মাতৃ-মন্দির

মহিলাদের মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক— { শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী।
শ্রীমতী সুরবালা দত্ত।

২য় বর্ষ।

[১৩৩১ বৈশাখ—চৈত্র]

প্রকাশক—

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস।

৩৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাতৃ-মন্দির

[২য় বর্ষ, ১৩৩১ বৈশাখ—চৈত্র]

বিষয় সূচি

(বর্ণানুক্রমিক লেখকলেখিকাদের নাম অনুসারে)

বিষয় — পৃষ্ঠা

উ

ক

গ

চ

জ

ত

দ



মাতৃ-মন্দিরে



মাতৃমন্দির



২য় বর্ষ } বৈশাখ—১৩৩১ { ১ম সংখ্যা।

নববর্ষের আবাহন

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

এস বরষের পর বরষ আবার
হরষ করিতে প্রাণ,
এস ভূলোকের মাঝে দ্যুলোকের আলো
আবার করিতে দান।
এস নূতন রাগিণী আলাপ করিতে
বিশ্ববাসীরে নিয়ে,
এস শান্তি বিলা'তে কাহারো প্রাণে,
কা'রে বা দুঃখ দিয়ে।
এস নূতন ভাগ্য দেখা'তে মোদের—
দেখা'তে নূতন ক্ষেত্র,
এস নবীন সুহৃদ, তোমারি কারণে
চাহিয়া আছি গো নেত্র।
এস চির প্রচলিত প্রথাটি রাখিয়া
যেমন আসিছ বিশ্বে,
এস উৎসবের হাসি যেমন ঢালিয়া
মধুর মোহন দৃশ্যে।
এস প্রতি ঘরে ঘরে আনন্দ-প্রদানি
আশার আলোক জ্বালি,
এস শেষে যাহা কর, প্রথম দর্শনে
ক'রনা হৃদয় খালি।
এস 'আকাঙ্খা' মোদের 'এত খানি' দিতে,
—দিতে গো নূতন শক্তি,
এস নূতন অতিথি, প্রথম দরশে
লওগো অর্ঘ্য-ভক্তি।
এস 'ভবিষ্যৎ' মোরা ভাবিতে জানিনা
জানি শুধু 'বর্ত্তমান'—
এস অতীতে'র স্মৃতি মুছাইয়া দিয়া
শান্ত করিতে প্রাণ।
এস সৌম্য-মধুর মূরতি লইয়া
শীতল করিতে হিয়া,
এস স্নিগ্ধ করুণা-স্নেহের নির্ঝর
সমুখে খুলিয়া দিয়া।
এস 'মাতৃমন্দিরে' মঙ্গল শঙ্খ
বাজুক তোমার স্পর্শে,
এস ধন্য করিতে নিখিল বিশ্ব
মত্ত করিতে হর্ষে।

মাতৃ-জাতির প্রতি

শ্রীসুতপা দেবী---[শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম]

বিশ্ব-বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে মানব-সৃষ্টির ধারাটা দুই ভাগে বিভক্ত—স্ত্রী ও পুরুষ। যদিও স্ত্রী পুরুষ এই উভয় সৃষ্টিই এক মানব সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত তথাপি এই সৃষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা, বহুবিধ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। নর নারীর মধ্যে কোনও প্রকার প্রাকৃতিক সাদৃশ্য নাই ব'ললেই হয়। নারীর কর্ত্তব্য-ভার পুরুষাপেক্ষা অনেক কঠিন। তাঁহারা সৃজন কারিণী জননী, তাই নারী এই বিশ্বে বরণীয়া পূজনীয়া, দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, সমাজের দুরপনেয় তাচ্ছীল্য শক্তিমদে গর্ব্বিত পুরুষ-জাতির সঘৃণা অবজ্ঞা, জাতির ভিত্তিস্বরূপা এই মাতৃজাতির অধঃপতনের মূল। এই সুমেরু সদৃশ অচলা অটলা সহিষ্ণুশীলা জাতির ক্ষমতার সহিত পুরুষ জাতির ক্ষমতার কোন তুলনাই হইতে পারেনা। যদিও বর্ত্তমানে নারীর আসন বহু নিম্নে তথাপি সমান ক্ষমতা দিলে কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষাপেক্ষা নারী কখনই হীন হইতেন না, অধিকন্তু হয়ত অধিকতর শ্রেষ্ঠ স্থান লাভেও সমর্থা হইতেন।

মাতৃজাতির শিক্ষা, দীক্ষা, উদারতা, মহানুভবতা বহুকালাবধি পুরুষের নিষ্পেষনে, সামাজিক নির্য্যাতনে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উদার ক্ষেত্র বিনা কখনও হৃদয়ের প্রশস্ততা আসিতে পারে না। যত গণ্ডীর মাঝে, ক্ষুদ্রতা দীনতার মধ্যে, কঠিন বাঁধনের মাঝে আপনাকে আবৃত রাখা যায়, হৃদয় ততোধিক ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল ও সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে। চীনের মেয়েদের পা যেমন লোহার জুতা দ্বারা আশৈশবে ক্ষুদ্র করিবার ব্যবস্থা, তেমন এই শস্য শ্যামল উদার বাঙ্গালার প্রশান্ত বক্ষে চতুষ্পার্শ্বের নিষেধের গণ্ডী, দুর্ব্বিসহ অবরোধ বাঙ্গালী মেয়েদের এমনি ভাবেই ক্ষুদ্র, হীন, দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে। চীনের মেয়েদের উক্ত ব্যবস্থার মতনই বাঙ্গালী মেয়েদের ব্যবস্থা।

যদিও বর্ত্তমানে নারী-সমস্যা লইয়া অনেকেই আপন সুস্থ চিত্তকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন তথাপি মনে হয় যে, সে চিন্তা হয়ত প্রকৃত জাতীয়তার মধ্য দিয়া কার্য্যকারী হয়না; কারণ তাঁহাদের সেই শিক্ষা দীক্ষার মাঝে পাশ্চাত্যের আব্ হাওয়া পূর্ণবেগে বহিতেছে। যে শিক্ষা শুধু বিলাস প্রসাধন, বাহ্যিক চাল চলনের মধ্যেই পর্য্যবসিত হয়, প্রকৃত নারীত্ব, মাতৃত্ব কি তাহার মাঝে আমরা দেখিতে পাই?

সর্ব্বাগ্রে নারীকে মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহারা সেই মাতৃজাতি, নারীজাতি--যাঁহাদের কর্ত্তব্য বিশ্বে কত সুকঠিন! তাঁহাদের মাঝে মাতৃত্বের অভাব, নারীত্বের ক্ষুন্নতা যে সবচেয়ে আঘাত দেয়। সন্তান পালন কি কখনও 'নার্স' দিয়া হয়? স্তন্য পানের সঙ্গে সঙ্গে জননী শিশুর প্রাণে যে প্রেরণা দিবেন, তাহাকে যে ভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবেন তাহা কি ওই 'নার্স' দ্বারা অথবা অপরের দ্বারা সম্ভবে? মাতৃজাতি, কর্ত্তব্য পালনে ধাত্রী পান্না, দুঃখে বেদনায় আত্মবিস্মৃতা সান্ত্বনার প্রতিমূর্ত্তি, শান্তি সুখে চির সহচরী, পরামর্শে মন্ত্রী, শুশ্রূষায় সেবিকা, গৃহকর্ম্মে দেবী, দিবসের কর্ম্মে পূজারিণী। স্বীয় সুখ সম্ভোগের জন্য হয়ত বিধাতা নারীকে বিশ্বে আনেন নাই। বিজন বনে যেমন আপনা হইতেই ফুল ফুটে, উঠে সুবাস বিতরণে জগতের আনন্দ বর্দ্ধন করে, তদ্রূপ এই নারীও যে তাপিত ধরার দুঃখ দৈন্য অভাব

অভিযোগের বোঝা বহন করিয়া শান্তি দিবার জন্যই সৃজিতা হইয়াছেন।

অনেক খ্যাতনামা শিক্ষিত ব্যক্তির মুখেও শুনিয়াছি "মেয়ে মানুষে আবার লেখা পড়া শিখবে কি? তাদের কি চাকরী করতে হবে? যদি মেয়েরা লেখা পড়া শিখবে, তাদের ঘরের কাজ করবে কারা?" হায়, হায়! মানুষই কি মানুষকে স্বীয় স্বার্থ সাধনের জন্য এমনি ভাবে নিষ্ঠুর পীড়নে মারিয়া ফেলিতে চায়? তবে কি 'নারী শরীর' লইয়া জন্মগ্রহণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা মহান অপরাধ? পুরুষের হাতের ক্রীড়া-পুত্তলিকা ও তাহাদের বিলাস বাসনার পরিতৃপ্তির জন্যই বিশ্বস্রষ্টার এই নারীসৃষ্টি? সমগ্র নারী যদি আজ শিক্ষিতা হইতেন যদি শিক্ষার নবারুণালোকে তাঁহাদের জীবনের কর্ত্তব্য পথ তাঁহারাই নির্দ্ধারণ করিয়া চলিতেন তবে কখনও তাঁহারা গৃহ কর্ম্মে উদাসীন থাকিতে পারিতেন না। বিরাট নারী সৃজনের মাঝে মুষ্টিমেয় নারী শিক্ষিতা বলিয়াই হয়ত আজ তাঁহারা অশিক্ষিতা-সমাজ হইতে আপনাদিগকে শিক্ষিতা বলিয়া স্বতন্ত্র রাখিতে পারেন কিন্তু যেদিন শতকরা ৯০ জন নারী শিক্ষিতা হইবেন সেই দিন তাঁহাদের দ্বারা গৃহকর্ম্ম অধিকতর সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে ইহাই আমার বিশ্বাস। কই পুরুষ জাতি তো শিক্ষিত হইলে শিক্ষার মর্য্যাদা (?) অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য তাঁহাদের গৃহকর্ম্মে উদাসীন থাকেন না অথবা অপর দ্বারা তাহা সম্পন্ন করান না! অতএব সমগ্র নারী আজ শিক্ষিতা হইলে কখনও এইরূপ হইতনা। মুষ্টিমেয় নারীর শিক্ষার ফলেই এইরূপ দাঁড়াইয়াছে।

আবার যাঁহারা নারী-শিক্ষার পক্ষপাতী তাঁহারা চান—নারী ও পুরুষের সমান অধিকার। (অবশ্য পুরুষের সহিত সমান অধিকার গ্রহণের ভার লইবার ক্ষমতা, সে মানসিক শক্তি, কর্ম্মক্ষেত্রে সেই তৎপরতা প্রতিযোগিতার সে তেজ নারীর মাঝে আজ চাই) আমার মনে হয় হয়ত সে মত ঠিক নয় কারণ নারী পুরুষের ব্যবধান বহু। নারী যদি পুরুষের সহিত আপন কর্ম্ম বিভাগ করিতে চান তবে এইখানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিজাতীয় বিদ্বেষ, মতদ্বৈধতা নানা প্রকার অশান্তির কারণ হইতে পারে, দ্বিতীয়তঃ শ্রেষ্ঠ-ধন নারীত্বের বিকাশ, মাতৃত্বের মাধুরিমা অঙ্গহীন ও মলিন হইয়া পড়ে। মাতৃত্বের চির গৌরব মাতৃজাতির মাঝে অস্তমিত হইবে। পূর্ণ অবরোধের মাঝে সম্পূর্ণ গঠিতা হইয়াও রাজপুত নারীরা যেমন ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে আপন শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম প্রদর্শনে শত্রুকুলের হৃৎকন্দরে যুগপৎ ভীতি ও সম্ভ্রম-জড়িত বিস্ময় জন্মাইতেও পশ্চাৎপদ বা ভীতা হন নাই সেইরূপ আমাদের মেয়েদেরও মানসিক বলে অসীম শক্তিমতী হইতে হইবে। প্রথমে চাই মেয়েদের গৃহকর্ম্মে শিল্পির মত নিপুণ নিপুণতা, নীতি পরায়ণতা, শুশ্রূষা, সন্তান-পালন, আদর্শের ধারায় সন্তান সন্ততির গঠন, স্বাস্থ্যরক্ষা পরিজনের প্রতি যথার্থ কর্ত্তব্য পালন, পরিচ্ছন্নতা, সত্যপ্রিয়তা, সহৃদয়তা, রন্ধন-নিপুণতা। দ্বিতীয়তঃ শিল্পচর্চ্চা, লেখাপড়ার আলোচনা, সদ্গ্রন্থাদি পাঠ, প্রবন্ধাদি লেখা, পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোনও সদ্ বিষয়ের আলোচনা, সংবাদ-পত্র ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ, সঙ্গীত চর্চ্চা। তৃতীয়তঃ চিত্তের স্থৈর্য্য, সংযমের জন্য ধ্যান ধারণাদি। গৃহ দেবতার আরাধনা, ব্রহ্মচর্য্য পালন, কায়মনোবাক্যে পতিসেবা।

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন "কেহই কাহারও স্থানে ছোট নয়, সকলেই আপনাপন স্থানে বড়, ছোট ছোট বলিতে বলিতেই মানুষ ছোট হইয়া আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলে।" অতএব নারী ছোট নহেন। মাতৃজাতিকে তাঁহাদের জীবনের কঠোর কর্ত্তব্য ব্রত বুঝাইয়া দিতে হইবে। যাহাকে ঘৃণা, অবহেলা, তাচ্ছীল্যের বিষে জর্জ্জরিত করিয়া পঙ্গু করা হইয়াছে তাহাকেই আবার সম্ভ্রমের সঞ্জীবনী সুধা দানে পরিপুষ্ট করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে সাদরে আহ্বান করিতে হইবে। আজ এই নব যুগের নব

চেতনায় মাতৃজাতি উদ্বুদ্ধ হয়েন নাই, জাগরণের সাড়া তাঁহাদের বিবশ কর্ণকুহরে আসিয়া পৌছে নাই, তাঁহাদের তন্দ্রালস-নয়নে তরুণ তপনের স্নিগ্ধ কিরণ এখনও পড়ে নাই। তাই এই বিপুল নারী প্রগতি আজ এত পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। যেমন একপক্ষ বিহঙ্গমের উত্থান অসম্ভব, সেইরূপ সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ মাতৃজাতিকে বাদ দিলে সমাজের উন্নতির আশা, দেশের ভবিষ্যৎ ভরসা সুদূর-পরাহত।

এই দুর্ব্বলা আত্ম-বিশ্বাস-হীনা পুরুষের পদানতা জীবন্মৃত জাতিকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে—যিনি আপন বক্ষ সুধায় পুষ্ট নয়নের মণি হৃদয়ের ধন, বিধবার জীবনের শেষ সম্বল, একমাত্র শিশু সন্তানকে দুর্দ্দান্ত নরপিশাচ ক্রুর ব্যাঘ্র শত্রুর করে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করেন সেই ধাত্রী পান্না কে ছিলেন? অসূর্য্যম্পশ্যা কোমলাঙ্গী সুখলালিতা নারীই না একদিন প্রবল প্রতাপশালী, বীরপুঙ্গব, একচ্ছত্রাধিপতি সম্রাট আকবরের হৃদয়ে বিস্ময়, হর্ষ, ভীতি, সম্মানের শ্রদ্ধা জাগাইয়া তোলেন? আবার কে বিপুল রাজ্যের বিশাল পরিজনের স্নেহচ্ছায়ে প্রতিপালিতা, জনক জননীর একমাত্র নয়ন পুত্তলী, অনুপম লাবণ্যময়ী নবীনা কিশোরী পিতৃরাজ্য, ততোধিক পিতার সম্মান রক্ষার জন্য আপন জীবনের সকল নবরাগে রঞ্জিত আশা ভরসা বক্ষে লইয়া, সমুদ্র মন্থনের অমৃতজ্ঞানে হলাহল পান করেন? কাহারাইবা রমণীর অমূল্য ধন সতীত্ব-রত্ন রক্ষার জন্য, প্রিয়তম জন্মভূমির বক্ষে আপনাদিগকে চির অমর রাখিবার জন্য, পতঙ্গের অগ্নিশিখা আলিঙ্গনের ন্যায় সকল হইতে প্রিয় জীবন জলন্ত হুতাশনে (বুঝি যজ্ঞীয় দেবতাগণের তৃপ্তি সাধনের জন্য) আহুতি দিয়াছেন! অসীম জ্ঞানগর্ভা অমিত-বীর্য্য-শালিনী জননী ভারতীয় প্রিয়-শিষ্যা সে কে! তাঁহারই পদতলে দিগ্বিজয়ী জ্ঞানাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও অবনত মস্তকে স্বীয় পরাভব স্বীকার করতঃ প্রণত হয়েন। দুর্ভাগ্য নারী জন্ম লইয়াই না প্রাচীন গার্গী, মৈত্রেয়ী 'ব্রহ্মবাদিনী' হইতে সক্ষমা হইয়াছিলেন? খনা, লীলাই না আপন পাণ্ডিত্যের রশ্মি বিকীরণে বিশ্ববাসীর নয়নে নবালোক দেখান। সাবিত্রীদেবীই না জীবন সংগ্রামে জয়, মরণ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া মৃত পতির প্রাণ ফিরাইয়া আনেন। রাজনন্দিনী রাজবধূ সীতাই না ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া দুঃসহ দুঃখ দৈন্য বরণ করিয়া পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে আজ ভারতের প্রতিগৃহে গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিতা! এইরূপ সর্ব্বত্রই আমাদের ভারতের ইতিহাসে নারীর উৎকর্ষতা দেখিতে পাই। অতএব এই ক্ষেত্রে নারীজাতি পুরুষাপেক্ষা কোথায় ছোট?

হে মায়ের জাতি, হে নারি, তোমরা হীন নহ! মহাশক্তির অংশসম্ভূতা তোমরা! তোমাদের ধৈর্য্য অসীম, শক্তি অপার, করুণা অমিত; অনন্ত স্নেহ তোমাদের বক্ষে বহন কর। তোমাদের প্রাদুর্ভাব বিনা 'মহেশের' সৃষ্টি লীলা পঙ্গু হইয়া পড়ে। তোমাদের অনির্ব্বচনীয় মায়া-শক্তিতে বিশ্বের প্রতি-লীলা সম্পন্ন হইতেছে। দেখাও যায় শ্রীরাধিকা বিনা-শ্রীকৃষ্ণের লীলার অপূর্ণতা! পার্ব্বতী বিনা কৈলাশ-পতি ভোলানাথের উন্মাদ উদ্‌ভ্রান্ত দিগন্তে ভ্রমণ! সীতা দেবী বিনা শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের উৎকর্ষতা কোথায়? অতএব তোমরা নবযুগের নবীনালোকে উদ্বোধিতা হও, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস সম্পন্না হও, তোমরা সৃষ্টির জাত! সৃজন তোমাদের মাঝে।

বৃক্ষ শাখায় বসিয়া সেই শাখাটীই ছেদন করিলে যেমন পতন অবশ্যম্ভাবী, অন্ধসমাজও তোমাদের প্রতি কতকটা সেইরূপ সুবিচার (?) করিতেছে। সমাজ একদিকে যেমন মাতৃজাতির প্রতি অসীম ঔদাসীন্য দেখায় অপরদিকেও তেমন সে তাহার আপনারি অজ্ঞাতেই তোমাদের আশা পথে সতৃষ্ণ নয়নে বুভুক্ষু প্রাণের আকুলতা লইয়া চাহিয়া আছে। কেননা নারী যে সৃষ্টির জাত। জননী বিনা কে সমাজকে, দেশকে এই অমূল্য নিধি উপহার দিবে? মা নহিলে কে সন্তান গড়িবে? "মায়ের

স্বাস্থ্য, মায়ের শিক্ষার উপরে সন্তানের মধ্য দিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। বড় ঘরেই বড় লোকের জন্ম হয়। যাঁহাদের মা নীতি পরায়ণা শিক্ষিতা, ধর্ম্মভীরু, তাঁহাদের সন্তানই উত্তর জীবনে 'মহৎ' হইয়া যান!' যে দিন ভারতে প্রতি ঘরে মায়েরা প্রকৃত শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হইবেন সেই দিনই তাঁহাদের সন্তান সন্ততি দ্বারা ভারতের প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃ-রূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

ছিন্নহস্ত

(গল্প)

শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়।

পাঁচ বছরের পর ছুটি পেয়ে, আশা করেছিলুম বাড়ী ফিরে আত্মীয়-স্বজনের হাসি মুখের ছবি স্মৃতিতে এঁকে নিয়ে, বিদেশের নিঃসঙ্গ দিনের গুরুভার একটু লাঘব করতে পারব। কিন্তু এমন একটা ঘটনা মধ্যথেকে ঘটে গেল যে, ফিরে এসে এই দূর প্রবাসেও, সে ব্যথার আভাষটা মন থেকে মুছতে পারছি না। দুঃখ নাকি সকলের কাছে প্রকাশ করলে, মনের ভার অনেকটা কমে, সেই ভরসাতেই, আজ আপনাদের কাছে আমার বেদনার কারণটি প্রকাশ করতে ভরসা পাচ্ছি।

বাড়ী গিয়ে, এবারেও পূর্ব্বের মত গোবিন্দদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম। সে আমাদের প্রতিবেশী, ত ছিলই, তা ছাড়া ছেলে বেলায় এক ক্লাসে তার সঙ্গে পড়েছি, এক সঙ্গেই খেলা করেছি। গরীব হলেও তারা বেশ চমৎকার লোক ছিল। জাতির সম্মানে আমাদের চেয়ে ঢের নীচু হলেও, আমরা তার বাবাকে 'কাকা' বলেই ডাকতুম। তার বাপের মৃত্যুর পর, তার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেল। সে ইলেকট্রিক্ না কিসের কাজ শিখতে লাগল—আর আমি বিনাবাধায় পড়তেই লাগলুম। তার পর, একটা মোটা চাকরী নিয়ে আমি এসে পড়লুম এই বিদেশে—আর সে নিজের দেশে বসে কোনও ভাবে দিন কাটাতে লাগল।

তার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে শুনলুম যে, কলে কাজ করতে গিয়ে তার বাঁ হাতের কনুই থেকে কেটে গিয়েছে। বেশ সহজ ভাবেই সে কথাটা বল্লে বটে, কিন্তু আমার প্রাণটা তার দুঃখ ব্যথায় কাতর হয়ে উঠল;—আহা, বেচারী পয়সার জন্য খাটতে গিয়ে, হাতখানাই নষ্ট করে ফেল্লে! কি ভাগ্য, যে ডান হাত খানি যায় নি, তা হলে ত তাকে পরের অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে দিন কাটাতে হোত……

তার একমাত্র পাঁচ ছ বছরের একটি ছেলে আমার পানে হাঁ করে তাকিয়ে এই নব আগন্তুকটিকে দেখছিল। তাকে কোলে টেনে নিতেই অপ্রস্তুত-ভাবে সে আমার হাতটি ধরে, নানাবিধ প্রশ্ন করে যেতে লাগল। তার কথার উত্তর দিতে দিতে, তার মার কথা জিজ্ঞাসা করতেই, সে এমন উদাস দৃষ্টিতে আমার দিকে করুণ ভাবে চাইলে, যে আমি যেন কিছু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লুম। গোবিন্দ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলে, কিন্তু সে হাসিতে এমন একটা বিষাদের ছায়া

ফুটে উঠল, যে না দেখলে, আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, হাসিতে আনন্দ ছাড়া, ব্যথাও সময় সময় ফুটে উঠতে পারে। তার সেই ম্লান হাসি দেখে আসল ঘটনাটা অনুমান করতে দেরী হল না। ছেলেটির হাতে একটি টাকা দিয়ে বললুম,—'আমি তোমার কাকা হই,—খাবার খেয়ো, বুঝলে?—এখন যাও খেলা করগে যাও।' ছেলেটি সোৎসাহে সম্মতি জ্ঞাপন করে, আমার কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে ছুটে চলে গেল। গোবিন্দ তখন বলতে লাগল,—

"সেও আজ এই চার বছর হল—ওর মা চলে গিয়েছে—দু বছরের ওই ছেলেটিকে, আমার জিম্মায় ফেলে রেখে। স্ত্রী ত তাই অনেকেরই যায়, কিন্তু স্বামীকে এমন দাগা দিয়ে, বোধ হয় কেউ কখনও এ সংসার ছেড়ে চলে যায় না। অহরহ যন্ত্রণার জ্বালায় পুড়ে মরবার জন্যই বোধ হয় আমি বেঁচে আছি। একে ওই ছোট ছেলে—তার ওপর মনের মধ্যে কি যে আগুন জ্বলছে"—বলে,' সে অন্যদিকে এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার বলে উঠল, রোগ অসুখ হয়ত বুঝি, কিন্তু এমন ভাবে মরণকে সে আদর করে নিলে, যেন তাতে কত আনন্দ··· আমি যে পাগল হয়ে যাই নি,—এখনও এমন অবস্থায় বেঁচে আছি সেইটেই আমার পরম আশ্চর্য্য বলে মনে হচ্ছে!

...এই আমার হাতটা যেদিন কলের চাকায় পিষে গেল, আর আমার অজ্ঞান দেহটা থেকে কৌশলী ডাক্তারের অনুগ্রহে, সে আহত অংশটুকু বাদ দেওয়া হল,—হাতে খুব ব্যাণ্ডেজ বেঁধে গাড়ী করে, রাত্রি বেলায় আমি ত বাড়ী এসে পৌছলুম। আমার ওই ভয়ানক অবস্থা দেখে, প্রথমে ত সে চুপ করে রইল, তারপর হঠাৎ চমক ভাঙ্গার মত, ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। নিজের বেদনা কাতর হাতখানার অসহ্য যন্ত্রণায় আমি ত প্রায় অস্থির হয়ে পড়েছিলুম। কিন্তু তার সেই রকম ব্যাকুল অবস্থা দেখে, আমি নিজেকে শক্ত করতে চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু তা কি আর হয়! তাকে বললুম 'কোনও ভয় নেই···দুদিন বাদে এ ঘা শুকিয়ে যাবে,—ভাবনা কিসের? আমার কৈ তেমন ত কষ্ট হচ্ছে না...। আমার আশ্বাস বাণীতে সে যে বেশ বিশ্বাস করতে পারছে না, সেটা বোঝা গেল তার ব্যথা-কাতর মুখের ম্লান দৃষ্টিতে। থেকে থেকে সে শিউরে উঠছিল ..বাড়ীতে এমন আর একটি কেউ নেই, যে আমার কাছে বসতে পারে বা তাকে বুঝিয়ে সুস্থির করে। কি ভাগ্যি, ছেলেটি পাশের ঘরে ঘুমচ্ছিল, না হলে কি ব্যতিব্যস্তেই পড়তে হোত!···

ঠাকুর দেবতার পূজা মেনে, নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়ে, কিছুক্ষণ পরে এসে সে আমার কাছে বসল। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, আমাকে ঘুম পাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করে, সে সারারাত্রি জেগে কাটিয়ে দিলে। রাত্রিটা যে এত দীর্ঘ, ভীষণ আর দুর্ব্বিসহ হয়ে পড়তে পারে, এর আগে আমি ত কল্পনাই করতে পারতুম না।

ভোরের আলোর উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটা অনেকটা যেন হালকা হয়ে এল। কিন্তু তার মুখখানা এক রাত্রে দুর্ভাবনায় শুকিয়ে মড়ার মত শাদা হয়ে গিয়েছিল। তাকে সান্ত্বনা দিবার সময় ডাক্তার এলেন। ব্যাণ্ডেজ খুলে, নূতন করে বেঁধে খুব আশ্বাস দিয়ে বলে উঠলেন --অবস্থা যে রকম ভাল—এতে এক সপ্তাহের মধ্যেই কাটা শুকিয়ে যাবে।

হাসিমুখে এ কথা তাকে বলতে, সে যেন হাতে স্বর্গ পেলে, এমনই তার মুখের ওপর প্রসন্নতা ফুটে উঠল।

"ডাক্তারের কথাই সত্য হল। আমি দশদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলুম। কিন্তু সেই সুস্থ হওয়ার আনন্দের দিনে কত বড় দুঃখের পাহাড় যে, আমার জীবনের বোঝার জন্য সঞ্চয় করা ছিল—যা সারা জীবনেও একটু হাল্কা হবে না—যার দুঃসহ ভারে আমার এই অবশ শরীরখানা শেষের দিনটিকে এগিয়ে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে—"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর গোবিন্দ আবার বলতে লাগল—"হাঁ সেই আনন্দের দিন খেয়েদেয়ে দুপুর বেলা ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি হঠাৎ গয়লানীর চেঁচানিতে আমি উঠে বাইরে এসে দেখি—উঠানের ওপর অজ্ঞান হয়ে সে পড়ে আছে—শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে আর পাশে একখানা রক্তমাখা কাটারী পড়ে রয়েছে···

"এই অবস্থা দেখে আমার সমস্ত রক্ত হিম হয়ে এল। চেঁচামেচি আর গোলমালে দু চার জন লোক এসে পড়ল। ডাক্তার এল, কিন্তু কিছুতেই তখন তার জ্ঞান হল না। দেখা গেল বাঁ হাতের কব্জিতে এমন কাটা হয়েছে যে শরীর থেকে সেটা বিচ্ছিন্ন বল্লেই চলে! তখন আমার মনে পড়ল তার আর একদিনের ঘটনা—খুব গরম দুধ আনবার সময় তার হাত থেকে বাটি পড়ে গিয়ে আমার হাতে গরম দুধ পড়েছিল। সামান্য ফোস্কাও হল,—যন্ত্রণাও বেশ অনুভব করেছিলুম। আমার যন্ত্রণা উপশম করবার জন্য সে অশেষ চেষ্টা করতে লাগল। পরের দিন হঠাৎ কি একটা কাজে রান্না ঘরে ঢুকে দেখি,—উনানে ফুটন্ত দুধের মধ্যে সে একটা আঙুল রেখে দিয়েছে—চোখের জলে মুখ ভেসে যাচ্ছে! তাড়াতাড়ি তাকে সরিয়ে দিয়ে আঙুলে স্পিরিট দিয়ে তার যন্ত্রণা কমাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। এ রকম পাগলামী করার কারণ জিজ্ঞাসা করে বোঝা গেল যে, আমার যে যন্ত্রণা হয়েছে, সেটা কি রকম আর কতখানি, সেও সেটা বুঝতে চায়···এ ব্যাপারটা ভুলে গেছলুম—সেদিন আবার মনে পড়ে গেল—ওঃ এই জন্যেই সে তার হাতখানা অমন নির্ম্মম ভাবে কেটে ফেলতে দ্বিধা করেনি...সে চেয়েছিল শুধু আমার সেদিনকার পাওয়া যন্ত্রণাটার অংশীদার হতে—"

চোখের জল মুছে নিয়ে গোবিন্দ আবার বলতে লাগল..."ঢের চেষ্টা করলুম—কিন্তু ডাক্তার বল্লেন "সেপ্‌টিক্" হয়েছে...কিছুতে বাঁচান যাবে না। তিন দিন পরেই সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল আমার বুকখানাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়ে··

...আচ্ছা যতীন, তুমিই বল ত ভাই, এইভাবে স্বামীর সুখ দুঃখে অংশী হয়ে সে কি করলে! এতে বরং আমার যন্ত্রণাই বেশী করে দিলে নাকি? এটা কি ভালবাসা, না স্বামীভক্তি—না অজ্ঞতা? এমন ধারা দেখেছ বা শুনেছ এর আগে? আমার মত হতভাগ্য আর কে আছে ভাই?" বলে সে আমার কোলে পড়ে, ছোট ছেলের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বুকের মধ্যের জমাট কান্না অশ্রু হয়ে আমার চোখে ঝরে পড়ল। কোনও রকম আশ্বাসবাণী আর তাকে শোনাতে না পেরে, হতবুদ্ধির মত আমি চুপ করে বসে রইলুম।

আশায়

শ্রীমতী শোভা রুদ্র।

তোমার আশায় পথ-চাওয়া কি
বৃথা-ই হবে মোর,
বৃথা-ই হবে দিন-গোণা আর
অলস আঁখি-লোর!
চেয়ে চেয়ে নয়ন-দুটী
ক্লান্ত হয়ে পড়ছে লুটি

তবু তোমার পাইনি দেখা,
হে মোর দেবতা,
ভালবাসা ভক্তি ভরে
দিয়েছি যা তোমার করে
আজ্‌কে বল কেমন ক'রে
ফিরিয়ে নেব তা।
—জীবন-দেবতা!

নারীশক্তির অপচয়

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

বাঙ্গালার পুরুষজাতির ন্যায় নারীজাতির মধ্যেও আজ একটা চেতনার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু এখনও লক্ষ লক্ষ মহিলা ভিখারিণীর ব্রত অবলম্বন করিয়া দেশে জড়তার প্রশ্রয় দিতেছেন। সোজা কথায় ইঁহাদিগকে বৈষ্ণবী বলে। এই সমস্ত মহিলারা নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি বৈষ্ণব-অধ্যুষিত স্থানেই অধিক পরিমাণে দেখা যায় এবং ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহই ইঁহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইঁহারা কৈবল্য বা মুক্তিলাভের জন্য—আহারে, বিহারে যে প্রকার সংযম ও শ্রীগৌরাঙ্গ-মহিমা কীর্ত্তনে যে প্রকার আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহার শতাংশের একাংশও যদি দেশ মাতৃকার সেবায় নিয়োজিত হয় তবে দেশের নারী সমাজের অবস্থা হয়ত দুদিনেই ফিরিয়া যাইতে পারে। ইঁহারা মুক্তিলাভের জন্য কীর্ত্তনাদি নানাপ্রকার কঠোর তপশ্চরণ করেন, কিন্তু দেশসেবাও যে মুক্তির প্রধান সোপান তাহা তাঁহারা মনে করেন না। পাশ্চাত্যখণ্ডে ধর্ম্ম সাধনার অন্য নাম Patriotism; রোগার্ত্তের সেবা, পিপাসিতকে বারি দান, বুভুক্ষুকে অন্ন দান, অজ্ঞানীকে জ্ঞান দান ধর্ম্মের প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন, তাই সে দেশের যা' কিছু ধর্ম্ম সাধনা তাহা প্রযুক্ত হইয়াছে দেশসেবায়। আর আমাদের দেশে ধর্ম্মসাধনা ও দেশসেবা এই দুইটি বস্তুকে পৃথক করিয়া দিন দিন মরণের পথে অগ্রসর হইতেছি। প্রতীচ্যের মুমুক্ষু নরনারী যেমন গির্জায় যাইয়া মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের ভজনা করেন, তদ্রূপ দেশমাতৃকার আহ্বান আসিলে সংগ্রামের মহাহবে অবতীর্ণ হইতে কিংবা লোক শিক্ষার জন্য দুরধিগম্য পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইয়া অসভ্য আদিম জাতিকে শিক্ষাদান করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। তাই আমরা দেখিতে পাই, যাহাদিগকে আমরা মানুষ বলিয়া মনে করি না—সেই সাঁওতাল, গারো, কুকী নাগার মধ্যে যাইয়া শত শত খ্রীষ্টান মহিলা তাহাদের পুরীষ নিষ্ঠীবন মুক্ত করিতেছেন, তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, সন্তানের মত তাহাদিগকে লালনপালন করিতেছেন। প্রতীচ্যের রমণী এই জনসেবাকেই মুক্তির সোপান বলিয়া জানেন এবং নর-নারায়ণের সেবার মধ্য দিয়াই তাঁহারা বিশ্বপতি নারায়ণকে সেবা করেন।

আমাদের দেশে কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত ভাব! নবদ্বীপে যাও, বৃন্দাবনে যাও দেখিবে শত শত, সহস্র সহস্র বৈষ্ণবী সর্ব্বাঙ্গে তিলক ফোঁটা কাটিয়া শুধু হরিনাম জপেই বিভোর! তাঁহাদের সম্মুখে সমস্ত দুনিয়াটা ধ্বংস বিধ্বংস হইলেও তাঁহাদের গায়ে একটুও ব্যথা লাগে না—কেহ জলাভাবে চীৎকার করিলেও তাঁহাদের হস্ত এক বিন্দু শীতল বারি তাহার রসনায় প্রদান করে না। এই শ্রেণীর বৈষ্ণবীরা বাহ্যিক গৈরিকবসন, সর্ব্বাঙ্গে তিলকের ফোঁটা ও বিভোরে কীর্ত্তন করাকেই মুক্তি সাধনার একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করেন! বাঙ্গালায় এই শ্রেণীর বৈষ্ণবীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। ইঁহারা যদি নিষ্কামভাবে দেশ সেবাব্রতে আজ ব্রতী হন তাহা হইলে মুহূর্ত্তের মধ্যে বাঙ্গালার নারীসমাজকে চেতন করিয়া তুলিতে পারেন। ইঁহাদের মধ্যে অবরোধ প্রথা নাই, জাতিভেদের বাড়াবাড়ি নাই এবং সন্তানাদি না থাকায় সংসার প্রতিপালনেরও জগদ্দল পাথর ইঁহাদের বুকে চাপান নাই। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে নিজেরা লেখাপড়া শিখিয়া গ্রামে গ্রামে বালিকা

বিদ্যালয় খুলিয়া তাহাতে শিক্ষয়িত্রীর আসন গ্রহণ করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে প্রতি বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া রোরুদ্যমান রোগার্ত্তের সেবা করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে চরকাকাটা শিক্ষা করিয়া অন্য সমস্ত গ্রাম্য মহিলাগণকে চরকায় সূতা কাটা শিখাইতে পারেন। বস্তুতঃ পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান রমণীগণ সমাজে যে স্বাধীনতা সুখ সম্ভোগের অধিকারিনী, আমাদের দেশের বৈষ্ণবীগণ ঠিক সমতুল্য স্বাধীনতার অধিকারিনী। ইঁহাদের সাধনা প্রণালী আজ যদি একটুকু পরিবর্ত্তিত হইয়া দেশ-মাতৃকার যজ্ঞ-বেদীতে গণনারায়ণের পূজায় পর্য্যবসিত হয় তবে বাঙ্গালাদেশ শত শত ডোরা, শত শত নাইটেঙ্গেল; শত শত নিবেদিতা ও রাভাস্কির জন্মস্থান বলিয়া গৌরব করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতের ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি দুইটি স্বতন্ত্র জিনিষ হইয়া পড়িয়াছে! পাশ্চাত্য খণ্ডে কিন্তু সেরূপ নয়। এখানকার ধর্ম্মের গুরু যাঁহারা, তাঁহারা চক্ষু মুদিয়া শুধু ধর্ম্মের ভাবনাই ভাবেন, দেশের চারিদিকে যে কি আগুন দাবানলের মত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, সে খোঁজ রাখেন না। ইউরোপ প্রমুখ পাশ্চাত্য খণ্ডের ধর্ম্মযাজক কিন্তু সেরূপ নহেন; সেখানকার গির্জ্জায় যিনি উপদেশ দেন তিনি রাজনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস সকলই জানেন। তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনানীর পদে নিয়োগ করিলে তিনি অসীম সাহসে যুদ্ধ করিতে পারেন—সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী করিলে সে কাজও অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারেন, আবার কলেজে অধ্যাপনা করিতে দিলে সে কাজও অক্লেশে করিতে পারেন। আমাদের দেশে কিন্তু ইহার বিপরীতাচরণ দেখিতে পাই। এখানকার নৈয়ায়িক শুধু ন্যায় শাস্ত্রই জানেন, বৈষ্ণব শুধু বৈষ্ণবশাস্ত্রই জানেন—এমন কি সংবাদপত্র পড়িয়া দুনিয়ার সংবাদ লওয়াটাও তাঁহারা ঘোর পাতকের কাজ বলিয়া মনে করেন। এই ভাবে বহির্জ্জগত সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া শুধু অন্তর্জ্জগত লইয়া আমাদের দেশের ধর্ম্মাচার্য্য ও ধর্ম্মাচার্য্যাগণ আছেন বলিয়াই বাঙ্গালার আজ এই দুর্গতি—বাঙ্গালীর আজ এই শোচনীয় অধঃপতন। আর বাঙ্গালার এই যে লক্ষ লক্ষ বৈষ্ণবী ইঁহারা যতই সাধনমার্গে অগ্রসর হৌন না কেন, ইঁহাদের অমূল্য জীবন যে বৃথা যাইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ জন-সেবা হইতে দূরে থাকিয়া কেবল কীর্ত্তন করিলেই যে ভগবানকে পাওয়া যায়, এমন কথা ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবও কখনও বলেন নাই।

বাঙ্গালার যাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মাচার্য্য, তাঁহারা যদি চক্ষুষ্মান হইতেন, দেশের মধ্যে আজ নারী সেবিকার কত অভাব ইহা যদি তাঁহারা জানিতেন তবে এই ভাবে বৃথা ভিক্ষাবৃত্তি ও কীর্ত্তনের মধ্যে বাঙ্গালার বৈষ্ণবীগণকে না রাখিয়া তাঁহারা আজ বৈষ্ণবীগণকে দেশের কার্য্যে নিয়োজিত করিতেন। এখন ত দেশের নিদ্রার সময় নয়! এখন যে কঠোর কর্ম্মের সময়! চারিদিক হইতে লক্ষ লক্ষ সন্তান রোগের জ্বালায়, পেটের জ্বালায়, ক্ষুৎপিপাসায় "মা" "মা" বলিয়া হৃদয়বিদারী আর্ত্তনাদ করিতেছে, বাঙ্গালার বৈষ্ণবীগণ! আজ কি তোমরা বুকভরা স্নেহ লইয়া মাতৃরূপে তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া অভয়বাণী শুনাইবে না? তোমরা যে মা সন্তানের সেবার জন্য সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া আজ বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর মত বাঙ্গালার শ্মশান-ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছ? একবার অন্নপূর্ণার মত অন্নের থালা লইয়া তোমাদের ক্ষুধিত পিপাসার্ত্ত সন্তানগণের ক্ষুৎপিপাসা দূর কর মা! "মা মা ব'লে ডাকছে এত, বাজে নাকি মা তোর প্রাণে!" তোমাদের প্রাণ কি মা এতই কঠোর! চিরদিন কি মা তোমরা ভিক্ষা করিয়া কেবল নিজের উদরই পরিপূর্ণ করিবে? তোমাদের শত শত সন্তান ঐ যে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া আছে, একবার তাহাদের মুখে ঐ অন্নের কিছু দাওনা মা—ওরা যে তোমাদের সন্তান! দেখ মা, আজ দেশ অশিক্ষার ঘোর তমিস্রায় ডুবিয়া; একবার শিক্ষার আলোকবর্ত্তিকা লইয়া বাঙ্গালার ঘরে ঘরে প্রবেশ কর দেখি!

বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আবার শ্বেতপদ্মাসনা বীণাপাণির পদচ্ছায়া পতিত হোক। তোমরাই ত মা আজ দেশের সেবিকা—দেশের নেত্রী, কর্ত্রী ও শিক্ষয়িত্রী! তোমাদের ভোগ-বিলাস-পরিশূন্য, তপশ্চর্য্যা-পরিপূরিত মুমুক্ষু জীবনের আদর্শবাদ আজ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে প্রচার করিয়া বাঙ্গালাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুল—দেশের নারী-শক্তিকে শিক্ষিতা করিয়া দেশকে "চৈতন্যময়" করিয়া তুল—ভারতের সনাতন আদর্শকে প্রচার করিয়া বাঙ্গালার ঘরে ঘরে "সনাতনের" প্রতিষ্ঠা কর, দেখিবে ভগবান শ্রীচৈতন্যের "জীবে দয়া, নামে রুচি" এই মহাবাণী সার্থক হইবে! আজ অবনতা, লুণ্ঠিতা, অচেতনা বাঙ্গালার নারীকে "চৈতন্যময়ী" করিতে, হে চৈতন্য শিষ্যাগণ! তোমরা অবতীর্ণা হইবে কি?

প্রেয়সী

শ্রীঅবনীকুমার দে।

নিশিদিন জপমালা জাগরণে শয়নে
তা'রি চোখ লাগে শুধু নয়নে।
ওই কণ্ঠ, ওই রূপ
রসগন্ধ অপরূপ
চিত্ত-বিত্ত হয় লোপ যেখানে;
সব দিকে সব ঠাঁই
প্রিয়া বিনে কিছু নাই
আপনারে ভুলে যাই ভুবনে।
তা'রি চোখ জাগে শুধু নয়নে।

এত গান এত সুর বাজে কোথা চরমে
—অনাহত অহরহঃ মরমে?
নিমিষে ভাবিতে তা'য়
মানস মুরছা পায়
পুরুষ টুটিয়া যায় সরমে!
তার সে নূপুর রোলে
ত্রিভুবন টলে মলে
কোটি শশী পড়ে গলে' ভরমে!
অনাহত অহরহঃ মরমে!

কলঙ্কে হয়েছি কালা,—সে কিনেছে গোকুলে
—কলঙ্কিনী রাধা নাম দু'কূলে।
কে বহিবে শিরে ডালা
এত জ্বালা এত পালা
বিনে সেই ব্রজবালা অকূলে?
বাঁশী বলে রাধা-রাধা
প্রাণ বাঁধা মন বাঁধা
আধা-সাধা আধা-কাঁদা স্ব-ভুলে।
কলঙ্কে হয়েছি কালা গোকুলে।

আজ যে করেছে মান বিরহিনী মানিনী
ভুলিতে কি পারি দীর্ঘ যামিনী?
আঁখি পদ্ম আছে ফুটে,
অহরহঃ মধু লুটে
নিশায় কভু কি টুটে কামিনী?
যৌবনে পড়ে কি ভাঁটা
মন যদি থাকে আঁটা
নাহি ডরে কোন কাঁটা পরাণি।
নিশায় কভু কি টুটে কামিনী?

জীবন-মরণ ধরে' সে যে মোর প্রেয়সী
অপরূপ ত্রিভুবন রূপসী!
বিশ্বকর্ম্মা ভাঙ্গে গড়ে
স্বর্গ-মর্ত্ত্য ওঠে পড়ে
অরবিন্দ থরে থরে বিকশি';
মুগ্ধ কবি লুব্ধ গন্ধে
পূজে তা'রে নানা ছন্দে
নিশিদিন ভূমানন্দে উলসি।
অপরূপ ত্রিভুবন রূপসী!

কুলবধূ সুজাতা

শ্রমণ শ্রীপুণ্ণানন্দ স্বামী এম-আর-এ-এস্।

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

প্রাচীন কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী অনাথপিণ্ডক শ্রেষ্ঠী ভগবান বুদ্ধদেবের অতি ভক্ত উপাসক। রাজগৃহের শ্রেষ্ঠী মগধরাজ মহারাজ বিম্বিসারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভগবান বুদ্ধের উপাসক হইয়াছিলেন। অনাথপিণ্ডক শ্রেষ্ঠীর ভগিনীর সহিত রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর বিবাহ হয়। রাজ-গৃহে ভগিনীর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া অনাথপিণ্ডক ভগবানের মধুর ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং তাঁহার একজন প্রধান ভক্ত হইয়া পড়েন। সর্ব্বদা ভগবানের সেবাপূজা করিয়া পুণ্যলাভ কামনায় তিনি শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠে এক প্রকাণ্ড বিহার (আশ্রম) প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে দান করেন।

অঙ্গদেশের ভদ্দীয় নগরের শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয় বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন। তাঁহার মেয়ে বিশাখা পিতৃগৃহে থাকিতেই বুদ্ধের উপাসিকা হইয়াছিলেন। শ্রাবস্তীর অন্যতম শ্রেষ্ঠী মিগারের পুত্রের সহিত বিশাখার বিবাহ হয়। শ্রাবস্তী আসিয়া ভগবানের সেবার খুব সুযোগ পাইয়া বিশাখা অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। তাঁহার চেষ্টায় নগ্ন জটিলের ভক্ত মিগার শ্রেষ্ঠী সপরিজন বুদ্ধের উপাসক হইলেন। বিশাখাও এক বড় বিহার প্রস্তুত করাইয়া সশিষ্য ভগবানকে দান করেন। অনাথপিণ্ডকও বিশাখার সেবায় মুগ্ধ হইয়া সুদীর্ঘ কাল শ্রাবস্তীতে অবস্থান করেন এবং তাঁহার অধিকাংশ উপদেশ তথায় প্রদান করিয়াছিলেন।

বিশাখার কনিষ্ঠা ভগিনী সুজাতার সহিত অনাথপিণ্ডকের এক পুত্রের বিবাহ হয়। সুজাতা বড় ঘরের মেয়ে এবং বিশাখার ভগিনী বলিয়া বড় অহঙ্কার করিত। শ্বশুর বাড়ীর কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না। সে স্বামীকে বিন্দুমাত্রও ভক্তি করিত না, শ্বশুর শাশুড়ীকে মান্য করিত না, তাঁহাদের কথা শুনিত না। সকলের অবাধ্য ছিল। দাস দাসীদের উপর অত্যাচার করিত। যাকে তাকে গালাগালি দিত। শ্রেষ্ঠীর পরিবারের সকলেই তাহার জ্বালায় উত্যক্ত হইয়া উঠিল, শান্তিতে বাস করিবার কাহারও সাধ্য ছিল না। বুদ্ধের এত বড় ভক্তের গৃহে সর্ব্বদা উৎপাত ও কোলাহল!

একদা ভগবান অনাথপিণ্ডকের বাড়ীতে আহার করিতে গিয়া তাঁহার জন্য প্রস্তুত আসনে উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় শ্রেষ্ঠীর অন্তঃপুরে ভয়ানক গোলমাল উঠিল। ভগবান উচ্চশব্দ ও মহাশব্দ শুনিতে পাইয়া শ্রেষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে গৃহপতি, তোমার বাড়ীতে এত গোলমাল কেন? যেন কৈবর্ত্তগণ মৎস্য বিক্রয় করিতেছে।" গৃহপতি সুজাতার কথা ভগবানকে নিবেদন করিলেন।

সুজাতা পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া, শ্বশুর ভগবানকে নিজের কথা কিছু বলে কি না শুনিতেছিল। ভগবান টের পাইয়া তাহাকে ডাকিলেন "এস সুজাতে"।

সুজাতা ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিল। ভগবান বলিলেন, পুরুষের সাত প্রকারের ভার্য্যা আছে। যথা বধকাসমা, চোরীসমা,

আর্য্যাসমা, মাতৃসমা, ভগ্নীসমা, সখীসমা, দাসীসমা। তুমি ইহাদের কাহার মত হইতে চাও?

ভগবানের মধুর কথায় সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার অলৌকিক শক্তিতে তাহার দুর্দ্দমনীয় অভিমান দমিয়া গিয়াছিল। সে বলিল প্রভু! আপনার সংক্ষিপ্ত উপদেশ আমার মত দীনহীনার বুদ্ধির অগোচর। বিস্তার করিয়া বলিয়া বাধিতা করুন।

তবে শুন সুজাতে!

১। বধকা স্ত্রী। পদুট্‌ঠচিত্তা অহিতানুকম্পিনী
অঞ্‌ঞেসু রতা অতিসঞ্‌ঞতে পতিং,
ধনেন কীতস্‌স বধায় উস্‌সুকা
যা এবরূপা পুরিসস্‌স ভরিয়া
বধকা চ ভরিয়া চ সা পবুচ্চতি।

যে স্ত্রীর চিত্ত সর্ব্বদা দূষিত, যে স্বামীর অহিত কামনা করিয়া থাকে, অপর পুরুষে আসক্ত, স্বামীকে অবজ্ঞা করে, এবং ধন দ্বারা ক্রীতা হইয়াও যে স্বামীকে বধ করিতে উৎসুকা সেই স্ত্রী "বধকা সমা" ভার্য্যা নামে কথিতা।

২। চোরী স্ত্রী। যং ইত্থিয়া বিন্দতি সামিকো ধনং
সিপ্‌পং বনিজ্জঞ্চ কসিং অধিট্‌ঠহং,
অপ্‌পম্পি তস্‌স অপহাতুমিচ্ছতি;
যা এবরূপা পরিস্‌স ভরিয়া,
চোরী চ ভরিয়াতি চ সা পবুচ্চতি।

শিল্প, বাণিজ্য বা কৃষি দ্বারা স্বামী যে ধন উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া স্ত্রীর হাতে দেয়, স্ত্রী যদি তাহা হইতে বেশী না পারিলে অল্প মাত্রও চুরি করিতে ইচ্ছা করে, এমন কি হাঁড়িতে দেওয়া বা উনুনে চাপান চাউল হইতেও কিঞ্চিৎ চুরি করিতে চেষ্টা করে সে স্ত্রী "চোরী সমা" নামে কথিতা।

৩। আর্য্যা সমা। অকম্মকামা অলসা মহগ্‌ঘসা
ফরুসা চ চণ্ডী চ দুরুত্ত বাদিনী,
উট্‌ঠায়কানং অভিভুয্য বত্ততি
যা এবরূপা পুরিসস্‌স ভরিয়া
অয্যা চ ভরিয়াতি চ সা পবুচ্চতি।

যে স্ত্রী কোন কাজ করিতে ইচ্ছা করে না, অলসা, অতি পেটুকা, সর্ব্বদা কর্কশ স্বভাবা, বিনয়-নম্রতাহীনা, বিবাদকারিণী, ঝগড়াটে ও নানা প্রকার কুকথা বদকথা বলিয়া থাকে; আর যে বীর্য্যবান পরাক্রমশালী স্বামীকেও বশীভূত করিয়া রাখে, যেমন কর্ত্রী চাকরকে অধীন করিয়া রাখে, পুরুষের এইরূপ ভার্য্যাকে "আর্য্যা সমা" স্ত্রী বলে।

৪। মাতৃ সমা। যা সর্ব্বদা হোতি হিতানুকম্পিনী
মাতাব পুত্তং অনুরক্‌খতে পতিং,
ততো ধনং সম্ভতমস্‌স রক্‌খতি।
যা এবরূপা পুরিসস্‌স ভরিয়া
মাতা চ ভরিয়াতি চ সা পবুচ্চতি।

যে স্ত্রী সর্ব্বদা স্বামীর হিতাকাঙ্ক্ষিণী এবং মাতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করে সেরূপ পতিকেও রক্ষা করে; আর পতির উপার্জ্জিত সম্পত্তি রক্ষা করে, কিছুতেই নষ্ট করে না, পুরুষের এইরূপ ভার্য্যাকে "মাতৃসমা স্ত্রী" বলে।

৫। ভগিনীসমা। যথাপি জেট্‌ঠা ভগিনী কনিট্‌ঠা
সগারবা হোতি সকম্হি সামিকে,
হিরীমনা ভত্তু বসানুবত্তিনী
যা এবরূপা পুরিসস্‌স ভরিয়া
ভগিনী চ ভরিয়াতি চ সা পবুচ্চতি।

কনিষ্ঠা ভগিনী জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের প্রতি যে ভাব পোষণ করিয়া থাকে সেইরূপ যে স্ত্রী নিজের স্বামীর প্রতিও সে ভাব পোষণ করে, এবং লজ্জাশীলা ও স্বামীর বশবর্ত্তিনী, পুরুষের সে ভার্য্যাকে "ভগিনী সমা স্ত্রী" বলে।

৬। সখী সমা। যাচীধ দিস্বান পতিং পমোদতি
সখীসখারং ব চিরস্‌সমাগতং
কোলেয্যকা সীলবতী পতিব্বতা
যা এবরূপা পুরিসস্‌স ভরিয়া
সখী চ ভরিয়াতি চ সা পবুচ্চতি।

বহুদিন পরে আগত সখাকে দেখিয়া সখী যেমন প্রমোদিতা হইয়া থাকে সেইরূপ যে স্ত্রী পতিকে

দেখিয়া আনন্দিতা হয়, আর কুলের গৌরব বর্দ্ধন করিয়া থাকে, সুশীলা ও পতিব্রতা, পুরুষের সে ভার্য্যাকে "সখী সমা" স্ত্রী বলে।

দাসী সমা। অক্‌কুদ্ধ সন্তা বধদণ্ডতজ্জিতা
অদুট্‌ঠচিত্তা পতিনো তিতিক্‌খতি,
অক্‌কোধনা ভত্তু বসানুবর্ত্তিনী
যা এবরূপা পুরিসস্‌স ভরিয়া
দাসী চ ভরিয়াতি চ পবুচ্চতি।

দণ্ড লইয়া বধ করিতে উদ্যত হইলেও যে স্ত্রী ক্রুদ্ধা না হইয়া শান্ত ভাবে থাকে, এবং মনে কোন পাপ চিন্তা না আনিয়া শুদ্ধচিত্তে পতিকে ক্ষমা করিয়া থাকে, আর যে স্বভাবতঃ ক্রোধহীনা এবং স্বামীর একান্ত বশবর্ত্তিনী, পুরুষের সে ভার্য্যাকে "দাসী সমা" স্ত্রী বলে।

এই সাত প্রকার স্ত্রীর মধ্যে বধকা, চোরী ও আর্য্যা এই তিন প্রকার স্ত্রী দুশ্চরিত্রা, কর্কশ স্বভাবা ও আদরহীনা। তাহারা নিজের দুঃশীলতা বশতঃ মৃত্যুর পর নিরয় গামিনী হইয়া থাকে।

আর মাতা, ভগিনী, সখী ও দাসীসমা স্ত্রী শীলবতী, পতির প্রতি চিরানুরক্তা ও সুসংযতা। তাহারা সুশীলতাবশতঃ মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করিয়া থাকে।

"হে সুজাতে, তুমি এই সাতপ্রকার স্ত্রীর কোনরূপ?

—হে ভক্তের ভগবান, আজ হইতে আমাকে স্বামীর "দাসী সমা" ভার্য্যা বলিয়া গ্রহণ করুন।

বর্ষ-বরণ

শ্রীমতী নন্দরাণী দাসী।

স্বর্ণ-কুম্ভ ভরিয়া আন গো, আন গো বরণ-ডালা,
সিন্দুর আর চন্দন লেপি' দাও গো পুষ্পমালা,
মঙ্গলঘট রাখ পুর-দ্বারে,
শঙ্খধ্বনি কর ঘরে ঘরে,
সুর-সঙ্গীত গাহ গো সকলে, ফুটিয়া উঠুক হর্ষ,
দিকে দিকে আজি সুষমা ছড়ায়ে এসেছে নবীন বর্ষ।

এস গো নবীন বর্ষ মোদের, এস এস অয়ি শোভনে,
শ্যাম কিসলয়ে, সুরভি কুসুমে সাজাব তোমারে যতনে
দাও গো বিশ্বে নবীন প্রাণ,
আনন্দের ধারা করগো দান,
শান্তির বারি সিঞ্চন করি শোক তাপ কর দূর,
পুষ্পে, শস্যে, ধনে ও ধান্যে কর দেশ ভরপুর।

একখানি পত্র

(গল্প)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

ভাই রেণি

আজ অনেক কাল পরে তোকে পত্রখানা লিখতে বসেছি, সে জন্য যেন মনে কিছু করিসনে।

মনে পড়ে কি—অনেক দিন আগে যখন আমরা স্কুলে পড়তুম তখনকার কথা? আমাদের ক্লাসে অতগুলি যে মেয়ে ছিল, কারও সঙ্গে আমাদের দু'জনের তত মেলামেশা ছিল না, জগতে তুই জানতিস আমাকে, আমি জানতুম তোকে। কে জানত ভাই—আমাদের এমনি ছাড়াছাড়ি হবে যে জীবনে আর তোকে দেখতে পাব না।

বড় কষ্টে অধীর হয়ে তোকে আজ পত্র লিখতে বসেছি। বিয়ে হওয়ার অনেক আগে হতে তোর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি, তারপর আর এমন অবকাশ পাইনি যে তোকে একখানা পত্র দেই। তোর পত্র রীতিমতই এসেছে, এর জন্যে তোকে আমি কোনও মতে দোষ দিতে পারিনে। দোষ যে আমার, সে আমি সহস্রবার স্বীকার করছি।

হৃদয়ে বড় আঘাত পেয়েছি, তাই আজ এই অদিনে তোর কথাই মনে পড়ল ভাই, মনে হল, সেই তুই আমার মুখখানা একটু মলিন হলে তোর ব্যস্ততার সীমা থাকৃত না। সত্যি—আমায় যে কি ভালবাসিস তুই, তা তোর পত্র গুলো এখনও বলছে।

ভাই, মেয়েদের সবারই কি আমার মতন অবস্থা হয়, আমি তাই ভাবি। বেশ মনে পড়ছে আমার ছোটবেলার একটা কথা। আমাদের পাশের বাড়ীতে একটী বউ ছিল; বউটি তেমনি নরম, তার মুখ দিয়ে একটী কথা ফুটত না; আর তার স্বামী আরে ধাস্‌রে, তুইও তো তারে দেখিছিস ভাই। সেই একদিন আমাদের সঙ্গে একটু বাগানে গেছল, তার জন্যে তাকে ধরে কি মারটাই না মারলে, তারপর লোকটা চলে গেলে আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—খুব লেগেছে? উত্তরে সে একটা নিঃশ্বাস ফেলে, একটু হেসে বললে—'না'।

কথাটা যে কি তা এখন নিজেকে দিয়েই জানতে পারছি ভাই। আমি তোকে বলেছিলাম ভাই আমার স্বামী যদি অমনি হয়? তুই বলেছিলি দূর তা কি হতে পারে? কদাচিৎ এক একটা লোক হয় এমনি দুর্দ্দান্ত, যারা মেরে নিজেদের পুরুষত্ব বজায় রাখতে চায়।

তোর কথা কিন্তু একেবারে উল্টো রেণি, আমি দেখছি পনের আনা লোক এমনি করে মেয়েদের বশে রাখতে চায়, এক আনা লোকমাত্র তোর স্বামীর শ্রেণীভুক্ত।

এদের মনের ভাব কি জানিস? আমরা যেন কিছুই না, এসেছি শুধু ওদের কাজ করতে। ওরা আমাদের চোখে হাত দিয়ে যা দেখাবে তাই দেখব, আমাদের হাঁটালে তবে হাঁটব, আমাদের কথা বলালে তবে কথা বলব।

ভাই, বড় উৎপীড়ন আমাদের ঘরে। ঘটনাটা আগাগোড়া বলি শোন, বুঝতে পারবে।

শশুর বাড়ীতে এসে পা দেয়ামাত্র আমার শাশুড়ী আমার ঘোমটা তুলে দেখলেন—বউ ভাল বটে; কিন্তু ঠোঁট দুটো যেন মোটা বড়।

স্বামী একবার আমার পানে চেয়ে চলে গেলেন। তারপর হতে আমি ঘরের বউ নামে

খ্যাঙা হয়ে গেলুম, তা হোক একটু ঠোঁট মোটা, বউ তো বটে!

আমার এক এক দিনের ইতিহাস কেবল বুকের রক্ত দিয়ে লেখা।

দাও দাও করে মেয়ের বাপের কাছে মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর হাত পাতা, এ চিরন্তন প্রথা, আমার বেলাতে কি তা বদলাতে পারে? আমার বাপ আমায় দান করতে নিঃস্ব হয়ে গেছলেন, তবু কথা শুনতে তাঁকে যত না হয়েছিল, আমায় তত হয়েছিল। মড়ার মত পড়ে থাকতুম, যার যত খুসী বাক্যবাণ ছুঁড়ে মারত, আমি তার একটী উত্তর দিতুম না।

উত্তর দেওয়া বঙ্গবধূর স্বভাবের চিরবিরুদ্ধ, কেমন, তাই নয় কি? তারা বুকখানা বাক্যবাণ বিঁধে বিঁধে রক্তাক্ত করে ফেলে, তবু সে যেন একটী কথা না বলতে পায়।

কিন্তু মানুষ তো সেও, সহ্যের সীমা তারও আছে। স্বামী যে দিন হুকুম করলেন পূজোর ভাল তত্ত্ব দেওয়া হয়নি, তোমার বাপের বাড়ী লিখে দাও, শীতে আমার শাল চাই, সেদিন যথার্থই কি রকম হয়ে গেলুম। বাপের বাড়ীর পত্র খানা সেইদিনই পেয়েছিলুম, তাঁদের দুরবস্থার কথা শুনে আমি কিছুতেই চোখের জল রাখতে পারিনি। আমি বললুম তাঁরা তো আমার বিয়ে দিয়েই ফতুর হয়ে গেছেন, শাল দেবেন কোথা হতে; খেতেই পান না যে, সে খোঁজটা রাখো?"

এই সত্যি কথাটাই সে দিন যে আমি বলেছিলুম, এতে আমার স্বামীদেবতা যে কি রকম রুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন তা আর তোমাকে কি বলব ভাই? আমায় সে দিন অনেক লাঞ্ছনা সইতে হল, কারণ আমি উত্তর করেছি। এটাকে তোমরা 'কিছুই নয়' বলে মনে করতে পারো, কিন্তু শ্বশুর বাড়ীর কেউ তো ক্ষমা করতে পারেন না।

বাড়ীর ঝি বললে হ্যাগা বউমা এমন করে উত্তর করতে হয় বাছা, ওতে যে [illegible] বুঝলুম—কথাটা ছড়িয়েও পড়েছে এর মধ্যে, আমার স্বামীদেবতা এ কথাটা সকলের কানে তুলতে ছাড়েন নি।

উঠতে বসতে অপমান; সে যে কি রকম তা বোন তোমায় বলে বুঝাব কি! কিন্তু অভাগিনীর কপালে যে আরও লাঞ্ছনা আছে, শোন, নিশ্চয়ই তোমারও বুকে ব্যথা লাগবে।

আমি এক কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্থা হয়ে পড়লুম, আমার স্বামীর ব্যারাম হতেই তিনি পালিয়েছিলেন কলিকাতায়, আমাকে যা দিয়ে গেলেন তার যে কি ফল হবে তা তিনি একবার ভেবেও দেখলেন না। তিনি পুরুষ—নিজের এই ব্যাধি অনায়াসে তিনি সারিয়ে ফেললেন কারণ তিনি স্বাধীন, যেখানে খুসি সেখানে যেতে পারেন, নিজের রোগের কথা চিকিৎসককে জানাতে পারেন, কিন্তু আমি?

হা রে পরাধীনা নারী-জাতি, আমরা যে শুধু ভার বইতেই এসেছি, আমাদের কোনও কথা জানাবার স্বাধীনতা কোথায়? শরীরে, অসহ্য কোন যন্ত্রণা হলেও তা মুখ ফুটে বলা যায় না। মরণান্ত কাল পর্য্যন্ত এমনি মুখ বুজিয়ে থাকো। সেই একদিন দেখেছিলুম একটা মেয়েকে মরতে—তারই স্বামীদত্ত নিদারুণ যন্ত্রণায় জলে পুড়ে। সে একখানা পত্রে লিখে রেখে গেছল তার স্বামীকে—আমার সেই তার কথাই মনে পড়ছিল।

কি নিদারুণ যন্ত্রণা ব্যাধির, আঃ, সে কথা যে জানানো যায় না ভাই, তার চেয়ে বেশী যন্ত্রণা দিতে লাগল সকলের কথা। আমার স্বামী ফিরে এলেন তখন তিনি ভাল হয়ে গেছেন। দোষটা আমার ঘাড়ে সম্পূর্ণ পড়ল, দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম আমার স্বামীদেবতা—যিনি এই ব্যাধির স্রষ্টা, তিনিও অম্লানমুখে আমায় অপরাধিনী করলেন।

হায় পুরুষ—জানোনা নারীর বুকের ব্যথা, লুকানো কথা। আমি সব দোষ মাথায় পেতে [illegible], আর বেঁচে থেকে কি

লাভ বোন ? আমার সব গেল, আমি যে মনুষ্যত্বের বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

স্ত্রী বলে নয়, দাসী বলে— কারণ সংসারের কাজ কে ঠেলবে তাই তাঁরা দয়া করে আমায় কি ওষুধ দিলেন। যন্ত্রণায় অধীর হয়ে পড়েছিলুম, তাঁদের আদেশমত সে ওষুধ খেলুম। তারপর আমার সে ব্যারাম সেরে গেল, কিন্তু বোন আমার সারা গায়ে কি সব বেরুল। আমার শাশুড়ি গম্ভীর মুখে বললেন "পাপের সাজা হাতে হাতে।"

হায় রে, পাপ করেছি আমিই বটে, কিন্তু দুর্ব্বলা নারী যে আমি,আমি যে স্ত্রী, মুখ—কোথায় আমার, আর মুখ থাকলেই বা আমার কথা শুনবে কে ? ওদের মিলিত কণ্ঠগুলোর কাছে আমার ক্ষীণ কণ্ঠ ?

বিচার বটে, মানুষেরও যেমনি ভগবানেরও কি তেমনি ? আর বিশ্বাস করব কি ভাই, বুক যে ভেঙ্গে গ্যাছে, মন যে আর বিশ্বাস করতে চায় না। এই পূর্ণ যৌবনে—মাত্র আঠার বচ্ছর বয়েস আমার, আমায় জরায় ঘিরে ফেলেছে। আমার হাতে পায়ে, গাঁটে গাঁটে ব্যাথা, আমার বুক ধড় ফড় করে, মাথা ঘোরে, তবু মরেমরেও সংসারের সব কাজ করতে হবে কারণ আমি যে বউ আমার মুখ যে বন্ধ। একদিন সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে যেতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেছলুম, তিন ঘণ্টা নাকি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, মাথা ফেটে গেছল কিন্তু রক্ত যতটা পড়ার কথা ততটা পড়ে নি। রক্ত কোথায় এ দেহে, সব যে সেই কাল—ব্যাধি শুষে খেয়েছে, আমায় মানুষ নামের অযোগ্য করে ফেলেছে।

একদিন আয়না ধরে নিজের মুখখানা দেখে চমকে গেছলুম। এই কি সেই আমি ? বুকের মধ্যে হাহাকার উঠেছিল আমি তো আমি না, আমি মরে গেছি। পূর্ব্বস্মৃতি বুকে জাগিয়ে নিয়ে পড়ে' আমারই ছায়া।

স্বামীদেবতার প্রসন্নতা কিছুতেই লাভ করতে পারলুম না। সারাদিন খেটে খুটে রাত্রে তাঁর পদসেবা, পায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়া, বাতাস করা। ঘুমে চোখ ঢুলে আসত, হাত থেমে যেতো, তিনি গর্জ্জে উঠতেন—ঘুমানো হচ্ছে বুঝি ?

অমার্জ্জনীয় অপরাধ। তিনি আরামে শুয়ে পড়ে থাকবেন, আমি সারারাত বসে থেকে এই জীর্ণ শরীর নিয়েও তাঁর পূজা করি এ ঠিক কথা। বলতে পারো—নারী কি মহাপাপ করেছিল যাতে তাকে এমনি করে পরের মন বুগিয়ে সারাজীবন চলতে হবে ?"

আমার পুত্র হবে—বাড়ীতে আনন্দ পড়ে গেল; শাশুড়ি আমার কাজের মাত্রা একটু কমিয়ে দিলেন, স্বামীদেবতাও সন্তান মুখ দেখতে পাবেন এই আশায় আমাকে দিয়ে সেবা নেওয়াটাও কমালেন।

আনন্দ ? একটুও না, আমার মন আরও নিরাশায় ভেঙ্গে যাচ্ছিল। কোন অভাগা আসছিস রে আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, নারীর চিরাকাঙ্ক্ষিত ফল দান করতে ? আমি কি এত সুখ সইতে পারব ?

তবু সে এল। সেই আঁতুর ঘরেই আমি ছেলের মুখখানা দেখে সব ব্যথা ভুলে গেলুম। কিন্তু একি, বাছার আমার—সারা গায় এ সব কি ?

আমার গায়ে যে সব চাকা চাকা কি বেরিয়েছিল, তারও সারাগায়, চোখে মুখে মাথায় তেমনি। অভাগা তাকাতে পারলে না, কেবল কাঁদতে লাগল।

স্বামী তাড়াতাড়ি ছেলে দেখতে এলেন। তাঁর পায়ের তলায় আছড়ে পড়ে কেঁদে বললুম "ওগো খোকাকে আমার বাঁচাও। ভগবান সাক্ষী, তুমি লজ্জায় মিথ্যা কথা বললেও এ সত্যি যে, তোমার ব্যারামই আমার হয়েছিল। তোমায় এ লজ্জা হতে বাঁচাবার জন্যে আমি মিথ্যা অপবাদ পর্য্যন্ত মাথায় নিয়েছি। দেখ সেই ব্যায়রামের চিহ্ন খোকার সারাগায়ে বর্ত্তমান। যাতনায় বাছা আমার কিছু খেতে পারছে না, চোখ মেলে তাকাতে পাচ্ছে না। কেবল কাঁদছে। নিজের যাতনা সব সহ্য করতে পারি, করেছিও, কিন্তু যে

রত্ন আমায় তুমি দিলে, এর যাতনা সইতে পারছি নে। তোমার পায়ে পড়ি তুমি কাউকে এনে দেখাও।”

অভিজ্ঞা লেডীডাক্তার, কবিরাজ এল, কিন্তু কিছু হল না, বাছা আমার—বোন, বলতেও চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, বাছা আমার বারটা দিন এমনি ভাবে কেঁদে, কিছু না খেয়ে চলে গেল, আমার বুকভরা দুধ, প্রাণভরা স্নেহ কিছু না, কিছু সে নিলেনা।

বোন, এ বুক একেবারে ভেঙ্গে গ্যাছে, আমার সব গ্যাছে। শুনেছি এ ব্যারামের ফল নাকি এমনই, সারাজীবনেও নষ্ট স্বাস্থ্য আর ফিরে পাওয়া যায় না। স্বামীদেবতা যে জেনে শুনে আমার এই সর্ব্বনাশ করলেন, এর জন্যে আমি তাঁকে কতখানি ভক্তি করতে, কতখানি ভালবাসতে পারি 'তা আমায় শুধু বলে দাও। আমায় তিনি পৃথিবীর সব জিনিস হতেই বঞ্চিতা করলেন, আমার আনন্দ, আমার স্বাস্থ্য অবশেষে নারীর পূর্ণ বিকাশ মাতৃত্ব—হা রে অভাগী নারী, তবু মুখ বুজে থাক, একটী কথা যেন ফুটে না বেরোয় তোমার মুখ হতে।

পৃথিবীর সমা সহ্যশীলা হতে পারি এই ব্রতটাই না করেছিলুম, এই প্রার্থনাই না করেছিলুম! খুব সহ্যও তো করছি। নিজের বুকের রক্তমোক্ষণ নিজের হাতেই করছি, একেবারে শেষ করতেই বাকী।

স্বামী দেবতা, হ্যাঁ,দেবতা বই কি! কারণ মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি এমন অত্যাচার করলে নিশ্চয়ই মনের মধ্যে বিদ্রোহ-আগুন ক্রমে জ্বলতে থাকে, তাই গোড়াতেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে স্বামী দেবতা, স্বামীর যাঁরা গুরু তাঁরা দেবের দেব, অতএব কেবল ভক্তি দিয়ে যাও, সুতরাং তাতে চাই কেবল সহ্যশীলতা।

জিজ্ঞাসা করছি ভাই, বলতে পারো আর কোনও দেশে এ রকম নারী-নির্য্যাতন আছে কি? যদি থাকে তবে তা জানিয়ো, জানলে মনকে প্রবোধ দিতে পারব—শুধু এদেশেই এ রকম ভাবে নারী-নির্য্যাতন হয় না, অন্য দেশেও হয়।

এ রকম তো আমাদের দেশে আকছার ঘটছে, আমি তোমায় ঢের দেখাতে পারি। তাইতেই আমি জেনেছি এ রকম ভাবে নারী-নির্য্যাতন আমাদের দেশে একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনেক পুরুষ নারীর দিকে টেনে কথা বলছেন, এঁদের আমার স্বামীদেবতার সমশ্রেণীস্থ লোকেরা একেবারে হেসে উড়িয়ে দিতে চান।

তবু—মনের মধ্যে একটু আনন্দ বোধ করছি এই ভেবে—তুমি আমার মত অদৃষ্ট পাওনি। তুমি যোগ্য স্বামীর স্ত্রী, তোমার ছেলে মেয়ে দুটি তোমাদেরই আদর্শ পাবে, এমনি ধারায় চলতে চলতে পৃথিবীর এই একটানা গতি হঠাৎ একদিন রোধ হতে পারে।

আর না বোন, আজ তবে আসি। জানিনে আর কখনও তোমায় পত্র লেখার অবকাশ পাব কিনা কারণ সময়ে অসময়ে বুকের মধ্যে এত ধড়ফড় করে, চোখে অন্ধকার দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই, রাত্রি দিন কোথা দিয়ে কেটে যায় তা বুঝতে পারি নে।

আমার ভালবাসা নিয়ো। তোমার ছেলে মেয়ে দুটিকে আমার স্নেহ-চুম্বন দিয়ো, আজ তবে বিদায়।

আত্ম-হারা

শ্রীঅতুলচন্দ্র নন্দী।

পথ হারিয়ে ঘুরছি গ্রামের মাঝে,
খুঁজে না পাই কারে।
জঙ্গলে সব পুকুর কোঠা ভিটে
আছে আঁধার ক'রে॥
দেখে ছিলাম ছেলেবেলায় হেথা
হাজার হিন্দুর বাস।
সেই গ্রামেতে চল্‌তে লাগে আজ
দিনের বেলায় ত্রাস॥
খুঁজে পেলাম ছোট্ট একটী বাড়ী
জংলা পথের পাশে।
ভরসা পেয়ে গৃহস্থকে ডাকি
পথ শুধাবার আশে॥
এগিয়ে গিয়ে ডাকি বারেক দুই
বাড়ীতে আছেন কে?
নিঝুম সব, বাড়ী নাই কি কেউ!
উত্তর পাই না যে?
দেখতে পেলাম দুয়ারে ব'সে মাতা
সন্তান ল'য়ে কোলে।
মুখপানে চাহি বক্ষ ভিজিছে তাঁর
অনিমেষ আঁখিজলে॥
প্রতিমার মত উজল মুরতি খানি
প্রতিমার মত স্থিরা।
সংজ্ঞাবিহীনা ঐ মাতৃ কায়া
হ'য়ে আপন হারা॥

কিসের কারণ অশ্রু তাঁহার চোখে
জান্‌তে পারি নাই।
শোকের ব্যথা বাজ্‌ল আমার প্রাণে
কেমন ক'রে যাই॥
পাশেই দেখি কচ্ছে মাটির খেলা
পাঁচ বছরের মেয়ে।
জানতে গেলাম তারি কাছে আমি
ধীরে ব্যাকুল হ'য়ে॥
"কিসের লাগি কাঁদেন ইনি আজ
জান কিছু তার?"
মেয়েটী কহিল "মাসি অমন ধারা
কাঁদেন অনেক বার॥
অমন কান্না দেখে আর এক দিন
কান্না পাচ্ছিল মোর।
জিজ্ঞাসা তাই করেছিলাম তাকে
কি হয়েছে তোর?"
আমার কাছে বলেছিলেন মাসি
"খোকার হাসি দেখে,
আনন্দে আমার গ'লে যায় প্রাণ
তাই জল আসে চোখে॥"
পথের সন্ধান নাহি হ'ল জানা
হরষে এলাম ফিরে।
ঈশ্বরের কাছে করিনু প্রার্থনা
সন্তান জননী তরে॥

নারীজাতির বর্ত্তমান কর্ত্তব্য

শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার।

সম্প্রতি আমাদের দেশে নারী-জাগরণের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ঘরে ঘরে নারীকে জাগাইতে হইবে। আজ তিন বৎসর যাবত এ বিষয়ে শুধু জল্পনা কল্পনাই চলিতেছে কিন্তু মেয়েদের জাগাইবে কাহারা? যাঁহাদের উপর নারী শিক্ষার ভার, দুঃখের বিষয় তাঁহারা জানেন না যে নারীকে কিরূপ শিক্ষা দিলে তাহারা বাস্তবিক শিক্ষিতা হইয়া সমাজে আদর্শ নারী বলিয়া পরিগণিতা হইবে। যে শিক্ষা বর্ত্তমানে আমাদের সামনে ধরা আছে, তাহাতে আমরা কি দেখি? দেখি একদিকে ইংরাজী পড়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ভাব ও বিদেশী চালচলন শিক্ষা, তাহারা না জানে সামাজিকতা না বোঝে স্বাধীনতা, এবং এ সমস্ত বিষয় ভাবিবার শক্তি পর্য্যন্ত তাহাদের নাই। তাই বলি কে কাহাকে শিক্ষা দিবে।

বর্ত্তমানে ইংরাজী পাস করাটাই একটা প্রধান শিক্ষা। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতা নারীদিগের মধ্যে কয়জনকে আমরা আজ এই জাতির জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে পাইয়াছি? কয়জন ইংরাজী শিক্ষিতা নারী আজ খদ্দরে ভূষিতা! যে শিক্ষায় আমাদের জাতীয় উন্নতির পথে পরিচালিত করেনা, যে শিক্ষা স্বাধীনতার বীজ হৃদয়ে বপন করে না, সে শিক্ষার গৌরব করা সমাজের সর্ব্বনাশ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইংরাজী শিক্ষার ফলে আরও উন্নতি হইয়াছে এই যে, ইংরাজ যেমন ভারত বাসীকে "নেটিভ" বলিয়া থাকে, তেমনি আমাদের বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষিতা ভগিনীরা যাহারা ইংরাজী জানেনা তাদের অশিক্ষিতা ভাবেন এবং একটু ঘৃণার চক্ষে দেখেন। এইত ইংরাজী শিক্ষার ফল! আমি বলিনা যে ইংরাজী শিক্ষার দরকার নাই— তবে ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরও এমন শিক্ষা দেওয়া দরকার যাহাতে নারীদিগের জাতীয় জীবনের এবং সামাজিক জীবনের উন্নতি সাধন করে। আমাদের নারীসমাজ কতক হইয়াছে বিদেশী শিক্ষায় বিদেশী ভাবাপন্ন, আর কতক হইয়াছে একেবারে গণ্ডিবদ্ধ পিঞ্জরের পোষা পাখী, তারা না জানে দেশ, ন জানে সমাজ। তাহাদের অভিভাবকেরা এমন শিক্ষাই দিয়াছেন যে তাহারা বাড়ীখানার দেয়ালের গণ্ডির বাইরে আর কিছুই ভাবতে পারেনা। হিন্দুনারীর প্রধান ধর্ম্ম স্বামীর ধর্ম্মকে নিজের ধর্ম্ম মনে করিয়া, স্বামীর জীবনের সঙ্গিনীরূপে তাঁহার জীবনের ব্রতকে নিজের ব্রত বলিয়া, স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইয়া স্বামীর সহায়তা করিয়া নিজের ধর্ম্মজীবন উদ্‌যাপন করা। সেই উদ্দেশ্য লইয়া দেবসেবায় ব্রতী হইয়াছি। এই কার্য্যে আসা অবধি অনেক পুরনারীর সহিত আমার দেখা হইয়াছে ও হইতেছে। তাহাদিগকে পুরুষেরা কি ভাবের যে ভাবুক করিয়া রাখিয়াছেন তাহা তাঁহাদিগের নিকট যাঁহারা যান তাঁহারা ছাড়া আর কেহ বুঝিতে পারেন না। একই কথা তাহাদের মুখে শুনি যে আমরা ইংরাজী জানি না, আমরা দুর্ব্বল, দেশের স্বাধীনতার জন্য কি করিতে পারি? ভেবে দেখুন কি সর্ব্বনাশের কথা! ইংরাজী জানিনা তাই দেশের চিন্তা করিতে পারি না, জাতির উন্নতির কথা ভাবতে পারি না, নিজকে দুর্ব্বল মনে করি।

নারী দুর্ব্বল কিসে? অসুরদলনী শক্তির অংশ যে নারী—তাকে কে বলে দুর্ব্বল? দুঃখের বিষয় শক্তির অংশ নারী তোমরা - নিজের শক্তি ভুলিয়া নিজকে দুর্ব্বল ভাব। নারী, তুমি চক্ষু থাকিতে অন্ধ, অমৃতময়ী হইয়া অমৃতের সন্ধান

পাওনা। ভেবে দেখ একবার শিবাজীর কথা— নিরক্ষর মায়ের এই নিরক্ষর পুত্র শিবাজী দেশের স্বাধীনতা কি ভাবে রক্ষা করিয়াছেন। প্রবীরের মাতা জনা, অভিমন্যু-জননী সুভদ্রা, ভীমার্জ্জুন জননী কুন্তি ইংরাজী পড়েন নাই, কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বদা স্বাধীনতার চিন্তা করিতেন, স্বাধীনতাকে ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিতেন, তাই তাঁহারা উভয় জিনিষকেই সমান ভাবে দেশের নিকট ধরিয়া দিয়া গিয়াছেন। বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিলে নারী দুর্ব্বল, কিন্তু নারীর মনের দৃঢ়তার নিকট মানুষ ও দেবতা উভয়েই পরাজিত। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ভোলা মহেশ্বর মা আদ্যশক্তির নিকট পরাজিত।

তাই বলি নারী তোমরা দুর্ব্বল নও। তোমরা নারীত্ব ভুলিয়া গিয়াছ, মাতৃত্ব ভুলিয়া গিয়াছ তাই তোমরা মনের বল, ধৃতি-শক্তি একেবারে হারাইতে বসিয়াছ। আবার মাতৃত্ব ও প্রকৃত নারীত্ব লইয়া দাঁড়াও দেখিবে তোমরা দুর্ব্বল রমণী নও। তোমরা যদি মা সাজিতে পার তবে দেখিবে— তোমাদের পুত্রেরা মায়ের শক্তি পাইয়া শিবাজী প্রবীর প্রভৃতি দেশ সেবকের মত হাসিতে হাসিতে দেশের গৌরব-ধ্বজা উড়াইয়া যাইবে। নারীজাতি যতদিন বিলাসের পাত্রী হইয়া থাকিবে ততদিন এই ভারতবাসীর মঙ্গল কিছুতেই হইবে না। যতদিন প্রতি ঘরে জনার মত মা, প্রবীরের মত পুত্র, শিবাজীর মত পুত্র না হইবে ততদিন এ দেশের স্বাধীনতা আসিবে না। তবে যদি কেউ নারীজাগরণ করিতে চান তবে প্রতি ঘরে ঘরে নারী-সমাজের সাম্‌নে, আদর্শ নারী-চিত্র ধরিতে আরম্ভ করুন তাহাদিগকে—বুঝিতে দেন যে তাহাদের ভিতর দিয়া জাতির উন্নতি এবং তাহাদের ভিতর দিয়াই আজ জাতির অবনতি। এ জিনিষ যতদিন না তাহারা বুঝিবে ততদিন কিছুই হইবে না। কেবল নারী-জাগরণ চীৎকারই সার হইবে। আমার মনে হয় নারীর স্বাধীনতা যথেষ্ঠ আছে, কিন্তু উপলব্ধি করিবার শক্তি নাই। সেইটুকুই তাহাদের সাম্‌নে ধরিতে হইবে। আমি বলি—নারী দুর্ব্বল নও, কেবল মনের দৃঢ়তাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেই দেখিবে তোমরা কি শক্তিকে তুচ্ছ করিয়া রাখিয়াছ। মনের বলের কাছে পশুশক্তি অবনত হইবে। ভেবে দেখ সীতা মনের বলের প্রভাবে দুষ্ট রাক্ষসের পুরী হতে নিজের পবিত্রতা লইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন। এই রকম ভাবে নারী তোমার নিজের স্থান অধিকার করিতে শিখ। একমাত্র শিক্ষা এই মাতৃত্ব বাঁচাইয়া তোলা, তবেই এই নারী-শক্তির দ্বারা অসাধ্য সাধন হইবে।

আশে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।

তোমার সঙ্গে মিলব আমি ভাবছি বসে তাই,
পরাণ পথের দিগন্তরেও তোমার দেখা নাই।
নিঝুম রাতের স্বপ্ন জালে
মৌন সাঁঝে, ভোর সকালে
তোমার আশায় বসে বসে দিন যে কেটে যায়,
পরাণ-পথের দিগন্তরেও তোমার দেখা নাই॥

ভেবেছিলুম আসবে তুমি ফাগুন-সাঁঝেতে,
রাঙিয়ে দেহ অশোক ফুলে বসবে পাশেতে
পিক পাপিয়ার কূজন গানে—
জেনেছিলুম আপন মনে
বীণা খানি হাতে ক'রে গাইবে করুণ মূর্চ্ছনা
ফাগুন আজি শেষ হল, কই তোমার দেখা পেলাম না।

ব্যথিতা

(গল্প)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

সে এক লতা-কুঞ্জের মাঝে তার সঙ্গে দেখা,—সাঁঝের গোলাপী কিরণ তার মুখের উপরে পড়ায় তার লাল মুখখানি আরও লাল দেখাচ্ছিল। সে একদৃষ্টে চেয়েছিল অস্তগমনোন্মুখ ম্লান সূর্য্যের দিকে, কি একটা অব্যক্ত বেদনায় অভিভূত হয়ে। মাথায় শুকনো চুলগুলো দুল্‌ছিল কানের ফুলকে চুম্বন ক'রে। হাতে ছিল তার বকুল ফুলের মালা। উন্মাদ হাওয়া যতই তার স্খলিত অঞ্চলকে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল নিজের অভিলষিত পথে, ততই সে তাকে চেপে চেপে ধরছিল।

পাখীর গানে, ফুলের গন্ধে, তরুলতার মাঝখানে একটা জাগরণের সাড়া এসে পৌঁছে গেছে,—নিশার আগমনে। এগুতেও পাচ্ছি না। পেছুতেও পাচ্ছি না, সম্মুখে সুষমাধার দেবী-প্রতিমা অচঞ্চলা। মনে হচ্ছিল নন্দনের সদ্য ফোটা পারিজাত—স্বর্গলোকের কোন দেবীর হাত থেকে পড়ে গেছে, মর্ত্তের এই বনপথে!

সে-ও অপলক চোখে চেয়েছিল কি একটা ক্লান্ত-করুণ ভাব নিয়ে আজন্মের পরিচিতের মত। বোধ হচ্ছিল সে যেন আমার কত জন্মের সাথী;—কোন দুর্নিবার ঘটনাঘাতে, তাকে হারিয়ে তারই ধ্যানে, তাকেই পাবার আশায় দিন কাটিয়ে আজকে দেখতে পেয়েছি; এ যে কামনার কাম্য, অর্চ্চনার অর্চ্চিতা! চোখের পলক ফেল্‌তে পাচ্ছি না, যত দেখ্‌ছি দেখবার আকাঙ্ক্ষা ততই যেন বেড়ে উঠছে, কি একটা অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ছি! দূরে মাধবী দুলছে—হাওয়ার ঘাতপ্রতিঘাতে, অতি কাছে মন পুলক-দোলায় দুলছে—আশার নিপীড়নে।

সব জিনিসের দুটো দিক,—ভেতর আর বার। বাইরের দিক দিয়ে তাকে এই তৃষিত বক্ষের উপরে রাখতে পাচ্ছিলাম না বটে, কিন্তু অন্তরের মাঝে ধরেছিলাম, তাহলেও সম্পূর্ণতার অভাব; দু-ই যে চাই!

প্রাণের তারে তারে ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে কানেড়ার মিলন-রাগিণী বেজে যাচ্ছিল। আমি ব'ল্লাম,—ওগো এস, আমি কৃতার্থ হব তোমায় বক্ষে ধারণ ক'রে, আমি ধন্য হব তোমার বন্ধুত্বের মহত্ত্বে। ওগো আমার বরেণ্যা, তোমাকে আদরে বরণ ক'রে নিতে চাই! তুমি যে আমার জীবন-মরণের প্রিয়-সঙ্গিনী!

উপরে নীল আকাশের গায়ে একটি একটি তারা ফুটছে, নিচে সুশ্যামল তৃণ-আস্তরণে জোনাকি আলো বিলুচ্ছে, আর তার কপালের ক্ষুদ্র টিপটিতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল একটু অস্ফুট আলোর ক্ষীণ রেখা,—কি সুন্দর!

কি এক উন্মাদনায় ভরপুর করুণ স্বরে সে ব'ল্লে,—ওগো আমায় ছুঁও না, চরিত্রহীনার মেয়ে আমি, সমাজের ঘৃণ্যা যে! আজ তুমি যেমন আদর ক'রে আমায় ডেকেছ, এমন ক'রে এর আগে ত কেউ ডাকে নি! ইচ্ছা ক'চ্ছে তোমার ঐ দুটি পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে আমার ব্যথিত চিত্তকে একটু শীতল ক'রে নেই। মনে হ'চ্ছে জন্মে জন্মে তুমি আমারই ছিলে, তোমার দাসীর অধিকার আমাকেই দিয়েছিলে, এজন্মেও আবার দিতে এসেছ; ওগো আজ আমি ধন্যা হয়ে গেছি তোমার স্নেহ-সম্ভাষণে। আমায় গ্রহণ ক'র্ত্তে চেওনা প্রভু, তাহলে তোমার

সুখের সংসারে আগুন লেগে যাবে, সমাজ তোমায় পায়ে দ'লবে ; আমি তা দেখতে পার্ব্ব না। আমি তোমাকেই বুকে রেখে নিজকে বিসর্জ্জন ক'র্ব্ব ঐ নদীর বুকে! সাথীহারা আজ সাথী পেয়েছে, ভয় কি তার মরণের পথে যাত্রী হ'তে!

তার সকল বাধা ঠেলে, তাকে বুকে ক'রে নিয়ে এলাম ; সমাজ আমায় ত্যাগ কর্ব্বে করুক ; আমি চাইনা তাদের অমন স্বার্থপরতার পক্ষপাতী হ'তে, আমি চাইনা তাদের অমন এক চোখো বিচারের কঠিন দণ্ড মাথায় পেতে নিতে!

ভগবান সাক্ষী ক'রে সে আমার গলায় বরমাল্য দিলে, সমাজচ্যুত হ'য়ে বাধ্য হ'লাম দেশ ছাড়তে। তাকে নিয়ে অনেক জায়গা ঘুরে, শেষে বাস ক'ল্লাম এই যমুনা-কিনারে কুটীর বেঁধে।

ফুট্‌ফুটে চাঁদের আলোয় বসন্তের পাগল হাওয়া যখন দিগ্‌দিগন্তে এলোমেলো ছুটোছুট ক'রে বেড়াত, বনফুলের গন্ধে চারদিক যখন ভ'রপুর হ'য়ে উঠ্‌ত তখন ঐ কাশ-শুভ্র নদী-সৈকতে ব'সে সে আর আমি কত গানই গাইতাম। সে স্বর ঐ কলতানের সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে কোন অজানা দেশে ভেসে চ'লে যেত, কে জানে সে কোন পারে পৌঁছে কার প্রাণে আঘাত কর্ত্ত! আমরা কত রকম গল্প ক'র্ত্তাম, সে বুঝি ঢেউগুলো শুন্‌তো,—তাতেই আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে প'র্ত্ত তার রক্ত-রাঙ্গা পায়ের পরে!

সে কেবলই ব'লত,—কেন তুমি আমায় গ্রহণ ক'ল্লে প্রভু! তোমার মান, সম্ভ্রম, সমাজ, সংসার কেন আমার জন্যে ত্যাগ ক'ল্লে, আমি তোমায় পেয়েও যে সুখী হতে পাচ্ছি নে ওগো এইটেই যে আমার সব চেয়ে বড় দুঃখু! যা কখন স্বপ্নেও আশা কর্ত্তে পারিনি, তা আমি পেয়েছি, কত বড় ভাগ্যবতী আমি, কিন্তু আমার জন্যে যে তোমার সব গেল, এ দুঃখু যে অসহ্য! এযে মৃত্যু-যন্ত্রণা! আমায় বিদায় দাও, মরণের মাঝে জীবন খুঁজে নিইগে! তুমি আবার তোমার তাদের কাছে ফিরে যাও—যারা চোখের জলে দিনরাত অভিসম্পাত ক'চ্ছে, তুমি আবার তাদের মুখে জল কর'গে, যাদের মুখে কলঙ্কের রেখাপাত হয়েছে। এ জীবনে আমার কপালে সুখ নেই, তাই পলে পলে জ্বলে-পুড়ে মর্চ্ছি। তুমি মনের কোণে একটু স্থান দিয়ে রেখ', আবার আমি আসব, আবার তুমি আস্‌বে, তোমায় আমায় আবার মিলব প্রভু!

একদিন সকালে কেবল গাছে পাতায় আলো দেখা দিয়েছে, আমার বাল্যবন্ধু জ্যোতি এসে উপস্থিত। সে বল্লে,—হাঁরে তুই এখানে লুকিয়ে আছিস! তোর বাড়ীতে যে চোখের জলের ঢেউ চলেছে, বাপ মা কেঁদে কেঁদে পাগল হবার মতন হয়েছেন। তুই একবার বাড়ী চল, এখানে আমি রাম ডাক্তারের বাড়ীতে আছি, বৈকালে আমার সঙ্গে অবশ্য একবার দেখা করিস।

জ্যোতি চলে যাওয়ার পর সে ব'ল্লে,—তুমি একবার যাও, তোমার বাপ মা পাগল হ'য়ে যাবেন তোমারি জন্যে কেঁদে কেঁদে আর তুমি তাঁদের কাছে একবার ফিরে যাবে না! এমন ক'রে তাঁদের কষ্ট দিও না, ছি! আমার ভয় হ'চ্ছে তোমার ভালবাসার উপরে, যে ভালবাসা কর্ত্তব্য ভুলিয়ে দেয়,সে ভালবাসা কি একটা ভালবাসা, না মোহ! সে দুদিনের! আমাকে ভালবাস যদি আমার কথা রাখ, একবার দেখা দিয়ে এসগে। জ্যোতির সঙ্গে যাওয়াই স্থির কর, আমার জন্যে ভাবতে হবে না, দু একটী দিন আমি একা খুব থাকতে পার্ব্ব।

সেদিন আকাশে একটু একটু মেঘ করেছিল, রোদ্দুরটা কেমন ঘোলাটে, ঔজ্জ্বল্যহীন। জ্যোতির সন্ধানে বেরুব, এমন সময় সে আমার পা জড়িয়ে কাঁদতে লাগল। আমি ব'ল্লাম,—আজ এমন ক'রে কাঁদছ কেন লীলা? সে ব'ল্লে,—আমার প্রাণটা আজ কেমন ক'চ্ছে তাই তোমার পায়ে একটু কেঁদে নিচ্ছি।

আমি কি জানতাম সে আমায় চিরদিনের কাঙাল ক'রে যাবে বলে, এত কাঁদছে! আমায়

জীবন্মৃত ক'রে যাবে বলে, চোখের জলে বিদায় নিচ্ছে। না—তা জান্‌তে পাল্লে কি তাকে ছেড়ে এক পাও বেরুতাম! যাক, চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে প'লাম গ্রামের পথে।

জ্যোতির সঙ্গে দেখা হ'ল, আমাকে অনেক বোঝালে, ব'ল্লে—একবার আমার সঙ্গে বাড়ী চল্, তারপর আবার আসিস্। আরও অনেক কথা, অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের কথা সবই হল, শেষে লীলার কথায় উপসংহার। তারপর বাড়ী ফিরলাম তখন সন্ধ্যা হবার বেশী দেরী ছিল না। এসে দেখি ঘরে লীলা নেই—সব শূন্য! কত তাকে ডাকলাম, কেউ সাড়া দিলে না, এদিকে-ওদিকে কত খুঁজলাম কোথাও তাকে পেলাম না। প্রাণের মধ্যে কেমন যেন একটা অব্যক্ত বেদনার আগুন জ্বলে গেল। লীলা কোথায় কে জানে!

বিছানায় বস্‌তে গিয়ে দেখি, তা-রি লেখা একখানা চিঠি, সে আমারি নামে। বিস্ময় হ'ল,—প'ড়ে দেখলাম সর্ব্বনাশ! আমি ত স্বপ্নেও ভাবিনি যে সে এমন ক'রে চলে যাবে! লিখে রেখে গেছে—"স্বামী! আজ তোমার কাছে চির বিদায় নিচ্ছি আমার জন্যে তোমার উচ্চশির নত হয়েছে, সমাজে সংসারে তুমি আজ ঘৃণিত। আমি এ দুঃখ রাখবার ঠাঁই পেলাম না, তাই যমুনার জলে আশ্রয় ভিক্ষা ক'র্ত্তে চলেছি। আমায় খুঁজনা; তুমি যখন আমার চিঠি পাবে, তখন হয়ত আমি কোন অজানা দেশে পৌঁছে যাব। বাড়ী ফিরে আত্মীয়স্বজনকে সুখী কোরো, দিনান্তে হত-ভাগিনীকে একবার মনে কোরো। এজন্মে তোমায় পেয়ে কাছে থাক্‌তে পাল্লাম না, এবার এসে বুকে বুকে থাকব প্রভু! আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর।" চিঠি প'ড়ে ক্ষণবিলম্ব না ক'রে ছুটলাম নদীর ধারে—যদি দেখতে পাই—কোথায় সে!

নদী কলগান গেয়ে ছুটে চলেছে। স্রোত পূর্ব্বগামী, ছুটলাম স্রোতের সঙ্গে। কতদূর যাচ্ছি কোন জ্ঞান নেই, তারপর দেখলাম তাকে বুকে ক'রে নিয়ে ছুটে চলেছে ঐ হতভাগিনী নদী—অবাধ গতিতে! অদূরে একখানা নৌকা বাঁধা ছিল, মাঝিকে আমার বিপদ জানিয়ে নৌকা খুলে দিলাম। তখন পশ্চিম প্রান্তে সূর্য্য ডুবে যাচ্ছিল, তার মুখের পরে ক্লান্ত কিরণ এসে পড়েছিল। তাকে প্রথম দেখেছিলাম এমনি এক প্রকৃতির ফাগোৎসব-ক্ষণে আর শেষ বিদায়েও তেমনি ভাবে দেখলাম! সে যেন ঘুমিয়ে গিয়েছে, তার মাঝে স্বপ্ন দেখ্‌ছে, সে স্বপ্নে সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব চলেছে,—চোখে জল, ঠোঁটে হাসি।

কাছে যেতে কি জানি কেন, কোন অতল জলে সে তলিয়ে গেল, আর তাকে খুঁজে পেলাম না। কত চেষ্টা ক'ল্লাম কোন সন্ধানই হ'ল না। ভাবলাম আমিও নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সব জ্বালা নিভিয়ে ফেলি না কেন! তাই বা পাল্লাম কৈ, মাঝিরা আমায় ধরে নিয়ে পৌঁছে দিলে তীরস্থ এক সন্ন্যাসীর কাছে। সন্ন্যাসী ব'ল্লে,—ম'রবে কেন বাবা, তাকে খোঁজ, কাঁদ, তার জন্যে অপেক্ষা কর, আবার সে আসবে তোমায় দেখা দিতে। আরও কত কি ব'ল্লে। একেবারে ম'র্ত্তে পাল্লাম না, কিন্তু পলে পলে ম'র্‌ছি যে!

সাঁঝের বেলায় শ্রান্ত রবির ক্লান্ত কিরণ যখন ঐ নদীর বুকে ছড়িয়ে প'ড়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে খেলিয়ে বেড়ায়, তখন বোধ হয় যেন তার সোণার মত হাত দুখানা ঢেউয়ের পাশ দিয়ে সাঁতার কেটে ছুটে চলেছে। তাকে কত চীৎকার ক'রে ডাকি, প্রতিধ্বনি তার জবাব দেয় লীলা—লীলা! কৈ সে-ত' আর সাড়া দেয় না! আবার ভাবি হয়ত কোন ফাঁকে লুকিয়ে সে ঘরে গিয়ে বসে আছে। বাড়ী ফিরে লীলা লীলা বলে ডাকি, নীরবতাই ভেঙ্গে যায়, তার ত আর দেখা পাই নে। এ জীবনে কি পাবার নয়! ঐ নদীর জলে চাঁদ যখন নেচে নেচে হাসতে থাকে, মনে হয় সে যেন, মুখ ডুবিয়ে আমার পানে চেয়ে হেসে অধীর হ'চ্ছে,—তখনি ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজি, বিফলতাই

লাভ হয় যে। ম'র্ত্তে পারিনা সে আস্‌বে ব'লে!

এ স্থান আমার বড় প্রিয়, তাতেই ত' কোথাও যেতে পারি না। মনে হয় একদিন সে আস্‌বে, এসে এখানেই যে খুঁজ্‌বে, একদিন এই ব্যথিত বক্ষের মাঝে এসে আমার সকল বেদনা নিভিয়ে দিয়ে কত হাসিই হাস্‌বে, যেমন সে আগেও হাস্‌ত; আমার চোখের ধারা মুছিয়ে দিয়ে ব'ল্‌বে,—"ছি তুমি এত অধীর, একটু তুমি হাস, কতদিন তোমার হাসি দেখিনি যে!" তাকে আসতেই হবে,—সে এসে এই বিরহ-মলিন হতভাগাকে ধৌত ক'রে নেবে—তার ভালবাসার অজস্র ধারে!

বর্ষ-প্রবেশ

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী।

চৈত্র গেল চিত্রার সকাশ,
বিশাখায় বৈশাখ প্রকাশ,
পাপিয়ার কল তান, কোকিলের কুহু গান
হৃদে বাজে বন্দনা সঙ্গীত
আগমনী বিসর্জ্জন গীত।
মুকুলের সুধাগন্ধে, প্রকৃতি হরিত ছন্দে
রচে প্রেম পল্লব লিখন,
তরু গাত্রে অপূর্ব্ব মিলন।
দখিন মলয় বায়, কিশলয় পত্রিকায়
বৃক্ষ শাখে ধ্বজা উড়াইয়া
বরষেরে পথ চিনাইয়া
আনে ধরণীর মাঝে, বিচিত্র বরণ সাজে।
পুরাতনে নবীন যৌবন,
হরিহর রূপে সম্মিলন,
স্থাবর জঙ্গম অঙ্গে, শ্যামল লোহিত রঙ্গে,
আঁকে নববরষের ছবি
রূপান্তরে দৃশ্যপট সবি।
কাল বৈশাখের বেশে মহারুদ্র অট্ট হেসে
প্রলয়ের বিশান বাজায়
চরাচর আতঙ্কে কাঁপায়,
ধ্বংসপুরে সব যেন, পলকে দেখায় হেন,
বৈশাখের বৈশাখী সন্ধ্যায়
বর্ত্তমান অতীতে মিশায়;
নাহি ধ্বংস, নাহি ক্ষয়, পুরাতন পরিচয়,
যায় আনে এই শুধু নব,
যাদু মন্ত্রে অন্ধ মোরা সব।
যারে হেরি ক্ষণ তরে তারেই আপন করে,
রাখিবারে চাহি হিয়াতলে
আলিঙ্গনে চিরন্তন বলে,
ঘুচে না হৃদয় ভ্রান্তি, মিটেনা দেহের শ্রান্তি,
চির আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই
আশা সাধ পূরাতে না পাই;
পিপাসিত রহে হিয়া, বাঞ্ছিতে বিদায় দিয়া,
নয়ন নিমিষে যায় সরি
স্মৃতি-ছায়া রহে চিত্ত ভরি,
বর্ষান্তে বরষ যায়, আবার নূতন পায়
সেই একে শ্যামা বসুন্ধরা,
অভিনব বেশে চিত্র করা,
নবরূপে আসে পুরাতন, বর্ত্তমানে করিতে বরণ।

মাজের সেবা করিতে ইচ্ছা থাকিতে পারেন। এতদ্ব্যাগর খরচ সংসদ বহন না থাকায় বৃথা

সংবাদ

চরকার সূতা—

বরিশাল জেলার বানরীপাড়া নিবাসী শ্রীমতী স্নেহলতা গুহ রায় ১৯২২ সালের সমগ্র ভারতের খদ্দর প্রদর্শনীতে স্বহস্তে কাটা চরকার সূতা প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে তিনি ৮০ হইতে ১২০ নম্বরের চরকার সূতার জন্য প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গমহিলার এ কৃতিত্বে বাঙ্গলার মুখ উজ্জল হইয়াছে। আমরা এ আদর্শ বাঙ্গলার অন্যান্য মেয়েদের গ্রহণ করিতে বলি।

মহিলা ব্যারিষ্টার—

কুমারী মিঠন টাটা বিলাতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারদের তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। ইনিই ভারতের সর্ব্বপ্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার।

মাতৃত্ব শিক্ষা—

আমেরিকার মেয়েদের আজকাল বিদ্যালয়ে মাতৃত্ব শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কেমন করিয়া উপযুক্ত মা হইতে পারা যায়, কেমন করিয়া শিশু পালন করিতে হয়, সন্তানদের কেমন করিয়া শিক্ষা দিতে হয়, গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম কেমন করিয়া চালাইতে হয়, এই সমস্ত তাহাদের শিখান হইতেছে। রোগী-পরিচর্য্যা কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহাও তাহাদিগকে শিখান হইতেছে। এই সব মায়ের সন্তান যে সাধারণতঃ দুর্ব্বল হইবেনা, ইহা বলাই বাহুল্য। আমাদের দেশের মেয়েরা নিজেরা মানুষ হইবার আগেই সন্তানের মা হইয়া বসেন। এই সব মায়ের সন্তান যে অকালেই কাল-কবলে পতিত হইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক

ছাত্রীর কৃতিত্ব—

শ্রীমতী অরুন্ধতী সেন বেথুন স্কুলে প্রত্যেকের বিভাগে সঙ্গীত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্যার অশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমতী অরুন্ধতী বরিশাল নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সেন মহাশয়ের কন্যা। বাঙ্গালী মেয়ের এ কৃতিত্বে আমরা প্রীত হইলাম।

বিদ্যালয়ে চরকা প্রচলন—

বিহার ও উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভায় উক্ত প্রদেশের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক ছাত্র ও ছাত্রীদের সূতা-কাটা শিক্ষা দেবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আমরা অন্যান্য প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকে সভায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করিতে অনুরোধ করি।

নারীহরণের মামলা—

রংপুরের শ্রীমতী বরদাসুন্দরী নাম্নী জনৈকা মহিলাকে অপহরণ করার অপরাধে নয় জন আসামীর কারাদণ্ড হইয়াছে। তিন জনের সাত বৎসর হিসাবে এবং ছয় জনের ছয় বৎসর হিসাবে কঠোর কারাদণ্ড হইয়াছে। আজকাল চারিদিক হইতে নারী অপহরণের সংবাদ আসিতেছে। এই সমস্ত অপহরণকারী দুর্ব্বৃত্তগণের বিশেষ শাস্তি হওয়া দরকার। দেশের মা বোনদের জন্য আমরা সরকার ও দেশ-নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা—

কুমারমঙ্গলম নিবাসী শ্রীমতী রাধাভাই জমিন্দারণী মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মান্দ্রাজ নারীসমাজের পক্ষে ইহা বিশেষ গৌরবের কথা।

লাভ হয় যে। ম'র্ত্তে পাতি—
ব'লে!

এ স্থান আমার বড় প্রি
যেতে পারি না।
এসে এখানেই দোহ
বক্ষের মাঝে ন।

টি শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর উক্ত সমিতি আজ কয়েক মনেহইয়াছে। হিন্দু বালবিধবাদের দিতে ইঁহারা দেশকে প্রবুদ্ধ। ইঁহারা যে ভাবে কার্য্য আরম্ভ ‌াছেন, তাহা বেশ আশাপ্রদ। তবে দেখিতে হইবে ইহার মধ্যে কোন উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি না হইয়া, সম্পূর্ণ হিন্দুভাবে এই কার্য্য পরিচালিত হয়।

রাজপরিবারে শিক্ষার প্রসার—

আগরতলার মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্রের পৌত্রী কুমারী পুলিনা এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্বে রাজপরিবারের আর কোন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেন নাই। আমরা আশা করি ইনি সসম্মানে উত্তীর্ণা হইয়া পরিবারের মুখোজ্জ্বল করিবেন।

খনির তত্ত্বাবধানে মহিলা—

ইংলণ্ডের মনতানা নামক স্থানে মিস্ জনসন্ নাম্নী একটি শ্বেতাঙ্গমহিলার কয়েকটি হীরা ও সোনার খনি আছে। তাঁহার বাসস্থান হইতে খনিগুলি প্রায় দুই মাইল দূরে। মিস্ জনসন্ অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া, নিজে রন্ধনাদি করিয়া খাইয়া, পায়ে হাঁটিয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী সেই খনিতে যান এবং শ্রমিকদের সহিত নিজে কাজ করেন। তাঁহার ব্যবসায়-বুদ্ধি এত প্রখর যে বহুস্থান হইতে বহু লোক তাঁহার নিকট ব্যবসায় কার্য্যে পরামর্শ গ্রহণ করিতে আইসে। মহিলার এ কৃতিত্ব বাস্তবিকই গৌরবের কথা।

শিশুদের পুরস্কার—

কলিকাতার শিশু-প্রদর্শনীক্ষেত্রে ১ম পুরস্কার পাইয়াছে একটি মাড়োয়ারী শিশু, ২য় পুরস্কার পাইয়াছে একটি ইউরোপীয়ান শিশু, ৩য় পুরস্কার পাইয়াছে একটি বাঙ্গালী শিশু। বাংলার শিশুদের অবস্থা কেমন ইহাতেই বোঝা যায়।

মহিলা কর্ম্মী সংসদ—

আমরা ৭৮ নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ মহিলা কর্ম্মী সংসদের ১৯২২ সালের ১লা নবেম্বর হইতে ১৯২৩ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সময়ের আয় ব্যয়ের হিসাব পাইয়াছি। এই সংসদটি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদারের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। এই আয় ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় যে ১৯২২ সালের ১লা নবেম্বর পর্য্যন্ত এই সংসদের তহবিলে ৪০৭০৷৷০ আট আনা জমা হইয়াছিল এবং ১৯২৩ জুন মাসের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ব্যয়ও হইয়াছে ঐ পরিমাণ টাকা। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অডিটার শ্রীসুরেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এই আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়াছেন। সংসদের পরিচালিকা কার্য্যবিবরণীতে সংসদের যে উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম:—

মহিলাদের মধ্যে কংগ্রেস কার্য্যের প্রচার, তাঁহাদের মধ্যে সুশৃঙ্খলভাবে শিক্ষাপ্রচার ও তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করা মহিলা-কর্ম্মীসংসদের কার্য্য। স্ত্রী ও পুরুষ লইয়া সংসার। স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের সহায়তাতেই সংসারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া প্রকৃতির বিধান; কিন্তু বর্ত্তমানে স্ত্রীজাতি পুরুষের সহায়তা করা দূরে থাকুক, পুরুষের গলগ্রহরূপে পরিণত হইয়াছে। একদিন ছিল, যখন এই মাতৃজাতি সংসারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। লক্ষ্মী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা অর্থাৎ ধনভাণ্ডারের কর্ত্রী, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী ও অন্নদাত্রী—এঁরা নারীজাতিই, পুরুষ নহে। শিক্ষার দ্বারা সমাজ গঠন, ধনের সংগ্রহ ও রক্ষাদ্বারা সমাজের স্থিতি এবং অন্নসংস্থান দ্বারা সমাজের জীবন রক্ষা—মাতৃজাতির দ্বারাই নিষ্পন্ন হইত। সেই মাতৃজাতি নিজ নিজ আদর্শ ও কর্ম্ম হারাইয়া আজ সমাজের গলগ্রহ হইয়াছে। ইহার প্রতিকারকল্পে সংসদের প্রতিষ্ঠা। সংসদের কর্ম্মী-গণ মহিলাদিগকে কর্ম্মে ব্রতী করিয়া যাহাতে তাঁহারা

পুনরায় সংসারে স্বীয় আসন গ্রহণ করিতে পারেন সেরূপ বন্দোবস্ত করিবেন। সংসদের দুইটি বিভাগ —প্রচার ও গঠন। প্রচারের দ্বারা মহিলাগণকে বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে তাহার প্রতিকার বিষয়ে উদ্যোগী করাইবার চেষ্টা করা। তৎপরে মহিলাগণ মধ্যে যাঁহাদের কর্ম্মে ইচ্ছা হয়, তাঁহাদের কর্ম্মের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া গঠন বিভাগের কার্য্য। রাষ্ট্রীয় সভা (কংগ্রেস) প্রথমতঃ প্রচারকার্য্য নারী-কর্ম্মমন্দিরের যোগে করিয়া আসিতেছিলেন। তৎপরে ১৯২১ ইং এপ্রিল মাস হইতে এই মহিলা-কর্ম্মীসংসদ সমস্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। গত সময়ের প্রচার কার্য্য দ্বারা দেশে মহিলাগণের মনে কর্ম্মের বেশ আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে! অতএব বর্ত্তমানে গঠন বিভাগের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে। এযাবৎ গঠন বিভাগে কেবল চরকার প্রচলন হইয়া আসিয়াছিল, এখন আরও নানাপ্রকার গৃহশিল্পের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—১। চরকার দ্বারা সূতা কাটা। ২। তাঁতে বস্ত্র প্রস্তুত করা। ৩। সেলাই—কলে ও হাতে। ৪। কাটা কাপড়ের কাজ। ৫। সূতা দ্বারা কাপড়ের পাড় তোলা, কাপড়ের পাড় ছাপান প্রভৃতি আরও নানারূপ শিল্পের প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। আপাততঃ এই কয়টি বিভাগ থাকিবে। প্রচার বিভাগের কর্ম্মীদিগকেও ভালরূপ শিক্ষা দেওয়ার জন্য বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। সেজন্য সংসদের একটি ভাল লাইব্রেরী থাকিবে। এ বিষয়ে সংসদ এযাবৎ জনসাধারণের যথেষ্ট সহানুভূতি পাইয়াছে। ইতিমধ্যে অনেক সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী ও অনেক গ্রন্থকার বিনামূল্যে পত্রিকা ও পুস্তকাদি দিতেছেন।

সংসদের পক্ষ হইতে কর্ম্মীর জন্য আহ্বান করায় নানাস্থান হইতে কর্ম্মীগণ আসিয়া যোগদান করিতেছেন। কর্ম্মীগণ-মধ্যে যাঁর অবস্থা ভাল, নিজ খরচে থাকিয়া দেশের ও সমাজের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিজ খরচে থাকিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত কর্ম্মীগণের সর্ব্বপ্রকার খরচ সংসদ বহন করিয়া থাকেন।

সময়ের সদ্ব্যবহারের বন্দোবস্ত না থাকায় বৃথা সময় নষ্ট হেতুই আমাদের দরিদ্রতা, এবং প্রত্যেকের সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারাই এই দরিদ্রতার প্রতীকার হইতে পারে। উল্লিখিতরূপ কর্ম্মদ্বারা অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে শিখিলে নারীজাতি সমাজের গলগ্রহ না হইয়া সমাজের সহায় হইতে পরিবে।

আমরা এই সংসদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি জানাইতেছি।

পাবনা হিমাইতপুর সৎসঙ্গ বালিকা বিদ্যালয়—

গত ইং ১৯২০ সালে পাবনা জেলার হিমাইতপুরে উক্ত বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় 'সৎসঙ্গের' প্রতিষ্ঠাতা এবং একজন ব্রহ্মচারিণী ভদ্রবিধবা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে ১২ জন ছাত্রী লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়, এক্ষণে ছাত্রী সংখ্যা ৮০। এই বিদ্যালয়ে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে বালিকাগণকে বিনা বেতনে লেখাপড়া ও গৃহশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্ত্তমান ছাত্রীগণের মধ্যে ৫ জন কুম্ভকার, ২ জন নমঃশূদ্র, ১ জন চর্ম্মকার, ৯ জন মুসলমান, ১৮ জন শ্রমিক, ১৩ জন ব্রাহ্মণ, ৮ জন কায়স্থ, ২২ জন বৈশ্য। ছাত্রীগণকে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূতা কাটা, সীবনবিদ্যা, রন্ধনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়টি স্থানীয় সৎসঙ্গ ভবনে আছে। অর্থাভাব বশতঃ নিজের গৃহ নির্ম্মাণ করা অথবা বিস্তৃত স্থান পাওয়া যাইতেছে না। দেশের সৎকর্ম্মে দানশীল ব্যক্তিগণকে এই সদনুষ্ঠানটিকে সহায়তা করিতে অনুরোধ করি। আমরা মাতৃ জাতির কল্যাণ-কামী এই প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘজীবন কামনা করি।

রন্ধন বিদ্যা

"মুড়ো ঘণ্ট"

শ্রীমতী পুষ্পকুন্তলা রায়।

(চট্টলবাসিনী)

উপাদান :—চিড়ে বা আতপ চাউল, রুই মাছের মুড়ো, ঘি, তেল, হলুদ, জিরে, ধনে, লবণ, লঙ্কা, তেজপাতা, গরম মসলা।

মাছের মুড়োটীকে হলুদ লবণ মাখাইয়া খুব পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লইতে হইবে। কানের অংশের ফুলগুলি পরিষ্কার করিবার সময় ফেলিয়া দিতে হইবে। চিড়ে (বা আতপ চাউল) গুলিকে ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া আলাদা পাত্রে রাখিয়া দিয়া বাটনার কাজগুলি সারিয়া লইতে হইবে। তবে গরম মসলাগুলি পরে বাটিয়া দিলে ভাল হয়।

পাকপ্রণালী :- প্রথমতঃ কড়াতে তেল চাপাইয়া মাছের মুড়োটীতে লবণ হলুদ মাখাইয়া ভালরূপ ভাজিয়া লইতে হইবে। ভাজা হইয়া গেলে একটী পাত্রে রাখিয়া দিয়া কড়াতে সামান্ত ঘি চাপাইয়া চিড়েগুলি এমন একটু ভাজিয়া লইতে হইবে, যাহাতে ফুটিয়া না যায় অথচ সিদ্ধ করিলে গলিয়াও না যায়। (চিড়েগুলি যেরূপ ভাজা হইল এরূপ চাউলের করিতে হইলে আতপ চাউলগুলিকে এ ওজনে ভাজিয়া লইতে হইবে) ভাজা হইয়া গেলে আলাদা পাত্রে রাখিয়া দিয়া কড়াতে তেল চাপাইয়া দুইটী শুকনা লঙ্কা ও তেজপাতা দিয়া পরে জিরে, ধনে বাটা ও হলুদকে তেলের উপর ছাড়িয়া দিয়া ভাজিয়া মাছের মুড়োটীকে তার মধ্যে দিয়া ভাজিয়া দিয়া আরও একটু ভাজিয়া লইয়া সামান্ত একটু জল দিয়া নাড়িতে হইবে। যখন দেখিবে জল শুকাইয়া উঠিতেছে তখন চিড়ে ভাজা (বা চাউল ভাজা) গুলি ছাড়িয়া দিয়া নামাইবার পূর্ব্বে শুকো শুকো অবস্থায় থাকে সিদ্ধও ভালরূপে হয় এই ওজনে জল দিয়া জল যখন ফুটিয়া উঠিবে তখন মাপ মত লবণ দিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। এইটী লক্ষ্য থাকে যেন হাতে ছেকা না লাগে এ ভাবে খুন্তীর সাহায্যে নাড়িতে হইবে। যখন দেখিবে জল শুকাইয়া গিয়াছে, নামাইবার পূর্ব্বাবস্থায় জল মাখা মাখা অবস্থা আছে তখন গরম মসলা গুলি রাখিয়া ঘি এর সঙ্গে মিশাইয়া ঘণ্টের মধ্যে দিয়া নামাইয়া ভালরূপ ঢাকনার সাহায্যে বন্ধ করিয়া দিলে "মুড়োঘণ্ট" তৈয়ার হইল !

শক্তি ও ভাগ্য

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ।

শক্তি কহে—অয়ি ভাগ্য, চপলা কমলা
কেন হেন বিপরীত গতি,
নয়নে নাহিক দৃষ্টি তবুও চঞ্চলা
স্থির নাহি রহ এক রতি !
দীন মর্ত্তবাসী করে প্রসাদ কামনা
আঁখি জলে, নাহি চাহ ফিরে,
হেম তুলিকার রাগে মোহিয়া কামনা,
হাসি ফের, স্বপনের তীরে !
ভাগ্য কয়—মিথ্যা দোষ, জাড্যের কারায়,
অলসের কল্পনার জালে,
ভীরু নারে উর্ণা ডোরে বাঁধিতে আমায়
শক্তিমান বাঁধে ভুজবলে !

বৎসরের নূতন দিনে

[রচনা—শ্রীমতী বেলা গুহ]

বৎসরের এই নূতন দিনে
    গানটী তোর আজ ধর্‌-না রে ;
নূতন আলোয় প্রাণখানি তোর
    ভর্‌-না রে আজ ভর্‌-না রে !
পুরাণো যা রইল পাছে,
হৃদয়-পাতে আঁকাই আছে—
অতীতকে তুই নূতন মাঝে
    সফল আজি কর্‌-না রে !
বৎসরের এই নূতন দিনে
    গানটী তোর আজ ধর্‌-না রে !!
নূতনকে আজ কর্‌-না বরণ,
নূতন পথে চলুক চরণ—
নূতন আলোয় চোখ মেলে তুই
    নূতনকে আজ বর্‌-না রে !

বৎসরের এই নূতন দিনে
    গানটী তোর আজ ধর্‌-না রে !!
প্রাণ-সাগরে চল্‌ছে সবাই
    নূতন পথের যাত্রী রে,—
অতীত যে ভাই সকল জ্ঞানের,
    সকল সুখের ধাত্রী রে !
    খেল্‌ছে হাওয়া উঠ্‌ছে যে ঢেউ,
    লুকিয়ে আজি থাকিস্‌-নে কেউ ;
অনন্ত এই প্রাণ-সাগরে
    ঝাঁপ্‌ দিয়ে আজ পড়্‌-না রে !
নূতন মাঝে প্রাণ লয়ে তুই
    গানটী তোর আজ ধর্‌-না রে !!

—oo—

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

স্থায়ী।   যোগীয়া—ঢিমে-তেতালা।

```
   ০                  ১                    ২´                     ৩
II { সা -ঋা -সা ঋা | মা -া গমা মা I পা দা -পদা -ণা | দা -পা -দা মা |
     ব  ০  ৎ  স      রে  র্ এ০ ই    নূ  ত  ০০  ন্      দি  ০  ০  নে

   ০                  ১                    ২´                     ৩
| মা -র্সা -নর্সা ঋা | র্সা -নর্সা দা -ণদা I পা -মপা গা -মা | গমা -পদা -পমা -গঋসা |
  গা  ০   ০ন্   টী    তো  ০র্  আ  ০জ্     ধ  ০র্  না  ০     রে০  ০০  ০০  ০০০
```

০ ১ ২´ ৩

| সা -ঋা ঋ -া | গমা গা -ঋা -সা I ন্‌া -ঋা -সা সন্‌া | দ্‌া ন্‌া -সা -া |

ন্‌ ০ ত ন্‌ আ০ লো ০ য়, প্রা ০ ণ্‌ খা০ নি ত্যো ০ র্‌

০ ১ ২´ ৩

| ঋা -সঋা মগা পা | পা -মা -দা -া I পমা -গমা গমা -পা | গা -মা -গা -ঋসা } II

ভ ০র্‌ না০ রে আ ০ ০ জ্‌ ভ০ ০র্‌ না০ ০ রে ০ ০ ০০

১ম অন্তরা।

০ ১ ২´ ৩

II { মা -গা মা পা | দা না -ঋা´ সা´ I সা´ না -সা´ ঋা´ | সা´ -না -সা´ -া

পু ০ রা গো যা র ০ ই ল পা ০ ০ ছে ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩

| দপা মা -পা -দা | না -সা´ ঋা´ -সা´ I না দা ণা -দা | দা -মা পা -দমা

হৃ দ ০ য় পা ০ তে ০ আঁ কা ই ০ আ ০ ছে ০০

০ ১ ২´ ৩

| সা´ -না সা´ -ঋমা´ | গা´ -মা´ গমা´ -গঋা´ I সা´ না -ঋা´ -সা´ | না -দা সা´ -া |

অ ০ তী ০ত্‌ কে ০ তু০ ০ই নূ ত ০ ন্‌ মা ০ ঝে ০

০ ১ ২´ ৩

| মা পা -দা -ণা | দা -মা পা -া I মা -গমা মপদা -নসা´না | দা -পা -মগা -ঋসা } |

স ফ ০ ল্‌ আ ০ জি ০ ক ০র্‌ না০০ ০০০ রে ০ ০০ ০০

"বৎসরের এই.........ধর্‌-না রে"—দু'টী পংক্তির স্বরলিপি পূর্ব্ববৎ II

২য় অন্তরা।

০ ১ ২´ ৩

II { সা´ না -দা -া | পা মা -দা -পা I না -ঋা´ -া সা´ | না -সা´ সা´ -া |

নূ ত ০ ন্‌ কে আ ০ জ্‌ ক ০ র্‌ না ব ০ র ণ্‌

০ ১ ২´ ৩

| দা মা -গা -মা | ঋা´ -না -সা´ সা´ I দা -পা দা -পধা | পা মা -গা -মা |

নূ ত ন্‌ ০ প ০ ০ থে চ ০ লু ০ক্‌ চ র ০ ণ্‌

০ ১ ২´ ৩
| র্সা -ঋা মর্গা -মা | র্গা -ঋা নর্সা -ঋা I র্সা -না -র্সা দা | পা -া গমা -পপা |
নূ ০ ত ০ ন্ আ ০ লো০ য় চো ০ খ্ মে লে ০ ভু০ ০ ই

০ ১ ২´ ৩
| পা ণা -দা -পা | মা পা -মা -া I ঋা -গমা র্সনা দপমা | পদা -পমা -গা -ঋসা } |
নূ ত ০ ন্ কে আ ০ ড্ ব ০র্ না০ ০০০ রে০ ০০ ০ ০০

"বৎসরের এই.........ধর-না রে"—পর্য্যন্ত দু'টী পংক্তির স্বরলিপি পূর্ব্ববৎ II

সঞ্চারী ।

০ ১ ২´ ৩
II { মা -গমা ণা -দা | পা গা -মা ঋা I -া গমা -গমা পা | দা -া মা -পা |
প্রা ০ণ্ সা ০ গ রে ০ চ ল্ ছে০ ০০ স বা ০ ই ০

০ ১ ২´ ৩
| গা -মা মা -পা | মা -পা ঋা -গমা I পা -মা গা -ঋা | গা -ঋা -সা -া |
নূ ০ ত ন্ প ০ থে০ ০র্ যা ০ ত্রী ০ রে ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| গা -ঋা সা -ন্সা | দ্া ম্া -ণ্দ্া -প্া I দ্া ম্া -প্া -দ্প্া | দ্া ন্া -সঋা -সা |
অ ০ তী ০ত্ যে ভা ০০ ই স ক ০ ০ল্ জ্ঞা নে ০০ র্

০ ১ ২´ ৩
| ঋা ঋা -মা -া | পা দা -র্সা -নর্সা I দা -ণা দপা -মা | ঋা -গা মা -পা } |
স ক ০ ল্ সু খে ০ ০র্ ধা ০ ত্রী০ ০ রে ০ ০ ০

আভোগ ।

০ ১ ২´ ৩
| { সা -ঋসা ঋা -মা | মা -গা গঋা মা I পা -দা ণা -দা | পা -গা মা মা |
খে ০ল্ ছে ০ হা ০ ও০ য়া উ ঠ্ ছে ০ যে ০ ঢে উ

০ ১ ২´ ৩
| দা ঋা র্সা -নর্সা | না -দা পা -া I মা -দা দা -মা | দা -না নর্সা র্সা |
লু কি য়ে ০০ আ ০ জি ০ থা ০ কি স্ নে ০ কে০ উ

০ ১ ২´ ৩
| র্সা র্ঋা -র্সঋা র্ঋা | র্মা -র্পা র্মা -র্গা I র্ঋা -র্গঋা নর্সা -ঋর্গা | র্মা -র্গা -র্ঋা র্সা |
অ ন ০ ন্ ত এ ০ ই ০ প্রা ০ণ্ সা০ ০০ গ ০ ০ রে

০ ১ ২´ ৩
| মা -পা র্ঋা -না | র্সা না -র্সা -না I দা -পণা দপা -মা | গা -ঋা -সা -া } |
ঝাঁ প্ দি ০ য়ে আ ০ জ্ প ০ড়্ না০ ০ রে ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| ঋা মা -পা -া | দা -না না -র্সা I র্ঋা -নর্সা নর্ঋা র্সনা | দা -ণা -দা পা |
নৃ ত ০ ন্ মা ০ ঝে ০ প্রা ০ণ্ দ০ য়ে০ তু ০ ০ ই

০ ১ ২´ ৩
| মা -র্সা -নর্সা র্ঋা | র্সা -নর্সা মদা -ণদা I পা -মপা গমা -পদা | পমা -গা -ঋা -সা II II
গা ০ ০ন্ টী তো ০র্ আ০ ০জ্ ধ ০র্ না০ ০০ রে০ ০ ০ ০

গান

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

ওরে আয় তোরা আয়,—
মায়ের চরণে
অর্ঘ্য দেবার
শুভ খ'ণ ব'য়ে যায়।
সুরভি কুসুমে অঞ্জলি ভ'রে
কে পূজিবি তোরা আয় আয় ওরে,
চিত্ত ভরিয়া ভকতি বিত্ত
কে দিবি মাতার পায়!

তরুণ উষার অরুণ-কিরণ
জাগায়ে দিয়াছে সবে,
এখনো কে বল পূজা হোম ছাড়ি
নিদ্রা মগন রবে;
আজিকে নবীন প্রভাতী লগনে
মঙ্গলশাঁখ বাজিছে সঘনে,
মন্দির দ্বার মুক্ত হয়েছে
ভক্ত যে গান গায়

—



"বীর নারী চাহে বীর"



মাতৃমন্দির



২য় বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৩১ | ২য় সংখ্যা

সঙ্কল্প

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।

"অতুলনা ভারত ললনা," আজি তারি স্মৃতি সুখে,
স্বপন-বিহ্বল হৃদি চলিবেনা চাহিয়া পশ্চাতে,
আজিকে নূতন বল বাঁধিতে হইবে প্রতি বুকে,
যেতে হবে আগুসরি অজানায় অচেনা প্রভাতে।

হয়ত পাবেনা আলো, বিষম বাজিবে পায়ে পায়ে
পথের তীখণ কাঁটা, সুকঠিন নিঠুর কাঁকর,
প্রতিদিন বেদনার পরিচয়, নব নব ঘায়ে,
ম্লান হ'য়ে যাবে চোখে আনন্দের রবিশশী-কর!

তবুও চলিতে হবে, লক্ষ্য যেন ব্যর্থ নাহি হয়,
জীবন ভরিয়া ওঠে দুঃখব্রত করি উদযাপন
যে সুখের স্বাদ শুধু পেয়ে গেছে মহৎ হৃদয়,
ওগো ভারতের নারী, তারি লাগি প্রাণ ক'রে পণ!

নারীর শিক্ষা

শ্রীমতী মহামায়া দেবী।

নারীর শিক্ষা বলতে খুব বেশী লেখা পড়া শিখে একজন খুব বড় সাহিত্যিকা গড়ে ওঠাকে বা অসাধারণ পাণ্ডিত্যজ্ঞান অথবা আধুনিকের ফ্যাসানানুযায়ী বক্তৃতায় পারদর্শিণী হওয়াকে বুঝি না। যদিও আজকাল সেটি অনেকেরই বাঞ্ছনীয় এমন কি আইনজ্ঞ হয়ে আদালতে লড়তেও অনেকে প্রস্তুত হতে চাইছেন বা হচ্ছেন। কিন্তু অন্যান্য দেশের মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমান ওজনে যতই কেন চলতে যাক না, আমাদের এই ভারতের মেয়েদের জীবনের সার্থকতা সেদিক দিয়ে আদৌ নাই। পরানুকরণে চলতে চেষ্টা করা ধৃষ্টতা, তার ফলে পতন অবশ্যম্ভাবী।

আজ নারীর শিক্ষা বিশেষ করেই যে প্রয়োজন হয়েছে তাতে কোনও ভুল নাই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত নারী যে ভাবে শিক্ষা পেয়ে এসেছে সে শিক্ষার আর মোটেই প্রয়োজন নাই। নারী লেখা পড়া শিখেছেন অনেক—যার ফলে গদ্য পদ্য নাটক নভেল লেখবার কল্পনায় তাঁদের মাথা ভরে গেছে, অত্যধিক সভ্যতা ও কায়দাকানুন অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে ভারতের আদর্শকে ঢেকে ফেলেছে, কিন্তু আর নয়, আজ এসব অভিনয়ের পর্দ্দা এইখানেই পড়ুক। এখন কবি, গ্রন্থকার বা বক্তার বিশেষ আর প্রয়োজন নাই; এখন চাই একনিষ্ঠ শিক্ষয়িত্রী। কিন্তু খুব বড় একটা মেয়েস্কুল খুলে কিছু লেখা পড়া মাত্র শিখিয়ে ছেড়ে দেওয়ার মত এমন শিক্ষয়িত্রী যে আর চাইনা একথা পূর্ব্বেই বলেছি। এতদিন নারী যা শিখেছে, বলেছে ও করেছে তা কেবল প্রাণের উত্তেজনার বশে, তা থেকে নারীর মস্তিষ্ক সামান্য খুলতে পারে কিন্তু নারীর স্বরূপ জাগেনি, ভারতের নারীরূপে তাদের নারীত্বের বিকাশ হয়নি।

নারীর সাহিত্যে যে আদৌ দরকার নাই, লেখা পড়া যে তাদের শিখতে হবেনা একথা আমি বলছি না। লেখা পড়া চাই, লেখা পড়াকে প্রথম অবলম্বন করেই নারী-শিক্ষা প্রবর্ত্তন করতে হবে। কিন্তু এইখানেই শিক্ষা পর্য্যবসিত হবে না বা এই লেখা পড়াই কেবল একমাত্র হবে না, এই কথাই বলছি।

নারীকে সংযমী হতে হবে এবং এই সংযম শিক্ষা নারীকে গোড়া থেকে দিতে হবে। এই সংযমের অভাবেই নারীর অধঃপতন আজ এত স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে।

সংযম শিক্ষা করতে হলে নারীকে প্রথম ব্রহ্ম-চর্য্যাবলম্বন করতে হবে এবং তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী চাই। এই সমস্ত নারীর অধঃপতন রোধ করে দাঁড়াবার জন্য কয়েকজন ত্যাগী সন্ন্যাসিনী নারীর প্রয়োজন। সংযমী না হলে সংযম শিক্ষা দেবে কে? কিন্তু বিশ্বশুদ্ধ নারীকে সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসিনী করবে বলে, যে এমন শিক্ষয়িত্রী চাই তা নয়; চাই নারীকে সংযম শিক্ষা দেবে বলে, তাদের চরিত্র গড়ে তুলবে বলে। কিন্তু সংযম শিক্ষা করতে হবে বলে যে নারী কর্ম্মে বিমুখ হয়ে বসে থাকবে তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মপদ্ধতিও আয়ত্ত করতে হবে, নারীর অর্থকরী বিদ্যাও চাই। কখনও যদি পুরুষের সাহায্য হতে নারীকে বঞ্চিত হতে হয় তখন যেন নারী ধূলোয় লুটিয়ে না পড়ে, সে দিক দিয়েও গোড়া থেকে গড়ে ওঠা দরকার।

আজ আমাদের দেশে বোধ হয় তিনভাগ নারী নিষ্কর্ম্মা হয়ে, পরের গলগ্রহস্বরূপ অতি দীন ও হীন ভাবে কাল কাটাচ্ছে। এমন কোনও কাজ তারা জানেনা যার দ্বারা মাত্র নিজেকেও স্বাধীনভাবে

চালিয়ে নেয়। অন্যের মন জুগিয়ে, অন্যের মুখ চেয়ে, ভিক্ষা করে নিজেকে হেলায় অন্যের পায়ে লুটিয়ে দেয়। সন্তানাদি নিয়ে যে অন্যকে ভারগ্রস্ত করে তার যে কি শোচনীয় অবস্থা তা চোখে না দেখলে বলে বোঝাবার নয়। অর্থের জন্য নারীকে এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত আর যাতে না হতে হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত।

ব্রহ্মচর্য্যাব্রত পালনে নারী-মনের যা কিছু নীচতা, হীনতা, দীনতা সমস্তকে ধুয়ে মুছে তাকে বিমল পরিশুদ্ধ করে তুলে অসীম শক্তিশালিনী ও সব বিষয়ে পারদর্শিনী করে তুলবে এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই আমার অনুভূতি।

নারীর চরিত্র যদি গড়ে উঠে তবে তাদের বিবেক জাগবে, বিবেক জাগলে তারা স্বার্থে অন্ধ হবে না, পরার্থে জীবন দিতে অগ্রসর হবে, তাদের মনে আপনা হতেই সাম্যভাব আসবে। নারীর যা স্নেহ-কোমল হৃদয় আছে তার উপর আর বেশী দরকার হবে না। সেই হৃদয়ের উপর চরিত্র গড়লে মণিকাঞ্চনের যোগ হবে। তখন তাকে আর বলে দিতে হবে না যে, সেবা শুশ্রূষা, ছেলে লালনপালন, দয়াধর্ম্ম, গৃহস্থালীর যা কিছু নিয়ম গঠন ও পরিচালনার ভার তোমার। নারীর স্বভাবানুযায়ী এ সমস্ত ভার তাদের হাত হতে স্খলিত হবার সম্ভাবনা আদৌ নাই, তেমনি হাতে তুলে দেবারও দরকার হবে না।

এখন কথা হচ্ছে, নারী-শিক্ষা প্রবর্ত্তন করতে হ'লে বালিকাবস্থা থেকেই করা উচিত। প্রথম জীবন এক সংস্কারে কাটিয়ে নূতন সংস্কারে উঠে দাঁড়ান বড় শক্ত, সে সামর্থ্য অনেকেরই নাই। বিশেষ নিম্নাভিমুখী গতিকে ঊর্দ্ধমুখে তুলে ধরা কঠিন ব্যাপার। তাই বাল্যাবস্থাতেই সমস্ত রকম শিক্ষার প্রশস্ত সময়।

প্রথম কিছু লেখা পড়া শিক্ষা দিতে হবে যাতে পুস্তকাদি পড়ে ভাব গ্রহণে সক্ষম হ'তে পারে, সঙ্গে সঙ্গে গীতা, উপনিষধ, রামায়ণ মহাভারত আদি পুরাণেতিহাস স্তব স্তোত্রও পড়াতে হবে—ধর্ম্মভাব এবং আত্মচিন্তা জাগাবার জন্য, ভূগোল, সাহিত্য ভারতীয় ইতিহাসাদিও কিছু কিছু পড়ান চাই —নিজের দেশকে নিজের জাতকে জানবার জন্য, বোঝবার জন্য, কিন্তু এরও সঙ্গে থাকবে নানাবিধ শিল্প—নারীকে স্বাবলম্বিনী হবার জন্য। এ সমস্তকে কেন্দ্র করে ধরবে নারীর সংযম সাধনা। কিন্তু জোরজুলুমে কাকেও কোন শিক্ষায় ব্রতী করান আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। তাদের স্বাধীনভাবে হাসতে খেলতে দিয়ে, সেই হাসি খেলার ভিতর দিয়ে তাদের শিক্ষার পথে আকর্ষণ করা দরকার। কঠিন পীড়নে তাদের আনন্দের উৎস যেন শুকিয়ে না যায়।

মনে রাখতে হবে নারীকে পূর্ণনারী, সত্যকার নারী অর্থাৎ মানবী করে তুলতে হলে দশ বা বার বছর মাত্র সময় দিলে চলবে না। এর জন্য কিছু সময় চাই। নিজের অবস্থাকে বুঝতে হলে অন্তত কুড়ি বছরও সময় দরকার হয়। তারপর তারা ইষ্টানিষ্ট বিচার করে নিজের অভিষ্ট পথ ঠিক করে নিতে পারে। খোলা কথা,—মেয়েদের বিবাহ কিছুদিন বন্ধ রাখতে হবে।

আমাদের দেশের আধুনিক মেয়েস্কুলগুলি উঠে গিয়ে তার পরিবর্ত্তে যদি এক একটি নারী-সাধনাশ্রম গড়ে ওঠে তবেই ভবিষ্যতে নারীর গৌরব জগতে আবার দেখবার আশা করা যেতে পারে। কিন্তু সে আশা দুরাশা বলেই মনে হয়, কারণ এভাবে নারী-শিক্ষা প্রবর্ত্তনকারিণী নারী আমাদের দেশে কই? নারীর শিক্ষা দেবে নারী, নচেৎ নারীর শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হওয়া সম্ভব নয়। এখানে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয় না, সামান্য কিছু অর্থ সাহায্যেই হতে পারে। প্রয়োজন—এক একস্থানে একপ্রাণ একআদর্শের দু তিনজন ত্যাগী সন্ন্যাসিনী শিক্ষয়িত্রী। অর্থ সাহায্য এর তুলনায় ঢের সহজ, এমনি শিক্ষয়িত্রীরই আজ একান্ত অভাব।

প্রার্থনা

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

বাসনার তৃপ্তি হোক—এ কথা বলিনা আমি,
চাহিনাক পূরাতে কামনা,
আমি চাই যুগে যুগে তোমারে ডাকিতে স্বামী,
প্রাণ ঢেলে করিতে সাধনা।
চির প্রবাহিত রবে আমার অন্তর মাঝে
ভালবাসা - স্বরগের নদী,
নিভৃত মরম তলে শুধু এই সাধ আছে,
স্নেহভরে পূর্ণ কর যদি!

সহস্র বাসনা আশা হৃদয়ের স্তরে স্তরে
জেগে উঠে প্রতি পলে পলে,
সীমা হারা অভিলাষ শতযুগ-যুগান্তরে,
প্রাণে শুধু মহাতৃষ্ণা ঢালে;
সকলি পূরিয়া যাক্—কভু আমি এ মিনতি
করিবনা চরণে তোমার,
যাচি শুধু করযোড়ে ওগো জগতের পতি,—
মতি থাক তোমাতে আমার।

পরাজিত

(গল্প)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

(১)

"বাবা, আমি ঠিক ও বাড়ীর ওদের মত একটা বেড়াল নেব, হঁ্যা, তোমায় আজই এনে দিতেই হবে।"

আদরিণী কন্যা মেনা আসিয়া পিতার হাতখানা জড়াইয়া ধরিল। হরি ঘোষ চোখ হইতে সন্তর্পণে ভাঙ্গা চশমা জোড়া খুলিয়া, খাপে বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন "কোথায় কাদের বেড়াল দেখলি মা?"

বালিকা রোদনবিজড়িত কণ্ঠে বলিল "ওই যে ওদের।"

কথাটা ঠিক বুঝিয়াও পিতা অজ্ঞের মতই বলিলেন "কাদের, কারা বিড়াল পুষেছে?"

এবার মেনা স্পষ্টই কাঁদিয়া উঠিল—"ওই যে পাশের বাড়ীর বাবুরা বেড়াল এনেছে, ওদের সেই আমার মত মেয়ে আছে না একজন, সে-ই বেড়ালকে কোলে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমায় অমনি একটা কাবুলে বেড়াল তোমায় দিতেই হবে, নইলে কক্ষনো হবে না। লটির বাপ লটিকে কিনে এনে দেছে, আমাকেও তোমার এনে দিতে হবে।"

হরি ঘোষ এক মুহূর্ত্ত নীরব রহিলেন, তাহার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "ওরা যে বড়লোক মা, ওদের কত টাকা আছে, আমাদের কি আছে মা? দিন গেলে আমরা কি খাব, কোথায় পাব তারই ঠিক নেই যে। কাবুলে বেড়াল, বিলাতি

কুকুর এ সব পোষে মা বড়লোকে, গরীব লোকে কিনতে পারে, না পুষতে পারে?”

মেনার বেদনাভরা চোখ দিয়া বেদনাগুলা গলিয়া অশ্রুধারারূপে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে অশ্রুজল পিতার হৃদয় স্পর্শ করিল, তিনি ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন আচ্ছা, চেষ্টা দেখি যদি কিনে দিতে পারি।”

মেনার চোখের জল তথাপি বন্ধ হইল না।

হার মানিয়া পিতা বলিলেন “আচ্ছা মা, যেমন করেই পারি তোকে একটা বেড়াল এনে দেবই। আজ পারব না, এই সপ্তাহের মধ্যে দিলেই তো হলো?”

মেনা উৎসাহে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল “সত্যি দেবে বাবা?”

অনির্দ্দিষ্টের পানে দৃষ্টি রাখিয়া পিতা বলিলেন সত্যি দেব মা।”

কিন্তু এই সত্য পালন যে কোথা দিয়া কেমন করিয়া হইবে তাহার ঠিক নাই।

বড় আদরের কন্যা মেনা, তাহার বুকে ব্যথা দিতেও পিতার বুকে ব্যথা বাজিয়া উঠে, আহা, তাহার যে তিনি ছাড়া আর কেহ নাই। ছেলে-পুলেরা তাড়না পাইয়া মায়ের কাছে মনের ব্যথা জানায়, এ হতভাগিনীর যে জননী নাই। সে যখন তিন বৎসরের মাত্র, তখন তাহার জননী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আজ যদিও সে মায়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছে, তথাপি—পৃথিবী যখন মা ছাড়া নয়, তখন সেও জানিতেছে তাহার মা কেহ ছিলেন। পাছে সেই মায়ের কথা মনে করিয়া তাহার বুকে বেদনা বাজে, তাহার চোখে জল আসে, এই ভয়ে হরি ঘোষ সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতেন।

এই খোলার ঘরখানি তাঁহার নিজের, এই খানিতে তিনি বাস করিতেন, আর পাঁচ ছয়খানি ঘর ইহাতে সংলগ্ন, সেগুলি ভাড়া খাটিত। তাঁহার জীবিকা কায়ক্লেশে ইহাতেই নির্ব্বাহ হইত।

ছোট মেয়ে মেনা পিতার অবস্থা বুঝিত না, সময়ে অসময়ে আবদারে তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিত। যতদূর ক্ষমতা ছিল পিতার, তিনি তার আবদার পূরাতে চেষ্টা করিতেন। এমনি করিয়া এই সাতটা বছর কাটিয়া গিয়াছে।

এই খোলার ঘরখানির ঠিক পাশেই ছিল রায় বাহাদুর প্যারী গুপ্তের প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা। তিনি আগে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, এখন অবকাশ লইয়াছেন। তাঁহার তিনটী উপযুক্ত ছেলে, একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন বড় ডাক্তার, অপর জন পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। লটি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অতীন্দ্র গুপ্তের একমাত্র আদরিণী কন্যা।

এ মেয়েটীর খেয়ালের অন্ত ছিল না, কিন্তু বড়লোকের মেয়ের খেয়াল পূর্ণ হইতে দেরী হইত না। সে মুখের একটী কথা খসাইতে না খসাইতে তাহা সমাধা হইয়া যাইত; তাহার ঘোড়া, বাইক, গাড়ী, কুকুর, ভালুকছানা, পাখী কিছুরই অভাব ছিল না। বাড়ীর তেতালার ছাদে ময়ূরের জায়গা, পায়রার খোপ, বিলাতী ইঁদুর, খরগোস সব ছিল। বাড়ীতে হরিণ প্রভৃতিরও অভাব ছিল না।

মেনা আশ্চর্য্য হইয়া শুধু চাহিয়া দেখিত। হায়, সে যদি লটি হইত তবে তাহার বাসনাও সব পূর্ণ হইত। সে লটি না হইয়া মেনা হইয়াছে বলিয়াই তাহাকে এই খোলার ঘরে কিছু না পাইয়াও থাকিতে হয়।

পিতার কাছে শুনিয়াছিল তাহারা গরীব, লটি বড়লোক, তাই তাহার সব বাসনা মিটে, তাহার একটা আবদারও অপূর্ণ থাকে না। সে গরীবের মেয়ে বলিয়াই তাহার সব বাসনা অতৃপ্ত থাকিয়া গেল, সে কিছুই পাইল না।

আচ্ছা, লটিতে আর তাহাতে প্রভেদ কি? লটিরও যেমন হাত পা মুখ আছে, তাহারও তেমনি আছে। লটির যেমন নাক চোখ দাঁত ঠোঁট আছে তাহারও তো তাই আছে, তবে সে কেন

বড়লোকের ঘরে জন্মিল না, সে কেন গরীবের ঘরে জন্মিল ?

আজ সকালে সে যখন ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে সম্মুখের দ্বিতলের বারাণ্ডার পানে চাহিয়াছিল, সেই সময় লটি তাহার নব-আনীত কাবুলী বেড়াল বাচ্চাটী তাহাকে দেখাইয়া গর্ব্বের সঙ্গে হাসিয়া বলিয়াছিল "দেখছিস মেনা, আমার কেমন বেড়াল ?"

এই ধনীর আদরের পুত্রীর সহিত দরিদ্র হরি ঘোষের মেয়েটীর যে কবে আলাপ হইয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না। এ আলাপে জয়ের গর্ব্বে লটির বুক ভরিয়া উঠিত আর পরাজয়ের অপমানে মেনা একেবারে লুটাইয়া পড়িত। তাহাকে বিশেষ করিয়া আঘাত দিবার জন্যই লটি তাহাকে মধ্যে মধ্যে নিজেদের প্রাসাদে আমন্ত্রণ করিত। মেনা বুঝিতে না পারিয়া দু চারদিন গিয়াছিল, তাহার পর তাহার গর্ব্ব বুঝিতে পারিয়া সে আহত হইয়াছিল, আর কিছুতেই তাহাদের বাড়ী যায় নাই।

কোনও দিন সে পিতাকে অন্যায় আবদারে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে নাই, কারণ সে জানিত তাহার পিতা বড় দরিদ্র। আজ এই শুভ্র কাবুলে বেড়ালটা দেখিয়া ও লটির বড়মানুষী কথা শুনিয়া তাহার হৃদয় বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। দরিদ্রের ময়ূর হরিণ কুকুর পুষিতে নাই পিতা বলিয়াছেন, কিন্তু বেড়ালও কি পুষিতে নাই ? এই যে তাহাদের ঘরের ভাড়াটিয়ারা দেশী বেড়াল পুষিয়াছে। সে না হয় একটা কাবুলী বেড়ালই পুষিল, লটির সহিত জেদ রাখিয়া সে একটা বেড়ালও পুষিতে পারিবে না ? মেনার কেবল কান্না আসিতেছিল।

পিতা অনেক খুঁজিয়া একটা কাবুলে বেড়ালের ছানা আনিয়া মেয়ের কোলে দিলেন। কি আনন্দের দীপ্তি যে সেই অনিন্দ্য-সুন্দর ছোট্ট মুখখানিতে ভাসিয়া উঠিল, পলকহীননেত্রে তিনি তাহাই চাহিয়া দেখিলেন, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তিনি কোনও মতে দমন করিতে পারিলেন না।

বেড়ালটা পাইয়া মেনার আনন্দ আর বুকে ধরে না, সে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া, কোলে শোয়াইয়া কিছুতেই আর তৃপ্তি পায় না। বেড়ালটা ডাকিল,—অস্থির হইয়া মেনা বলিল "বাবা, এ যে দুধ খাবে। আমি আর দুধ খাব না বাবা, আমি তো বড় হয়েছি, দুধ না খেলেও চলে ; কিন্তু এ বড্ড ছেলেমানুষ, একে যে দুধ না দিলে মরে যাবে।

তাড়াতাড়ি দুধ আনিয়া সে বেড়ালটাকে খাইতে দিল। বেড়ালটাও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল তাই চক চক করিয়া নিমেষে সবটা খাইয়া ফেলিয়া মেনার কোলে আপনিই গিয়া শুইয়া ঘড় ঘড় শব্দ তুলিয়া ঘুমাইল।

বৈকালে লটি যখন বেড়াল কোলে লইয়া গর্ব্বের সঙ্গে বারাণ্ডায় পাদচারণা করিতেছিল, সে তখন নিজের বেড়ালটাকে দেখাইয়া বলিল "এই দেখ ভাই আমারও বেড়াল আছে।"

ভিখারীর মেয়ের কাবুলে বেড়াল, লটি ঈর্ষাপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া দেখিল, "আচ্ছা, তোর বেড়ালের গয়না কই ? এই দেখ, আমার বেড়ালের গলায় সোণার তারে সোণার ঘুঙুর বেঁধে দেছি।"

তাই তো, এমন সুন্দর বেড়ালকে যদি সোণার ঘুঙুর না পরানো যায়, তবে এ বেড়াল পোষাই বা কেন ? বালিকার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কুলাইল না— তাহার হাতে আছে কাঁচের চুড়ি, সোণা যে কি তাহা সে ব্যবহার করিয়া কখনও জানিতে পারে নাই।

তাহার জলভরা চোখ দেখিয়া পিতা দুইটা পিতলের ঘুঙুর আনিয়া গোলাপী 'রিবনে' গাঁথিয়া বেড়ালটার শুভ্র গলায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন "দেখ তো মা, সোণার তারে সোণার ঘুঙুর গেঁথে দেওয়ার চেয়ে এই কি সুন্দর দেখাচ্ছে না ?"

মেনাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইল, এবং পরদিন লটির বেড়ালের গলার সোণার তার অন্তর্হিত হইয়া সেখানে গোলাপী 'রিবন' দেখা গেল। এই একটা বিষয়ে মেনা আজ জয়ী হইতে পারিল।

(২)

বরাবর ঠকিয়া গেলেও সেই একটা দিনের জয়ের চিহ্ন মেনার মনে গাঁথিয়া ছিল।

মেয়ে দিন দিন বড় হইতেছিল, ক্রমে সে পঞ্চদশ উত্তীর্ণ হইয়া গেল; মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য হরিঘোষ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

নিসর্গসুন্দরী মেয়ে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত পাত্র পাওয়াই এখনকার বরের বাজারে দুর্ঘট। পাত্র ঢের জোটে, কিন্তু এ বাজারে মেয়ে সুন্দরী হইলেই তো চলে না, টাকা চাই যে অনেক, এই গরীবের ঘরের মেয়েটী পিতার বুকের বোঝা স্বরূপ - এই ঘরখানার মধ্যে বেশ কাজকর্ম্ম করিতেছিল, অবসর পেলে পিতার কাছে বাংলা সংস্কৃত ইংরাজিও শিখিতেছিল। আর ওবাড়ীতে লটি যখন চেয়ারে বসিয়া 'অর্গানে' সুর দিয়া তাহার সহিত গান গাহিত, তাহার সঙ্গে সঙ্গে চুপি চুপি গান গাহিয়া গানটাও খুব ভাল শিখিয়া ফেলিয়াছিল।

সে যখন রাঁধে, পিতাকে সযত্নে খাওয়ায়, লটি তখন জুতা মোজা পায়ে দিয়া, কাপড় জামা পরিপাটীরূপে পরিয়া স্কুলের বইগুলা হাতে লইয়া নিমেষের তরে সেই বারাণ্ডায় আসিয়া তাহার কাজ দেখিয়া যায়। তাহার সমবয়স্কা এই মেয়েটী যখন হাতে হলুদ, হাঁড়ি কড়ার কালি মাখিয়া গম্ভীর মুখে চোখ তুলিয়া তাকায়, সে তখন যেন বানবিদ্ধের মতই সরিয়া পড়ে। বাহিরে মটরের ঘন ঘন শব্দ শোনা যায়, বোঝা যায় লটি স্কুলে চলিয়াছে।

একদিন ওবাড়ীতে বিবাহের গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। আত্মীয় আত্মীয়াগণ বাড়ী ভরিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের সকলকেই মেনা দেখিতে পাইল কারণ গরীবের কুটীরে এই অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়েটীকে দেখিতে, ঐশ্বর্য্যের উজ্জ্বল প্রভায় তাহার চক্ষু ঝলসাইয়া তুলিতে, সকলেই একবার একবার সেই বারাণ্ডায় দেখা দিয়াছিলেম। মেনা তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার বুঝিত, তাই একদিন তাঁহারা যখন নিতান্ত অনুগ্রহ করিয়াই ডাকিয়াছিলেন— এ বাড়ীতে এসো না, তখন সে অনুগ্রহের আহ্বান কাটাইয়া দিয়াছিল। তাঁহাদের এই ঘৃণামিশ্রিত দয়া সে প্রত্যাশাও করিত না।

লটির বিবাহ হইয়া গেল, কয়েকদিন আর তাহাকে দেখা গেল না, কারণ সে শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল।

হরিঘোষ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "বড় লোকের কালো মেয়েরও টাকার জোরে ভাল ঘরে ভাল পাত্রে বিয়ে হয়ে যায়, কিন্তু গরীবের ঘরের সুন্দরী মেয়েটীকেও কেউ দয়া করে নিতে চায় না।"

কথাটা কিশোরীর হৃদয় স্পর্শ করিল, তাই সে মরমে মরিয়া গেল। লটি কুৎসিতা হইয়াও ভাল ঘরে ভাল পাত্রে সমর্পিতা হইল, আর সে নিসর্গ সুন্দরী হইয়াও আজও অবিবাহিতা, ধিক তাহার রূপে, এমন রূপ থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।

লটি কয়েকদিন বাদেই ফিরিয়া আসিল।

আজ একবার বিবাহিতা লটিকে দেখার জন্য মেনার মনে বিপুল কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ কি সে এ বারাণ্ডায় আসিবে? হয় তো সে আর এ বারাণ্ডায় আসিবে না৷

নিজের মনে সে কলতলায় কড়াখানা মাজিতেছিল, সেই সময়ে উপরে খিল খিল হাসি শোনা গেল, - ওগো, দেখে যাও একবার।

লটির হাসি শুনিয়া সে কড়া মাজা হইতে বিরত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

বারাণ্ডার রেলিংয়ে ভর দিয়া তাহার পানে মুগ্ধ নয়নে দাঁড়াইয়া সুপুরুষ বলিষ্ঠ এক যুবক। তাহার সে চোখে বিস্ময় যেন ধরিতেছিল না, সে যেন কিছুতেই আশা করিতে পারে নাই এই খোলার ঘরে এমনই একটী সুন্দরী কিশোরীকে সে দেখিতে পাইবে।

লটি সরিয়া গিয়াছিল, দূর হইতে সে স্বামীকে ডাকিল, কিন্তু স্বামী সরিল না। তাহার বিভোর অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় লটির মনে একটু বিরাগ

আসিয়াছিল, সে তাই স্বামীর পাশে দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া মেনার চোখেও বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ছিঃ, বেহায়ার একটু লজ্জা নেই, কি করে তাকিয়ে আছে দেখ তোমার দিকে।"

এই কথাটা কাণে আসা মাত্র মেনা তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া লইল, তাহার পর দ্রুত পদে ঘরে ছুটিয়া গেল। ইহার পর সময় নাই অসময় নাই, সে তরুণকে সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিত; তাহার চোখে সেই বিস্ময় ভরা দৃষ্টি, যেন সে কিছুতেই তাহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

লটি ভারি বিব্রত হইয়া পড়িল তরুণকে লইয়া। সে স্বামীকে এই মজাটা দেখাইবার জন্যই ডাকিয়াছিল, সেটা এখন ভারি সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। বরাবর সব রকমেই সে গরীবের মেয়ে মেনাকে পরাজিতা করিয়া আসিতেছে, আজ যে সেই পরাজিতা হয় তাহার স্বামীই যে মেনার অসামান্য রূপে মুগ্ধ।

লটি বুঝিল অর্থে সম্পদে কিছুতেই লোকের হৃদয় জয় করিতে পারা যায় না, রূপ নিমেষে হৃদয় জয় করিতে পারে। পিতামাতার একান্ত জেদে পড়িয়া তরুণ তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাকে সে একটুও ভালবাসিতে পারে নাই। সে সুপুরুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ উপাধিধারী, অর্থের প্রলোভনে তাহার পিতামাতা জোর করিয়া লটির সহিত তাহার বিবাহ দিলে, কে বলিবে তাহার মনের মধ্যে ঘৃণা সঞ্চিত নাই? লটি তরুণের চোখে যাহা দেখিল তাহাতে ভারি সঙ্কিতা হইয়া উঠিল।

সেদিন সে মেনাকে উদ্দেশ করিয়া গালাগালি দিল বড় কম নয়, অকথ্য কথা অনেক তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল। সে যে তাহার রূপ দেখাইয়া লটির স্বামীকে কাড়িয়া লইতেছে লটি তাহা স্পষ্ট শুনাইয়া দিল।

দরিদ্র-কন্যা মেনা উত্তর দিতে পারিল না, নীরবে শুধু তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল, গৃহমধ্যে থাকিয়া হরিঘোষ ধনীর শিক্ষিতা মেয়ের গর্ব্বপূর্ণ তেজের কথা শুনিতেছিলেন, হৃদয় তাঁহার অপমানে দগ্ধ হইতেছিল।

মনের ক্ষোভ মিটাইয়া গালাগালি দিয়া ফিরিতে গিয়া লটি সামনে দেখিল তরুণকে। তরুণের মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলিল "ছি লটি, ভদ্রলোকের মেয়েকে এ রকম করে বলা কি তোমার উচিত হচ্ছে?"

লটি গর্জ্জিয়া উঠিল "ভদ্রলোকের মেয়ে কে? ও কখনই ভদ্রলোকের মেয়ে নয়। ওর ব্যবসাই ওই—যে রূপের—"

"চুপ, মুখ সামলাও, যা তা ব'ল না বলছি। তোমার যেমন মুখের কথা তাতে তোমাকেই ভারি নীচ বোধ হচ্ছে, তোমার কথা শুনে ওই যে মেয়েটী একটী উত্তর দিলে না, শুধু চোখের জল ফেলছে, ওই হলো খারাপ এটা তুমিই বলতে পার, আর কেউ বলতে পারে না।"

তীব্র কণ্ঠে লটি বলিয়া উঠিল "তুমি? তুমি এই কথা বলছ?"

তরুণ ততোধিক তীব্র কণ্ঠে বলিল "হাঁ, আমি বলছি।"

লটি দ্রুতপদে চলিয়া গেল, আর একটী কথাও বলিল না।

সন্ধ্যা হইয়াছে তখন, পিতার কোলে মাথা দিয়া মেনা পড়িয়া আছে। তাহার বুকটা ফাটিয়া যাইতেছিল। আজ লটির মুখে সে যে সব কদর্য্য কথা শুনিয়াছে, তাহাতে সারাদিনটাই তাহার কাঁদিয়া কাটিয়াছে। এমন সব কথা ধনী-কন্যা লটি কোথা হইতে শিক্ষা করিল? সে দরিদ্র-কন্যা বলিয়াই তো সব মাথা পাতিয়া লইল, একটা কথা বলিতে পারিল না!

পিতা নীরবে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন। ঘৃণায় দুঃখে তাঁহার বক্ষ জর্জ্জরীভূত হইতেছিল। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিতেছিলেন

কাঁদছিস কেন মা? আমি আর এখানে তোকে নিয়ে থাকব না, অন্য জায়গায় যাব। কালই সকালে তোকে নিয়ে চলে যাব মা, যেখানে বড় লোক আছে সেখানে আর থাকব না। আমরা যেমন গরীব তেমনি গরীবের কাছে থাকব। ওঠ মা, কাঁদিস নে।

"হরি বাবু, বাড়ী আছেন কি?"

এ কে ডাকে? মেনা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল, এ যে তরুণের কণ্ঠ। এ কণ্ঠস্বর তাহার বক্ষে বাজিয়া উঠে, এ স্বর তাহার পরিচিত হইয়া গিয়াছে।

"বাবা, তরুণবাবু আপনাকে ডাকছেন বোধ হয়।"

বিস্মিত হরিঘোষ বলিলেন "তরুণ বাবু কে?"

মেনা বলিল "ও বাড়ীর নতুন জামাই। লটি এ রকম করে বলেছে তাই বোধ হয়—"

"দূর পাগলি, ভাবছিস তাই ক্ষমা চাইতে এসেছে? ওরা কি আর আমরা কি, তা জানিস? আকাশের চাঁদ আর পথের ধূলো, আমাদের বুক যেমন পা দিয়ে দলা যায়, ওদের তেমনি হাত বাড়িয়ে পাওয়া যায় না। বোধহয় লটির আদেশ এসেছে আমাদের উঠিয়ে দেবার জন্যে।"

"না হরি বাবু, আমি তা ভেবে আসি নি—"

দরজার উপর তরুণ দাঁড়াইল "আকাশের চাঁদ সবাই হয় না তা জানবেন, আমিও আপনাদের সঙ্গে মিশে পথের ধূলো হতে এসেছি।"

সঙ্কুচিতা মেনা একবার চোখ তুলিয়া চাহিল।

হরিঘোষ বলিলেন "পথের ধূলো হ'তে এসেছেন তার মানে?"

তরুণ বলিল "আমি আপনার মেয়েকে গ্রহণ করব, দেবেন কি?"

বিস্ময়ে আত্মহারা হরিঘোষ তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। তরুণ বলিল "আপনি যে আমার কথা বিশ্বাস করছেন না তা বুঝতে পেরেছি কারণ এটা একেবারেই কল্পনার অতীত। আমি বড় লোকের জামাই, কিন্তু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমি আমার সে পদ-মর্য্যাদা ত্যাগ করছি। মনে করুন আমি আপনারই মত গরীব, আপনার মেয়েকে গ্রহণ করতে এসেছি।"

জড়িত কণ্ঠে হরিঘোষ বলিলেন "কিন্তু লটি—"

ঘৃণার স্বরে তরুণ বলিল "তার অহঙ্কার আমি নাশ করতে চাই। সে যাকে পৃথিবীর অগণ্যা করেছে তাকে আমি বরেণ্যা করতে চাই। সে যদি নিজের ভুল বুঝতে পারে, তার দর্প ত্যাগ করতে পারে, সে আমার পাশে স্ত্রীরূপে অবশ্যই দাঁড়াতে পারবে, আমার বাপমায়ের দান সে, তাকে আমি অস্বীকার করে তফাতে রাখতে পারব না। দেখুন, এতে আপনি যদি ভাল বুঝেন, আপনার মেয়েকে আমায় দান করতে পারেন।"

হরিঘোষ তরুণকে আলিঙ্গন করিয়া বাষ্পগদগদ স্বরে বলিলেন "দেব বই কি বাবা; তোমার মত উপযুক্ত ছেলে আমি যে আজ চার বছর মাথা খুঁড়েও পাই নি। আজ না চাইতে যখন আমার দুয়ারে এসেছ বাবা, আমি কি তোমায় ফিরাতে পারি? আমার মিনুকে আমি তোমার হাতে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলুম।"

ইহার কয়েকদিন পরে লটি শুনিতে পাইল তরুণ মেনাকে বিবাহ করিয়া নিজের বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে। পরাজয়ের দারুণ অপমান লটির মাথায় ন্যস্ত হইল, সব রকমে জিতিয়া প্রধান সংগ্রামেই সে মেনার কাছে হারিয়া গেল, নিজের সব সে হারাইয়া ফেলিল।

রেবতী বিমান

শ্রমণ শ্রীপুণ্ণানন্দ স্বামী এম্-আর-এ-এস্

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

কর্ম্মের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত। কর্ম্মের প্রাধান্য প্রদর্শন জন্য নানা বৌদ্ধগ্রন্থে নানা ভাবের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। নানা প্রকারে লোকের সুকৃতি দুষ্কৃতি আলোচনা করিয়া অনেক আখ্যায়িকাও রচিত হইয়াছে। আবার এই কর্ম্ম-ফলকে মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া ইহাকে অসীম শক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। মানুষের কর্ম্মই মানুষকে হীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব, নীচত্ব ও উচ্চত্ব প্রদান করিয়া থাকে। পাপকর্ম্ম মানুষের যত সব দুঃখ দৈন্যের কারণ, আর পুণ্যকর্ম্ম সুখৈশ্বর্য্যের নিদান। পাপকর্ম্মের দোষে ব্রাহ্মণ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়, আর কুশল কর্ম্মানুভাবে চণ্ডাল ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। সুত্তনিপাত গ্রন্থে দেখিতে পাই "মাতঙ্গ" নামে এক চণ্ডাল ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যার ফলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির উচ্চ জাতির পূজ্য হইয়াছিলেন। থেরগাথা নামক গ্রন্থে আছে "সুনীত" নামে একজন পুক্কুষ জাতীয় লোক প্রসূতিদের গর্ভমল নিক্ষেপ করিয়া এবং সুতিকাগার শুদ্ধ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। একদা ভগবান বিরাট সভায় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। দূর হইতে সুনীত তাঁহার বজ্রগম্ভীর ব্রহ্মস্বর শুনিয়া অত্যন্ত প্রীতি অনুভব করিল এবং ভগবানকে বন্দনা করিবার মানসে নিকটে যাইতে চাহিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির উচ্চ জাতির সভায় চণ্ডালের প্রবেশাধিকার কি সম্ভব? সে লাঞ্ছিত হইয়া অপসৃত হইল। কিন্তু ভগবানের করুণাদৃষ্টি যাহার উপর পতিত তাহার চেষ্টা কি ব্যর্থ হয়? একদা ভগবান রাজগৃহে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন এমন সময় সুযোগ পাইয়া সুনীত ভগবানের পদে পতিত হইল এবং দীক্ষা প্রার্থনা করিল। তাহার ভবিষ্যত উন্নতির লক্ষণ দেখিয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শী ভগবান তাহাকে দীক্ষিত করিলেন। "তারপর সে স্বীয় দৃঢ়-পরাক্রম ও অমিতবীর্য্যবলে কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল তাহা তাহার নিজ মুখেই শুনুন।

তারপর ইন্দ্র ও ব্রহ্মা আসিয়া অঞ্জলি বদ্ধভাবে প্রণাম করিয়া আমাকে বলিলেন :—

নমোতে পুরিসজঞ্ঞ, নমোতে পুরিসুত্তম,

যস্‌স তে আসবা খীণা, দক্‌খিনেয্যোসি মারিস।

হে, পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার, হে পুরুষোত্তম আপনাকে নমস্কার, যেহেতু আপনার পাপক্ষয় হইয়াছে, আপনি দাক্ষিণেয় (পূজ্য) হইয়াছেন।

তার পর তিনি বলিতেছেন—

তপেন ব্রহ্মচরিয়েন, সংযমেন দমেন চ,

এতেন ব্রাহ্মণো হোতি, এতং ব্রাহ্মণ মুত্তমন্তি।

তপ, ব্রহ্মচর্য্যা, সংযম ও দম দ্বারা লোক ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে; ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এইরূপ ব্রাহ্মণই উত্তম।

কুশল কর্ম্মের চরম সীমায় পৌঁছিলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়া থাকে। "কিন্তু ছোটখাট কুশল করিয়া বা পাপাচরণ করিয়া কিরূপে স্বর্গে বা নরকে গিয়া থাকে তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিয়া প্রবন্ধ উপসংহার করিব। অনেকে কুশল কর্ম্ম করিয়া তৎফলে "তাবতিংশাদি" (ত্রয়ত্রিংশাদি) দেবলোকে জন্ম-গ্রহণ করিয়া নানাবিধ সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকে। পাপীরা নানাপ্রকারের নরকে পড়িয়া দুঃখ পাইয়া থাকে।

বারাণসী সহরের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন ঋষিপত্তন নামক আরামে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ শ্রমণ বাস করিতেন। ঋষিপত্তনের বর্ত্তমান নাম সারনাথ। এই আরামের নিকট অনেক ধনবান গৃহপতি বাস করিতেন। নন্দিয় নামক যুবক ৮০ কোটী বিভব-সম্পন্ন কোন গৃহপতির উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিয়া পরম সুখে বাস করিতেছিলেন। নন্দিয় স্বভাবতঃ ভক্তিশ্রদ্ধাবান ও সুশীল ছিলেন। কুশল কর্ম্মে তিনি বড়ই আনন্দ পাইতেন। সাধুদের সেবা পূজা এবং দরিদ্রগণের দুঃখ মোচন করিতে তিনি সতত উৎসুক থাকিতেন।

নন্দিয় এক মনোহর আরাম (আশ্রম) প্রস্তুত করাইয়া ভিক্ষুসংঘকে দান করিলেন। সেই আরাম-বাসী ভিক্ষুগণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য তিনি যোগাইতেন। আবার প্রত্যহ শত শত ভিক্ষু তাঁহার গৃহে গিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সুস্বাদু সুখাদ্য ভিক্ষালাভ করিতেন। স্বীয় বাসগৃহের সম্মুখে এক বৃহৎ দান শালা প্রস্তুত করাইয়া অন্নসত্র খুলিয়া দিলেন। শত সহস্র দরিদ্র নিঃস্ব কাঙ্গাল ভিখারী প্রত্যহ উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পাইত।

এতদ্ব্যতীত নন্দিয় সর্ব্বদা প্রাণীহত্যা হইতে বিরত ছিলেন। সামান্য ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র কীট হইতে সুবৃহৎ হস্তী পর্য্যন্ত কোন প্রাণী তাঁহার অসীম অনন্ত অপরিমাণ দয়া হইতে বঞ্চিত ছিল না। সকল প্রাণীকে তিনি আত্মবৎ জ্ঞান করিতেন। নিজের সুখ দুঃখের ন্যায় অপরের সুখ দুঃখের প্রতিও তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। নিজে কোন প্রাণীহত্যা ত করিতেনই না, অপিচ প্রাণীহত্যার কারণ ও সহায়ও হইতেন না। প্রাণীহননের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র সহানুভূতিও ছিল না। কায়-বাক্যমনে তিনি কোন প্রাণীর মনে অনুমাত্র দুঃখও জন্মাইতেন না। সেইরূপ চৌর্য্য, পরদার গমনাদি মিথ্যা কামাচার, মিথ্যা, কর্কশ, সম্প্রলাপ ও বাক্য কথন, সুরা, মৈরেয়াদি নেশা সেবনাদি পাপ হইতে তিনি বিরত ছিলেন। হিংসা-দ্বেষ-লোভহীন চিত্তে সতত অপরের হিত কামনা করিতেন। এইরূপে নন্দিয় নানাবিধ পুণ্যকর্ম্মে রত ছিলেন।

তাঁহার মা তাঁহাকে একাকী এত পরিশ্রম করিতে দেখিয়া তাঁহার এই সকল কুশলকর্ম্মে সাহায্যকারিণী এক ভার্য্যা আনিয়া দিতে মনস্থ করিলেন। নিকটস্থ গৃহে তাঁহার মাতুল-কন্যা রেবতীকে তাহার জন্য তাঁর মার একান্ত ইচ্ছা। মা পুত্রের মত চাহিলে তিনি অমত জানাইলেন। কারণ রেবতীর স্বভাব তাঁহার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। রেবতী অতি মাৎসর্য্যপরায়ণা; কাহাকেও একমুষ্টি চাউল দিতেও তাহার প্রাণ ফাটিয়া যায়, শ্রমণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি তাহার ভক্তি শ্রদ্ধা নাই, তাঁহাদিগকে দানাদি দ্বারা তুষ্ট করার কথা দূরে থাকুক, আরও তাঁহাদের নানা কুবাক্য বলিয়া গালাগালি দিত। ভিক্ষার্থী দরিদ্রগণকে তদ্রূপ কঠোর বাক্যে পীড়া দিত, সময় সময় প্রহার দিতেও ছাড়িত না। কোন ধর্ম্মে তাহার আস্থা ছিল না, কোন কুশলকর্ম্মে তাহার উৎসাহ ছিল না। নন্দিয় তাঁহার কুশলকর্ম্মের সহায়িকা পাইলে বিবাহ করিতে প্রস্তুত, নতুবা বিবাহে কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া মাকে জ্ঞাপন করিলে, তাঁহার মামী রেবতীকে নানারূপে বুঝাইয়া সুঝাইয়া নন্দিয়ের অনুকরণ করিতে উপদেশ দিল, অন্ততঃ বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত।

সে মা ও পিসির উপদেশে কৃত্রিম শ্রদ্ধাবতী, দানশীলা ও শীলবতী সাজিল। প্রাতেই উঠিয়া কাঁচা গোবর দিয়া দানশালা লিপিয়া পুঁছিয়া পরিষ্কার ও পবিত্র করিত। স্বহস্তে অতি যত্নের সহিত শ্রমণ ব্রাহ্মণগণের জন্য সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া অতি ভক্তির সহিত দান করিত। তাঁহাদের ভোজন শেষ হইলে তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্র ধুইয়া পুঁছিয়া শুকাইয়া দিত। পাখার বাতাসে তাঁহাদের ক্লান্তি দূর করিত। মোট কথা রেবতী এমন ভাবে স্বভাব বদলাইল যে নন্দিয় দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণীরূপে পাইলে তিনি প্রত্যহ

নূতন নূতন কুশলসম্পাদন করিয়া প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিবেন আশায় বড় আনন্দিত হইলেন। ছেলের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে জানিয়া নন্দিয়ের মা শুভদিনে শুভক্ষণে দুই হাত জোড় করিয়া দিলেন। রেবতী আসিয়া নন্দিয়ের বিপুল ঐশ্বর্য্যের স্বামিনী হইয়া বসিল।

ঐ দিকে স্বর্গে দেবগণের মধ্যে নন্দিয়ের পুণ্য-কর্ম্মের কথা লইয়া আলোচনা চলিতে লাগিল। তাবতিংস স্বর্গে ইন্দ্রের বৈজয়ন্তপ্রাসাদের অদূরে নন্দিয়ের জন্য বিচিত্র বিরাট বিমান প্রস্তুত হইল। সে বিমানের ভিত্তি বৈদুর্য্যমণি নির্ম্মিত, এবং উহার সভাগৃহ বৈদুর্য্যমণির সহস্র স্তম্ভে ভূষিত ছিল। সূর্য্যের আভার ন্যায় ইহার উজ্জ্বল আভা দিক্‌বিদিক্ আলোকিত করিত। পঞ্চবর্ণের পদ্মসমূপশোভিত পুষ্করিণী সে বিমান সংলগ্ন উপবনের শোভা এমনই বৃদ্ধি করিত যে দেবতাগণেরও তাক লাগিত। সহস্র অপ্সরা সে বিমানের পরিচারিকা নিযুক্ত হইয়াছিল। সকলে বিমানাধিপতির আগমন প্রতীক্ষা করিতে-ছিল।

রেবতী স্বামীগৃহে আসিয়া স্বামীর একান্ত বশ-বর্ত্তিনী হওয়ার ভাণ করিয়া প্রতি পদে স্বামীর অনু-সরণ করিত। ক্রমে সে দুই পুত্রের মা হইল। নন্দিয় দীর্ঘকাল পিতৃপিতামহগণের সঞ্চিত অর্থে প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন। একদা তিনি নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিলেন "স্বোপার্জ্জিত অর্থে কোন পুণ্য করিলাম না। নিজের শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা উৎপন্ন অর্থ ব্যয় করিয়া কুশল করিলে আরও অধিক পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিতাম। অতএব বিদেশে গিয়া বাণিজ্য করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিব।" এই ভাবিয়া তিনি রেবতীকে বিষয়কর্ম্মের ভার দিয়া বিদেশে গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "প্রিয়তমে রেবতি, স্বোপার্জ্জিত অর্থে পুণ্য সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমি বাণিজ্য করিতে বিদেশে যাইব। তুমি গৃহে থাকিয়া আমার কাজ-কর্ম্ম পরিচালন কর। আমি যে সকল পুণ্যানুষ্ঠান করিয়াছি; খুব মনোযোগের সহিত সে সকল সম্পাদন করিবে। শ্রমণ ব্রাহ্মণগণকে নিত্য ভিক্ষাদি দ্বারা সেবা পূজা করিবে, অন্নসত্র হইতে রীতিমত দরিদ্র ভিখারীগণকে অন্ন বিতরণ করিবে। আরামের প্রতি খুব মনোযোগ রাখিবে। তথাকার অধিবাসী ভিক্ষুসঙ্ঘকে যথারীতি আহার্য্যাদি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দানে সন্তুষ্ট রাখিবে। মোট কথা আমার অনুষ্ঠিত কোন পুণ্যকার্য্য সমূহের যেন বিন্দুমাত্রও হানি না হয়। বড় সাবধান, এই সকলের কোন ত্রুটী যদি আমি আসিয়া দেখিতে পাই তবে এই গৃহে তোমার স্থান হইবে না। যেন আমার সমস্ত সদনুষ্ঠান আমি আসিয়া পূর্ণাঙ্গ দেখিতে পাই।"

স্বামীর বিদেশ গমনের কথা শুনিয়া রেবতীর বড়ই আনন্দ হইল। রাত দিন দানধর্ম্মাদির হাঙ্গামে পড়িয়া রেবতীর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এখন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিবে ভাবিয়া তাহার আনন্দ হইবারই কথা। স্বামীকে সত্বর বিদেশ পাঠাইবার তার একান্ত ইচ্ছা। তাই স্বামীর উপদেশ সে অতি মনোযোগের সহিত শুনিবার ভাণ করিয়া তাঁহার উপদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হইবে এবং তাঁহার পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান সমূহের কোন প্রকার অঙ্গহানি করিবে না বলিয়া সম্মতি দিল।

নন্দিয় স্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে বিদেশ গমন করিল।

স্বামীর অনুপস্থিতিতে রেবতী অভিষ্টসিদ্ধির সুযোগ পাইয়া ভারি খুসী হইল। এবং স্বগতঃ বলিতে লাগিল :—এবার মুণ্ডক শ্রমণদের দেখাচ্ছি কেমন আমার ঘাড়ের উপর চেপে উদর পূরণ করে? বাছাধনদের এবার খাওয়াইয়া খাওয়াইয়া পেট মোটা করাচ্ছি।

সে প্রথমে অন্নসত্র বন্ধ করিয়া দিয়া ভিক্ষার জন্য আগত লোকের কোলাহল কমাইয়া পাড়ায় শান্তি আনিল। তারপর ভিক্ষার জন্য আগত শ্রমণ ব্রাহ্মণদের যাহারা ভিক্ষা লইয়া আশ্রমে চলিয়া

যাইত তাহাদের ভিক্ষা বন্ধ করিল। আর যাঁহারা তাহার ঘরে বসিয়া খাইত তাহাদের আসনশালায় ভাত তরকারি ছড়াইয়া নোংরা করিল এবং পাড়ার লোকদের ডাকিয়া তাহা দেখাইয়া বলিল :- দেখ মুণ্ডকদের কাজ, পরের উপর খাইয়া পেট ভরায়, আবার অন্ন ব্যঞ্জন নষ্ট করে, আর ঘর নোংরা করে। এই সকল অপদার্থ, অলস, পরান্নভোজী, দেশের অন্নধ্বংশককে ভিক্ষা দিয়া কোন লাভ আছে কি?" এই নিরপরাধ সাধুদের উপর দোষারোপ করিয়া লোকেরও অশ্রদ্ধা জন্মাইল, নিজেও ভিক্ষা দান বন্ধ করিল এবং গালাগালি করিয়া তাঁহাদের ফিরাইয়া দিল।

পরিশেষে রেবতীর নজর পড়িল নন্দিয় গৃহপতির সাধের আরামের প্রতি। আরামবাসী ভিক্ষুগণের আহার্য্য পাঠান বন্ধ হইল, আরাম পরিষ্কার করণ ও জীর্ণ সংস্কারাদি কার্য্য হইল না। ভিক্ষুগণ আরাম ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। ক্রমশঃ গাছ গাছড়া উঠিয়া আরাম জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া উঠিল। এই সব কার্য্য সমাধা করিয়া রেবতী নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের খাওয়া দাওয়ার প্রতি খুব মনোযোগ করিল। নানা প্রকারের প্রাণীহত্যা করিয়া মৎস্য মাংস খাইতে লাগিল। সুরা পান করিয়া খুব আমোদ করিতে লাগিল। দাসদাসীদের প্রতি অত্যাচার, গুরুজনের প্রতি অভক্তি, জ্ঞাতি প্রতিবেশীর প্রতি অবমাননা প্রভৃতি অপকর্ম্মের দ্বারা সকলকে অতিষ্ট করিয়া তুলিল।

যো দণ্ডেন অদণ্ডেসু অপ্পদুট্ঠেসু দুস্সতি,
দসন্নমঞ্ঞতরং ঠানং খিপ্পমেব নিগচ্ছতি।

যে নির্দ্দোষ হিংসাদ্বেষশূন্য ব্যক্তিকে দুঃখ প্রদান করে সে এই দশবিধ শাস্তির অন্যতর শাস্তি পাইয়া থাকে।—তীব্র বেদনা, ধনাদি হানি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ভঙ্গ বা ছেদ, কঠিন রোগ, উন্মত্ততা, রাজার উপদ্রব, দারুণ অপবাদ, জ্ঞাতি বিনাশ, পশু পক্ষী হিরণ্য সুবর্ণাদি ধন বিনাশ অথবা গৃহদাহ। মৃত্যুর পরও সে মূর্খ ব্যক্তি নিরয়ে পতিত হইয়া থাকে।

রেবতীরও পাপের শাস্তি আরম্ভ হইল। অতিরিক্ত পান ভোজনের দরুণ উৎকট রোগাক্রান্ত হইল। পিতৃমাতৃবিয়োগ দুঃখও পাইল। পরিশেষে সে গৃহচ্যুতও হইল।

নন্দিয় বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত দেখিলেন ও শুনিলেন। রেবতীর ন্যায় পাপিণীর দর্শনও পাপজনক ভাবিয়া তিনি তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পিতৃকুলেও এক ভাই ভিন্ন কেহ ছিল না। নিরুপায় হইয়া সে ভাইয়ের আশ্রয় লইল। কিন্তু ভ্রাতৃবধূর যন্ত্রণায় সে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিল। এক রকম দাসীবৃত্তি করিয়াই সে দুই মুঠা খাইতে পাইতেছিল। রুগ্ন শরীরে পরিশ্রম সহ্য হইল না। সে অচিরে যমালয়ে গেল।

দুই জন যমদূত তাহাকে দুই বাহুতে ধরিয়া যমরাজার দরবারে হাজির করিল। যমরাজ রেবতীকে অবীচি নিরয়ে ফেলিবার ব্যবস্থা দিলেন। কিন্তু আগে নন্দিয়ের বিমান দেখাইয়া আনিতে হুকুম করিলেন।

যমদূতগণ তাহাকে নন্দিয়ের বিমানের সম্মুখে লইয়া ভাল করিয়া দেখিতে বলিল। সে তাহা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইল এবং এই বিমান কাহার জানিতে চাহিল।

উত্তরে তাহার স্বামীর বিমান বলিয়া শুনিয়া সে তথায় থাকিতে চাহিল। বলিল "আমিই আমার স্বামীর সমস্ত ঐশ্বর্য্যের স্বামিনী। এই বিমানও আমার পরিভোগ্য। সুতরাং আমি এইখানেই থাকিব।"

যমদূতগণ উত্তর দিল "না রেবতে, তুমি এই বিমান লাভের যোগ্য নও। তুমি কত পাপ করিয়াছ স্মরণ কর। নন্দিয়ের পুণ্যফলে তাঁহার জন্য এই বিমান প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি মৃত্যুর পর এই বিমানে পরম সুখ ভোগ করিবেন। তুমি তোমার উপযুক্ত স্থানে গিয়া স্বকর্ম্মের ফলভোগ কর।"

রেবতী বিলাপ করিতে লাগিল। যমদূতগণ তাহাকে জোর করিয়া নরকের দিকে লইয়া চলিল। নরকের ভীষণ দৃশ্যে রেবতী ভয়ানক ভীতা হইয়া কাঁপিতে লাগিল। এবং অতি কাতর ভাবে প্রার্থনা করিল "আমায় দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিন; আমি গৃহে গিয়া প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করিয়া আমার স্বামীর বিমান লাভের যোগ্যা হইব।"

"না, বিশ্বাস করিতে পারি না। নারকীরা তেমন বলে, কিন্তু মনুষ্যলোকে গিয়া সব ভুলিয়া যায়। তুমি যাও,—তোমার পাপকর্ম্মের ফল ভোগ কর।"

তারপর যমদূতগণ তাহাকে তুলিয়া অবীচি নরকের ভীষণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল।

লোপামুদ্রা

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

[বৈদিক যুগের বিদুষী মহিলা। ইনি ঋগ্বেদের ১৭৯ সূক্তের প্রথম ও দ্বিতীয় ঋক্ সঙ্কলন করেন

১

বিদর্ভ রাজার সুতা
অপরূপ গুণযুতা
অগস্ত্য মুনির পত্নী, লোপামুদ্রা নাম;—
অতুলনা তাঁর গুণগ্রাম!

২

ভারতের মধ্যস্থলে
যবে উচ্চ বিন্ধ্যাচলে
সূর্য্যের গমন-পথ অবরোধ ক'রে,
দাঁড়াইলা উন্নত শিখরে;

৩

তখন অগস্ত্য ঋষি
বিন্ধ্যাচল পাশে আসি
কৌশলে তাহার শির অবনত করি
সেই বিঘ্ন দিলা অপসারি।

৪

হেন ঋষি মহামতি
সহ লোপামুদ্রা সতী
সুকঠিন ব্রহ্মচর্য্যে, পুণ্য তপোবনে
ছড়াইলা জ্ঞানের কিরণে।

৫

লোপামুদ্রা পতিব্রতা
রমণী-ললামভূতা,
রচিলেন বেদমন্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞান-বলে,—
বসি' পূত পতি-পদতলে!

৬

মূর্ত্তিমতী সরস্বতী
পবিত্র চরিত্রবতী.
স্বামীসেবা দেব দ্বিজ অতিথি পূজন
পুণ্য কার্য্যে যাপিলা জীবন!

সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য

ডাক্তার আর সেন গুপ্ত

M. D. A. R. H. S. M. R. A. S. (London)

[জর্জ্জ মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল]

মাতার সহিত সন্তানের জীবন যতদূর ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত রহিয়াছে, পিতার সহিত তদ্রূপ নহে। এজন্য শাস্ত্রকারগণ পিতা অপেক্ষা মাতাকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন :—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥
পিতুরপ্যধিকা মাতা (১)গর্ভধারণ (২)পোষণাৎ।
অথোহি ত্রিষুলোকেষু নাস্তি মাতৃসম গুরুঃ॥

এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে (১) গর্ভধারণ ও (২) পোষণের জন্য মাতা, পিতা অপেক্ষা এমন কি সকল দেবতা অপেক্ষাও উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন। সুতরাং মাতা স্বর্গ হইতেও প্রধান, ধর্ম্ম হইতেও প্রধান, এক কথায় বলিতে গেলে মাতা আমাদিগের সাক্ষাৎ আরাধ্যা দেবতা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে (১) গর্ভধারণ ও (২) পোষণ এই দুই কর্ত্তব্য সন্তানের প্রতি মাতার নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং শুধু দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়া সন্তান প্রসব করিলেই মায়ের কর্ত্তব্য শেষ হয় না, সন্তানকে যথাযথ ভাবে পোষণ বা লালনপালনও করিতে হইবে। যে মাতা সন্তানকে পোষণ বা লালনপালন করিতে জানেন না তিনি 'গর্ভধারিণী' নামের অধিকারিণী হইতে পারেন কিন্তু প্রকৃত মাতার স্থান অধিকার করিতে পারেন না। অনেক মাতা সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই সন্তানের প্রতি তাঁহাদিগের প্রকৃত কর্ত্তব্য শেষ বলিয়া মনে করেন এজন্য তাঁহারা আপন সন্তানের লালনপালনের ভার ধাত্রীর হস্তেই ন্যস্ত করিয়া থাকেন। ইহার পরিণাম কত দূর শোচনীয় তাহা তাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করেন না। সন্তানের লালনপালনের জন্য যে ধাত্রীর সুব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, অধিকাংশ স্থলেই তাহারা হীন স্বভাবা ও হীনবংশ-সম্ভূতা। যাহারা চরিত্রহীন তাহাদিগের শরীর যে কদর্য্য অর্থাৎ নানা রোগের ভিত্তিভূমি তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং এইরূপ হীনস্বভাবা রুগ্না ধাত্রীর সংসর্গে সুকুমার শিশু যে ক্রমেই অধোগতি প্রাপ্ত হইবে এবং অকালে কাল-গ্রাসে নিপতিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? সন্তানের এইরূপ অধোগতি প্রাপ্ত হইবার এবং অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইবার জন্য মাতাই প্রকৃত দায়ী; কারণ তিনি যদি তাঁহার সন্তানকে নিকৃষ্ট ভাবাপন্না ধাত্রীর হস্তে রক্ষণাবেক্ষণের ভার না দিতেন যদি সন্তান প্রসব করিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে না করিতেন, তাহা হইলে হতভাগ্য শিশু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত না।

সন্তানের চরিত্র পিতা অপেক্ষা মাতার চরিত্র সাপেক্ষ, কারণ মাতার আদর্শে সন্তানের চরিত্র গঠিত হয়। এজন্য মায়ের চরিত্রে যে সকল দোষ ও গুণ আছে, সন্তানের চরিত্রে সাধারণতঃ তৎসমুদয় দৃষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ মাতা ভোগ বিলাসিনী হইলে সন্তানও ভোগ বিলাসী হয়; মাতা সচ্চরিত্রা হইলে সন্তানও সচ্চরিত্র হয়; মাতা পরশ্রীকাতরা হইলে

সন্তানও পরশ্রীকাতর হয় এবং মাতা পরের সুখে সুখ ও পরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করিলে সন্তানও পরের সুখে সুখ ও পরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করে। অর্থাৎ সন্তান অহরহ মাতার সংসর্গে থাকে বলিয়া মাতার চরিত্রের দোষ ও গুণ অনুকরণ করিয়া থাকে।

মাতা যে শুধু সন্তানের চরিত্র ও শিক্ষা বিষয়ে দায়ী তাহা নহে সন্তানের স্বাস্থ্য বিষয়েও তিনি সম্পূর্ণ দায়ী। যাহাতে সন্তান আহারাদি বিষয়ে সুসংযত হয় তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে; নতুবা সন্তানের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সন্তানের স্নান, আহার ও ব্যায়ামাদি বিষয়ে মাতার বিশেষ মনোযোগ দরকার।

রীতিমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকিলে শরীরে ঘর্ম্মাদি ময়লা জমিয়া নানারূপ চর্ম্মরোগ হয় এজন্য স্নানাদির দ্বারা রীতিমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত। জ্বর ও সর্দ্দি কাশি প্রভৃতি রোগ না থাকিলে প্রত্যহ শীতল বা ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিতে হইবে।

স্নানের ন্যায় আহারের নিয়মও প্রতিপালন করিতে হইবে। অধিক আহারে ক্ষুধামান্দ্য, উদরাময় প্রভৃতি নানা রোগ জন্মে, অপুষ্টিকর দ্রব্য ভোজনে শরীরের উপকার অপেক্ষা অনিষ্টের সম্ভাবনাই অধিক। এজন্য পরিমিত পরিমাণে পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করা উচিত।

ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের জন্য আহারের দুই তিন ঘণ্টাকাল পরে যে কোন ব্যায়াম বা অঙ্গ চালনার আবশ্যক, অন্যথা স্বাস্থ্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে না।

আমরা বারান্তরে সন্তানের স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিব।

মোহন রূপ

শ্রীমতী অজানিতা দেবী।

আকাশে আজ জোয়ার এসেছে,
তোমার মোহন রূপের জোয়ার এসেছে।
ঐ সীমাহীন গগন পটে
রঙ বিরঙের ঢেউ যে ছোটে,
নীলাম্বরের বুকখানি আজ
রঙিন হ'য়েছে।
তোমার মোহন রূপের
জোয়ার এসেছে॥

রূপের তোমার নাইক সীমা
রূপের রাজা হে,
ঐ অপরূপ ফোটাও মম
শুষ্ক হিয়াতে;—
বিশ্ব মগন যে রূপ ধ্যানে
ছোটাও মোরে তাহার পানে,
গগনে আজ ও রূপ হেরি
পরাণ মেতেছে॥

ব্যর্থতা

শ্রীমতী সুধীরা মজুমদার।

"আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।"

আজ আমার বয়স হয়েছে অনেক। জীবনের উপর দিয়ে কত ঝড় ঝাপ্টা যে বয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। জীবন-সন্ধ্যায় মনের কোণে অনেক হারান স্মৃতি থেকে থেকে উঁকি মারছে। হাতের কাছে পেলাম একটী বহুদিনের "পুরাণ খাতা।" সেখানা দেখে যৌবনের অনেক স্মৃতিই মনের মাঝে জোয়ার ভাটার মত খেলে যাচ্ছে। আজ তার একটুখানি উদ্ধৃত না করে পারছি না।

১৫ই ফাল্গুন—আজ অনেক দিন বাদে অনেক পুরাণো স্মৃতির ডালি নিয়ে শিশু বসন্ত আমারই হৃদয়-দ্বারে এসে ডাকাডাকি করছে। কিন্তু মন ত তাতে সায় দেয় না! আমার প্রাণে এত মরচে পড়েছে কেন? আজ ঐ দখিন হাওয়া আমার হৃদয়-লতাকে নাড়া দিয়ে তারই মত জাগ্‌তে বল্‌ছে, নূতন আনন্দ নিয়ে, নূতন জীবন নিয়ে। আজ ঐ সুনীল আকাশ আমায় ডেকে তারই মত উদার হ'তে বল্‌ছে। বসন্তের কোকিল আজ থেকে থেকে আনন্দে গেয়ে উঠ্‌ছে। মনে হয়, সে আজ তারই আনন্দে যোগ দিবার জন্য উৎসাহিত করছে। আজ যেন আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে, সবেরই মনে আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে। চারিদিকে বসন্ত তার রঙ্গীন উত্তরীয় উড়িয়ে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এখন জগতের সবাই আনন্দে মাতোয়ারা, শুধু নয় আমার মরচে-ধরা বেসুরো মনটী। সে-ত এই আনন্দে সাড়া দিতে পারছে না। ইচ্ছা হয় তাকে আকাশেরই মত নির্ম্মল করি, তাকে ফুলের মত সুন্দর করি, কিন্তু মনের মাঝে অনেক কালী লেগেছে। ঘসে কালী তোলা যায়, কিন্তু তার দাগ ত চিরকালই মনের ফাঁকে ফাঁকে লেগে থাকে; তাকে তুলি কি করে?

১৬ই ফাল্গুন—আজ হে আকাশ, কোথায় তোমার সেই সুন্দর মোহন মূর্ত্তি? কেমন করে তুমি সেই রূপটী লুকালে? আজ তোমায় দেখে মনে হচ্ছে, কোন অভিমানী তার প্রিয়তমের উপর অভিমান করে সমস্ত সাজসজ্জা খুলে বসে আছে, আর কখনও প্রিয়তমের সাথে কথা বল্‌বে না।

আজ তুমি, দখিন হাওয়া, কেন চুপ্ ক'রে বসে মানব-মনের খেলা দেখ্‌ছ? কেন অন্য দিনের মত আজও অশান্ত ছেলের ন্যায় উধাও হয়ে ধরণীর বুকে গাছের গায়ে জড়ান লতায় পাতায় নেচে নেচে কাঁপন তুল্‌ছ না? তুমি ফুটন্ত ফুলের দলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ব্যাকুল করে দিচ্ছ না কেন? কেন এখনও তুমি নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আকুল করে দিচ্ছ না? তুমি আজ এত মন-মরা হয়ে আছ কেন? আজ আমার হৃদয়-লতাকে নাড়া দিয়ে রোজের মত তোমার সুরে সুর মিলাতে বল্‌ছ না কেন?

হায়! আমার মন কি এতই কালো যে, তোমরা সকলে মিলে তার কালো দাগ তুল্‌তে পার না? আমার যে তোমাদের সঙ্গে মিলে তোমাদের সেই চির নীল, চির শিশু, চির পুরাতন দেবতার আরতি কর্‌তে ইচ্ছা হয়। কিন্তু আমি কি তা পারব? তোমরা যদি আমায় সাহায্য কর; হে আকাশ, বাতাস, তা হ'লে আমিও তোমাদের সঙ্গে সেই মহান্ দেবতার পূজায় জোগাড় দিতে পারি।

আজ থেকে থেকে বনের কোকিলের সাথে সুর মিলিয়ে আমার মন গেয়ে উঠ্‌তে চাচ্ছে,—

"আজকে সুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন।"

২৮শে ফাল্গুন—আজ অনেক দিন বাদে লিখ্‌তে বসেছি, তাই নানা রকম ফুলের গাঁথন-ছেঁড়া মালার মত এলোমেলো ভাবে চিন্তাগুলি মনের কোণে উঁকি মারছে। আজ পূর্ণিমা। নীলাকাশ চাঁদের আলো মেখে চাঁদের বাসর জাগ্‌বার জন্য প্রস্তুত। তার যে আজ বিয়ে—নির্ম্মল মাঠের শেষে বাঁশ-বনের ধারে পানা পুকুরের সাপ্‌লার সাথে। তাই ঝিঁ ঝিঁ ধরেছে সাহানার করুণ তান। বনের কোণে যূঁই চাঁপা যেন তাদের বন্ধুর বিয়েতে এক গাল হেসে নবদম্পতির সম্বর্দ্ধনায় ব্যস্ত। শুধু ব্যস্ত নয়—বনের বকুল। সে চায় সবারই নীচে সকলের ছোট হয়ে থাকতে। দূরে বিরহিনী কোকিলের থেকে থেকে বুক-ভাঙ্গা কান্না শুনা যাচ্ছে। মনে হয় সে যেন তার হারান প্রিয়তমের অপেক্ষায় থেকে থেকে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সবাই ব্যস্ত এই চাঁদিনী যামিনী সম্ভোগ কর্‌বার জন্য। শুধু ব্যস্ত নয় বনের বকুল, আমারই মত।

ওরে আমার মরা-মন, তোকে কেমন করে জাগাই, বল? তোর জীবনের উপর দিয়ে কত শরৎ এলো, কত বসন্ত গেল, তবু তুই জাগ্‌বি না? তুই এত নির্ব্বোধ কেন, তোর যেন কিছুতেই কিছু হবে না? তুই কি শুধু ঘুমাবি? জগতের সবাই জাগ্‌ল, শুধু তুইই ঘুমাবি? এ-তো তোর ভারি অন্যায়! তোকে নিয়ে যে আর পারি না, বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছি, তোর সাথে যুদ্ধ করে'। বনের বকুল, যে সবার নীচে থাকতে চায়, তারও কোন গুণ আছে, কিন্তু তুই,—তোর ত কোন গুণ নাই। মনে করি তোকে কত কিছু দিয়ে সাজাই। কিন্তু তুই যে কালো, তোর ফাঁকে ফাঁকে যে ময়লা জমেছে, তা-ত' ঘসে মুছে তোলা যায় না। তবে, হে বাতাস, তোমরা আমায় সাহায্য কর, যাতে আমি জগতের সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে পারি,—

"আজ নিখিলের আনন্দ ধারায় ধুইয়ে দাও
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও।"

২৯শে ফাল্গুন—আজ ফাগুনের দিনে এই আনন্দ-ধারার মাঝেও কেন বার বার মনে প'ড়ছে—

"আমার হৃদয়লতা নুয়ে পড়ে,
ব্যথা ভরা ফুলের ভরে।"

সত্যি, আজ আমার চঞ্চল স্বতঃনৃত্যশীল দুরন্ত হৃদয় কোন এক অজানা ব্যথার ভারে নুয়ে পড়ছে। তার সকল কাজেই কেমন যেন বেসুরো বাজছে, মনে হচ্ছে—আমার হৃদয়-বীণার কোন একটা তার একেবারে ঢিলে হ'য়ে গেছে, তাকে আর বাঁধ্‌তে পারছি না। সে তার তাল ঠিক্ রাখ্‌তে পার্‌ছে না, বার বারই তাল কেটে ফেল্‌ছে। আমার মন আজ এক দিনেই যেন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাই যেন তার বহু পুরাতন স্মৃতির খাতাখানা নিয়ে বসেছে। আজ সে কেবলই দেখ্‌ছে, তাতে তার শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই আজ যেন দেওয়ার চেয়ে পাওয়াতেই তার সুখ বেশী। তার কাছে যেটা আব্‌ছা হয়ে গেছে, সেটাকে সে টেনে বের করে রঙিন তুলি বুলিয়ে রঙিয়ে তুল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। আজ সমস্ত জগৎ থেকে সে নিজেকে গোপনে সরিয়ে নিয়ে সবার আড়ালে বসে কেবলই পুরাণ স্মৃতিগুলি ঘেঁটে যাচ্ছে।

আজ তাই মনে পড়্‌ছে সেই বহু পুরাতন স্মৃতি, অতি জীর্ণ স্মৃতিটুকু মাত্র। শুধু স্মৃতি—যা নাকি মানুষকে কেবল দংশন করে, কেবলই দংশন আর কিছু নয়। আজ মনে পড়্‌ছে—সেই সুদূর পর্ব্বত কোলে যেখানে বারমাসই শীত থাকে, যেখানে শীত ছাড়া আর কিছুরই বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় না, যেখানে পাহাড়ের চূড়ায় বারমাসই বরফ থাকে, সেই গগন-চুম্বি পর্ব্বতমালা সকাল বিকাল সূর্য্যের রাঙ্গা রশ্মির ফাগ মেখে মাতে। সেখানে পাহাড়ের

বুক থেকে হাততালি দিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেছে ছোট নদীটী। সে যেন খেয়ালী বাপের অভিমানী মেয়ে, চলেছে সাগরের সঙ্গে অভিসারে আর তার ধার দিয়ে চলে গেছে একটা সরু বাঁকা পাহাড়ী পথ। সেইখানেই ত তার সাথে প্রথম দেখা। কি সুন্দর মুখ খানা! কি চমৎকার সরল চাউনি! একবার ভুবন-ভুলান হাসি হেসে কোথায় পালাল?

* * * * *

তারপর থেকে তাকে খুঁজে খুঁজে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলাম। কই, তার দেখা ত পেলাম না? তবে আশা নিয়েই বসে থাকি, এ জীবনে না হ'লেও —পাব। আজ আমার জীবনতরী ঘাটে' এসে লেগেছে। সারা জীবন তার ধ্যান করেই কাটালাম, কিন্তু পেলাম কই? তাকে ভালবেসে ব্যর্থ-প্রেম নিয়েই চলে যেতে হবে। তার সঙ্গে বোধহয় আর দেখা হবে না। আজ আমি মৃত্যুভেরী শুনে ভয় পাই নাই মোটেই, তবে একটা ব্যর্থতার হাহাকার "হয় নাই,—হয় নাই" বলে আমায় যেন বাধা দিচ্ছে। তবু আমায় যেতে হবে বুক ভরা ব্যর্থতা নিয়েই।

নারী

শ্রীমতী ভক্তিসুধা হাঁর।

বিশ্বে দেবের অতুল সৃষ্টি
　　প্রকৃতির লীলাভূমি,
অনন্তকালের আনন্দ-মধু
অন্তরে তব বহে' আনা শুধু
সুন্দর অতি মন্থর-গতি
　　মঙ্গলময়ী তুমি।
সঙ্কোচে কহে সরি' এক কোণে
　　সঙ্গীত স্বরে তারি
'পরিচয় মোর কিছু নাই আর
　　হে পুরুষ, শুধু নারী।'
যাও দূরে সরি অভিশাপ চির
　　ধরণীতে ধূমকেতু,
একি সচপল চল-চঞ্চলা
বিলাস আলসে লুটিতাঞ্চলা
ছলনা-মূর্ত্তি খলতা-বৃত্তি
　　চির-বন্ধন হেতু।
অশ্রু-সজল ব্যাকুল কণ্ঠে
　　লুটায়ে চরণে তারই
রমণী কহিল 'হে সাধুপুরুষ,
　　এ যে গো কেবলি নারী।'

চিনিতে নারিনু রমণী তুমি কি
　　মানুষ, পিশাচী, দেবী?
নির্ঝর-ঝর প্রীতি রস ধারে
প্রেমের তীর্থে বরিছ সবারে—
সত্য মিথ্যা কে জানে তোমারে,
　　ভাবনা, ডরি কি সেবি—
করুণে চাহিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া
　　সে কহে অমনি গো
'ভ্রান্ত পুরুষ, কি ভাবনা ভয়
　　এ শুধু রমণী গো।
কম্পিত হৃদে পুলকে হসে
　　পুরুষ যখনি কহে—
জননী ভগিনী প্রণয়িনী নাম,
লহ গো প্রাণের অর্ঘ্য-প্রণাম—
সিক্ত করেছ শুষ্ক জগতে
　　সার্থক স্নেহ বহে'।
সে দিনও কণ্ঠে পুলকে ঢালিয়া
　　অন্তর সুধা-বারি
রমণী বুঝাল ভক্ত পুরুষে
　　সে যে গো শুধুই নারী।

মা

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মণ্ডল।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" দশ-মাস দশদিন যিনি কঠোর যাতনা সহ্য করিয়া সন্তানকে জঠরে স্থান দেন এবং দুর্বিষহ প্রসব বেদনা সহিয়া তাহাকে বিশ্বের শোভা নিরীক্ষণ করিবার অধিকার দান করেন; শৈশবে কত যত্নে, কত কষ্টে লালন-পালন ও শত শত বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, এমন কি সন্তানের মলমূত্রাদি কত দিন অন্নের সঙ্গে সঙ্গে মুখে উঠে তাহাতেও যিনি ক্ষুব্ধ হন না, তিনি কে?—তিনি আমাদের মা।

পীড়িত অবস্থায়, অনাহারে অনিদ্রায় কত দিবা, কত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই—সর্ব্বদা বিশ্ব-জননীর মত আমাদের শিয়রে বসিয়া থাকেন; তিনি কে?—তিনি আমাদের মা। মুমূর্ষু অবস্থায় যমের সঙ্গে লড়াই করিয়া 'হে ঠাকুর! আমি বুক চিরে রক্ত দিব, আমার অন্ধকারের বাতি কেড়ে নিওনা!' বলিয়া কে মৃত্যু দ্বার হইতে সন্তানকে ফিরাইয়া আনেন?—তিনি মা।

মা যে কি জিনিষ, তাহা বাক্যে বুঝান যায় না; যার মা নাই কেবল সেই বুঝে। দাঁত থাকিতে আমরা দাঁতের মর্য্যাদা ও মর্ম্ম বুঝিতে পারি না। মাতৃহীন শিশু অন্য ছেলেকে মা বলিয়া ডাকিতে দেখিয়া সে অন্তরে গুমরিয়া উঠে, বলে—'ওরে, আমার কি মা বলিয়া ডাকিবার কেহ নাই?' তারও যে এমনি করিয়া মা বলিবার সাধ হয়, হায় মা নাই যার, তার মত দুর্ভাগ্য বোধ হয় আর কেহ নাই। প্রবাদ আছে—'মা নাই যার, গাঁ নাই তার।' বাস্তবিক, মা ভিন্ন সন্তানের বেদনা বুঝিতে, কোলে লইয়া জ্বালা জুড়াইতে সন্তানের আর কে আছে? এমন শান্তির আকর, স্নেহের নির্ঝর, অমৃতের উৎস আর কোথাও আছে কি? বিধাতা বোধ হয় স্নেহ, দয়া, মায়া, ভালবাসা, ত্যাগ ও মহিমা,—প্রকৃতির সকল সদ্বৃত্তিগুলিই নারীমূর্ত্তির ভিতর দিয়া মাতৃত্বে প্রস্ফুট করিয়াছেন।

জগতে নারী আদ্যশক্তির অংশরূপিনী। কখনও তিনি অন্নপূর্ণা, অন্নের থালা হাতে ঘরে ঘরে অন্ন বিতরণ করিতেছেন, কখনও বা জগদ্ধাত্রীরূপে গৃহস্থালীকল্প বিশ্বে নিম্ন হইতে উচ্চতম সর্ব্ববিধ প্রাণীকে পালন করিতেছেন, আবার কখনও দুর্গা-রূপে দশপ্রহরণে জগতের দশবিধ অকল্যাণ নিবারণ করিতেছেন, ক্রোধ মহিষাসুরকে পদতলে দলিত করিয়া, দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি পশু নিচয়কে অহরহঃ তাড়না করিয়া আপন বীর্য্য প্রদর্শন করিতেছেন। সন্তানের সর্ব্ববিঘ্ন দূর করিয়া দয়া, কর্ম্ম ও জ্ঞানযুক্ত ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী মা আমাদের ঐশ্বর্য্য সকল বিধান করিতেছেন, আবার মৃদুহাস্যে বর ও অভয় দান করিয়া বলিতেছেন 'ভয় কি,—এই যে আমি।' এমন যে মা, সন্তানের মঙ্গল এবং স্বাস্থ্য বিধানই যাঁর একমাত্র কর্ম্ম, কি বলিয়া যে সে মায়ের স্বরূপ বর্ণন করিব, তাহা ভাষায় খুঁজিয়া পাই না, কেহ কখন পারিয়াছেন কি না জানি না।

একবার মা বলিয়া ডাকিলে, জননী সন্তানের সকল অপরাধই ভুলিয়া যান। মাত্র 'মা' নামের যে কত মহিমা তাহাও বাক্যে বলিয়া ফুরান যায় না। অশীতিপর বৃদ্ধও যদি কোনও অপরিচিতা ও বয়কনিষ্ঠা রমণীকে মাতৃসম্বোধন করেন, তাহা হইলে সে রমণী তাহাকে ফিরিয়া স্নেহের 'তাত'—সম্বোধন না করিয়া পারেন না। তাই বলিতে-

ছিলাম, মায়ের তুলনা এ জগতে মিলেনা, মায়ের তুলনা শুধুই 'মা'। একবার মা বলিয়া ডাকিলে প্রাণে কত শান্তি আসে, হৃদয়ে কত আনন্দ মিলে, নিরাশার দীন-অবসাদের মধ্যে একটা শান্তি ও সঞ্জীবতার সঞ্চার হয়।

এমন যে মা, অবোধ সন্তান আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না,—সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও নহে। অর্জ্জুন সর্ব্বদার জন্য বাসুদেবকে সঙ্গে পাইয়াও যেমন প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, আমরাও তেমনি বিশ্ব-মাতৃ-স্নেহে সর্ব্বদার জন্য পরিপ্লুত থাকিয়াও তাঁহাকে ভুলিয়া আছি। কবে অর্জ্জুনের সে সৌভাগ্য লাভ করিব? মাতৃত্বের প্রকটিত বিরাটরূপ সন্দর্শন করিয়া সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্রতা হইতে কবে মুক্ত হইব? মাই জানেন সে শুভ মুহূর্ত্ত কবে আসিবে। মা—ই সত্য, মা—ই সত্য!

অনুভূতি

শ্রীমতী জিনিয়াকুসুম সেনগুপ্তা।

মলিনতা যত ধুয়ে দাও আর
মুছে দাও যত কালি,
যোগ্য কর মোরে ধরিতে মাথায়,
তোমার চরণ ধূলি,
শিখাও গাহিতে তব নামগান,
দাও নব সুর, দাও নব প্রাণ,
সঙ্গীত মোর ছুটে যাক্ নাথ
দূর হ'তে বহু দূরে,
জাগুক জগত, ভরুক চিত্ত
তব সঙ্গীত-সুরে।

মুছাইতে দাও শকতি হে নাথ,
ব্যথিত নয়ন-বারি,
শিখাও হে নাথ পরহিতে যেন
আপন বিকাতে পারি,
তব করুণার রস মধু-ধারা,
রাঙিয়ে তোলে গো এ জীবন কারা,
ধৌত করিয়া পাপ মলিনতা
ছুটে যায় বহু দূরে,
দেবতা আমার! দাও হে শকতি
জানাব জগত জুড়ে।

অতিথি

(গল্প)

শ্রীমতী কুলবালা দেবী।

পঞ্চাননের অন্ধ পূজারী শম্ভুনাথের মেয়ে—নাম ছিল তার দেবদাসী।

পোনের বৎসর বয়স যখন, যৌবন তার কনক-তুলি বুলিয়ে দিলে দেবদাসীর মর্ত্ত-দুর্ল্লভ রূপের উপর। সৌন্দর্য্যের ষোলকলা পূর্ণ হল, কিন্তু এই ষোড়শী সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীকে কেউ আদরে বা অনাদরে বরণ করে নিতে এলনা।

লোকচক্ষুর অন্তরালেই বনফুলটি ফুটে রইল নিরালা বনের বুক সুরভিত করে।

পঞ্চবটির ছায়া-ঢাকা ঘন বনানি-মাঝে দেবদাসীর রূপের মলয় নিভৃতে বইত, বনদেবতায় তৃপ্তি দিতে নামটিও তার সার্থক হয়েছিল। সে তার আশৈশবের প্রিয়তম এই উপবন-সুন্দরকে রূপের ডালি নিবেদন ক'রে দিয়ে ক্ষুদ্র প্রাণটি পরিপূর্ণতায় ভরে রেখেছিল, কোথাও এতটুকু অপূর্ণতার অভাব রাখেনি। কামনা-গন্ধ-লেশহীন পুলকধারায় মন ছিল তার নিয়তই অভিষিক্ত।

সেদিন চৈত্রের মধ্যাহ্ন, সূর্য্যদেব উগ্রতেজে জলছিলেন প্রকৃতিকে অলসতার কোলে ডুবিয়ে রেখে। কোথাও জন মানবের সাড়া নেই, কেবল নিঝুম নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে আমগাছে ব'সে একটা চাতক চীৎকার কচ্ছিল—"ফটিকজল" "ফটিকজল"। এমনি সময়ে শম্ভুনাথের খোড়ো ঘরের দ্বারে এক ক্ষুৎপিপাসাতুর অতিথি এল।

দেবদাসী সদ্যস্নাত মেঘের মত মুক্ত কুন্তল দুলিয়ে দুয়ারে এসে থমকে দাঁড়াল। দুটী স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টির আলোয় মনে হলো সে নিমিষে নিজেকে হারিয়ে ফেল্লে!

অতিথি দীর্ঘদেহ গৌর সুন্দর যুবক, প্রশান্ত ললাটে তার শত সৌভাগ্যের সুস্পষ্ট চিহ্ন, স্কন্ধে মল্লিকা মালার মত শুভ্র যজ্ঞোপবিত, সে তাপস অঙ্গে গায়িত্রীর পবিত্রাসন সগৌরবে বিরাজিত। সহসা তার মনের পটে ভেসে উঠ্‌ল "প্রসন্নং পদ্মাসীনং" সেই মহেশ্বর মূর্ত্তি।

কি এক অজ্ঞাত শিহরণে বুকটি একবার শিউরে উঠে আঁখি দুটি ধীরে ধীরে মুদিত হ'ল—রবিকর-স্পর্শ-কমলের মত। লজ্জানত দৃষ্টি তুলে চাহিতেই আবার চারি চক্ষুর মিলন! অতিথি এবার কথা কইলে, ভিক্ষার্থীর মত প্রার্থনার সুরে বল্লে, "একদিন বিশ্রাম করবো, একটু আশ্রয় পাব কি?"

দেবদাসী সানন্দে সম্মতি জানালো। অতিথি সেবায় প্রাণ তার পুলকের সাড়ায় জেগে নেচে উঠল, কে জানে হৃদয়ের কোন গুপ্ত গুহার তল থেকে আজ ব্যাকুল বাসনা বুক চিরে বেরুতে চাইছিল—পাষাণবক্ষভেদা ঝর্ণা-ধারার মত অঝোর ধারায়।

(২)

পরদিন ভোরের সময় জ্যোতিঃস্ময় অতিথি সেবা-তুষ্ট মনে বিদায় নিলে, নয়নের নীরব ভাষায় প্রসন্ন অভিনন্দন জানিয়ে। দেবদাসীর বিষন্ন মুখ একবার আবির রঙ্গে রেঙ্গে উঠ্‌ল, মুখ দিয়ে একটী কথাও বের হল না; মূকের মত বুকের ভাষা কণ্ঠে এসে আবার বুকে ফিরে গেল। কিন্তু না, তাকে একটিবার যে বলতেই হবে "ওগো অপরিচিত!.. একটী সান্ত্বনার বাণীরও কি প্রার্থী আমি হতে পারি না? যদিও এই ক্ষণিক সেবার গৌরবের মাঝেই

তোমার পূজা করে ধন্য হয়েছি, তথাপি ওগো বাক্‌সংযমী ব্রহ্মচারী, একটীবার বলো—আর এক দিন আমায় সেবার অবসর দেবে।" কণ্ঠকবাট্ মুক্ত করে ঠিক্ এই কথাগুলি যখন জোর করে বলতে গেল অতিথি তখন দৃষ্টির বহির্ভূত। শালবনের ঝোপের ফাঁক দিয়ে সাদা উত্তরীয়-প্রান্ত বাতাসে একবার দুলে উঠ্‌ল, তার পরেই বনের আড়ে মিশিয়ে গেল—তার ক্ষণিকের পাওয়া তৃপ্তি শান্তি যা কিছু সব—

কামনার কালি গায়ে মেখেছিল সে, শান্ত উপবন-শ্রী আর তাকে মুগ্ধ করতে পারত না, তাই মন তার চীৎকার করে বলতে চাইত—'আমার আবাল্যের বন্ধু, এ বিলিয়ে দেওয়া বুকে আর ত তোমাদের স্থান দিতে পারব না, সে পবিত্রতা যে চিরতরে হারিয়ে ফেলেছি।'

পূর্ণিমার রাত, চাঁদের আলোয় দিক্ ভ'রে গেছে; দেবদাসী অপলকে চাঁদের দিকে চেয়ে বসেছিল। খণ্ড খণ্ড মেঘমালারা এসে চন্দ্রমাকে একটুখানি পরশ করেই কেমন তৃপ্ত হয়ে চলে যাচ্ছে, যেন এর বেশী আর কিছু চায় না ওরা, বুঝি বিশ্ববাসীকেও বুঝিয়ে দিতে চায় "তোমরাও শান্তিকামী হও। আমাদেরই মত একটু পরশের সুখ নিয়ে দূরে সরে থাক, লিপ্ত হয়ে আর প্রাণের দৈন্য বাড়িয়ে তুল না।"

সে কেন তবে দূরের দেবতার স্মৃতির পরশ নিয়ে বরষের পর বরষ কাটিয়ে দিতে পারে না? কই আর পারে! পূর্ণ এক বৎসর যে তার জীবন-নিকুঞ্জবনে শারদ জ্যোৎস্না ভরা মিলন-মধুর যামিনী হতাশের গ্লানিমায় মিলিয়ে আছে। তবু সে তো বসে আছে পলক হারা প্রতীক্ষায়!

(৩)

দেবদাসীর পিতা পরপারে প্রস্থান করেছেন ইহলোকের দেনা পাওনা চুকিয়ে। একমাত্র কন্যার কাতর কান্না সে যাত্রার পথে কোন বিঘ্নই আনতে পারেনি। তবে হতভাগী মেয়েটার জন্য দুফোঁটা অশ্রু জোর করেই ফেল্‌তে হয়েছিল, তার পরই পরম নিশ্চিন্ততা এসে তাঁকে নিয়ে গেল মুক্তির দেশে।

দেবদাসী তখন পিতৃশিষ্যা বৃদ্ধা অন্নপূর্ণার গৃহে গিয়ে রইল। অন্নপূর্ণার ত্রিজগতে আমার বলতে কেউ ছিল না। এখানে দেবদাসী মায়ের মতন আদর পেল, পিতৃশোকও কতক ভুলল—বৃদ্ধার স্নেহের সান্ত্বনায়।

সমুদ্রের কিছু দূরে বৃদ্ধার দুখানি মাটির ঘর। এ স্থানটিও লোকালয় শূন্য। প্রত্যহ সে সাগর তীরে একটি নির্জ্জন স্থানে বসে অতীতের কত কথাই ভাবতো। সেদিনও সে নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে দাঁড়াল, গোধূলির রাঙ্গা আলো তখন নীল-সমুদ্রের জলে এক বিচিত্র বর্ণের সৃষ্টি করে উর্ম্মিগুলির সাথে নেচে যাচ্ছে কোন অসীমের পথে। সে সেই দিকে বিভোর হয়ে অনেকক্ষণ চেয়েছিল; সহসা রজত-নূপুরের রুণু রুণু শব্দে দেবদাসী চমকে উঠ্‌ল; একটি তের বৎসর বয়সের মেয়ে উজ্জ্বল হাসিতে মুখখানি ভরিয়ে মূর্ত্তিমতী সাগরবালার মত তার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। বালিকার পরিধানে রেশমী নীলাম্বরী সাড়ি—তার শ্যামশ্রীকে অপূর্ব্ব শোভায় ফুটিয়ে তুলেছে নিপুণ শিল্পির চিত্রের মত। বহুমূল্য রত্ন অলঙ্কার পরিচয় দিচ্ছিল সে ধনীর মেয়ে। দেবদাসী আদরে বালিকার চিবুক ধরে জিজ্ঞাসা কল্লে, "তোমার নাম কি?"

বালিকা সহাস্যে উত্তর কল্লে "কেন, তুমি কি জান না, আমি রত্নমালা?"

"বেশ নামটি ত' তোমরা কোথায় থাক?"

"একটু দূরেই আমাদের বাড়ী।"

রত্নমালার সিঁথিতে সিন্দুর, হাতে নোয়া দেখে দেবদাসী বল্লে, "হাঁ ভাই, তোমর স্বামী কি এখানেই থাকেন?"

"দূর, তা কি করে থাক্‌বেন, তিনি রাজার ছেলে, মস্ত পণ্ডিত, অনেক শাস্ত্র পড়েন আর দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান"।

"তোমার বিয়ে হয়েছে কত দিন।"

"কতদিন কি গো, সে অনেক দিন; আমার তাঁকে মনেই পড়েনা।"

দেবদাসী বিস্মিত হ'য়ে বলল, "এঁ্যা, তোমার স্বামীকে তোমার মনে পড়ে না?"

"কি ক'রে পড়বে ভাই, সেই শুভদৃষ্টির সময় একটুখানি দেখেছিলাম; বিয়ের পরদিনই তিনি চলে গেলেন, তখন আমি খুব ছোট।"

বালিকার সরল কথাগুলিতে দেবদাসীর কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হ'ল। সে জিজ্ঞাসা কল্লে "তিনি আবার আসবেন বোধ হয়?"

"ওমা, বোধ হয় কি, নিশ্চয় আসবেন।" কি অসীম নির্ভরতাময় বাণী! ব্যথার দোলায় দুলে মন তার তিরস্কারের সুরে বলে উঠল, "ওরে হতভাগী, এ নিশ্চিন্ত বাণীর অধিকারিণী তুই ন'স্; তোর কল্পনায় কুড়িয়ে পাওয়ার মত স্মৃতির কণা হৃদয়ের রুদ্ধকোণে চির সমাহিত থাকবে।

"হ্যাঁ গা, তোমার বুঝি এখনও বিয়ে হয় নি?"

দেবদাসী ছোট একটী উত্তর দিলে, "না।" কিন্তু তার বেদনাতপ্ত নিশ্বাস যে ব্যর্থ-ভবিষ্যতের সবখানি ব্যথা জানিয়ে দিলে, বালিকা তার কিছুই বুঝতে পারল না।

সন্ধ্যা সমাগত দেখে রত্নমালা চলে গেল তেমনি প্রাণভরা হাসির লহর তুলে।

সেই একদিন মাত্র রত্নমালার সহিত দেখা, তার পরই দেবদাসী কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়েছিল, সুতরাং দেখার অবসর হয়নি।

(৪)

শরতের শান্ত মধুর সকাল, ঝক্‌ঝকে রোদ্দুর বালির চড়ায় ঝিক্‌মিক্ কচ্ছিল, যেন শারদলক্ষ্মীর ঝলমলে অভ্রের আঁচলখানি হাল্কা হাওয়ায় লুটুচ্ছে তীরসুন্দরীর বুকের পরে। আজ সমুদ্রতীরে অনেক লোক সমাগম হয়েছে, রাজকুমারীর বিদায় সম্ভাষণে দেবদাসীও এসেছিল। কে যাবে, কোথায় যাবে, এসব সে কিছুই জানত না, সকলের মত সেও তীরের দিকে চেয়ে আছে। তীরে একখানি সুসজ্জিত পান্‌সি বাঁধা, রজতদণ্ডে রক্তচেলির নিশান উড়চে যেন রাজদম্পতির কল্যাণশ্রী কামনায় উৎফুল্ল হ'য়ে। পান্‌সির খোলা ছাদের মধ্যস্থলে মুক্তার ঝালর দেওয়া স্বর্ণছত্রের তলে যে কে তা দেখবার উপায় নেই, অসংখ্য লোকের জনতায় কিছুই দেখা যায় না। রাজদর্শনের পুণ্য সঞ্চয় যে তার অদৃষ্টে নেই তা বুঝতে পেরে দেবদাসী ক্ষুন্নমনে ফিরে যাচ্ছিল। সহসা শুভশঙ্খ বেজে উঠল, নৌকাও নঙর তুলে নিল, সেই সময় কতকগুলি লোক নৌকায় উঠতেই বেশ পরিষ্কার দেখা গেল,—রাজকুমারী রত্নমালা আর তার পাশেই..................ও! এযে তারই ধ্যান ধারণার জ্যোতিঃশ্বর সেই অজানাদেশের অচিন অতিথি!

দেবদাসীর পাণ্ডুর ওষ্ঠপুটে একবার আর্ত্ত-চীৎকার ফুটে উঠল, মুহূর্ত্তের মধ্যে তার রোগ-দুর্ব্বল ক্লান্তদেহ নিরাশার অবসাদে সাগর বেলায় লুটিয়ে পড়ল।

বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী

(শিশুচর্য্যা ও সন্তানশিক্ষা)

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, এবং যতকাল পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে গতিবিধি করিতে না পারে, ততকাল জননীর শিক্ষাধীন বলিয়া, শশিকলার ন্যায় অনুদিন বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে, এই সময় প্রতিনিয়ত জননীর নিকটে অবস্থিতি করায় শিশু যে সকল শিক্ষালাভ করে, বয়োবৃদ্ধিসহকারে তৎসমুদয়ের বিকাশ ভিন্ন বিনাশ হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। সন্তান-বৎসলা জননীর অকৃত্রিম স্নেহের প্রভাব এতই প্রবল যে, শিশু তাঁহারই প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুরক্ত হয় এবং তাঁহার আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতির অনুকরণ করিয়া থাকে। সুতরাং মাতার দোষ বা গুণ সন্তানেই সংক্রামিত হইয়া পড়ে।

যে শিক্ষা দ্বারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয়, শৈশবেই তাহার সূত্রপাত হইয়া থাকে। এ সময়ে সাধারণতঃ শিশুর অনুসন্ধিৎসা ও অনুকরণ প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল থাকে। শিশু ইতস্ততঃ যাহা কিছু নিরীক্ষণ করে, সে সকল তাহার নিকটে নূতন ও অপরিচিত, সুতরাং সে যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই তৎসমুদয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করে এবং সেই সমুদয় বিষয়ের বিশ্লেষণ তাহাকে যাহা বলিয়া দেওয়া হয়, তাহাই সে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করে; ফলতঃ বাল্যকালে যাহা একবার শিক্ষা করা যায়, তাহা চিরকাল স্মৃতি-পটে দেদীপ্যমান থাকে। অতএব এ সময়ে শিশুর পুরোভাগে এরূপ আদর্শ সকল রাখা উচিত, যাহাতে তাহার সুকুমার মনোবৃত্তিনিচয় সজীব হয় এবং উন্নত ও পবিত্র চরিত্র লাভ করিতে তাহাকে শক্তিশালী করে; এই সময়ে হৃদয়ে জ্ঞানের যে রেখাপাত হয়, উত্তর কালে তাহাই অধিকতর রঞ্জিত ও বৰ্দ্ধিত হয় মাত্র। অতএব শিশু যেরূপ পরিবার মধ্যে থাকিয়া লালিত পালিত হয় তাহার শিক্ষা ও চিত্তবৃত্তির বিকাশও যে তদনুরূপ হইবে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই।

জনক জননী ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে সংসারে শিশুসন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। জননীর উদার বা অনুদার প্রকৃতি, তাঁহার তমসাচ্ছন্ন কুসংস্কার অথবা দিব্য জ্ঞানালোক নিশ্চয়ই শিশুর জীবনপথের পরিচালক। সুতরাং মাতার এক একটী সদনুষ্ঠান বা অসদনুষ্ঠান, তাঁহার আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, স্বভাব, চরিত্রের উপর শিশুর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে।

পরিবার মধ্যে ধর্ম্ম ও সাধুতা রক্ষা করিবার ভার রমণীর হস্তে। জননী যদি ধর্ম্মপরায়ণা ও বিবেকশালিনী হন, তাঁহার অন্তরে যদি সাধুতা লাভের ইচ্ছা বলবতী থাকে, তাহা হইলে সন্তানগণও সেই সকল সদ্গুণ লাভ করে। স্নেহময়ী মাতার অধরনিঃসৃত সুমিষ্ট অনুশাসন-বাক্য সন্তানের স্মৃতিপটে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের শত শিক্ষকের উপদেশে যে শিক্ষার লাভ না হয়, একটী সুশিক্ষিতা, সচ্চরিত্রা, সংযতচিত্তা, বিবেকপরায়ণা মাতার ক্রোড়ে বৰ্দ্ধিত হইলে সন্তানদিগের সে শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে। মহান্ লোকের জীবনচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, জগতে যত মহাজন যে যে সদ্গুণের জন্য

প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলে, এরূপ পরিলক্ষিত হয় যে তাঁহাদের জননীগণ সেই সকল চরিত্র গুণে বলবতী ছিলেন।

ত্রিভুবনবিজয়ী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নিরতিশয় হরিবিদ্বেষী ছিলেন। হরির নাম শুনিলেই তিনি ক্রোধে অধীর হইতেন। তাঁহার রাজ্যের চতুঃসীমাতেও কেহ হরিনাম উচ্চারণ করিতে পারিত না। এমন হরিদ্বেষীর গৃহেও হরিভক্তিপরায়ণা রাজমহিষী কয়াধুর ভক্তিবলে প্রহ্লাদের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চম বর্ষীয় শিশু এতদূর ধর্ম্ম-পরায়ণতা ও ভগবানের প্রতি এত আত্মনির্ভরের ভাব কোথায় শিক্ষা করিল? সকলেই জানেন, যে প্রেম কয়াধুর হৃদয়ে, অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাই পঞ্চম বর্ষীয় শিশু প্রহ্লাদের হৃদয়ে ভক্তি মন্দাকিনীতে পরিণত হইয়াছিল।

উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব, বিমাতা সুরুচির দুর্ব্বাক্য-বাণে বিদ্ধ হইলে পর জননীর নিকটে উপস্থিত হইয়া অতি কাতর ভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলে, ধর্ম্মশীলা, সহিষ্ণু, ও বিবেকপরায়ণা জননী সুনীতি, যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা অতি মহৎ, অতি উচ্চ। তিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "বৎস! কাঁদিও না; এই পৃথিবীতে মানুষ নিজ কার্য্যের গুণেই বড় হয়। যদি বিমাতার কথায় মনে অত্যন্ত ক্লেশ হইয়া থাকে, পুণ্যলাভ করিবার জন্য যত্ন কর; পুণ্যলাভ করিলে সকল ফল লাভ হইবে। বিনয়ী, সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ ও পরহিত-ব্রতী হও; জল যেমন নিম্নাভিমুখেই ধাবমান হয়, এই সকল গুণবিশিষ্ট হইলে, পৃথিবীর সর্ব্ব সম্পদ তেমনি অনায়াসেই তোমাকে আশ্রয় করিবে। সর্ব্বদুঃখহারী ভগবান্ তোমার মঙ্গল করিবেন, তুমি তাঁহার শরণ লও।" এরূপ ক্ষমাশীলা, পুণ্যবতী জননীর সন্তান বলিয়াই, পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ধ্রুবের হৃদয় পুণ্যের পবিত্র ও বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল; ধ্রুব কঠোর তপঃ প্রভাবে, পদ্মপলাশ-লোচন হরির কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শিশু বিদ্যাসাগর সকলের চক্ষের অগোচরে, জননীর স্নেহময়ী বক্ষে, শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় অনুদিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন; তাঁহার ভাগ্যে বিদ্যাবতী জননী লাভ ঘটে নাই। কারণ বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতে স্ত্রীজাতি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলেন। দেশে তখন স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না। কুমারসম্ভব ও বিক্রমোর্ব্বশী নাটক প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পুরাকালে স্ত্রীলোকেরা ভূর্জ্জপত্রে লিখিতেন। তাঁহারা নানা বিষয় শিক্ষা পাইতেন। সংস্কৃত দশকুমারচরিত নামক গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্ত্রীলোকেরা বিদেশীর ভাষা, চিত্রবিদ্যা, পুষ্পবিদ্যা, নৃত্যবিদ্যা সঙ্গীত, তর্কবিদ্যা, গণনা, বাক্যবিন্যাস, সৌগন্ধ ও মিষ্টান্ন প্রস্তুতকরণ বিদ্যা জীবিকা-নির্ব্বাহক অর্থকরী প্রমুখ বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। কিন্তু হায় যে ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা এক সময়ে প্রকৃষ্টরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, যে ভারতে, দেবযানি, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, রোমশা ও বাক্ প্রভৃতি বিদুষী মহিলারা বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন; যে ভারতে, ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শিনী হইয়া স্বনামে জ্যোতিষগ্রন্থ প্রচার করিয়া জগতের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন; যে ভারতে, অনুসূয়া, অরুন্ধতী, সাবিত্রী, মৈত্রেয়ী, শৈব্যা, গার্গী, প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীগণ সাংসারিক সুখসম্ভোগ পরিহারপূর্ব্বক ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত থাকিতেন; যে ভারতে এমন দিন ছিল, যখন বারানসী নগরীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া হটি বিদ্যালঙ্কার নামে এক বিখ্যাত রমণী, ছাত্রদিগকে ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতেন; যে ভারতে, মিহিরের স্ত্রী খণা জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও তাহার রচনার জন্য বিখ্যাত আছেন; যে ভারতে চিতোরের রাণী আপন শক্তিগুণে জয়দেবের ন্যায় সুমিষ্ট কবিতা লিখিয়া

গিয়াছেন, যে ভারতে, পৃথ্বীরাজ-লক্ষ্মী পদ্মাবতী, চৌষট্টি শিল্প ও চতুর্দ্দশ বিদ্যা জানিতেন; যে ভারতে, মালাবারে আভীর নামে এক অবিবাহিতা বিদ্যাবতী নারীরত্ন নীতি, কাব্য ও দর্শন বিষয়ক পুস্তক সকল রচনা করিয়া বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে প্রচলিত করিয়াছিলেন; যে ভারতে, নানাশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাও নানা প্রকার বিদ্যাশিক্ষা করিতেন, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই ভারতে স্ত্রী শিক্ষা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ক্রমে এ দেশের লোকের এতাদৃশ কুসংস্কার জন্মে যে, নারীজাতি বিদ্যাশিক্ষা করিলে, তাহাদের বৈধব্য দশা ঘটিবে। ফলতঃ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা তৎকালে এবংবিধ অকিঞ্চিৎকর ও অমূলক ভয়ে বিদ্যাভ্যাসে অনুরক্তা হইতেন না। দেশে যখন স্ত্রীশিক্ষার পথ এইরূপভাবে নিরুদ্ধ, তখন স্ত্রীলোকগণ গৃহপালিত পশুবৎ জীবন যাপন করিতেন, এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। তখন চরিত্রগত ও অনুষ্ঠানগত শিক্ষাই দেশকে সজীব রাখিয়াছিল। তখন দেশে শাস্ত্রকথা, কথকথা, রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক উপাখ্যান সমূহ আদর্শ হিন্দুগৃহে প্রতিদিন ধ্বনিত হইত। এবং এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানই দেশের ধর্ম্মভাব ও নৈতিক-ভাব জাগরিত রাখিয়াছিল।

তখনকার জননীগণ রত্নাকরের মুক্তি, হরিশ্চন্দ্রের স্বার্থত্যাগ, যুধিষ্ঠিরের ন্যায়নিষ্ঠা, ভীষ্মের শরশয্যাতে শয়ন, অর্জ্জুনের রণ-কৌশল ও বাহুবল, রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃবৎসলতা, লোকরঞ্জনের জন্য স্বার্থত্যাগ, লক্ষ্মণের অগ্রজানুরাগ, সতী সাবিত্রীর পতিভক্তি প্রভৃতি উপাখ্যানগুলি সন্তান-শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপাদান বলিয়া মনে করিতেন। তখনকার সন্তানগণ মাতা, মাতামহী, পিতামহী প্রভৃতির মুখের অগ্রে অভ্যাগতের পরিচর্য্যা, অপরিচিত রুগ্ন ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা, বিপন্নকে আশ্রয় দান, ক্ষুধাতুরকে অন্ন দান করিতে দেখিয়া পরোপকার ও সেবাধর্ম্ম শিক্ষা করিত। গ্রামের সামান্য লোকদিগের সহিতও ধনশালী সম্ভ্রান্ত পরিবারের অল্পবয়স্ক বালকদিগেরও এক একটী সম্বন্ধ থাকিত, কেহ কাহাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিত না। এরূপে তাহারা দয়াশীল, হৃদয়বান ও মিষ্টভাষী হইতে শিক্ষা পাইত। পূর্ব্বে আদর্শ পরিবারে বার মাসে তের পার্ব্বণ ছিল, ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল, গৃহের সর্ব্ববিধ কর্ম্মের মধ্য দিয়া সন্তানগণ সুশিক্ষা লাভ করিত। দেশে এই সকল সুভাব ও সদুদ্দেশ্য বিদ্যমান্ ছিল বলিয়াই দেশ প্রাণহীন বা হৃদয়বিহীন হয় নাই। তখনকার জননীগণ সন্তান-শিক্ষা সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালের শিক্ষিতা জননীগণের ন্যায় বেন, গার্ণ্টন, হারবার্ট, স্পেন্সার, স্মাইল, কার্পেন্টার, ফাউলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মন্তব্য পাঠ করিবার সুযোগ পান নাই সত্য বটে, কিন্তু ঋতধ্বজরাজ পত্নী মদালসা কিরূপ সদুপদেশ দানে সাধু অলর্কের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য রাজর্ষিগণকে যে মহামূল্য উপদেশ রত্ন দান করেন, তন্মধ্যে সন্তানের উপর মাতার প্রভাবের বিষয় যাহা উক্ত হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্রে গার্হস্থ্যধর্ম্ম কথনের মধ্যে সন্তান-শিক্ষা সম্বন্ধে যে উপদেশের উল্লেখ আছে এবং বিবিধ উপাখ্যানের অন্তর্গত উপদেশাবলী সেই সময়ে প্রত্যেক আদর্শ হিন্দুগৃহে মুখে মুখে গীত হইত এবং সন্তান-শিক্ষার উপাদান বলিয়া বিবেচিত হইত।

এ পর্য্যন্ত সন্তানের উপর মাতার প্রভাব এবং তৎকালীন আদর্শ হিন্দু পরিবারের অনুষ্ঠানগত ধর্ম্ম ও নৈতিক শিক্ষার কথা কথিত হইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখন দ্বিবিধ শিক্ষা ছিল,—অনুষ্ঠানগত এবং চরিত্রগত শিক্ষা। ভগবতী দেবীর চরিত্রগত শিক্ষা কি কি ছিল, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান দ্বারা আমরা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, আমরা এক্ষণে সেই সমুদয় বিষয় উল্লেখ করিব।

তাঁহার চরিত্রের এই এক বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান করিতে অতিশয় ঘৃণাবোধ করিতেন। অনেক জননীকে এরূপ দেখা যায় যে, রোরুদ্যমান

শিশুসন্তানগণকে শান্ত করিবার মানসে কিংবা অবাধ্য সন্তানদিগকে বাধ্য করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা তাহাদিগকে "জুজুর ভয়" দেখাইয়া থাকেন। এরূপ ভয় প্রদর্শন যে সন্তানের পক্ষে মহা অনিষ্টের কারণ, সে বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই। ইহা দ্বারা শিশুর বল, বিক্রম ও আত্মরক্ষার ভাব সকলই একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কোন কোন জননীকে এরূপ দেখা যায় যে, শিশু যদি তাহার প্রিয় বস্তু পাইবার জন্ম ক্রন্দন করে, তবে তাহাকে "আকাশের চাঁদ" প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়া সান্ত্বনা করেন। এরূপ ব্যবহারে শিশুরা অতি সহজেই অন্য সকলকে অবিশ্বাস করিতে শিক্ষা করে এবং ধীরে ধীরে মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি তাহাদের সুকোমল বাল্য-হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিয়া কালক্রমে বদ্ধমূল হইতে থাকে।

অনেক মাতার এরূপ স্বভাব আছে যে, তাঁহারা সন্তানগণের নিকট সংসারের অবস্থা গোপন করিতে প্রয়াস পান। এরূপ আত্মগোপন নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়। কারণ শিশুদিগের অন্যায় প্রার্থনায়, তাঁহাদিগকেই জ্বালাতন হইতে হয়।

ভগবতীদেবী সন্তানদিগকে কখনও "জুজুর ভয়" দেখানর কিংবা তাহাদিগকে শান্ত করিবার মানসে "আকাশের চাঁদ" ধরিয়া দিবার কথা বলিতেন না। তিনি এরূপ ক্ষেত্রে সন্তানের যতদূর সম্ভব প্রার্থনা রক্ষা করিতেন এবং স্নেহ ও মমতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহাদিগকে শান্ত করিতেন, কঠোর শাসন দ্বারা তাহাদিগের কোমল বৃত্তি গুলির মূলে আঘাত করিতে তিনি কখনই প্রয়াস পাইতেন না। ইহা তাঁহার একেবারেই প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। অবস্থায় যাহা সংকুলান হয়, তাহার অতিরিক্ত প্রার্থনা করিলে, সংসারের দরিদ্র অবস্থা স্মরণ করাইয়া এবং বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিতেন।

সৎকার্য্যে উৎসাহদান তাঁহার চরিত্রের আর এক বিশেষত্ব। শিশু সন্তানদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত সৎকার্য্য ও সদ্ব্যবহার দেখিলে, তিনি আনন্দ প্রকাশ করিতেন এবং উৎসাহ দিতেন। একদা বালক বিদ্যাসাগর সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। ক্রীড়া শেষে দেখিতে পাইলেন একজন সঙ্গী ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছে। তিনি তাহাকে আপনার বস্ত্রখানি গ্রহণ করিতে বলিয়া স্বয়ং তাহার ছিন্ন বস্ত্রখানি পরিধান করিলেন। গৃহে সমাগত হইলে, মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বস্ত্র কোথায়?" বালক উত্তরে সত্য ব্যাপার প্রকাশ করিলেন। মাতা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এইত ভাল ছেলের কাজ; আমি চরকায় সুতা কাটিয়া তোমায় আর একখানি নূতন কাপড় প্রস্তুত করিয়া দিব।" সন্তানগণের এইরূপ সদনুষ্ঠান বা পরোপকার-প্রবৃত্তি দেখিলে, তাহাদিগের প্রতি আদর ও সস্নেহ ভাব প্রদর্শন করা তিনি অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। কেবল তাহাই নহে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি লক্ষ্য রাখিতেন যে, বালকবালিকার জীবনে তিনি যে সকল সৎ-প্রবৃত্তি পরিস্ফুট দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা ধীরে ধীরে তাহাদের হৃদয়ে বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে কি না।

স্নেহ ভালবাসা বর্জ্জিত কঠোর শাসন যে, কোমলমতি শিশুর পক্ষে অতীব অনিষ্টকর, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। কঠোর শাসনে শিশু দিন দিন উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া পড়ে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আলস্য, ভীরুতা ও শঠতা আসিয়া শিশুকে আশ্রয় করে। ভীরুতায় মনুষ্যত্বের লোপ পায়, এ সত্য; বৃদ্ধ, যুবক, শিশু সকলের পক্ষেই সমান। প্রয়োজন হইলে, শিশুকে প্রাণের স্নেহ মমতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া শাসন করা উচিত। কোন কোন মাতা এরূপ আছেন যে, সন্তানের সামান্য অপরাধে গুরুদণ্ড বিধান করিয়া শেষে তাহাদের গুরুতর অপরাধে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, ইহা অতীব অন্যায়। প্রদীপে একবার হাত দিয়া যন্ত্রণা অনুভব করিলে, শিশু আর কখনও প্রদীপে

হাত দিতে যাইবে না। এরূপ স্থলে মাতার গুরুতর শাসনের প্রয়োজন হয় না। হয় ত কোন সন্তানের অসাবধানতাবশতঃ হস্তপদ ভগ্ন হইয়াছে, এরূপ স্থলে মাতার অগ্রে সন্তানের জীবনরক্ষার উপায় বিধান করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু এরূপ অনেক নির্ম্মম মাতা আছেন যে, তাঁহারা সেই সময়ে ক্রোধপরবশ হইয়া সন্তানকে ভয়ানক তিরস্কার করিতে আরম্ভ করেন, উপস্থিত কর্ত্তব্যের বিষয় একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান। ভগবতীদেবীর প্রকৃতি এরূপ ছিল না। বালক বিদ্যাসাগর এক সময়ে ধান্যক্ষেত্রের নিকট দিয়া গমনকালে, ধান্যের শীষ তুলিয়া চিবাইতে চিবাইতে গমন করেন। শেষে ধান্যের শীষের শুঁয়া গলায় আটকাইয়া প্রাণ সংশয় হইয়া উঠে। তদবস্থায় বাটীতে নীত হইলে তাঁহার পিতামহী অতি কষ্টে সেই শুঁয়া বাহির করিয়া দেন, এবং সে যাত্রায় বিদ্যাসাগরের প্রাণ রক্ষা হয়। মাতা সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়, যাহাতে সন্তান বিপন্মুক্ত হয়, প্রথমতঃ তাহারই সহায়তা সর্ব্বতোভাবে করিয়া শেষে শিক্ষা দিলেন,—"বাবা, অমুক অমুক শস্যের শীষে শুঁয়া আছে, আর কখনও এই সকল শস্যের শীষ চিবাইও না।"

তিনি লোকের আত্মবিশ্বাসের উপর কখনও কোন প্রকার আঘাত করিতেন না। তিনি যেন এই আত্মবিশ্বাসের মধ্যে অমিত শক্তি, অমিত বল, কত প্রাণ, কত বীর্য্য, কত ওজঃ, কত অমৃত, নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করিতেন। অবশ্য সময়ে সময়ে এই আত্মবিশ্বাসের সহায়তা করায় শিশুদিগের দুই একটী ভুল ভ্রান্তি ঘটিত। কিন্তু তিনি বলিতেন যে,—"এই ভুলটাই যে একটা মহা শিক্ষা।"

লোকের দোষ অপেক্ষা গুণের উপরই তাঁহার অধিক লক্ষ্য ছিল, এবং গুণের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহার দোষকে গুণে পরিণত করিতে সতত চেষ্টা করিতেন। যেমন পাপীকে, 'পাপী' 'পাপী' বলিলে তাহার উদ্ধার অসম্ভব। তাহার ভিতর যে মহাশক্তি আছে, সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দিতে পারিলেই তাহার মঙ্গল হয় সন্তান-শিক্ষা সম্বন্ধেও ঠিক সেই ভাবেই তিনি কার্য্য করিতেন। কারণ তিনি যেন মনে করিতেন, জগতে পাপ তাপ নাই, রোগ শোক নাই, যদি কিছু পাপ জগতে থাকে তাহা এই ভয়। যে কোন কার্য্য তোমার ভিতরে শক্তির উদ্রেক করিয়া দেয় তাহাই পুণ্য; আর যাহাতে তোমার শরীর ও মনকে দুর্ব্বল করে, তাহাই দুর্ব্বলতা, মৃত্যু বা মহাপাপ। সুতরাং মৃত্যুর সহায়তা না করিয়া জীবন দান করাই প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষার অর্থ—ধ্বংস সাধন নহে, প্রকৃত শিক্ষার অর্থ—গঠন। সুশিক্ষায় অন্তর্নিহিত শক্তির উপচয়ই হইয়া থাকে; শক্তির অপচয়ের কোন আশঙ্কাই থাকে না।

বিদ্যাসাগর বাল্যকালে অতিশয় দুষ্ট ছিলেন, অনেক প্রতিভাবান্ প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির বাল্য-জীবনে বালস্বভাবসুলভ চপলতার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য বাল্যকালে গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণগণের নৈবেদ্য কাড়িয়া খাইতেন; অমর কবি সেক্সপীয়র বাল্যকালে দুষ্ট বালকদিগের সঙ্গদোষে হরিণ চুরি করিয়াছিলেন। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অত্যাচারে তাঁহার জননী জ্বালাতন হইতেন। বালক বিদ্যাসাগর বাল্যকালে পাড়ার লোকের বাগানের ফল পাড়িয়া চুপে চুপে খাইতেন; কেহ কাপড় শুকাইতে দিয়াছে দেখিলে, তাহার উপর মূত্র ত্যাগ করিতেন, পাঠশালায় যাইবার সময় মধ্যে মধ্যে মথুরমণ্ডল নামক একজন প্রতিবেশীর দ্বারদেশে মলত্যাগ করিতেন। এই সকল সংবাদ মাতার কর্ণে প্রবেশ করিলে, তিনি বিদ্যাসাগরকে বলিলেন, —"বাপু! তুমি লোকের ছেঁড়া কাপড় দেখিলে, আপনার ভাল কাপড় তাহাকে পরাইয়া নিজে সেই ছেঁড়া কাপড় পরিয়া বাটীতে আইস, লোকের দুঃখ দেখিলে তুমি মনে এত দুঃখ পাও, আর এরূপ করিয়া লোকের মনে ব্যথা দাও কেন? কোন খাদ্যদ্রব্য হস্তে তাহারা তোমার বিষ্ঠা স্পর্শ করিলে,

সেই দ্রব্যগুলি তাহাদিগকে ফেলিয়া দিতে হয়, পুনরায় স্নান করিতে হয়। আহা, তাহাদের কত কষ্ট দেখ দেখি।" শুনা যায়, মাতার এরূপ শিক্ষায় সন্তানের সুফল ফলিয়াছিল। বালক বিদ্যাসাগর বালস্বভাবসুলভ চপলতা বশতঃ ঐরূপ অন্যায় কার্য্য করিতেন, কিন্তু যেদিন মাতার সুশিক্ষায় বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ সকল অন্যায় কার্য্য হেতু লোকে নিগ্রহ ভোগ করে, তাহাদের মনে কষ্ট দেওয়া হয়, সেইদিন হইতেই তিনি ঐরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে বিরত হইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর বাল্যকালে অতিশয় অনাশ্রব (একগুঁয়ে) ছিলেন। এজন্য পিতা ঠাকুরদাস তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে প্রহার পর্য্যন্ত করিতেন। এবং তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—'ঘাড় কেঁদো', কিন্তু ভগবতীদেবী হৃদয়ের স্নেহ মমতা দ্বারাই তাঁহাকে সংযত করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যেন জানিতেন, প্রগাঢ় সন্তানবাৎসল্যই শিশুকে আপনার হইতে আপনার করিয়া দেয়। তখন এমন কোন কার্য্যই নাই যাহা তাহা দ্বারা করাইয়া লওয়া যায় না। শিশু যেমন ভালবাসার অধীন এমন আর কেহই নহে। স্নেহ, মমতা ও বাৎসল্যের শাসনই প্রকৃত শাসন। ভগবতী দেবী বলিতেন, "সন্তান বালকবুদ্ধিবশতঃ কোন অন্যায় কার্য্য করিলে পর, মাতা যদি মুখ আঁধার করিয়া তাহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ বন্ধ রাখিলেন, আর সন্তান মাতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া না বেড়ায়, তাহা হইলে, সে মাতাই বা কিরূপ, তাঁহার ভালবাসাই বা কিরূপ, আর তাঁহার মায়ামমতাই বা কিরূপ, কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না।" ভগবতী দেবীর এই উক্তি হইতেই পাঠক পাঠিকাগণ তাঁহার সন্তানবাৎসল্যের প্রগাঢ়তা অনুভব করিবেন।

সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ তাঁহার চরিত্রের আর এক বিশেষত্ব ছিল। সহানুভূতি সর্ব্ববিধ উন্নতির নিত্য সহচর এবং দায়িত্বজ্ঞানই মানুষকে সর্ব্বোচ্চ উন্নতির সোপানে উন্নীত করিতে পারে, ইহাই যেন তাঁহার ধারণা ছিল। তিনি সন্তানগণকে বলিতেন, "আপনি ভাল কাপড় পরার চেয়ে, পরকে পরাইতে পারিলে, অধিক সুখ হয়। নিজে ভাল খাওয়া অপেক্ষা পরকে ভাল খাওয়াইতে পারিলে, অধিক আনন্দ হয়।" এইরূপে তিনি সন্তানগণের হৃদয়ে মনুষ্যজীবনের উচ্চতর ও গভীরতর দায়িত্ব সকল অনুভব করাইয়া দিতেন।

স্বীকার করি, মানবের সদ্গুণাবলী স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সদ্গুণাবলীর বিকাশ শিক্ষাসাপেক্ষ, শিক্ষারূপ ইন্ধন না পাইলে জ্ঞান ও বিদ্যাগ্নি প্রজ্বলিত হয় না। ক্রিয়ার জলন্ত দৃষ্টান্ত ভিন্ন অন্য উপায়ে মানুষ মানুষকে শিক্ষা দিতে অসমর্থ। যদি কেহ সম্পূর্ণরূপে আপনাকে বিকাশ করিতে সমর্থ হন, তবেই তাহার শিক্ষা দিবারও ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু বিশুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ দ্বারা শিক্ষা দানে কেহ কখনও সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হন না। যিনি গ্রহণ করিতে সমর্থ, তিনি কেবল শিক্ষা দিতে পারদর্শী এবং গ্রহণ করিবার শক্তি না থাকিলে কেহই শিক্ষিত হইতেও পারে না। ছাত্র শিক্ষকের মনোভাব বুদ্ধি এবং বিশ্বাসের সমতলবর্ত্তী না হইলে শিক্ষার আদান প্রদান কোনমতে সম্ভাবিত নহে। কারণ শিক্ষাকালে পরস্পরের চিত্তসংযোগ বা বিমিশ্রণ ঘটিয়া থাকে। এইরূপ চিত্ত সন্নিপাতের সংঘটন হইলেই, কেবল প্রকৃত শিক্ষা কার্য্যোপযোগিনী হয় এবং প্রতিকূল দৈবপাত বা অসৎ সংসর্গ হেতু তাহার উপকারিতা কোন কালেই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না।

ভগবতী দেবীর এই সকল শিক্ষাদীক্ষা সকল সন্তানগণই সমান পরিমাণে লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশের সুফল আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে যে অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট দেখিতে পাই তাহারও কারণ এই। এ সম্বন্ধে অপর দিকে মহাকবি ভবভূতির গভীরার্থ পূর্ণ নিম্নলিখিত শ্লোকটী আমাদের মনে পড়ে :—

"বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে,
ন চ খলু তয়োর্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তি বা।
ভবতি চ তয়োর্ভূয়ান্ ভেদঃ ফলং প্রতিতদ্ যথা,
প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ।"

গুরু, সুবোধ ও নির্ব্বোধ, দ্বিবিধ ছাত্রকেই সমভাবে বিদ্যা বিতরণ করেন; কিন্তু তদুভয়ের ধারণাশক্তির বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারেন না। বিদ্যাবিষয়ে যে পূর্ব্বোক্ত ছাত্রই প্রভূত পার্থক্য প্রাপ্ত হন ইহা বলা বাহুল্য। নির্ম্মল মণি প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয়, মৃৎপিণ্ড কখনই সমর্থ হয় না।

স্মৃতি

শ্রীমতী স্নেহময়ী দেবী।

এসেছিল অতিথির বেশে
বাদলের রাতে একদিন,
ক্ষুদ্র তনু কোমলতা মাখা
প্রাণ তার ব্যথাভরা ক্ষীণ।
আঘাতে আঘাতে যেন আজ
নুয়ে পড়ে ভাঙ্গা হৃদিখান,
আনন্দ হারায়ে গেছে ওগো
আছে শুধু বেদনার গান;
আছে শুধু মৌন ব্যাকুলতা,
আছে শুধু তপ্ত আঁখিজল,
আছে শুধু হাহাকার ভরা
শুষ্ক এই হৃদয়ে অনল।

* * * *

বাদলের ঘন অন্ধকারে
আসিয়া দাঁড়াল দ্বারে মোর,
হাতে তার গুচ্ছ কেয়াফুল,
আঁখিতলে মাখা ছিল লোর।
দেখে তারে মনে হয় যেন
ফিরেছিল দ্বারে দ্বারে কত,
কেহ ত দেয়নি ঠাঁই হায়,
অপরাধ করেছিল এত!

পথের পথিক সে ত' শুধু
ক্লান্ত শ্রান্ত দেহখানি ঢেকে
চাহিয়াছে এতটুকু ঠাঁই
ঝরঝরে বারিধারা মেখে।

* * * *

তরুণ অতিথি ওগো মোর
এস হেথা দ্বার খোলা আছে,
এস তুমি কুটিরে আমার
এস তুমি আজি মোর কাছে।
সরমে জড়িত আঁখি দুটি
নয়নের পরে রেখে মোর,
কি যেন বলিতে গেল শুধু
কণ্ঠে কই ভাষা নাহি ওর!
নীরবে দেখায়ে দিনু ঘর
মূক সম নিস্তব্ধতা ভরে,
ভোরে উঠে দেখি অপরূপ
অতিথি ত' নাহি মোর ঘরে।
স্মৃতিচিহ্ন কিবা রেখে গেছে
আজি কেন এ কথাটি বাজে,
অশ্রুভরা চোখে দেখি চেয়ে—
কেয়াফুল কুটিরের মাঝে।

সঙ্কলিকা

দুর্ব্বলের বল—

রক্তহীন দুর্ব্বলতম জাতিরও ত্রাণ রক্ষার জন্য অহিংস আন্দোলন। স্ত্রীলোকদিগকে দুর্ব্বলতার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াই ধার্য্য করিয়া আসা হইয়াছে। দেহের দিক দিয়া দেখিতে গেলে দুর্ব্বল হইলেও আত্মা ও মনের দিক দিয়া তাঁহারা বলবত্তমের অপেক্ষাও বলবতী হইতে পারেন। চরকা তাহার যাবতীয় ফলিতার্থের সহিত আধুনিক ভারতীয় পুরুষ ও নারীর অহিংস বলের মূর্ত্তিমান প্রতিভূ। এই আশ্চর্য্য চক্রকে অস্ত্ররূপে ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করিলে গ্রেটব্রিটেন্ ভারতের সহিত তাহার কেবলমাত্র স্বার্থপর সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইবে। তখনই ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের সংযোগ পবিত্র ও নিঃস্বার্থ হইয়া জগতের মঙ্গলের জন্য হইবে। ভারতীয় নরনারী, বিশেষ করিয়া নারীগণ চরকায় সূতা কাটা.ক নিজেদের দৈনিক কর্ত্তব্যরূপে গ্রহণ করিলে আমাদের দেশের দুর্ব্বলতম যে মানুষটী, তাহারও স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁহারা নিজেদের পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিলেন ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। (এম্, কে, গান্ধী)। —ভারতী।

দেশ মা—

রব উঠেছে সারাটা ভারত জুড়ে "দেশ মা।" অযুত কণ্ঠে—মায়ের আগমনী গান, বন্দনা—বন্দে মাতরম্। তবু ত' কই এলনা মা, দেখা ত' দিল না শস্যশ্যামা সুজলা সুফলা মা।

* * *

শুধু মা আসেনা। প্রতিমা চাই, মন্ত্র চাই, পূজা চাই। * * * প্রতিমার পদতলে ব'সে আসমুদ্রহিমাচলবাসী অগণিত ভাই বোনের ভক্তি নম্র হৃদয়ে, শ্রদ্ধানত মস্তকে, বাষ্পাকুল নয়নে, জাতিধর্ম্ম ভুলে গিয়ে "মায়ের সন্তান" পরিচয়ে, আগমনী গাইতে হবে। চালচিত্রে থাক্‌বে বঙ্কিম, * * * গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, মহম্মদ, সৌকৎ, মতিলাল, তিলক। মায়ের প্রসাদ, মায়ের সন্তান সবাই কাড়াকাড়ি ক'রে পাশাপাশি ব'সে খাবে। হিন্দু নাই, মুসলমান নাই, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, জৈন কেহ নাই—সবার এক পরিচয়—সবার ঐ এক মা, দেশ মা, সবাই ঐ এক মায়ের সন্তান * * *। তবেই মা আসবে মা, তবেই মা আমাদের পূজা সার্থক হবে—তবেই না কবির কথা সফল হবে—আমরা আমাদের চক্ষের সম্মুখে দেখব—

"এই প্রধূমিতা, প্রজ্জলিতা, রক্ত স্রোতস্বতী ভৈরবী ভারত-ভূমির পরিবর্ত্তে এক রত্নালঙ্কারা, সঙ্গীতমুখরা হাস্যময়ী জননী; জলধি হ'তে জলধি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য।"

যতদিন না আমাদের দেশে দেশমায়ের পূজার প্রচলন হয়, যতদিন না আমরা * * * অধীর আগ্রহে দেশমাকে আবাহন ও চোখের জলে বিসর্জ্জন ক'র্ত্তে না শিখি, ততদিন গান্ধীর মত অবতার চিত্তরঞ্জনের মত দেশপ্রাণ, মহম্মদ সৌকৎএর মত উদার বীর বৃথাই আমাদের জাতির মিলনের জন্য সর্ব্ববিধ দুঃখ যন্ত্রণা বরণ ক'রে নেবেন।

বিসর্জ্জনের দিন দেশমায়ের চতুর্দ্দোলার চারদিক চার জাতি কাঁধে ধ'রে রাজপথ প্রদক্ষিণ ক'রে যখন গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দেবে, আর অস্তমিত সূর্য্যের শেষ-রশ্মি-উজ্জ্বল গোধূলী বেলায় পরস্পর পরস্পরকে ভাই বলে আলিঙ্গন করবে—সেই দিন, সেই শুভ সন্ধ্যায় আমাদের জাতীয় জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হবে, আর সেই অধ্যায় হ'তে জীবনপুস্তকের প্রতিটী পৃষ্ঠা সাফল্যের ঔজ্জ্বল্যে ঝলমল করবে।

এস দেশের তরুণ তরুণী, এস দেশের কর্ম্মী, এস সেবাধর্ম্মী আমরা দেশমায়ের প্রতিমা গড়ি, পূজা করি, মন্ত্র রচি—এসো।

—সেবা ও সাধনা।

জনসংখ্যার কথা—

ভারতবর্ষের মোট জন সংখ্যা বর্ত্তমানে ৩১৮৯৪২০৮০

ইহার মধ্যে বাংলার সংখ্যা ৪৭৫৯২৪৬২

তন্মধ্যে—

মুসলমান ২৫৪৮৬১২৪, হিন্দু ২০৮০৯১৪৮, এনিমিষ্ট ৮৪৯০৪৫, বৌদ্ধ ২৭৫৫৭৯, খৃষ্টান ১৪৮০৭৫, অন্যান্য ২৩৩১১।

পুরুষের তুলনায় প্রতি হাজার কর. নারীর সংখ্যা—

কুমার ৯৩৮, আগুরী ৯৩৬, নাপিত ৯২৬, বারুই ৯২৫, কামার ৯২৫, সূত্রধর ৯২৩, ধোপা ৯১৪, কলু ৯০১, লোহার ৮৮৪, ময়রা ৮৮৪, তন্তুবায় ৮৮১, মুচি ৮৪৮, শূদ্র ৮৪৩, গোয়ালা ৮০৭, ভুঁইয়া ৮০১, সোণার ৭৯৫, কুর্ম্মী ৭৫২, চামার ৬৪৪, কাহার ৬১৩, সুনিয়া ৫৯৩, গোসাই ৪১৭।

প্রতিহাজার স্ত্রীলোকের তুলনায় সর্ব্বজাতির বিধবার সংখ্যা—

বয়স	হিন্দু	মুসলমান	বৌদ্ধ	খৃষ্টান
১০-১৫	৩৮	১৮	৪	৪
১৫-২০	৯৪	৪১	২৬	২০
২০-২৫	১৫৪	৬১	৪৮	৪৯
২৫-৩০	২৩৬	১০৫	৭৭	৭১
৩০-৩৫	৩৪৩	১৯৬	১১৭	১২৫
৩৫-৪০	৪৫৫	৩২১	১৬৯	১৭৩
৪০-৪৫	৫৭৮	৪৭৮	২৩৫	২৯৯

—প্রাচী।

প্রত্যাবৃত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

(১)

ধীরে ধীরে তরীখানি নদীর কাল জল ভেদ করিয়া সম্মুখে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতেছিল। ক্ষুদ্র তরীর দুই পাশ দিয়া ছল্ ছল্ করিতে করিতে জলের ঢেউ পিছনে সরিয়া যাইতেছিল। দুটি পাশে কেবল কাল ঢেউয়ের সারি। মাথার উপর সুনীল আকাশ। পশ্চিমে সূর্য্য তখন ডুবু ডুবু। লাল আলোর ফিন্কি আসিয়া সমস্ত পৃথিবীটা রঙিন করিয়া তুলিয়াছে।

স্রোতের মুখে ক্ষুদ্র তরী আপনিই ভাসিয়া চলিয়াছে। আরোহী দুটি নীরব হইয়া বসিয়া আছে। বুঝি অনন্তের অসীমতা কল্পনা করিয়া তাহারা দুজনেই নিজেদের হারাইয়া ফেলিয়াছে।

অসীমের পায়ের কাছে দাঁড়খানা পড়িয়া ছিল, সরিতের কোলে তাহার দাঁড় ছিল। আজ তাহারা দুজনেই যেন অসীম পথের যাত্রী, এমনি তাহাদের ভাব। পিছনের ডাক যে আবার তাহাদের বিচলিত করিবে, আবার যে তাহারা ফিরিবে, তাহা তাহারা এখনও ভাবে নাই।

সময় যে চলিয়া যাইতেছে সে দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না। যখন সূর্য্যের আলো একেবারে ডুবিয়া গেল, সন্ধ্যার মলিন ছায়া চারিদিকে ঘনাইয়া আসিল, তখন হঠাৎ সরিত চমকাইয়া উঠিল, তাহার কোল হইতে দাঁড়খানা ছিটকাইয়া পড়িল গিয়া অসীমের গায়ে; অসীমের অসীম ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল, সে ধরমড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহার গায়ে লাগিয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া সরিতের খুব লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সে দিকে একবারও মন না দিয়া সে বলিয়া উঠিল, "আরে যাঃ! এ করেছি কি? কোথায় এসেছি ভাস্তে ভাস্তে?"

অসীম চারিদিকে চোখ ফিরাইয়া বেদনার কথাটা ভুলিয়া গিয়া বলিল, "তাই তো, পাঁচ ছয় ক্রোশের তো কম হবে না বোধ হয়। আমি যে এদিকে কখনও এসেছি তা-তো মনে হচ্ছে না।"

সরিত হতবুদ্ধি ভাবে বলিল, "উপায়? সন্ধ্যে হয়ে এসেছে যে, দিনের আলো থাকলেও না হয় বুদ্ধি খাটানো যেত, যেমন করেই হোক ফিরে যাওয়া যেত। যাই বল ভাই, দোষটা কিন্তু আমাদেরই। বেরিয়েছি সেই বেলা তিনটার সময়, জলখাবারটা পর্য্যন্ত আজ খাওয়া হয় নি। কতবার বলেছি ফিরবার কথা, তুমি সে কথা সাফ কাণেই তোল নি, কেবল বলেছ আর একটু চল দেখা যাক কত দূর কি হয়।"

অসীম লজ্জিত ভাবে বলিল, "হাঁ সত্যি বটে, আমার জন্যই তোমাকে এতটা কষ্ট পেতে হল। আমি ভাই গরীবের ছেলে, সব কষ্ট সহ্য করা অভ্যাস আমার আছে। না হয় আজ এই বোটেই থাকব কিছু না খেয়ে, তাতে ভয় করিনে; কিন্তু ভাবনা হচ্ছে তোমায় নিয়ে, তুমি বড় মানুষের ছেলে, কষ্ট কাকে বলে তা কখনো জান না। বিশেষ তোমার আবার অসুখ প্রায় লেগেই আছে। আজ মাথা ধরা, কাল সর্দ্দি, পরশু জ্বর—"

বাধা দিয়া সরিত বিরক্ত ভাবে বলিয়া উঠিল, "থাম বাপু, আর সে সব কথা পাড়তে হবে না। বড়লোক আর গরীব লোক ওসব আমি বুঝিনে। গরীব লোক তুই তাই বুঝি এই রাত্রে বোটে বসে

থাকতে চাস? ফিরতে গেলেও কাজ হবে না, তা দেখা যাচ্ছে।"

সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল, অসীম মুগ্ধ নয়নে সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে আবৃত গ্রামখানির পানে চাহিয়া বলিল, "দেখ ভাই, কি সুন্দর দেখাচ্ছে এই জায়গাটা।"

সরিত গম্ভীর ভাবে বলিল, "সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হবার সময় এটা নয় অসীম! মাথার উপরে কি বিপদ ঝুলছে দেখছো তা?"

অসীম এবার হাসি রাখিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া ফেলিল। সে ভারি সরল ছিল, হাসিটাও তাহার এত বেশী ছিল যে সময় সময় তাহাকে সরিতের নিকট কানমলা, চড়, কীল পর্য্যন্ত খাইতে হইত। মাথার উপর বিপদ ঝুলিতেছে, সেই বিপদের গুরুত্বটা সরিত যত বেশী অনুভব করিয়াছিল, সে যে ততটা বেশী করে নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

অসীম তখনি মুখখানা গম্ভীর করিয়া ফেলিল, তাহার সৌভাগ্য যে সরিত তাহার হাসি দেখিতে পায় নাই। যদি হাসি দেখিত তাহা হইলে সে খুবই জ্বলিয়া উঠিত তাহাতে একটুও সন্দেহ ছিল না।

সরিত বলিল "সামনের ঘাটে বোট বাঁধা যাক এসো, তার পর গাঁয়ের মধ্যে যাওয়া যাক। যদি কেউ জায়গা দেয় একটু আর একটু ডাল ভাত দেয়, তাই পুণ্যের জোর বলে খেতে হবে। বোটে বসে আকাশ পানে তাকিয়ে থেকে লাভ নেই কিছু অদৃষ্ট পরীক্ষা করা যাক।"

তাহার বীরের মত কথা শুনিয়া অসীমের আবার হাসি পাইতেছিল, কিন্তু অতি কষ্টে হাসি সামলাইয়া বলিল "বেশ, ভাল কথা।"

দুই বন্ধু বোট ফিরাইয়া ঘাটের দিকে লইয়া চলিল।

গ্রাম্য মেটে ঘাট। বৈশাখ মাস সুতরাং গঙ্গার জল একেবারে তলায় নামিয়া গিয়াছে। ঘাটের দুইদিকে নানা আগাছা জন্মিয়াছে। বর্ষাকালে এই সমস্ত খাতটা জলে ভাসিয়া উঠে।

সান্ধ্য গগনের রক্তিম আভা গ্রাম্য ঘাটটী তখনো আলো করিয়া ছিল। ঘাটের উপর বাবলা গাছের শ্রেণী বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। অসীম বোট বাঁধিতে বাঁধিতে দুই একবার সেদিকে মুগ্ধ নেত্রে চাহিল কিন্তু শেষে সরিতের তাড়া খাইয়া আর চাহিতে সাহস করিল না।

হঠাৎ পিছনে শিশুর কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া অসীম তাড়াতাড়ি ফিরিতে গেল,—সেই সময় পা-টা সরিয়া গিয়া সে সশব্দে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে খিল খিল হাসিতে সেই নিস্তব্ধ নদীতীর ভরিয়া উঠিল। অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইয়া সে উঠিবার আগেই সরিত আসিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল, সক্রোধে তাহার কাণ ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিল "হ্যাগাবণ্ড কোথাকার, এত দেখেও আশ মেটে না তোর?"

অসীম চাহিয়া দেখিল ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া একটী বালিকা, তাহারই হাত ধরিয়া একটী চার পাঁচ বছরের ছেলে এতবড় লোকটাকে হঠাৎ পড়িতে দেখিয়া হাসিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে। বোধ হয় তাহার জ্ঞান আছে পড়াটা তাহাদেরই একচেটিয়া, তাহারাই পড়ে, তাহারাই কাঁদে। এত বড় লোকটা যে তাহাদের মতই হঠাৎ আছাড় খায়, ইহা দেখিয়া হাসি সামলানো তাহার পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু সেই মেয়েটীর মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। অপরিচিত লোকটী যে পড়িয়া গেল, সে লজ্জাটা আসিয়া যেন তাহাকেই ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। সে মুখে আসিয়া পড়িয়াছে সেই সন্ধ্যার ম্লান দীপ্তি। অসীম একবার মুখ তুলিয়া চাহিল তখনই চোখ নামাইল। সে সৌন্দর্য্য-প্রেমিক, সৌন্দর্য্য দেখার লোভে সে সকল কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত; এ সৌন্দর্য্য একবার দেখিয়াই তাহার সাধ যেন মিটিয়া গেল, সে আর চোখ তুলিতে পারিল না।

সরিত তাহাকে অগ্রসর হইবার জন্য বারবার টিপিতে লাগিল, অনিচ্ছুক ভাবে অসীম পা বাড়াইল।

সে অসঙ্কোচে সেই উচ্চনীচ আঁকাবাঁকা নদীর ঘাট ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে লাগিল, একটুও তাহার পায়ে বাধিল না, মুস্কিলে পড়িয়া গেল বেচারা সরিত। সে পাশের ছোট ছোট আগাছা ধরিয়া অতি সন্তর্পণে উঠিতে লাগিল ভয়, পাছে সে পড়িয়া যায় এবং সকলের কাছে উপহাসাস্পদ হয়।

উপরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বলিল "বাবাঃ, বাঁচা গেল, এমন ভয়ানক ঘাটে মেয়েরা কলসী নিয়ে নামা ওঠা করে কি ক'রে আমি তাই ভাবছি। প্রাণ যেন বেরিয়ে গেছল এখনি।"

অসীম একটু হাসিয়া বলিল "অভ্যাস থাকলে সবই পারা যায়। দেখ না ওই মেয়েটাই কেমন উঠে আসবে'খ'ন। আচ্ছা, ওকেই জিজ্ঞাসা কর না কেন, কোথায় আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে?"

সরিত বলিল "তুমিই জিজ্ঞাসা কর না কেন।"

অসীম হাসিল "বিলক্ষণ। বেশ আমিই করছি।"

সেই মেয়েটী তখন শিশুটীর হাত ধরিয়া ঘাট হইতে উঠিতেছিল। তাহার সহিত দাসীশ্রেণীর একটী স্ত্রীলোক। সে মেয়েটীকে তিরস্কার করিতে করিতে উঠিতেছিল "এই ভরা সন্ধ্যে বেলা, কেন তুমি এসেছ ঘাটে খোকাকে নিয়ে? বাড়ী গিয়ে সব কথা মাকে বলে দিচ্ছি। আমি ঘাটে এনু, ভাবনু কেউ জানতে পারে নি। ও মা মা, কি দস্যি মেয়ে ছেলে গো, অমনি ছুটে এসেছে ঘাটে। এতবড় মেয়ে, একটুকু কি লজ্জাসরমের ধার দিয়ে যায়নি গো!"

আরও কতক্ষণ তাহার বক্তৃতা চলিত বলা যায় না, হঠাৎ সামনে দুটি ভদ্রলোককে দেখিয়া সে থমকিয়া গেল। মেয়েটীকে আগে করিয়া বলিল "হন হন করে বাড়ী পানে ছোট এখন। হাজার বার বলনু তবু—"

অসীম একটু তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া সবে মাত্র বলিয়াছে "ওগো বাছা একটা—"

স্ত্রীলোকটী চীৎকার করিবার উপক্রম করিতেছিল, মেয়েটী তাহাকে এক ধমকে ঠাণ্ডা করিয়া দিয়া অসীমের পানে চাহিয়া সংযত কণ্ঠে বলিল "ওকে বলাও যা না বলাও তাই। আপনার যা বলবার থাকে আমাকে বলুন, আমি শুনছি।"

তাহাকে আরও ভাল করিয়া অনুভব করিয়া অসীম আরও সঙ্কচিত হইয়া পড়িল। দুই একবার ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিয়া ফেলিল "আমরা দুজন সহর হতে বেড়াতে বেরিয়ে অনেক দূরে এসে পড়েছি; আর এখন ফিরতে পারছি নে। এখানে কোথাও জায়গা হবে কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম।"

দাসী কাংস্যকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল "সে আমরা কি জানি বাছা। সোজা পথ রয়েছে, হাজার বাড়ী রয়েছে, দেখে শুনে ঠিক করে নাওগে যাও। আমাদের কাছে কেন বাছা? দীপা দিদি বলছি তোমায়—তাড়াতাড়ি করে চলে এসো, এর পর মার কাছে মুখ খেতে হবে তোমায়।"

দীপালি তাহার দিকে ফিরিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল 'তুই থাম রূপা", অসীমের পানে চাহিয়া বলিল "আপনারা এখানে সুধীরবাবুর বাড়ীতে থাকতে পারেন। বোধ হয় তাঁর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় থাকতে পারে তিনি বহরমপুর কলেজেই পড়েন, এই ছুটিতে বাড়ী এসেছেন।"

আনন্দপূর্ণ কণ্ঠে সরিত বলিয়া উঠিল "আমাদের সুধীর? তাদের গাঁয়ে এসে পড়েছি একেবারে? আচ্ছা, আমরা এখন দেখে নিচ্ছি তাকে। তোমাদের আর বাধা দেব না, তোমরা যাও।"

দীপালি চলিতে চলিতে হাত দিয়া বিপরীত দিকে একটা পথ দেখাইয়া বলিল "ওই পথ দিয়ে যান, সামনেই তাঁদের বাড়ী দেখতে পাবেন।"

বন্ধুদ্বয় সেই পথে চলিয়া গেল।

কৃপাদাসী এতক্ষণ আর কথা কহিতে পারে নাই, এখন বলিল "আচ্ছা দীপাদিদি, কি আক্কেল তোমার? এতবড় মেয়ে হয়েছ থাকলেই না হয় কলকাতায়, তা হলেও আমাদের দেশের মেয়ে তো তুমি। একটু লজ্জাসরমের ধার ধার না? এর চেয়ে আমাদের ছোটলোকের মেয়ে যে হাজার গুণে ভালো বাছা।"

দীপালি কথা কহিল না।

শিশু সমর একবার তাহার হাতখানি ধরিয়া টানিয়া চুপি চুপি বলিল "ওরা কে দিদি?"

দিদিও তেমনি চুপি চুপি উত্তর দিল "জানিনে।"

(ক্রমশঃ)

জাগ গো

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্ভ্রমে স্মরি' অতীত কাহিনী,
নব গৌরব-পুলক ভ'রে;
জাগ গো, জগতজননীর জাতি,
পোহাইল রাতি ধরার' পরে!

ঐ বহে যায় মলয় পবন,
কুসুম-সুরভিময় গো;
ঐ ছুটে আসে নবারুণ-রেখা,
বহ্নির লেখা নয় গো!—
মঙ্গলময়ি! সৃষ্টির হেতু,
জাগরণে তুলে দাও জয়কেতু,
বিজয়-শঙ্খ উঠুক বাজিয়া,
আজি এ বঙ্গে সকল ঘরে!
জাগ গো, জগতজননীর জাতি,
পোহাইল রাতি ধরার' পরে।

বিহগ সকল, কল কোলাহল,
তুলেছে কাননময় গো;
মিলনের মহামন্ত্র ও সব,
বিপ্লব-রব নয় গো!—
মঠ, মন্দির, দেউল সকল,
চূর্ণ ক'রোনা প্রকাশিয়া বল,
স্নেহ-বন্ধনে বাঁধ এ জগত,
শান্তি-শীতল-কমল-করে!
জাগ গো, জগতজননীর জাতি,
পোহাইল রাতি ধরার' পরে।

হাসিয়া আকুল, পুষ্পপুঞ্জ
কুঞ্জ সুরভিময় গো;
দেবতা-চরণে দাও তুলে তাহা,
বিলাসীর করে নয় গো!—
দলগুলি ছিঁড়ে আপনার করে,
ছড়ায়ে দিওনা ধুলায় উপরে,
গাঁথি' মালা, দাও বিশ্বনাথের
কণ্ঠে দুলায়ে আপন করে!
জাগ গো, জগতজননীর জাতি,
পোহাইল রাতি ধরার' পরে।

বিবিধ বার্ত্তা

বালিকার স্বদেশ প্রেম :—

লাহোরের শ্রীযুক্ত ভকতরাম কাপুরের ষোড়শবর্ষীয়া কন্যা সরলা দেবী গত ১৯২১ সালে প্রতিজ্ঞা করেন—জীবনে কখনও খদ্দর ভিন্ন অন্য বস্ত্র পরিধান করিবেন না। তিনি অবিবাহিতা : ভবিষ্যতে বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে এরূপ প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হইতে পারে ভাবিয়া তাঁহার মাতা তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা হইতে নিবৃত্ত রাখিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সরলা দেবী তাহাতে বিচলিত হন নাই। সম্প্রতি সরলা দেবীর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পিতাকে স্বরাজ্য-ভাণ্ডারে একশত টাকা দেবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। শোকাতুর পিতা কন্যার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন।

দেশের ঘরে ঘরে সরলা দেবীর মত আদর্শ কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়া দেশকে ধন্য করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

নারী রক্ষা সমিতি :—

নারীগণকে দুর্ব্বৃত্ত ও লম্পটগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে নারী রক্ষা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সব সমিতি হইতে নারী নির্য্যাতন সম্বন্ধীয় ঘটনার তদন্তের জন্য স্বেচ্ছাসেবক প্রেরিত হইতেছে। যেখানে নারীর উপর অত্যাচার হইবে অথবা হইবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে এই স্বেচ্ছাসেবকগণ নারীগণকে দুর্ব্বৃত্তদের কবল হইতে রক্ষা করিবে ও যাহাতে ভবিষ্যতে আর ঐ প্রকার দুর্ঘটনা না ঘটে তাহার চেষ্টা করিবে।

বাঙ্গলার নারীজাতির উপর দুর্ব্বৃত্তদের উপদ্রব দিন দিন যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক গ্রামে এই প্রকার নারী-রক্ষা সমিতির গঠন হওয়া বিশেষ আবশ্যক বলিয়াই মনে হয়। আশা করি বাঙ্গলার তরুণ সম্প্রদায় এই সব সমিতির স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীতে যোগদান করিয়া তাঁহাদের মা বোনদের ধর্ম্ম রক্ষার্থে সহায়তা করিবেন।

বাঙ্গালী বালিকার কৃতিত্ব :—

পাটনার ইন্‌স্‌পেক্‌টারের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা কুমারী নিত্যলীলা চট্টোপাধ্যায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

বাঙ্গালী বালিকার এ কৃতিত্ব বিশেষ গৌরবের কথা।

দান :—

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও তৎসংলগ্ন অবৈতনিক বালিকা-বিদ্যালয়ের ত্রিতল বাড়ী এবং মন্দির নির্ম্মাণ সাহায্যে সম্প্রতি নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে :—শ্রীধীরেন্দ্রকুমার বসু ৫০০৲, জনৈক ভদ্রলোক ২৫০০৲, দ্বিতীয় ভদ্রলোক ৬০০৲, শ্রীসারদা চরণ কুণ্ড ১০০৲, শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৫০৲, শ্রীকমলকৃষ্ণ কুণ্ডু ১০০, জনৈক মহিলা ১৫০৲।

বিধবা বিবাহ সমিতি :—

ঘাটালের অন্তর্গত ধান্যঘর নামক স্থানে একটি বিধবা বিবাহ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ত্রিপুরার ফুলতলীতে গত ফাল্গুন মাসে চারিটি কায়স্থ, এবং একটি শীলবংশীয়া বিধবার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

মহিলার সম্মান :—

বোম্বাইয়ের শ্রীমতী দিলসাদ বেগম ও শ্রীমতী জগমোহন দাস বারজীবন দাস নানা জনহিতকর কার্য্যের জন্য ইতিপূর্ব্বে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে "ওমেন অফ দি পীস" উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

ইহাদিগকে এই উপাধি প্রদান করিয়া বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট উপযুক্ততা ও নারী-জাতির সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।

শিশু মৃত্যু :—

প্রতি ১৫ মিনিটে একটি করিয়া শিশু ধনুষ্টঙ্কার রোগে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। প্রতি ৩০টি মৃত শিশুর মধ্যে ২৬টি স্বাস্থ্যকর অবস্থায় থাকিলে বাঁচিতে পারিত।

দেশের শিশুদের অবস্থা শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে না কি?

উপেক্ষিতা

(গল্প)

শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় এম্‌-এস্‌-সি ।

আমি তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব। আজকাল নাকি নবজাগরণের যুগ এসেছে, পুরুষ নাকি নারীর নারীত্বের দাম জেনেছে, তার প্রতি কৃত অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে শিখেছে তাই আমার, তাদের কাছে এ দুঃসাহস।

আমি জন্মেছিলাম এক গরীব ব্রাহ্মণের ঘরে, কলিকাতা হতে অনেক দূরে এক পল্লীগ্রামে। বাবার অতি কষ্টে দিন চল্‌ত। বাবার আমার পোষ্য ছিল অনেকগুলি। তাদের দুবেলা দুমুঠা ক্ষুধার অন্নই জুট্‌তনা,—লেখাপড়া বিবাহ ত দূরের কথা!

আমাদের যে গ্রামে বাস সে গ্রামে হিন্দুর সংখ্যা অতি অল্পই ছিল—আর ব্রাহ্মণ মোটে আমরাই একঘর। অল্পাহারে, অল্পাদরে পালিত হ'য়েও বেশ মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠলাম—একদিন লজ্জিত পুলকের সঙ্গে অনুভব কর্‌লাম আমার নারীত্ব!

আর ত' আমায় রাখা চলেনা - এ গলগ্রহকে এইবার যেমন ভাবে হ'ক্‌ বিদায় ক'র্ত্তে হবে। বাবা আমার মস্ত কুলীন, যা'তা' ঘরে বিয়ে কি দিতে পারেন? তাতে যে তাঁর কুলের অমর্য্যাদা! কাজেই আজকাল ক'রে যখন আমি তেরো উত্তীর্ণ হ'তে চললাম, তখন তিনি বেরুলেন গ্রাম ছেড়ে জামাইয়ের সন্ধানে।

প্রায় মাসখানেক পরে আমার নারী-জীবনকে ধন্য আর আমার পিতার কুল উজ্জ্বল কর্ত্তে তাঁর সঙ্গে এক পঞ্চাশ বছরের ··· কি বল্‌ব—এসে দেখা দিলেন। শুনলাম—আগামী ত্রয়োদশী তিথিতে এঁর গলে বরমাল্য দিয়ে আমার নারীত্বকে লাঞ্ছনার হাত হ'তে বাঁচাতে হবে।

মনে যে কি ভাবের উদয় হয়েছিল, তা' বোঝাতে পার্ব্বনা—শুধু এইটুকু বল্লেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে সেদিন বৈকালে পুকুরের নির্জ্জন ঘাটে গা ধুতে ধুতে প্রাণে এক দুর্নিবার ইচ্ছা জেগেছিল জলটা কত শীতল পরীক্ষা করি। দু একবার ডুবেছিলাম কিন্তু কেবলই ভেসে উঠলাম, একেবারে ডোবা হলনা। সন্ধ্যার সময় এক রাশ ভিজে চুল পিঠে ছড়িয়ে, চোখ লাল ক'রে বাড়ী এসে ঢুকলাম। সেইরাত্রেই সুতহিবুকযোগে শুভলগ্নে চার হাত এক হয়ে গেল!

আমি শ্বশুরবাড়ী এলাম। ভোর পাঁচটায় উঠে উঠান ধোয়া, বাসন মাজা, গরুর খড় কাটা, উনানে আগুন দেওয়া হ'তে আরম্ভ ক'রে রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ একা আমাকেই ক'র্ত্তে হ'ত - একটু তার জন্য সহানুভূতি বা প্রশংসমান দৃষ্টি পেতামনা।—এ সব ত' দূরের কথা একটু ভুল হ'লে তীব্র তিরস্কার, বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা, দগ্ধ অদৃষ্টের নিত্যকার পাওনা ছিল।

স্বামী যে কি তা' বুঝলাম না—কারণ তাঁর পদসেবা কর্ব্বার অধিকার এ জীবনে মেলেনি।

তিনি নাকি মস্ত উঁচু কুলীন, আমার বাবার চাইতে উঁচু—কাজেই তিনি আমায় বিবাহ কর্ত্তে পারেন কিন্তু শয্যার অংশ দিতে পারেন না।

অল্পদিন পরে বাবার বড় অসুখের খবর পেয়ে অনেক ব'লে ক'য়ে মাত্র পনেরটী দিনের কড়ারে বাপের বাড়ী গেলাম। আর দিন পাঁচ ছয় পরই আবার ফিরতে হবে।

একদিন বৈকালে ঘাটে গা ধুতে গেছি—দেখি ও পাড়ের গাছের ঝোপের আড়ালে কে গুঁড়ি মেরে ব'সে। গা ধোয়া হ'ল না, ভয়ে ভয়ে চ'লে এলাম।

পরদিন সকালেও সেই মূর্ত্তি, বৈকালেও। আমার মনে দারুণ ত্রাসের সঞ্চার হ'ল। তাইত' এ কে? ভয়ের কথা আরও পাঁচজনকে বললাম—সবাই হেসে উড়িয়ে দিলে।

রাত্রে কি প্রয়োজনে ঘরের বাইরে এসেছি—যমদূতের মত বিকট চেহারার ছুটো রাক্ষস ছদিক হ'তে ছুটে এসে আমায় চেপে ধরলে। আমি হঠাৎ এইভাবে আক্রান্ত হ'য়ে এমন মুহ্যমান হ'য়ে পড়েছিলাম যে গলা দিয়ে আমার একটুও স্বর বেরুল না।

তারা যেন আমায় শূন্যে শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে চল্ল। তখন অন্তিম শ্বাসের সঙ্গে সবটুকু শক্তি প্রয়োগ ক'রে চীৎকার ক'রে উঠলাম—"ওগো কে কোথা আছ, ছুটে এসো, আমায় বাঁচাও।"

আমার চীৎকারে তারা রেগে উঠে, আমায় মাটীতে নামিয়ে আমার মুখে কাপড় গুঁজে দিতে লাগল। কিন্তু তার আগেই আমার চীৎকার গ্রামের প্রতি গৃহে প্রতি লোকের কাণে পৌছেছিল। অনেকে ব্যাপার কি দেখতে ছুটেও এলো—কিন্তু প্রতীকার ক'র্ত্তে কেউ এগিয়ে এলনা—শুধু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল—বড় জোর এ ওর কাণে বল্‌ল—"হেমত আলির লোক!"

হেমত আলি! আমাদের গ্রামের চতুর্দ্দিকে বিশ ক্রোশ জুড়ে এমন লোক নেই যে তার নাম না শুনেছে। তার কাছে অনেক নারীই আজ পর্য্যন্ত লাঞ্ছিতা হয়ে এসেছে। কত হিন্দু মুসলমান মর্য্যাদা রাখবার জন্য ঘরবাড়ী, পৈত্রিক ভিটার মায়া ছেড়ে পালিয়েছে—আর কতক বা তার অত্যাচারে কুলমান খুইয়ে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছে।

আমি তারই বিলাসকক্ষে নীত হচ্ছি! কত কত মর্ম্মন্তুদ কাহিনী, কত সতীর কত কত সতীত্ব রক্ষার জন্য তীব্র চীৎকার, রক্তাক্ত ভূলুণ্ঠিত কত সতীত্বনিধিবঞ্চিত নারীর মৃত্যুমলিন মুখ—সব এক সঙ্গে আমার স্মরণপথে উদয় হ'ল। "বাবা গো" ব'লে চীৎকার ক'রে উঠবার একটা নিষ্ফল প্রয়াস ক'রে আবার আমি মূর্চ্ছিত হয়ে গেলাম।

* * * * * *

অনুনয়, উপেক্ষা, ভয়প্রদর্শন সব অগ্রাহ্য ক'রে হাসতে হাসতে সেই পিশাচ আমার অকলঙ্ক জীবনে গভীর কালীর দাগ লেপে দিল। দুদিন না তিন দিন আমায় তার কক্ষে বন্দী রেখে, আমার যথা সর্ব্বস্ব, আমার একমাত্র অবলম্বনটুকু কেড়ে নিয়ে, ছিন্ন বস্ত্রের মতই আমায় একদিন রাত্রিশেষে পদাঘাতে বাইরে নামিয়ে দিল।

পরিত্রাণ ত মিলেছে; এখন যাই কোথা! আলির ক্ষুধা মিটেছে, তার ঘরে আমার ঠাঁই নাই। পাষণ্ডেরা জোর ক'রে আমায় ধরে বেঁধে তুলে এনেছে, বাবাও আমায় আর নেবেন না। কৌলিন্য মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে এই ভয়ে যিনি শয্যার অংশ পর্য্যন্ত দিতে কাতর ছিলেন তিনি যে আমায় তাঁর ঘরে নেবেন—এ চিন্তা উন্মাদের মনের কোণেও ঠাঁই পায় না।

আমি দাঁড়াই কোথা, করি কি? শাস্ত্রে বলে আত্মহত্যা পাপ,—কতকটা সেজন্য আর কতকটা পারিনি ব'লে—আজও আমি বেঁচে আছি। সকল দুয়ার বন্ধ হ'য়ে গেল যদি, আমি বাঁচি কি ক'রে? আমার ছায়া পর্য্যন্ত লোকে ঘৃণার সঙ্গে পরিত্যাগ করে।, যেন আমি এক নরকের কীট, যেন এক মূর্ত্তিমান অনাচার, আমায় তারা ঘৃণা দেখাবার উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার অবধি খুঁজে পায় না।

অথচ আমার কি অপরাধ! আমি ত' কাতরে তাদের ডেকেছিলাম, কত মিনতি করেছিলাম—তারা তখন ত' তার কোন প্রতিকারই করেনি, আমি একা কত যুঝব?—অথচ আমাকেই শাস্তি ভোগ কর্ত্তে হবে!

এ রকম আমি একা নয়, সারা ভারতের বুক জুড়ে আমার মত হতভাগিনী অনেক আছে। দুর্ব্বৃত্তদের কাছে সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়ে জীবন্মৃত হ'য়ে কোন মতে বেঁচে আছে—এমন অনেক হতভাগীদের কথা আজকাল তোমরা খবরের কাগজে দেখ্‌তে পাও।

কই তোমাদের প্রাণ কাঁদে কি? তাদের বাঁচাতে তোমরা কেউ হাত বাড়িয়ে দিয়েছ কি? আমার মত নারীদের কায়ক্লেশে যাতে পেটটা চলে তার কোনও উপায় ক'রে দিয়েছ কি?

ওগো দেশের তরুণ তরুণী—তোমরা শিক্ষা শিক্ষা ক'রে ত' পাগল—কিন্তু বল দেখি আমাদের এ দুর্দ্দিনে তোমরা কি কর? তোমাদের শিক্ষার সময় ব'য়ে যাবে না, অবরোধ ভাঙ্গবার সুসময় নষ্ট হবে না, কিন্তু আজ যদি এই মুহূর্ত্তে আমাদের মুখের পানে না চাও তা'হ'লে আমাদের মর্ত্তে হবে নয় আরও গুরুতর পাপে লিপ্ত হ'তে হবে—যার নামমাত্র তোমাদের কাছে উচ্চারণ করলে তোমরা ঘৃণায় বদন ফেরাবে।

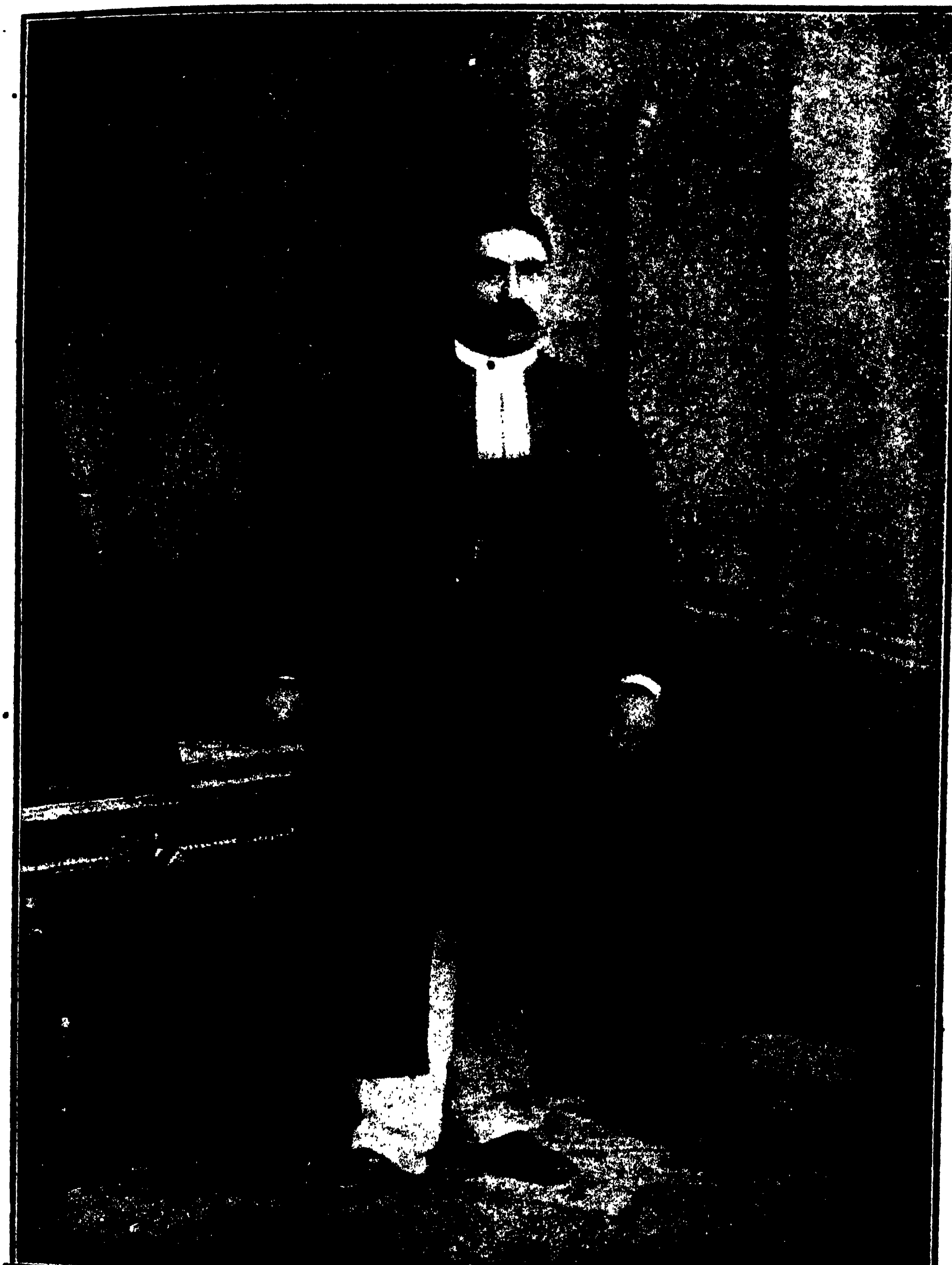
ওগো তরুণ, আমরা ত' তোমাদেরই মাতৃজাতি? লাঞ্ছিতা, অপমানিতা, সর্ব্বস্বঅপহৃতা তোমাদেরই সহদরা ত'? আমাদের মুখপানে একবার চাও। ওগো তরুণী, তোমার কাণে ঘুমভাঙ্গানর গান গেয়ে যে তরুণ তোমায় জাগিয়েছে, তার কাছে তোমার জাতির জন্য একটু করুণা, ভিক্ষা ক'রে নাও!

গান

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

সকলের শেষে পূজিতে তোমায়
মন্দিরে মা গো এসেছি,
বহু আশা নিয়ে তোমার চরণে
অর্ঘ্য আমার এনেছি।
অযুত ভক্ত কণ্ঠে তোমার
পরায়ে দিয়াছে কাঞ্চন হার,
দীন হীন আমি কোথা পাব তাহা?
বনফুলে মালা গেঁথেছি।

চরণকমলে ঢালিব জননী
উছল নয়ন বারি,
বরণ করিব হৃদয় ডালায়
পুলকে পরাণ ভরি;
মন্ত্র জানি না, অন্তর-বাণী
দেব প্রাণ খুলে,—এই শুধু জানি,
আরতি করিতে কোথা হেম-দীপ?
জীবনপ্রদীপ এনেছি।



মহামনীষী ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
(ভারতবর্ষের সৌজন্যে)



২য় বর্ষ { আষাঢ়—১৩৩১ } ৩য় সংখ্যা

আমার মা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

যদি উজল চাঁদ বলে কেউ উচ্চে আমায় তোলে
মা গো আমার ওগো আমার মা,
জানি তুমি আকাশ হবে করতে আমায় কোলে
মা গো আমার ওগো আমার মা।

সাগর তলে ফেলায় যদি মুক্তা আমায় করে,
মা গো আমার ওগো আমার মা,
শুক্তি হয়ে থাকবে তুমি বুকের মাঝে ধরে
মা গো আমার ওগো আমার মা।

নিজের ছায়া সঙ্গ ছাড়ে এলে দুখের নিশি
মা গো আমার ওগো আমার মা,
তোমার মায়া দুঃখে সুখে বক্ষে থাকে মিশি
মা গো আমার ওগো আমার মা।

পঙ্কে যদি ডোবে আমার আত্মা এবং দেহ
মা গো আমার ওগো আমার মা,
আবার মোরে পদ্ম করে ফোটাবে ওই স্নেহ
মা গো আমার ওগো আমার মা।

তুর্কীস্থানে মহিলা জাগরণ*

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য।

ছেলেবেলা হতে শুনে আসছি, মুসলমান স্ত্রীলোকদের ন্যায় এমন পর্দ্দানশীন নারী পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। মুসলমান মেয়েদের চন্দ্র, সূর্য্যও নাকি দেখিতে পারে না, মানুষ ত দূরের কথা। তাই রাস্তায় বেরুবার সময় পর্য্যন্ত "বোরখা" নামে এক অদ্ভুত পোষাক পরে একেবারে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে জগতের এক অদ্ভুত জীব সেজে রাস্তা চলে।

নারী-স্বাধীনতার চরম পন্থি এই ইউরোপে তুরস্ক দেশের মেয়েরা এতদিন ঠিক এমনি পর্দ্দানশীন ছিল। কিন্তু রাতারাতি যখন এই অসূর্য্যম্পশ্যা নারীজাতি বিধাতার কোন মঙ্গলময় সাড়ায় জাগ্রত হয়ে একেবারে পর্দ্দার বাহিরে এসে দেশের বিপদে এতকালের কুসংস্কার ভুলে অসঙ্কোচে পুরুষদের সঙ্গে কাদের কাজ করতে লাগল শুনে আর ঘরে বসে থাকতে পাল্লুম না। আরও অবাক হয়ে গেছলুম শুনে যে, এই জাগরণের মূলে মাত্র ২২ বৎসরের একটী মেয়ে। নাম হামিদা খানুম।

বিধাতার এই বর-কন্যাকে ও তার দেশের মেয়েদের দেখবার জন্য একদিন বাড়ী হতে বেরিয়ে পড়লুম।

রাস্তার কথা বলে আর পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করতে চাইনা। এখন এই মাত্র বলব যে সে সব মেয়েরা যে কি উৎসাহ নিয়ে দেশকে তৈরী করে তুলছে তা নিজ চখে যা দেখেছি তাই বলব।

তুর্কীস্থানে যে একটা ঘোর পরিবর্ত্তন এসে দেখা দিয়েছে তা সেই দেশের মাটিতে পা দিয়াই বুঝতে পারছিলুম। আর একবার এদেশে এসেছিলুম আমার বাবার সঙ্গে। তখন আমার বয়স দশ কি এগার। তখনকার তুরস্কে আর বর্ত্তমানের তুরস্কে রাত দিন তফাত। যাঁরা অতীতের তুরস্ককে দেখেছেন তাঁরা বর্ত্তমানের তুরস্ককে দেখে এটাকে পরীর দেশ না বলে থাকতে পারবেন না। পরীরা যেমন রাতকে দিন এবং দিনকে রাত করে ফেলে এও যেন ঠিক তাই হয়ে গেছে।

রাস্তা ঘাটে ছেলেমেয়েরা চলাফেরা করছে, কোন বাধা নাই। নিজ নিজ সম্মান রক্ষা করে নিজেরা চলছে। মেয়েদের আর "বোরখা" নাই। সেই রাঙ্গা টুকটুকে মেয়েরা নিজ দেশী পোষাক পরে তুর্কী সেণ্ডেল পায়ে দিয়ে কেমন সুন্দর চলে যাচ্ছে। রাস্তার উপর কোন যুবতী পড়লে, যুবক সসম্মানে মাথা হেঁট করে যুবতীর রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছে, কা'রো মুখে কোন কথা নাই। একই গাড়ীতে ছেলেমেয়েরা উঠছে। গাড়ীতে লোকের অত্যন্ত ভীড় হলে যদি কোন মেয়ে সেই গাড়ীতে উঠে একটু জায়গা না পায় তাহলে ছেলেরা বিনা বাক্যে নিজেদের জায়গাটুকু মেয়েটীকে দিয়ে নিজে অতি কষ্টে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরেও জায়গা না থাকলে তারা গাড়ী ফেল করে, তাতে তাদের মনে কোন কষ্ট হয় না। ছেলেরা বন্ধুবান্ধব নিয়ে গাড়ীতে বসে কোন অশ্লীল কথা আলাপ করবার

---

* ইংরেজী হইতে অনুবাদিত। মিস্ পেগী নামে একজন ইংরাজ মহিলা তুরস্কের নারী জাগরণের বার্ত্তা পাইয়া সেখানকার মেয়েদের কার্য্যকলাপ দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি নিজ দেশে ফিরিয়া উপরোক্ত বর্ণনা বিলাতের লেডীজ মেগাজীন (Ladies magagine) নামক পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

সময় যদি কোন মেয়ে সে গাড়ীতে উঠে তাহলে তৎক্ষণাৎ ছেলেরা সে সব অশ্লীল কথা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকে।

তিন চার বৎসর পূর্ব্বে যিনি তুরস্কে এসেছিলেন তিনি এই সব কথা বিশ্বাস করতে চাইবেন না। কিন্তু এসব অতি সত্যি কথা।

এখানে এসেই ঠিক কল্লুম যে হামিদা খানুমের সঙ্গে প্রথম দেখা করব। মনে মনে ভাবছিলুম বড় সহজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারব না। বলতে গেলে তুরস্কের রাজা রাণীর সঙ্গে দেখা করা, না জানি কত দরখাস্তই করে বসে থাকতে হবে।

কিন্তু অবাক হয়ে গেছি তাঁর ব্যবহার দেখে। আমি সুদূর ইংলণ্ড হতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি শুনে নিজে এসে আমাকে নমস্কার করে আপন ঘরে নিয়ে গেলেন। কোন দরখাস্ত করতে হয় নাই। মাত্র ভিজিটিং কার্ড পাঠিয়েছিলুম।

মুসলমান জাতি সাধারণতঃ বড় সৌখীন ও জাঁক জমক প্রিয় জাতি। তার প্রমাণ ভারতের মুসলমান রাজাদের চালচলন। হামিদা খানুমের তা দেখতে পেলুম না। একবারে সাদাসিদে, দেখলে রাণী বলে মনে হয় না। একটী সাধারণ তুর্কী মহিলা বলেই মনে হয়। ঘরখানিতে বিশেষ মূল্যবান আসবাবপত্র ছিল না। অতীতের তুরস্কের বড় বড় যুদ্ধের কয়েকখানি ছবি। নিজ পাঠাগারে তুরস্কের প্রত্যেক জিলার এক একটী মানচিত্র আছে। তিনি রাণীর মত শুধু বসে দিন কাটান না। নিজ কাজ করে খাবারও সময় পান না। সব সময়ই আছেন শুধু দেশের মেয়েদের চিন্তা নিয়ে। দেশের গ্রামে গ্রামে মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় করে দেওয়া হচ্ছে। কোন্‌খানে কত টাকা পাঠাতে হবে, কোন্‌খানে স্কুল হল না এই সব নিয়েই দিন রাত কাটাচ্ছেন।

এই অল্প সময়ের মধ্যেই মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য অনেক গুলি কলেজ তৈরী হয়ে গেছে।

একদিন তিনি নিজে আমাকে সেই সব স্কুল কলেজ দেখাতে নিয়ে গেলেন। প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বিঘা জমির উপর সেই বিদ্যামন্দির তৈরী করা হয়েছে। চারিদিকে খুব উচ্চ প্রাচীর। তার ভিতরে সব। মেয়েদের বোর্ডিং, কলেজ, খেলার মাঠ, সাঁতার কাটবার পুষ্করিণী ইত্যাদি সেই দেওয়ালের ভিতরে। বোর্ডিংএ যেসব মেয়ে দেখলুম—তাদের বড় একটা বাবুগিরী নাই। কলেজের নিয়ম করা আছে প্রত্যেক মেয়ের কতগুলি কাপড় বা পোষাক রাখতে হবে। পাঠ্যাবস্থায় অত্যন্ত সাদাসিদে ভাবে থাকতে হয়। জেনারেল লাইনে ছেলেমেয়েদের একই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মমত পড়াশুনা বা পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু মেয়েদের কতকগুলি বেশী কাজ শিক্ষা করতে হয়। প্রথমতঃ শিশুদের সেবা শুশ্রূষা করা। তার জন্য ঠিক মেডিকেল কলেজের মত বন্দোবস্ত। প্রত্যেক কলেজের সঙ্গে সঙ্গে এক-একটী অনাথআশ্রম আছে। সেই সব অনাথ-আশ্রমের ছোট্ট ছেলেমেয়েদের নাওয়ান খাওয়ান প্রভৃতি কাজ এই কলেজের মেয়েদের করতে হয়। কি করে শিশুকে নাওয়ালে, খাওয়ালে শরীর ভাল থাকে, কি করলে শিশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকে—"হাইজিন" ক্লাসে শিক্ষা করে এই সব অনাথ শিশু-দের দিয়ে সে সব পরীক্ষা করতে হয়। তারপর গৃহকার্য্যের কথা। বোর্ডিংএর যাবতীয় গৃহকর্ম্ম,যেমন ভাত, তরকারী, রুটী, মাংস তৈরী করা, তরকারী কোটা প্রভৃতি কাজ ছাত্রীদেরই করতে হয়। অবশ্য সাহায্য করবার জন্য চাকরাণী আছে। এক এক দিন দশপনরটী মেয়ে পাক করতে আসে। সেখানেও অধ্যাপিকা আছেন। তিনি তাদের কাজ কর্ম্ম দেখেন। কে কি রকম কাজ করল তা দেখে নম্বর দেন। খুব বড় বড় রাজকর্ম্মচারীদের মেয়েরা এই বোর্ডিংএ আছেন। কিন্তু তাদেরও এ সব করতে হয়। মেয়েদের খাবার বন্দোবস্ত অত্যন্ত ভাল। কারণ দেশে যত প্রকারের ভাল ভাল খাবার বা পাকপ্রণালী আছে, সবই মেয়েদের শিখতে হয়। কাজেই মেয়েদের খাবারও ভাল হয়।

তারপর নার্সিং। যুদ্ধের আহত সৈন্যদের নার্সিংএর কথা বলা হচ্ছে। কি করে ব্যাণ্ডেজ করতে হয়, শরীরের নানা স্থানের নানারূপ ব্যাণ্ডেজ আছে তা শিক্ষা করতে হয়। আহত সৈন্যদের কি করে উষ্ণ পথ্য দিতে হয়, তাও জানতে হয়। এসব অবশ্য যুদ্ধের নিয়মানুসারে শিক্ষা দেওয়া হয়।

এর পর ঘোড়ায় চড়া, সাইকেল, মটরকার চালান খুব ভাল করে শিক্ষা করতে হয়। এসব শিক্ষা করবার জন্যও এই দেওয়ালের ভিতর প্রকাণ্ড মাঠ আছে।

মেয়েদের প্রত্যেককে সাঁতারকাটা শিক্ষা করতে হয়। এ সবের জন্যে মেয়েদের পৃথক পৃথক পোষাক আছে। তা প'রে শিক্ষা করতে হয়। এ সব করে আবার ব্যায়াম করতে হয়।

পড়া শুনা ছেলেমেয়েদের একই, তবে এই কলেজেই মেয়েদের জন্য কতকগুলি টেক্নিকেল বিভাগ আছে। সে সব লাইনে প্রবেশিকা পাশ করেই ভর্ত্তি হওয়া যায়। মেয়েদের জন্যে সর্টহ্যাণ্ড টাইপ রাইটিং, টেলিগ্রাফ, বুককিপিং প্রভৃতি আছে। প্রত্যেক মেয়েকেই সেলাইএর কাজ করতে হয়। তবে যাঁরা জীবিকার জন্য সেলাইএর কাজ শিক্ষা করতে যান, তাঁদের জন্য ড্রেস্ মেকিং বিভাগ আছে। সেখানে নানা প্রকারের ড্রেস তৈরী করা শিক্ষা দেওয়া হয়।

কলেজে যে শুধু আর্টবিভাগ আছে তা নয়। বিজ্ঞান ক্লাসও আছে। ইউরোপের অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক অধ্যাপিকারা এখানে এসেছেন, মেয়েদের প্রাকৃতিক (Practical) ক্লাসের জন্য লেবরেটরী আছে, মেয়েরা সে সব মেশিনে কি সুন্দর কাজ শিক্ষা করছে।

যে সব লোকের দৈনন্দিন আয়ই দৈনন্দিন ব্যয়, তাদের মেয়েছেলেদের জন্য একটী শিল্পাশ্রম খুলা হয়েছে, সে সব মেয়েদেরও শিল্প কার্য্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটু লেখাপড়া শিক্ষা করতে হয়। অন্ততঃ নিজের মাতৃভাষাটাকে একমত শিখে নিতে হয়।

সে শিল্পাশ্রমের কি প্রকাণ্ড বাড়ী। ঘরখানি প্রায় ৭।৮ শত হাত লম্বা। প্রস্থও প্রায় ৩।৪ শত হাত। তার মধ্যে প্রায় ৬।৭ শত মেয়ে মজুর কাজ শিক্ষা করছে। এই শিল্পাশ্রম হতে সুন্দর সুন্দর গালিছা, কার্পেট, লেস, পর্দ্দা, কাপড়, মোজা প্রভৃতি তৈরী হচ্ছে। তুরস্কে এক প্রকার বেত গাছ আছে। ইহা দেখতে বড় সুন্দর, তাকে "লাঙ্কুম" বলে, এই "লাঙ্কুমের" তৈরী, মুসলমানদের টুপী, বড় সুন্দর হচ্ছে। তা ছাড়া, নানা প্রকারের জিনিষপত্র রাখবার পাত্র তৈরী হচ্ছে।

এই আশ্রম একমাত্র হামিদা খানুমের তত্ত্বাবধানে আছে।

কলেজের মেয়েরা আরও অদ্ভুত ত্যাগ স্বীকার করছে। তাদের কি উৎসাহ। এদের দেখে মনে হয় যেন কোন ইলেক্ট্রীক মেশিনের জোরে কাজ করে যাচ্ছে। একটুও ক্লান্তি নাই। কি করে যে দেশের মেয়েদের মানুষ করে তুলবে তাই চিন্তা। জগতত্রাতা যিশুখৃষ্ট যেমন তাঁহার পরম পিতার বাণী পেয়ে আপনি জগতের নরনারীকে তা জানাবার জন্য পাগল হয়েছিলেন এ সব তুর্কী মেয়েরাও যেন তেমনি কি এক মহাবাণী প্রচারের জন্য পাগল হয়ে ছুটছে।

মেয়েরা সহর বাস ত্যাগ করে চিরতরে পল্লীতে চলে যাচ্ছে। তাদের অপরাপর অশিক্ষিত ভগ্নিদের তাদের ন্যায় শিক্ষিত করবার জন্য গ্রামে গ্রামে মেয়ে স্কুল করছে। রাতদিন পরিশ্রম করে তাদের শিক্ষা দিচ্ছে। কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় দৃশ্য।

অল্প দিন হ'ল মেয়েরা Grand National Assemblyতে সদস্য হবার জন্য রাজ সরকারে ডেপুটেসন পাঠিয়েছে, এই Grand National Assembly দ্বারাই রাজ্য শাসিত হয়। মেয়েরা আইন ব্যবসায় এমন কি বিচারবিভাগে অধিকার লাভের জন্যও উঠে পড়ে চেষ্টা করছেন। বৃদ্ধ মন্ত্রিদের

য়ত আপত্তি, নবীনদের পূর্ণ মত। তা নিয়ে আবার মন্ত্রিদের মধ্যে দু দল হয়ে গেছে।

অনেক ঝগড়ার পর এই ঠিক হয়েছে যদি দেশের মেয়েদের বেশী ভাগের মত হয় তাহলে তাদের সদস্য হতে দেওয়া হবে। এখন অশিক্ষিত মেয়েরা লেখাপড়া না জানলে এ সব বিষয় ত বুঝে উঠতে পারবে না, বা কি বিষয়ে ভোট দিতে হবে তা বুঝবেনা। তাই এই সব শিক্ষিত মেয়েরা উঠে পড়ে লেগে গেছেন দেশের মেয়েদের শিক্ষিত করবার জন্যে।

ওঁরা একটা Ladies Congress তৈরী করেছেন, প্রতিবৎসর এই কংগ্রেস দেশের এক এক প্রদেশে বসবে ও তাতে দেশের মহিলারা যথা সাধ্য সম্মিলিত হবেন। উক্ত কংগ্রেসে তাঁদের সকল প্রকারের উন্নতি অবনতির কথা আলোচনা হবে।

এবার সেই কংগ্রেস ঠিক করেছেন যে, যে করেই হউক মেয়েদের মধ্যে হতে Grand National Assemblyর সদস্য হতেই হবে। তারপর সেখানে প্রবেশ লাভ করে নিজেদের ন্যায্য অধিকারসমূহ যাতে লাভ করা যায় তার জন্য যথাসাধ্য বাকযুদ্ধ করা যাবে। এদিকে ধীরে ধীরে দেশের অশিক্ষিতা মেয়েদেরও তৈরী করে দেওয়া যাবে।

এর ফলাফল এখনও কিছু জানা যায় নাই। তবে মেয়েরা যে ভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তাতে তাঁরা যে কৃত-কার্য্য হবেন তার কোন ভুল নাই। একদিন একটি কলেজের ছাত্রীর সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়। মেয়েটীর বয়স সতর আঠার। কথার ধারাটা চলছিল তাদের স্বাধীনতা নিয়ে। মেয়েটী আমাকে বল্লে "দেখুন কাগজে কলমে শুধু পুরুষদের গাল দেওয়ায় কোন কাজ আসে না। যাঁরা বলেন পুরুষ জাতি আমাদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করে রাখছেন তাঁদের এই কথাগুলো নেহাত ভীরু বা কাপুরুষের কথা। কে তার স্বাধীনতা দিতে পারে? সবাইকে নিজের পায়েই ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়। আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার পাচ্ছি না সে আমাদের দোষ। কাজ করলে পাব ত? দু একটী মেয়ে দু কলম লেখা শিখে গেলে ত আর কিছু হল না? এখন চাই দেশের পল্লীর মেয়েদের তৈরী করা, তার পর আমাদের সব অধিকারই আপনি আপনি হয়ে যাবে। কি সাধ্য পুরুষের আমাদের কার্য্যে বাধা দেয়।"

পাঠিকা, এই সতর বৎসরের মেয়েটীর কথা হতেই হয়ত বুঝতে পারছেন যে তুরস্কের নারী সমাজ কত উন্নত হয়ে গেছে।

তুরস্কের স্ত্রী-স্বাধীনতা আর আমাদের ইউরোপীয় স্ত্রী-স্বাধীনতায় অনেক তফাৎ। তুর্কী মেয়েরা ইউরোপীয় স্বাধীনতাকে কথার ভাবে বুঝলুম যে ঘৃণাই করে, তারা আমাদের স্বাধীনতাকে স্বাধীনতা বলেই স্বীকার কর্ত্তে চায় না। এ নাকি এক মাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা।

দেশে আসবার কয়দিন পূর্ব্বে আর একবার হামিদা খানুমের সাথে দেখা করতে যাই। সেদিনও কথায় কথায় আমাদের ইউরোপীয় স্ত্রী স্বাধীনতার কথা উঠল। হামিদা খানুম একটু সঙ্কোচিত হয়ে আমাকে বল্লেন "দেখুন কথাগুলি হয়ত আপনার কাছে অপ্রিয়ই হবে কিন্তু আপনার বার বার প্রশ্ন করায় উত্তরও যে না দিয়ে থাকতে পারছি না। আপনাদের নিকট হতে আমি অনেক সদ্‌গুণ চুরি করেছি। কিন্তু আপনাদের স্বাধীনতাকে আমি একটুও পছন্দ করি না। আপনাদের ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশের মেয়েরা স্বাধীনতার নাম নিয়ে অনেক বীভৎস কাণ্ড করছেন, তা নইলে প্রতিদিন কোর্টে দুই শত তিন শত করে ডাই ভোর্স (তালাক) কেস উঠে কেন? এই কি আপনাদের কোর্টসিপের ফল? ছেলেতে মেয়েতে ভাব হয়ে বিয়ে হয় এটা আমি অত্যন্ত ভালবাসি। কিন্তু এরূপ ভাবকে আমি ভাল বলি না। শুধু পাশবিক কামুকতার উন্মত্ততা।"

"এই যে এমেরিকান ফ্লেনবাইজ দলের মেয়েদের কেহ বলছেন "গর্ভ ধারণ করা বড় লজ্জার কথা।" এই কি স্বাধীনতার আদর্শ? আমরা মায়ের জাত। মাতৃত্বই আমাদের একমাত্র সম্বল। স্বাধীন হতে যেয়ে কি সেই মাতৃত্বকে ঘৃণা করতে শিখব? আমরা পুরুষের সব কাজ করলেও ভুলে যাব না যে আমার ঘরে স্বামী পুত্র ও শ্বশুরশাশুড়ী আছেন। সারাদিন বাইরে পুরুষের মত কাজ করে সন্ধ্যার সময় বাড়ী যেয়ে ঠিক স্বামীর কাছে প্রেমময়ী পত্নী, পুত্রের কাছে স্নেহময়ী মা, ও শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে ভক্তিমতী বধূ হতে ভুলে যাব না। তাদের প্রত্যেকের কাছে আমার যে যে কর্ত্তব্য তা সাধন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁর কথাগুলি শুনে যাচ্ছিলুম। কি নির্ভিক ও যুক্তি সঙ্গত উত্তর। আমার হাঁ না করবার একটুও জো ছিল না এ যে বড় মিথ্যা কথা নয়।

আজ দেশে এসেও বাড়ী বসে ঠিক সেই কথা গুলিই ভাবছি। কি শুনে এলাম আর কি দেখে এলাম। সবই যেন আমার কাছে স্বপ্ন বলে এখন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তুর্কী স্থানের সে সব স্বর্গীয় দৃশ্যাবলী স্বপ্নের ঘোরে দেখে ছিলুম আর আজ হঠাৎ জেগে দেখি যে কিছুই নাই, যে ইংলণ্ড সেই ইংলণ্ড।

আজ বুঝেছি যে, যেখানে ইচ্ছা আছে সেখানে উপায়ও আছে। তুর্কী মেয়েদের ঐকান্তিক ইচ্ছা আছে বলে তাহাদের উপায়ও হয়ে যাচ্ছে।

পূজারিণী

কুমারী সুব্রতাপুরী দেবী।

মন্দিরে ওই বেজে ওঠে শাঁক,
পূজারিণী সবে ছুটিয়া আয়,
তোরা না আসিলে ব্যর্থ সকলি
পূজার লগন বহিয়া যায়।
চারিদিকে আজি খোলা সব দ্বার,
নাহি অন্য কারো প্রবেশাধিকার,
মন্দিরে হের দীপ্ত প্রতিমা
তোমাদের পানে চাহিয়া হায়।

তোরা বিনা বল কে সাজাবে ডালা
দিয়া হেসে প্রাণ বলিদান,
কে রাখিবে বল্ দুর্দ্দিনে এই
আত্ম ভুলিয়া সবার মান?
কোথা নারী বিনা হয় কোন কাজ?
তাই বলি তোরা সেজে আয় আজ!
দীপ্ত ললাটে রক্ত-তিলক,
নিজে এঁকে দিবে ভগবান।

মর্য্যাদা

(গল্প)

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(১)

সে দিন মাতুল মহাশয় যখন মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি আর পেরে উঠছি না, তোমরা অন্যত্র যাবার বন্দোবস্ত কর।"

মা তাঁহার ভ্রাতার মুখের প্রতি একবার চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন "হাঁ" "না" কোন উত্তর দিলেন না।

মাতুল মহাশয় একটু রাগান্বিত ভাবে ও উচ্চ গলায় পুনরায় বলিতে লাগিলেন "দেখ সুশীলা, আমার অবস্থার লোকের যা করা সম্ভব তার চেয়ে অনেক বেশী করেছি, এখন আর পারছি না, তাই তোমাকে তোমার ছেলে নিয়ে অন্যত্র যেতে বলছি। তিন দিন সময় দিলাম, এর মধ্যে যেখানে হোক তোমায় যেতে হবে। শেষ কথা, আমাকে যেন লোক হাসাহাসি কর্ত্তে না হয়। মানে মানে গেলে, কোন কথাই হবে না। তুমিই একটু বুঝে দেখ না।"

এবারও মা কোন জবাব করিলেন না। তাঁহার নয়ন হইতে সকলের অজ্ঞাতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বুঝি অনেক দিন পরে আজ তাঁহার নিভৃত হৃদয়ের ক্ষতস্থান ভেদ করিয়া দুই বিন্দু রক্ত অশ্রু ধারায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার সমস্ত অন্তর বেড়িয়া একটা অসহ অপমান-ভার তাঁহার মস্তককে মৃত্তিকা সংলগ্ন করিয়া আনিতেছিল। পাশের ঘরে বসিয়া আমি পড়িতেছিলাম। অকস্মাৎ মাতুলের অস্বাভাবিক রুক্ষ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া জানালার নিকট গোপনে মুখ রাখিয়া সকল কথা শুনিলাম। আমাকে লইয়াই যে মায়ের এত কষ্ট, এক মুহূর্ত্তের ভিতর সে কথা বুঝিলাম। এতবড় অপমান মা যে কেন মুখ বুজিয়া হজম করিতেছিলেন, তাহা আমার জানিতে বাকি রহিল না। মায়ের পেটের ভাই যে তাঁহাকে একদিন এমনি করিয়া পথে বাহির করিয়া দিতে পারেন মা বোধ হয় কোন দিন তাহা ভাবিতে পারেন নাই, তাই তিনি একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। এখন বেশ বুঝিতে পারিলাম, মার যদি কোন উপায় থাকিত তাহা হইলে তখনই আমার হাত ধরিয়া তিনি বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতেন কিম্বা আমি যদি না থাকিতাম তাহা হইল অভাগিনী জানি না, কোনরূপ অন্যায় উপায় অবলম্বন করিয়া সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রনার হাত হইতে অনেক দিন পূর্ব্বেই নিষ্কৃতি লাভ করিতে মোটেই ইতস্ততঃ করিতেন না। দেখিলাম, মা একবার আমার পড়িবার ঘরের দিকে তাকাইলেন। বোধ হইল এসকল কথা আমি শুনিতে পাইয়াছি কিনা জানিবার জন্যই চাহিলেন। আমি অল্প জানালা ফাঁক করিয়া দেখিতেছিলাম, সুতরাং মা আমাকে দেখিতে পাইলেন না। বরং আমি মাকে বেশ ভালরূপ দেখিতেছিলাম। মার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, এতখানি অপমান মা যে মাথা পাতিয়া লইয়াছেন এ সংবাদটা যেন আমি জানিতে না পারি। আমি জানিতে পারিলে আমার শিশু হৃদয়ে যে নির্ম্মম আঘাত লাগিবে তাহা ভাবিতে তিনি আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিতেছিলেন।

মাতুল বলিলেন "আমাকে যেন একথা আর দ্বিতীয় বার বলতে না হয়।"

এবার মা অত্যন্ত মৃদু অথচ ভার ভার কণ্ঠে উত্তর করিলেন "তুমি ত জান আমার শ্বশুর বাড়ীর কেউ নেই। ইদানিং ভাড়া-ঝাড়ীতে তিনি তাঁর জীবনটা শেষ করে গেছেন। নলিন ছেলেমানুষ, সংসারের কিছু জানে না, এখনো লেখাপড়া কিছু শেখেনি, ও আমাকে নিয়ে কোথায় যায় বল? নলিন আমার একটু কিছু আনতে পারলে আর তোমাকে ভাই আমার ভার নিতে হবে কেন? আমি একলা হ'লে এত কথা বল্‌তাম না। আর দুটো বছর রাখ, নলিন একটু বড় হলে একটা দোকানে টোকানে বলে দিলে যা হউক দুপয়সা আনতে পারবে ত!"

মাতুলমহাশয় এবার তাঁহার মস্তিষ্ক ঠিক রাখিতে পারিলেন না, তিনি অত্যন্ত রাগিয়া গিয়া বলিলেন "ওসব কথা আমি শুনতে চাই নে, স্যাদা কথা, আমি পারব না। তোমাদের পথ দেখতেই হবে। নিজে বাঁচলে বাপের নাম! আমি ছেলেপুলে নিয়ে এখন মরি তারপর ওঁর নলিন বড় হয়ে আমাকে রাজা করবেন! ওসব হবেনা বলছি, বুধবার দিন তোমাকে যেতেই হবে। ভগবান যখন তোমার অদৃষ্টে ঘরবাড়ী দেননি, শ্বশুরবাড়ীর কাউকেই রাখেননি, তখন যেখানে ইচ্ছা সেখানেই যেতে হবে।"

মা বল্লিলেন "আমার হাতে আর কিছুই নেই। আমার শেষ গহনাখানি পর্য্যন্ত তোমাকে দিয়েছি। এখন কি নিয়ে গিয়ে দাঁড়াই বল? আর যাবই বা কোথা?"

আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না। কারণ তখন সবে মাত্র যৌবনে পা দিতেছি, বয়স পনের বছর হইবে। মাস খানেক হইল দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পাইয়াছি। একটা আত্মসম্ভ্রম-বোধ বেশ ভিতরে ভিতরে সাড়া দিয়া উঠিতেছিল। আমি তাড়াতাড়ি সেখানে আসিয়া, বলিলাম "মা, আমার অনেক লেখাপড়া শেখা হয়েছে। অনেক ছেলের যে এতখানিও হয় না; আর পড়ার দরকার নেই, আমি আজই চাকরী করতে যাব। তিন দিনের ভিতর চাকরী ঠিক করে এসে তোমাকে নিশ্চয় নিয়ে যাব।" এতগুলো কথা যে মামার সম্মুখে গুছাইয়া বলিতে পারিব এমন বিশ্বাস বা সাহস কোন দিন আমার ছিল না। সুতরাং কে যে আমার মুখ দিয়া খাঁটি সত্য কথাগুলি বলাইয়া দিয়াছিল তখন তার প্রকৃত সন্ধান না পাইলেও সে যে আমার অন্তরের ভিতর ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মাতুল খুব গম্ভীর ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "এই ত পুরুষ মানুষের মত কথা, যে নিজে খেতে পায়না তার লেখাপড়া শেখা বিড়ম্বনা।" এই বলিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

মা আমার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেলেন। তখনও আমার হাত পা কাঁপিতেছিল। কি যেন একটা অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনা আমার সমস্ত শরীরের শিরার ভিতর গিয়া তড়িৎ বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। সারাদিন গল্প করিয়া কোন দিন জিহ্বা শুকাইয়া যায় না, আজ এই সামান্য কয়েকটী কথার ভিতর কি এমন শক্তি ছিল, যে আমি অসহ্য পিপাসায় তখনই অস্থির হইয়া উঠিলাম। এতটা বয়সের ভিতর এমন ধারা ভাব ত কোন দিন অনুভব করি নাই! হঠাৎ মনে হইল যেন রঙ্গমঞ্চের একখানি শরৎ-জ্যোৎস্নার পট পরিবর্ত্তিত হইয়া নিবিড় মেঘভার সম্বলিত বর্ষার দৃশ্য আসিয়া দর্শকের চক্ষে ধাঁ ধাঁ লাগাইয়া দিল। আমি মার বক্ষে মস্তক রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। তিনি বলিলেন "কাঁদিসনি, ভাবনা কি, এখনো তোর মা মরেনি।" মার উৎসাহ বাক্য যেন মন্ত্রশক্তির মত আমাকে এক নূতন জীবনের পথ দেখাইয়া দিল। এখনও বেশ মনে আছে সেদিন রবিবার। ইস্কুল ছিল না। সমস্ত দিন ধরিয়া মা আমাকে কত বুঝাইলেন কিন্তু আমি বলিলাম "নিজে উপায় করিয়া যদি পড়িতে পারি তবেই পড়িব নতুবা চাকরী করিতেই হইবে।"

মার চাকরীর উপর বড় বিতৃষ্টা ছিল, তিনি বলিলেন "স্বাধীনভাবে পয়সা এনে তুই সংসারী হয়েছিস দেখলে আমার সব কষ্ট দূর হবে। আমাদের যে কোনরূপ ব্যবসা করবার মূলধন নেই, সেজন্য চাকরী করে কিছু টাকা সংগ্রহ কর্ত্তেই হবে।"

আমার কলিকাতা যাওয়াই স্থির হইয়া গেল। পরদিন আমি মায়ের পায়ের ধূলা ও আশীর্ব্বাদ লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। মা আমার চাদরে মহামায়ার প্রসাদ ও পূজার ফুল বাঁধিয়া দিতে ভুলিলেন না।

(২)

পথে আসিতে আসিতে স্থির করিয়াছিলাম, কোন আত্মীয়স্বজনের নিকট যাইব না। যদি ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, যদি অনাহারে মরিতে হয় সেও শ্রেয়ঃ তথাপি পরিচিতের উপেক্ষিত অনুগ্রহ কিছুতেই গ্রহণ করিব না।

কলিকাতা আসিয়াই প্রথমে যাঁহার সহিত পরিচয় হইল তিনি বেশ ফিটফাট সুন্দর যুবক। পরিধানে একখানি দেশী কালাপেড়ে কাপড়, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী তাহাতে সোণার বোতাম, আঙ্গুলে একটী চুনী বসান ফ্রেঞ্চপ্যাটার্ণ আংটী। হাতে হাতীর দাঁতের একগাছি ছড়িও ছিল। এত সব সরঞ্জামের মধ্যে দেখিলাম ভদ্রলোক চাদর ব্যবহার করেন না। লোকটী গৌরবর্ণ, বয়স চব্বিশ পঁচিশ বৎসর হইবে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম তাঁহার নাম সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কথায় কথায় তাঁহার সহিত বেশ আলাপ হইয়া গেল। আমার অবস্থার কথা তাঁহাকে সমস্তই বলিলাম। তিনি আমাকে একটী চা ব্যবসায়ীর নিকট লইয়া গিয়া পরিচিত করিয়া দিলেন।

সুরেনবাবু আমার অবস্থার কথা যেমনটী শুনিয়াছিলেন ভদ্রলোককে ঠিক সেইরূপ বর্ণনা করিলেন। আমার মত একজন লোককে এতখানি বিশ্বাস যদি সুরেনবাবু সেদিন না করিতেন, তাহা হইলে আমার যে কি পরিণাম হইত তাহা বলিতে পারি না। সুরেনবাবু আমাকে যে ভদ্রলোকটীর নিকট লইয়া গিয়াছিলেন তিনি থাকিতেন মাণিকতলা ষ্ট্রীটে। যে বাড়ীতে তিনি থাকিতেন, সেখানি ছোট হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নীচের ঘর দুইটী বড় রাস্তার ধারে বলিয়া দোকানদারদের ভাড়া দেওয়া ছিল। দোতলার একখানি ঘরে তাঁহার বৈঠকখানা, সেই ঘরেই সুরেনবাবু আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। বৈঠকখানাঘরের মাঝে একটী দরজা ছিল। সেই দরজা দিয়া অন্দরমহলে যাইতে হয়। দরজাটা বোধ হয় সর্ব্বদা খোলা থাকিত সেইজন্য একখানি লাল ও নীলবর্ণের ডোরাকাটা পর্দ্দা টাঙ্গানো ছিল। ঘরের আসবাবপত্র দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম লোকটী বেশ সৌখীন। আমার ইতিহাস শুনিতে শুনিতে তিনি অনেকবার বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে আমার মুখের প্রতি দেখিতেছিলেন। একবার দেখিলাম, যেন আলোক সম্পাতে তাঁহার নয়নকোণে দুইটী বড় বড় অশ্রুকণা হীরক খণ্ডের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন "এখানে আপনার কেউ পরিচিত লোক আছেন?" আমি বলিলাম "অনেক আছেন কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমি দেখা করতে প্রস্তুত নই। আপনার মনের মধ্যে যদি কোনরূপ অবিশ্বাস এসে থাকে তবে আমি চলে যেতে পারি।" এইকথা বলিয়া যেমন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি এমন সময় ভিতর হইতে কে যেন সেই পর্দ্দাখানি নাড়িয়া শব্দ করিয়া গৃহ স্বামীকে ভিতরে আহ্বান করিলেন। তিনি বলিলেন, "একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আসছি।" ভদ্রলোক ভিতরে চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চাকর দুইখানি রেকাবীতে সুরেনবাবু ও আমার জন্য জলখাবার আনিয়া দিল। তিনি বলিলেন "একটু জল খান।"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া সুরেন বাবু বলিলেন "এমন বোকা ছেলে দেখিনি ত? যতখানি সৌভাগ্য এগিয়ে এসেছে তাকে সমাদর

করে না'নিলে আবার অনেকখানি তফাতে পেছিয়ে পড়বে।" কথা কয়টি বলিয়াই তিনি জলযোগে মন সংযোগ করিলেন। জলযোগান্তে সুরেনবাবু বলিলেন "এখন আসি, ছোকরার যাহোক একটা ব্যবস্থা করবেন।"

ভদ্রলোকের নাম পরেশচন্দ্র বসু। তিনি বোধহয় ভিতর হইতে আমাকে রাখিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিলেন। এবার আর অন্য প্রশ্ন না করিয়া বলিলেন—"বেশ, আপনি আমার ছেলেকে পড়াবেন। আমার বাড়ীতেই থাকবেন, মাসে মাসে আপনার মাকে ৭৲ টাকা করে পাঠালে হবে ত ?"

অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিলাম "আপনি যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন কিন্তু আপনি বোধ হয় বিস্মৃত হ'য়েছেন যে, আমাদের থাকবার জায়গা নেই, মা কোথায় থাকবেন ?" বলিতে বলিতে আমার কণ্ঠস্বর বাষ্পভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

এমন সময় একটী অষ্টমবর্ষীয় বালক পর্দা ঠেলিয়া আসিয়া বলিল "আমাদের বাড়ী থাকবেন।"

আমি অত্যন্ত আগ্রহ ও স্নেহভরে ছেলেটীকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলাম "খোকা তোমার নাম কি ?"

ছেলেটী তাহার এক মাথা কোঁকড়া চুল দুলাইয়া একগাল হাসিয়া উত্তর করিল আমার নাম "সুধাংশু কুমার। আপনি আমাকে মারবেন না ত ? মা বলেছেন, পড়া না করলে খুব মারবেন মাষ্টার বাবু, হ্যাঁ মাষ্টার বাবু আপনি আমাকে মারবেন ?"

আমি পুনরায় সাদরে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলাম "না মারব কেন, তুমি ভাল হয়ে পড়া করবে ত ?"

পরেশবাবু বলিলেন "তাহলে সুধাংশু ত বলেই দিয়াছে, আপনি আপনার মাকে এখানে নিয়ে আসুন, আমি আপনাকে মাসিক ২০৲ টাকা করে দেব, আপনি সকালে বিকালে সুধাংশুকে পড়াবেন এবং দুপুর বেলা আমার চা'য়ের কার্য্য দেখবেন।"

সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। সুধাংশুর জননী আমাকে ছেলের মত যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন এবং পরদিন আমার মাকে আনিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমি মাকে আনিয়া সুধাংশুকে পড়াইতে লাগিলাম।

(৩)

পূজার আর দশ বার দিন বিলম্ব আছে। বাঙ্গালা মুলুকটা যেন শত দৈন্যের মধ্যে, সহস্র ব্যাধি ও শোকের ভিতরও অকস্মাৎ একটা অভাবনীয় আনন্দের রসাস্বাদ করিয়া মাতিয়া উঠিতেছিল। শরতের লঘু শুভ্র খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি ব্যস্তভাবে এদিকে ওদিকে ছুটাছুটী আরম্ভ করিয়াছে। মেঘ ও রৌদ্রের মধ্যে হঠাৎ যেন একটী সন্ধি কখন হইয়া গিয়াছে। বর্ষার রজনীগন্ধা শরতের শেফালির কণ্ঠ জড়াইয়া বিদায় প্রার্থনা করিতেছিল। সারা 'বৎসর পরে এসময় যেন পরস্পরের খোঁজ খবর লওয়া বঙ্গবাসীর অস্থিমজ্জাগত ভাব। আমার বাড়ী হইতে আজ পাঁচ বৎসর হইল আমরা কলিকাতা আসিয়াছি, এখন আমি চাকরী ছাড়িয়া দিয়া সকালে একটী মাড়োয়ারীর ছেলেকে পড়াই, তাঁহার নিকট হইতে যে টাকা পাই তাহাতে কম্পাউণ্ডারী পড়ি। উদ্দেশ্য—পাস করিয়া একটী বড় ডাক্তারখানায় কয়েক বৎসর চাকরী করিব, পরে কোন একটী পল্লীগ্রামে গিয়া মায়ের কথামত স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিব।"

পূজার দিন কয়েক থাকিতে মা বলিলেন "তোর মামাকে একখানি পত্র দিস নলিন, অনেক দিন তার কোন খবর পাইনি রে ? ইচ্ছা করে পূজার সময় একবার গিয়ে তাদের দেখে আসি। মার পেটের ভাই, তার জন্য প্রাণটা বড়ই হু হু করে। তার ছেলেপুলে সব কেমন আছে কে জানে ? তুই একবার গেলেও ত পারিস ?"

মা মামার অপরাধের কথা সবই ভুলিয়া ছিলেন।' এইরকম ভাবে আমাকে প্রায়ই তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন।

যে এই নিঃসহায়া বিধবা ভগ্নীকে তাহার সংসারানভিজ্ঞ বালক-পুত্রের সহিত গৃহের বাহির করিয়া দিতে মুহূর্ত্তের জন্য লজ্জা বা নির্দ্দয়তা অনুভব করেন নাই, পুত্র প্রতিপালন ত দূরের কথা— অনাথা, গৃহহীনা ভগিনীকে যে ভাই অনায়াসে তিন দিনের ভিতর গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া না যাইলে অপমান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন, সেই ভাইকে দেখিতে যাইবার জন্য যে ভগিনীর হৃদয় ব্যাকুল হয়- তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবার জন্য মস্তক সততই নত হয়না কি? মায়ের এই উদার হৃদয়ের কথা, তাঁহার এই অকুণ্ঠিত ক্ষমা আমার হৃদয়ে একটি সুধার অবিরল ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল। মনে মনে বলিতাম "মা, তুমি মানবী, না দেবী!"

এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমি তিনবার মামারবাড়ী গিয়াছি মায়ের একান্ত অনুরোধে। পত্রাদি তাঁহাকে নিয়মিতই দেওয়া হত। তিনি অবশ্য উত্তরাদি খুব কমই দিতেন, যাহা দিতেন তাহাও অতি সামান্য- এবং-সব কথাগুলিতেই একটা অবহেলা, একটা ঘৃণার-ভাব যেন মিশান থাকিত। মা কিন্তু মামার সেই উত্তরেই যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিতেন এবং আমার কাছে সেই পত্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিতেন। মামা হয় ত মনে করিতেন— এত চিঠিপত্র লিখে আলাপ করে আবার হয়ত আমরা তাঁহার স্কন্ধে চাপিয়া পড়িব, খুব সম্ভব এ আশঙ্কা তাঁহার যায় নাই। না যাইবার কারণও যথেষ্ট ছিল- অমন করিয়া তাড়াইয়া দেবার পরও আমরা লজ্জাহীনের মত তাঁহাদের তোষামোদ করিয়া সংবাদাদি লইতেছিলাম এটা যে ভগিনীর পবিত্র স্নেহধারা-সম্ভূত—তাহা তিনি কল্পনা করিতেই পারিতেন না।

এই সময় আমি কম্পাউণ্ডারী পাস করিলাম।

যেদিন পাসের খবর বাহির হইল মার আনন্দ রাখিবার স্থান রহিল না। এই সময় একদিন একটী অভাবনীয় আশ্চর্য্য ঘটনা হইল। আমার পিতা তাঁহার পৈত্রিক ভিটাখানি ১০০৲ টাকায় একজনের নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন। তাহা সুদে আসলে অনেক টাকা হইয়া গিয়াছিল, সে জন্য তিনি সে খানির উদ্ধার করিতে কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। যে লোকের নিকট বাড়ীখানি বন্ধক ছিল, তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন "বাবা, আমি কাশীবাস করব স্থির করেছি, অতএব তোমাদের ভিটা তোমরা ফিরিয়ে নাও, আমায় কেবল আসল টাকাটা দিয়ে দাও, সুদে প্রয়োজন নাই।"

আমি তাঁহাকে আমার বর্ত্তমান অবস্থার কথা খুলিয়া বলিলাম। শুনিতে শুনিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া বলিলেন "তোমার কাজকর্ম্ম হ'লে মাসে মাসে যেমন সুবিধা বুঝবে কাশীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিও।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার ছিন্ন তৈলসিক্ত ক্যাম্বিসের ব্যাগ খুলিয়া বাড়ীর বন্ধকীয় খতখানি আমার হাতে দিলেন। আমি বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। "ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন। সময় মত যা পার আমায় পাঠিয়ে দিও বাবা।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

মাকে লইয়া দেশে চলিয়া গেলাম। বাড়ীখানি যথাসাধ্য মেরামত করা হইল। পাড়াপ্রতিবেশীরা খুব আগ্রহ ও আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমি যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। মামাও এ সংবাদ পাইলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কন্যাদায় ও তাহার প্রতীকার

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

বেশী দিনের কথা নহে। বাঙ্গালার এক নিভৃত নীথর পল্লীতে দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা স্নেহলতা যেদিন কন্যাদায়গ্রস্ত মাতাপিতার চিন্তাভার দূর করিবার জন্য জলন্ত হুতাশনে আত্মাহুতি দিয়া জহর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিল, সেদিন একবার বাঙ্গালার হিন্দু সমাজে কন্যাদায়ের প্রতীকার করিবার জন্য সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কত সভা হইল—সমিতি হইল—বক্তৃতা হইল—প্রস্তাব পাশ হইল কিন্তু জলবুদ্বুদের ন্যায় হুজুক কয়েকদিনেই নিভিয়া গেল। তদবধি কতশত স্নেহলতা যে জলন্ত আগুনে পুড়িয়া মরিতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কই? সমাজ ত তাহার প্রতীকার করিবার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিতেছে না!

হিন্দুসমাজের কন্যারা হইতেছে আঙ্গুর ফল আর ছেলেরা সব কাবুলী মেওয়া। আঙ্গুর ফল অতি যত্নে কৌটায় পুরিয়া রাখিলেও বেশীদিন থাকে না, তাই ভয়ে ভয়ে যে দামেই হৌক তাহাকে বিক্রয় করিতে হয়! কিন্তু কাবুলী মেওয়ার ত আর সে ভয় নেই! তাইতে বোধ হয় হিন্দু-বালিকার বয়স ১১ স্থলে ১২ হইবামাত্র মনুর বিধান লঙ্ঘন-জনিত পাপার্ণবে পড়িবার ভয়ে কন্যার পিতা যে ভাবেই পারেন তাহাকে পাত্রস্থা করিবার জন্য চেষ্টিত হন। এই যে দুর্ব্বলতা, এই দুর্ব্বলতা সমাজ হইতে না গেলে কন্যাদায় যে হ্রাস হইবে এমন ধারণা আমাদের নাই। পূর্ব্বে কুলীনের ঘরে আমরণ কত নারী অবিবাহিতা অবস্থায় থাকিত, এখনও কোথাও কোথাও থাকে। ঘরে ঘরে বয়স্থা বিধবা-কন্যাও অনেকের আছে; কই তাহাতে ত কাহারও জাতি যায় না! তবে কেন মেয়েদিগকে বেশী বয়স পর্য্যন্ত ঘরে রাখিতে কন্যার পিতারা ভয় পান? এই ভয় পান বলিয়াই ত ছেলের দল তাঁহাদিগকে পাইয়া বসে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশ অনুসারে যে যেমন পারে চুষিয়া লয়। বাল্যবিবাহের অনুকূলে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী যতই প্রমাণ প্রয়োগ দেখান না কেন বাল্যবিবাহের ফলে দেশে স্ত্রী-শিক্ষার যেমন একদিকে ব্যাঘাত হইতেছে, অন্যদিকে অল্প বয়সে বালিকারা প্রসূতি হওয়ায় সন্তান সন্ততি অল্পায়ুঃ, কৃশ, ক্ষীণ, দুর্ব্বলকায় ও মেধাহীন হইয়া পড়িতেছে। বালিকাগণকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না দিয়া ঘরে রাখিলে একদিকে যেমন তাহাদের শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইবে, অন্যদিকে তাহারা একটু বেশী বয়সে স্বামী-গৃহে যাইয়া সংসারের কাজ কর্ম্মও বেশ গোছাইয়া লইতে পারে।

কোন দেশই চিরন্তন নিয়ম বা প্রথার অনুকরণ করিয়া চলিতে পারে না। দেশ কাল পাত্র ভেদে সামাজিক রীতি নীতি প্রথারও পরিবর্ত্তন করিতে হয়। আমরা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে মনুর যে অনুশাসনকে বেদবাক্য বলিয়া মাথা পাতিয়া লইয়া বাল্যবিবাহ দিয়াছি, সে ব্যবস্থা বর্ত্তমান যুগে চালাইতে গেলে বর্ত্তমান জগতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া আমরা কখনই বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। কাজেই বালিকা-বিবাহ একেবারে সমূলে উৎপাটিত করিয়া প্রত্যেক মেয়েকে উচ্চ শিক্ষা দিতে হইবে—যাহাতে তাহাদের মনে একটা "মনুষ্যত্ব"-বুদ্ধি জাগে, এবং তাহারা পুরুষের শুধু ক্রীড়নক হইয়া সংসারে ভারবাহী গর্দ্দভের মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ না করে। দেশের সমস্ত মেয়ের মা-বাপ যদি ছেলেদের দ্বারে দ্বারে টাকার তোড়া হাতে করিয়া কন্যা সম্প্রদানের জন্য তোষামোদ না করেন,

সকলেই যদি এক জোটবদ্ধ হন, তবে ক'দিন এই কুব্যবস্থা সমাজে থাকিতে পারে ?

কন্যাদায়ের আর একটা প্রতীকারের প্রধান উপায় রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে আদান প্রদান। সমাজের মধ্যে যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থাক্ বা বর্ণ আছে তাহা তুলিয়া দিয়া সকলেই অবাধে পরস্পরের মধ্যে কন্যা-পুত্র আদান প্রদান করিতে পারিলে কন্যাদায় অনেকটা কমিতে পারে। এখন কুলীনের ঘরের ছেলে বংশজের অথবা শ্রোত্রীয়ের ঘরের কন্যা বিবাহ করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহাদের কৌলীন্যমর্য্যাদা নাকি বাড়ে, কিন্তু বংশজ বা শ্রোত্রীয়ের ঘরে তাঁহারা কন্যা দিতে পারেন না—তাঁহাদিগকে স্বঘরেই কন্যা সম্প্রদান করিতে হয়। ইহার ফলে কুলীনের ঘরে অবিবাহিতা কন্যার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে; আর তাহার ফলে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাসও যে না হইতেছে এমন নহে। এই কৌলীন্য প্রথা একেবারে আমাদের জাতির সংখ্যা বৃদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। পূর্ব্বে গুণগত কৌলীন্য ছিল, এখন তাহা গিয়া বংশগত কৌলীন্য হইয়া পড়িয়াছে। ফলে বাধাচরণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র গদাইচরণ মুখোপাধ্যায় গাঁজার দোকান খুলিয়া গাঁজা বিক্রী করিলেও কিংবা চুরি ডাকাতি রাহাজানি করিয়া জীবিকার্জ্জন করিলেও সমাজে কুলীন বলিয়া সম্মানার্হ! একটা জাতির পক্ষে এরূপ বংশগত কু-সংস্কার জাতির উন্নতির পক্ষে ঘোর পরিপন্থী!

পূর্ব্বে আমাদের দেশে নারীর একটা মর্য্যাদা ছিল। স্বয়ম্বর প্রথা যখন প্রচলিত ছিল, তখন এক একটা রাজকুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য কত রাজা, মহারাজা, যোদ্ধা ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া তবে বিবাহ করিবার অধিকারী হইতেন। যে দিন হইতে নারীর এই সম্মান সমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে—নারীকে যে দিন পুরুষের "দাসী"র স্থলে অভিষিক্ত করা হইয়াছে সেই দিন হইতে কাল পণপ্রথা জগদ্দল পাথরের মত মেয়েদের বুকে চাপিয়া বসিয়াছে। পুরুষে বিবাহ করিতে যতবার ইচ্ছা, মেয়ে দেখিবে, সে কালা কি অন্ধ, খঞ্জ কি পঙ্গু কতপ্রকারে তাহার পরীক্ষা লইবে, কিন্তু মেয়েদের তাহার শতাংশের একাংশও অধিকার নাই। নারীর স্বাধীনতা হরণের এই যে ব্যবস্থা, ইহাই কি পণ-প্রথা প্রচলনের মূল কারণ নহে? তাহাদিগকে অবলা, সরলা প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া সমাজ তাহাদিগকে এমনই ভাবে অবলা, দুর্ব্বলা করিয়া রাখিয়াছে যে তাহাদের 'টু' শব্দটি করিবার উপায় নাই, ব্যক্তিত্ব বলিয়া কোন জিনিষের ধারণাই তাহারা করিতে পারে না!

নারীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন আর নারীর ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অবসর না দিলে পণপ্রথা কখনই দূর হইবে না।

স্বামী নানারূপ দুষ্কার্য্য করিয়া স্ত্রীকে মারধর করিবে, শাশুড়ী তপ্ত লৌহ শলাকায় গায়ে ছ্যাকা দিবে, ননদিনী তাহার পিতৃপিতামহের উদ্দেশ্যে কত কি অমৃত বর্ষণ করিবে, অথচ সেই স্বামীকে তাহার "পতিরেকো গুরু স্ত্রীনাং" বলিয়া পূজা করিতেই হইবে—এই যে দুর্ব্বলতা, এই দুর্ব্বলতার জন্যই ত আজ পুরুষ উচ্ছৃঙ্খল, যথেচ্ছাচারী আর নারী নিঃসহায়া। কিন্তু পুরুষের ন্যায় নারীর যদি ব্যক্তিত্ব থাকিত তবে কি তাহার উপর স্বামী-শাশুড়ী-ননদিনী এরূপ অত্যাচার করিতে পারে? কখনই নয়। নারী অশিক্ষিতা, নারীকে জগতের জ্ঞানরাশি হইতে একেবারে দূরে অন্ধ তমসাচ্ছন্ন অর্গলবদ্ধ রন্ধনশালায় আবদ্ধ রাখা হয়, তাহার ব্যক্তিত্ব লোপের ইহাই মুখ্য কারণ।

নারীর শক্তি নিতান্ত সামান্য শক্তি নহে। সেই নারীশক্তিকে আজ আমরা উপেক্ষা করিয়া স্বরাজের সৌধ গড়িবার জন্য অগ্রসর হইতেছি। ফলে পদে পদে ভগ্নোদ্যম, পলে পলে হতাশা আমাদের পথের সম্মুখবর্ত্তী হইতেছে। নারীকে যদি শুধু বিলাসের সামগ্রী মনে না করিয়া শক্তিস্বরূপিনী

বলিয়া আমরা মনে করিয়া তাহাকে রাষ্ট্রীয় জীবনের অংশভাগিনী করিতে পারি, তবেই ত আমাদের সাধনা সম্পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন হইয়া সমাধা হয়। বস্তুতঃ নারীর ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব স্ফুরণের উপরেই এই পণপ্রথার মূলোচ্ছেদ নির্ভর করে।

এক একটা বর্ব্বর রাক্ষসপ্রতিম পুরুষ অতি সামান্য কারণে স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া দারান্তর পরিগ্রহ করে, হতভাগী নারীকে যে সারাটি জীবন ইহার জন্য সধবা হইয়াও বিধবার ন্যায় অতি কষ্টে জীবন যাপন করিতে হয়। সমাজ কি নারীর এ দুর্দ্দশা দেখেন না? দেখেন, কিন্তু নারী যে হিন্দু সমাজে ক্রীতদাসা, পুরুষের হাতের ক্রীড়নক। তার প্রতি যত অত্যাচারই হোক না কেন, অম্লান বদনে তাহা সহ্য করাই নাকি "পাতিব্রত" ধর্ম্মের লক্ষণ! যে সমাজে নারীর এইরূপ হীন অবস্থা, একটু মুখ উচু করিয়া কথা কহিবার কিংবা একটু 'টু' শব্দ করিবার তাহার যে সমাজে অধিকার নাই, সে সমাজে টাকা দিয়া ছাগল গরুর মত তাহাকে বিক্রয় করিবে না ত কি করিবে?

নারীকে আজ যদি তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের একটুমাত্র অধিকার দেওয়া হয়, তবে এই পণপ্রথা সমাজ হইতে এক মুহূর্ত্তে উঠিয়া যাইতে পারে। নারী তাহা হইলে জোর গলায় বলিতে পারে—টাকা দিয়া কারও চরণে আজীবনের জন্য বিক্রীত হইব না; বরং আজীবন কুমারী থাকিয়া দেশের সেবা—সমাজের সেবা করিয়া যাইব।

বলি পুরুষেরও ত বিবাহ করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। মেয়েরা যদি সব পণ করিয়া বসে কারও চরণে টাকা দিয়া আত্মবিক্রয় করিব না, তবে কতদিন পুরুষ অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে পারে? বাধ্য হইয়া তাহাকে নারীর নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতেই হইবে।

চাই এই দৃঢ়তা—চাই এই আত্মবিশ্বাস—চাই এই অটল সঙ্কল্প। তবেই ত অত্যাচারী, অর্থ লোলুপ পুরুষের দল সায়েস্তা হইবে। সমাজ নিন্দা করে করুক। দুয়ের সমবায়েই ত সমাজ। সকলে যদি নারীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য একমত হন তবে তাহাই ত সমাজে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। কিন্তু অশিক্ষিত হিন্দুজাতি এ সত্যটুকু বুঝিবে কি?

পণপ্রথা দূর করিবার ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। ছেলের দল সভায় দাঁড়াইয়া হাজার বার প্রতিজ্ঞা করিলেও রজত-কাঞ্চনের লোভ কার্য্যকালে তাহারা কিছুতেই ছাড়িতে পারিবে না। পাত্রের পিতার চরণে আবেদন-নিবেদনের ঝুলি লইয়া হাজারবার কাকুতি-মিনতি করিলেও তাহাদের দয়ার উদ্রেক হইবে না। এ হতভাগা দেশ তা নয়। এ দেশ কেবল আত্মস্বার্থের জন্য প্রস্তুত। পরের জন্য কাঁদিতে, পরের জন্য মরিতে, পরের জন্য ভাবিতে যদি এ দেশ শিখিত তবে কি আজ পরাধীনতার লৌহ-শৃঙ্খল পায়ে পরিয়া এমনই ভাবে জগতের এক প্রান্তে নিতান্ত দীনহীনের ন্যায় কোণঠাসা হইয়া পড়িয়া থাকে!

তবে উপায় কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উপায় একমাত্র আছে—সে উপায় মেয়েদিগকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখিয়া কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া। মেয়ে শিক্ষিতা হইলে কার সাধ্য তাকে অবহেলা করিয়া ত্যাগ করে?

কামমামরণাৎ রক্ষেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবেনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

—ইহাই ত শাস্ত্রের অনুশাসন। মেয়েকে আজীবন অনূঢ়া অবস্থায় ঘরে রাখিবে সেও ভাল, তথাচ তাহাকে কখনও গুণহীন পাত্রের করে সমর্পণ করিবে না।

হিন্দুজাতি, তোমরা ত শাস্ত্রবাক্য পালন কর বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাক, যদি সত্য সত্যই তোমাদের বাক্যে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য থাকে, তবে প্রতিজ্ঞা কর মেয়েকে অবিবাহিতা অবস্থায় ঘরে রাখিবে তথাচ টাকা দিয়া মূর্খ, দুশ্চরিত্র, সার্টিফিকেট-সর্ব্বস্ব কোন জীব-বিশেষের হস্তে

কন্যা রত্ন সমর্পণ করিয়া তাহাকে চির দুঃখ সাগরে ভাসাইবে না।

আজ চেয়ে দেখ অন্য জাতির ইতিহাসের দিকে! কোথাও কোন জাতির মধ্যে এই দুষ্ট পণ-প্রথা নাই—কোন জাতিই ছাগল গরুর মত টাকা দিয়া যার তার হাতে কন্যা সমর্পণ করে না। অপর কোন সমাজে নারীর লাঞ্ছনা—নারীর দুর্গতি নাই, তাই আজ তারা জগতের মাঝে কেমন মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর নারীর লাঞ্ছনা করিয়া—অমর্য্যাদা করিয়া তোমার এই দুর্গতি!

পণ-প্রথা দূর করিতে চাও, মন হইতে নারীর প্রতি হীনভাব দূর করিয়া দাও। তাহাদের মর্য্যাদা রাখিতে শিখ, তাহাদের স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দাও, উচ্চ শিক্ষা দাও, দেখিবে সমাজ হইতে এ পাপ অচিরে দূর হইবে।

কে তুমি আমার ?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

প্রিয়তম,
আজি এই কর্ম্ম হীন শ্রান্ত সন্ধ্যাবেলা
নিতান্ত নিঃসঙ্গ শুধু স্মৃতি নিয়ে খেলা ;
ভাবিতেছি বসে বসে কে তুমি আমার ?
কি সম্বন্ধ তোমা সনে, কি হেতু তোমার
মুখখানি মনে পড়ে রহিয়া রহিয়া
বেদনায় অশ্রু ঝরে রহিয়া রহিয়া !
তুমি কেন প্রাণে মনে সর্ব্ব দেহময়
আপনারে বিস্তারিয়া, করিয়াছ জয়
আমার জীবন মন কর্ম্ম চিন্তারাশি ;
তব প্রেম অনুভূতি, তব অশ্রু হাসি,
তোমার সকল কর্ম্ম সর্ব্ব অপচয়
সব ব্যথা সব দৈন্য সব ক্ষতি ভয়
আমার জীবন মাঝে মোরে লয়ে সাথে
নিয়ত জাগ্রত আছে কেন দিনে রাতে ?

কে তুমি ? কোথায় ছিলে ? আমি কোথাকার ?
দু'দণ্ডের পরিচয়ে হ'লে আপনার,
হৃদয় ভাণ্ডার খুলি দিলে গুপ্ত ধন
কাঙাল হইল ধন্য, তৃপ্ত তনু মন।
তুমি যে হাসিয়াছিলে প্রথম দর্শনে,
সে হাসিটী আজও মোর পড়িতেছে মনে ;
কি কথা কহিয়াছিলে প্রথম কথায়—
কেমনে তোমার বলি বরিলে আমায়,
সব কথা মনে পড়ে ; কিন্তু ভাবি প্রিয়
তুমি কেন নিজে এসে হ'লে বরণীয় ?
পরশ বিধুর করি' বন্টি প্রেমসুধা
কেন তুমি ঘুচাইলে অন্তরের ক্ষুধা ?

যে কথা বলিনি ফুটে কা'রো কাছে আমি
কেমনে তা বুঝে নিলে হে হৃদয়-স্বামি ?

যে গান হয়নি গাওয়া, সুর সাধা যা'র
ছিন্ন-বীণা-তন্ত্রী-পার হলো একাকার ;
আপনার হাতে তুমি সুর দিলে গানে,
মূর্চ্ছনা ছড়ায়ে প'ল সারা মনে প্রাণে!
সে মূর্চ্ছনা কিছু নয় মহিমা তোমার,
শিরা উপশিরাময় হইল আমার !

হে দয়িত, হে প্রাণেশ, হে হৃদয়-স্বামি,
কোন্ কল্পলোক হ'তে আসিলে গো নামি'
মর্ত্ত্য-মানবের এই দুঃখ বেদনাতে—
কেমনে বাঁচিবে তুমি কঠিন আঘাতে?
সারা বিশ্ব খুঁজে তুমি নিলে যে জনায়,
নিশিদিন সেও জাগে প্রেম-কামনায়!
সে চাহে অসীম প্রেম, তোমা হেন ধন,
একি তার প্রগল্‌ভতা তাই ভাবে মন !
সেও ত বিলাতে চায় হৃদয় তাহার,
তা'তে কি পূরিবে সাধ হে প্রিয় তোমার?
অন্তর সম্পদ যদি কিছু থাকে মোর—
সে যে গো তোমার তরে ক্ষুব্ধ আঁখি লোর।
ব্যর্থ বাসনায় হ'ত দীর্ঘশ্বাসে ভরা—
এ প্রাণে, হে প্রাণারাম দেবে কি গো ধরা?

এ বুকের সর্ব্ব ঠাঁই তোমার হিন্দোলা
সর্ব্বক্ষণ চঞ্চলিয়া দিয়ে যায় দোলা,
বুকের শোণিত ধারা তোমার পরশে
জাগিয়া উঠে যে প্রিয় অধীর হরষে,
নয়নে তোমার তৃষ্ণা বাড়িছে কেবল,
হৃদয়ে তোমার ক্ষুধা জাগে অবিরল ;
সারা বুকে তব স্পর্শ অভাবের দুখ
এস প্রিয়, প্রেমময় ক'রো না বিমুখ।
নখরে নখরে জাগে তোমার বিলাস
পঞ্জর ভেদিয়া বহে তোমার নিশ্বাস ;
নয়নে তোমার আলো জগৎ দেখায়,
হৃদয়ে তোমার ভাব আমারে জাগায় !

তুমি যদি আছ প্রিয় সর্ব্বকাল ধরে,
আমারে নিয়ত তব প্রেমকামী ক'রে—
তুমি ছাড়া সত্ত্বা নাই, নাহিক জীবন,
তুমি ছাড়া ভাবহীন নিখিল ভুবন ;
রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ অনুভব
তুমি ছাড়া কিছু নাই, তুমিই ত সব !
সখা, তুমি বন্ধু, তুমি চির কাম্য ধন,
প্রাণের দোসর তুমি অতি প্রিয়জন ;
দয়িত প্রাণেশ তুমি জীবনে মরণে,
আমার এ প্রেম ধন্য তোমার বরণে ;
সব তুমি, তবু কেন অবোধ এ মন,
কে তুমি আমার? তাই ভাবে সর্ব্বখন !

প্রত্যাবৃত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(২)

সরিত ঠিক ভাবিয়াছিল, তাহাদের কপালে আছে গাছতলায় নিশি যাপন আর অনাহারে থাকন, তাহার পরিবর্ত্তে যখন রাজভোগ এবং দ্বিতলের দুগ্ধফেণনিভ শয্যা জুটিল, তখন আনন্দে হৃদয় এত পূর্ণ হইয়া উঠিল যে, সে একবার ভুলিয়া গিয়া ভগবানকে ধন্যবাদও দিয়া ফেলিল।

তাহার মুখে ভগবানের নাম কেহ শুনিতে পাইয়াছে কি না সন্দেহ। সুধীর তাই হাসিয়া বলিল, "নাস্তিকের মুখে আজ যে বড় ভগবানের নাম শোনা যাচ্ছে? অবাক কাণ্ড বটে।"

অসীম বলিল, "গাছতলায় অনাহারে প'ড়ে থাকার বন্দোবস্ত, শেষে জুটল কি না রাজার মত খাওয়া আর এত নরম বিছানা যে লোকে শুতে পারে না; কাজেই কৃতজ্ঞতায় হৃদয়টা ভ'রে উঠেছে কি না, তাই একটা নাম বেরিয়ে গেল।

সরিত বলিল, "যাই বল, সেই মেয়েটাই কিন্তু মূল; নইলে কে জানত যে সুধীর এখানে থাকে। যদিও শুনেছিলুম সুধীরের বাড়ী এখানে কিন্তু অমন বিপদে কি মনে থাকে সে কথা? ধন্যবাদ দেওয়া উচিত তাকেই, কি বল অসীম?"

সুধীর বলিল, "কোন মেয়েটা?"

সরিত অসীমকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, "বল না। কে দীপালি বলে একটী মেয়ে আছে না তোমাদের এখানে—?"

সুধীর একটা আড়মোড়া দিয়া, হাই তুলিয়া বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই দীপালি বলে মেয়েটা? বেশী বয়েস পর্য্যন্ত কুমারী রেখে অতিরিক্ত লেখাপড়া শিখিয়ে তার সৌন্দর্য্য দেখার রোগ হয়েছে বটে। আমি প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা তাকে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। কাছেই বাড়ী কি না, যখন তখন এসে ওইখানেই দাঁড়ায়।"

অসীম বলিল, "অতিরিক্ত লেখাপড়া কি রকম?"

সুধীর বলিল, "মানে খানিকটে পড়েছে যা আমাদের ঘরের মেয়েরা পড়তে পায় না।"

অসীম বলিল "লেখাপড়া শেখাটাকে মন্দ বলতে চাও নাকি তুমি? আমি তো বলি ওই ভালো। মূর্খা নারী নিয়ে সংসারে বাস করা ভারি ঝকমারি। একটা কথা বলতে গেলে তারা ঠিক উল্টো বোঝে। ভাল কথা বল্লে মনে ভাবে খারাপ।"

সরিত ধাঁ করিয়া তাহার পিঠে একটা চড় মারিয়া বসিল। আশ্চর্য্যভাবে অসীম বলিল, "এর মানে?"

সরিত গম্ভীরভাবে বলিল, "অনেকক্ষণ হ'তে একটা আলাদা ভাব আমার সামনে জেগে রয়েছে। আমি দেখছি, তুমি তোমার কর্ত্তব্য জ্ঞান হারাচ্ছ। তোমায় সচেতন ক'রে দিচ্ছি তাই, সাবধান। যাকে যে গ্রহণ করবে, সে মূর্খাই হোক আর শিক্ষিতাই হোক, তাকে নিয়েই জীবন কাটাতে হবে। ফেলবার যখন উপায় নেই, ভুল যখন শোধরানো যাবে না, তখন সে সব কথা তোলাই মিছে।"

সুধীর ইহাদের ভিতরের পরিচয় কিছু জানিত না। এক সঙ্গে বি, এস্, সি পড়িয়াছে—এইমাত্র। সে একটু বিস্মিতভাবে উভয়ের পানে একবার চাহিল।

পরদিন প্রাতে এক কাপ করিয়া চা ও খাবার খাইয়াই উভয় বন্ধু বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল, সুধীর অনেক বলিয়া কহিয়াও তাহাদের রাখিতে পারিল না।

ঘাটের পথ ছাড়াইয়া একটু দূরে একটা লাল রঙের বাড়ী দেখাইয়া সুধীর বলিল, "ওই বাড়ীটাই নরেশ বোসের, দীপালির বাপের।"

অসীম সেইদিকে চাহিল। দ্বিতলের উন্মুক্ত বাতায়নে একখানি সুন্দর মুখ শোভা পাইতেছিল। প্রভাতের অরুণ আলো তাহার মুখের উপর পড়িয়া এক অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে। সে চাহিয়া আছে আকাশের পানে। বুঝি প্রভাত বায়ু সংস্পর্শে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘগুলি ধীরে ধীরে নীল আকাশের কোল দিয়া কেমন করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, তাহাই দেখিতেছিল।

সুধীর তাহাদের বোটে তুলিয়া দিল। দুই বন্ধু হাসির সহিত বিদায় লইয়া নীল জলে তাহাদের বোট ভাসাইল।

সমস্ত পথ উভয়েই নীরব। সরিত নীরবে অসীমের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল, ইহাতে অসীম অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। কি বলিয়া যে প্রথম কথাটা আরম্ভ করিয়া এই নীরব ভাবটাকে দূর করিয়া দিবে সে, তাহা মোটে ভাবিয়া পাইল না।

সম্মুখেই একটা শ্মশান। চিতা তখন ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে, কয়েকটী লোক বিষণ্নভাবে নিকটে দাঁড়াইয়া।

সরিত দাঁড় বাহিতে ক্ষান্ত হইল। একবার সেইদিকে চাহিয়া অসীমের পানে চোখ ফিরাইয়া বলিল "দেখছ?"

বিস্মিত ভাবে অসীম বলিল, "দেখছি।"

সরিত বলিল, "কি দেখছ?"

অসীম বলিল, "চিতা।"

সরিত গম্ভীর ভাবে মাথাটা হেলাইয়া বলিল, 'হ্যাঁ, চিতা। এই দেখছ বাসনা কামনার শেষ? ছোট বেলা হ'তে লক্ষ বাসনা কামনা যে আমাদের মধ্যে জেগে উঠছে, তার শেষ দেখতে পাচ্ছো? চিতা বল্লেই যে কথাটা শেষ হল, মরা বল্লেই যে সেই কথাটার শেষ হল, তা নয়; তার মধ্যে থেকে আগে সত্যটাকে খুঁজে বার করতে হবে। মরা আর চিতা। অর্থাৎ কামনা বাসনা প্রভৃতি পৃথিবীর জিনিসের সঙ্গে সব সম্বন্ধ শেষ। এবার দেখ দেখি চিতাটা।"

অসীম একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, সরিত কেন যে এ কথা বলিতেছে, তাহা সে বেশ বুঝিয়াছে। তাহার হৃদয় বিচলিত হইয়াছে, সরিত সে হৃদয় দৃঢ় করিতে চায়।

নিজেদের ঘাটে পৌঁছাইয়া বোট বাঁধিয়া সরিত উপরে উঠিতে উঠিতে বলিল, "যাও বেশ ক'রে বুঝে দেখ গে আমার কথাগুলো। যদি মন্দ ব'লে বোধ হয় তবে ত্যাগ কোরো আর যদি ভালো ব'লে মনে হয়, গ্রহণ কোরো।"

অসীম নীরবে বাড়ীতে চলিয়া গেল।

সংসারে অসীমের পিতা ললিতবাবু, বিমাতা হেমলতা এবং পত্নী সেবিকা আর ছিলেন বৃদ্ধা ঠাকুরমা।

ললিতবাবু ওকালতি করিতেন, উপার্জ্জন করিতেন মন্দ নয়। অসীম যখন দশমবর্ষীয় বালক তখন তাহার মাতার মৃত্যু হয়। তখন হইতে অনেক ঘটকের আমদানী হইতে থাকে, কিন্তু ললিতবাবু তখন অকম্পিত পদে দণ্ডায়মান। অনেক মেয়ের ফটোও তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কোনও দিকে চোখ দেন নাই, কোনও কথা কাণে তুলেন নাই। অনেকে ইহাতে দোষ দিত মায়ের কেন না তিনি একদিনও ললিতবাবুকে বিবাহ করিবার অনুরোধ করেন নাই। লোকে

সারদার সম্মুখেই তাঁহার নিন্দা করিত, তিনি হাসিতেন আর বলিতেন, "ওগো, তোমরা বুঝবে কি, কেন আমি ললিতকে আর বিয়ে করতে বলিনে? যদি সোণারচাঁদ ছেলেটী না থাকত তার, আমিই যে জোর করে বিয়ে দিতুম। অমন ছেলে রয়েছে, আর পাঁচ সাত বছর গেলে পরে ওরই বিয়ে দিয়ে বউ আনবে ঘরে। দরকার কি ওর বিয়েতে?"

অসীম যখন আই, এস্. সি পড়িতে লাগিল, সেই সময়েই তিনি জোর করিয়া তাহার বিবাহ দিলেন। সেবিকা দরিদ্রের কন্যা। তাহার পিতা তাহাকে কিছু দিতে পারেন নাই। কিন্তু সে রূপবতী। গরীবের ঘরে শিক্ষা তাহার হয় নাই। অসীম শুধু রূপ লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। সে যাহা চায় সেবিকার কাছে তাহা পায় নাই। সেবিকা নামেও সেবিকা কাজেও সেবিকা। একমাত্র সেবাব্রতকেই সে জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল। প্রথম হইতেই অসীম তাহার উপর সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

অসীমের বিবাহের এক বৎসর পরে ললিতবাবু কোথায় মফঃস্বলে গিয়াছিলেন। সাত আট দিন পরে যখন তিনি বাড়ীতে ফিরিলেন তখন তাঁহার সহিত পত্নী হেমলতা। দেখিয়া মাতা শুধু ললাটে করাঘাত করিলেন, অসীম একটু হাসিল মাত্র।

ললিতবাবু প্রথমটা খুব কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই যেমন তেমন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, মেয়েটীর বাপ তাঁরই মক্কেল। বড় বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, মেয়ে এদিকে অষ্টাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, মোকর্দ্দমার দায়ে সর্ব্বস্ব যায়। এমনই সময়ে যখন আসিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল, তখন তিনি তো ছার, পাষাণ হইলেও গলিয়া যাইত।

অনেকে তাঁহার দয়ার যথেষ্ট প্রশংসা করিল, আবার অনেকে তাঁহার নিন্দাও করিল, এই বিবাহ আগে করিলেই ভাল হইত, বলিবার কোনও কথা থাকিত না, এখন শ্মশান পথের যাত্রী যে, তাহার আবার নূতন করিয়া সংসার গড়াইবার সাধ কেন?

হেমলতা স্বামীর গৃহে পদার্পণ করিয়াই সব দেখিয়া লইলেন। আগেই তাঁহার কাজ হইল হিসাবপত্র রাখা। ললিতবাবু আগে যাহা পাইতেন কাজ করিয়া, সব আনিয়া সেবিকার কাছে ফেলিয়া দিতেন। আজকাল সব জমা হয় নূতন গৃহিণীর ভাণ্ডারে।

বি, এস, সি পাশ করিয়া অসীম ওকালতী পড়িতে চলিয়া গেল। এইবার তাহার 'একজামিন্' শেষ হইয়াছে, ছুটিতে সে বাড়ী আসিয়াছে।

কিন্তু বাড়ী তাহার কাছে বড় নিরানন্দময়। স্ত্রী তাহার উপযুক্তা নহে। সে যাহা বলে তাহা কাণেই তুলে না। আর নূতন মায়ের কথা তো বলিবার নয়। সারদার সঙ্গে তাঁহার বিবাদ তো লাগিয়াই আছে। সময় সময় উভয়ের কণ্ঠস্বর এত উচ্চে উঠে যে তাহাকেই অগত্যা মাঝখানে দাঁড়াইতে হয়। যুদ্ধের গোলাগুলি তাহাকেও যে খাইতে হয় এ কথা বলাই বাহুল্য।

আজ যখন সে বাড়ী ফিরিল তখন ললিতবাবু বাহিরের বারাণ্ডায় মক্কেল লইয়া বসিয়াছিলেন। বাড়ীর মধ্যে ওদিকে খুব বিবাদ বাধিয়াছিল। ললিতবাবু পুত্রের পানে একবার চাহিয়া খুব গম্ভীর ভাবে বলিলেন "দিন দিন তোমার হচ্ছে কি অসীম? আজ কাল আবার রাত্রেও—"

মক্কেলের কথায় তাঁহার কথা আর শেষ করিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি সেই দিকে তাঁহাকে ফিরিতে হইল।

অসীম অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল হেমলতা নীচের গৃহের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া সেবিকার উদ্দেশ্যে অজস্র গালি বর্ষণ করিয়া যাইতেছেন। সারদা প্রাঙ্গনে কাপড় মেলিয়া দিতে দিতে এক একটা উত্তর দিতেছেন।

পার্শ্বের গৃহের দরজায় একটী কিশোরী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অসীম প্রবেশ করিতেই সে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অসীম বিমাতার বারাণ্ডায় উঠিতে উঠিতে হাসি মুখে বলিল "কি হয়েছে গো নতুন মা? সকাল বেলা এত ঝগড়া আরম্ভ করেছ কিসের?"

হেমলতা দেখিলেন অসীম ঠাকুরমাকে সম্ভাষণ না করিয়া আগে তাঁহাকেই সম্ভাষণ করিল। অসীম তাঁহার একটু প্রিয়পাত্র হইয়াছিল কারণ সে তাঁহার বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত একটীও কথা বলে নাই। তিনি যাহা বলেন সে তাহাই শুনিয়া যায়। তাঁহার পক্ষ হইয়া কখন কখন সারদার সহিত বিবাদও করে।

তবু মুখখানা অন্ধকার করিয়া বলিলেন "হ্যাঁ, ঝগড়া যে আমিই করি, তা তো বলবেই।"

অসীম ব্যস্তভাবে বলিল "না নতুন মা, আমি সে কথা বলিনে। দুই হাত ভিন্ন কি তালি বাজে? সে যাই হোক, রোজ ভদ্রলোকের বাড়ীতে এ রকম ঝগড়া, এ তো ভাল নয়। এই যে চারিদিকে ভদ্রলোকেরা আছেন, যাঁদের সামনে তোমরা কখনও বার হওনি, যাঁরা তোমাদের পায়ের একটা আঙ্গুল পর্য্যন্ত দেখেননি এ রকম চীৎকার শুনে তাঁরা কি ভাবেন বল ত? আমি সেই জন্যই বলি, নচেৎ আমার বলবার কারণটা কি বল দেখি?"

হেমলতা নরম স্বরে বলিলেন "সে কথা হাজার বার সত্যি বাবা। আমিও কি বুঝতে পারিনে তা? আমি কি সাধে চীৎকার করি? আমায় রাগিয়ে দিলেই আমার চীৎকার আসে। আজকের ঝগড়ার কারণটা বলি শোনো। ঘুম হতে উঠে বাইরে এসে দেখি বউমা ওই থামটাতে হেলান দিয়ে কাঁদছে। বল দেখি, একটা রাত তুমি বাড়ী আসনি, এতে বউয়ের এত কান্না দেখে গা জ্বলে যায় কিনা?"

নিজের স্ত্রীর লজ্জাহীনতায় অসীম জ্বলিয়া উঠিল। সে একটু ঝাঁজের সহিত বলিল "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

হেমলতা বলিলেন "তাতে যদি কথা বলেছি, অমনি মা এসে পড়লেন, কাঁদবে বেশ করবে। আমি সৎমা, আমার কি মায়া দয়া আছে, আমি তো এই চাই যে অসীম মরে যাক, এমনি কত কথা শুনিয়ে দিলেন—"

হেমলতার চোখে জল আসিতেছিল, তিনি অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন "হলুমই বা সৎমা, তাই বলে কি সেই প্রার্থনা করব যে তুমি মরে যাও? আমারই বা আছে কে, যে এ সম্পত্তি ভোগ করবে? বাপমা ছিলেন মরবার সময় তাঁদের সব আমাকেই দিয়ে গেলেন। আমার কি দশটা ছেলে মেয়ে আছে যাদের জন্যে জমিয়ে রাখব? সবই তো তোমারই বাবা, আমি কোথাকার কে?"

চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি গৃহমধ্যে চলিয়া গেলেন। অসীম খানিক বসিয়া থাকিয়া সারদার সন্ধানে গেল।

(৩)

আজ অসীম স্ত্রীর উপর খুব রাগিয়াছিল। একটা সামান্য ছুতার অভাবে সে এতদিন সেবিকাকে কোনও মতে জব্দ করিতে পারে নাই। অনেক দিন সে ছল খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে কিন্তু সেবিকার কার্য্যে কোনও ছল পাওয়া অসম্ভব।

আজ একটা ছুতা পাইয়া সে বিবাহের পরের প্রত্যেক দিনটার কথাই আগাগোড়া ভাবিয়া দেখিল। আজ সেবিকার সব গুণগুলি চাপা পড়িয়া গেল, মূর্ত্তিমান ভাবে ফুটিয়া উঠিল তাহার দোষগুলি। সেগুলি লইয়া অসীম যতই তোলাপাড়া করিতে লাগিল ততই স্ত্রীর উপর তাহার যে অল্প স্নেহটুকু ছিল তাহা সরিয়া যাইতে লাগিল!

শুধু সেবা—আর কিছু নয়?

অসীম ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। কে চায় তাহার সেবা? সে কেন অসীমের মনের মত হইতে পারিল না? কাজের জন্য লোকের অভাব নাই ত? পাচিকা সত্ত্বেও কেন সে রন্ধনগৃহে গিয়া কালিঝুলি মাখিয়া আসে? কাপড়খানা হলুদের

দাগে রঞ্জিত, হাতখানা হলুদের দাগে ভরা। যে যাহার নিজের কাজ করিয়া লইতে পারে সে কেন গিয়া তাহা করে?

আরও একটা প্রধান দোষ বর্ত্তমান যে তাহাতে। সে যে লেখাপড়া জানে না। অসীম চায় তাহার স্ত্রী তাহারই মত ভাবপ্রবণ হইবে, সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহার সমালোচনা করিবে, নূতন নূতন গাথায় কাণ তাঁহার ভরিয়া দিবে। সে বাহির হইতে যাহা বহিয়া আনিবে স্বামীস্ত্রীতে তাহার সমালোচনা করিবে।

জীবনটা তাহার পূর্ণ ছিল সুখের স্বপ্নে। সে কত আশা করিয়াছিল, কত ভাবে হৃদয় পূর্ণ করিয়াছিল। বিবাহের রাত্রেই তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহার আশাকে সে দূরে ফেলিয়াছিল। সে বেশ জানিয়াছিল সে সুখী হইতে পারিবে না।

সামনেই একখানা ফটো ছিল, তাহার বন্ধু ও তাহার পত্নীর। এই বন্ধুটী যেমন শিক্ষিত তেমনি শিক্ষিতা পত্নীও পাইয়াছিল। লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, স্বামীর পার্শ্বে কেমন সে দাঁড়াইয়া আছে। এ ফটোটী বিবাহ-সময়ে তোলা, নববধূর যে একটা কুণ্ঠিত ভাব, তা পর্য্যন্ত তাহার মুখে নাই। আর তাহার স্ত্রী? আজ সুদীর্ঘ চার বৎসর বিবাহ হইয়াছে, এই দীর্ঘকালের মধ্যেও তাহার সঙ্কোচ, তাহার কুণ্ঠা গেল না। তাহার ললাট হইতে সে অবগুণ্ঠন উঠিল না, তাহার মুখের সে লজ্জিত ভাব ঘুচিল না।

সেই ফটোখানা দেখিতে দেখিতে আর একখানা মুখ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। সেই সান্ধ্য অরুণিমা যাহার মুখে পড়িয়া অপরিসীম সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া দিয়াছিল, আর প্রভাতের আলো যাহার মুখের উপর পড়িয়া ঝিক ঝিক করিয়াছিল। প্রভাতের বায়ু যাহার চুলগুলি আনিয়া একবার ললাটে ফেলিতেছিল আবার সরাইয়া দিতেছিল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস অসীম কোনও মতে দমন করিতে পারিল না।

কি সঙ্কোচহীন কথা তাহার? কোথাও একটু বাধে নাই। শিক্ষা এই বটে, অপরিচিত যখন আপনাকে পথহারা ভাবিয়া সামনে দাঁড়ায় তখন অবগুণ্ঠন টানিয়া দূরে পলায়ন কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা সে ভাবে নাই। সে নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে ঠিক।

সঙ্গে সঙ্গে সরিতের কথা মনে জাগিয়া উঠিল। সে চমকিয়া উঠিল আচ্ছা, সরিত তাহার মনের ভাব জানিতে পারিল কিরূপে? তাহার অন্তরের কথা ত সে বাহিরে কাহারও কাছে প্রকাশ করে নাই। সরিত কি অন্তর্য্যামী?

রাত্রি তখন অনেক হইয়া গিয়াছে। দেওয়ালের ঘড়িতে ঠুন ঠুন করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল। অন্য দিন তো সেবিকার এত রাত্রি হয় না। আজ সে নিশ্চয়ই তিরস্কার সহ্য করিবার ভয়ে আসিতেছে না। অসীমের মনটা করুণায় একটু আর্দ্র হইয়া আসিল।

দেখা যায়, যতক্ষণ দোষী ভয় না পায়, আমরা ততক্ষণ তাহার উপর অত্যাচার করি। দোষী ভয় পাইলে স্বতঃই আমাদের মনটায় একটু দয়া হয়।

অসীম ভাবিল যদি সে যথার্থই ভয় পাইয়া থাকে, তবে তাহাকে বেশী কিছু বলিতে হইবে না, কারণ সেটা অত্যন্ত অনুচিত হইবে।

সে একখানা বই টানিয়া লইয়া মনোযোগ দিয়া পড়িতে বসিল। প্রথমটা মন না লাগিলেও তাহার পর কখন যে মনটা তাহাতে বসিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না।

হঠাৎ দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে চুড়ির ঠুন ঠুন শব্দ শুনিয়া সে মুখ তুলিয়া দেখিল সেবিকা আসিয়াছে।

বেশ সহজভাবেই সে টেবিলটার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, সহজ সুরেই বলিল "এখনও

শোওনি যে তুমি? রাতও তো বড় কম হয় নি। অসুখ করতে পারে এত রাত জেগে।"

তাহার সহজ স্বর, কুণ্ঠাহীন মুখের ভাব দেখিয়া অসীম অবাক হইয়া গেল। অপরাধিনীর এ রকম সহজ ভাব কেন? কোথায় স্বামীর রাগত ভাব বুঝিতে পারিয়া পা দুখানা জড়াইয়া ধরিতে যাইবে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, তাহার কিছুই না! যেন কিছুই হয় নাই এমনই ভাব! অসীমের মনটা আবার কঠোর হইয়া উঠিল। না, ক্ষমা করা হইবে না, শাস্তি দেওয়া আবশ্যক।

সে কথা না কহিয়া আবার বইতে মন দিল। সেবিকা আশ্চর্য্যভাবে একটুখানি দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল "আর রাত জেগো না, যাও শোও গে।"

বইখানা বন্ধ করিয়া অসীম স্ত্রীর পানে একবার তীব্র নেত্রে চাহিয়া বলিল "এতক্ষণ কোথায় ছিলে সেবা?"

সেবিকা স্বামীর কথার ভাব কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে বলিল "বাবা আজ তো কিছু খাননি, বড় মাথা ধরেছে তাঁর, তাই মাথা টিপে দিচ্ছিলুম।"

সহজ ভাবে অসীম বলিল "নতুন মা?"

সেবিকা বলিল "তাঁর সঙ্গে বাবার আজ খুব ঝগড়া হয়েছে যে।"

অসীম বলিল "কেন?"

সেবিকা একটু কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল—মাথা নত করিয়া বলিল "অবশ্য আমিই এ সকলের মূল। কাল সেই দুপুরে তুমি কিছু না খেয়ে চলে গেলে। ঝি বললে সে ঘাটে তোমাকে আর সরিত ঠাকুরপোকে বোটে উঠতে দেখেছে। তারপরে সমস্ত দিন গেল, রাত হল, তুমি এলে না, তখন আমার কি অবস্থা হল তা আর কি বলব। ঠাকুর মাকে তবু জানাইনি যে তুমি বোটে গেছ। যদি শুনতেন তাহলে তিনি তখনই আছড়াতেন। বাবাকেও বলতে পারলুম না। বললুম নতুন মাকে। তিনি আমায় যাচ্ছেতাই ব'কে তাড়িয়ে দিলেন। সমস্ত রাত আমার যে কি করে কেটে গেছে তা তুমি বুঝতে পারবে না। সকালে দরজা খুলে বাইরে এসে কিছুতেই চোখের জল রাখতে পারলুম না—ঝি যখন বললে তুমি আসনি। ভোরবেলা নাকি সরিত ঠাকুরপোর বাড়ী হতে লোক এসেছিল তোমরা ফিরে এসেছ কিনা তাই জানবার জন্যে। সকালবেলা তাই নিয়ে ঝগড়া বেধেছিল। বাবা বাড়ী মধ্যে এসে যখন ঠাকুরমার মুখে শুনলেন নতুন মা আমায় খুব বকেছেন, তখন মাকে বকতে লাগলেন। মাও অনেক কথা শুনিয়ে দিলেন। দুজনের কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছেন না। আমি যদি সকাল বেলাই চোখের জল না ফেলতুম—"

বাধা দিয়া তীব্রকণ্ঠে অসীম বলিয়া উঠিল "থাক্ আর সে সব কথা বলতে হবে না। এটা ঠিক্ যে বাবা আর নতুন মার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দেছ তুমিই। আমি দেখছি প্রায় তোমাকে নিয়েই ঝগড়া বাধছে। কেন এরকম হয় তাই আমি শুনতে চাই তোমার কাছে।"

সেবিকার চোখ হঠাৎ জলভারে অবনতা হইয়া পড়িল। সে চুপ করিয়া খানিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার পর রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "কেন যে হয় তা যে আমিই বলতে পারি নে। তোমাকে তা বলব কি করে? আমি যদি জানতুম তা হলে কি ঝগড়া হতে দিতুম? আমার কপালের দোষ।"

উত্তেজিত ভাবে অসীম বলিল "কপাল আবার কি? ও সব মূর্খ লোকের মনকে প্রবোধ দেওয়া মাত্র। একটা অন্যায় কাজ করে বসলে; কেউ সেটা যখন ধরিয়ে দিলে, বলবে অমনই অদৃষ্টে করেছে। অদৃষ্ট কি করতে পারে জিজ্ঞাসা করি? দোষ করবে নিজে, ঘাড়ে ফেলবে অন্যের, এমন স্বভাব কেন?"

সেবিকা কথা কহিতে পারিল না, নীরবে

পদাঙ্গুলি খুঁটিতে লাগিল। স্বামীর নিকট সে কখনও আদর পায় নাই। বিবাহের পরের দিনগুলি সমান একভাবেই কাটিয়া যাইতেছে। আজ হঠাৎ তিরস্কার শুনিয়া সে কি বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

অসীম গম্ভীর স্বরে বলিল "তোমার স্বভাবের জন্যেই তুমি ক্রমাগত আমার কাছ হ'তে দূরে সরে যাচ্ছো। আমি আশা করেছিলুম আমার মনের মত করে তোমাকে গড়ে তুলব; কিন্তু তুমি এমনই অবাধ্য, কিছুতেই যদি আমার কথা শোনো। আমি দেখছি ঠিক আমার বিরুদ্ধ ভাবে চলেছ তুমি। আমি যা চাইলুম তুমি তা কিছুতেই দিলে না আমাকে।"

অশ্রুভরা দুইটী নয়ন স্বামীর মুখের উপর স্থাপন করিয়া সেবিকা বলিল "কি চেয়েছিলে? স্ত্রীর যা দেওয়া উচিত স্বামীকে, দিইছি তা। কি লুকিয়ে রেখেছি আমার মধ্যে?"

বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে অসীম বলিল "কি দিয়েছ! সেবা করছ এই তো? কে চায় তোমার ও লোক দেখানো সেবা? আমি কোনও দিন চেয়েছি তোমার কাছে? আমি তোমায় শিক্ষিতা করতে চাইলুম, নিজে তোমায় শিক্ষা দিতে চাইলুম, আসলে কি তুমি? সংসারের কাজ করবার লোক কি কেউ নেই যে তুমি না হাত দিলে হবে না? আমার যে স্ত্রী হবে সে আমার মনের মত হবে, আমার মতে চলবে। আমি যদি তাকে সংসারের কাজ না করতে দেই, আমি যদি তাকে চেয়ারে বসিয়ে রাখি, তার তাই করতে হবে। তুমি কিসে আমার স্ত্রী? এই রাত্রির সম্পর্কটুকু নিয়ে কি? সমস্ত দিন তোমার নাগাল আমি পাইনে, আমার মনের ভাবা তোমার মনে ঢেলে দিতে পারিনে। কি নিয়ে তুমি আমার স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে চাও বল দেখি?

সেবিকার মুখে কথা ফুটিতেছিল না কিন্তু তাহার অন্তর কথায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। অসীমের যদি তাহা বুঝিবার, শুনিবার ক্ষমতা থাকিত সে শুনিত সেখানে অতি করুণ ক্রন্দনের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে—'কেমন করে পারব তা? এতদিনকার অভ্যাসগুলো কেমন করে ছেড়ে দেব, কেমন করে তোমার প্রদর্শিত পথে চলব?'

অসীমের অন্তর-বাণী বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না, সে অন্তর চিনিত না। বাহিরটা দেখিয়া সে মুগ্ধ হইত, নিজের স্ত্রীকেও সে চিনিতে পারে নাই।

নিজের মনের আবেগে সে বলিতে লাগিল "ভেবেছিলুম, বিয়ে করে সবাই সুখী হয়, আমিও হব। সব ভুল দেখছি। আমার একটা আশাও মিটেনি। চার বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে তবু আমি তোমায় আমার আপন বলে ভাবতে পারিনে। মাঝখানে আমাদের ব্যবধান যথেষ্ট। এ ব্যবধান জীবনেও দূর হবে না। তুমিও সুখী হবে না, আমিও সুখী হব না। একই সংসারে স্বামীস্ত্রীরূপে বাস করেও আমাদের দূরত্ব এতখানি!"

সামনের ফটোখানা দেখাইয়া সে বলিল "দেখ দেখি বিবাহিত জীবন কত সুখের। কি শান্তির ভাব আঁকা এদের মুখে। চাও দেখি এই মেয়েটীর পানে, কতদূর আত্মনির্ভরতা এর মুখে ফুটেছে দেখছো? তোমাকে আমি এই ভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলুম কিন্তু তুমি তা হতে পারলে না। নিজে ত সুখী হতে পারছই না, উপরন্তু সংসারের সকলকে অসুখী করে তুলছ।"

তাহার পর একটা হাই তুলিয়া চেয়ার হইতে উঠিতে উঠিতে বলিল "যাক, সে সব বলে এখন তোমার মন খারাপ করতে চাইনে বিশেষ। এখনও বলছি ভেবে দেখ সব। এর পর যেন অনুতাপ না কর্ত্তে হয়, এই আমার কথা। যাও এখন শোও গে।"

বেশ ধীরভাবেই সে নিজের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। সে একবারও ভাবিল না যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই হৃদয়হীনের মত কথাগুলা সে

বলিয়া গেল, তাহার হৃদয়ে কি ব্যথা বাজিল, কি ঝড় উঠিল।

শয়ন করিবার খানিক পরেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। সেবিকা তখনও সেই স্থানে তেমনই নতমুখে দাঁড়াইয়া।

অনেকক্ষণ পরে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। স্বামীর পানে একবার চাহিল, ঝর ঝর করিয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িল।

এতক্ষণ এই দুর্ব্বলতাটাকে সে যে কি কষ্টে চাপা দিয়া রাখিয়াছিল তাহা সেই জানে আর তাহার অন্তরের দেবতাই জানেন। স্বামীর সম্মুখে গোপন থাকিতে তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিল স্বামীরই কঠোর ব্যবহার। এ পর্য্যন্ত কখনও সে স্বামীর নিকট নিজ-জনের উপযুক্ত ব্যবহার পায় নাই। অসীম যথার্থই বলিয়াছে এত কাছে থাকিয়াও তাহারা এত দূরে। কেহ কাহারও নাগাল এ জীবনে তাহারা পাইবে না।

এতক্ষণ সে প্রাণপণে চোখের জল চাপিয়া রাখিয়াছিল। আর পারিল না কারণ স্বামী এখন নিদ্রিত।

দুই হাত মুখের উপর চাপা দিয়া আর্ত্তভাবে একবার মাত্র সে বলিয়া উঠিল "মা গো।"

(ক্রমশঃ)

আসামদেশীয় মহিলাদিগের সামাজিক প্রথা

আসাম পর্য্যটক—শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী।

বিবাহ—

অসমীয়া ব্রাহ্মণ কন্যাগণ দ্বিতীয় সংস্কারের পূর্ব্বে বিবাহিতা হইয়া থাকেন। এই বিধির ব্যতিক্রম ঘটিলে তাঁহাদিগের পিতামাতা জাতিচ্যুত হইয়া থাকেন। আসামের মধ্যে গোয়ালপাড়া ও কামরূপ অঞ্চলের কায়স্থ কন্যাগণকে এবং মধ্য-আসামের খাতি কায়স্থের কন্যাদিগকে ব্রাহ্মণকন্যার মত দ্বিতীয় সংস্কারের পূর্ব্বে বিবাহ দিতেই হইবে—অন্যথা জাত যাইবে। গণক (দৈবজ্ঞ) ব্যতীত অসমীয়া কলিতা, কৈবর্ত্ত, কেওট, কোচ, নদীয়াল (ডোম) প্রভৃতি জাতির কন্যাদিগের বিবাহের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। তাহারা দ্বিতীয় সংস্কারের পরেও পরিণীতা হইলে সমাজে কোনরূপ ধিকৃতা হয় না। এ কারণ অসমীয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও দৈবজ্ঞ সমাজে কেবল বাল্যবিবাহের প্রকোপ দৃষ্ট হয়। আসামে শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে ধর্ম্মগত বিরোধ থাকিলেও শাক্তধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির কন্যার সহিত বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির বিবাহ হইতে পারে। তাহাতে কোন বাধা নাই।

বিবাহ, পূজা ও অন্যান্য কর্ম্মকাণ্ডের সময় অসমীয়া মহিলারা গীত বাদ্য করতঃ আনন্দোচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা হইয়া থাকেন। অন্য কোন সময়ে স্বেচ্ছায় তাঁহাদিগের গীত গাহিবার রীতি নাই। তবে বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে গৃহ-কর্ম্ম করিবার কালে অনেক সময় গান গাহিয়া থাকে।

বঙ্গীয় হিন্দুদিগের প্রথা অনুসারে বিবাহের দিন স্থিরের পূর্ব্বে সপ্তাহ কাল মধ্যে কোন একটী শুভক্ষণে বর ও কন্যার গাত্রহরিদ্রা হইয়া থাকে।

বরের বাড়ী, কন্যার বাড়ী হইতে ৪।৫ ক্রোশের মধ্যে হইলেও এবং ঐ দিন ৩।৪ ঘণ্টা পরেও যদি পঞ্জিকাতে শুভক্ষণের উল্লেখ থাকে তাহা হইলে বরপক্ষ বরের গাত্রহরিদ্রার পর নাপিত দ্বারা কন্যার বাটীতে ঐ হরিদ্রার কিয়দংশ পাঠাইয়া থাকেন। সেখানে উহাই কন্যাকে মাখান হয়। বর কন্যার বাড়ী পরস্পর দূরবর্ত্তী স্থানে হইলে এবং কন্যার বাড়ীতে হরিদ্রা পাঠান অসুবিধাজনক বোধ হইলে, এই নিয়ম প্রতিপালিত হয় না। এরূপ স্থলে উভয় পক্ষের কথা অনুসারে একই দিনের একই শুভক্ষণে বর কন্যার গাত্রহরিদ্রা হইয়া থাকে। কিন্তু অসমীয়া হিন্দুদিগের মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচলিত নাই।

৩ দিন ৫ দিন অথবা ৭ দিনের দেশীয় অনুষ্ঠান অন্তে অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহকার্য্য সমাপ্ত হইয়া থাকে। যেদিন বিবাহ হইবে তাহার একদিন পূর্ব্বেই অসমীয়াদিগের বিবাহের অধিবাস হয়। অধিবাসের দিন "কলর গুরিত গা ধুওয়া"ন'র কালে অর্থাৎ কলাগাছের নিকট বর কিম্বা কন্যাকে স্নান করাইবার সময় উভয়ের গাত্রহরিদ্রা হইয়া থাকে। অন্যান্য দিন সেখানে বর কিম্বা কন্যাকে কেবল স্নান করাইবার রীতি আছে। চূড়াকরণ আদি সংস্কার কালে কলাগাছের নিকটও স্নান করান হয়।

অসমীয়াদিগের "কলর গুরিত গা ধুওয়া" প্রথাটী কিরূপ তাহা হয়তো জানিবার আগ্রহ অনেকের জন্মিতে পারে। এই বিষয়টী হইতেছে—প্রত্যূষে বরের বাটীতে বরের মাতা এবং কন্যার বাটীতে কন্যার মাতা গ্রামস্থ সম্পর্কীয় ও অন্যান্য মহিলাগণ সহ মিলিত হইয়া ঢাক, ঢোল, খোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সহ গীত গাহিতে গাহিতে নদী কিম্বা পুষ্করিণীর ঘাটে যান। সেখানে যাইবার কালে বর অথবা কন্যার মাতা ও অন্যান্য মহিলারা হস্তে মৃৎঘট ও একটী ডালায় করিয়া প্রদীপ, হরিতকী প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য লইয়া থাকেন। তাঁহারা ঐ ঘটে করিয়া জল আনিয়া সেগুলিকে গৃহমধ্যে সযত্নে রাখেন। অতঃপর বাড়ীর লোকে একটী কলাগাছ আনিয়া উঠানের কোন এক পার্শ্বে পুঁতিয়া দেন। এই কলাগাছের তলায় বর কিম্বা কন্যাকে উপবেশন করাইয়া স্নান করাইবার জন্য আসনস্বরূপ কয়েকটী খণ্ডিত কদলি-কাণ্ড পাশাপাশি বিছাইয়া রাখা হয়। সন্ধ্যার পর বর কিম্বা কন্যাকে ঐ আসনে বসান হয়। বর অথবা কন্যার মাতা ও অন্যান্য সম্পর্কীয় স্ত্রীলোকেরা পেষিত মাসকলাই, হরিদ্রা প্রভৃতি দ্রব্য বর কিম্বা কন্যার গাত্রে লেপন করতঃ উক্ত ঘটস্থ জল দ্বারা স্নান করাইয়া দেন। চূড়াকরণের সময় দুপুরবেলায় এইরূপ নিয়মে স্নান করান হয়। ইহাকে "কলর গুরিত গা ধুওয়া" বলা হয়। লোয়ার আসামে বিবাহের দিনেই ঐ প্রকারে জল আনা (পাণী টুলা) হয়। কিন্তু আপার আসামে বিবাহ-দিনের ৭ দিন, ৫ দিন কিম্বা ৩ দিন পূর্ব্বে নদী অথবা পুষ্করিণী হইতে এই প্রকারে গৃহে জল আনাইয়া বর কিংবা কন্যাকে স্নান করান হয়।

"কলর গুরিত গা ধুওয়া"ন'র কালে অসমীয়া মহিলারা নিম্নোদ্ধৃত ধরণের নাম (গীত) গাহিয়া থাকেন :—

কলর গুরিত গোয়া নাম

"সলাগ লৈ জেঠেরি মুচুকাই হাহিলে
বৈনাই বর ভাল বুলিহে।
অলাপ মাতিয়া বৈনাই কুমলীয়া
সত্র ধরিছে তুলিহে ॥
শহুরর পধূলি দকা-দমকা
কি ফুল ফুলিলে হালিহে।
পিহিবর মনে গল জেঠেরি বৈনাই
ইন্দ্রমালতীর চাকি হে ॥
শহুরর মরমে বারু দেখিলো
ছপাই কল গুরিত থলে হে।
শাহু আইর মরমে নিছেই নিদারুণে
জিয়েরুক পইতা যাছে হে ॥

জিয়েকে বুলিছে মই কিয়ে খামে
স্বামী কল গুরিত আছে হে।
কিনো কলে পুলি কলাই ঐ জেঠেরি
গত হালি জালি পরে হে।” *

বিবাহকালে বাড়ীর লোকেরা “বেই” তৈয়ার করেন। ইহাতে কোন ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয় না। ইহার আয়তন লম্বা চওড়ায় কতখানি হইবে সে সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। ইহা প্রস্তুতকালে তাঁহারা সুবিধামত লম্বা চওড়া করিয়া লন।

কন্যার পিত্রালয়ে বিবাহকার্য্য শেষ হইলে পর বর প্রথমে কন্যার গৃহে কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন না—নিজ গৃহ হইতে প্রেরিত জলখাবার খাইয়া থাকেন। অতঃপর তাঁহাকে অন্তঃপুরে কন্যার সান্নিধ্যে লইয়া যাওয়া হয় এবং চিপিটক, পিঠা, পরমান্ন প্রভৃতি নানাবিধ সুসজ্জিত খাদ্য দ্রব্য খাইতে দেওয়া হয়। বর উহার কিয়দংশ লইয়া মুখশুদ্ধি করতঃ মুখ ধুইয়া বাহিরে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসেন। দেশীয় প্রথা অনুসারে সে দিন বরকে কন্যার গৃহের কোন দ্রব্য গলধঃকরণ করিতে নাই।

বিধবা বিবাহ—

আসামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও দৈবজ্ঞ (গণক) ব্যতীত অন্যান্য অসমীয়া হিন্দুজাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। আসাম অঞ্চলের কুত্রাপি বিধবাবিবাহে “কলর গুরিত পা ধুওয়া”ন’র কালে গাত্রহরিদ্রা অথবা “বেই”য়ের আবশ্যক হয় না। হোম পূজা করিবার বিধিও নাই।

আপার আসামে অর্থাৎ শিবসাগর ও লখিমপুর জেলায় বর বিধবার পিত্রালয়ে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে “আগ চাউল” দেওয়া হইলে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল; কিন্তু লোয়ার আসামের অর্থাৎ গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলার প্রথা অনুসারে বিধবাকে তাহার মৃত স্বামীর অথবা পিতার গৃহ হইতে লইয়া গিয়া নূতন স্বামীর বাটীতে “আগ চাউল” দেওয়া হয়।

“আগ চাউল” জিনিসটা কি তাহা হয়তো জানিবার আগ্রহ অনেকের হইতে পারে। বরের আত্মীয়রা বর ও কন্যাকে একটী পাটী (mat)এর উপর উপবেশন করাইবার পর তাহাদের সম্মুখে পুষ্প, ঘট, একটী বাঁশের ডালায় প্রদীপ শিলখা ও অন্যান্য মাঙ্গল্য দ্রব্য এবং একটী দোনাতে এক দোনা চাউল রাখিয়া দেয়। বরের মাতা আসিয়া বর কন্যা উভয়ের মস্তকে যৎকিঞ্চিৎ চাউল ৩ অথবা ৫ বার ছড়াইয়া দেয়। তৎপরে সম্পর্কীয় অন্যান্য মহিলারা তদ্রূপ চাউল ছড়াইয়া থাকে। সম্পর্কীয় ভিন্ন অন্য কোন মহিলার এইরূপ করিবার নিয়ম নাই। অসমীয়ারা ইহাকে “আগ চাউল দিয়া” বলিয়া থাকেন।

পরে ঐ দোনাস্থ চাউলের মধ্যে বর একজোড়া আংটী লুকাইয়া রাখে। কন্যাকে ঐ আংটী জোড়া খুঁজিয়া বাহির করিতে বলা হয়। এই সময় সমবেত মহিলাগণ গীত গাহিয়া থাকেন। কন্যা সহজে আংটী বাহির করিতে না পারিলে তাঁহারা বরকে লক্ষ্য করিয়া অনেক ঠাট্টা করেন এবং কন্যাকে ক্লেশ না দিয়া স্নেহ করিয়া বর যেন চাউলের উপরেই আংটী রাখিয়া দিয়াছে, এইরূপ অর্থজ্ঞাপক ও হাস্যদ্দীপক গীত গাহিয়া থাকেন। অতঃপর দুইটী পায়সপূর্ণ বাটী তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করা হয়। বর একটী বাটী কন্যার দিকে ঠেলিয়া দেয়। কন্যাও তাহা বরের দিকে ঠেলিয়া দেয়। উভয়েই ৩ বার অথবা ৫ বার উভয়ের দিকে পায়স-পাত্র ঠেলাঠেলি করিয়া থাকে।

* অসমীয়া শব্দার্থ=সদাগ—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ; কুমলীয়া—কোমল; দকা-দমকা—উচ্চ-নিম্ন; হালি—হেলন, বক্র হইয়া (bending); চাকি—চাকা, মণ্ডল; বার—ভাল; ছপাই—ধরিয়া আনিয়া; কল—কলাগাছ; থলে—স্থাপন করিল; আই—মা; নিছেই—একেবারেই; পঁইতা—পান্তাভাত; খামে—খাইব; কিনো—কি প্রকার; হালিজালি—হেলেবুলে জালি—বুলিয়া।

বিধবার স্বামী কিংবা পিতার বাটীতে কোন রূপ উদ্বাহ-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয় না। দরঙ্গ জেলায় আমরা দেখিয়াছি পাত্রপাত্রী উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজন এবং গ্রামস্থ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ বিবাহ সভায় সম্মিলিত হইলে কন্যাপক্ষ কন্যাকে বরপক্ষের প্রদত্ত বস্ত্র অলঙ্কার পরিধান করাইয়া সেখানে উপস্থিত করে। তখন পাত্রপাত্রীকে আশীর্ব্বাদ ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে জলযোগ করান হয়।

যদি কন্যা স্বামীগৃহে যাইবার পূর্ব্বে বিধবা হয় এবং তাহার "দ্বিতীয় সংস্কার" না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নূতন স্বামী তাহাকে পিত্রালয় হইতে একটু আড়ম্বর করিয়া ঢাকঢোল বাদ্য সহ নিজ গৃহে লইয়া যায় এবং সেখানে কেবল "আগ চাউল" দেওয়া হইলে বিবাহের কার্য্য সমাপ্ত হইয়া যায়। এরূপ স্থলেও হোম হয় না অথবা "বেই" বাঁধিবার নিয়ম নাই।

বিধবা বিবাহিতা হইলে পিত্রালয়ে যাইতে পারে—তাহাতে কোনরূপ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নাই। তাহার বহুবার বিবাহ হইতে পারে। তাহাতেও সমাজে কোন আপত্তি নাই। মনে করুন—স্বামীর মৃত্যুর পর কোন ব্যক্তি তাহার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিল। এই দ্বিতীয় স্বামীরও মৃত্যু হইল। তখন ইচ্ছা করিলে সেই বিধবা তৃতীয় পতি গ্রহণ করিতে পারে, এবং তৃতীয় পতির মৃত্যু হইলে চতুর্থ পতি—এই প্রকারে যত ইচ্ছা পতি গ্রহণ করিতে পারে। ব্রাহ্মণ, গণক (দৈবজ্ঞ) এবং কায়স্থজাতি ব্যতীত আসামে অন্য জাতির মধ্যে এই প্রকার বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় পতি গ্রহণ করিলে অসমীয়ারা সাধারণতঃ ইহাকে "ঢেকুনি আনা" অর্থাৎ বিবাহিত নয় বলিয়া থাকেন।

বিধবা ব্রাহ্মণীর জারজ সন্তান ও তাহার বংশধরগণকে কামরূপ অঞ্চলের লোকেরা "সূত কুলিয়া" বনাম "বরিয়া" বলিয়া থাকেন। বিধবার প্রথম পতির ঔরসজাত পুত্র বিধবার দ্বিতীয় স্বামীর সম্পত্তির অংশ পায় না। সে বড় হইয়া তাহার নিজ পিতার সম্পত্তি পাইয়া থাকে। প্রথম স্বামীর ঔরসজাত পুত্র যদি মাতার সহিত দ্বিতীয় স্বামীর গৃহে থাকে, তখন ঐ পুত্রকে লোকে "গুরু গুরীয়া" বলে। বিধবার সন্তানেরাও পৈত্রিক সম্পত্তির পূর্ণ অধিকারী। মনে করুন—জনৈক নাপিত বা বৈশ্যের বিবাহিত পত্নীর গর্ভজাত এক পুত্র আছে। পত্নীর মৃত্যুর পর সে ব্যক্তি একটী বিধবাকে বিবাহ করিল, এই বিধবার গর্ভে দুইটী পুত্র জন্মিল। মোট তিনটী পুত্রের মধ্যে তাহার বিষয় সম্পত্তি সমভাবে বিভাগ হইবে।

লাঞ্ছিতা

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

দ্বাদশ বরষে যবে একদা সন্ধ্যায়
গঙ্গাজলে গেল মোর শাঁখা দুটি ভাসি,
সমাজে সাপের মত বিষফণা তুলি
অভাগী বিধবাবেশে দাঁড়াইনু আসি।
সমাজ-মুকুট যারা—ক্ষণিকের তরে
ঢালেনি ভুলেও কভু প্রবোধের বাণী;
লভিয়াছি চিরদিন ঘৃণা অপমান,
দহিয়াছে লাজে ক্ষোভে সারা মনখানি।
তারপর কতদিন সমাজের কাছে
যাচিনু তৃষিত হিয়া এক ফোঁটা জল,
আগুনের শলা দিয়ে নেতা তার যত
পোড়ায়ে করেছে ছাই মরমের তল।
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আর অনন্ত বেদনা
এ বুকে বহিয়া জাগে লাঞ্ছিতা ললনা।

মনীষি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

অনন্ত রত্নের খনি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নীলাম্বুধি ভারতের তুলনা শুধু ভারতই। এই ভারতে যুগে যুগে কত শত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া আপন অলৌকিক প্রতিভার দ্বারা জগতের সভায় ভারতের মুখ উজ্জল করিয়া গিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতে যে সমস্ত প্রতিভাবান পুরুষের জন্ম হইয়াছে, তন্মধ্যে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অন্যতম।

১৮৬৪ সালের কথা। একদিন শুভ সুপ্রভাতে ভবানীপুরের ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঔরসে একটি শিশুপুত্র ভূমিষ্ট হয়। কে জানিত এই শিশুপুত্র অজ্ঞাতভাবে তাহার হৃদয়ে একটা অদম্য তেজ, ললাটে অক্ষয়কীর্ত্তি লইয়া আসিয়াছে! দিনের পর দিন যাইতে লাগিল শিশু আশুতোষ শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রবেশিকা, এফ্-এ, বি-এ প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। বি-এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিলেন। তখন শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি সেই তরুণ যুবকের ভবিষ্যৎ-সৌভাগ্যের দিকে আকৃষ্ট হইল।

এম্-এ, বি-এল পাশ করিয়া আশুতোষ ডাক্তার স্যার রাসবিহারী ঘোষের আর্টিকেল্ড ক্লার্ক হইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে গণিতে এম্-এ পাশ করিয়াছিলেন, এবার বিজ্ঞানেও এম্-এ পাশ করিলেন। তার পর পি-আর-এস্, পাশ করিয়া আশুতোষ সুধী সমাজে বরেণ্য হইলেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট এই উদীয়মান সিংহকে অমনি হাইকোর্টের বিচারাসনে বাঁধিয়া ফেলিলেন—স্যার আশুতোষ হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি হইলেন।

এই জজীয়তীপদে ২০ বৎসরকাল কার্য্য করিয়া —অতি দক্ষতার সহিত বিচারপতির গুরুতর কার্য্য করিয়া গত জানুয়ারী মাসে ৬০ বৎসর পূর্ণ হইবার প্রাক্কালে অবসর গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কর্ম্মীর আবার অবসর! অমনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে ডুমরাঁওন রাজের মামলা পরিচালনের ভার দিলেন। অক্লান্ত কর্ম্মী আশুতোষ পাটনায় অবস্থান করিয়া তাহাই করিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ সংবাদ আসিল আশুতোষ নাই! বাঙ্গালা আঁধার—ভারত আঁধার হইল—আবাল বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই মুখে এক কথা আশুতোষ নাই! কেন এ উৎকণ্ঠা? কেন এ আবেগ? আশুতোষ যে বাঙ্গালার একটা পুরুষ সিংহ ছিলেন। জীবনের অন্য কোন ব্রত ছিল না—অন্য কোন লক্ষ্য ছিল না, ছিল শুধু শিক্ষার বিস্তার। কি করিলে দেশের বালক বালিকারা শিক্ষা লাভ করিবে আশুতোষ নিশিদিন কেবল তাহাই ভাবিতেন। তাই ১৯০৪ সালে যখন লর্ড কার্জ্জন উচ্চ শিক্ষার পথরোধ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বিল উপস্থাপিত করেন, তখন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে স্যার আশুতোষ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তাঁহার পুত্রাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু। হাইকোর্টের কঠোর শ্রমের পর আশুতোষ স্বেদসিক্ত কলেবরে ছুটিয়া আসিতেন সিনেট হাউসে। কি করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অক্স্ফোর্ড, ক্যাম্ব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সমকক্ষতা করিতে পারে, স্যার আশুতোষ দিবানিশি কেবল সেই চেষ্টা করিতেন। তাই

দেশ বিদেশের যত ভাল ভাল অধ্যাপক, তাঁহাদিগকে আনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিতেন।

বাঙ্গালীর মধ্যে আশুতোষ ছাড়া আরও অনেক ভাইস্‌চ্যানসেলার হইয়াছেন, কিন্তু আশুতোষের মত দীর্ঘকাল কেহই ভাইস্‌চ্যানসেলারী করেন নাই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় কেহ এরূপ ভাবে জীবনের বিন্দু বিন্দু শোণিতও অর্ঘ্য প্রদান করেন নাই। ঐ যে সাকুলার রোডে বিজ্ঞান কলেজ, ঐ কলেজের প্রতি ইষ্টক গাত্রে স্যার আশুতোষের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে। তিনি যদি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রয়োজনানুরূপ অর্থ পাইতেন তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়কে যে কি করিতেন তাহা কল্পনায়ও আনা যায় না।

স্যার আশুতোষের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব স্তম্ভ কি? অনাদৃতা বঙ্গভাষার সমাদর। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা বাধ্যতামূলক করেন এবং বঙ্গভাষায় এম্‌-এ পরীক্ষার প্রচলন করেন। কিন্তু ইহা ছাড়াও আশুতোষের আর একটি বিশেষত্ব ছিল। তিনি স্বাধীনচেতা তেজস্বী পুরুষ-সিংহ ছিলেন, একথা নূতন নহে। ভূতপূর্ব্ব শিক্ষা সচিব প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বিল উপস্থিত করিলে এবং বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা সচিবের পোষকতা করিলে স্যার আশুতোষ জলদ-গম্ভীর নির্ঘোষে বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, ইহাকে কখনও গভর্ণমেণ্টের অধীনে যাইতে দিব না—Freedom first, Freedom last, Freedom always ইহাই ছিল স্যার আশুতোষের বজ্রনির্ঘোষ।

আশুতোষ,—বাঙ্গালার গৌরব ও শ্লাঘার আশুতোষ,—বাঙ্গালার মধ্যমাম দ্যুতি কিরীট আশুতোষ,—বীণাপাণির বরপুত্র আশুতোষ শুধু কি আইনজ্ঞ, গণিতজ্ঞ, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌, ঐতিহাসিক, শিক্ষার প্রচারক ছিলেন? তা নয়, শুধু তা নয়! তিনি ছিলেন বাঙ্গালার দলিতা মথিতা নারী জাতির রক্ষক। বাঙ্গালার স্ত্রীশিক্ষার আজ এই যে এত প্রসার ইহার মূলে স্যার আশুতোষের সাধনা, আশুতোষের উদ্যম অধ্যবসায় নিহিত। বেথুন কলেজের পারিতোষিক বিতরণী সভায় সভাপতির অভিভাষণে তিনি বাঙ্গালার নারী সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহা আজও ঝঙ্কৃত হইতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন,—"দেশকে জাগাইতে গেলে, স্বরাজ লাভ করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে দেশের মাতৃ-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। ঘরে ঘরে শিক্ষিতা মহিলা না হইলে দেশের অজ্ঞতা যাইবে না। সন্তানের যা' কিছু—শৈশব বাল্য কৈশোর ও তরুণ যৌবনের শিক্ষা সবই সে পায় মায়ের নিকট। যতদিন ভারতে সুশিক্ষিতা মাতা ঘরে ঘরে বিরাজ না করিবেন, ততদিন ভারতের উন্নতির কোন আশা নাই।"

উনবিংশতি শতাব্দীতে বালবিধবার অশ্রু দেখিয়া একজনের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তিনি দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর। আর এই বিংশ শতাব্দীতে বালবিধবার আলুলায়িত কেশপাশ, ছিন্ন মলিন বসন, বিমর্ষ মুখমণ্ডল দেখিয়া আর একজন মহাপুরুষের প্রাণে ব্যথার করুণ সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল, তিনি ভারতপূজ্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়! সমাজ কত প্রকারে তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছিল, বিবেক-বুদ্ধি-প্রণোদিত আশুতোষ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন বিধবা দুহিতার পুনর্বিবাহ দিয়াছিলেন। আজ এই যে দেশে স্থানে স্থানে বালবিধবার বিবাহ হইতেছে, এই অনুপ্রেরণা লোকে লাভ করিয়াছে স্যার আশুতোষের দৃষ্টান্তে।

বাঙ্গালার স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য যদি কাহারও নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে তবে থাকিবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের। তিনি যদি আরও কিছুদিন জীবিত থাকিতেন তবে

বাঙ্গালার স্ত্রী-জগতে শিক্ষার প্রসারতা আমরা আরও দেখিতে পাইতাম।

বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী মহিলার দুর্ভাগ্য এই যে এত বড় একটা দেশ-প্রেমিক, নারী সমাজের কল্যাণ-কামী, ভারতের গৌরব-স্তম্ভ মাত্র ৬০ বৎসর বয়সে কর্ম্মজীবনের অপরাহ্ণে চলিয়া গেলেন! তাঁহার পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ চিতানলে ভস্মীভূত হইয়াছে, রহিয়াছে বাঙ্গালীর হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের প্রতিভা অঙ্কিত,—সুন্দর চিত্রপট।

ব্যথিতা

(কথিকা)

শ্রীবেলাগুহ।

সেদিন বিদায়ের কালে সে প্রভাতের শিশির সিক্ত পদ্ম-পাপ্‌ড়ির মত তার অশ্রু সজল চোখ দুটী তুলে—সাহানার মতই করুণ সুরে আমাকে বলে গিয়েছিল,—"আবার আস্‌ব গো—আবার আস্‌ব। তোমার সনে আবার আমার দেখা হ'বে পথের শেষে দুকূল ভাঙ্গা নদীর কূলে—যেথায় আলো আঁধার নিবিড় আলিঙ্গনে এক হ'য়ে মিশে গেছে!"

সেদিন থেকে আজ অবধি অসীম ব্যাকুলতা বুকে নিয়ে বসে আছি তারই প্রতীক্ষায়।

সারাদিনটি ধরে' বাতায়ন-পথে একলাটি বসে আনমনে চেয়ে থাকি ওই সুদূর অসীম নীল আকাশের দিকে। সকাল হ'তে সন্ধ্যা আবার সন্ধ্যা হ'তে সকাল কত দৃশ্যই না আমার চোখের সামনে ভেসে যায়—কত কান্না, কত হাসি, কত আলো, কত গান! কিন্তু কৈ আমার প্রাণের তারে ত তাদের সাড়া জাগে না। পাষাণ দেয়ালের গায়ে ঢেউয়ের মত সবই যেন আমার হৃদয়-তলে ব্যর্থ হ'য়ে চূর্ণ হ'য়ে যায়।

ভোরবেলাকার ফুলগুলি সোহাগভরে এ-ওর কাণে কাণে প্রাণের গোপন কথা জানায়—রং-বেরঙের প্রজাপতিরা নূতন আলোয় রঙিন পাখা উড়িয়ে হেলে দুলে গিয়ে বসে আধ-ফোটা বেল-কুঁড়িগুলির বুকের উপর—তারা যেন কোন্ অজানা পুলকে ঘুমের ঘোরেও শিউরে শিউরে ওঠে, ঝুর ঝুর করে গাছগুলোর পুরাণো শীর্ণ পাতাগুলি ঝরে ঝরে পড়ে।

পাতা-ঝরার করুণ বেদনা,—কেয়াবনের দীর্ঘ-নিশ্বাস,—'চোখগেল'র বুক-ফাটা ডাকাডাকি আর আমার একটানা সুদীর্ঘ জীবনের ব্যর্থতা—আমাকে করে দেয় আরও আনমনা!

বহু যুগের পদচিহ্নে আঁকা ওই রাঙ্গা মাটির বাঁকা পথখানির পানে দিনরজনী আকুল-তৃষিত চোখে চেয়ে থাকি—যে পথ এসেছে ঐ শূন্য প্রান্তরের প্রান্ত থেকে সরিসৃপের মত এঁকে বেঁকে—ঐ বালু-তীরের উপর চির পরিচিত খেয়াঘাটের পাশ দিয়ে—থেমেছে এসে আমারই নিভৃত নিকুঞ্জের ছায়া-বাটে!—যেখানে কোন দিন কোন লোকের আসা-যাওয়া হয়নি—পায়ের রেখা সেখানে নেই! যেদিকে তাকাও কেবলই সবুজ—রূপ-রস আর গন্ধে ভরা! আর দূরে—বহুদূরে একটা অনাবিল নীলের অসীম গরিমা তাকে বুকে জড়িয়ে অনন্ত সমাধিতে মগ্ন হ'য়ে রয়েছে!

সকাল সাঁঝে, আকাশে বাতাসে, পল্লবে যে রং ধরে সে যে আমার প্রিয়-র প্রাণেরই রং, চাঁপা

ফুলের পাতায়-চাপা মদির-মিষ্টি গন্ধ টুকুন যে সে কুসুম-পেলব অঙ্গেরই সুমধুর গন্ধ!

কিন্তু আমার চেয়ে থাকা আর ফুরোয় না— দেখ্‌তে দেখ্‌তে দূরের ঝাপসা আর ছায়াতে চোখ দৃষ্টি হারিয়ে ফেলে উদাসী হাওয়ার নিশ্বাসের সাথে সাথে আমার মনও ভরে যায় গোপন অতৃপ্তিতে ও নিস্ফলতায়! আমার চোখের পাতা দুটী বেদনার অশ্রুতে সিক্ত হ'য়ে ওঠে, বুক ছাপিয়ে একটা কান্নার করুণ সুর বেজে ওঠে—

"ওগো আর কতদিন—ওগো আর কতদিন
রব আমি তব পথ চেয়ে,
দিন যে ফুরিয়ে এল—রবি জ্যোতিঃ হীন,
অন্ধকার নামে ধরা ছেয়ে।"

দিন শেষের শেষ আলোটুকুও আস্তে আস্তে সরে যায় পশ্চিম আকাশের কালো কালো মেঘের ভিতর দিয়ে, রাতের আঁধার নেমে আসে ধরার তপ্ত বুকে—ঠিক প্রিয়ের পরশের মতই শীতল মধুরতার পরশখানি!

আমার নিরালা গৃহকোণের প্রদীপখানা জ্বালা হ'তে না হ'তেই নিভে যায়। আমি ভাবি—"আমার কি হ'বে আলোতে? আমার বুক-ভরা আঁধার নাকি একটি ক্ষীণ প্রদীপের ম্লান আলোতে ঘুচে যাবে?"

পূরবীর অশ্রু ভরা রাগিণীর মত তার আসার আশাও দিনান্তের ক্লান্তি-নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে যায়!

গভীর অন্ধকারের বাহুবেষ্টনের মরণ-আঘাতে আমার কণ্ঠ সাহানার মত করুণ সুরে কেঁদে বলে, "ওগো আমার প্রিয়, আমার হৃদয় বেদনায় ভ'রে গেছে—সেই বিদায় দিনের ব্যথার বাণী আজও আমার মন-সেতারের তারে তারে বেসুর বাজ্‌ছে—তুমি কি আর আস্‌বে না? আমার এতদিনের আকুল পথ চাওয়া কি ব্যর্থ হ'য়ে যাবে? বক্ষের গোপন আশার কোরকগুলি বাসি ফুলের পাপ্‌ড়ির মতই কি ধূলার বুকে এমনি ক'রে ঝরে যাবে?"

আমার আঙিনার পাশে সেই পথের ধারের নব মল্লিকার ঝাড় কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ঝড়ো হাওয়া এসে বারে বারে আমার রুদ্ধ দ্বারের কাছে আছড়ে প'ড়ে ডাক দিয়ে ব'লে যায়—"ওগো বিরহি, তোমার প্রিয়-র বাণী ত তোমারই নিকুঞ্জে ফোটা গন্ধে বিভোল ফুলদলের জাগরণের ভাষায় লুকিয়ে আছে; সে বাণী তো কানাকানি ক'র্‌ছে কেয়াবনের নৃত্য-দোদুল ওই মর্ম্মগীতির ছন্দের সাথে, সে-ও তো তোমার বাণী খুঁজে বেড়াচ্ছে লোকালয়েরই তীরে তীরে!"

সুখ ও দুঃখ

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ।

ধাতা শুধালেন "নর, কি তব প্রার্থনা?"
নর কহে, "ধরা তব আনন্দ সদন,
আনন্দে উদ্ভব সৃষ্টি আনন্দে বিলয়,
তার মাঝে কেন দিলে দুঃখের বেদন?"

ধাতা কন "হায় মূঢ় বুঝাই কেমনে,
পুষ্পরূপে ফোটে সুখ দুঃখ তরুপরে,
দুঃখেরে বিদায় দিলে সুখ যাবে সাথে,
বেদনা গোপনে থাকি বহে আনন্দেরে!"

নানা কথা

বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালী মহিলার কৃতিত্ব—

এবার কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন একজন বাঙ্গালী মহিলা। ইঁহার নাম কুমারী আশালতা অধিকারী।

বাঙ্গালী মহিলার এ কৃতিত্বে বাঙ্গলার মুখ বিশেষ উজ্জ্বল হইয়াছে।

ব্রহ্মমহিলা কন্‌ফারেন্স—

ব্রহ্মদেশের পাংদে নামক স্থানে ব্রহ্মদেশীয় মহিলাগণের একটি কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে। সভায় প্রায় দুইশত বিভিন্ন নারীসঙ্ঘের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন, স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য বিশেষ ভাবে প্রচার করা প্রভৃতি কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। যে সকল যুবক ইংরাজী ফ্যাসানে চুল কাটিবে তাহাদিগকে কোন স্ত্রীলোক বিবাহ করিবে না—এই প্রস্তাবটিও সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

বিধবা বিবাহ—

সম্প্রতি বঙ্গীয় সমাজ সংস্কার সমিতির উদ্যোগে কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর বাড়ীতে হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে একটি বিধবার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বর—যশোহর জেলার নবাবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রসিকলাল বিশ্বাস। বয়স ২১ বৎসর, বর্ত্তমান বৎসরে তিনি বি-এ পরীক্ষা দিয়াছেন। পাত্রী—শ্রীমতী দেবযানী ফরিদপুর জেলার সাতপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গয়ালীচরণ বিশ্বাসের কন্যা। শ্রীমতী দেবযানীর বয়স তখন মাত্র নয় বৎসর যখন তাহার স্বামী যুদ্ধে গিয়া মারা যান। শ্রীমতী দেবযানী বাঙ্গলা লেখাপড়া বেশ ভালরকম জানেন। বর ও কন্যা উভয়েই নমঃশূদ্রশ্রেণীর। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পণ্ডিত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে এ বিবাহের পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। বিবাহসভায় নমঃশূদ্র শ্রেণীর বহু ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তি এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, ডাঃ ডিঃ, এন, মিত্র, শ্রীযুক্ত পীযুষকান্তি ঘোষ, অধ্যাপক দেবেন্দ্র নাথ রায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

কুন্দিহার বালিকা বিদ্যালয়—

গত ১৩১৮ সালে বরিশালের কুন্দিহার নামক গ্রামে এই বিদ্যালয়টী স্থাপিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে এই বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় বিদ্যালয়ের জন্য একটী গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব উঠে। বহু ভদ্রলোক চাঁদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করেন। জনৈকা ভদ্রমহিলা এই শুভ উদ্দেশ্যে তাঁহার কানের ফুল খুলিয়া দেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, এই বিদ্যালয়ে বালিকাগণকে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে চরকায় সুতা কাটিতে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তাহারা উন্নত চরিত্র হইয়া সুনিপুণা গৃহিণী এবং উপযুক্ত মা হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে মহাত্মাজীর অভিমত—

"নবজীবন" পত্রে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন যে, দশ বৎসরে কন্যার বিবাহ দিলে পিতার কোন পুণ্যই হইতে পারে না। যে কন্যার আজ বিবাহ হইয়া আজই পতি মরিয়া গেল, তাহাকে বিধবা বলিতে পারি না। বৈধব্য সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিয়া আমরা মহাপাপ করিতেছি। যদি বিধবাদের সুরক্ষিত করিতে হয়, তাহা হইলে পুরুষদেরও কি নিজধর্ম্মের বিচার করা আবশ্যক হয় না? যাঁহার মন বিধবা হয় নাই তাঁহার শরীর বিধবা হয় কি করিয়া? তাঁহার প্রতি তাঁহার পিতার কর্ত্তব্য কি? তাঁহার গলায় ছুরি মারিলেই কি পিতার কর্ত্তব্য পালন করা হইল?

বৈধব্যের পবিত্রতা রক্ষার জন্য, ধর্ম্ম রক্ষার জন্য এবং সমাজের সুব্যবস্থার জন্য আমি অনেক চিন্তার পর নিম্নলিখিত নিয়মগুলির আবশ্যকতা বিবেচনা করিতেছি:—

(১) কোন পিতা ১৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কন্যাকে বিবাহ দিতে পারিবেন না।

(২) ১৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে যাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং ১৫ বৎসরের মধ্যেই যাহারা বিধবা হইয়া গিয়াছে, তাহাকে পুনরায় বিবাহ দেওয়া পিতার ধর্ম্ম হইবে।

(৩) ১৫ বৎসর বয়সের বালিকা যদি বিবাহের এক বৎসরের ভিতর বিধবা হইয়া যায়, তাহা হইলে মাতাপিতার কর্ত্তব্য হইবে তাহাকে পুনরায় বিবাহ করিতে উৎসাহিত করা।

(৪) আত্মীয়স্বজনের প্রত্যেকেরই বিধবাকে সম্পূর্ণ আদর করা উচিত। মাতা, পিতা, শ্বশুর, শাশুড়ী সকলেরই বিধবার জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

মাতৃ মন্দির



মায়ের কোলে



মাতৃমন্দির



২য় বর্ষ } শ্রাবণ—১৩৩১ { ৪র্থ সংখ্যা

অতুলনা

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ।

"অতুলনা ভারত ললনা" ;
দূরগত অতীতের লুপ্ত চিত্রশালা
ঘেরি উঠে সঙ্গীত মূর্চ্ছনা।
লক্ষ শিখে রশ্মি ঢালে আরতির দীপ,
কণ্ঠে কণ্ঠে ঝঙ্কৃত বন্দনা,
বাজে মাঙ্গলিক শঙ্খ বর্ষে পুষ্পাঞ্জলি,
মুগ্ধ চক্ষে নেহারে কল্পনা—
অতুলনা ভারত ললনা।

লাজে নত শির বর্ত্তমান ;
শূন্য সৌধ জাগে বুকে লইয়া তিমির,
নীরব মুরজ বীণা গান।
মৃত্যু মেলি আস্য হাসে ব্যাধির নীড়েতে,
ভীতি করে নিত্য অভিযান,
মূর্খতার আলিঙ্গনে ঘুমায় ক্ষুদ্রতা
ঈর্ষা মেলে জিহ্বা লেলিহান ;—
লাজে নতশির বর্ত্তমান।

বঙ্গনারী

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

[এই প্রবন্ধের পূর্ব্বার্দ্ধ ১৩৩০ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় মাতৃ-মন্দিরে বাহির হইয়া গিয়াছে]

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি অন্তঃপুর-কারা হইতে স্ত্রীলোকদিগকে বাহির হইতে হইবে। আজীবন অন্তঃপুরে রুদ্ধ বায়ুতে থাকার ফলে সহরবাসিনী নারীদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন রুগ্ন ও অসুস্থ, এই স্বাস্থ্যহীনা রমণীরাই আবার সন্তানের জননী। রুগ্ন মায়ের সন্তান কখনই সুস্থ ও নিরাময় হইতে পারে না। বর্ত্তমানকালের বাঙ্গালীদের স্বাস্থ্যহীনতার ইহাই অন্যতম কারণ। শরীরের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ খুব নিকট, কাজেই রোগজীর্ণ মস্তক কখনই মনীষার আধার হইতে পারে না, তদ্ভিন্ন অসুস্থ দেহে মানসিক পরিশ্রম ও পরিপাক হয় না। আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বহুমূত্র, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ ও অকালমৃত্যু ইহারই অনিবার্য্য পরিণাম। যাহা হউক জাতিকে প্রত্যাসন্ন ধ্বংসের করাল কবল হইতে রক্ষা করিতে হইলে নারীদের পায়ের শৃঙ্খল উন্মুক্ত করিতে হইবে, ঘরের বাহিরে প্রকৃতির প্রাঙ্গনে স্বাধীনতার সঙ্গে তাহাদের পরিচিত করিতে হইবে।

যে নারীর প্রতি আমাদের পিতৃপুরুষগণের সম্ভ্রম ও সৌজন্যের সীমা ছিল না—যে বরেণ্য জাতির ব্যবস্থাকার মনু স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন "শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং। ন শোচন্তি তু যত্রৈতাঃ বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা" অর্থাৎ "যে গৃহে কুলকামিনীগণ দুঃখে কাল কাটায় সে গৃহ ত্বরায় বিনষ্ট হয়, ইহারা যেখানে সুখে থাকে সে গৃহের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হয়।" সেই প্রাচীন আর্য্য জাতির বংশধর হইয়া আমরা স্ত্রীলোকদের প্রতি এত অবহেলা ও অনাস্থা দেখাই কেন, তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়।

স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা দিবার পূর্ব্বে চাই পুরুষদের নৈতিক বুদ্ধির জাগরণ। যতদিন না দেশের পুরুষেরা নারীদের সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত হইতেছে, যতদিন না পুরুষ কঠোর সাধনার দ্বারা অন্তরস্থ হীন প্রবৃত্তিনিচয়কে জয় করিতে পারিতেছে ততদিন স্ত্রীস্বাধীনতা সুফলপ্রসূ হইবে না। একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে বর্ত্তমান সময়ে পুরুষদের মধ্যে নীতি ও সমাজের বন্ধন যথেষ্ট পরিমাণে শিথিল হইয়াছে। সমাজও অন্ধস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া (কারণ পুরুষদের হাতেই সমাজ) পুরুষদের যাবতীয় ত্রুটীবিচ্যুতি নির্ব্বিচারে ক্ষমা করিয়া থাকেন, যতদিন না নারী ও পুরুষের মধ্যে খাদ্য খাদকের সম্বন্ধ গিয়া সুদৃঢ় প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হয় ততদিন স্ত্রীস্বাধীনতা আদৌ নিরাপদ নয়।

বিশেষতঃ আজকাল যে প্রণালীতে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে আমরা তাহার বিরোধী। কতকগুলি সেক্সপীয়র মিল্টন গলাধঃকরণ করিয়া ও তাহার জাবর কাটিয়া আমাদের দেশের ভাবী জননীরা যখন ডিগ্রীর তকমা ঝুলাইয়া কলেজ হইতে বাহির হন তখন তাঁহাদের কঙ্কালসার পাণ্ডুর মূর্ত্তিগুলির পানে চাহিয়াই গভীর ব্যথায় বুক ভরিয়া যায়। অধুনাতন এই পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। আমাদের বিশ্বাস এই অযোগ্য শিক্ষার ফলে এদেশের মেয়েদের মধ্যে দয়া স্নেহ মমতা প্রভৃতি স্ত্রীসুলভ সুকুমারবৃত্তির দিন দিন অপচয় ঘটিতেছে। এই ধর্ম্মহীন শিক্ষার ফলে নৈতিক চরিত্র স্ফূর্ত্তিলাভ করিবার সুযোগ পাইতেছে না।

গত ফাল্গুনমাসের বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত

"সিংহের বিবরে" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীমতী সরলা দেবী যে ভাষায় বন্ধুবর প্রবীণ সাহিত্যিক যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়কে আক্রমণ করিয়াছেন তাহাতে সাধারণ ভদ্রতা এবং রুচির সম্মান পদে পদে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সিংহ মহাশয় বিধবার "প্রেমে পড়ার" বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন বলিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিতা শ্রীমতী সরলা "পরকীয়া" প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া যেরূপ তীর্য্যক ভঙ্গীতে কটূক্তি করিয়াছেন তাহা দেখিয়া বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আমাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ বিচলিত হইয়াছে। একজন শিক্ষাভিমানিনী রমণী যে এইভাবে কোমর বাঁধিয়া কলহ করিতে পারেন তাহা আমাদের অজ্ঞাত ছিল। যে সহজ কোমলতা ও বাক্যসংযম কামিনীর কমনীয়তাকে এক স্বর্গীয় সুষমায় পূর্ণ করিয়া রাখে — প্রচলীত স্ত্রীশিক্ষা যদি তাহার সহায়ক না হইয়া বিলোপের কারণ হয় তবে তাহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? বাস্তবিক, সারহীন পুস্তক পাঠ করিয়া আমাদের মেয়েদের বুদ্ধি বিপথ-গামী হইতেছে। মোপাসাঁ, ব্যালজাক্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য লেখকগণের কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল গল্প উপন্যাস পাঠ করিয়া চিত্ত এত কলুষিত হইয়াছে যে শ্লীলতার সীমারেখা লঙ্ঘন করিতে তাঁহাদের একটুও বাধে না অথবা মন্দকে মন্দ বলিয়া চিনিবার চেতনা পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। বিলাতী সভ্যতার স্রোতে তাঁহারা একেবারে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন আপাত-রম্য প্রবৃত্তির পথকেই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া তাহারই শরণাপন্ন হইয়াছেন। তা ছাড়া নারী পুরুষের প্রকৃতি যখন স্বতন্ত্র, তখন শিক্ষা কখনও এক হওয়া উচিত নয়। পুরুষদের মত বি-এ, এম-এ পাশ করিলেই যে চরম সুশিক্ষা হইল তাহা যেন কোন রমণী মনে না করেন। যে শিক্ষায় হৃদয়বৃত্তির উন্মেষ হয়—যে শিক্ষা নারীহৃদয়কে এক দুর্লভ মণি মঞ্জুষায় পরিণত করে—প্রতিভার সহিত মাধুর্য্যের, দৃঢ়তার সহিত কারুণ্যের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটাইয়া দেয় তাহাই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা নামের যোগ্য। অপিচ, দেশের যা কিছু সমস্তই অকিঞ্চিৎকর ও বিদেশের শিক্ষা দীক্ষা সকলই চমৎকার এই ভ্রান্ত ধারণাই সমস্ত বিপত্তির মূল।

মেয়েদের স্বাধীনতা দিতে হইবে কিন্তু তাহাও ক্রমে ক্রমে। অবরোধের অন্ধকারে চক্ষু যাহার দীপ্তিহীন, মধ্যাহ্ন-রবির প্রখর রশ্মি তাহার সহিবে কেমন করিয়া? বাস্তবিক সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে দেশীয় সহিত বিলাতীর কলম বাঁধিতে হইবে, বর্জ্জন বরণের মধ্য দিয়া আদর্শকে আয়ত্ত করিতে হইবে।

অনেকের ধারণা নারীকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দিলেই বুঝি তাহার সতীত্বের হানি হইবে। প্রথম প্রথম ব্যভিচারের সংখ্যা হয়ত কিছু বেশী হইবে। কিন্তু এই অবাধ মিলনের অজস্র প্রলোভনের মধ্যেও যাঁহাদের চরিত্র-মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকিবে সেই নারীরত্নগণের অক্ষয় পুণ্যে ভাগ্যবিধাতা প্রসন্ন হইয়া দেশের উপর কল্যাণ ও আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন। নারীর অপমানের জন্য দায়ী কে? পুরুষ। পুরুষের লালসা-বহ্নিতে নারীর উৎসর্গ নূতন কথা নয়। তা ছাড়া, সতীত্ব কি কেবল বাহিরের বস্তু? কি তাহার সতীত্বের গৌরব? যে পরের প্রতি আসক্তি পোষণ করিয়া শুধু সুযোগের অভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না? কায়মনে যে পতিপ্রেমানুরাগিনী নয় সে আবার সতী কোন্‌খানে?

কামনার বশবর্ত্তী হইয়া ভালবাসা—আর প্রণয়ের বশবর্ত্তী হইয়া ভালবাসা, এক নহে। উদ্দাম কাম রিপুকে নিবৃত্তির ডোরে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সমভাবে আবদ্ধ না করিলে, প্রেমের নির্ম্মল সলিল আবিলতায় পূর্ণ হয়। দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ও অনৃত-বাদিতা সতীত্বের নির্ম্মাল্যের পরিপন্থী। পরপুরুষে অনাসক্ত রমণীও স্বামিকাহীনা সতী নহেন, যদি তাঁহার হৃদয়ে—অসূয়াদি প্রবৃত্তি আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। ঈর্ষার বশীভূতা রমণী স্বৈরিণীর সহচরী।

নারীপ্রকৃতির সহিত আমাদের যতটুকু পরিচয়

তাহাতে জানি যে দাম্পত্যসম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া গৃহ পরিবারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া নারীর পক্ষে স্বাভাবিক। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলে নারীর পারিবারিক কর্ম্মক্ষেত্রকেই সর্ব্বাগ্রে গণনা করিতে হয়। এই হিসাবে পতিসেবা ও সন্তান পালন নারীর প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য। যে জননী পুত্রের অন্ততঃ ৯।১০ বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষার ভার নিজ হস্তে রাখিতে না পারেন তাঁহার শিক্ষা কিছুই হয় নাই জানিতে হইবে। স্বাস্থ্যতত্ত্বের স্থুল নিয়মগুলি প্রত্যেক নারীরই জানা থাকা উচিত।" এক কথায় উপযুক্ত জননী, সেবাপরায়ণা সহধর্ম্মিণী, নিপুণ গৃহিণী ও জনপ্রিয় প্রতিবেশিনী হইতে হইলে যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন তাহাই হইল প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা। লোকসমাজে ধর্ম্ম ও নীতির মর্য্যাদা রক্ষাও স্ত্রীলোকের কাজ। পাপের প্রতি বিরাগ ও সাধুতার প্রতি অনুরাগ নারী চরিত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, যাহাতে এই স্বাভাবিক বৃত্তি উন্মেষলাভ করিতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা শিক্ষার অন্যতম কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি আধুনিক শিক্ষাধাতাকলের মধ্যে পড়িয়া রমণীসুলভ কান্ত কোমল গুণাবলীর হ্রাস হইতেছে। রমণী—কল্যাণী, গৃহলক্ষ্মী; সংসার-সাগর মন্থনোত্থিত গরল পান করিয়া রমণী পুরুষের জন্য অক্ষয় অমৃত সঞ্চিত করিয়া রাখে। অতএব যে শিক্ষা এই সমস্ত গুণ বিকাশের পরিপন্থী তাহা কখনই সমীচীন হইতে পারে না। রোগার্ত্ত ও দরিদ্র নারায়ণের সেবা, বিপন্নের বিপদুদ্ধার নারীর অপর কর্ত্তব্য। আমরা পরের দোষটী অনুকরণ করি, গুণের খবরও লইনা। পীড়িতের আর্ত্তনাদ শুনিয়া চক্ষু করুণার্দ্র করিয়া কি ফল যদি তাহার কোন কাজেই না লাগিলাম? সে সহানুভূতিতে কি প্রয়োজন যাহা শূন্যগর্ভ দুচারিটী বাক্য ও দুএক বিন্দু অশ্রু ব্যতীত আর কিছুই প্রসব করিল না! Florence, Nightingale প্রভৃতি ইংরাজ কুমারীর সেবার কথা আমরা জানি; কিন্তু সেইরূপ নিঃস্বার্থ-সেবা ও পরহিতব্রতে দীক্ষিত হইতে পারি কয়জন?

পরিশেষে বক্তব্য আমাদের সমাজের যে অবস্থা তাহাতে মহিলাকুল সম্পূর্ণভাবে পুরুষের মুখাপেক্ষী। প্রায়ই দেখা যায় স্বামী বা অন্য কোন অভিভাবকের তিরোধানে নারী পরের গলগ্রহ হইয়া পড়ে। এক মুষ্টি অন্ন ও একখানি পরিধেয় বসনের জন্য শত লাঞ্ছনা, অবমাননা সহিয়াও পরের আশ্রয়ে তাহাদের পড়িয়া থাকিতে হয়। এরূপ স্থলে যদি মেয়েদের সীবন ও বয়ন প্রভৃতি কার্য্যকরী শিল্প শিক্ষা দেওয়া যায় তবে নারীর অনেক অন্যায় লাঞ্ছনা বাঁচিয়া যায়। আমরা সধবা নারীর রোজগার করিতে যাওয়ার পক্ষপাতী নহি তবে লাথি ঝাঁটা সহিয়া পরের আশ্রয়ে থাকিয়া কৌলীন্য বজায় রাখাও সমীচীন মনে করি না। এমন দিনকাল পড়িয়াছে যে শিক্ষিতা বধূর পাকশালায় গেলে মাথা ধরে, রাত্রিদিন নভেল গুঁজিয়া না থাকিলে হজমের ব্যাঘাত হয়। সকলেই কিছু সমৃদ্ধির অধিকারী হয় না অতএব দারিদ্র্যের মধ্যে শান্তির আশ্বাস পাইতে হইবে। দারিদ্র্য যে পথের পাথেয় হরণ করিতে অক্ষম, সেই ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করিতে হইবে নতুবা এই অকৃত্রিম শিক্ষাবিধি আপনি আপনাকে অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও ফলবান করিয়া তুলিবে তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

হিন্দুর বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার। মাতাপিতা, ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ পুত্রকন্যাদি লইয়া অদূর অতীতেও হিন্দু যে সুখের বিপুল নীড় রচনা করিয়া নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে কাল কাটাইত তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না। আজ আমাদের ঘরে ঘরে ইংরাজী ভাব ঢুকিয়াছে, উপার্জ্জনক্ষম হইলেই আমরা সস্ত্রীক নিজের পথ দেখিয়া লই—জীবিকার্জ্জনে অক্ষম বৃদ্ধ মাতাপিতাকে গলগ্রহ বলিয়া মনে করি। ভায়ে ভায়ে সদ্ভাব নাই—জায়ে জায়ে দারুণ বিরাগ। একদিন ছিল যেদিন ছোট ভাই বড় ভাইকে সংসারের সর্ব্বময় কর্তৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কৃতার্থ হইত, দাদাও ভাই বলিতে আত্মহারা হইত। সেদিন আর নাই।

কোথায় গেল সেই স্নেহ-সুরধুনীর পবিত্র ধারা! কোথায় আজ সেই অটল বিশ্বাস, অমেয় প্রেম ও অনন্ত নির্ভর? বহুস্থলেই এই ভ্রাতৃবিচ্ছেদের মূলে রমণীর স্বার্থপরতা, জায়ে জায়ে মনোমালিন্য। আমার স্বামী উপার্জ্জন করেন অতএব সে অন্নে আমি ছাড়া আর কাহারও অধিকার নাই এই হীন স্বার্থবুদ্ধিই গৃহবিবাদের একমাত্র কারণ। স্ত্রীদিগের এই হীনচিত্ততার মূলে অশিক্ষা অথবা কুশিক্ষা। তারপর শ্বশ্রূ ও পুত্রবধূর সম্বন্ধও আজকাল বড় মধুর নয়। বৌকাটকী শাশুড়ীর বাক্যের উষ্মায় ও অমানুষিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া কত স্নেহলতা যে অকালে মরণকে বরণ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পূর্ব্বে শ্বশ্রূ ও পুত্রবধূর সম্বন্ধ ছিল মা মেয়ের সম্বন্ধ, কনে বৌ পতিগৃহে আসিয়া শাশুড়ীর শীতল স্নেহচ্ছায়ায় বিচ্ছেদের সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইত। তাই বলিয়া সেকালে শাশুড়ীরা পুত্রবধূদের তিরস্কার করিতেন না এমন নয়। স্নেহময়ী জননীর ন্যায় দোষ সংশোধনের সাধু-ইচ্ছা লইয়া তাহার তিরস্কার করিতেন, গায়ের জ্বালা মেটাইবার জন্য নয়। স্নেহের মধ্যে যে কঠোরতা, প্রচ্ছন্ন মঙ্গলেচ্ছা লইয়া যে ভর্ৎসনা তাহা অকারণ ব্যবধানের সৃষ্টি না করিয়া মিলনের সুদৃঢ় সেতু রচনা করিত। কিন্তু আজকালকার নভেল-পড়া শাশুড়ীদের তিরস্কারের ভিতরে জ্বালাই সবখানি; তিলপরিমাণ স্নেহের আভাসও তাহার মধ্যে পাওয়া যায় না। শাশুড়ীদের মধ্যে আর সে প্রাণ-খোলা সরলতা নাই। বৌ সারাদিন সমস্ত গৃহকর্ম্ম করিয়া মরিল কিন্তু যেমনই পাড়াবেড়ানী বামাসুন্দরীর আবির্ভাব হইল অমনই শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মুখ হইতে তীব্রতা কোথায় চলিয়া গেল, উঁচুগলায় স্নেহে গলিয়া বলিলেন "থাক্ থাক্ বৌমা, তুমি ছেলে মানুষ, তুমি কি এই আগুণের তাতে বসে দুধ জ্বাল দিতে পার?" তারপর মোলায়েম ভাষায় একে একে বধূর গুণের যে তালিকাটী দিয়া গেলেন তাহাকে যদি কেহ বিপরীত অর্থে গ্রহণ করে তবে তাহার দোষ দেওয়া যায় না। স্বভাবতঃই এই সকল নিগৃহীতা বধূরা শাশুড়ী হইয়া তাহাদের পাওনা Compound interestএ আদায় করিয়া লয়। এই বিরোধের মূলেও অশিক্ষা অথবা কুশিক্ষা। ইহাদের মধ্যে বধূপক্ষ যদি এরূপ ভাবে শিক্ষিত হয় যে উষ্মার সমস্ত উত্তাপ অবলীলাক্রমে সহিতে প্রস্তুত থাকে, সর্ব্ববিধ দুর্ব্যবহারকে স্বচ্ছন্দমনে বরণ করিয়া লইতে অভ্যস্ত হয় তবে সেই আত্মত্যাগের অমূল্য মূল্যে যে শান্তি ক্রীত হইবে তাহার ক্ষয় কখনও হইবে না। স্ত্রীশিক্ষা দিবার সময় এই কথাটী মনে রাখিলে অদ্ভুত উপকার সাধিত হইবে।

আনন্দ কর্

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় কবিগুণাকর বি-এ।

আনন্দ কর্ আনন্দ কর্
　　এ যে আনন্দ ধাম,
দুঃখ দৈন্য ভুলে যারে সব—
　　নিস্‌নে দুঃখের নাম।

এ যে আনন্দময়ীর ভবন,
হেথা নাহি থাকে অভাব বেদন—
কোথায় এমন প্রেমের বাঁধন
　　স্বভাবের শোভা শ্যাম?

একবার যদি শুধু 'মা' 'মা' বলে'
ডাকিস্—বিপদ কোথা যাবে চলে'
পাবি নব বল, শোষে তাঁরি কোলে
　　পাবি স্থান—কি আরাম!

নির্ব্বাণ

(গল্প)

শ্রীআশুতোষ দত্ত বি-এ।

(১)

শৈশবে মাতৃহারা ও বাল্যে পিতৃহারা হইয়া শ্বশুরশাশুড়ীর মধ্যে নূতন মাতাপিতা পাইয়া সকল অভাব, সকল দুঃখ ভুলিয়াছিলাম এবং দেবোপম শ্বশুরশাশুড়ীর সেবা ও নারীজীবনের একমাত্র অবলম্বন, কোমলতায় ভরা আমার জীবন-সঙ্গীর সাহচর্য্যে জীবন সুখেই কাটিয়া যাইতেছিল—যেন সোণার তরী মধুর হিল্লোলে হেলিতে দুলিতে সুখ সাগরে ভাসিয়া চলিতেছিল।

ষোল বৎসর কাল এইভাবে কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল বলিতে পারি না। যাঁহাদের সংসারে—বিশেষতঃ যাঁহার হাতে—মাতৃহারা এই বালিকা কন্যাকে পিতাঠাকুর মহাশয় সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অকপট স্নেহ ও সহৃদয়তার ছোট বড় কত পরিচয়ই যে পাইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। এমন শ্বশুরশাশুড়ী এবং স্বামী পাইয়া কেবল আমিই যে ভাগ্যবতী বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতাম তাহা নহে, কত সংকীর্ণচেতা নারীও আমাকে হিংসা করিতে ছাড়িতেন না। যাক্ সে সকল কথা।

(২)

তখন পঁচিশে মাত্র পা দিয়াছি। কোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। সেবার ঘরে ঘরে ইনফ্লুয়েন্জা। সারারাত্রির মধ্যে স্বামীর সংজ্ঞা দেখিলাম না। বড়ই ভয় হইল—কি জানি ভাগ্যে কি ঘটে! পরদিন দুপুরের পর আমিও ইনফ্লুয়েন্জার শয্যা লইলাম, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানলোপ হইল। বিয়াল্লিশদিন পরে জ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম, কিন্তু বুঝিতে পারিলাম আমি সে আমি নহি। জানিতে পারিলাম, ক্রমাগত আটাশদিন অক্সিজেন গ্যাসের সাহায্যে আমার শ্বাসক্রিয়া বজায় রাখা হইয়াছিল, অন্যূন ষাটটি ইন্জেক্সন দেওয়া হইয়াছিল; বরফ অডিকোলন ও ইউ-ক্যালিপ্টাস্ প্রভৃতির খরচের ত কথাই ছিল না। আত্মীয় স্বজনের, বিশেষতঃ সোদর প্রতিম দেবরের অক্লান্ত সেবাশুশ্রূষা ও পূজনীয় শ্বশুরঠাকুরের ভগবচ্চরণে আকুল প্রার্থনায় যমদ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। রোগীর পরিচর্য্যা যে কি ভাবে করা যাইতে পারে তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত আমার দেবর দেখাইয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবি করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে রাখুন। আমার বহু ভাগ্য যে স্বামী আমার পূর্ব্বেই আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

রোগ মুক্তির পর যে শিশুর স্বভাব পাইয়াছিলাম তাহা মনে করিলে এখন হাসি পায়। মনে আছে আহারে বিলম্ব হইলে কিরূপ কাঁদিয়া আকুল হইতাম। রহস্যালাপও বুঝিতে পারিতাম না, রাগিয়া মরিতাম। পঁচিশ বৎসরের 'ঘরণি' গৃহিণী আমি, সে অবস্থায় পুতুল খেলাও করিয়াছি। কত আর ছাই বলিব! কিন্তু এ যে কাহিনীও নয়, কল্পনাও নয়! হায়, কি সরলতাই পাইয়াছিলাম!

(৩)

চিকিৎসকেরা আমাকে তুলা পশমে আচ্ছাদিত পুতুলের ন্যায় রাখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভয় ছিল আমার শরীর আর কখন গৃহস্থ ঘরের অপরিহার্য্য পরিশ্রমও সহ্য করিতে পারিবে না।

শুনিয়া আমি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। ও মা! সে কি গো? রমণী-জীবন লাভ করিয়া যদি আত্মীয় স্বজনের সেবায় অসমর্থ হইলাম, তবে এ জীবনের আবশ্যকতা কি? অল্পদিনেই যে জীবন দুর্ব্বিসহ ভার হইয়া উঠিবে, স্বামীর গলগ্রহ হইয়া পড়িব, দরিদ্রের গৃহে অশান্তির সৃষ্টি হইবে! শরীরে যেমন নববলের সঞ্চার হইতে লাগিল, মনোবৃত্তি যেমন প্রচলিত পথে চলাফেরা করিতে লাগিল, হৃদয় ততই ব্যর্থ জীবনের দুর্ব্বিসহ গুরুভার বহনের ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। সদানন্দপুরুষ আমার স্বামীদেবতার মুখে বিষাদের ছায়া দেখিলাম। ভাবনায় আকুল হইয়া, ভগবানের পাদপদ্মে শরণ লইলাম। "যদি এ জীবন ফিরাইয়া দিলে প্রভো, তবে আত্মীয় স্বজনের সেবা ও পরিচর্য্যার সুখ হইতে বঞ্চিত করিও না, নারী-জীবন ব্যর্থ করিও না।" হৃদয়ের অকপট নিবেদন, ব্যথিতের কাতর ক্রন্দন যদি করুণাময়ের নিকট না পঁহুছিবে তাহ'লে যে তাঁহার অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক হইবে!

কয়েকমাসের মধ্যেই সাংসারিক কার্য্য চালাইবার উপযুক্ত সামর্থ্য ফিরিয়া পাইলাম। স্বামী আমার পরিশ্রমে বাধা দিতেন না বটে, কিন্তু পরে যেমন বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তাঁহার মন হইতে আমার সম্বন্ধে উদ্বেগ যায় নাই। বায়ু পরিবর্ত্তন দ্বারা আমার স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে এই আশায় তিনি স্বাস্থ্যকর স্থানে চাকরির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই হতভাগিনীর চিকিৎসার ঋণ ও স্বাস্থ্যের চিন্তাই তাঁহার নির্ম্মল জীবনাকাশে কাল মেঘের সৃষ্টি করিল। বৃদ্ধ ঠাকুর ও বর্ষীয়সী ঠাকুরাণী যে আমাদের অভাবে তাঁহাদের সেবা-নির্ভর জীবনে কত অসুবিধা ভোগ করিবেন! হতভাগিনী আমি! আমার নবজীবনের উন্মাদনায় এত বড় সত্যটা আমিও ভুলিয়া গেলাম। আত্ম সুখের চিন্তা ও প্রচেষ্টাই যে মানব জীবনের সকল অশান্তির কারণ—একথা কেন ভগবান আমাদের মনে অহরহঃ জাগরূক রাখেন না?

দুই তিন মাস বিদেশ বাসের পরই আমরা উভয়েই আমাদের ভুল বুঝিতে পারিলাম। যাঁহাদের স্নেহাঞ্চলের নিবিড় আবরণে সংসারের সকল অন্ধকার, সকল কুজ্ঝটিকা হইতে আমাদিগকে আজীবন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, দয়াধর্ম্মের অবতার সেই মাতাপিতা হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিয়া তাঁহার কাল্পনিক সুখের মোহ অচিরে টুটিয়া গেল। প্রতি পত্রেই শ্বশুর মহাশয় তাঁহার স্নেহের পুতুল নাতি নাতিনীর জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমাদের মানসিক চঞ্চলতাও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

(৪)

সেদিনের কথা কখনও ভুলিতে পারিব না। ভাদ্রমাস; সেদিন অজস্রধারায় বৃষ্টিপাত হইতেছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই স্বামী আমার বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে বাসায় উপস্থিত হইলেন। শুষ্ক বস্ত্রাদি নিকটে ধরিয়া দিয়া 'চা' তৈয়ারের জন্য 'ষ্টোভ্‌টি' জ্বালিতে যাইতেছি, অশ্রুভারকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "চা তৈরি করতে হবে না।" মুখ পানে চাহিয়া দেখি তাঁহার চোক ছল ছল করিতেছে। ব্যাপার কি অনুসন্ধান করিতে সাহসে কুলাইল না। কিন্তু বৃথা কালক্ষেপের অবসর ত ছিল না। চোকের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিয়া উঠিলেন, "বাবার বড় অসুখ, আমাদিগকে এই ক্ষণেই বাড়ী যেতে হবে, তুমি গোছ গাছ করে নাও আমি গাড়ী দেখি।" আধ ঘণ্টার মধ্যেই সেই দারুণ বর্ষার মধ্যে আমরা বাড়ী রওনা হইলাম।

যখন আমরা দেশে পৌছিলাম, তখন রাত্রি প্রায় তিনটা হইবে। ষ্টেশন হইতে আমাদের বাড়ী বেশী দূর নহে, আমাদের মানসিক চঞ্চলতাও বড় প্রবল ছিল। জিনিষপত্র ষ্টেশনে রাখিয়া একটি মাত্র কুলি লইয়া, নিদ্রাতুর ছেলেপুলেকে হাঁটাইয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। শাশুড়ী ঠাকুরাণীর চরণধূলি গ্রহণান্তে শ্বশুর মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তিনি

উৎফুল্ল নয়নে বলিয়া উঠিলেন, "আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এসেছ মা! দেখ মা, তোমাদের সেবা যত্ন না পেয়ে আমার দেহের অবস্থা কি হয়েছে!" তখন তাঁহার রোগপাণ্ডুর মুখমণ্ডলে কি আনন্দ-জ্যোতিঃই শোভা পাইতেছিল! আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সমাগমে রোগশয্যায় কত না সান্ত্বনাই আনে! আমরা উভয়েই নির্ব্বাক্ অবস্থায় শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছি, চোক হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

কমল ও অরবিন্দ এতক্ষণ তাহাদের পিতামহের শয্যাপার্শ্ব দখল করিয়া বলিতেছিল, "দাদাম'শায়, আমরা এসেছি; এতদিন তোমাকে না দেখে আমাদের বড় কষ্ট হ'ত, দাদাম'শায়।"

"এস দাদা এস, আয় দিদি আয়। তোদের না দেখেই আমার এ অসুখ, এবার আমি ভাল হ'য়ে যাব।"

"দাদাম'শায়, তোমার মাথা ব্যথা ক'র্‌ছে? মাথায় হাত বুলিয়ে দি". বলিয়া কমল তাঁহার মাথার ধারে গিয়া বসিল। অরবিন্দ আস্তে আস্তে পা টিপিতে লাগিল। মাতাঠাকুরাণী ইতিমধ্যে গরম দুধ ও হালুয়া তৈয়ার করিয়া আনিয়া উপস্থিত হইলেন, ছেলে মেয়েদের খাওয়াইয়া তাঁহার পুত্রকে হাত মুখ ধুইতে বলিলেন।

আমার স্বামী বরাবরই কম কথা কহিয়া থাকেন, কিন্তু তেমনই আবার ভাবপ্রবণ। পিতাঠাকুর মহাশয়ের স্বাস্থ্যভঙ্গ সম্বন্ধে মনে মনে নিজেকে অপরাধী করিয়া লইয়াছিলেন। এই কাল্পনিক অপরাধের চিন্তা তাঁহার কোমল হৃদয়কে এরূপ মথিত করিতেছিল যে দীর্ঘ-দিবসের পরিশ্রম ও অনাহার তাঁহার মনে আদৌ স্থান পায় নাই। মাতাঠাকুরাণীর আগ্রহাতিশয্যে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া সামান্ত কিছু আহার করিলেন। কিন্তু চিকিৎসকের নিকট হইতে কতক্ষণে পিতাঠাকুর মহাশয়ের পীড়ার প্রকৃত অবস্থা শুনিবেন, এই উৎকণ্ঠায় শয্যাগ্রহণ করিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।

(৫)

ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে ভুগিতে শ্বশুর মহাশয় ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে দুই চারি দিন একটু সুস্থ থাকিতেন বটে, কিন্তু প্রায়ই জ্বর হইতে লাগিল। ক্রমে কুইনাইন ও ফিবার মিকশ্চারের উপর তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল। তখন কবিরাজি চিকিৎসা আরম্ভ হইল। কবিরাজি ঔষধে প্রথম প্রথম কিছু উপশম বোধ হইল, ক্রমে তাহাও নিষ্ফল। রক্তহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পাইল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভয়ও বাড়িয়া উঠিল। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, এবং সকলের সঙ্গেই তাঁহার বেশ সৌহার্দ্দ ছিল। প্রায়ই দুই একজন আসিয়া তাঁহার সহিত গল্পগুজব করিয়া ও তাঁহাকে সাহস দিয়া রোগদীর্ঘ একঘেয়ে দিনগুলি কাটাইয়া দিয়া যাইতেন। আমার স্বামী তিন মাসের ছুটী লইয়াছিলেন, তাহা ফুরাইয়া আসিল। ছুটী বাড়াইবার জন্ম পুনরায় আবেদন করিলেন। তিনি পিতাঠাকুর মহাশয়ের শুশ্রূষায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন, ঔষধ পথ্যাদি তাঁহার উপস্থিতিতে দেওয়া হইত। তিনি মাত্র একবার সন্ধ্যার সময় বেড়াইয়া আসিতেন।

সেদিন উত্তরায়ণ সংক্রান্তি। প্রাতে কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়া কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া গেলেন। হরেকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য আমার শ্বশুরমহাশয়ের নিকট কয়েকবার বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন। তিনি সেদিন অনেকক্ষণ তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে বড়ই সম্প্রীতি ছিল, বিশেষতঃ আমার শ্বশুর বংশে সকলেই দেবদ্বিজে বিশেষ ভক্তিমান্। ভট্টাচার্য্য মহাশয় উঠিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, আর শ্বশুরমহাশয় বলিতেছিলেন, "বস দাদাঠাকুর, আর একটু বস, হয়ত আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বয়সে অনেক ছোট, তিনি বলিতেছিলেন, "সে কি কথা বলেন দাদা? ভয় কি? আপনি

নিশ্চয়ই সেরে উঠ্‌বেন।" "ভয় আমার কিছু নেই দাদাঠাকুর, তবে আমার মন যেন ব'লছে—আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল শ্বশুর মহাশয় যেন একটু অতিরিক্ত নিস্তেজ ও ম্রিয়মাণ। আমরা ভাবিলাম, বোধ হয় দুর্ব্বল শরীরে বেশী কথাবার্ত্তা করিয়া রোগ-কাতর দেহে একটু অবসাদ আসিয়াছে, অল্প গরম দুধ বা অন্য কোন রকম পথ্য খাইলেই সুস্থ হইতে পারিবেন। গরম দুধে চুমুক দিতে দিতে বলিয়া উঠিলেন, "ওগো! আমার সময় হ'য়ে আসছে, আমি আর বেশীক্ষণ বাঁচব না, আমার মেয়েদের খবর দাও। আর দেখ, আমাকে ঘরে মের' না, দুর্গামণ্ডপে নিয়ে যেও।" ইহার পর প্রতি মুহূর্ত্তেই যেন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমাদের হাত পা অধিকতর অবশ হইয়া আসিতেছিল। ইহার ঘণ্টা খানেক পরেই তাঁহার অমর আত্মা নরদেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল—বারিবিন্দু বারিধিতে মিশাইল।

পূর্ব্বেই আমার ঠাকুরঝিদের নিকট টেলিগ্রাম গিয়াছিল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইবেন, এ আশা ছিল। সুতরাং তাঁহাদিগকে একবার শেষ দেখা দেখিতে দিতে হইবে, স্থির হইল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ী আত্মীয়স্বজনে ভরিয়া উঠিল। বহু আত্মীয়স্বজন ও দেশের অনেক গণ্যমান্য লোকে মিলিয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সকলে একবাক্যে বলিতে লাগিলেন—এ রকম মৃত্যু বহু ভাগ্যের ফলেই ঘটিয়া থাকে। সাধক বলিয়াছেন "জপ তপ কর কি মরণে হঁসিয়ার।"

(৬)

শ্বশুরমহাশয় পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর প্রায় দুই বৎসর পরের কথা। আমার মাতৃহারিণী শাশুড়ী ঠাকুরাণীর দেহ মন ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, সংসারের সুখ দুঃখ আর তাঁহাকে স্পর্শ করে না। স্থূল শরীর রক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় আহারাদি বিষয়েও তাঁহার আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা কমিয়া আসিয়াছে, তিনি এরূপ নির্ব্বিকার-চিত্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে নর-নারী মাত্রই সকল নির্ব্বিশেষে তাঁহার নিকট "মা," "বাবা" হইয়া উঠিয়াছে। সংসারের কর্ত্তৃত্বের ভার কেমন যেন অজ্ঞাতসারে আমার দুর্ব্বল স্কন্ধে আসিয়া পড়িয়াছিল। আটাশ বৎসর বয়স হইলেও, পল্লী-গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ঘরের বধূ আমি, এ যাবৎ শ্বশুর শাশুড়ীর স্নেহাদর বেষ্টনীর ভিতরই বাড়িয়া উঠিয়াছি। সাংসারিক কার্য্যে সাধ্যমত সহায়তা করিয়া আসিয়াছি বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করি নাই বলিয়া সর্ব্বাঙ্গীন শান্তিরক্ষা করিয়া সংসার চালাইবার মত শক্তি আমাতে বিকাশ পায় নাই। বুদ্ধিও আমার যেন তেমন স্থির ধীর ছিল না, যখন যে কাজটি করিতাম মোটামুটীভাবে তখন সেটি করিয়া যাইতে পারিতাম বটে, কিন্তু গৃহিনীপদবাচ্য হইতে হইলে যে কার্য্যকুশলতা ও উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োজন তাহা আমাতে ছিল না। ফলে ইহাই হইল যে আমাকে পরিশ্রম করিতে হইত যথেষ্ট, কিন্তু স্বামীর ইচ্ছানুরূপ সংসার-সৌষ্ঠব বজায় রাখিতে পারিতাম না। কতবার তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, আত্ম-নিয়োগ ও সেবাদ্বারা অন্তঃপুরের শান্তিরক্ষা করাই গৃহিনীর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। সঙ্গীত থামিয়া গেলেও যেমন সুরের ঝঙ্কার ও গানের ভাব শ্রোতার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাঁহার সেই মধুর উপদেশবাণীও তেমনই আমার স্মৃতির আশে পাশে বিরাজ করিত। কিন্তু কি যে আমার স্বভাবের ত্রুটী! একটা কাজ করিতে করিতে আর পাঁচটা বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে বা চিন্তা করিতে আমার শক্তি ছিল না।

কর্ম্মোপলক্ষে আমার স্বামী বিদেশে থাকিতেন কখনও সপ্তাহান্তে কখনও বা পক্ষান্তে দুই এক দিনের জন্য বাড়ী আসিতেন। বৃথা বাক্য-

ঠাকুরাণীর ও কমল অরবিন্দের সংবাদ লইয়া তবে তিনি ক্ষান্তিদূর করিতেন। এমন কোমল হৃদয় ছিল তাঁর, যে সচরাচর তেমন দেখা যায় না। স্বভাবটুকুও ছিল তেমনি মধুর; সংসারের তাড়নায় মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইতেন, কিন্তু তাঁহার বিরক্তি বা রাগ সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া যাইত। ছেলেপুলের আবদারই তাঁহাকে সব চেয়ে বেশী বাজিত, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে কখনও কোন বিষয়ে প্রশ্রয় দিতেন না। বরং এ সকল বিষয়ে তাঁহার একটু বৈশিষ্ট্য ছিল—ছেলেপিলেকে সৌখিন কাপড় জামা বা বেশী সোনাদানা কখনই দেন নাই। কিন্তু তাঁহার হৃদয় যে, কত গভীর এবং তাঁহার স্নেহরাশি যে কত স্থির ও অচঞ্চল, অবিচ্ছিন্ন আঠার বৎসর কাল উপভোগ করিয়াও তাহা এখনও আমার ধারণার অতীত। তাঁহার হৃদয় চিরদিনই আমার নিকট এক রহস্য থাকিয়াই গেল।

(৭)

সংসারের অভাব অভিযোগ ও সুখ দুঃখের মধ্যে দিন এই ভাবেই কাটিয়া যাইতে লাগিল। একদিন সংবাদ আসিল আমার শ্বশুরমহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কার্য্যে অবসর লইয়া দেশে ফিরিতেছেন। আমার বিবাহের পর এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তাঁহাকে মাত্র দুই একবার দেখিয়াছিলাম। তিনি বাড়ী আসিলে আনন্দকোলাহলে বাড়ী ভরপূর হইয়া উঠিবে ভাবিয়া আমরা সকলেই উৎকণ্ঠার সহিত দিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। যেদিন তিনি দেশে ফিরিলেন, সত্যই সেদিন বাড়ী আমাদের উৎসবগৃহে পরিণত হইল। লোকাভাবে যাহা "খাঁ" "খাঁ" করিত, লোক সমাগমে এখন তাহা কাকলমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায় হইয়া উঠিল।

খুড়ামহাশয় বিপত্নীক; দাস দাসীর সাহায্যেই মাতৃহারা শিশু-সন্তানগুলিকে মানুষ করিয়াছিলেন, সংসারে আর কোন স্ত্রীলোক ছিল না। শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যুতে আমাদের যে অভাব ঘটিয়াছিল, খুড়ামহাশয় বাড়ী আসাতে তাহার কতক পূরণ হইল। বিশেষতঃ পিতৃমাতৃহীন আমার পক্ষে তাঁহার স্নেহলাভ সৌভাগ্য বলিয়া মনে হইল। সংসারের কাজ কর্ম বেশ বাড়িয়া গেল বটে কিন্তু তাহা আমাদের জানাইল না।

কয়েক মাস বেশ আনন্দেই কাটিল। আমার স্বামী পূর্ব্ববৎ সপ্তাহান্তে বাড়ী আসিতেন; কিন্তু তাঁহার কাজও বাড়িয়া গিয়াছিল, চিন্তাও বাড়িয়া গিয়াছিল। প্রথম প্রথম আমি বুঝিতে পারিতাম না কোন্ চিন্তায় তাঁহাকে ব্যাকুল করিতেছিল। আমার ধাত ক্রমে সর্দ্দিপ্রবণ হইয়া উঠিল, প্রায়ই সর্দ্দি কাসিতে ভুগিতে লাগিলাম, মধ্যে মধ্যে দুই একদিন গায়ের উত্তাপও হইত। একদিন রাত্রিতে ঘরে আসিয়া তাঁহাকে বিশেষ চিন্তান্বিত দেখিলাম। চাঁদিনী রাত্রি, বাড়ীর চারিদিক্ একেবারে "ধব্" "ধব্" করিতেছিল। শোভাময়ী প্রকৃতি অবিরাম-ধারে অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি ঢালিয়া দিতেছিলেন, এমন সময় শয়ন কক্ষের জানালায় বসিয়া তিনি নিবিষ্টচিত্তে কি ভাবিতেছিলেন। স্থান কাল পাত্রের সেই অপূর্ব্ব সমাবেশ এই বিগত যৌবনার হৃদয়ে আবেগময় প্রেমের সৃষ্টি করিল। আমার সেই তীর্থগৃহে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলাম, নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিবামাত্র সর্ব্বাঙ্গে অপূর্ব্ব পুলকসঞ্চার হইল। আমি বিহ্বলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ-গা, কি ভাবছ' বল' না?" তিনি এতই অন্যমনস্ক ছিলেন যে আমার এই প্রশ্নে চমকিত হইয়া উঠিলেন, কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "কৈ, কিছুই না। তুমি কখন এলে? এমন চোরের মত চুপি চুপি কেন?" এমন সময়েও লুকোচুরির ভাব দেখিয়া মনে বড় ব্যথা পাইলাম। কিন্তু তাঁহার চিন্তার বিষয় কি জানিবার জন্য মনে বড়ই কৌতূহল জন্মিল। আমি যতই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম, তিনি ততই বিহ্বল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে হতভাগিনীকে কোলে

টানিয়া লইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, দেখ, তোমার কথাই ভাবছিলাম ; দিন দিন তোমার শরীরের যে অবস্থা হ'য়ে উঠ্‌ছে, তা' দেখে আমার মনে আর একটুও শান্তি নেই। বড় ভয় হয়, কোন দিন বা তোমাকে হারাতে হয়!" তাঁহার চোক হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছিল। "তুমি আমার কথা ভেবে কাঁদ্‌ছ? ছি! ছি! আমার কি সেই সৌভাগ্য হবে যে তোমার কোলে মাথা রেখে হাস্‌তে হাস্‌তে ম'র্‌তে পার্‌বো? আর যদি তোমার সংসর্গে—তোমার সংস্পর্শে—এসে আমার তেমন ভাগ্যই হয়, তোমার তা'তে দুঃখ কেন? তুমি ত' পুরুষ মানুষ, সহ্য ক'র্‌বার শক্তি অনেক বেশী!"

তিনি চোকের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "দুঃখ এই জন্যে চুণি—এমন ভাগ্যহীন হইয়াছিলাম্ যে রুগ্না স্ত্রীকে দুদিনের জন্যেও সংসারের খাটাখাটনি থেকে বিশ্রাম দিতে পার্‌লাম না।"

প্রেমের ডাকে অবলাজাতি সাড়া না দিয়া থাকিতেই পারে না। অকপট স্নেহের নিকট তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতেই হয়। কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, তাঁহার প্রস্তাবমত আমাকে স্বীকার করিতে হইল যে নিয়মিতভাবে চ্যবনপ্রাশ ও মকরধ্বজ ব্যবহার করিব। একথাও স্থির হইল যে সংসারের ভার লইবার জন্য একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের সন্ধান করা হইবে, এবং এরূপ একজনকে পাওয়া গেলেই আমাকে দিনকতক বিশ্রাম লইতে হইবে।

(৮)

সপ্তাহ যাইতে না যাইতে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা ব্যবসায়ী তাঁহার এক বন্ধুর নিকট হইতে তিনি আবার জন্য মকরধ্বজ ও চ্যবনপ্রাশ আনিয়া দিলেন। আমিও নিয়মিতভাবে খাইতে লাগিলাম। চারি বৎসর পূর্ব্বে যে কালান্তক ইনফ্লুয়েঞ্জার হাত হইতে আমি রক্ষা পাইয়াছিলাম তাহাতেই আমার ফুসফুসের অবস্থা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। একটু বেশী পরিশ্রম করিলে বা সিঁড়ির উপর নিচে করিলেই আমার যেন হাঁপ ধরিত। গৃহস্থঘরে যাহা অপরিহার্য্য—আমাকেও সেই আগুনের সঙ্গে লড়াই করিতে হইত, কি করিব, উপায় ছিল না।

বৈশাখের শুক্লানবমীর দিন রন্ধন পরিবেশনাদি সারিয়া কলসী কয়েক ইন্দারার শীতল জল গায়ে মাথায় ঢালিয়া আহারান্তে শয়নকক্ষে গিয়া শয়ন করিলাম। সন্ধ্যার সময় বেশ একটু জ্বরভাব বোধ করিলাম। ছোট ভা'কে বলিলাম, "ভাই, একটু কষ্ট ক'রে তুই আজ রাত্রিটা চালিয়ে দে, আমার শরীরটা বড় খারাপ বোধ হচ্ছে।" পর দিন প্রাতে দেখি, জ্বরত্যাগ হয় নাই, উঠিবার শক্তিও নাই, শ্লেষ্মার প্রকোপও বেশ হইয়াছে। লক্ষ্মী বোনটি আমার সংসারের চাপে কত কষ্ট, কত অসুবিধাই ভোগ করিতেছে, রোগশয্যায় পড়িয়া তাহাই ভাবিতেছিলাম, কমল আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল। রাত্রিতে পিপাসা বাড়িত, নিদ্রা হইত না। মধ্যে মধ্যে নিদ্রাতুরা বালিকা কন্যা আমার সোণার কমলকে তুলিয়া তুলিয়া জল পান করিতে হইত।

পরদিন খুড়ামহাশয় ডাক্তার ডাকিলেন। হেম আমাদের বাড়ীর ডাক্তার, ছোট ভাইটির মত। বাড়ীতে অবারিতদ্বার; আমাদের বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করেন; আমরাও তাঁহাকে বিশেষ লজ্জা করি না, স্নেহের চক্ষেই দেখি। হেম আসিয়া থার্ম্মোমিটারাদির সাহায্যে যথারীতি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বিশেষ ভয়ের কারণ নাই, পুরাতন সর্দ্দি কাসি, এই কয়দিন অর্থাৎ পূর্ণিমা কাটিয়া গেলেই সুস্থ হইতে পারিব।" তিন চারি দিনের মধ্যে তাঁহার আসিবার সম্ভাবনা ছিল; সুতরাং তাঁহাকে সংবাদ দিবার আবশ্যকতা ছিল না। আমাদের দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া বর্ষীয়সী এক বিধবাকে দিন

কয়েকের জন্য লইয়া আসিবার বন্দোবস্ত করা হইল।

দুই তিন দিন প্রায় এক ভাবেই কাটিয়া গেল। কমল দিনরাত্রই আমার কাছে থাকে. অরবিন্দ কিন্তু ফাঁক পাইলেই একবার এদিক ওদিক ঘুরিয়া আসে। সে যে ছেলে, আর কমল যে মেয়ে, সেবা ত' মেয়েরেই ধর্ম্ম।

চতুর্দ্দশীর সন্ধ্যা হইতেই যেন আমার হাঁপ ধরিতে লাগিল, আর যেন শুইয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমার দেবর তখন বাড়ীতেই ছিলেন, তিনি আসিয়া কয়েকটি বালিস উপর উপর রাখিয়া আমাকে ঠেশ দিয়া বসাইলেন। ইহাতেও আমার শ্বাস কষ্ট কমিল না। তিনি চিন্তিত হইয়া ডাক্তারকে সংবাদ দিলেন।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, নিউমোনিয়ায় দাঁড়াইয়াছে। একটি ইন্‌জেক্‌সন্ দিয়া বিশেষ সাবধানে রাখিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমার ভিতরের অবস্থা যেন ক্রমেই খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল। আমি ছটফট করিতে লাগিলাম। দুই দেবর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আমার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলাম, "প্রভু, আজ রাত্রিটা কাটিয়ে দাও। কাল তিনি বাড়ী আসিলে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মরিতে পারি যেন।" দেবরকে বলিলাম "ঠাকুরপো, তোমার দাদাকে একটা টেলিগ্রাম করে দাও, কাল সকালেই যেন চলে আসেন।"

বুকের ভিতর কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণা হইতে লাগিল। অস্থিরতাও এত বাড়িয়া উঠিল, যে মনে হইতে লাগিল আর বেশী দেরী নাই। একবার শুইয়া পড়ি, একবার বালিসে ঠেশ দিয়া বসি। ঘরের দরজা জানালা সব খুলিয়া দিতে বলিলাম, ঘরের চারিদিকে জ্যোৎস্নার আলোক আসিয়া পড়িল। ক্রমে একটু তন্দ্রা আসিল।

শেষ রাত্রি হঠাৎ তন্দ্রা-ভঙ্গ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল, বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছে। অতি কষ্টে বলিলাম, "ঠাকুরপো, আমি আর বাঁচ্‌লাম না, সকলকে কাছে ডাক।"

খুড়ামহাশয় অন্য ঘরে ঘুমাইতেছিলেন, তাঁহাকে ডাকা হইল। তিনি কাছে আসিলে, পায়ের ধূলা লইবার জন্য অতি কষ্টে হাতখানি বাড়াইয়া দিলাম। বলিলাম, "কাকা, আমি ত চলিলাম, আশীর্ব্বাদ করুন আর যেন এ যন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়। এক বছর হল সাধ্যমত আপনার সেবা করেছি, দেখবেন, কমল আমার যেন ভাল ঘরে পড়ে।" আর কথা বলিতে পারিলাম না, ঘন ঘন হাঁপাইতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে একটু সামলাইয়া বলিলাম, 'ঠাকুরপো, মা'কে আর এখানে এনে কাজ নেই, তাঁর বড় কষ্ট হবে। তুমি গিয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে এস, আমার মাথায় দিয়ে দাও।"

ছোট বউকে বলিলাম—"ছোট বৌ, তোর ত' ছেলে মেয়ে হয় নি। তোর হাতে আমার কমল অরবিন্দকে দিয়ে গেলাম, ওরা আজ থেকে তোর। তাদের মায়ের স্থান তুই পূরণ করিস। আর তাই আমি কথা কইতে পার্‌ছি নে।"

ছোট বৌ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কথা কহিবার শক্তি কমিয়া আসিতেছে, কিন্তু সব বুঝিতে পারিতেছি। দেখি, চারিদিকে সকলেই কাঁদিতেছেন। অন্তর যাঁহাকে নিরন্তর চাহিতেছে, কেবল তাঁহাকেই দেখিতেছি না। বুঝি বা শেষ দেখা হয় না!

ক্রমে যেন আমার সকল শক্তিই বিলুপ্ত হইয়া আসিল। অজ্ঞানতা কি নিদ্রা আমাকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। মাত্র একটু অনুভব শক্তি আছে আর কিছুই নাই।

* * * * *

যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; দেখি বাহিরে মাদুরের উপর পড়িয়া আছি, আর আশে পাশে সকলেই কাঁদিতেছেন। আমি বলিয়া উঠিলাম, "ঠাকুরপো,

আমাকে কোথায় এনেছ? একি! আমাকে কিসের উপর শুইয়ে রেখেছ? ঘরে নিয়ে চল আমায়, ভাল বিছানায় শুইয়ে দাও। আমি ত এখন ম'র্‌বো না! তোমার দাদা কৈ?"

ঠাকুরপো যেন বলিতেছেন, "বৌদি, দাদা এসেছেন। "মনে হইল যেন খুব দূরে থেকে কে কথাটা বলিল। আমি একটু ইসারা করিয়া বলিল্যাম, "কৈ? কাছে আসতে বল।" তিনি কখন ঘরে আসিয়াছিলেন, বুঝিতে পারি নাই।

যখন তিনি আমার পাশে বসিয়া আমাকে চাপিয়া ধরিলেন, তখন আমার সকল শক্তি কেবল চোকে আসিয়া জড় হইয়াছে, আমি কেবল এক দৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। আজ দুকি বৎসর ধরে তাঁকে দেখেও যে আমার তৃপ্তি হয় নি!

ঠিক সন্ধ্যার সময় যখন পূর্ণিমার চাঁদ উঠিল, আমি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলাম, "ওগো! তুমি আমার মাথার গোড়ায় ব'স', আমি তোমার কোলে মাথা রেখে একটু ঘুমুই।"

একথা কি তিনি ঠেলিতে পারেন? সরিয়া তিনি আমার মাথা কোলে লইয়া বসিলেন, আমি হাসিতে হাসিতে অগাধ শান্তির মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

চাওয়ার দুঃখ

শ্রীমতী লীলা দেবী।

চাইলে তুমি দাও না আমায়
 না চাইলে দাও উজাড় ক'রে,
ভরিয়ে আমার সকল হৃদয়
 দাও যে আমার দু'হাত ভ'রে।

ঝরনা যখন ফলেরি আশ
 তখন ওঠে কুঁড়ির আভাষ,
 ফুল ঝ'রে হয় ফলের বিকাশ,
 অগুন্তি ফল ধরে।

যেদিন আমি চাইনা কিছুই
যেদিন থাকি সবার পিছুই,
সেদিন আমার দু'হাত ধ'রে
 নাও যে সবার আগে;
সেদিন থেকেও ঘরের মাঝে
আমার এ মন বিশ্বে রাজে,
সেদিন দেখি নিখিল জগৎ
 মনের মাঝে জাগে।

তাই সে চাওয়ার দুঃখ হ'তে
 বাঁচাও সখা বাঁচাও মোরে,
চাইলে তুমি দাওনা তাহা
 না চাইলে দাও উজাড় ক'রে।

নারী-হরণ ও তাহার প্রতীকার

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

বাঙ্গালার চারিদিক হইতে আজ নারী হরণের সংবাদ আসিতেছে। এ কি হইল।

যখন দেশে পুলিশ ছিল না, পাহারা ছিল না, গোয়েন্দা ছিল না, জেলখানা ছিল না, কই তখন ত কেহ নারী হরণের কল্পনাও করে নাই, নারীরা সব স্বচ্ছন্দে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াত করিতেন, সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেন, সকলেই তাঁহাদের দেখিয়া সম্ভ্রমে মাথা নত করিত—সে হিন্দুরাজত্বের কথা।

তারপর মোগল পাঠানের আমলে দস্যু তস্করে টাকা কড়ি, ধন দৌলত চুরি করিত বটে, কিন্তু কাহারো ঘরের পাশে ওৎ পাতিয়া থাকিয়া ঘরের কুল মহিলাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছে কই এরূপ ত কোন কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

আজ তবে এরূপ হইল কেন? এই নারী-হরণের মূলে সামাজিক, রাজনৈতিক অনেক কারণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কি সে কারণ? পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে জমিদার থাকিত, তালুকদার থাকিত, তাহাদের ছিল অপরিসীম ক্ষমতা, অসাধারণ প্রতাপ, তাহাদের প্রতাপে বনের সিংহ বাঘ পর্য্যন্ত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিত। তাঁদের রীতিমত আদালত ছিল, জেলখানা ছিল, তাঁরা দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করিতেন গ্রামের চোর ডাকাত বদমায়েস তাঁদের প্রতাপে টুঁশব্দটি করিতে পারিত না। এখন সে সব জমিদার আর নাই। তাঁহাদের সে প্রতাপ নাই। এখন সে রতন রায় নাই, সে চাঁদ রায়, কেদার রায়ও নাই। অধিকাংশ বনিয়াদী জমিদার এখন কেবল তৈলহীন প্রদীপের মত মিটি মিটি জ্বলিতেছেন মাত্র। পুলিশের হাতের তাঁহারা ক্রীড়নক। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে থানার দারোগাবাবু তাঁদের অস্তিত্বটা শুধু রেখে দিয়েছেন কেবল মফঃস্বল ভ্রমণে যাইয়া খাবার আড্ডার জন্য! আর দু'চারটা বড় বড় জমিদার যাঁরা আছেন, তাঁরা সব তল্পী তল্পা নিয়ে একেবারে সহরে এসে উপস্থিত হইয়াছেন, দেশের সহিত তাঁদের সম্পর্ক কেবল খাজনা আদায়ের। তাঁদের যারা নায়েব, গোমস্তা, কর্ম্মচারী তারা—থাকে পল্লীগ্রামে, কাছারীতে। লাঞ্ছিতা নারী তাদের কাছে কি অভিযোগ করিবে, তারা যে নিজেরাই ভক্ষক! এই জাতীয় সব নায়েব গোমস্তা গ্রামের দুষ্টদিগকে সায়েস্তা করা ত দূরের কথা, তাহাদের সহিত একত্র মদ্যাদি পান করিয়া গ্রামে কোন্ স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবে কেবল সেই সন্ধানে ফিরে। গ্রামের চৌকিদার, দফাদার, পঞ্চায়েত, তাদের কথা আর নাই বলিলাম। মাসের মধ্যে কোথাও এক দিনও চৌকি দেয় কিনা সন্দেহ। প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত বাবুর কাজ করা, বাজার করা, মাছধরা, দারোগা সাহেবের মোট বহন করা—এই সমস্তই হইল তাহাদের কাজ। কাজেই দুর্বৃত্ত তাহাদের দ্বারা কেমন শাসিত হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার মজা এই, বাছিয়া বাছিয়া এমন লোককে সার্কেলের পঞ্চায়েত নিযুক্ত করা হয় যাহারা দারোগা সাহেবের সফরের ভাত যোগাইতে পারে—বেশ বড় বড় থামা ধরিতে পারে। পুলিশের দ্বারাও এই সমস্ত কারণে গ্রামের দুর্বৃত্ত দমন হয় না।

আবার ব্যাপার এই—ভদ্র ঘরের কোন স্ত্রীলোকের উপর কোনরূপ অত্যাচার হইলে তিনি প্রাণ গেলেও

তাহা প্রকাশ করেন না। আদালতে নালিশ করিলেও পক্ষীয় অভাবে মোকর্দ্দমা ফাঁসিয়া যায়, কাজেই কোন ভদ্র মহিলার উপর অত্যাচার হইলে তাহা সহসা সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় না—তাঁহারা "স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জন" নীতি অবলম্বন করেন।

যে সমস্ত স্ত্রীলোক অসহায়া, যাহাদের হইয়া যুঝিবার লোক নাই, সাধারণতঃ দুর্বৃত্তেরা তাহাদেরই উপর অত্যাচার করে। গ্রামের লোকের মধ্যে একতা না থাকায়, কেহ কাহারও বিপদে অগ্রসর না হওয়ায় সেই সমস্ত স্ত্রীলোকেরা কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারে না, তাহার ফলে যখন তাহারা দুর্বৃত্তদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া আসে তখন একদেশদর্শী সমাজ তাহাদিগকে আশ্রয় না দেওয়ায় তাহারা সমাজের বাহিরে অন্য উপায়ে জীবিকার্জ্জন করিতে বাধ্য হয়।

সাধারণতঃ আজকাল দেখা যাইতেছে যে, মুসলমান গুণ্ডারাই স্ত্রী-হরণ করিতেছে বেশী। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতা তেমন বিস্তার লাভ করে নাই, জমিদার, পুলিশ কিংবা মুসলমান মাতব্বরদিগেরও তেমন শাসন নাই, কাজেই দিন দিন ইহারা প্রশ্রয় পাইতেছে। গ্রামের লোকজন নৈতিক বলে বলীয়ান্ না হইলে ইহার যে কোন প্রকার প্রতীকার হইবে, তেমন আশা নাই।

আবার স্ত্রীলোকদের দুর্ব্বলতার জন্যও যে, অনেক সময় তাহারা অপহৃত ও লাঞ্ছিত হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্ত্রীলোককে অশিক্ষা, অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া আমরা তাহাদিগকে এমনই "অবলা" করিয়া তুলিয়াছি যে গুণ্ডা দেখিলেই তাহাদের বাক্‌রোধ হয় ভয়ে সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে। কিন্তু স্ত্রীলোককে যদি লাঠি খেলা, গুলি চালান, মুগুর ভাঁজা শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে কায়িক শক্তিতে আমরা শক্তিমতী করিয়া তুলিতে পারিতাম, তাহা হইলে অন্ততঃ তাহারা গুণ্ডাদের সহিত কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করিয়া তাহাদিগকে কাবু করিতে পারিত। আগে কত স্ত্রীলোকের বিবরণ পাওয়া যাইত, তাহারা মায়ের হাতের খড়্গ লইয়া রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে প্রচণ্ড ডাকাতের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিত। কিন্তু কই? এখনত' তেমন মেয়ে লোকের নাম শুনি না। এক একটা রাজপুতের মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখ, তাহারা রীতিমত ঘোড়ায় চড়িয়া এখনও অসিচালনা করিতে পারে। আর বাঙ্গালীর মেয়ে ঘোড়া দেখিলেই মূর্চ্ছা যায়।

যে জাতি শারীরিক মানসিক দুর্ব্বলতাকে এমনই ভাবে বরণ করিয়া লয়, কেবল মসীচালনাই যে জাতির আদর্শ ও লক্ষ্য, সে জাতির মা ভগ্নী আজ যে এভাবে লাঞ্ছিতা, অপমানিতা ও অপহৃতা হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি আছে? কিন্তু বাঙ্গালীর এই দুর্ব্বলতার জন্য শুধু বাঙ্গালীকে দোষ দিলে চলিবে না। সরকার যে আমাদের হাতে বিশ্বাস করিয়া একটা পাঁচহাতি বাঁশের লাঠিও ব্যবহার করিবার অধিকার দেন নাই। প্রতি পাঁচ গ্রামের মধ্যে সন্ধান করিলে একটা বন্দুক পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। কোথাও যদি একটা কুস্তীর আখ্‌ড়া হয়, ছেলেরা যদি একটু ব্যায়াম করে তবে অমনি তথায় পুলিশের দৃষ্টি পড়ে। এ ভাবে শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চায় ব্যাঘাত পড়ার ফলে বাঙ্গালীর পুরুষেরাও আজ স্ত্রীলোকে পরিণত হইয়াছে।

তবে উপায় কি? নারী-হরণের তবে কি কোন উপায় নাই? আছে বৈ কি! গ্রামে গ্রামে উৎসাহী, সচ্চরিত্র যুবকগণকে লইয়া কমিটি গঠন করা, গুণ্ডাদের মধ্যে নারী জাতির প্রতি সম্মানের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করা, দুষ্ট দুর্বৃত্ত যে যত বড়ই শক্তিশালী ও ধনবান হোক না কেন, তাহাকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দেওয়া, গুণ্ডাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করিয়া তাহাকে রীতিমত শাস্তি দেওয়া, আর সর্ব্বোপরি অসহায়া, অবলা নারীর ঘরদ্বারের প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা—

এই গুলি, করিতে পারিলে বোধ হয় নারী-হরণের কতকটা প্রতীকার হইতে পারে।

নারীসমাজের জানিয়া রাখা দরকার, দুর্ব্বৃত্ত, পাপীকে যদি তাঁহারা নিজের ধর্ম্ম রক্ষার জন্ত খুনও করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের কোন সাজা হইবে না। চাই তাঁহাদের ভিতর এই শক্তি। শুধু অস্ত্র থাকিলেই মানুষ যে আত্মরক্ষা করিতে পারে তাহা নহে, অস্ত্র পরিচালনা, অস্ত্রের অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপের মত মনের বলও থাকা চাই।

যেখান হইতে নারী-হরণের সংবাদ আসিতেছে, প্রায়শঃ দেখা যাইতেছে তাহারা অধিকাংশই হিন্দুর মেয়ে। ইহার দ্বারা এই বুঝা যায়—হিন্দু সন্তানেরা নারীর মর্য্যাদা রাখিতে এখনও শিখে নাই, অথবা দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষ। মুসলমান কোন্ বলে বলী হইয়া হিন্দুর মেয়ে চুরি করিতে সাহস পায়? সাহস পায় এই কারণে,—তাহারা জানে হিন্দুর মধ্যে সঙ্ঘশক্তি নাই—হিন্দু পরের মেয়ের জন্ত বিপদকে বরণ করিতে আদৌ রাজী নহে। তাহারা জানে হিন্দুর মেয়ে মুসলমানের হস্তস্পর্শ হইলে সমাজ অপহৃতাকে দূর দূর করিবে এবং অপহৃতা নারীও সেই কারণে যাইতে চাহিবে না। কিন্তু মুসলমানের বেলায় কি তাই? কখনই না। কারণ মুসলমানদের মধ্যে সঙ্ঘশক্তি আছে। আর তুমি হিন্দু, কিন্তু তোমার মধ্যে নাই।

নারী-হরণের প্রতীকার আজ যে ভাবেই হোক করিতে হইবে। আদালতকে বলি—তাঁহারা মেয়েদের বিচারের জন্ত—সে ধনী ঘরের আর ছোট ঘরের মেয়ে হোক না কেন, ক্যামেরাতে তাদের বিচার করিবার ব্যবস্থা করুন। তাহা হইলে অনেক বড় ঘরের মেয়েরাও তাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা, লাঞ্ছনা, অত্যাচারের প্রতীকার আদালতে অভিযোগ করিতে পারিবেন।

আমার মনে হয়, ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নীরা যদি পল্লীগ্রামের নারী-লাঞ্ছনা ও নারী নির্য্যাতনের এবং নারীহরণের অনুসন্ধানের ভার গ্রহণ করেন তবে অনেক ধনী ঘরেও নারীর প্রতি অত্যাচারের প্রতীকার হয়। বাঙ্গালার হিন্দু নারী—স্বভাবতঃই লজ্জাশীলা। ইহাদের লজ্জাশীলতার বশবর্ত্তী হইয়া নিতান্ত প্রাণে দারুণ ব্যথা না পাইলে, কোন কথা অন্ত পুরুষের সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারেন না। এই যে চরমনাইতে পুলিশের হাতে লাঞ্ছিতা স্ত্রীলোকেরা তাহাদের সব কথা প্রকাশ করিল, যদি শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার মহাশয়া নিজে তথায় যাইয়া স্ত্রীলোকদের নিকট সমস্ত ঘটনা না শুনিতেন তাহা হইলে আজ সব কথা প্রকাশ পাইত কি না সন্দেহ! মহকুমার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়েরা কি যখন সহরে বাহির হন তখন আপন আপন পত্নীকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া গ্রামের স্ত্রীলোকেরা কে কি অবস্থায় আছেন তাহা—জানিতে পারেন না? তাঁহাদের সব সময়ে জানা উচিত তাঁহারা Public servant—জনসাধারণের ভৃত্য। এই ভৃত্য-বুদ্ধি লইয়া—যদি তাঁহারা দেশ শাসন করিতে না পারেন, যদি লম্বা লম্বা বেতন লওয়া ও গ্রামবাসীদের উপর হাকিমী চাল চালান তাঁহাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে সে চাকুরী না করাই ভাল।

পরিশেষে—দেশের সমাজপতিদিগকে বলিতে চাই—এখনও তাঁহাদের অন্ধ গোঁড়ামী ছাড়ুন। আর মেয়েদিগকে ঘরের কোণে অবরুদ্ধ রাখিয়া জাতটাকে অধঃপাতের দিকে যেন নিক্ষেপ না করেন। মেয়েদিগকে শিক্ষালাভের সুযোগ দান করুন। উপবাসের ব্যবস্থা দিয়া বিধবাদিগকে যেন আর দিন দিন ক্ষীণ করিয়া দুর্ব্বলা করিয়া না তুলেন। সর্ব্বদা যেন তাঁহারা মনে রাখেন—ঘরে বাহিরে এখন আমাদের শত্রু। এখন যে ভাবে হোক আত্মরক্ষা করিতেই হইবে। আত্মরক্ষাই বলবৎ ধর্ম্ম। কথায় আছে, "আত্ম রেখে ধর্ম্ম" পরাধীন, দুর্ব্বল জাতির "ধর্ম্ম" একটার কথা কথা মাত্র। এখন আর "ধর্ম্ম" "ধর্ম্ম" করিয়া বৃথা চীৎকার করিবার সময় নয়। আগে হিন্দুজাতি

বাঁচিয়া উঠুক, তখন আবার তোমার শাস্ত্র-অনুশাসন অনুযায়ী দেশকে গড়িয়া তুলিও।

আর নারী-জাতি, তোমাদিগকেও বলি, তোমরা উঠ, জাগ—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" তোমরা মানুষ—একথাটা দিনরাত ভাব। কতকাল আর এরূপে অবলা সরলা হইয়া পরের অত্যাচার সহ্য করিবে? এখন তোমাদের ধর্ম্ম তোমাদিগকেই রক্ষা করিতে হইবে। শক্তির অংশ তোমরা; তোমরা কি না আজ শক্তিহীনা সামান্য অবলা নারী! তোমরা তোমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা কর। শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়া—লেখাপড়া শিখিয়া এক একটা "দেবী চৌধুরাণী" হইয়া উঠ। দেশ বাঁচুক—জাতি বাঁচুক—বাঙ্গালা হইতে এই নারী-নিগ্রহ ও নারী হরণের পালাও উঠিয়া যাউক।

মন্দিরে চল

শ্রীঅতুলচন্দ্র নন্দী।

মন্দিরে চল, মন্দিরে চল, মন্দিরে চল।
ওগো মা, ওগো ভগিনি চল চল চল॥
বেশ ভূষার নাই প্রয়োজন
শুভ্র চিত্ত সেই ত ভূষণ,
বলতে তাঁরে প্রাণের বেদন
দিয়ে চোখের জল।
ওগো মা, ওগো ভগিনি চল চল চল॥

আজকে মায়ের ভাঙ্গা বুকে
পড়ছে আঘাত উপর থেকে;
ধরবি বজ্র মাথা রেখে
বেঁধে বুকে বল।
ওগো মা, ওগো ভগিনি চল চল চল॥

আঘাত হবে পরশ পাথর
পড়বে ঝরে পুণ্য নিঝর,
হেথা শান্তি সুধার সাগর
ঝরবে টলমল।
ওগো মা, ওগো ভগিনি চল চল চল॥

বজ্র সে যে আশীষ হবে
তোদের মাথায় পড়বে যবে,
শিরের ভূষণ সগৌরবে
রইবে চিরকাল।
ওগো মা, ওগো ভগিনি চল চল চল॥

প্রত্যাবৃত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

সেবিকা বসিয়া তখন পান সাজিতেছিল। সেই সময় হঠাৎ "বৌদি গোটা কত পান দিতে হচ্ছে যে, পানের খদ্দের হাজির" বলিতে বলিতে সরিত আসিয়া পড়িল।

এ বাড়ীতে তাহার অবাধ গতি ছিল। সেবিকা প্রথমটা তাহাকে লজ্জা করিয়া চলিত, তাহার পর অসীম এবং সারদা তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন সরিতকে লজ্জা করা তাহার পক্ষে একেবারে অনুচিত কারণ ধরিতে গেলে সে অসীমের ভাই।

সরিত নামজাদা বড়লোকের ছেলে, এম-এ পাশ দিয়া বাড়ী আসিয়াছে। তাহার সৎকার্য্যের কথাও অনেক শুনা যাইত, কিন্তু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে স্পষ্ট উত্তর দিত "আমি তো কিছুই করি নে।" দেশের সে একটী অনুরক্ত ভক্ত ছিল। লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেও সে ভারি মজবুত ছিল। এই জন্যই সেবিকার সহিত আলাপ করিয়া লইতে তাহার দেরী হয় নাই।

সরিতকে দেখিয়া সেবিকা সচকিত হইয়া উঠিল। বহুদিন সে এ বাড়ীতে আসে নাই। সরিত এ বাড়ীতে আসিলেই একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত। সে নিজে আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি ছিল বলিয়া কাহারও বিষাদ দুঃখ সহিতে পারিত না। এদিকে সে স্পষ্টবাদী ছিল। কাহারও দোষ দেখিলে মুখের উপরই বলিয়া দিতে ভয় পাইত না। অনেকে সেই জন্য এই দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ যুবককে ভয় করিত, অনেকে ভক্তি করিত। হেমলতা তাহার স্পষ্টবাদীতাকে একটু ভয় করিতেন। এ বাড়ীতে সে যে বেশী আসা যাওয়া করে ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না, অথচ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেও পারিতেন না। তবে ভাবটা তাঁহার মুখে চোখে যে ব্যক্ত হইয়া পড়িত, তাহাতে সন্দেহ নাই। সরিত তাঁহার ভাব একটু বুঝিয়াছিল বলিয়া এ বাড়ীতে তাহার স্বাধীন পাদক্ষেপ একটু সংযতও করিয়াছিল।

ভাই যেমন বোনের কাছে অসঙ্কোচে বসে, সরিতও তেমনই করিয়া বসিয়া পড়িল। হাসিতে হাসিতে বলিল "আচ্ছা বউদি, খুব মন তো তোমাদের। এতদিন যে আসিনি, একটু খোঁজও তো নিতে পারনি কেন আসিনে? ধর যদি মরেই যেতুম তা হলেও তো খোঁজ নিতে না।"

সেবিকা তাহার মলিন মুখে হাসির রেখা ফুটাইয়া বলিল "তাই মনে করেছো ঠাকুরপো? আমি রোজ তোমার খোঁজ নেই যে তা তুমি জান না। আমাদের ঝিকে রোজ একবার তোমাদের বাড়ী যেতে হয়, তাকে দেখেছ?"

সরিত মাথা দুলাইয়া বলিল "তা হতে পারে বটে। কই, পান সাজা এখনও শেষ হয় নি তোমার? না, বাধ্য হয়ে দেখছি আমাকেই সেজে নিয়ে যেতে হয়। তুমি যে সহজে দেবে তা তো বোধ হচ্ছে না।"

সেবিকা তাড়াতাড়ি পানে সুপারী দিতে দিতে বলিল "এত তাড়াতাড়ি কেন ঠাকুরপো; বসলেই বা দুদণ্ড এখানে। আসলেই যে অমনি বন্ধুর খোঁজে যেতে হবে তার কোনও মানে নেই।"

সরিত বলিল "আজ কয়েকদিন সে যায়নি যে

আমার কাছে।' আমি কাল পত্র লিখে পাঠালুম নেমন্তন্ন করে, তার উত্তরে লিখেছে—'আমার শরীর খারাপ, মাপ কোরো।' সত্যি সত্যি তার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি বৌদি ?"

সেবিকা একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "বোধ হয় হয়েছে নইলে লিখবেন কেন সে কথা ?"

সরিত হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল "বাঃ, তুমি কিছু জান না ? নেহাৎ পরের মতই কথাটা বলছ যেন, অথচ সে কথাটা তোমার জানা একান্ত প্রয়োজনীয়।"

কথাটা শেষ করিয়া সে একবার সেবিকার মুখের পানে চাহিল। এই আজ এতক্ষণের পরে তাহার মুখ দেখা। কই, কিছুদিন আগে সে মুখে যে হাসির রেখা ভাসিত, প্রসন্নতার একটা দীপ্তি সে মুখে যে সদা বিরাজিত থাকিত, তাহা আজ কোথায় ? সেবিকার ভাসা ভাসা চোখ দুইটীর নীচে যেন কালিমা পড়িয়াছে, গণ্ড দুটি যেন শুখাইয়া গিয়াছে, নাসিকাটি আরও উন্নত দেখাইতেছে, তাহার ললাটে চিন্তার রেখা অঙ্কিত, তাহার মুখখানা যেন বড় ম্লান।

সরিত বলিল "আমার কাছে তুমি অনেক কথা লুকিয়ে রাখছ বউদি, তা আমি বুঝতে পারছি। অসীমও আগে তার কথা সব আমায় বলত, কিন্তু ইদানীং অনেক কথা সে গোপন করে যাচ্ছে। তার সে ভাব দেখে আমি এ বাড়ীতে আসা কমিয়েছি, এবার দেখছি আসা একেবারে বন্ধ করতে হবে।"

সেবিকার মুখ লাল হইয়া উঠিল, বলিল "কি কথা লুকোচ্ছি ঠাকুরপো ?"

সরিত বলিল "আমায় এতদিন নিজের ভাই বলে ভেবেছ, পর বলে ভাব নি। আমিও নিজের বোনের মত তোমায় দেখেছি। এখন দেখছি আমি সেই পর ভিন্ন আর কেহই নই, আচ্ছা, সত্যি কথা বল দেখি বউদি, অসীম কি তোমায় কোনও কঠিন কথা বলে নি ?"

সেবিকা থামিয়া উঠিল। সরিত যে এ কথা আনিয়া ফেলিবে তাহা যদি আগে সে জানিত, তবে তাড়াতাড়ি দুইটা পান দিয়া তাহাকে তখনি বিদায় করিয়া দিত। সে সরিতের পানে চাহিতে পারিল না, মুখ নীচু করিয়া পান মুড়িয়া ডিবায় ফেলিতে লাগিল।

সরিত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আমি সবই জানি বউদি। অসীম মোহে ভুলে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করতে বসেছে। আমি তোমায় তোমার কর্ত্তব্য দেখিয়ে দিচ্ছি, যেন ভুল কোরো না।"

সে সেদিনকার বেড়াইতে যাইবার কথা, দীপালীর কথা, সব ব্যক্ত করিয়া বলিল "তুমি স্ত্রী, স্বামীর ভাল মন্দ তোমার হাতে রয়েছে তা দেখছ। এখন যদি তার কঠোর একটা কথা শুনে তুমিও অভিমান করে কঠোর কথা শুনাতে যাও তাকে, তাতে মন্দ ফলই হবে সন্দেহ নেই। আমি বরাবর তাকে দেখে আসছি, তাকে চিনেছি। সে ভারি একরোখা, যা ধরবে তা আর ছাড়বে না। কঠিন কথায় তাকে বশ করতে পারা যাবে না, নরম কথায়, তার বশ্যতা আগে স্বীকার করে তবে তাকে বশে আনতে হবে। তুমি কেন তার মনের মত হও নি—এই তার রাগ। আচ্ছা বউদি, চেষ্টা কর না কেন ?"

রুদ্ধকণ্ঠে সেবিকা বলিল "আমি যে তা পারিনে ঠাকুরপো।"

সরিত বলিল "কেন পারবে না ? তুমি সামান্য একটু লেখা পড়া শিখলেই যদি হয়—"

সেবিকা বলিল "তা আমি করব বলেছিলুম, তিনি শুধু তা চান না। তিনি চান দিনরাত—"

কথাটা লজ্জায় সে শেষ করিতে পারিল না।

সরিত আন্দাজে তাহা বুঝিয়া লইল। ক্ষুণ্ণভাবে বলিল "এটা অসীমের বড় বাড়াবাড়ি। মা, বাপ কাউকেই দেখছি সে কেয়ারে আনতে চায় না, নিজের জেদই বজায় রাখতে চায়। ছি ছি! দেখি, আমি একবার তাকে বলিগে যাই। যদি আমার কথা আজ শুনতে রাজি হয়।"

সেবিকা অশ্রুভরা চোখ দুইটি তুলিয়া বলিল "আমার কথা কিছু বোলনা ঠাকুরপো, তা হলে আমার মুখ দর্শন করবেন না।"

"না না, সে ভয় করতে, হবে না তোমার—" বলিয়া সরিত পান লইয়া উঠিতে যাইতেছিল, সেই সময় অসীম আসিয়া পড়িল।

সেবিকা অপরাধিনীর মত তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। সে আর মুখ তুলিতে পারিতেছিল না কারণ সে ভাবিয়াছিল অসীম তাহার সব কথা শুনিয়া ফেলিয়াছে। সরিতও প্রথমটা ভারি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। সম্মুখে সে অসীমকে তিরস্কার করিবে ভাবিয়াছিল, সেটাতে দোষও হয় না, কিন্তু আড়ালে অসীমের সম্বন্ধে তাহার সমালোচনা করা অন্যায় হইয়া গিয়াছে। অসীম উভয়ের পানেই একবার তীব্র চোখে চাহিল। তখনই তাহার মুখের কুঞ্চিত ভাবটা দূর করিয়া প্রসন্নতা আনিয়া বলিল "কিসের ভয় নেই সরিত?"

সেবিকা জড়সড় ভাবে তাড়াতাড়ি পানের পাত্র এক পাশে ঠেলিয়া ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। দ্রুত চলিয়া যাইতে তাহার অঞ্চলের চাবীর গোছা দরজার সার্সির উপর পড়িয়া কাঁচখানা ঝন্ ঝন্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। সে আর ফিরিয়াও চাহিল না।

একটা তীব্র বিরক্তিতে অসীমের সারা বুকটা ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে একবার পলায়মানা স্ত্রীর পানে তাকাইয়া বন্ধুর পানে আবার চাহিল।

সরিত সেবিকাকে বাঁচাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ উত্তরযোগ্য কোনও কথা তাহার মনে হয় নাই, সে তাই পকেট হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া সেটা ধরাইয়া দুইএক টান দিয়া বলিল "বাইরে চল, বলা যাচ্ছে সব।"

উভয়ে বাহিরে আসিয়া সামনা সামনি দুখানা চেয়ার লইয়া বসিল। সরিত সিগারেটের ছাইগুলি আঙুল দিয়া ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল—"কথাটা হচ্ছে তোমারই সম্বন্ধে।"

অসীম স্থিরভাবে বলিল "আমার সম্বন্ধে কি রকম?"

সরিত একটু বিরক্তভাবে বলিল "রকম টকম আমি বুঝিনে। আমি দেখছি তুমি দিন দিন আলাদা হয়ে যাচ্ছ, কারও কাছে আর নিজেকে ধরা দিতে চাও না। আমি বউদির কাছে এ কথাটা মনের কষ্টে পাড়তে তিনিও বললেন তোমার ভাবই অমনি হয়েছে। তিনি ভয় করছিলেন তোমার কোনও অসুখ হয়েছে ভেবে। আমি তাই যাচ্ছিলুম তোমার কাছে।"

অসীম একটু মলিন হাসিয়া বলিল "এনকোয়ারী করতে? ডাক্তারের উপরেও ডাক্তারী করতে যাও তুমি, এত ক্ষমতী হয়েছে? দেখ নাকি থার্মোমিটর, টেম্পারেচার নেবে? ষ্টেথিসকোপটা এনে দি, একবার ব্রেষ্টটা একজামিন করতো ভাই।"

সরিত গম্ভীর হইয়া বলিল "ইয়ারকির কথা নয় এটা। তোমার টেম্পারেচার নেয়ার কোনও দরকার নেই আমার, ব্রেষ্ট একজামিন করবারও দরকার নেই। ব্রেণটা কোনও মেডিক্যাল আফিসারের কাছে একজামিন করানো দরকার তা বুঝতে পারছি।"

অসীম হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল "দেখ, এবার যদি লিউনেটিক্ এসাইলামে পাঠাতে পার।"

সরিত অতিরিক্ত বিরক্ত হইয়া বলিল "বাস্তবিক বলছি অসীম, তোমার মনটা যে এমন হয়ে গেছে এতে আমি ভারি দুঃখিত হচ্ছি। আমি ভাবছি, তুমি তো আগে এ রকম ছিলে না। তেমন সরল অকপট মনটা তোমার কোথায় বিসর্জ্জন দিলে অসীম? আমার কাছে কখনও কোনও কথা গোপন ত কর নি। আমি যখন কোনও বিপদে পড়েছি, তোমার কাছে পরামর্শ চেয়েছি, তুমি যখন কোনও বিপদে পড়েছ আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছ। আজ তোমার কি হয়েছে, তোমার মুখ অত আঁধার কেন? আমি তোমার ধরবার চেষ্টা

করেও ধরতে পারছিনে কেন? সব কথাগুলো—বন্ধুত্বের খাতিরে নয়, দয়া করে আমায় বলবে কি?"

অসীম মাথাটা নীচু করিয়া একখানা বই টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। সরিতের কথার উত্তর দিল না।

সদুঃখে সরিত বলিল "বুঝেছি তুমি আমার কাছে সব গোপন করে রাখতে চাও। আমি শুনেছি এর মধ্যে তুমি আরও একবার সুধীরের বাড়ী গেছলে। ভেব না আমি কিছু জানতে পারছি নে। নিজের দিকে তাকাও বা না তাকাও তাতে আমার কিছু আসে যায় না, কারণ তোমাকে তুমিই চালনা করবে। তোমার সঙ্গে আর একটী নারীর অদৃষ্টও জড়িত আছে। তোমার সুখ দুঃখ তাকে সমানভাবে স্পর্শ করবে। এতে তুমিও যতটা কষ্ট পাচ্ছ, সে তার চেয়েও কষ্ট পাচ্ছে। তোমার কষ্ট তুমি ইচ্ছা করলেই দূর করতে পারো, সে তা পারে না, পারবেও না—"

বাধা দিয়া একটু তীব্র ভাবেই অসীম বলিল "কেন পারবে না? ইচ্ছা করলেই সেও পারবে।"

সরিত তাহার কাণ নাড়িয়া দিয়া বলিল "বেশী লেখাপড়া শিখলে জ্ঞানটা বুঝি এই রকমই বেড়ে যায়? হিন্দুঘরের মেয়েরা স্বামীকেই একমাত্র পরমারাধ্য দেবতা বলে জেনে নেয়। স্বামী তাকে হাজার নির্য্যাতন করলেও সেই স্বামীর পায়ের তলে বুক পেতে রেখে দেয়। তুমি ইচ্ছা করলে দীপালিকে গ্রহণ করতে পারবে কিন্তু তোমার স্ত্রী অন্য স্বামী নিতে পারবে না। তুমি আবার সুখী হতে পার, সে আর সুখী হতে পারে না। বিধবাদের দেখেছ? স্বামী চলে গেছেন, স্ত্রী তাঁর পবিত্র স্মৃতি বুকে নিয়ে বেঁচে আছেন। যতদিন বেঁচে থাকবেন, সেই স্মৃতিই তাঁর একমাত্র অবলম্বন হয়ে থাকবে। কি পবিত্র ত্যাগ দেখ ত। তাঁরাও তো আবার বিয়ে করতে পারতেন, কিন্তু নিজেরাই ত্যাগ স্বীকার করে এ মহা আদর্শ ভারতের বুকে এঁকে রেখে গেছেন। আমরা একটার যায়গায় দশটা বিয়ে করি, আজ বউ মরে গেলে কাল আবার বিয়ে করি, এই তো আমাদের স্বভাব। নিজের সঙ্গে আর স্ত্রীর সঙ্গে এত সহজে কেমন করে যে তুলনা করে দেখে তাকেও তোমার মত উচ্ছৃঙ্খল হতে বল, তাই ভেবে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি।"

অসীম মাথা না তুলিয়াই বলিল "আমায় কি করতে বল তুমি, শুনি?"

উত্তেজিত হইয়া সরিত বলিল "কি, তুমি আমার কথা শুনে তারপরে নিজের কর্ত্তব্য ঠিক করতে চাও? নিজের স্ত্রীর প্রতি তোমার কি কর্ত্তব্য তা তোমার নিজের জ্ঞান নেই? যদি তাই হয়, অর্থাৎ যদি আমার কথা শুনে তোমার কর্ত্তব্য ফেরে, সে কর্ত্তব্য আমি চাইনে। সেটা দয়ার দান মাত্র, স্বেচ্ছার দান নয়। বউদি যদি যথার্থ মানুষ হন, মনুষ্যত্ব যদি থাকে তাঁর হৃদয়ে, তবে এ দয়ার দান যেন কখনও না গ্রহণ করেন। পরের দ্বারা ভিক্ষা করানো জিনিস বিষের মতই তাঁর দূরে ফেলা উচিৎ। যেটা তাঁর স্বভাবতঃ প্রাপ্য, সেটা কিনা অবশেষে মাথা নুইয়ে ভিক্ষা স্বরূপ নিতে হবে? ছিঃ, ঠিক না এমন জীবনে।"

খুব রাগত ভাবেই সে দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অসীম তখনও চুপ করিয়া বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

খানিক বাদেই সরিতের জুতার শব্দ আবার পাওয়া গেল। সে দরজার উপরে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই বলিল "আমি আজই দার্জ্জিলিং যাচ্ছি, বোধ হয় মাস পাঁচ ছয় এখানে আসব না। আজকের দুপুর বেলায় তোমায় আমার বাড়ী নিমন্ত্রণ করছি, যাবে কি?"

অসীম মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল তাহার মুখে সে উগ্রতা আর নাই। সে লাল রং ঘুচিয়া গিয়া আবার তাহার স্বাভাবিক গৌর রং ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার ওষ্ঠে আবার সেই হাসির রেখা ভাসিয়া উঠিয়াছে।

অসীম একটুখানি কি ভাবিল, তাহার পর মাথা

নাড়িয়া বলিল "না আমার শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে।" তোমার কাল রাত্রের নিমন্ত্রণ নিতে না পেরে আমি লজ্জিত হয়েছি, তা জেনেও যে আবার আমায় বেশী করে লজ্জা দেবার জন্তে তুমি আজ আমায় নিমন্ত্রণ করছো, এতে আমি দুঃখিতও হলুম।"

সরিত একটুখানি দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে পথে বাহির হইয়া পড়িল। অসীম একবার তাহার পানে চাহিল, চক্ষু দুইটী তাহার জ্বলিয়া উঠিল; অস্ফুট স্বরে সে আপন মনে বলিল "আমি বলে তাই, অন্য কেউ হলে এতক্ষণ খুন করে ফেলত।"

বইখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া সে চেয়ারখানাতে আড়ভাবে পড়িয়া পা দুখানা টেবিলে তুলিয়া দিয়া ভাবিতে লাগিল—এক্ষণে উপায় কি, কি করিলে সে নষ্ট শান্তি ফিরিয়া পায়। (ক্রমশঃ)

আসামদেশীয় মহিলাদিগের সামাজিক প্রথা

আসাম পর্য্যটক – শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী।

(২)

বিবাহ-ব্যবস্থা—বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ নদীয়ার স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের বিবাহ বিষয়ক বিধি-ব্যবস্থা মানিয়া চলেন। গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলায় মহামহোপাধ্যায় পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশের ব্যবস্থা মতে অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ হয়। দরঙ্গ (Darrang) জেলায় সাধারণতঃ পীতাম্বর সিদ্ধান্ত বাগীশের বিধান মতে এবং কাহারও রঘুনন্দন ও পীতাম্বর উভয়ের মাঝামাঝি মিশ্রিত ব্যবস্থামতে বিবাহ হইয়া থাকে। শ্রীহট্ট অঞ্চল উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম এই চারিটী বিভাগে বিভক্ত। উত্তর ও পূর্ব্ব শ্রীহট্ট অঞ্চলের হিন্দুরা শূলপাণি ও বাচস্পতি মিশ্রের প্রাচীন বিধানমতে বিবাহের ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করিয়া থাকেন। কাছাড় অঞ্চলের হিন্দুরা ইঁহাদেরই মতাবলম্বী। হাইলাকান্দির রায় বাহাদুর হরকিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন—"দক্ষিণ ও পশ্চিম শ্রীহট্টের কতক অংশের হিন্দুরা শূলপাণি ও বাচস্পতি মিশ্রের বিবাহ বিধি পালন করেন এবং সেখানকার আর কতক হিন্দুরা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থানুযায়ী উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। নগাঁও জেলার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বহুকাল হইতে যে "হাড় শুচিবিবাহ" প্রচলিত আছে তাহার ব্যবস্থাপকের নাম অজ্ঞাত। গোয়ালপাড়া জেলার কোন কোন স্থানে বাঙ্গালীদিগের পদ্ধতি মত অসমীয়া হিন্দুদিগের "বাসী বিবাহ" হয়। আসামের কোন স্থানে বাঙ্গালীদিগের এই প্রথা প্রচলিত নাই।

পণপ্রথা—পূর্ব্বে কামরূপ অঞ্চলে বরপণ ও কন্যাপণ খুবই ছিল। এক্ষণে বিবাহের জন্য আসামের কুত্রাপিও পাত্রীর পিতাকে "পণ" দিতে হয় না। বিপত্নীকেরা পুনরায় বিবাহ করিতে চাহিলে কামরূপীয়া কন্যাপক্ষ খুব বেশী পণ দাবী করিয়া থাকেন। গোয়ালপাড়া ও কামরূপ অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ অধিকাংশ স্থলে পণ গ্রহণপূর্ব্বক কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। দরঙ্গ জেলায় বরপণ ও কন্যাপণ নাই বলিলে চলে। সেখানে সাধারণ লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল হইলে বরপক্ষের

নিকট হইতে কিছু অর্থ লওয়া হয়। দরঙ্গ ও লখিমপুর অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কোনরূপ পণ গ্রহণ করেন না। শ্রীহট্টে কন্যাপণ বহুলরূপে প্রচলিত ছিল এখনও আছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, ১৩২০-২১ বঙ্গাব্দ হইতে সেখানে বরপণ চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীহট্টে কায়স্থ, বৈদ্য ও সাহু জাতির মধ্যে বিবাহ প্রচলিত আছে। এরূপ স্থলে পণপ্রথা অনিবার্য্য। কায়স্থ বৈদ্য কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে এবং সাহু জাতীয় বরের জন্য কায়স্থ কন্যার আবশ্যক হইলে বরপক্ষকে অতিমাত্রায় পণ দিতেই হইবে। কাছাড়ের হাইলাকান্দি মহকুমায় বৈদ্য ও সাহুজাতি নাই। সেখানে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির মধ্যে কোনরূপ পণপ্রথা নাই। বহুদিন পূর্ব্বে সেখানে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির মধ্যে কন্যাপণ প্রচলিত ছিল। এক্ষণে তাহা রহিত হইয়া গিয়াছে।

পাত্রীদেখা—বিবাহের কথাবার্ত্তা হইলে অধিকাংশ স্থলে বাড়ীর মেয়েরা "পাত্রী" দেখিতে যান। সাধারণ লোকের বাড়ীর মেয়েরা নিজেরাই অবাধে যাইয়া থাকেন। কেবল কামরূপের কোন কোন স্থানের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও সম্ভ্রান্ত দৈবজ্ঞ জাতির মহিলারা পাত্রী দেখিতে যান না। গোয়ালপাড়া ও গৌহাটী মহকুমাস্থ ঐ জাতিত্রয়ের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা পাত্রী-গৃহে আদৌ যান না। ইঁহাদের পরিবর্ত্তে অন্য জাতীয় স্ত্রীলোকদিগকে সেখানে পাঠান হয়। দেশীয় প্রথানুসারে ঐ স্ত্রীলোকেরা প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে পাত্রীকে একটী অলঙ্কার ও এক বোতল তৈল দেন এবং তৎপরে তাহাকে নূতন কাপড় পরাইয়া তাহার কপালে সিন্দুর দিয়া থাকেন।

কন্যাবরণ—কামরূপ জেলায় বিবাহ কালে কন্যাকে "খাড়ু" পরিধান করান হয়। এখানকার খাড়ুগুলি রৌপ্যনির্ম্মিত, কচিৎ সোণার পাতে মোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ধনীলোক রূপার "মুঠি"তে সোণার পান ঢালাইয়া লন। অসমীয়ারা ইহাকে 'সোণ খটোয়া মুঠি" বলিয়া থাকেন। দরঙ্গ জেলা ব্যতীত কামরূপ অঞ্চলে "থুরিয়া" নামক কর্ণালঙ্কারের প্রচলন নাই। আপার আসামে ও দরঙ্গ জেলায় "বলয়" ব্যবহারবিধি আছে। যাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল নহে, তাঁহারা আর বালা কোথায় পাইবেন, কাজেকাজেই তাঁহাদিগকে শুধু হাতে থাকিতে হয়। আপার আসামের লখিমপুর অঞ্চলের হিন্দু কন্যারা বিবাহকালে অথবা মহিলারা কোন সময়ে কোমরে "করধ'ন" বা অন্য কোনপ্রকার অলঙ্কার এবং কাণে সোণার "করিয়া" পরিধান করেন না। সেখানকার প্রাচীনা মহিলাদিগকে কাজকর্ম্মের সময় সাধারণতঃ কাণে "কেরু" এবং গলায় "মণি" পরিধান করিতে দেখা যায়। কায়স্থ ও কলিতাদিগের কন্যারা বিবাহকালে একই প্রকার অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকেন। গৌহাটীর রায় বাহাদুর কাশীনাথ সেন মহাশয় বলেন (১৬ই মার্চ্চ তারিখের পত্র)—"আপার আসামে খাতি কায়স্থ আছেন কিনা সন্দেহ। তত্রস্থ যাঁহারা আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহাদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে।" অবসর প্রাপ্ত একষ্ট্রা অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনর রজনীকান্ত বরদলৈ মহাশয় বলেন (বিগত ২৪শে মে তারিখের পত্র)—"লখিমপুর জেলায় খাতি (১) কায়স্থ আছেন বলিয়া মনে হয় না, সেখানে কায়স্থ এবং কলিতাতে মেশান।" গোয়ালপাড়া জেলার সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির কন্যারা বিবাহকালে খাড়ুর পরিবর্ত্তে সুবর্ণ বলয় এবং দরিদ্র ব্যক্তির কন্যারা বিবাহকালে শাঁখা পরিধান করিয়া থাকেন। শ্রীহট্টে খাড়ুর প্রচলন ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে এবং উহার পরিবর্ত্তে "গঙ্গা যমুনা রুলী" এবং "ছয়রা",

(১) খাতি অর্থাৎ বিশুদ্ধ। যে সকল "কায়স্থ" কায়স্থ জাতির যাবতীয় সংস্কার পালন করেন, ব্রাহ্মণদিগের মত বিধবাবিবাহ করেন না, রজঃস্বলার পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন তাঁহারাই খাতি কায়স্থ। (ভরলুমুখ নিবাসী শ্রদ্ধেয় বীরহরি দত্ত বরুয়া মহাশয়ের বিগত ২৯মে তারিখের পত্র।)

"গুজরী"* প্রভৃতি পদাভরণ ব্যবহৃত হইতেছে। বিবাহকালে সেখানে প্রধানতঃ শেষোক্ত অলঙ্কার ও "চরণপদ্ম" ব্যবহৃত হয়।

বরের আগমন—গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, বড়পেট ও মঙ্গলদৈ মহকুমার বর কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে হোম পূজাদি বৈদিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল সমাপনান্তে কন্যাপক্ষ বরকে অন্দরমহলে লইয়া যায়। সেখানে বহু মহিলা সমবেত হইয়া গীত গান। কিছুক্ষণ পরে বরের আত্মীয়ারা বর ও কন্যাকে একটী পাটীর উপর উপবেশন করাইয়া তাঁহাদিগের দেশীয় "আগ চাউল দিয়া" প্রথা পালন করেন। আমরা এই প্রথার বিষয় গতবারে সবিশেষ বিবৃত করিয়াছি। বিবাহকালে কাছাড়স্থ সকল শ্রেণীর মহিলারাই গান গাহিয়া থাকেন। উজনীয়া অঞ্চলে বর যখন কন্যার পিত্রালয়ের বহির্ভাগে আসিয়া উপস্থিত হয়, কন্যার কনিষ্ঠা ভগ্নী সর্ব্বসমক্ষে তাহাকে চুম্বন প্রদানপূর্ব্বক অন্তঃপুর গমনের জন্য সম্ভাষণ করিয়া থাকে। উজনীয়াবাসীর কামরূপে অবস্থানকালে তাহার কন্যার বিবাহ হইলে উজনীয়া অঞ্চলের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইয়া থাকে, ঐ প্রথারও ব্যতিক্রম ঘটে না। কিন্তু গোয়ালপাড়া ও কামরূপ অঞ্চলে বরকে সম্বর্দ্ধনার জন্য কন্যার কনিষ্ঠা ভগ্নীর চুম্বন করিবার রীতি নাই।

মৎলিখিত আসাম প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—"আসামের সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য শ্রেণীর হিন্দু কন্যাগণের বিবাহের নির্দ্দিষ্ট বয়স নাই।" গৌহাটীর শ্রীযুক্ত অম্বিকানাথ বরা আমাদিগকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দৃঢ়তার সহিত ইহাই বলিয়াছিলেন। পুস্তক প্রকাশের পর কামরূপের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিলে আমরা প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধানান্তে অবগত হইয়াছি "গোয়াল-পাড়া ও কামরূপ অঞ্চলে দ্বিতীয় সংস্কারের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ কন্যার মত কায়স্থ ও দৈবজ্ঞ জাতির কন্যার বিবাহ না হইলে পাত্রীর পিতাকে জাতিচ্যুত হইতে হয়।" এই জন্য এই তিনটী সমাজে বাল্যবিবাহের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। কাছাড় অঞ্চলে দ্বিতীয় সংস্কারের পূর্ব্বে কায়স্থ কন্যাগণের বিবাহ দিবার নিয়ম আছে। তবে তেমন বর পাওয়ার অভাবে অনেক কায়স্থ কন্যাকে ৩।১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া অবিবাহিত থাকিতে হয়। আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি, ইতিমধ্যে তাহারা পুষ্পবতী হইয়া পড়িলে, নিজ পরিবারের মধ্যে তাহা গোপন রাখা হয়। সমাজে পতিত অথবা জাতিচ্যুত হইবার আশঙ্কায় বাড়ীর লোকেরা অন্য কাহাকেও জানিতে দেন না।

দ্বিতীয় সংস্কার—কন্যা প্রথম ঋতুমতী হইলে বাঙ্গালার পল্লীতে তজ্জন্য "কাদা-মাটী"র প্রথা প্রচলিত আছে। কোন অসমীয়া কন্যা ঋতুমতী হইলে ঘরের পশ্চাৎভাগে একটী কলাগাছ পোতা হয়। বাড়ীর লোকে একটী অথবা দুইটী কলাগাছ খণ্ড খণ্ড করিয়া সেখানে বিছাইয়া রাখিয়া দেয়। স্বচ্ছল ভদ্রঘরের কন্যা হইলে, বাড়ীর ঝি এবং নিম্নশ্রেণীর ঘরের হইলে তাহার আপন জ্যেঠাই, খুড়ী অথবা কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া চতুর্থ দিবসে তাহাকে ঐ খণ্ডিত কলা-গাছের উপর বসাইয়া স্নান করাইয়া দেয়। সেখানে গ্রামের অনেক স্ত্রীলোক যথাসময়ে একত্রিত হইয়া গীত গাহিয়া থাকেন। স্নানান্তে কন্যাকে ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। অতঃপর ৭টী যজ্ঞ ডুমুর, ৩টী পান, খানিকটা থুরি (১) কলাপাতা, ৪৫ অঙ্গুলি প্রমাণ দীর্ঘ খড়, এই গুলিকে একত্রিত করিয়া তিনটী বিভিন্ন রংয়ের সূতার দ্বারা বাঁধা হয়। অসমীয়ারা ইহাকে "কানাই" অর্থাৎ ছেলে কৃষ্ণ বলেন। এই কানাইকে কন্যার হাতে দেওয়া হয়। কন্যা তাহার প্রত্যেক প্রতিবাসিনীর হস্তে উহা

(১) অসমীয়ারা খুব কচি কলাপাতাকে "থুরি কলাপাত" বলেন।

প্রদান করে। তাঁহারা উহাকে চুম্বন করেন এবং যথাসাধ্য উপহার সহ কন্যাকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অনিচ্ছুক স্ত্রীলোকেরা কানাই গ্রহণ করেন না।

আপার আসাম অঞ্চলে এই কানাই করিবার প্রথা আছে; কিন্তু নিম্ন আসামে কানাইয়ের পরিবর্ত্তে একখানি কাটারী উপরোক্ত দ্রব্যাদি সহ একখানি গামছায় বাঁধিয়া পূর্ব্বমত করা হয়। এই কাটারীর সহিত একটী দাড়িম্ব ফলও বাঁধা হয়। অসমীয়ারা ইহাকে "ফল কাটারী" বলিয়া থাকেন। এই কানাই এবং ফল কাটারী যত্নপূর্ব্বক ঘরে রাখিয়া দেওয়া হয়। স্থিরীকৃত দ্বিতীয় বিবাহের দিন, বিবাহ-সভায় বর ও কন্যার মধ্যভাগে একখানি কাপড় (পর্দ্দা) ধরা হয়। কন্যা ঐ কানাই অথবা ফল কাটারীকে পর্দ্দার উপর দিয়া বরের দিকে ফেলিয়া দেয়। কন্যাও কাপড় পাতিয়া উহাকে ধরিয়া থাকে। ৩ অথবা ৫ বার এইরূপ করাই দেশীয় প্রথা। উজানী অঞ্চলে ইহাকে "কানাই সলেয়া" এবং ভাটী অঞ্চলে "ফল কাটারী" বলা হয়। অসমীয়া ভাষায় "সলেয়া" অর্থে অদল-বদল বুঝায়।

এক্ষণে আমরা দরঙ্গ জেলার কথা বলিব। কন্যা ঋতুমতী হইলে গ্রামস্থ এবং নিকটস্থ আত্মীয় কুটুম্বের স্ত্রীলোকেরা সপ্তম দিবসে একত্রিত হইয়া তাহাকে স্নানান্তর নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া আশীর্ব্বাদ করেন। এই কার্য্যে পুরোহিতও আসিয়া শান্তিজল দেন। দরঙ্গ জেলায় এই অনুষ্ঠানকে "পাণীতোলানী" বলে।

সামাজিক আচার ব্যবহার—

সমগ্র আসামে ব্রাহ্মণ, গোস্বামী, কায়স্থ এবং কলিতা প্রভৃতি জাতির মহিলারা স্ব স্ব গৃহে বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকেন। গোয়ালপাড়া ও কামরূপের কায়স্থ মহিলারা বাড়ী হইতে কখনও রাস্তায় বাহির হন না। তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা যতই কেন অস্বচ্ছল হউক না, প্রকাশ্যভাবে কিছুতেই তাঁহারা রাস্তায় চলিতে চাহেন না। ইহার একমাত্র কারণ ঐ দুই অঞ্চলের কায়স্থ মহিলারা বহুকাল হইতে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মহিলাদিগের ন্যায় অন্দর মহলে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছেন। উজানী অঞ্চলের কৃষক-পত্নীরা মাঠে ধান্য কর্ত্তন করেন ও সেগুলিকে বিড়া বাঁধিয়া বাড়ীতে আনিয়া তদ্দ্বারা গাদা (pile) প্রস্তুত করেন। সেখানকার কোন কোন ব্রাহ্মণ বিধবা ধান্য কর্ত্তন করিয়া থাকেন। নিম্ন আসামের কৃষক-পত্নীরা চাষের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না। শ্রীহট্ট অঞ্চলের কোন শ্রেণীর মহিলা "রীহা" অথবা "মেখেলা" পরিধান করেন না। স্ত্রীর বড় ভগ্নীর সহিত স্বামীর কথা কহিবার রীতি অসমীয়াদিগের মধ্যে আদৌ নাই। কাছাড় জেলাস্থ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শিক্ষিত শূদ্রেরা স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নীসহ আলাপ করিয়া থাকেন; কিন্তু অনেকেই তাঁহাকে স্পর্শ করেন না। সেখানকার হিন্দু জাতির মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত নাই। সেখানে বিবাহের পরদিন পাকস্পর্শ হয় না। পাকস্পর্শ প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে উহা আছে। সেখানে চতুর্থ মঙ্গলবারের পর দিন পাকস্পর্শ হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে অসমীয়া কুমারীরা কপালে ও সিঁথায় সিন্দুর পরিধান করে। শ্রীহট্ট অঞ্চলেও এরূপ প্রথা আছে। কলিতা, কেওা, কৈবর্ত্ত এই তিন জাতির বিধবা বিবাহ একই পদ্ধতিতে হইয়া থাকে—হোম হয় না। আগচাল দিলেই হইল। লখিমপুর জেলার কেওা ও কলিতার মধ্যে ভূরি ভূরি অসবর্ণ বিবাহ হয়। নদীয়াল জাতির সহিতও এই দুই জাতির বিবাহের আদান-প্রদান হইয়া থাকে।

চিত্রকর *

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত।

(১)

তরুণ চিত্রকর
তুলিকা তাহার ফুটায়ে তুলিত
একটী ছবির'পর!
দিবানিশি তার থাকিত না জ্ঞান
আলোক আঁধার সকলি সমান,
রুদ্ধ সে দ্বার—নীরব আঁধার
পশে না রবির কর,
একাকী তথায় থাকিত বসিয়া
নবীন চিত্রকর।

(২)

সহযোগী তার কত
নানান্ রঙেতে আপনার ছবি
তুলিত ফুটায়ে শত!
শিল্পী হেথায় বসিয়া বিজনে
আঁকিত ছবিটী আপনার মনে,
লোহিত ব্যতীত কোন রং তার
ছিল না তাদের মত,
বিস্ময়ে তবু ফুকারিয়া উঠে
পটুয়া-পথিক যত!

(৩)

সুনাম তাহার শেষে
কি জানি কেমনে পড়িল ছড়ায়ে
দূর কত দেশে দেশে!
ছুটে আসে সব পটুয়ার দল
দুয়ারে দাঁড়ায়ে করে কোলাহল
রঙের সন্ধান জিজ্ঞাসে সবে,
—পটুয়া কহিল হেসে,
সন্ধান তার পাবে না এখন
কহিব মরণ-শেষে!

(৪)

শুনিল না কেহ হায়!
বাতুল বলিয়া উপহাসে' কেহ
—রোষে কেহ ফিরি' যায়।
শিল্পী তখন তুলিকা তাহার
হাতে তুলি ধীরে লইল আবার
আঁকিয়া চলিল অতি সযতনে
কোন দিকে নাহি চায়—
একটী বরষ এইরূপে পুনঃ
ধীরে ধীরে কেটে যায়।

(৫)

সহসা একদা প্রাতে
পটুয়ার প্রাণ মিশে গেল ধীরে
পঞ্চবায়ুর সাথে!
শুনিয়া সকলে হরষিত মনে
ছুটিয়া চলিল পটুয়া সদনে,
সন্ধান করে রঙটী তাহার,
উৎসাহে সবে মাতে,
বরিল না কেহ তরুণ যুবকে
একটি অশ্রুপাতে!

(৬)

আকাশ নীরব ম্লান—
চিতার উপরে শায়িত শিল্পী
—জীবনের অবসান!
বুকের উপরে শোভিতেছে ক্ষত
তিল তিল করি লভিয়াছে যত
সকল শোণিতবিন্দু সে যে গো
ছবিরে করেছে দান,
নির্ব্বাক হোল পটুয়া সকলে
নিশ্চল হতমান!

---

* গত আশ্বিনের মাতৃ-মন্দিরে শ্রীমতী বীণাপাণি বসু লিখিত 'চিত্রকর' অনুসরণে লিখিত।—লেখক।

মর্য্যাদা

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(গল্প)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(৪)

কম্পাউণ্ডারী পড়িবার সময় ভিতরে ভিতরে রাত্রি জাগিয়া ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছিলাম। অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে দেখিলে মা নিষেধ করিতেন বলিয়া এ কথা তাঁহাকে জানিতে দিই নাই।

সেবার দেশে অতিরিক্ত বর্ষা হইয়াছিল। পথ ঘাট সব জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। নীবিড় ঘন মেঘে সর্ব্বদা আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ঘরের বাহির হওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। একমাত্র কৃষকগণ মহানন্দে মাথায় তালপাতার টোকা দিয়া জমিতে লাঙ্গল দিতেছে। জীবন-মরণ পণ করিয়া সারা বৎসরের গ্রাসাচ্ছাদন করিবার উপায়টি আগ্রহভরে, আশান্বিত অন্তরে সম্পন্ন করিতেছে। শুষ্ক পুষ্করিণীগুলি আবার জলপূর্ণ হইয়া ভেককুলের অপার আনন্দের পথ মুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। রৌদ্র-দগ্ধ তরুলতাগুলি নববারি সম্পাতে নবীনহর্ষে নয়ন বিমোহন সবুজ হইয়া প্রকৃতির শ্যামল শোভার আনন্দবার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতেছে। পাঠশালার ছেলেদের অনেকেই তালপাতার 'পাততাড়ি' পরিত্যাগ করিয়া পুকুরে পগারে ছিপ্ হাতে ভিজিয়া ভিজিয়া মাছ ধরিবার আশায় ফিরিতেছে। একটু একটু ম্যালেরিয়া দেখা দিবার উপক্রম করিতেছে।

ঠিক সেই সময়ে আমার একটা চাকরী হইল। মাকে চাকরীর কথা বলিলাম। মা, চাকরী হইয়াছে শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন সত্য কিন্তু, তিনি কি ভাবিয়া যেন অধিকতর চিন্তাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। আমাদের যৎসামান্য জমি ছিল। তখন আবাদ করাইবার সময়। তাহার উপর নূতন করিয়া ঘর বাড়ী মেরামত করা হইয়াছিল, সে সব ছাড়িয়া আমার সহিত মার কর্ম্মস্থানে যাইতে হইলে বাড়ী ঘর সব আবার নষ্ট হইয়া যাইবে। এই সব মেরামত করিতে আমাদের কিছু টাকা দেনা হইয়াছিল। তাহা পরিশোধ করিতে হইবে এবং কাশীতেও টাকা পাঠাইতে হইবে। সুতরাং চাকরীতে আর অমত থাকিলেও বর্ত্তমান অবস্থা চারিদিক দিয়া ভাবিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এমন ভাব মুখে প্রকাশ করিলেন, মনে মনে যেন তাহার সমর্থন করিতে পারিতেছিলেন না বলিয়া অনুমান হইল।

মা অনেক বিবেচনা করিয়া শেষে মত দিলেন, বলিলেন "কিছুদিন চাকরী করে দেনাগুলি পরিষ্কার কর, তারপর কিছু টাকা জমিয়ে গ্রামে একটা ডাক্তারখানা খুলে স্বাধীনভাবে থাকতে পারবি।"

খাওয়া থাকা ছাড়া আমার মাসিক বেতন হইয়াছিল ৫০৲ টাকা। মা জিজ্ঞাসা করিলেন— "যেখানে চাকরী হয়েছে সে দেশ কেমন? সেখানে ম্যালেরিয়া আছে কি না? খাওয়া দাওয়ার কোন কষ্ট হবে না ত?" মার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া আমার কর্ম্মস্থলে যাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। কতকগুলি খামে মাকে ইংরাজিতে আমার কর্ম্মস্থানের ঠিকানা লিখিয়া দিলাম। খুব সাবধানে থাকিবার কথা বলিয়া একবার সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "মা, এখন ত আমার চাকরী হয়েছে, এখানে একলা থাকা অপেক্ষা আমার

বাড়ীতে তোমার থাকলে হয় না? আমি মাসে মাসে মামাকে তোমার খরচের টাকা পাঠিয়ে দেব।”

মা আমার কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বুঝিলাম, মা যেন এ প্রস্তাবে মনে মনে বিশেষ বিরক্ত ও দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু, আজ পর্য্যন্ত একদিনও ত তিনি মামার উপর কোন প্রকার অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করেন নাই, বরং কতবার তিনি আমাকে জিদ করিয়া তাঁহার সংবাদ আনিতে পাঠাইয়াছেন। মামাকে তিনি ত অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন, তবে সেখানে খরচের টাকা দিয়া থাকিবার কথা শুনিবামাত্র মা কেন অপ্রসন্না হইয়া উঠিলেন! আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মা নিজ হইতে বলিলেন, “নলিন, এখন সেখানে গেলে ঘরবাড়ী চাষবাস সব নষ্ট হ'য়ে যাবে যে, নইলে আমি ত সঙ্গেই যেতাম। যদি আমি এখানে তেমন কষ্ট বা অসুবিধা হ'চ্ছে বুঝি তাহলে সেখানে যেতেই বা কতক্ষণ? সেজন্য তোর কোন চিন্তা নেই। কষ্ট হবে বলে যদি শ্বশুরের ভিটা, স্বামীর ঘর ছেড়ে আজ চলে যাই তবে কোন দিন আর এখানে বাস করতে পারব না, তুইও পারবি না। শ্বশুরের ভিটায় সন্ধ্যা পড়বে না, তাঁর নাম গন্ধ পর্য্যন্ত লোপ পেয়ে যাবে, এ অসম্মান আমার বা তোর কোন দিক দিয়ে হওয়া একেবারেই উচিত নয়। যে মর্য্যাদা রক্ষার জন্য একদিন তোর বালক-অন্তর অপমান বেদন ভরে নুয়ে পড়েছিল, যেদিন নলিন, তুই তোর অসহায় বিধবা মা'র হাত ধ'রে অনায়াসে অজানা পথে বেরিয়ে পড়তে এতটুকু দ্বিধা করিস্ নি, সেদিনকার মত সৌভাগ্য ক'জন জননীর অদৃষ্টে ঘটে তা বলতে পারি না, তবু তখন তুই তোর পৈত্রিক ভিটা হ'তে বঞ্চিত ছিলি। তোর সেই সৎসাহস দেখে স্বর্গ হ'তে তাঁরা তোকে, আমাকে তাঁদের চিরদিনের প্রীতি মণ্ডিত স্নেহ-নীড়ের মধ্যে যখন পুনরায় টেনে এনেছেন, এবং যেখানে নারী তার পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে সারা বিশ্ব-সংসার তুচ্ছ ও অবহেলা করবার মত সাহস ও শক্তি পায় সেই পুণ্যস্থান পরিত্যাগ করে আমার রাজার ঐশ্বর্য্যও পছন্দ হয় না। আমার কোথাও আর যেতে ইচ্ছা হয় না। এখানে যে তাঁদের সমস্ত গৌরব তোকে তোর সমস্ত দারিদ্র্যের মধ্যেও সম্মানিত করে রেখেছে, সে কথাটা নলিন, কোন দিন যেন ভুলিসনি। আশীর্ব্বাদ করি তুই যেন এই ভিটার মধ্যে তাঁদের সম্মান ও নাম অক্ষুন্ন রেখে আনন্দে বাস করতে পারিস।”

মার কথাগুলি সেদিন আমাকে যেন একটী নূতন পথ দেখাইয়া দিল। মাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, “মা তোমার আশীর্ব্বাদ-বাণী যেন রক্ষা করতে পারি, এর অধিক সৌভাগ্য আমি কোন দিন চাই না।” তিন চার দিন পরেই আমি কর্ম্ম-স্থানে যাত্রা করিলাম। মা মাথায় হাত দিয়া, চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, “বিদেশে খুব সাবধানে থাকবে, কারো সঙ্গে বিবাদ কোরো না। মাঝে মাঝে পত্র দিও।” আমি যে কতদূর যাইতেছি সে কথাটা আর মাকে জানিবার অবসর দিই নাই। যেখানে আমার চাকরী হইয়াছিল সে জায়গাটা রাজপুতানার বিকানির প্রদেশের প্রান্ত-সীমায় মরুরাজ্যের সুজানগড় গ্রামের দাতব্য-চিকিৎসালয়। মা জানিলে বোধহয় এতদূর আসিতে দিতে সম্মত হইতেন না।

(৫)

আজ প্রায় ছয় মাস হইল আমি সুজানগড় আসিয়াছি। এখানে এক ডাক্তারবাবু ভিন্ন দ্বিতীয় বাঙ্গালীর মুখ দেখিবার আশা, দুরাশা। ডাক্তারবাবু সস্ত্রীক আছেন। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। তাঁরই বাসায় আমার আহারাদি চলে। কোনরূপ কষ্ট নাই। তবে কেবল বালি ধূ ধূ করিতেছে। কোথাও সবুজের সম্বন্ধটি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। সেজন্য মনও হু হু করিতে থাকে। এক বৎসর চাকরি করিলে এক মাস ছুটি—সে ছুটি কি মিষ্টি, সেজন্য

একটি দিন চলিয়া যায় আর একটু খানি বাড়ী যাইবার আনন্দ বাড়ে। মার চিঠি বরাবর পাইতেছি, প্রত্যেক চিঠিতে তিনি খুব উৎসাহের কথা লিখিয়া থাকেন। সেদিন একখানি পত্র পাইয়াছি, মা সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া পাচ বিঘা জমি খরিদ করিয়াছেন। এই জমিতে ধান হইলে আমাদের সারা বৎসর আর চাল কিনিতে হইবে না। মাহিনার সমস্ত টাকাই মাকে মাসে মাসে পাঠাইয়া দিই। এখানে মাসে 'কলে' প্রায় ২০৲, ২৫৲ টাকা উপরি পাই; সে টাকা সেভিংস্‌ব্যাঙ্কে জমা রাখি।

ডাক্তারবাবু এখন প্রায় অনেক সমাগত রোগী আমাকেই দেখিতে দেন, কিরূপ ঔষধাদির ব্যবস্থা করি, তাহা নিজে দেখিয়া দেন ও বলেন "তুমি ত ডাক্তার হয়ে গেছ; এখন তুমি নিজে প্রাক্‌টিস করতে পার।" আমি চুপ করিয়া থাকি; কোন উত্তর দিই না। আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, এবার বাড়ী গিয়া ক্যাম্বেলে ভর্ত্তি হইব।

এমন ভাবে যখন সুখে স্বচ্ছন্দে প্রবাসের দীর্ঘ দিনগুলি কাটিতেছিল, তখন হঠাৎ প্রায় ২০।২২ দিন মার নিকট হইতে কোন পত্র পাইলাম না। মন বড় ব্যাকুল হইল। মাকে পত্র দিলাম, উত্তর আসিবার দিন উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ডাকপিয়ন কত দেশ দেশান্তরের চিঠি বহিয়া আনিল, কিন্তু আমার চিঠি ত আনিল না? আমার মন অস্থির হইয়া পড়িল। মা পত্র পাইবামাত্র উত্তর দেন, অনেক সময়ে আমার পত্র পাইতে একটু বিলম্ব ঘটিলে উপরি উপরি পত্র আসিয়া পড়ে। আর আজ প্রায় মাসাধিক কাল হইতে চলিল, মার কোন সংবাদ নাই কেন? যদি তাই হয়, তাহা হইলে মার নিশ্চয় অসুখ হইয়াছে। মার উঠিবার ক্ষমতা থাকিলে পত্র না দিয়া কি তিনি কোন দিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? মা যদি সত্যই এত অধিক পীড়িত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পাড়ার মহেন্দ্র কাকা, ডাক্তারবাবুও আমাকে সে কথা নিশ্চয় জানাইতেন! মাও তাঁর এতবড় অসুখের সময় সংবাদ না দিয়া কখনই চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। পাড়ার কাহাকেও দিয়া কি দুই লাইন লিখিয়া পাঠাইতে পারিতেন না! মার মত বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক সহজে ত দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে কি কারণে তিনি নীরব হইয়া আছেন? মা কি রাগ করিয়াছেন? কৈ, কোন দিন ত তিনি আমার উপর অপ্রসন্ন হন নাই। আমি যেন আর ভাবনার কুল কিনারা খুঁজিয়া পাইলাম না। একবার মনে হইল, হয়ত মার খুব বেশী রকম অসুখই করিয়াছে। খবর পাইয়া মামা মাকে তাঁর বাড়ী লইয়া গিয়াছেন। মা হয় ত মামাকে ঠিকানা দিতে পারেন নাই। তাঁর বাক্সের ভিতর ঠিকানা লেখা খামগুলি সব হয়ত ফেলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মা আমাকে সংবাদ না দিয়া কিনা, তাঁর ভাইয়ের বাড়ী চলিয়া যাইবেন? একথা বিশ্বাস করিতে যে প্রবৃত্তি আসেনা। আর ভাবিতে পারিলাম না, চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

আমি যখন ডাক্তারখানায় বসিয়া কাঁদিতে ছিলাম, বোধহয় ডাক্তারবাবুর স্ত্রী তাহা কোন রকমে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন "তুমি দেখছি ডাক্তারী করতে পারবে না। সামান্য কারণে কিনা, ছেলে মানুষের মত কান্না সুরু করে দিয়েছ। মন কেমন করছে? বিদেশে এলে অমন সবাইএর করে থাকে। চিঠি পাওনি, তার মানে যে, তোমার মা চিঠি দেন নি একথা হ'তে পারে না। অনেক সময় যে ডাকের চিঠি ডাকঘরের কৃপায় পথেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তার খবর রাখ কি? কেবল মন্দ দিক্‌টা যত বড় করে দেখবে, ভাল দিকটা ততই যে চাপা পড়ে যাবে, সে কথাটা ভুললে চলবে কেন?"

আমি বলিলাম, "আজ প্রায় সাত মাস এসেছি; কিন্তু কোন দিন ত এমন হয়নি। কখনও চিঠি মারা যায়নি।"

ডাক্তারবাবু হাসিয়া সমস্ত ব্যাপারটাকে খুব হাল্কা করিয়া দিয়া উত্তর করিলেন, "কোন দিন মারা যায়নি বলে যে কখন মারা যেতে পারে না, এমন কোন যুক্তি কোন শাস্ত্রে লেখেনা। কোন দিন কি এত দূরে চাকরি করতে এসেছিলে? ও সব বাজে চিন্তা মাথা থেকে তাড়িয়ে দাও। স্নানটান করে খাবে চল। আজ তোমার মায়ের খবর পেলেই ত হ'লো?"

"তা'হলে মা আমার বেঁচে আছেন?"

"হাঁ গো মশাই বেঁচে আছেন, অত উতলা হবার কোন প্রয়োজন হয় নি।" বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া টানিয়া স্নান করিতে লইয়া গেলেন। আমার মনের ভিতর কিন্তু একটা অশান্তি লাগিয়াই রহিল।

(৬)

যখন ডাক্তারবাবুর টেলিগ্রামের উত্তর আসিল যে সত্য সত্যই আমার মা সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় শয্যাশায়ী হইয়া আমাদের বাড়ীতেই আছেন, তখনই ডাক্তারবাবু আমার বাড়ী যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনি ষ্টেসনে আমাকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে আসিলেন। গাড়ি ছাড়িবার সময় তিনি আমার হাতে ২খানি ১০০৲ শত টাকার নোট দিয়া বলিলেন, "এ টাকা তোমার, আমার নিকট জমা ছিল, নিতে দ্বিধা করো না। এ বিষয় পরে তোমাকে পত্রে সমস্ত খুলে লিখব। তুমি গিয়েই টেলিগ্রাম করবে—তোমার মা কেমন থাকেন; যদি চিকিৎসার জন্য টাকার প্রয়োজন হয়, আমাকে তার করতে কিছু মাত্র ইতস্ততঃ কোরোনা।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে চাহিতেই দেখিলাম, তাঁহার সংযম ভেদ করিয়া দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। প্রবাসে এমন আত্মীয়তা যে কি মধুর তাহা বোঝান যায় না।

মার অসুখ যখন সামান্ত হইয়াছিল, 'ও কিছু নয় আপনিই সেরে যাবে' বলিয়া মোটেই কোন প্রতিকারের চেষ্টা করেন নাই। যখন শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, উঠিবার শক্তি পর্য্যন্ত কমিয়া আসিতে সুরু করে, তখন যে গোয়ালাবধূ মার নিকট রাত্রিতে থাকিত সে মার নিষেধ সত্ত্বেও ডাক্তারকে ডাকিয়া আনে। ডাক্তার যখন আসেন তখন রোগ বাঁকিয়া গিয়াছে। অসুখ খুবই কঠিন। নিউমোনিয়া হইয়াছে। ছেলেকে সংবাদ দিবার কথা বলায় তিনি কোন উত্তর দেন নাই। গোয়ালাবৌয়ের নিকট পরে বলেন "নলিন ছেলে মানুষ, তাকে ব্যস্ত করে কাজ নেই। নূতন চাকরি হয়েছে, হয় ত এখনি ছেড়ে চলে আসবে।" প্রতিবেশীরা যখন ধরিয়া বসে—এ সময় নলিনকে আনানো বিশেষ প্রয়োজন, তখন তিনি উত্তর করেন "আর ৪।৫ দিন দেখা যাক্, শেষে তাকে সংবাদ দিলেই হবে।"

কোনমতেই তিনি পুত্রকে আনিতে স্বীকৃতা হন নাই। তাঁর কেবলই মনে হইতেছিল "নলিন বালক, চিরজীবনটাই সে কষ্ট পেয়ে আসছে। আমার অসুখে আসলে সে হয় ত আহার নিদ্রা ত্যাগ করে নিজের শরীর নষ্ট করে ফেলবে। এই ম্যালেরিয়ার সময়, চারিদিকে জ্বরে লোক মরছে। আমার যে অদৃষ্ট! হয় ত সে এসে অসুখে পড়বে, মুখে জল দেবার লোকটি পর্য্যন্ত নেই, তাকেই বা কে দেখবে। না, এখন তার এসে কাজ নাই। যদি এ যাত্রা রক্ষা না পাই, তখন তাকে টেলিগ্রাম করলেই চলবে।" একখানা চিঠিতে দুই লাইন মাত্র "ভাল আছি" লিখিয়া একটী ছোট ছেলেকে ডাকঘরে ফেলিতে দিয়াছিলেন, কিন্তু সে চিঠি ফেলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং যথারীতি তার বইএর ভিতর সেখানি থাকিয়া গিয়াছিল। যেদিন তার মনে পড়ে তখন প্রায় ১০।১২ দিন বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভয়ে সে পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া পগারে ফেলিয়া দিয়াছিল। চিঠি লিখিবার এক সপ্তাহ পরে মায়ের বিকার দেখা দেয়। গ্রামের লোকেরা ব্যস্ত হইয়া পড়ে। কেহই

আমার ঠিকানা জানে না। বড়ই মুস্কিল, উপায় কি? ব্রাহ্মণকন্যার মুখে কি পুত্র থাকিতে এক গণ্ডুষ জল বা অগ্নি পড়িবে না? গ্রামের বয়োবৃদ্ধেরা পরামর্শ করিয়া স্থির করেন, যে আমার মামাকে সংবাদ দেওয়া হউক। তাহাই হয়। একদিন, দুইদিন, তিনদিন পরেও মামার কোন সংবাদ মেলে না। এতে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া পড়েন। শেষে তাঁহার নিকট ডাকে আর পত্র না দিয়া লোক পাঠান হয়।

যথাসময় মামা প্রথম পত্রখানি পাইয়াছিলেন, কিন্তু পাছে কোনপ্রকার অর্থাদি সাহায্য করিতে হয় এই আশঙ্কায় আসেন নাই। মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, পরে বলিলেই হইবে "চিঠি পাই নি।" তাহা হইলে সর্ব্বদিক রক্ষা হইবে এবং কোন কথা হইবে না।. তিনি ঘোরতর রকমের বিষয়ী লোক, সুতরাং অকারণ, অনর্থক আত্মীয়তা দেখাইবার যে বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে, তাহা তিনি কোন দিনই মনে করিতেন না। মামীমা হাজার হোক স্ত্রীলোক—পত্রের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "মার পেটের বোন, অসময় ধর্ম্মতঃ তোমার যাওয়া ও দেখা খুবই কর্ত্তব্য, নইলে লোকে যে গায়ে থুথু দেবে, ভদ্রসমাজে মুখ দেখাবে কি ক'রে? তোমার কি নিষ্ঠুর প্রাণ, নলিন শুনচি বাড়ীতে নেই, ঠাকুরঝির মুখে একটু জল দেয় এমন মানুষটি পর্য্যন্ত কাছে নেই, কেমন করে পেটে অন্ন দিচ্ছ বুঝতে পারি না।"

মামীর কথায় ও আত্মীয়তায় মামা নাকি রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়াছিলেন। মামীকে বলেন "আমার বোনকে দেখি না দেখি তোমার বাবার কি? আমার অনেক টাকা দেখেছেন! আমার ইচ্ছে, যাই আর না যাই। ফের এ সম্বন্ধে যদি কোন কথা বল, তাহ'লে বাপের বাড়ীর সোজাপথ পড়ে আছে যেন স্মরণ থাকে, বলে দিচ্ছি। লোকে কি বল্‌বে, সে কথা ভেবে ভেবে ত আমার ঘুম হ'চ্ছে না। লোকে, আমি খেতে না পেলে, রসোগোল্লার হাঁড়ি এনে মুখে তুলে দেয় কি না, তাই লোকের কথায় ভয় ক'রে চলতে হবে! দেখ্‌ছ—সে নিজে চিঠি লিখ্‌তে পারেনি, মরবার বোধহয় আর বেশী বিলম্ব নেই, তাই পাড়ার লোক আমার মাথায় কাঁটাল ভাঙবার ফন্দি এঁটে চিঠি দিয়েছে। যদি তাই না হয়, শুধু হাতে ত আর যাওয়া চলে না; রোগীর পথ্য এখন ২৲টাকার কিনে নিয়ে যেতে হয়। নিয়ে গিয়ে লাভ? পাবার প্রত্যাশা কি আর কিছু রেখেছি—সে সব আগেই আত্মসাৎ ক'রে তবে না বাড়ী থেকে বের করেচি। শুনেছি, নলিন ছোঁড়া চাকরী করে, দু-পয়সা নাকি হাতে ক'রে ছিল, তা বাড়ী করতেই বেরিয়ে গেছে। কি আশায় যাই বল দেখি? শেষে সবাই বলবে—তোমার বাড়ী নিয়ে যাও, তখন কি হবে? বেনো জল খাল কেটে ঘরে আনব নাকি? তা আমি কিছুতেই পারব না।

প্রতিবেশীদের প্রথম পত্রখানি মাতুলের অভাবনীয় বিচার-বুদ্ধির মধ্যেই চিরসমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু লোকের হাতের পত্রখানাকে অস্বীকার করিবার আর কোন পথ মুক্ত নাই দেখিয়া তিনি মহা চিন্তান্বিত হইয়া পড়েন। তখন পত্রবাহককে প্রশ্ন করেন—"নলিনকে টেলিগ্রাম করা হ'য়েছে কি?"

"আজ্ঞে আমি ত বলতে পারলাম না।"

"নলিনের ঠিকানা কি জানিস? কোথায় চাকরী করে? কত টাকা বেতন পায়?"

"দা-ঠাকুর, ও সব ত কিছুই বলে দেন নি। তিনি কোথায় চাকরি করেন বলতে পারি না। তবে শুনেছি অনেক টাকা বেতন পান, মাসে মাসে মা-ঠাকরুণকে ঢের টাকা পাঠান, সেদিন তিনি পাঁচ বিঘা জমি কিনেছেন—হাতে ঢের টাকা আছে; যদি নলিনবাবু না এসে পড়েন তবে সব টাকা বেহাত হ'য়ে যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমরা মুখ্যু-মানুষ, আমাদের ও সব কথায় থাকা উচিত নয়।"

মামার এবার কিন্তু ভগিনীকে দেখিতে যাইবার উৎসাহ খুব প্রবল হইয়া উঠে। তিনি মনে মনে ভাবেন—'হাতে নিশ্চয় অনেক টাকা আছে। ওখানে রাখলে কিন্তু মনোস্কামনা সিদ্ধ হবে না। এখানে যে কোন উপায় নিয়ে আসতেই হবে। কপালে টাকা থাকলে ঠিক এসে যাবে। নইলে নলিন এ সময় বিদেশে পড়ে থাকবে কেন? না, বিলম্বে কার্য্য-হানি, আজই যেতে হবে।' সেই দিনই মামা মাকে আনতে রওনা হন। মামী-মা কপাটের আড়াল হইতে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, সুতরাং স্বামীর উৎসাহের কারণ বুঝিতে তাঁহার বাকি ছিল না।

(৭)

মা কিছুতে মামার সহিত যাইতে স্বীকৃতা হন নাই। তিনি বলেন, "নলিনকে তার করা হোক সে এসে যেরূপ বন্দোবস্ত করে সেরূপ হবে।" মামা যথেষ্ট অনুনয় বিনয়, এমন কি দুঃখে চোখের জল পর্য্যন্ত ফেলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু যখন কিছুতেই মা সম্মত হইলেন না, তখন মামা রাগিয়া চলিয়া যান এবং মার সঙ্গে তাঁহার ভবিষ্যতে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না সে কথা বলিয়া আসিতে ভুলেন না। মা সে কথার কোন উত্তর দেন নাই। কারণ তাঁহার জ্ঞান ভালরূপ ছিল না। মা কেবল আমার আশাপথ চাহিয়া যেন কোন মতে প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন। ডাক্তারবাবু আসিলে মা অতি কষ্টে বালিসের নীচ হইতে আমার ঠিকানা বাহির করিয়া দিয়া কোনপ্রকারে জানান যে আমাকে তার করিতেই হইবে। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বদিনই তিনি সুজানগড় হইতে ডাক্তারবাবুর তার পান ও তাহার উত্তরে আমাকে যাইবার তার করেন। সে কথা ডাক্তারবাবু মাকে বলেন।

নানা চিন্তার ভিতর দিয়া যেদিন সকালে আমি গ্রামের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলাম, সেদিন আমার চক্ষে গ্রামের প্রাতঃছবির সে মনোমুগ্ধকর তৃপ্তিপ্রদ সৌন্দর্য্য নাই। তরুণ-অরুণের আলোক-সম্পাতে তরুপল্লব স্বর্ণকান্তিতে সুশোভিত হয় নাই। বিহঙ্গম-কণ্ঠে কই সে প্রভাতী সুললিত সঙ্গীত-ঝঙ্কার? মাধুর্য্যময়ী ক্ষুদ্র গ্রামখানির সে মহিমা আজ কে হরণ করিয়াছে? চারিদিকেই যেন একটা হাহাকারের পূর্ব্বাভাষ পরিলক্ষিত হইতেছে। আমার চক্ষু ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল। পথেই ডাক্তারবাবুর বাড়ী, তাঁহার দ্বারের নিকট গিয়া যেন আমার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক হইয়া আসিল, তাঁহাকে ডাকিবার মত সাহস হইল না। এখনি হয় ত তিনি আসিয়া বলিবেন, "এত দেরী করে আসতে হয়? আর যদি একদিন আগে আসতে তাহা হইলে দেখা হত।" একথা ভাবিবা-মাত্র আমি ধপ্ করিয়া ডাক্তারবাবুর দ্বারের নিকট বসিয়া পড়িলাম। রেলের কুলীরা আমার জিনিস-পত্র লইয়া আসিতেছিল, আমার অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বাবু কি হ'ল, বসে পড়লেন যে, মাথা ঘুরে গেল নাকি?" আমি কোন উত্তর না দিয়া হাত তুলিয়া তা'কে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিলাম। এমন সময় ডাক্তারবাবুর ছেলে কুলীর চীৎকারে দরজা খুলিয়া আমাকে দেখিয়া বলিল "এই যে নলিন-দা এসে পড়েছেন। কাল রাত্রি থেকে বাবা আপনাদের বাড়ীতে আছেন—বাবা আপনাকে তার করেছেন, পান নি? আপনার কোন অসুখ করেনি ত?" আমি বলিলাম, "না, মা কেমন আছেন?"

"অবস্থা মোটেই ভাল নয়। এখন ভগবানের হাত। কেবল নলিন, নলিন বলছেন" আমি আর কোন প্রশ্ন না করিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। মা এখন বাঁচিয়া আছেন জানিয়া যেন অনেকটা বল পাইলাম। আমি যখন ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করলাম তখন পাড়ার অনেকেই সেখানে উপস্থিত। ডাক্তারবাবু মার শয্যার উপর বসিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতেছেন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলাম "মা আমি এসেছি, একবার আমাকে ডাক।" গৃহ

অভ্যন্তরস্থিত সকলে বলিয়া উঠিলেন "এই যে নলিন এসেছে।" এই আকস্মিক চীৎকারে মার যেন মুহূর্ত্তের জন্য সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তিনি চক্ষু মেলিয়া আমার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া, আমাকে তাঁর রোগক্লিষ্ট ক্ষীণ বাহুদ্বয় দিয়া শীর্ণ বক্ষের উপর অত্যন্ত আগ্রহভরে বিগলিত মাতৃ-স্নেহে টানিয়া লইলেন। অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন "নারায়ণ আমার অন্তরের ব্যাথা বুঝেছেন। তাই তোকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছেন রে নলিন! তোর জন্যেই আমি এতক্ষণ তাঁর কাছে যেতে পারিনি। এক দিন তুই তোর বিধবা অসহায়া মার হাত ধরে পথে দাঁড়িয়ে তোর পিতৃপুরুষের যে মর্য্যাদা আমার হাতে তুলে দিয়ে ছিলি, আমি মৃত্যু পণ করে অমূল্য মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা নিয়ে বসে আছি রে, সে মর্য্যাদা কি সামান্য জীবনের মমতায় কারো কাছে হীন করে যেতে পারি? আজ নলিন আমি ঋণ মুক্ত! তোদের মর্য্যাদা তোর হাতে তুলে দিয়ে গেলুম, এখন তুই তার সম্মান রক্ষা কর।"

এই অদ্ভুত বাণী মন্ত্রশক্তির মত সকলকে মুগ্ধ করিয়া মাতার শয্যার নিকট মস্তক নত করিয়া আনিল।　　　　(সমাপ্ত)

মোহ

শ্রীঅবনীকুমার দে।

নিশিদিন নিরবধি নয়নে নয়নে মোর
　　শুধু তা'রে রাখিবারে চাই,
হ'লে পরে চোখো-চোখি আসে মহা তন্দ্রাঘোর
　　অমনি সে নয়ন ফিরাই!

মরমের এত কথা বলি-বলি মনে করি
　　দেখা হ'লে সব ভুলে যাই,
টুটে যায় সব স্বর বৃথা শুধু ঘেমে মরি
　　কোথা হতে আপনা হারাই!

কি যেন কি মোহ এসে করে চিত্ত ভরপুর
　　চাই চাই চাহিতে না'পাই,
নিশিদিন এত কাছে তবু যেন কতদূর
　　দেখে দেখে না দেখে পালাই!

একি আশা-নিরাশার একি স্বপ্ন-জাগরণ
　　একি মোহে নিয়ত বেড়াই,
মানেনা বোঝেনা প্রাণ;—বৃথা শুধু এ মরণ
　　—তবু যদি তা'রে নাহি পাই!

নারীর অধিকার

শ্রীমতী প্রীতিকণা দত্তজায়া।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশের সমস্ত সমস্যার চেয়ে বড় সমস্যা দাঁড়াইয়াছে যেন নারী-সমস্যা। দেশের লোক অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে, বস্ত্রাভাবে লজ্জা নিবারণ করিতে পারিতেছে না, ম্যালেরিয়া, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি দুরন্ত ব্যাধির কবলে পড়িয়া দেশটা দিন দিন উৎসন্ন যাইতেছে, উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে দুইবেলা দুই মুষ্টি পেট ভরিয়া খাইয়া জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবার মত শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিতেছে না, সমাজে কত অত্যাচার নির্ব্বিরোধে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু কৈ, তৎসমুদায়ের প্রতিবিধানকল্পে ত দেশের শিক্ষিত সমাজ তেমন ভাবে মন প্রাণ নিয়োগ করিতে পারিতেছেন না, যতটা করিতেছেন এই নারী-সমস্যা, নারী স্বাধীনতা বা নারীর অধিকার লইয়া! মাসিক, দৈনিক, সাপ্তাহিক প্রায় সমস্ত কাগজেই এই সমস্যা লইয়া কিছু না কিছু লেখালেখি চলিতেছে, দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় এই নারী-সমস্যা লইয়া কিছু আলোচনা না করিলে বুঝি কাগজ আর বাজারে চলেনা। অনেক লেখাতেই, বিশেষতঃ নারীর এবং তজ্জাতীয় পুরুষ-পুঙ্গবদের লেখায় রীতিমত বিদ্রোহের ভাব মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে,—যেন এই সমস্যাটার সমাধান অচিরে না করিলে দেশটা যায় আর কি? আমরা ত খুঁজিয়া ভাবিয়া পাই না যে বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য এই বিষয়টা লইয়া এত আলোড়িত হইতেছে কেন? 'না জাগিলে সব ভারত ললনা, ভারত যে আর জাগে না জাগে না'—এই জন্যই কি?

নারীর অধিকার লইয়া নারী-সমাজে যে একটা সাড়া পড়িয়াছে ইহাকে আমরা ছোট খাট নারী-বিদ্রোহের পূর্ব্ব সূচনাও বলিতে পারি। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন কয়েকজন শিক্ষিতা মহিলা আর কয়েকজন পুরুষ। তাঁহারা চাহেন এই নিদ্রিত দেশের মহানিদ্রায় অভিভূত নারী-সমাজে প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদিগকে জাগাইয়া তুলিতে,—শুধু জাগাইয়া তুলিতেই নয়, পুরুষদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রীতিমত লড়াই করিয়া তাঁহাদের স্বাধিকার হস্তগত করিতে। তাঁহারা বলেন, ভারতের নারী-সমাজ পুরুষদের স্বার্থময় অন্যায় অত্যাচারে নিষ্পেষিত ও স্বাধিকার-চ্যুত, সমাজ-শাসন ও শাস্ত্রের নিগড়-বন্ধনে তাঁহারা সমাজে এত হেয় হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহাদের কাজ শুধু গর্ভধারণ আর গৃহ-আবেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নিছক দাসী-বৃত্তি দ্বারা পুরুষদের স্বার্থ সংরক্ষণ করণ। সমাজের কাজে, দেশের কাজে তাঁহাদের কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই, পুরুষদের প্রদর্শিত আলোক বর্ত্তিকার পশ্চাদনুসরণ করাই তাঁহাদের একমাত্র কর্ম্ম বলিয়া যেন বিধাতা কর্ত্তৃক তাঁহারা সংসারে প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিবেক বুদ্ধির স্ফূরণ পুরুষদের অভিপ্রেত নহে;—ইহাই হইতেছে নারী সমাজের পক্ষ হইতে নালিশ;—ঠিক নালিশও বলা চলে না, কারণ নালিশ করিতে হয় কোনও বিচারকের কাছে, কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা স্বহস্তেই আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার (?) প্রতীকার করিতে বদ্ধপরিকর। আমরা শাস্ত্রবচন মানিতে নারাজ, কেননা শাস্ত্রকার ছিলেন স্বার্থান্ধ পুরুষ ঋষিরা। শাস্ত্রকারেরা আমাদিগকে যে সমস্ত শ্লোকের দ্বারা অসীম সম্মানের আসনে, দেবীর বেদীতে প্রতিষ্ঠিতা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা স্তোকবাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া—আমাদের

ভগিনীগণকে সে সমস্ত শ্লোকের মোহে ভুলিতে নিষেধ করিতেছি। কবীর, তুলসীদাস, বিবেকানন্দ প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাদিগকে কুৎসিৎ ভাষায় ব্যঙ্গ করিতেও কেহ কেহ লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন না। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে "বিজলী" পত্রিকায় কোনও শিক্ষিতাভিমানিনী মহিলা 'স্ত্রী স্বাধীনতা' নামক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই সীতা সাবিত্রীর দেশে কোনও হিন্দু মহিলার কলমে কেন, মনেও যে আসিতে পারে, তাহা ঐ প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বে ভাবিতে পারি নাই। ইহাতেই মনে হয়, দেশে একটা নারী বিদ্রোহের সূচনা হইতেছে।

এটা অবশ্যই ঠিক যে, আমাদের দেশে নারী জাতির উপর অনেক অন্যায় অত্যাচার হইতেছে, এবং তাহার প্রতীকার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রতীকার কি ঐ ভাবে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিলেই হইবে? দেশের মহাপুরুষদিগকে গালাগালি দিয়া, শাস্ত্রবচন পায়ে ঠেলিয়া, স্বামীকে 'ইতর' 'নীচ' 'ঘৃণ্য' ইত্যাদি কুৎসিৎ বিশেষণে বিশেষিত করিয়া, নারীর যাহা বৈশিষ্ট তাহা ত্যাগ করিয়া গলাবাজী করিলেই কি প্রতীকার হইবে? আমার মনে হয়, তাহাতে প্রতীকার না হইয়া সমাজে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। আর সেই বিশৃঙ্খলার জন্য আমাদের এই শান্তিময় বাংলার কুটীরগৃহ যে অশান্তির ধূমশিখায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে অধিকারের জন্য আমরা আজ লালায়িত সে অধিকার আমাদিগকে অভীষ্ট শান্তি দিতে সমর্থ হইবে কি না তাহা সন্দেহ করিবার পক্ষেও যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

"নারীর অধিকার" কথাটা কি তাহা একটু ভাল করিয়া আলোচনা করা হউক। ভগবানের রাজ্যে মানুষ হিসাবে পুরুষ ও নারীর যে একটা অধিকার বা দাবী আছে তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। প্রত্যেক মানুষেরই এক একটা অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য আছে, এবং তাহা থাকাই হইতেছে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। সৃষ্টির আদিকাল হইতেই ভগবান তাঁহার সৃষ্টিরাজ্যকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য পুরুষ ও নারীর সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেকের অধিকার বা কার্য্যের একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তারপর তাহার অনেক পরে যখন সমাজ সৃষ্টি হইল, তখন সমাজের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য শাস্ত্রকারেরা নর ও নারীর কর্ত্তব্য কর্ম্মের গণ্ডী বাঁধিয়া দিলেন। নর ও নারীর শারীরিক ও মানসিক গঠন সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক। এই শক্তি এবং গঠনের তারতম্যানুসারেই সমস্ত দেশে পুরুষ ও নারীর অধিকার এবং কর্ম্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে সমাজ বেশ একটা সুনিয়ন্ত্রিত ধারায় ক্রমোন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে। যদি নর ও নারীর মধ্যে কর্ম্মক্ষেত্রের একটা পার্থক্য না থাকিত তবে সমাজ সুশৃঙ্খলভাবে কোন দেশেই চলিতে পারিত কি না তাহা বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। চিরকালই পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র বাহিরে এবং নারীর কর্ম্মক্ষেত্র গৃহে নির্দ্দিষ্ট, এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সুসম্পাদিত করিয়া সমাজের ও দেশের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুশৃঙ্খলা রক্ষার সাহায্য করিয়া আসিতেছে। সমাজ সৃষ্টির অব্যবহিত পর হইতেই যদি উভয়েই উভয়ের কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ত্তৃত্ব করিতে যাইত তবে এই পৃথিবী বোধ হয় আজ এত উন্নতির পথে উঠিতে পারিত না। কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সমস্ত দেশেই নরনারীর কর্ম্মের একটা শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে। যদিও জড়বাদী পাশ্চাত্যের নারীসমাজ আজ ঘর ছাড়িয়া রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে পুরুষের অধিকার কাড়িয়া লইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তবু এটা বোধহয় খুবই সত্য যে, নারীর যাহা বৈশিষ্ট যুগ যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে, শত আস্ফালন করিলেও তাহারা তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইতে পারিতেছে না। সেই পরপারের ঢেউ আসিয়া ভারতের বেলাভূমে লাগিয়াছে, আর সেই ঢেউ-এর কলরোলে আমরা

ভারতের নারীসমাজ চঞ্চল হইয়া আমাদের পাশ্চাত্যের ভগিনীগণের অনুকরণে রণসাজে সজ্জিত হইবার আয়োজন করিতেছি। যে সকল শিক্ষিতা মহিলা এই নারী-জাগরণের নেতৃত্ব লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হয়ত মনে করিতেছেন, পুরুষেরা আমাদের এই সংহারিণী মূর্ত্তি দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। পুরুষেরা যে একটু ভীত না হইয়াছেন তাহা অস্বীকার করিলে নিছক মিথ্যা কথা বলাই হয়। আমরা হইতেছি সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তির অংশ-সম্ভূতা, সেই আদ্যাশক্তি সতীই যখন তাঁহার সেই দশমহাবিদ্যা-রূপ প্রকটন করিয়া শিবকে ভীত সঙ্কুচিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখন আমরা সেই আদ্যাশক্তির ছোট খাট অংশগুলিও যে পুরুষদিগকে ভীত চমকিত করিতে না পারিব তাহা ভাবাই নিতান্ত মূর্খতা।

আবহমান কাল হইতে ভারতবর্ষ নারী জাতিকে যে সম্মানের আসনে বসাইয়া শ্রদ্ধাভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আসিতেছে, পৃথিবীর আর কোনও দেশে বোধহয় তাহা দেওয়া হয় নাই। যে পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমরা আজ অধিকার ও স্বাধীনতা বলিয়া চীৎকার করিতে সুরু করিয়াছি, তাহাদের স্থান যে আমাদের অপেক্ষা কত নীচে তাহা কি আমরা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছি? পাশ্চাত্যের জনসমাজ নারীদিগকে দেখে ভোগের উপকরণস্বরূপ, তাহাদের বিবাহপদ্ধতি, বিবাহ চ্ছেদ-প্রথা এবং আইন-ই তাহার জলন্ত সাক্ষী। পাশ্চাত্যে যত ব্যভিচার, পাশ্চাত্যে যত নারী-নির্য্যাতন তাহার শতাংশের একাংশও কি আমাদের এই পুণ্য-ক্ষেত্র ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত হয়? ভারত চিরকালই নারীজাতিকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া আসিতেছে। তাই এখানে আমাদের উপর যে কর্ম্মভার ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহাও অতি মহৎ, অতি গৌরবের। আমরা সংসারের একচ্ছত্র অধীশ্বরী, লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা। কেহ আমাদের কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবার নাই, পুরুষেরা তাঁহাদের গৃহ-তরণী খানির সমুদায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমাদের উপর ছাড়িয়া দিয়া বাহিরের কাজ লইয়া ব্যস্ত, উপার্জ্জন করিয়া অর্থ আনিয়া আমাদের হাতে দিয়াই খালাস, সময়মত এক মুষ্টি জুটিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট, সংসারের দিকে দেখিবারও তাঁহাদের বড় অবসর নাই। সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী আমরা। বাড়ীর কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য পিপীলিকাটীর অন্ন সংস্থানের ভার আমাদের উপর। গৃহকর্ত্রী স্বীয় কর্ম্মকুশলতায় গৃহসংসারকে শান্তি-নিকেতন করিয়া তোলেন। পুরুষের কার্য্য বাহিরে, তাঁহারা বাহির লইয়াই ব্যস্ত, সংসারের দিকে দেখিবার বড় একটা অবসর নাই। নারীত্বের বিকাশ মাতৃত্বে, ভারতে নারীজাতি সেই ভাবে সম্পূজিতা। এতবড় একটা সম্মানের উচ্চ পদবী বোধহয় আর কোনও কালে নারীজাতিকে অর্পিত হয় নাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের মেয়েরা আজ ঘরের ঠাকুর ফেলিয়া পরের কুকুর পূজা করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আজ আমরা পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমাদের অত বড় গৌরবের পদ উপেক্ষা করিয়া, নিজের অধিকারের, কর্ত্তব্যের দায়িত্ব ও সম্মান বিস্মৃত হইয়া পুরুষের অধিকার ভোগের জন্য কলম বাজী ও গলাবাজী করিতে আরম্ভ করিয়াছি। যাহারা আবহমানকাল প্রচলিত স্বাধিকারের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিল না, তাহারা পুরুষের অধিকার নিজেদের হাতে লইয়া নিজেরাই বা এমন কি কৃতার্থ ও ধন্য হইবে এবং দেশকেও ধন্য করিবে? কথাটা একটু ভাল করিয়াই বলি, গৃহ-সংসারের নেতৃত্ব ও কর্ত্তৃত্বের যাবতীয় ভার, এতদিন আমাদের দ্বারাই পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু আজকাল, আমরা আমাদের সেই ভগবদ্দত্ত নেতৃত্বে সন্তুষ্ট নই, ঠাকুর, চাকর ও ঝীর হাতে আমরা আমাদের সেই গৌরবের কাজ ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছি। স্বামী পুত্র

রীতিমত সময়ে আহার পাইল কি না, দাসদাসীর হাতে সংসারের কত অপব্যয় হইতেছে তাহাও একবার চোখ ফিরাইয়া খোঁজ লইবার প্রবৃত্তি আমাদের হয় না। আমাদের মঙ্গল হস্তের পূত-স্পর্শে একদিন এই দেবভূমি ভারতের ঘরে ঘরে লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আজ আবার আমাদেরই ঔদাসীন্তে সেই সুখ ও শান্তির গৃহ দারিদ্র্যের হাহাকারে ভরিয়া উঠিতেছে। গৃহলক্ষ্মীর দ্বারায় গৃহের যে শান্তি পুরুষেরা কর্ম্মক্লান্ত শরীরে আসিয়া অপরাহ্নে ভোগ করিত, আমরা পাশ্চাত্যের অনুকরণে তাহা নষ্ট করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া উঠিয়াছি। আজকাল তাস ও উপন্যাস লইয়াই আমাদের অধিক সময় অতিবাহিত হয়, ঘরের যে সর্ব্বনাশ আমাদের দ্বারায় সাধিত হইতেছে সেদিকে একবার চাহিয়া দেখিবার অবসর আমাদের নাই। আমরা মায়ের জাতি, সংসারের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহা আমাদের এই মাতৃত্বের মধ্যে সঞ্চিত, কিন্তু ভগবানের কি অভিসম্পাত আজ আমাদের দেশে ও সমাজে পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে যে, আমরা সেই মাতৃত্বের গৌরবকে নিতান্ত তুচ্ছ ঘৃণ্য সামগ্রী বলিয়া অবহেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছি! সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে আমরা পেটের ছেলে মেয়েকে ভগবানের দেওয়া তাহাদের খাদ্য শুন্য দুগ্ধে বঞ্চিত করিয়া আয়া, বা ফিডিং বোতলে তাহাদের ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করিতেছি! আমরাই না করুণাময়ী মাতৃজাতি, আমাদেরই দয়ায়, আমাদেরই স্নেহেই না এই জগত এত সুন্দর, আমাদেরই উপর না সৃষ্টি সংরক্ষণের অধিকাংশ ভার ভগবান কর্তৃক সমর্পিত? আমরা আজ আমাদের সেই অধিকার ও দায়িত্ব এমনি করিয়াই পালন করিতেছি! আমরা আজ স্বাধিকার পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি পুরুষের অধিকার কাড়িয়া লইতে! যাহারা নিজেদের অধিকার সুসম্পন্ন করিতে অসমর্থ, তাহারাই আবার পরের অধিকার লাভের জন্য এত লালায়িত কেন? যে আমেরিকা ও ইউরোপের অনুকরণে আমরা অধিকার অধিকার বলিয়া নাচিয়া উঠিয়াছি, সেই দেশেরই কোনও বিদুষী মনস্বিনী মহিলা তাঁহাদের দেশের নারী জাতির অধঃপতন দর্শনে ব্যাকুল চিত্তে প্রতীকারের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, নারী ও পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র কোনও দিনই এক নহে, এবং কোনও দিনই এক হইবে না, যদি বলপ্রকাশে এক করিতে যাওয়া যায়, সৃষ্টিরাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, সমাজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। আর আমরা ভারতের নারীসমাজ তাহাই পাইতে লালায়িত হইয়া পড়িয়াছি, ইহা রুচিবিকার, না শিক্ষার সার্থকতা?

আমাদের দায়িত্ব, আমাদের কর্ত্তব্য, আমাদের অধিকার যে কত কঠোর, কত গুরুতর, কত গৌরবময় তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। আমাদের উপর গৃহ-সংসারের শান্তি প্রতিষ্ঠার ভার, তার চেয়ে একটা বড় ভার হইতেছে গর্ভধারণ ও সেই সন্তানকে দেশের প্রকৃত সন্তানরূপে গড়িয়া তোলা। একবার ভাবিয়া দেখা উচিত পাশ্চাত্য সভ্যতার চটকে আমরা কোন পথে অন্ধের মত ছুটিয়া চলিয়াছি! আমরা আমাদের বৈশিষ্ট্য হারাইতে বসিয়াছি। ভারতের পুণ্যময় গৃহায়তনে পবিত্র বেদীতে সমাসীনা হইয়া আবার আমাদের আগের মত গৃহসংসারের পালন-দণ্ড পরিচালন করিতে হইবে, তাহা হইলেই ভারত আবার সোণার ভারত হইবে, গৃহসংসার আবার সুখ ও শান্তির প্রতিষ্ঠানক্ষেত্ররূপে বিরাজ করিবে। লেখাপড়া শিখিয়া দেশ বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনা করিতে সমর্থ হওয়া, আমাদের উপর অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার মত শক্তি সঞ্চয় করা খুবই দরকার কিন্তু নিজের অধিকার পরিত্যাগ করিয়া অন্যের অধিকার কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলে কিছুই হইবে না, যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিতে হইবে।

একখানি চিত্র

শ্রীবিশ্বমোহন সান্যাল।

দিন চিরকাল সমান যায়না যেন এই কথা প্রমাণ করিবার জন্তই লক্ষ্মী বাঁচিয়া রহিল। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার অগাধ বিষয় সম্পত্তি যে কেমন করিয়া উড়িয়া গেল, তাহা রহস্যময়ই বলিতে পারেন। যাই হোক, লক্ষ্মীর আজ মাথা গুঁজিবার স্থানও নাই—তাহার দেবর তাহাকে জানাইয়া দিয়াছে যে দাদার ঋণ শোধ করিতে ও শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিতে ভদ্রাসন পর্য্যন্ত বেচিয়া ফেলিতে হইয়াছে।

লক্ষ্মী দেবরের কাছে আশ্রয় পাইবার আশা করিয়াছিল। কিন্তু তাহা হয় কি করিয়া? ছোট ও বড় বৌএ কোনকালেই নাকি মিল নাই। অতএব লক্ষ্মীর দেবর সংসারে অনর্থক অশান্তি সৃষ্টি ত আর করিতে পারে না! তবে বড় বৌকে মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া সে দিবে—তিনি যেন একটি চালা তুলিয়া পৃথক বাস করেন। একজনের জন্ত আর কতই বা দরকার হয়!!

* * * *

লক্ষ্মী কিছুই বলিল না। চোখের জল ও দেবরের দেওয়া পাঁচটি টাকা লইয়াই সে দিন কাটাইতে লাগিল। পাড়ার লোক কিন্তু কাণাকাণি করিতে কসুর করিল না। লক্ষ্মীর দেবর যে তাহাকে ঠকাইয়া সব আত্মসাৎ করিয়াছে, সে কথা তাহারা বলিতে ছাড়িল না। কিন্তু লক্ষ্মীর তাহাতে কিছুই উপকার হইল না।

হিন্দু বিধবাকে ঠকাইবার নানা উপায় আছে; কিন্তু তাহাকে বাঁচাইবার উপায় কৈ? নারীকে প্রথম হইতে যে ভাবে শিক্ষা দিলে এই বিপদকে দূর করা যায়, সে শিক্ষা হিন্দু-সমাজে কোথায়? পরমুখাপেক্ষী জীব মাত্রেরই যে অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হয়, একথা এক ভারতবাসী ব্যতীত কে না জানে? মনু বলিয়াছেন—নারী বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকিবে; অতএব সেই বিধান মতেই আমরা চলিতেছি। আমরা ভুলিয়া বসিয়াছি যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া কালে কালে স্মৃতির বিধান পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সে যুগে মদ্যপ ও দুশ্চরিত্র স্বামীর ছড়াছড়ি ছিল না—স্ত্রৈণ ও আত্মসুখসর্ব্বস্ব পুত্রের প্রাচুর্য্য ছিল না—ভ্রাতৃবধূকে ঠকাইবার জন্ত বেনামী করিয়া সম্পত্তি ক্রয় করিবার মত দেবরের সংখ্যাও বেশী ছিল না।

* * * *

মোট কথা, মনুর যুগের শিক্ষাই লক্ষ্মীর ছিল—তাই এ যুগে তাহার চক্ষের জল আর ফুরাইল না।

আবাহন

শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার।

এস শস্যশ্যামলা ইন্দিরা মাতা
পল্লী-আঙিনা তলে;
আজি অযুত তনয় পূজিবে তোমায়
অনিমেষ আঁখি জলে।
এস প্রাঙ্গনে খুলে' সোণার আঁচল,
ছড়ায়ে স্নিগ্ধ হাসি,
আজি ভরুক্ পল্লী সঙ্গীতে সুরে
জাগুক্ হর্ষ রাশি।
এস শান্তি প্রদানি' ভবনে ভবনে
চির কল্যাণময়ী,
আজি পুলকে পল্লী-সন্তান নমে'
এস মা লক্ষ্মী অয়ি!

শিশু চিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত এচ্-এম্-বি।

কুকূণক :—শিশুদিগের চক্ষুর পাতায় কুকূণক বা কোথ নামক এক প্রকার রোগ হয়। ইহা দূষিত দুগ্ধ পানে, সূতিকা গৃহের দোষে ও হিম লাগান প্রভৃতি কারণে হইয়া থাকে। ইহাতে শিশুর চক্ষু চুলকায়, বারংবার চক্ষু হইতে জল নির্গত হয়। ইহার জন্য শিশু কপাল, চক্ষু ও নাসিকা ঘর্ষণ করিয়া থাকে এবং রৌদ্রের দিকে চাহিতে পারে না ও চক্ষুর পাতা উন্মীলন করিতে পারে না। ইহাকে চলিত কথায় শিশুর "চোখ উঠা" বলিয়া থাকে।

চিকিৎসা :—(১) এই কুকূণক বা চোখ উঠিলে গরম জল আধ হাত পরিমাণ উঁচু হইতে ধারাণী করিয়া ভাল করিয়া চক্ষু ধুইয়া দিবে।

(২) গরম জলে পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজাইয়া চক্ষুর পিচুটি মুছাইয়া দিবে।

(৩) ১ রত্তি পরিমিত তুঁতে এক ছটাক পরিষ্কার জলে গুলিয়া একটী শিশিতে রাখিবে। উক্ত জলধারা প্রত্যহ দুই তিনবার চক্ষুতে ছাট দিবে।

(৪) সেওড়ার আটায় কাজল পাতিয়া চক্ষুতে সেই কাজলের অঞ্জন দিবে।

(৫) ছাগ দুগ্ধের সহিত দারু হরিদ্রা, মুতা ও গিরি মাটি পেষণ করিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিবে।

তড়কা :—শিশুদিগের 'তড়কা' নামক এক প্রকার পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মূর্চ্ছা ও হাত পায়ের খিঁচুনী প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। নানা কারণে এই রোগ হয়। জ্বর অথবা অন্য কোন কারণে শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে, হঠাৎ ভয় পাইলে, শরীরের কোন স্থানে আঘাত বা বেদনা পাইলে, ফোড়া বা ক্রিমি হইলে এই রোগ হয়। তড়কা আরম্ভ হইলে শিশু অচেতন হয়। মুখের বর্ণ ফ্যাকাসে হয়, হাতের অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ হয়, পায়ের অঙ্গুলি বক্র হয়, এবং হাত পা খেঁচিতে থাকে। ১ মিনিট হইতে ৫ মিনিট পর্য্যন্ত ইহার অবস্থিতি সময়। অনেকের আবার ১ বার ভিন্ন বার বার তড়কা হয়। এই রোগ হইবার পূর্ব্বে—ঘুমের সময় চমকাইয়া উঠা, চক্ষু টেরা হওয়া ও বৃদ্ধ অঙ্গুলি কুঞ্চিত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই গুলিকে তড়কার পূর্ব্বরূপ বলে।

চিকিৎসা :—শিশুর তড়কায় চেতনা সম্পাদনের জন্য একখানি হরিদ্রা আগুণে উত্তপ্ত করিয়া কপালে অল্প তাপ দিবে। জ্বর বেশী হওয়ার জন্য তড়কা হইলে চোখে মুখে ও মাথায় ঠাণ্ডা জলের ছিটা দিবে। দুর্ব্বলতার জন্য তড়কা হইলে রাই সরিষা গুঁড়া করিয়া গরম জলের সহিত মিশাইয়া ঐ জলে একটী পাত্র পূর্ণ করিয়া তাহাতে হাঁটু পর্য্যন্ত শিশুর পা ডুবাইয়া দিবে। এই ভাবে কিছুক্ষণ রাখার পর ময়দা ও রাই সরিষার গুঁড়া একত্র জলে মিশাইয়া লইয়া শিশুর দুই পায়ের ডিমে উহার পটি বসাইয়া দিবে এবং হাতে, পায়ে ও বগলে আগুনের সেঁক দিবে।

ক্রিমির জন্য তড়কা হইলে :—গরম জল পূর্ণ একটী পাত্রে শিশুর গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। উপরোক্ত প্রকারে আধ হাত উঁচু স্থান হইতে মস্তকে শীতল জল ঢালিতে হয়। এরূপ অবস্থায় শিশু যখন সুস্থ হইবে তখন দুগ্ধের সহিত এরণ্ড তৈল সেবন করাইয়া দাস্ত করাইবে।

মুখের ঘায়ে :—শিশুর মুখে ঘা হইলে সোহাগার খই মধুর সহিত মিশাইয়া মুখে লাগাইতে দিবে। ভেড়ার দুধ লাগান শিশুর মুখের ঘায়ে বিশেষ উপকারী।

কাণ পাকায় :—শিশুর কাণ পাকিয়া পূঁয নির্গত হইতে থাকিলে গরম জল কিম্বা কাঁচা দুধ ও জলসহ পিচ্‌কারীর সাহায্যে কর্ণ ধৌত করিয়া তাহার পর ভাল করিয়া মুছাইয়া দিয়া ২।৩ ফোঁটা আতর কর্ণ মধ্যে ঢালিয়া দিবে।

ফট্‌কিরির জলের ফুট দিলে বা আলতা গরম করিয়া তাহার ফুট দিলে কাণ পাকা ভাল হয়।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রীদের তালিকা

নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহাদের নামের শেষে ১ চিহ্ন আছে তাঁহারা প্রথম বিভাগে, যাঁহাদের নামের শেষে ২ চিহ্ন আছে তাঁহারা দ্বিতীয় বিভাগে, এবং যাঁহাদের নামের শেষে ৩ চিহ্ন আছে তাঁহারা তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বেথুন কলেজিয়েট স্কুল—

অমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১, রেণুকা বন্দ্যোপাধ্যায় ১, সরস্বতী দাস গুপ্ত ১, সুলতা মিত্র ১, সুরমা মিত্র ১, তমালিকা সরকার ১, সুষমা মিত্র ১, জয়ন্তী গুপ্তা ১, অমিয়া আই ১, কল্যাণী দাস গুপ্ত ১, ভায়লেট নিরুপমা রায় ১, পুলিনা দেবী ১।

ডায়োসেসন কলেজিয়েট স্কুল—

রয়ডালি বেজবড়ুয়া ১, মনোরমা মল্লিক ১, প্রভা গুপ্ত ২, জৈনবরহিম ১, নীলনলিনী বিশ্বাস ১, লিলি সেন ১, নীতা মুখার্জ্জী ১, লীলা রায় ২, জ্ঞানভাতি ভাণ্ডারী ১, এলিআর্ম্মা এলিয়া ১, বেথ জেফবয় ১।

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়—

সুপ্রভা ঘোষ ১, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ১, নীহার নলিনী দত্ত ১, সুরুচি সিংহ ১, বিনীতা বিশ্বাস ১, মণিকা দত্ত ১, শান্তনা বসাক ১, সুপ্রভা দত্ত ১, স্নেহলতা সেন ১, আভা দাস ২, সুলেখা সেন ২, পরিমিতা সেন ২, কমলা দাস গুপ্ত ১, কণিকাকণা সেন ২, শোভনা ঘোষ ১, রেণুপ্রভা নাগ ১।

সেণ্ট মারগারেট স্কুল—

বীণাপাণি বসু ১, ভবেন বালা দাস ১, রমলা বালা বিশ্বাস ১, বিনয়বালা বসু ১, পুষ্পলতা বিশ্বাস ১, রূপমা বিশ্বাস ১।

ভিক্টোরিয়া ইনষ্টি—

সুষমা বসু ১, সুহাসি ঘোষ ১, প্রতিভা বিশ্বাস ১, বিনীতা সেন ১, সুধা ঘোষ ১।

ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী গার্লস স্কুল—

শশিমুখী লাহিড়ী ১, বিসখা নাগ ২, নীহারবালা নন্দী ২, সুনীতি সরকার ১, মণিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২, স্নেহলতা চৌধুরী ১ প্রীতিলতা গুপ্ত ১, নীহার হালদার ১, সুষমা রায় ১।

চট্টগ্রাম ডাক্তার খাস্তগীরস্ বালিকা হাই স্কুল—

শোভনা চৌধুরী ১ সুধীরা দত্ত ১, নীলিমা রায় ১, সুশীরা নারায়ণ ১, হিরণ বিশ্বাস ১, অণিমা দাস ১, মাধুরী গুপ্তা ২।

ক্রাইষ্ট চার্চ্চ হাই—

চন্দ্রমুখী রায় চৌধুরী ২, কৃপাকণা বসু ১, অরবিন্দ ক্রিশ্চেন ১।

বরিশাল্ সদর হাই বালিকা বিদ্যালয়—

শান্তিসুধা ঘোষ ১, মনোরমা গুহ ১, নবলীলা ঘোষ ১, হেমলতা রায় ১।

ইউনাইটেড্ মিশনারী গার্লস্ হাই—

বেলি হডসন ১, পারুল বালা মণ্ডল ১।

চট্টগ্রাম উমাতারা ইনষ্টি—

সুকৃতি চৌধুরী ৩।

দার্জ্জিলিং মহারাণী স্কুল—

শরৎশশী দে ১, মীরা ধর ১, শৈবলিনী দাস ৩।

প্রাইভেট ছাত্রী—

দীপ্তি চট্টোপাধ্যায় ১, এস পেটাস ১, আশালতা বসু ৩, বিধুমায়া দাস গুপ্তা ২, মৃণালিনী সাউ ২, বনস্ হেমিস্কিয়ার ১, রেণুকা রায় ২, রোজ ভায়লেট দত্ত ১, বকুল দেশপাণ্ডে ১, শোভনা দেবী ২, ইরেনিডি বনিফেশাস্ ১, কোপার্থী লক্ষ্মীনারায়ণ সা ২, মিরিয়াম ফ্রাঙ্ক ২, ধর্ম্মশীলা জয়াবল ৩, রেবা রায় ১, রেখা দেবী ১, সুহাসিনী দেবী ২, ফুলবালা মণ্ডল ২, লীলা দত্ত ৩, ইলা দত্ত ২, হিরণ দত্ত ১, জ্যোৎস্না দত্ত ৩, দোধোথি ওয়ার ২, গ্রিজিবন ২, মিস মিলা ৩, মেরি ইসিবন ২, সন্তোষ দত্ত ১, বেথিজিনা ২, সুমতি গুপ্ত ১।

মাতৃ-মন্দিরে

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

মন্দির-দ্বার মুক্ত আজিকে মঙ্গলঘট পাতা,
কোথায় পুজারী, কোথায় ভক্ত, কোথা গো অর্ঘ্যদাতা?
হোমের আগুন কে জ্বালিবে আজ,
কে পরাবে মাকে শত ফুল সাজ?
কোথা সন্তান,—জাল' জাল' দীপ, গাহ' গাহ' জয়গাথা।
এস অগণিত তরুণ সাধক, ডাকিছেন আজি মাতা॥



—"[illegible] যেমন আলোর লাগি, না জেনে রাত কাটায় জাগি,
তেমনি তোমার আশায় আমার হৃদয় আছে চেয়ে।"—রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীবসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত



মাতৃমন্দির



২য় বর্ষ } ভাদ্র—১৩৩১ { ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।

সুভদ্রা-হরণ পালা ভাদ্র আজি গায়,
চলে রথ সুভদ্রায়, অর্জ্জুন দক্ষিণে তাঁর
পরাহত মেঘদল যদুকুল ধায়।
সমুখে অবাধ পথ চলেছে বিজয়ী রথ
সমুখে অপার আলো কিরীটী ছড়ায়,
রমণী সারথি আজ, নিখিলে মোহন সাজ
জল স্থল শূন্য ভরে মাধুরী লীলায়।
জলে কমলের মেলা, মাঠেতে ধানের খেলা
আলোকিত নদী বেলা কাশ সীতিমায়।
আকাশে বকের পাঁতি ফুটায় নীলের ভাতি
চাঁদিমা উজল রাতি নয়ন ভুলায়।
পথ ধূলি আজি লীন, দিগন্ত যে অন্তহীন
বাঞ্ছিত পরশে আশা যাত্রী অসীমায়।

নারী-চরিত্র

শ্রীমতী মহামায়া দেবী।

নারীর উন্নতি নির্ভর করছে নারীর চরিত্রের উপর। নারী-চরিত্র আজ এত দুর্ব্বোধ্য, এত জটিলতাময় এবং এত আচ্ছন্ন যে তার স্বরূপ খুঁজে পাওয়া দায়। পর্দ্দার পর পর্দ্দা ফেলে নারী আপন স্বরূপকে ঢেকে ফেলেছে।

নারী বড় গোপনতা প্রিয়। এই গোপন-প্রিয়তাই তার সর্ব্বনাশের মূল। নারী আপনার সঙ্গে আপনি লুকোচুরি খেলে, আপনাকে আপনি বিকৃত ক'রে প্রকাশ করে। নারী-চরিত্রের এইটাই মহৎ দোষ, এই খানেই নারী-চরিত্র খর্ব্ব হয়েছে। সে কিছুতেই নিজেকে সহজভাবে প্রকাশ করতে পারে না।

নারীর এই গোপনতার কারণ অনেক আছে জানি। জানি, নারীর মুক্ত-গতি রোধ হওয়ায় গলিপথ তাদের আবিষ্কার করতে হয়েছে; জানি, সত্য অধিকারের দাবী অগ্রাহ্য হওয়ায় কৌশলে চাতুরীজাল বিস্তারে তাদের প্রাপ্য আদায় করতে হয়; জানি, চারিদিক আমাদের রুদ্ধ, আমরা অলঙ্ঘ্য, অভেদ্য বিধানের প্রাচীর-ঘেরা ঘরে বন্দী হয়ে আছি, কিন্তু তাই বলে কি ঐ প্রাচীর গাত্রে সিঁদ্ কেটে আসা যাওয়ার গোপন পথের সৃষ্টি করে সেটা পাথর চাপা দিয়ে নিজের চরিত্রকে কলুষিত করতে হবে? এ যে চোরের উপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খাওয়ার মত আমরাই ঠকছি, নিজের হাতে নিজের অমঙ্গলের পথ পরিষ্কার করছি।

কারো বিপক্ষে বিদ্রোহ করতে আমি নারাজ, অক্ষমতায় নয়, ঘৃণা বোধ করি। আমার প্রাপ্য যা, তা কারো হাতে নাই, আমি তার অধিকারী হলেই পাবো—এই আমার বিশ্বাস। তাই আমি আমাদের শত বাঁধনের বিধানকে অথবা বিধাতাকে দোষ দিই না, দোষী নারী, দোষী আমি। আমার নিজের কোথায় ফাঁক আছে তার অনুসন্ধান আগে আমার করা চাই; আমার উন্নতি অন্যের নিকট প্রার্থনীয় নয়, আমার উন্নতি আমার নিজের হাতে।

নারীর এক দারুণ অক্ষমতা যে, সে হয় নিজেকে ঢেকে রেখে দেখাতে চায়, নয় তো নানারকম রং ফলিয়ে দেখাতে চায়। এ এক মস্ত ফাঁকি। এ বাহিরকে ঠকান নয়—এ নিজেকে ঠকান, আপনার হাতে আপনার চরিত্রকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।

নারীকে সহজ হয়ে দাঁড়াতে হবে, আপনার স্বভাব নিয়ে, স্বরূপ নিয়ে, স্বধর্ম্ম নিয়ে দাঁড়াতে হবে। অস্বাভাবিকতাই পতন, ধ্বংস, মৃত্যু। গোপনতাই পাপ, তার জন্য পরিতাপই নরক ভোগ। এই গোপনতার জাল নারীকে নিজের হাতে একে একে ছিন্ন করে প্রকাশ হতে হবে। উদার, অনাবৃত, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র নিয়ে, একমাত্র সত্যকে, ভগবানকে আশ্রয় ক'রে নারী যদি দাঁড়াতে পারে, তবে শত বন্ধনের কারা নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। নারী যদি আপনার দিক থেকে উন্নত হয়ে না উঠতে পারে তবে তার উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা।

আজ আমরা বাইরের দিক দিয়ে অনেক কিছু করে যেতে পারি কিন্তু সে করাটা আমাদের ক্ষণিক সান্ত্বনা স্বরূপেই হবে, শান্তি দিতে পারবে না, যদি সেখানে আমরা চরিত্রে দুর্ব্বল হই।

নারীর চরিত্র যারপর নাই দুর্ব্বল এবং চঞ্চল এ কথা নারীর অস্বীকার করলে চলবে না। এবং চঞ্চল বলেই তো নারী আজ স্বরাজাশায় ও স্বাধীকারাশায়, এবং এ সবের আড়ালে নিজের নাম ও যশের আশায়, অনেকে অনেক কিছু বলতে চাচ্ছে, করতে যাচ্ছে, অনেক রকম বিদ্রোহ

বিপ্লবের সৃষ্টি করতেও চেষ্টা করছে, কিন্তু আসল বস্তুটার জন্য কেউ কি কিছু করছে, যে বস্তু পেলে আর কোন কিছু করবার প্রচেষ্টা করতে হয় না এবং চাইতেও হয় না, আপনা হতেই পাওয়া যায়? বিবেকানন্দের বাণী প্রশ্বাসে প্রশ্বাসে স্মরণ করবার দিন কি এখনও আসেনি যে, চালাকির দ্বারা কোনও কাজ হয় না, চাই চরিত্র, চাই ধৈর্য্য, চাই সত্যনিষ্ঠা। তাঁর এই মহৎবাণী আমি কেবলমাত্র পুরুষের দিকেই প্রযোজ্য বলে মনে করি না, নারীরও এ বাণী গ্রহণীয়। কিন্তু নারী সে মহৎবাণী গ্রহণ করবার যোগ্যতা কি এখনও লাভ করতে পারলে না?

লজ্জায় ঘৃণায় মরমে মরতে ইচ্ছা হয়—এখনও পুরুষমহলে নারী চরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তা নিয়ে অনায়াসে আলোচনা চলছে! নারী আপন মহান চরিত্র দেখিয়ে পুরুষের এ সাহসের মূলে কুঠারাঘাত করতে প্রস্তুত হচ্ছেনা কেন?

'নারী-চরিত্র দুর্জ্ঞেয়' একথা পুরুষের মুখ থেকে নারী অবাধে শুনে আসছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এর প্রত্যুত্তর নারী আপনার চরিত্র দেখিয়ে দিতে পারলে না যে, নারী-চরিত্র দুর্জ্ঞেয় তো বটেই কিন্তু দুর্জ্ঞেয়তায় পুরুষ-চরিত্র তার অপেক্ষা একটুও কম যায় না বরং অধিক। নারী-চরিত্র দুর্জ্ঞেয় হয়েছে অবস্থায় পড়ে কিন্তু এমনও কত পুরুষ আছেন আমি প্রত্যক্ষ করেছি যাঁদের চরিত্রে প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন ঘটে।

কিন্তু কি বলা যাবে? এখানে বেশী কথা বলবার নাই। নারী অনাবশ্যক আন্দোলন করে আপন চরিত্রকে গুলিয়ে না তুলে বরং চরিত্রের মলিনতা ধুয়ে ফেলবার চেষ্টা যদি করেন তবেই তাঁহার মঙ্গল, তবেই তাঁহার মুখ থাকে, দুটো কথা বলাও সাজে, কিন্তু তার আগে নয়।

যতদিন না নারী চরিত্র গড়ছে, ততদিন নারী-চরিত্রের এই সব অপবাদ নারীকে মাথা পেতেই নিতে হবে নারীর এযে প্রায়শ্চিত্ত!

পূর্ণ-লাভ

শ্রীমতী ভক্তিসুধা হার।

লক্ষ যুগের বেদনা বহিয়া
বক্ষ গিয়াছে ভরি'
নিঠুর দহনে দহিয়া দহিয়া
দুঃখ লয়েছ হরি'।
মরমে কঠিন পরশ শোণিমা
আঘাতের দাগে দাগে,
এ মধুর ক্ষতে প্রেমের লালিমা
প্রণয়ের রাঙা রাগে।
আশা নিরাশার সংশয় মাঝে
বাঁচালে বন্ধু মোর,
সাজালে ব্যর্থ পিয়াসীর সাজে
মিটালে দ্বন্দ ঘোর!
আঁখি পাশে থাকি তৃষা শুধু বাড়ে
বৃথা আর দূরে দূরে,
তাই দিলে ধরা নয়নের আড়ে
এ গোপন হৃদি পুরে।
অশ্রুসাগর মন্থন করি'
যে সুধা দিয়াছ বঁধু
প্রীতির জোয়ার অন্তর ভরি'
বহাবে তাহার মধু।

শেষ দৃষ্টিতে

(গল্প)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

(১)

সেখানে ছিল বার মাসই বসন্ত অর্থাৎ সকল ঋতুই বসন্ত না হলেও ক্ষতি ছিল না, প্রাণ যেখানে দিনরাত মসগুল, সেখানে বারমাস বসন্ত নয় তো কি? ফুরফুরে বাতাস, কোকিল পাপিয়ার সুমধুর ঝঙ্কার, এ সবও নবাবজাদির আরামের স্থান মনিমঞ্জিলে অভাব ছিল না।

সামনে বয়ে যেত কাঁচপারা ঠাণ্ডা জলভরা বড় দীর্ঘিকাটী, তার ধারে শুধুই বসরাই গোলাপ, সে গোলাপ বারমাসই ফুটত, তবে কম আর বেশী, বড় আর ছোট। ধারে ধারে বড় বড় ঝাউগাছের সরু পাতা গুলোতে বাতাসের ধাক্কা লেগে সোঁ সোঁ শব্দ উঠত, দিগ্‌বধূরা তার শব্দে মুগ্ধ হয়ে যেত। দীর্ঘিকার কালো জলে ছায়া ফেলে খেলা করত দুধের মত সাদা হাঁসগুলি। মীনশিশুরা জলের ওপর ক্ষণিকের তরে ভেসে উঠে পৃথিবীর বাহ্যসৌন্দর্য্য দেখবার চেষ্টা করত, সূর্য্যের আলো উপভোগ করত, চঞ্চল হাঁসগুলোর পা দিয়ে জলকে কেটে অগ্রসর হওয়ার শব্দ শুনে চকিতে ভয় পেয়ে তারা ডুবে গিয়ে গভীর জলের মাঝে লুকিয়ে যেত। মাছে হাঁসে এই লুকোচুরি সেখানে চলছে প্রত্যেক দিনই।

সেখানে সারাদিন ফোটা ফুলের পাশে ভ্রমরের গুঞ্জন, কুঞ্জে কুঞ্জে গোলাপের স্ফুট সৌন্দর্য্য দেখে মত্ত কোকিলের ঝঙ্কার এ আছেই। পোষা কোকিল, পাপিয়া রূপোর খাঁচায় সোণার দাঁড়ে বসে সোণার বাটীতে খাবার খেত, আর সময় অসময়ে কুহু কুহু পিউ পিয়া পিউ শব্দে বহুদূর প্রতিধ্বনিত করে তুলত। তাদের ডাকে বনের পাখী ছুটে আসত, অনস্নুভূত বারমেসে বসন্তের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে তারাও এদের সঙ্গে নিজেদের গলার মিষ্ট সুরটা মিশিয়ে ফেলত।

চারিদিকে ফুলের হাসি, পাখীর গান, ভ্রমরের ঝঙ্কার; এরই মাঝে একদিন শারদ প্রভাতে ঝরে পড়ে যাওয়া শিউলির পানে চেয়ে মেহেরুণ বীণার সুরে সুর মিলিয়ে গান গাচ্ছিল—

আজু সখি কাঁহা পিয়া
আবাহু ন আওয়ে।

ভারি সুন্দর প্রভাত সেটী। এই চিরবসন্তের মাঝেও শরৎ পূর্ণরূপে ফুটে উঠেছিল—শেফালির ফুটে ওঠা ও তার ঝরে পড়ার মধ্যে দিয়ে। আর তার চিহ্ন ছিল শুধু আকাশের গায়ে। নির্ম্মল নীল আকাশের কোলে এক এক খণ্ড সূর্য্যতেজে উদ্দীপ্ত সাদা মেঘ ক্রমশঃ চলতে চলতে কাছে এসে আবার চলে যাচ্ছিল। শারদলক্ষ্মী আজকের এই শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করছিলেন সারা ধরাটার গায়ে, তার একটু কণা ছিটকে এসে এই চিরবসন্তের লীলাকাননেও পড়েছিল।

প্রভাতের মৃদু বাতাসে দুলছিল তার কালো রেশমের মত চুলগুলো যা সামনে তার শুভ্র রক্তাভ কপালের 'পরে পড়েছিল। বেণীটা তার পেছনে তারে মতির গাঁথুনীতে জড়িত হয়ে পিঠের পরে লুটিয়ে পড়ছিল, যেন কৃষ্ণ সাপ একটা তার মুখখানা বেষ্টন করে সোহাগ করবার আশায় তাকে রেড়ে উঠছিল। কালো রঙের ওড়নাটীতে রূপোর মত

জরীর পাড় বোনা, সেটা ছিল তার বুক পিঠ খানিকটা ঢেকে, গোলাপী কাঁচুলীর সামান্ত একটু অংশ বুকের উপর সামান্তই জেগে ছিল। নবাব-জাদির উন্নত কণ্ঠে শুধু এক ছড়া বড় মতির মালা, বেশী ভার সে ফুলের চেয়ে কোমল দেহ বইতে পারবে না, তাই অতি সামান্তই অলঙ্কার।

বসন্তের রাণী সে, শারদ উষা আজ তারই সম্বর্দ্ধনার জন্তে দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে, সেও দু হাত বাড়িয়ে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে, তার মধুর স্পর্শ উষার মুখে মাখিয়ে দিয়েছে।

প্রভাত গগনে শুকতারা যখন উঠে সে সেই তখন হতে উঠে গাচ্ছে—

আজু সখি কাঁহা পিয়া
আবাহু ন আওয়ে।

কাঁহা পিয়া—কাঁহা পিয়া ? হৃদয় সেই অজানিতের উদ্দেশ্তে ঘুরে মরছিল কিন্তু কোথা সে? কতদিন যাচ্ছে, কত রাত যাচ্ছে, এই বারমেসে বসন্তের বুকে দিনরাতের তো সমান যাওয়া আসা আছে। কিন্তু সে অজানিত অতিথি তো কোনও দিন এলো না!

চাঁদ ওঠে, সমস্ত বাগান খানা তার শুভ্র আলোয় প্লাবিত হ'য়ে যায়, দীর্ঘিকার কালো বুকে বাতাসের দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে ছোট ছোট ঢেউ গুলো ওঠে, তার মাথায় চাঁদের আলো প'ড়ে জলে ঠিক গলানো রূপোর মতই, আত্মহারা পাপিয়া মালতী কুঞ্জের মধ্যে গা লুকিয়ে ডেকে ওঠে,—চোখ গেল, ওগো, আমার চোখ গেল।

মুক্ত বাতায়নের পাশে পালঙ্কে শুয়ে পড়ে থাকে মেহেরুণ, ঘরের দীপ্ত আলো নিভিয়ে দেয় সে, বাতায়ন পথ দিয়ে খোলা চাঁদের আলো ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে ঘরের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে, সে চেয়ে দেখে আলো আঁধারের খেলা, সাদায় কালোয় মেশামিশি, গভীর ঘনিষ্ঠতা, সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে, পাপিয়ার বুকফাটা চীৎকার শুনতে শুনতে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, কাকে ডেকে ডেকে তার অন্তরটা একেবারে শুকিয়ে ওঠে, বাঁদি তখনি গোলাপী সরবৎ এনে তার মুখের কাছে ধরে।

সার্থক হবে সেদিন যেদিন তার চির অপরিচিত কোনও অতিথি এসে তার এই চিরবসন্ত নিকেতনের দরজায় হাত পেতে দাঁড়াবে শুধু দুটি ভিক্ষে পাবার তরে। কিন্তু আসবে কি সে? সাত দেউড়ি পার হয়ে, হাজার প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে এই সোণার খাঁচায় আবদ্ধ বিহগীর কাছে সে আসবে কি?

নিদারুণ ব্যথায় মেহেরুণ বিছানায় লুটিয়ে পড়ত।

(২)

কিন্তু সত্যই সে একদিন এলো। জানিনে কেমন করে সাত দেউড়ি পেরিয়ে হাজার চোখে ধুলো দিয়ে সে এসে দাঁড়াল মেহেরুণের বিস্ময়ভরা দুটি চোখের সামনে।

আকাশ ভরা সেদিন মেঘের খেলা, বিদ্যুতের ঝিকিমিকি, ছুটোছুটি, তার আলোয় মেহেরুণের বাগানখানা ঝলসে উঠছিল।

নিস্পন্দ ভাবে কিশোরী শুধু চেয়ে রইল। সে শুধু চেয়েই থাকা তা ছাড়া আর কিছুই তার মধ্যে ছিল না। তার বাপ ছাড়া সে যে কারও অস্তিত্ব জানত না, সেই বাপেরই বা পরিচয় কতটুকু সে জানত? এই চিরবসন্তের নিকেতনে সে সম্রাজ্ঞী হয়ে ছিল, কিন্তু এখানে সবই নারী, বরের সঙ্গে তার চাক্ষুস দেখা হ'ত যখন সে প্রহরী ও সহচারিণী পারবৃতা হয়ে পিতৃভবনে পিতৃসন্দর্শনে যেত। তার প্রাসাদের পুরুষ প্রহরীর অস্তিত্বও সে সেই সময়টীতে জানতে পারত।

কিংখাপের মতি মুক্তা সোণা রূপা জড়িত তাঞ্জাম সে, নবাবজাদী পাছে দৃষ্টা হন, সতর্ক নারী প্রহরিণীরা তারও পরে আবরণ চাপাত। কিশোরীর হৃদয়টা সে আবরণ ছিঁড়ে ফেলে একবার প্রকাশ হতে চাইত, কিন্তু পারত না। তাকে এমনই আবরণের মধ্যে থাকতে হবে

বিধাতার এই নিয়ম যে, বিধাতার আইন রদ করবার ক্ষমতা কি তার?

সে এলো, তার সামনে হাত দুখানা পেতে সে দাঁড়াল, তার আরক্তিম অধরৌষ্ঠ দুটি ভেদ করে' শুধু একটী কথা প্রকাশ হল—"ভিক্ষা—"

ভিক্ষা? এ চায় ভিক্ষা? এই প্রকৃতির শ্রেষ্ট দান নয়—এর যে সবই আছে, তবু এ চায় ভিক্ষা? এর ভাণ্ডার যে পূর্ণ, তবু কি চায় এ?

ঘেমে উঠে মুখখানা লাল করে ফেলে কুমারী বললে "ভিক্ষা? তুমি কি চাও তরুণ, কি তোমার প্রার্থিত বস্তু এ জগতে আছে?"

তরুণ স্মিতমুখে বললে "আছে বই কি?"

"আছে?" সে ব্যগ্রভাবে তরুণের হাত দু'খানা ধরে ফেললে "কি নেবে তুমি?"

"আমি তোমার কাছে তোমায় চাইতে এসেছি নবাবজাদি।"

বিস্ময়ে মেহেরুণ স্তব্ধ হয়ে গেল, সে অবাক হয়ে এই তরুণের সুন্দর মুখখানার পানে চেয়ে রইল। শরৎ তপনের প্রথম স্নিগ্ধ আরক্তিম আলোর ছটা তার মুখখানার পরে পড়েছিল। সেই মুখখানার পানে চেয়ে চেয়ে কখন যে তার কণ্ঠ হতে একটী আর্ত্তনিনাদ ফুটে বেরিয়ে গেল, তা সে জানে না। পর মুহূর্ত্তে সম্যক জ্ঞান পেয়ে সে যখন তার মুদিত নেত্র উন্মিলন করল তখন সে তরুণ আর সেখানে নেই, কিন্তু সে যে এসেছিল তার পায়ের চিহ্ন এখনও কার্পেট মোড়া মেঝের পরে পড়ে আছে।

মেহেরুণ আর্ত্তভাবে সেই পায়ের চিহ্নের পরে লুটিয়ে পড়ল, সুন্দর গো, তুমি আজ প্রাতে এসেছিলে!—

আজ তার মনে হল সব ব্যর্থ হয়ে গেল। তার এই চির বসন্তের নিকেতনে যেন হঠাৎ শীতের আবির্ভাব হল, তার সাধের গোলাপ গাছে ফুল ফুটতে ফুটতে কবে যে একেবারেই ফুল ফোটা বন্ধ হয়ে গেল, কোকিল পাপিয়া কবে যে নীরব হয়ে গেল, তা সে জানতে পারলে না। তার বসন্তের নিকেতন হয়ে গেল শীতের কুয়াশায় অন্ধকার, সেখানে আর তেমন মিঠে রোদ পড়ে না, শীতের বাতাস হাড় কাঁপিয়ে হু হু করে বয়ে যেতে লাগল, তাতে না আছে স্নিগ্ধতা, না আছে প্রফুল্লতা।

নিরানন্দ চারিদিকে তার কঠোর হাত বুলিয়ে দিলে, অশান্তি আপনি এসে অধিষ্ঠান করলে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছরও কাটতে লাগল। চিরবসন্ত নিকেতনে আর ফুল ফুটল না, আর পাখী গাইল না আর সেখানে বীণার সুর ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে না, আর সেখানে গান কেউ গায় না। ঐন্দ্রজালিকের মোহময় যষ্টিস্পর্শে সব যেন রাতারাতি পাষাণে পরিণত হয়ে গেল।

(৩)

কে সে, কোথা হতে এলো, আবার কোথা চলে গেল, সে কি যাবার মুহূর্ত্তে এমন করে সত্যই সব পাথর করে দিয়ে গেল?

অকস্মাৎ একদিন নবাবজাদি অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠল। সে একদিন বিছানা হতে উঠে তার সেই খোলা বাতায়নে দাঁড়াল। কই—বাগানে সে ফুলের সৌন্দর্য্য কোথায় গেল? গাছগুলো সব মরার মত হয়ে গ্যাছে, তাদের মধ্যে যে চির সবুজ রঙ ছিল, তা এখন হলদে রঙে পরিণত হয়েছে!

ঝাউগাছগুলি যেন অসহ্য শোকে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে, বাতাস এসে আজও তেমনি তাদের গায়ে লাগ্‌ছে, কিন্তু তা লাগছে মাত্র, কারণ তরুর বুকে তাতে একটু পুলকের শিহরণ উঠতে পারছে না। তার বুকের যেখানে আনন্দের প্রস্রবণটী গোপনে রক্ষিত ছিল, সেখানকার প্রস্রবণ শুকিয়ে গেছে, আর তা বইবে না, আর তাকে দোদুল দোলায় দুলিয়ে দিয়েও যাবে না।

পোষা হরিণগুলো যেন কেমন হয়ে গ্যাছে। মানুষ দেখলে তারা হঠাৎ চমকে ওঠে, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাতে যায়, কিন্তু তাদের বেড়া ডিঙিয়ে

পালাবার তাদের ক্ষমতাও ছিল না, তাই তারা অমনি জীবনহীনের মত পড়েই থাকত। তাদের চাউনি গুলোও যেন কেমন ভয়চকিত হয়ে গ্যাছে, তারা আর কাউকেই যেন বিশ্বাস করতে চায় না।

ময়ূরগুলো নীল আকাশে মেঘের খেলা দেখে আর পেখম তুলে নেচে ওঠে না, ছুলে ছুলে সবুজ হাওয়ায় বেড়িয়ে বেড়ায় না। তাদের কেকাধ্বনিতে সারা বাগানটা আর ভরে ওঠেনা, সব নীরব, সব নিঝুম।

অবাক হয়ে মেহেরুণ ভাবতে লাগল এ হ'ল কি? নিমেষে সব পরিবর্ত্তন হল কি ক'রে?

কে সে এসেছিল, সে আসবে বলেই বুঝি এই পৃথিবীটা এমন মোহন সাজে সেজেছিল, এমন করে সবুজ পাতায় রঙিন ফুলে ভ'রে উঠেছিল! সে চ'লে গেল, যাবার সময় তার আসার সব চিহ্নটুকু মুছে নিয়ে গেল? নিমেষে সারা ধরা আঁধার হ'য়ে গেল, গান থেমে গেল, বীণা বাজতে বাজতে তার ছিঁড়ে গেল! জগৎটা চলেছিল একভাবে, হঠাৎ যেন তার গতি বদলে গেল।

না, আর সে অপরিচিতের কথা ভাবা হবে না। যাক্, সে গ্যাছে ভালই, সে কে এসেছিল সে কথা যেমন করে হোক ভুলে যেতেই হবে।

মেহেরুণ আবার তার বাগানের দিকে মন দিলে।

কিন্তু আর হয় না যে। ছিন্ন তার জোড়া দিয়ে বাজাতে গেলে সে তার আবার ছিঁড়ে যায়, সে সুর আর বীণায় বাজে না। বাগানে আবার সবুজ পাতা রঙিন ফুল ধরল, আবার ময়ূর পেখম তুলে নাচ্‌ল, আবার পাখী গাইল, আবার ফুলকে শুইয়ে দিয়ে, পাতা গুলোকে দোদুল দোলায় দুলিয়ে দিয়ে বসন্তের স্নিগ্ধ হাওয়া বয়ে গেল, কিন্তু প্রাণের মাঝে আর সে স্পন্দন সে জাগিয়ে তুলতে পার্‌লে না। প্রাণের ফুলের পাপড়িগুলি মুদেই রইল। বাতাসে সে ফুল ফুটে উঠতে পার্‌লে না।

নবাবজাদি হুকুম দিলে "আমি বাপের সঙ্গে দেখা করতে যাব।"

প্রাসাদে সাড়া প'ড়ে গেল "সাজ, সাজ!" প্রহরীরা, প্রহরিণীরা, বাঁদীরা, সহচরীরা সব প্রস্তুত হতে লাগ্‌ল। আজ নবাবজাদি যেন জেদ করেই বাপের দেওয়া মণি-মুক্তার গহনা সব পর্‌লে, তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পেশোয়াজ, ওড়না পর্‌লে।

পিতৃ সন্দর্শনে নবাবজাদি যাত্রা কর্‌লেন।

পথের ধারে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে লোক নবাবজাদির পিতৃ সন্দর্শনের যাত্রা অবাক হ'য়ে দেখ্‌ছে। প্রহরীরা মহাগর্ব্বে বন্দুক ঘাড়ে ক'রে চলেছে, তাদের তালে তালে পা ফেলার শব্দ কানে আস্‌ছে।

তাঞ্জামের মধ্যে বসে মেহেরুণ ধ্যানে নিমগ্না, যেন কোনও দেবীমূর্ত্তি।

তাঞ্জামের দরজায় হঠাৎ আঘাত লাগ্‌ল, বিরাট শোভাযাত্রা হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়াল, সব বিস্ময়ে, ভয়ে আড়ষ্ট!

ক্ষিপ্রহস্তে দরজা খুলে কে তার মুখখানা বাড়িয়ে দিয়ে আবেগ কম্পিত কণ্ঠে ডেকে উঠল "মেহেরুণ!"

সেই তরুণ, সেই সুন্দর মুখখানা! মেহেরুণ আড়ষ্ট হ'য়ে চেয়ে রইল। যুবক দুই হাতে তার সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কারে মণ্ডিত মুখখানা ধ'রে কাছে নিয়ে এল, মূর্চ্ছিত প্রায় কুমারীর কম্পিত অধরোষ্ঠের 'পরে তার প্রথম ও শেষ একটী চুম্বন রেখা অঙ্কিত ক'রে দিলে, মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সে তার অনুরাগ জানালে।

মূর্চ্ছিতা হয়ে নবাবজাদি ঢ'লে পড়ল। যখন সে চোখ মেল্‌ল—তরুণ তখন বন্দী।

* * * *

অপরাধীর বিচার শেষ - ফল প্রাণদণ্ড। সামান্য একটা লোক হয়ে সে নবাবজাদির মর্য্যাদা নাশ ক'রেছে, তাঞ্জামের দরজা, যা শুধু প্রহরিণীরাই স্পর্শ কর্‌তে পারে, সেই দরজা নিজের হাতে খুলে ফেলে মহামান্যা নবাবপুত্রীর অসামান্য রূপ দেখতে পেয়েছে।

উচ্চ প্রাসাদের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিল মেহেরুণ, চোখ্‌ দুটি তার জলে ভ'রে উঠেছে, তবু সে চোখ মুছ্‌তেও পার্‌ছিল না, চোখের পলকটাও ফেল্‌তে পার্‌ছিল না, পাছে সেই সময় টুকুর মধ্যে তার প্রিয়তমের শেষ নিঃশ্বাসটা ব'য়ে যায়।

বহুদূরে, বহু নীচে সে যুবক। সেও তৃপ্তির চোখে চেয়েছিল এই প্রাসাদের দিকে স্বর্ম্মা আঁকা পদ্মাক্ষির সন্ধানে।

ওই গেল—সব ফুরিয়ে গেল, অপরাধীর দেহ লুটিয়ে পড়্‌ল, তার সব শেষ হ'য়ে গেল!

দুই হাতে বুকখানা চেপে ধ'রে নবাবনন্দিনী সেখানে লুটিয়ে পড়্‌ল। তার সেই দুটি কাতর চোখের সামনে নেমে এল অমাবস্যা রজনীর মেঘাবৃত নিবিড় অন্ধকার, এ অন্ধকারের নিবিড়তা ভেদ ক'রে কখনও আর একটা ক্ষীণ দীপশিখাও তার সাম্‌নে জ্বলে ওঠে নি।

মাতৃ-মন্দির

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

(১)

জগতের মাঝে যত মন্দির আছে,
তুলনায় সব হার মানে এর কাছে,
শিশুর দেয়ালা, স্বপন মাখানো হাসি
অস্ফুট ফুলের পরিমল রাশি রাশি,
নিয়ত নিত্য আনন্দ করতালি,
কোমল মুখের কণক চাঁপার ডালি,
হাসি অশ্রুর রামধনুকের খেলা,
বিমল প্রভাতে কমলের হাই তোলা
বাল্য ভোগ আর প্রভাত আরতি লয়ে
আছে মন্দির বিশ্ব বিজয়ী হয়ে।

(২)

এই অলকায় চিরশিশু রয় রবি
শিশির মুকুরে হেরে আপনার ছবি,
কোকিল বালক বসি বসি গলা সাধে
হেথায় মিলন প্রথম চকোরে চাঁদে।
নবনীর দেশ, লাবণীতে আছে ভরি,
বিশীর্ণ লতা শোভে ফুল বুকে করি।
সাপিনী বাঘিনী থাকে না হেতায় ক্রূর,
মায়ের এ পীঠ মমতায় ভরপুর।
শিশু ভোলানাথ দিগম্বরের ভূমি
হেরি আনন্দে দিশেহারা হবে তুমি।

(৩)

হেথা ঝরে ক্ষীর শ্যামলীর বাঁট হতে,
পেতে রাখে আঁখি যশোদা কানন পথে;
প্রতাপ মাটীর শার্দ্দূল ধরে বাঁধে,
মামুদ খেলার পুতুল ভাঙ্গিয়া কাঁদে;
তৈমুর করে ঝুমঝুমি লয়ে খেলা,
কালিদাস হেরে আষাঢ়ে মেঘের মেলা।
হেথায় গোপাল ক্ষীর ননী লয়ে থাকে,
মথুরার কথা শুনায় না কেহ তাকে।
ভাবী জগতের সৃষ্টি চলেছে হেথা
বাঁধিয়াছে বাসা নন্দন নবীনতা।

স্ত্রীশিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বি-এল।

আমাদের দেশের প্রায় যাবতীয় সমাজ-সংস্কার স্ত্রীজাতি সংক্রান্ত। কৌলীন্য, বিধবা-বিবাহ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি সমস্তগুলিই স্ত্রীজাতিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের উন্নতির চেষ্টায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহার কারণ খুঁজিতে অধিক দূর যাইতে হয় না। সমাজ-শরীরের অৰ্দ্ধেক স্ত্রী ও অৰ্দ্ধেক পুরুষ। আমাদের শাস্ত্রে বলে স্ত্রী পুরুষের অৰ্দ্ধাঙ্গ এইজন্য স্ত্রীর অপর নাম অৰ্দ্ধাঙ্গিনী। সমাজের এই দুই বিভাগকে আমরা দেহের দক্ষিণ ও বাম অঙ্গ বলিতে পারি। বাম অঙ্গকে যদি দুৰ্ব্বল, বিকল, নিশ্চেষ্ট ও পঙ্গু করিয়া রাখা যায়, তবে দক্ষিণ অঙ্গের দ্বারা কোন কার্য্য সুন্দররূপে সাধিত হইতে পারে না। আমাদের সমাজের স্ত্রী ও পুরুষের অবস্থা যদি তুলনা করি, তাহা হইলে কি তাহা এইরূপই বিকলাঙ্গ বলিয়া মনে হয় না? আমাদের সমাজে নারীর অবস্থা যে কত হীন ও অধঃপতিত তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এজন্য প্রকৃত দায়ী কে, সে বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে। আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা হয়ত ইহার জন্য কতকটা দায়ী, কিন্তু তাহা সত্বেও কবির সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

> "ওরে দুরাচার, হিন্দু কুলাঙ্গার!
> এই কি তোদের দয়া সদাচার?
> হয়ে আর্য্যবংশ জগতের সার
> রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে!"

হিন্দুসমাজে স্ত্রীজাতির অবস্থা চিরকাল বোধ হয় এরূপ অধঃপতিত ছিল না। বেদ, স্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, সেই সময়ে স্ত্রীজাতির সামাজিক অবস্থা অনেক উন্নত ছিল। পণ্ডিতেরা বলেন, "বৈদিক যুগে স্ত্রীগণ পতির সহিত যজ্ঞ করিতেছেন এবং বনিতাগণ যজ্ঞে নিযুক্ত আছেন, এইরূপ বহু উক্তি বহু মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনাকালে বহু নারী আজীবন অবিবাহিতা থাকিতেন। ঋগ্বেদে নিম্নলিখিত নারী-ঋষিগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—জ্যোৎস্না, সূর্য্যা, লোপমুদ্রা, বিশ্ববারা, আপালা, ইন্দ্রাণী বা শচী, এবং সর্পরাজ্ঞী প্রভৃতি। ইহারা সকলেই ঋক্ বা মন্ত্র রচনা করিয়া ঋষিপদবাচ্য হইয়াছিলেন। বিশ্ববারা যে কেবল মন্ত্র রচনা করিয়াই জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু অগ্নির স্তব উচ্চারণ করিয়া ঋত্বিকেরও কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। বিশ্ববারা নারী, অথচ তিনি হোতা, তিনি উদ্গাতা, তিনি অধ্বর্য্য, এবং তিনি স্বয়ংই তাঁহারা কৃত যজ্ঞের ব্রহ্মা। পাঠক এস্থলে স্পষ্ট দেখিতেছেন, বৈদিক যজ্ঞাদি কার্য্যের সমস্ত অধিকার নারীতে বর্ত্তমান।"—(শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস)

বৈদিক যুগের পরও আমরা নারীর উন্নত অবস্থা সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাইয়া থাকি। মনু প্রভৃতি সংহিতাকারেরা যদিও নানাভাবে নারীর অধিকার খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তথাপি মনুই বলিয়া গিয়াছেন,—"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" অর্থাৎ যেখানে, যে গৃহে নারী পূজিতা হন সেখানে, সে গৃহে দেবতা প্রীতি লাভ করেন। মহাভারতে আছে,—

> "অৰ্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য, ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
> ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং ভবিষ্যতঃ॥"

অর্থাৎ ভার্য্যা পতির অৰ্দ্ধাঙ্গ, শ্রেষ্ঠ বন্ধু, ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের মূল, সংসার-সাগর পার হইবার অর্থাৎ মোক্ষলাভেরও মূল।

বস্তুতঃ, প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে নারীর অবস্থা

যে বর্ত্তমানের অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল, নারীর স্বাধীনতা যে অনেক ব্যাপক ছিল, শাস্ত্রাদি গ্রন্থে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালের তুলনায় বর্ত্তমানে নারীর অবস্থা যে কত শোচনীয়, তাহা বোধহয় কাহাকেও চোখে আঙুল দিয়া দেখান আবশ্যক করে না। পুরুষকে শিক্ষা, স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়া যেরূপ সমাজের কর্ত্তব্য পালনের উপযোগী করা হয়, স্ত্রীজাতিকে কি সেই পরিমাণেই সকল বিষয়ে হীন ও কর্ত্তব্য-পালনের অনুপযোগী করিয়া রাখা হয় না? ফলে সমাজের যে অধঃপতন হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? পরন্তু সমাজের অধিকাংশ সমস্যাই যে স্ত্রীজাতিকে কেন্দ্র করিয়া উদ্ভূত হইবে, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি?

আমাদের মনে হয়, আমাদের দেশের নারীর অবস্থা যতই উন্নত হইবে, আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান ততই সহজ ও সরল হইয়া আসিবে। স্ত্রীজাতির অবস্থার উন্নতির প্রধান ও একমাত্র উপায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার। সুতরাং স্ত্রী শিক্ষাই আমাদের সমাজ সংস্কারের প্রধান উপায়, ইহাই আমাদের ধারণা। আমরা সমাজ-সংস্কারের জন্য যত চেষ্টাই করি না কেন, কিছুতেই সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হইতে পারে না, যতক্ষণ না আমাদের স্ত্রীজাতির অবস্থা উন্নীত হয়, যতক্ষণ না আমরা স্ত্রীজাতিকে শিক্ষায় দীক্ষায়, ধর্ম্মে কর্ম্মে, সমাজের কর্ত্তব্য-পালনের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারি।

আমরা সমাজের দুই একটি সমস্যা লইয়া আমাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ পণপ্রথার কথাই ধরা যাউক। পণপ্রথা আমাদের সমাজের যে কিরূপ সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আমাদের সমাজে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সকলেই কন্যাসন্তান হইলে দুর্ভাগ্য মনে করেন। কন্যা হইলেই আমাদের প্রথম ও একমাত্র ভাবনা হয়, কি করিয়া উহার বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিব। বরের পণ দিতে কন্যার পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন, ইহা আমাদের সমাজে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। পণপ্রথা অত্যন্ত কুপ্রথা ও জঘন্য প্রথা, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু যে ভাব হইতে ইহার প্রথম উৎপত্তি, তাহা কিন্তু তত দোষের ছিল না। আমাদের দেশে পুত্রের ন্যায় কন্যার পিতৃধনে অধিকার নাই, সুতরাং বিবাহের সময় পিতা কন্যাকে স্বেচ্ছায় নিজের ধনের কিয়দংশ যৌতুক-স্বরূপ দান করিবেন, ইহাই ছিল শাস্ত্রের বিধান। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্ন সমন্বিতা॥"

অর্থাৎ—কন্যাকেও অতি যত্নের সহিত (পুত্রের ন্যায়) লালন-পালন করিবে ও সুশিক্ষাদান করিবে এবং সেই সুশিক্ষিতা কন্যাকে ধনরত্ন যৌতুক দিয়া বিদ্বান বরে অর্পণ করিবে।

সুতরাং আমাদের শাস্ত্রের বিধান যে দোষের ছিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমানে যেভাবে পণপ্রথা প্রচলিত, তাহা বাস্তবিকই দোষণীয় ও গর্হিত। বরের পিতার অর্থগৃধ্নুতাই বর্ত্তমান পণ-প্রথার প্রধান কারণ।

পণপ্রথা নিবারণের জন্য কত সভা-সমিতি কত বক্তৃতা ও আলোচনা, কত আন্দোলন চলিতেছে, কিন্তু ইহার গতিবেগ একটুও হ্রাস হইতেছে কি? যতদিন আমাদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন না হয়, যতদিন ধর্ম্ম ও নীতি স্বার্থপরতা ও অর্থ-গৃধ্নুতার স্থান অধিকার না করে, ততদিন এ কুপ্রথা দূর হইবে না। আমার মনে হয়, আমরা যদি কন্যাকে সুশিক্ষাদান করি, যদি তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারি, তবে পণপ্রথার কঠোরতার অনেকটা উপশম হয়। পাড়াগাঁয়ে চাষাদের ঘরে মেয়ে পড়িতে পায় না, পাত্র আসিয়া পণ দিয়া মেয়েকে বিবাহ করে। ইহার কারণ বুঝিতে বোধ হয় কষ্ট হয় না, ইহার কারণ এই, চাষাদের মেয়েরা তথাকথিত ভদ্রঘরের মেয়ে-

দের ন্যায় শুধু গৃহের শোভা বৃদ্ধির উপকরণ নহে, তাহারা স্বামীর ঘরের, বাহিরের সকল কার্য্যের সহায়, পল্লীজীবনের অভাব মোচনের জন্য যে কার্য্য-পটুতা ও শ্রমশীলতা আবশ্যক, তাহা তাহারা বাল্যকালে পিতৃগৃহে শিক্ষা করিয়া থাকে। স্বামীর গৃহে আসিয়া তাহারা শুধু গৃহের বিলাস-সামগ্রী হইয়া থাকে না, কেবলমাত্র রন্ধন ও সন্তানপালনেই তাহাদের সমগ্র শক্তি ব্যয়িত হয় না, পরন্তু এ সমস্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াও তাহারা পরিবারের সুখ ও স্বচ্ছলতাবৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। ভদ্রঘরের কন্যাদিগকেও সেইরূপ উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা পারিবারিক ও সামাজিক সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যপালনের উপযোগী করিতে পারিলে, তাহাদের বিবাহ সমস্যা অনেকটা সহজ ও সুগম হইয়া আসে, পণপ্রথার কঠোরতাও অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কন্যা যদি সুশিক্ষিতা হয়, সে যদি স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনক্ষম হয়, তবে তাহার বিবাহ ব্যাপারটা তত জটিল হয় না, যত হয় অশিক্ষিতা ও অক্ষম কন্যার পক্ষে। কন্যা সুশিক্ষিতা হইলে, তাহার বিবাহ না হইলেও তাহাকে পরের গলগ্রহ হইতে হইবে না, এ বিশ্বাস ও ভরসা তাঁহার অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনগণের মনে থাকে। কিন্তু অশিক্ষিতা ও অক্ষম কন্যার পক্ষে এ ভরসা কোথায়? সুতরাং যে ভাবেই হউক, তাহাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়; এক্ষণে পাত্র মূর্খই হউক, আর অক্ষমই হউক, সেদিকে তখন তত দৃষ্টি থাকে না, ফলে বাল্যবৈধব্য প্রভৃতি আরও নানারূপ সমস্যা আসিয়া দেখা দেয়।

অবশ্য, কন্যা সুশিক্ষিতা হইলেই যে পণপ্রথা সমাজ হইতে একেবারে উঠিয়া যাইবে, সে ধারণা আমাদের নাই। পণপ্রথা উঠাইতে হইলে আমাদের শিক্ষার আমূল সংস্কার করিতে হইবে, জাতীয় জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্যের উন্নতি-সাধন করিতে হইবে। যুবকদের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহাদিগকে অর্থকরী শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আর আমাদের কন্যাগণকেও সর্ব্ববিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষাদান করিতে হইবে। তবেই আমাদের সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষা ও অবস্থার মধ্যে প্রকৃত সামঞ্জস্য বিধান হইবে, তবেই সমাজে অর্থ গৃধ্নুতা চলিয়া গিয়া যথার্থ গুণের আদর হইবে এবং পণের পরিবর্ত্তে প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী লাভই বিবাহের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য হইবে।

অস্পৃশ্যতা আমাদের সমাজের আর একটি প্রধান সমস্যা। অস্পৃশ্যতা হিন্দু-সমাজের কলঙ্ক, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অস্পৃশ্যতা-দোষ দূর করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, পণ্ডিত মালব্য প্রভৃতি দেশের মহারথীগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই দোষ নিরাকরণের নিমিত্ত দেশের নানাস্থানে সভা-সমিতি ও নানারূপ আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি বা পারিব, তাহা ভাবিবার বিষয়। আমার মনে হয়, স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে এই আন্দোলনের নিগূঢ় সংযোগ রহিয়াছে। অস্পৃশ্যতা-দোষ দূর করিতে হইলে শুধু পুরুষদের এ বিষয়ে বুঝাইলে চলিবে না, মেয়েদিগকেও বুঝান একান্ত দরকার। অস্পৃশ্যতার অপকারিতা ও কুফল সম্বন্ধে পুরুষ বাহিরে যত বক্তৃতা ও যত আস্ফালনই করুক না কেন, ইহা কিছুতেই পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারিবে না, যতদিন না এ বিষয় মেয়েদের হৃদয়ঙ্গম করান হয়। পুরুষ বাহিরের কর্ত্তা হইতে পারেন, কিন্তু গৃহের অন্তঃপুরের কর্ত্তা পুরুষ নয়, কর্ত্তা—মাতা, পত্নী, ভগ্নী, কন্যা প্রভৃতি। গৃহে কোন অস্পৃশ্য জাতির ছোঁয়া জল আচরণীয় করিয়া লওয়া পুরুষের ইচ্ছার উপর তত নির্ভর করে না, যত করে মেয়েদের উপর। বাহিরে পুরুষ কত অভক্ষ্য ভক্ষণ করে, নানাজাতির সহিত মিলিত হইয়া আহার বিহার করে, কিন্তু শত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী হইলেও কয়জন পুরুষ নিজের গৃহে তাহা করিতে সাহস রাখে? মা বোনকে যদি

অস্পৃশ্যতার অপকারিতার কথা বুঝান যায়, তবে মা বোনের সাহায্যে বাড়ীর ছেলে পিলে এমন কি বাড়ীর কর্ত্তাদিগকে বুঝান বিশেষ কঠিন কাজ হয় না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমরা সমাজ-সংস্কারের যে কোন বিভাগেই হাত দেই না কেন, স্ত্রী জাতিকে বাদ দিয়া কাজ করিলে কিছুতেই সফলতা লাভের সম্ভাবনা নাই। কোন বিভাগেই যে আমরা এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ ফল পাইতেছি না, তাহার একমাত্র কারণও ইহাই। সমাজের সহিত স্ত্রীজাতির যে কোন সম্পর্ক আছে, স্ত্রীজাতি যে সমাজ-শরীরের প্রধান অঙ্গ, আমাদের কার্য্যের দ্বারা তাহা অনেক সময় স্বীকার করিতে চাহি না। সুতরাং প্রতি কাজেই যে আমাদের অসাফল্যকে বরণ করিয়া লইতে হয়, তাহাতে আর বিচিত্র কি? শরীরের একার্দ্ধকে বিকল রাখিয়া কেহ কি গোটা শরীরের পূর্ণ পরিপুষ্টি আশা করিতে পারে, না করিলেই পারা যায়?

সুতরাং যদি আমরা প্রকৃতভাবে সমাজ-সংস্কার করিতে চাই, তবে আমাদের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার। পণপ্রথা, কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবা-বিবাহ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সমাজের যে কোন কুসংস্কার আমরা দূর করিতে চাই না কেন, স্ত্রীলোকের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার না করিতে পারিলে কোনটাতেই আমরা সফলতা লাভ করিতে পারিব না। স্ত্রীলোকদিগকে অজ্ঞ রাখিয়া তাঁহাদের ইচ্ছা ও ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কেহই এ সকল সংস্কার সমাজে প্রবর্ত্তন করিতে পারিবেন না, বলপূর্ব্বক করিতে গেলেও ফল হইবে গৃহ-বিদ্রোহ ও অশান্তি। সুতরাং প্রত্যেক সমাজ-সংস্কারককেই সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করা দরকার, কেননা, আমাদের দেশের প্রায় সমস্ত সমাজ-সংস্কারই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উপর নির্ভর করিতেছে। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।

স্বপ্নরাণী

অধ্যাপক শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

তখনো রজনী ছিল, জাগেনিক' পিকরাণী
তখনো খোলেনি ধরা শ্যামল অঞ্চল খানি।
তখনো স্তব্ধ, শান্ত প্রকৃতির চারু দেহ,
তখনো সুষুপ্তি ঘোরে মেলে নাই আঁখি কেহ।
তখনো আকাশে চাঁদ বঙ্কিম রঙ্গিল বেশে;
তখনো উজ্জ্বল তারা চাহিতেছিল গো হেসে।

কুসুম কানন হ'তে গোপনে করিয়া চুরি
সমীর আনিয়াছিল গন্ধটুকু অঙ্গে পুরি'।
নিশ্বাসে সে বাস মিশি' পশিল মরমে গিয়ে,
আবেশে অবশ প্রাণ আকুলতাটুকু নিয়ে
স্তিমিত নয়ন দুটি নিমীলিয়া আধ আধ,
স্তব্ধ বদনখানি - যেন কিসে বাধ বাধ।

সুষমার রাণী সে যে —অমরা প্রদেশে বাস,
ধরায় উদয় কেন— জানিনাক' অভিলাষ।
অজানা প্রদেশ হ'তে অজ্ঞাত হিয়াটি নিয়ে
অপরিচিতের প্রতি কেন শুভদৃষ্টি দিয়ে
যা' ছিল লইল সব মরম মাঝারে আসি,
যেন আর কিছু নাই—শুধু সেই রূপরাশি!

কারমাটারে কয়দিন

শ্রীমতী তমাললতা বসু।

গতবার পূজার ছুটিতে কোথায় বেড়াইতে যাওয়া হইবে, তাহা ১৩ই অক্টোবর শনিবারের আগের দিন অবধি স্থির ছিলনা। শনিবার দিন বিকালে স্থির হইয়া গেলে রাত্রেই ঝাঝা স্পেশালে যাত্রা হইল কারমাটারে. জেলা সাঁওতাল পরগণা, ই, আই, রেলের মেন লাইন ধরিয়া গেলে মধুপুরের আগের ষ্টেশন।

কারমাটার ষ্টেশনে গাড়ী যখন দাঁড়াইল তখন সবে তরুণ রবির কিরণে পূর্ব্বাকাশ সোনালী আভা ধারণ করিয়াছে, শরৎ প্রভাতে মুক্ত আকাশতলে দাঁড়াইয়া এ অপূর্ব্ব শোভা দেখিবার ও উপভোগ করিবার জিনিষ। মধুর স্নিগ্ধ পশ্চিম সমীরণে সারারাত্রির অনিদ্রা জনিত সকল কষ্ট এক নিমিষে জুড়াইয়া গেল। আমাদের আগে যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহারা হাসিমুখে আসিয়া আমাদের আগাইয়া লইলেন, বালকবালিকারা কলকণ্ঠে সম্বর্দ্ধনা করিয়া জড়াইয়া ধরিল।

প্রতিবারই প্রায় ঐখানেই যাই কারণ ওখানে আমাদের বাঁধা আস্তানা আছে, আসবাবপত্র, বাসন-কোসন সবই সেখানে মজুত, সুতরাং কোনরকমে নিজেরা গিয়া পৌছাইতে পারিলেই হয়। তা ছাড়া কারমাটারে যাওয়ার আরও একটা সুবিধা এই যে ওখান থেকে মিহিজাম, জামতাড়া, মধুপুর বৈদ্যনাথধাম, সিমুলতলা, ঝাঝা প্রভৃতি সন্ধ্যায় ঘুরিয়া আসিয়া, রাত্রিকালে নিজেদের ডেরায় ফিরিয়া সুখে বিশ্রাম ও নিদ্রা উপভোগ করা যায়।

স্থানটি স্বাস্থ্যকর, ক্ষুধাকর ও কাঁকর এই তিন কারণে খ্যাত। জল এখানে অতি সুস্বাদু ও মিষ্ট, গ্রীষ্মকালে সদ্য তোলা জল এত ঠাণ্ডা যে বরফের কোনই দরকার করেনা। শীতের দিনে সদ্য তোলা জল গরম থাকে। দূরে দূরে চারিদিকে পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়, মউলগাছ ও শালগাছ এখানে বেশী। সবশুদ্ধ ২৫।৩০ টি কোঠাবাড়ী, পূজার সময় সবগুলি লোকে ভরিয়া যায়, তিল ধারণের স্থান থাকেনা। এখানে মেয়েদের প্রধান কার্য্য সকালে বিকালে মুক্ত বাতাসে বেড়াইতে যাওয়া। কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়া তাঁহারা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গম যেমন ছাড়া পাইলে মনের সুখে উড়িয়া বেড়ায়, তেমনি গৃহরূপ পিঞ্জরাবদ্ধা রমণীরাও এখানে আসিয়া খোলা পাইয়া বেড়াইয়া হাওয়া খাইয়া বাঁচেন। তাঁহাদের বেড়াইতে যাইবার উৎসাহ ও আনন্দ দেখিলে, সত্যই প্রাণে বড় আনন্দ হয়।

আগে আগে এখানে কিছুই পাওয়া যাইত না, আজকাল মাছ, মাংস, ঘি, দুধ, চাল, ডাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তরিতরকারী, শাকসবজী সব সময়ে বড় পাওয়া যায় না। যাঁহারা নিজের নিজের জমীতে ও সকলের চাষ করেন, তাঁহাদের প্রচুর ফসল হয়।

মিশনারীদের দল এখানে বালকবালিকা বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। উঁহাদের চেষ্টার মূলে স্বার্থ থাকিলেও, উৎসাহ ও সহৃদয়তা শিখিবার জিনিষ। সুদূর আমেরিকা, ইংলণ্ড হইতে আসিয়া আর্ত্তের সেবা, অশিক্ষিতের শিক্ষা, আশ্রয়হীনের আশ্রয় স্থাপনা এইসব ব্রত হইল উঁহাদের। গ্রাম্য বালক বালিকারা কি ছিল আর উঁহাদের যত্নে কি হইয়াছে দেখিলে সত্যই আনন্দ হয়।

নিজ কারমাটারে দেখিবার জিনিষ কিছুই নাই। দেড় ক্রোশ দূরে আছেন ক্ষীণ সলিলা নদী মহাজোড় এবং তাহারি পথে আছেন মাঠের মাঝখানে পাথরের চাঁইয়ের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়া নদীর জলধারা, লোকে তাহারই নাম দিয়াছে ঝরণা।

আরও ৪ ৫ মাইল দূরে আছে ছোট ছোট পাথরের ঢিবি, সে-ই ওখানের পাহাড়। বড় পাহাড় নিকটে নাই। মহাজোড়ের ওপারে বাঁরো গ্রাম। গ্রামটি বেশ, অনেক ভদ্র ভদ্র ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস আছে; অনেক কোঠাবাড়ী, লক্ষী নারায়ণ প্রভৃতি দেবতার মন্দির আছে; পূজার সময় ৫।৬ খানি প্রতিমা হয়। এখানে ৺সখারাম গণেশ দেউস্করের বাসস্থান। কারমাটারে আর আছে রেলের ষ্টেশন, যেখানে বাবুদের কাজ তিন বেলা গিয়া গাড়ীতে চেনা লোক খোঁজা।

মোটের উপর কারমাটার দেশটি মন্দ নহে। জল হাওয়া খুবই ভাল। চারিদিক খোলা, ধূ ধূ করিতেছে মাঠ, দূরে দূরে মেঘের মত ধোঁয়া ধোঁয়া পাহাড়, গাছপালা, জ্যোৎস্নালোকে এসব যেন হাঁসিতে থাকে—সে এক অপরূপ দৃশ্য; মহুয়াফুলের গন্ধে ভরা পশ্চিমের মধুর স্নিগ্ধ বাতাসে চারিদিক আমোদিত থাকে। এক একদিন জ্যোৎস্নায় আমরা দলবদ্ধ হইয়া বেড়াইতে যাইতাম। ঘরে থাকিতে মন সরিত না। খোলা জায়গায় চাঁদের আলোয় যেমন শোভা হয় এমন শোভা সহরের আলো ধোঁয়ার ভেতর হয় না।

চাঁদের আলোয় বসিয়া বালকবালিকারা যখন সুধামাখা কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান গাহিত, তখন ক্ষণেকের তরে শোক দুঃখ তাপ অনেক দূরে সরিয়া দাঁড়াইত। আমরা মুগ্ধ হইয়া সে সঙ্গীত-সুধাধারা পান করিতাম।

গতবারের আগের ছুটিতে আমাদের এখানের বাড়ীতে সাহিত্যিকের মেলা বসিয়া গিয়াছিল। আমাদের সাদর নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন—শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার। আর সঙ্গিনী ছিলেন কমলবাসিনী ও সুবর্ণ দেবী প্রভৃতি। সম্পাদক, কবি, ঔপন্যাসিক, চিত্রকর, গায়ক কাহারই অভাব ছিলনা, প্রাচুর্য্যই ছিল; দিবারাত্র আমাদের গৃহ সাহিত্য-উৎসবে মধুময় ও মুখর ছিল।

সাহিত্যিক দেবরগুলির ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসায় মনের সুখেই ছিলাম। সকালবেলা আনাজ কুটিতে বসিলে, দেবরগুলি বেড়াইয়া ফিরিতেন, এবং গ্রাম হইতে আনাজপাতি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিতেন।

গতবারে গিয়া অবধি সর্ব্বদাই তাঁহাদের কথা মনে পড়িত। বেশ আনন্দেই দিনগুলি কাটিয়াছিল সেবার।

জামতাড়া মহকুমার কর্ত্তা শ্রীযুত মন্মথনাথ সেন মহাশয় সপরিবারে আসিয়া কারমাটারে ডাক বাঙলার সম্মুখে তাঁবু ফেলিলে স্থানটি বেশ একটু জমিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার পুত্রবধূ অরুণা (৺শ্রীশ মজুমদারের দৌহিত্রী) ও তাঁহার কন্যা কুমারী স্নেহরাণী রবীন্দ্রনাথের গানের ধারায় আমাদের সরস করিয়া রাখিত।

কারমাটারে এস, পি, কুণ্ডু ও সহায়রাম কুণ্ডু মহাশয়দের ফুলের নার্শারী আছে, খুব বড় বড় চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ প্রভৃতি ফুল সেখানে হয়। সেখান হইতে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল মার্কেট ও অন্যান্য স্থানে ফুল চালান আসে।

কারমাটার সাঁওতালদের দেশ। সবল, সুস্থ, কার্য্যক্ষম সাঁওতাল. পুরুষ ও রমণীদের দেখিলে আনন্দ হয়। যেন কালো পাথরের খোদাই করা মূর্ত্তি। ইহারা স্ত্রীপুরুষেই খাটিয়া খায়। কেহ কারো মুখাপেক্ষী নহে। এদেশের কোন আনন্দ উৎসবে পূজাপার্ব্বণে সর্ব্বাগ্রে সাঁওতাল-নাচ হইয়া থাকে, পুরুষরা মাদল প্রভৃতি বাদ্য বাজায়, মেয়েরা সার গাঁথিয়া হাত ধরাধরি করিয়া কুড়ি ত্রিশজন একসঙ্গে নাচে। মেয়েরা ফুল বড় ভালবাসে, ফুল পাইলেই মাথায় বা কাণে গুঁজিয়া রাখে। সাঁওতাল রমণীরা বড় সরল, বয়স্থা মেয়েরাও বালিকার মত এমন ভাবে রাস্তার মাঝে ছুটাছুটি করিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায় দেখিলে আনন্দ হয়।

সাঁওতাল পল্লীতে বেড়াইতে গেলে দেখিতাম,

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তকৃতকে ঝক্‌ঝকে কুটিরগুলি, সিঁদুর পড়িলে তুলিয়া লওয়া যায়।

একদিন সকালে—সেদিন পূজার অষ্টমী, বেড়াইয়া ঠাকুর দেখিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম, পথে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম, চোখের জল রাখিতে পারিলাম না। ওখানের কোনও ভদ্রলোকের স্ত্রী পীড়িত অবস্থায় মেডিকেল কলেজে গিয়াছিলেন, জীবনের আশা ছিল না; তিনি সুস্থ হইয়া সেদিন পাল্‌কীতে করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, ৯টার ট্রেণ হইতে। সঙ্গে মাতা ও স্বামী পদব্রজে আসিতেছিলেন। বাড়ীর নিকটে পাল্কী আসিতেই ছোট ছোট বালক-বালিকা গুলি সমস্বরে "ওরে আমার মা এসেছে রে" বলিতে বলিতে পাল্কীর কাছে ছুটিয়া আসিল, শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে "এসো মা আমার গৃহলক্ষ্মী ঘরে এসো" বলিতে বলিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া চিবুক ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন। মা আসার যে কি আনন্দ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। আজ বালকবালিকাগুলির মা আসা সার্থক হইল। তাহারা শুনিতেছে মা আসিয়াছেন, চারিদিকে উৎসব হইতেছে, ও সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারিতেছিল না, মা কই আসিয়াছেন। সেদিন তাদের যথার্থই মা আসিয়াছিলেন। হৃদয় ভরিয়া উঠিল, সেদিন দিন সার্থক হইয়া গেল।

কারমাটার হইতে কলিকাতার দিকে আসিতে তিনটা ষ্টেশন আগে সালনপুর। ঐখানে নামিয়া কল্যাণেশ্বরী দেবীর মন্দিরে যাওয়া যায়। উহা ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে। স্থানটি বড়ই মনোরম। দুইটি পাহাড়ের নীচে দিয়া বহিয়া গেছে বরাকর নদী —তারই কিনারায় ঐ মন্দির। ঐ মন্দিরের নাম-ডাক খুব, ভক্তের সমাগমও সেখানে বেশ হয়। আর একটি দেবালয় আছে মধুপুর থেকে দুই ক্রোশ দূরে পাথ্‌রোলে। মূর্ত্তিটি কালীমূর্ত্তি। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যও চমৎকার, এখানেও লোক সমাগম হয় যথেষ্ট। নিজ মধুপুরে আজকাল অন্নপূর্ণাদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্রীযুক্ত মতিলাল মিত্র ও দেওয়ান বাহাদুর উপেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের যত্নে সেখানে ঐ সময় পাঠ, ব্যাখ্যা, কীর্ত্তনাদি ও অন্নকূট উৎসব হইয়াছিল। আমরা নিজেরা উপস্থিত থাকিয়া তাহাতে যোগদান করিয়াছিলাম।

কারমাটারের স্থানীয় লোকে যে ভাষায় কথা কহে তাকে বলে 'চিকাচিকি' ভাষা। বাজারে দোকান পাট সবই প্রায় মাড়োয়ারীদের, বাঙ্গালীর চিহ্ন সেখানে নাই।

বাঙ্গালী সর্ব্বত্রই বঞ্চিত, কুণ্ঠিত হইতেছে। জাতির প্রাণ এমন করিয়া আর কতদিন টিকিবে?

সুধা ও ক্ষুধা

শ্রীকালিদাস রায়।

সুধা আর ক্ষুধা একই জনে কভু দাওনাক ভগবান,
যারে দাও সুধা, ক্ষুধার অভাবে করেনা সে তাহা পান;
একটি মুষ্টি তণ্ডুলো যার দুর্ল্লভ,—সুধা ঢালা,
তারে দেছ প্রভু শুধু প্রচণ্ড ক্ষুধার অনল জ্বালা;
মরুতে-মেরুতে, সাগর-ভূধরে, গড়েছ বিশ্বভূমি,
একই বিধান জীবলোকে আর ভূলোকে রেখেছ তুমি।

সুখের স্মৃতি

[গল্প]

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

পিতা 'এম-এ, বি-এল,' দেখিয়াই জামাই করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও উকিল। তবে বিয়ের সময় একখানি গহনার জন্য সামান্য একটু গোল হইয়াছিল। যখন পূজার সময় বেহানের নিকট হইতে তত্ত্ব আসিল, তখন হেমলতার শাশুড়ি সেগুলি একবার দেখিয়া সমস্ত ফেরৎ দিলেন।

* * * * *

হেমলতার স্বামীর বংশে বেশী কেহ ছিল না। তাহার শ্বশুরেরা তিন ভাই। বড় নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়াছেন, ছোট ভাই সংসার-ত্যাগী বৈরাগী। হেমলতার স্বামী অম্বুজকুমারই পিতার একমাত্র সন্তান। শাশুড়িই কর্ত্রী; এই ক্ষুদ্র সংসারের অন্তর্গত আর কেহ ছিল না। ছোট গৃহস্থ দেখিয়া হেমলতা ভাবিয়াছিল শান্তি-সুখেই তাহার দিনগুলি কাটিয়া যাইবে।

কিন্তু ভাগ্যবিধাতা লিখিয়াছিলেন অন্যরূপ। 'বিয়ের কনে' হেমলতা প্রথম হইতেই টের পাইল, শাশুড়ি মোটেই সুবিধার লোক ন'ন। কোনো একটু ত্রুটি একবার পাইলে হয়, আর রক্ষা নাই— হেমলতার মাতাপিতার নিন্দায় আরম্ভ হইয়া শেষে তাহা ক্রন্দনেই পর্য্যবসিত হইত। মাতৃভক্ত পুত্র অমনি ক্রন্দন শুনিয়া বধূর উপর হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া উঠিতেন। প্রথম দিনকতক একরকম কাটিল। কিন্তু দ্বিরাগমনের পরের মাস হইতেই হেমলতার উপর রীতিমত অত্যাচার আরম্ভ হইল। যেখানে কোনোই কারণ নাই সেরূপ স্থলেও শাশুড়ি-ঠাকুরাণী তাহার দোষ দেখিতেন ও গালাগালি দিয়া শ্রান্ত হইলে কাঁদিতে বসিতেন। পুত্র প্রথম প্রথম বধূর উপর অসন্তুষ্ট হইতেন। পরে তাহাকে ভৎর্সনা আরম্ভ করিলেন। শেষে মায়ের কথায় তাহাকে রীতিমত নির্য্যাতন পর্য্যন্ত করিতে লাগিলেন। মা যে প্রকার শাস্তি বধূকে দিতে বলেন তিনিও নির্ব্বিকার-চিত্তে তাহাই দিতেন, একবার ভাবিতেন না স্ত্রীর দোষ আছে কিনা অনুসন্ধান করা উচিত।

হেমলতা বিবাহের প্রথম কয়দিনের স্মৃতিগুলি মনে আনিয়া বর্ত্তমান দুঃখ অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিত। যতদূর সাধ্য মন যোগাইয়া চলিত। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার ছিল না। কোন কুলগ্নেই না তাহার বিবাহের সুলগ্ন স্থিত হইয়াছিল! বৈবাহিক যে নির্দ্দিষ্ট গহনার একটি দেন নাই ইহাতেই শ্বশুরমহাশয় পুত্রবধূর উপর তত প্রসন্ন হইতে পারেন নাই। আর তিনি নিতান্ত শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। বাড়ীর একটি প্রাণীর উপর যে অযথা অত্যাচার চলিতেছে তাহা যেন তিনি দেখিয়াও দেখিতেন না।

হেমলতা প্রথমে সমস্ত দোষ অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া সহ্য করিবার চেষ্টা করিত। ইদানীং স্বামী তাহার সহিত বড় একটা বাক্যালাপ করিতেন না। যেদিন গৃহিণীর মেজাজ সপ্তমে চড়িত সেদিন তিনি পুত্রকে আজ্ঞা করিতেন, আর অম্বুজকুমারও হেমলতাকে সমস্ত বিকাল ও রাত্রি একটি ঘরে শিকল দিয়া রাখিতেন—সকালে আবার খুলিয়া দিতেন, কেননা কাজের সময় হেমলতাকে চাই! সমস্ত রাত্রি অনাহারের পর দিনের যত কাজ শেষ করিয়া বেলা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে সকলের উচ্ছিষ্ট একমুঠা অন্ন হয়ত তাহার ভাগ্যে জুটিত। সেই ক'টিতে অর্দ্ধাহার শেষ করিয়াই তাহাকে আবার কাজ করিতে হইত। বাড়ীতে ঝি-চাকরাণীর বালাই ছিল না। সকলের বিষচক্ষে পড়িয়া সে এই রকম অসহ্য যন্ত্রণা নীরবে সহিতে লাগিল। উপযুক্ত,

শিক্ষিত স্বামীই যখন তাহার দিকে চাহিলেন না তখন সে আর কাহার কাছে স্নেহ, সংহানুভূতি আশা করিতে পারে? একটু অবসর পাইলেই সে ঘরে খিল দিয়া মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিত। তাহার ক্রন্দন শুনিবার লোক ছিল না, তাহার ব্যথায় ব্যথিত হইবার মত কোন দরদী ছিল না।

একদিন আর হেমলতা দুঃখ চাপিতে না পরিয়া ভাবিল পিতাকে একখানি পত্র দিবে। কিন্তু পত্র লিখিতে বসিয়া সে দেখিল বিষম বিপদ। যদি শ্বশুরবাড়ীর কেহ জানিতে পায় যে সে তাহাদের নামে দোষ দিয়া বাপের বাড়ীতে চিঠি দেয় তাহা হইলে তাহার পত্র দেওয়া ত বন্ধ হইবেই, উপরন্তু নির্য্যাতনের অবধি থাকিবে না। তাই সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অনেক চিঠির কাগজ চোখের জলে নষ্ট করিয়া, এইরূপ একটি পত্র শেষ করিল :—

"বাবা, অনেকদিন আপনাদের না দেখিয়া আমার বড় মন কেমন করিতেছে। আমার শরীরও ভাল নাই। যদি দয়া করিয়া আমায় কিছুদিনের জন্য লইয়া যান, তাহা হইলে আমি বড়ই আনন্দিত হইব।"

পিতা পত্র পাইয়া সমস্ত বুঝিলেন। তিনি অতিশয় চিন্তিত হইয়া বৈবাহিককে দিন স্থির করিয়া পত্র দিলেন।

হেমলতার শ্বশ্রূদেবী সে কথা শুনিয়া পুত্রের নিকট আবার ক্রন্দনের অভিনয় করিয়া বলিলেন, "বাবা শুনেছ, ডাইনি আমাদের নামে আবার বাপকে লাগাতে গেছে। ওর অসাধ্যি কিছু নেই। খবরদার বাবা, যেন ওকে যেতে দিস নে।" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এইবার একবার পুত্র, স্ত্রীর হইয়া একটি কথা বলিলেন, "আচ্ছা মা. ওকে পাঠিয়েই বা দেওয়া গেল। ওকে ত কেউই দেখতে পারে না—আমাদের চোখের বাইরে কিছুদিন থাকুক না কেন?"...... আর যায় কোথা! মা উত্তরে বলিলেন "ওমা, ডাইনি আমার ছেলেটাকেও বশ করেছে যে গো! কোথা যাবো গো! কলিতে কি আর ধর্ম্ম আছে? বউয়ের হ'য়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে আসা?" ইত্যাদি।

অমূল্যকুমার দেখিলেন কথাগুলো ক্রমশঃ বড় অপ্রীতিকর হইয়া চলিয়াছে। তিনি এ গোলমালের সমাপ্তির জন্য মাকে বলিলেন যে বধূকে পিত্রালয়ে পাঠান হইবে না। তখন প্রসন্ন হইয়া জননী তাঁহাকে 'মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর' ও আরো কত কি বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বধূকে তাড়াইয়া দিলে যে নিজের একদণ্ড চলিবে না তাহা অমূল্যের মাতা বেশ জানিতেন। কেন-না ঝি-চাকরাণী, রাঁধুনী, সকলের কাজই হেমলতার দ্বারা চলিয়া যাইত। সময়ে অসময়ে আহ্বান করিবামাত্রই এত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও আবার হেমলতা তাঁহার পা টিপিয়া দিত, তেল মাখাইয়া দিত। এইজন্য বধূ পিত্রালয়ে যায় এ ইচ্ছা তাঁহার এতটুকুও ছিলনা।

কিন্তু এত লাঞ্ছনা, এত কষ্ট হেমলতার সহিবে কেন? সে নব-মালিকার মত নিজ-সৌরভে পূর্ণ হইয়া যাহার কণ্ঠ-লগ্ন হইয়াছিল, তাহার নিকট সে কঠোর হস্তের স্পর্শ আশা করে নাই। সে যখন অনাদৃত কণ্ঠচ্যুত হইয়া নির্দয় ব্যবহারে নিত্য প্রপীড়িত হইতে লাগিল তখন তাহার নূতন জীবনের উন্মেষ শেষ হইল। সে দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

শারীরিক দুরবস্থায় ও মনের অশান্তিতে তাহার প্রথম প্রথম অল্প অল্প জ্বর হইতে লাগিল। গৃহস্থের মধ্যে এমন কেহই ছিলনা যাহার নিকট সে নিজের শরীরের অবস্থা কি মনের বেদনা জানায়।

যে বনের পাখী প্রথম উড়িতে শিখিয়াছে, তাহার উড়ায় কত আনন্দ! তাহাকে যদি ধরিয়া খাঁচায় বন্ধ রাখা হয়, সে দুদিনেই নিশ্বাস-রুদ্ধ হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে মরিয়া যায়। হেমলতারও সেই দশা হইল। তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি যখন সতেজ ও উন্মেষশালী, তাহাকে সেই সময় দিনরাত নিষ্ঠুর কর্ম্মময় গৃহের অবরোধের মধ্যেই থাকিতে

হইত। কাহারও নিকট একটু মনের কথা কহিতে পাইত না। দুটি মিষ্ট-কথার, একটু স্নেহ-সহানুভূতির তাহার বড়ই প্রয়োজন হইয়াছিল। কেহই তাহাকে উহা দিল না।

জ্বর হইত, সে ভয়ে কাহাকেও জানাইত না—কাহাকেই বা জানাইবে? তাহার উপর সুস্থ শরীরের মত সমস্ত কাজকর্ম্ম করিতে লাগিল। ভয়ে স্নানাহারও রীতিমত করিতে হইত। একদিন সে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করাতে শুইয়া রহিল। সকালে উঠিয়া গৃহিনী দেখিলেন সমস্ত পূর্ব্ব-রাত্রের অবস্থাতেই পড়িয়া। কোনো কাজ হয় নাই। হৃদয়পূর্ণ ক্রোধের বিষ লইয়া বধূর নিকট উদ্গীরণ করিতে চলিলেন। ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন 'কি গো নবাবের মেয়ে, আজ আর ওঠা হবেনা নাকি?" ধীরে ধীরে হেমলতা বলিল "মা, আমার বড় জ্বর হয়েছে।" তিনি পূর্ব্ববৎ কর্কশস্বরে বলিলেন "তা ব'লে সবাই উপোস করে থাকবে নাকি? কি তোমার মনে আছে বল ত? অত আদিখ্যেতা এখানে চলবে না, বাপের মায়ের কাছে কোরো। ভালোয় ভালোয় বাসন মেজে, রান্না চড়িয়ে দাও গিয়ে। অম্বুজের কাছারীর ভাত যেন ঠিক সময়ে তৈরী হয়।"

শীতে ও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হেমলতা আদেশ পালন করিতে চলিল। ভাবিল যতক্ষণ একটুও শক্তি আছে, ততক্ষণ করিবে—নহিলে তাহার নিস্তার নাই। সেদিন যথাযথ দিনের সমস্ত কাজগুলি করিয়া হেমলতা না খাইয়া সন্ধ্যার সময় শুইয়া পড়িল। সেদিন স্বামী কাছারী হইতে ফিরিয়া কি সৌভাগ্যবশতঃ তাহার খোঁজ লইলেন। মাতা উত্তর করিলেন "দেখগে না কেমন আছে। থাকবে আবার কেমন, ভালই আছে। একটু গা গরম হয়েছে ত আর রক্ষা নেই।" ঘরে ঢুকিয়া অম্বুজ দেখিলেন হেমলতার চক্ষু মুদ্রিত, মুখ ঘোর রক্তবর্ণ। তিনি তাহার কপালে হাত দিতেই হেমলতা চমকিয়া চক্ষু মেলিল। "ওকি, তোমার চোখমুখ যে বড় লাল হয়েছে! উঃ, গা কি গরম!" বলেই অম্বুজকুমার ডাক্তার আনিতে গেলেন। হেমলতা মনে মনে ভাবিল, "হে ঈশ্বর, এ অসুখ আমার চিরদিন থাকুক—যদি এতে ওঁর অমনি সহানুভূতি পাই!" হেমলতার শাশুড়ি ভাবিলেন 'ডাইনি মরে ত বেশ হয়। ছেলের আর একটা ভাল দেখে বিয়ে দি। ডাইনি আমার ছেলেকে খেয়ে ফেলবে একটু গা গরম হয়েছে ত অমনি ডাক্তার আনতে ছোটা!"

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষার পর বলিলেন "এর আগে কখনো জ্বর হত?" অম্বুজকুমারের মাতা আড়াল হইতে বলিলেন, "কখনও হয়নি, সমস্ত কাজকর্ম্ম করত; এও কিছু নয়, অনিয়মে একটু জ্বর হয়েছে সেরে যাবেখ'ন।" ডাক্তারবাবু ঘাড় নাড়িয়া অম্বুজকুমারকে বলিলেন "আমার সন্দেহ হয় অম্বুজবাবু, মা হয়ত জানেন না, আপনিই একবার নিজে গিয়ে রোগীণীকে জিজ্ঞাসা করুন ত।" জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া তিনি বলিলেন "অল্প অল্প জ্বর প্রায় গত কয়েকদিন ধরে রোজই হ'ত।" তাঁহার মা ভাবিলেন 'মেয়েটা কি সয়তান! তাহা মিথ্যা কথাটা বলে পাঠালে!—ডাক্তারবাবু বলিলেন "তাইত, পরীক্ষা করে দেখলাম এ অসুখ শেষে বড় সাংঘাতিক দাঁড়াতে পারে। কিছুদিন হাওয়া-বদলান আর খুব যত্ন শুশ্রূষার দরকার হয়েছে। কোথাও নিয়ে যান না কিছুদিনের জন্যে? ওষুধও দিচ্ছি, খাওয়াবেন।" এই বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। তাঁর ব্যবস্থা শুনিয়া অম্বুজবাবুর জননী বলিলেন—"কেন, আমরা কি ওর শত্রু, না কখনো ওকে দেখি না? এতদিন বেঁচে রইল কি করে? আবার হাওয়া-বদলান! আমরা কি এখানে থেকে মরে গেছি, না এখানে লোক বাস করে না? উনি কি এমন স্বর্গের পরী যে এ জল-হাওয়া সহ্য হবে না?"

চিকিৎসাটা নেহাৎ না করিলে নয়, তাই সেটা বাহাল রহিল; নহিলে তাঁহার ইচ্ছা ছিল ওই

বাজে খরচটাও বন্ধ থাকে। কিন্তু এ উপায়ে বেশী দিন চলিল না। ঔষধে বিশেষ কোন উন্নতি না হওয়ায় অম্বুজকুমার পিতার সম্মতি লইয়া ঠিক করিলেন হেমলতাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিবেন। শুশ্রূষা ও স্থান-পরিবর্ত্তন উভয়ই হইবে।

এবারে শাশুড়িও বধুকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে বিশেষ গোলোযোগ করিলেন না। নিন্দকেরা বলিল 'হেমলতা আর খাটিতে পারে না, আর ঔষধ পথ্যেরও ত খরচ আছে, তাই এবার শাশুড়ি বধূর পিতার স্কন্ধে এই বোঝা চাপাইতে চাহেন।' সে যাহাই হউক, হেমলতার পিতা আসিয়া তাহাকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লইয়া গেলেন। যাইবার সময় জামাতাকে বলিলেন "মেয়েটাকে এমনি করে মেরে ফেলতে হয় বাবা?" জামাতা মুখ নীচু করিলেন।

* * * * *

হেমলতা বাপের বাড়ী যাইবার কিছুদিন পরে অম্বুজকুমার তাহার পিতার পত্র পাইলেন—

'যদি অন্ততঃ আর কিছুদিন আগে আমার মেয়েকে ফেরৎ দিতে, তাহা হইলে বোধ হয় বাঁচাইতে পারিতাম।'

* * * * *

পত্র পাইয়া অবধি অম্বুজকুমারের মন ভাল ছিল না। সেদিন কাছারী হইতে ফিরিয়া যে ঘরে তাঁহার ফুলশয্যা হইয়াছিল সেই ঘরে বসিলেন। মনে হইল সে যেন সেদিনের কথা—বোধহয় এখনো ঘরের কোথাও পুরানো ফুল পড়িয়া আছে; এখনো সেই ফুলের গন্ধ বুঝি ঘরে খেলিয়া বেড়াইতেছে! এই সব মনে হওয়ায় তাঁর মন আরও খারাপ হইয়া গেল। আজ সে হেমলতা কোথায়!

ধীরে ধীরে তাঁর বিবাহের ঠিক পরের কয়দিনের সুখের ঘটনাগুলি মনে পড়িতে লাগিল। ছোট ছোট তুচ্ছ ঘটনা বটে, কিন্তু প্রথম প্রেমের স্বর্গীয় সুষমায় প্রত্যেকটি মধুর, প্রত্যেকটি অমূল্য! জলবিন্দু মূল্যহীন কিন্তু স্বাতীর সলিল যেন শুক্তি-গর্ভে পড়িয়া মুক্তা হইয়াছে। প্রত্যেকটি সুন্দর, অতি সুন্দর!····· অম্বুজকুমারের সমস্ত মন সেদিন সে স্মৃতির সম্পদে পূর্ণ হইয়া রাঙিয়া উঠিল।

যখন শাশুড়ির একান্ত বাসনা পূর্ণ করিয়া হেমলতার মৃত্যুসংবাদ পঁহুছিল, তখন তিনি আরো হাজার কতক টাকার চিন্তায় বিভোর হইলেন। তাঁহার ছেলে কি যে সে ছেলে? পাঁচ পাঁচটি পাশ করেছে, তার ওপর মায়ের প্রতি কি ভক্তি! আরও পাঁচ হাজার টাকা তাঁহার মনশ্চক্ষে অতি স্পষ্ট হইয়া আসিল।

সুবিবেচকের মত তিনি মনের কথা মনেই রাখিলেন, ভাবিলেন, 'ক'টা দিন যাক্ একবার, তখন ছেলে আমার নিশ্চয়ই ডাইনিকে ভুলে যাবে; তারপর আমার ছেলে ত আমারই আছে। আবার এক গা গয়না নিয়ে একটি টুকটুকে বউ আর অন্ততঃ পাঁচটি হাজার টাকা আসবে।'

অম্বুজকুমার হেমলতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বড়ই কাতর হইলেন। তিনি যে তাহাকে ভালবাসিতেন না, তাহা নয়। বরং প্রতিহত হইয়া তাঁর সমস্ত স্নেহ সহানুভূতি প্রতিদিন ব্যাকুলতর হইয়া উঠিয়াছিল। ইচ্ছা হইত হেমলতাকে সমস্ত অত্যাচারের হাত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য তাহাকে লইয়া অন্য কোথাও যান; কিন্তু পাছে মায়ের মনে আঘাত করা হয়, বা তিনি কিছু মনে করেন এই জন্য সমস্ত দেখিয়া, বুঝিয়াও তিনি কিছু করিতেন না। ভাবিতেন, মা আর কতদিনই বা আছেন? তাঁহার মনে কেন শেষ বয়সে কষ্ট দি? তারপর ত আমাদের সুখ-শান্তি রহিলই। কিন্তু যে যাইবার সে রহিয়া গেল, ও যে থাকিবার সে-ই চলিয়া গেল—ইহাই তাঁর বেশী মনে লাগিল। সে যদি যাইবার সময় তাঁহাকে দুটি অনুযোগের কথা বলিয়া যাইত, যদি দুটি অভিযোগ শুনাইয়া যাইত, হয়ত আজ তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন। কিন্তু তাহা ত সে করে নাই, তিনি কি বলিয়া আজ

নিজেকে সান্ত্বনা দিবেন ?—তিনি নিজেকে আরো বেশী অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন।

যেন তাঁর স্পষ্টই মনে হইল অভিমানভরেই হেমলতা সমস্ত মায়া কাটাইয়া গেল। চিন্তায় সে' আর ফিরিবে না, তাই যথাসাধ্য, চিন্তা করিতে বিরত হইলেন। কিন্তু মন স্বাধীন, সে তাঁহার কথা শুনিবে কেন ? ক্ষণে ক্ষণে শুধু ইহাই মনে হইত 'তাহার কাছে ক্ষমাও ত চাওয়া হইল না! যদি একবার বলিতে পাইতাম,—'তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি, আমায় ক্ষমা কর' তাহলে সে বোধ হয় আমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিত।

কিছুদিন খুব চেষ্টা করিয়া অম্বুজকুমার এই কাতরতা পরিত্যাগ করিলেন। মনের মধ্যে সেই প্রপীড়িত নির্দ্দোষ মানস-প্রতিমার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নীরবে সমস্ত জ্বালা সহিলেন। মনকে শুধু এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেন—'সে যখন নীরবে আমার অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, আমিও তাহার কষ্ট নীরবেই সহ্য করিব। আমার অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই।'

মা ভাবিলেন ছেলে বুঝি বউয়ের কথা সমস্তই ভুলিয়াছে। কেন না, সে কোন কাজেই আর শোকের চিহ্ন দেখায় না। না ভুলিবেই বা কেন ? সে ডাইনির কি কিছু গুণ ছিল ? অতিশয় সাধ-ধানীর মত ধৈর্য্য ধরিয়া তিনি তিনটি মাস কাটাইয়া দিলেন।

শেষে একদিন ভাবিলেন এতদিন ঠিক সময় হইয়াছে। একদিন অম্বুজকুমারকে কাছারীর ভাত দিয়া পাখা করিতে করিতে বলিলেন—"অমু বাবা, ওবেলা কাছারীর ফেরৎ একবার নিধুবোসের বাড়ী হয়ে এস ত ? সমস্ত বলা-কওয়া আছে। মেয়েটিকে একবার দেখে এস অম্‌নি। বড় সুন্দরী, আর গুণে যেন লক্ষ্মী······"

ধীরে ধীরে, শান্ত অথচ পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত অম্বুজকুমার বলিলেন "মা, ও কথাটি আমায় আর বোলো না। ও আর আমি পারব না।"

জননী পুত্রের এই প্রথম অবাধ্যতায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। অম্বুজকুমারও এই প্রথম নিজেকে বিদ্যাসাগরের আদর্শচ্যুত করিলেন।

মা

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

মার মূরতি জ্যোছ্‌না-গড়া, ফুল-পরিমল মাখা,
মার নয়নে ভালবাসার অসীম সিন্ধু আঁকা।
মায়ের বুকে বন্যা-উছল্‌ পুণ্য পীযুষ-ধারা,
মায়ের গেহে আনন্দ-দীপ—আঁধার-আলো করা।
মায়ের হাসি ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বিলাস ময়,
মায়ের প্রেম "পাগ্‌লা-ঝোরা"র ঝর্ণাবেগে বয়।
মায়ের স্নেহ পরশ-মণি—চাঁদের অমল আলো;
অমিয় মধুর মায়ের কথা শুন্‌তে বড় ভালো।

দয়া-মায়ার মন্দাকিনী—সর্ব্ব-সহা মাটি,
মেঘের মত আপন-ঢালা—স্থির-শীতল গা'টি
মায়ের কোলে নন্দন-বন—বিশ্ববনের সেরা,
স্নিগ্ধ শীতল, কূজনময়, সবুজ শোভায় ঘেরা।
মায়ের পায়ে কোটী স্বরগ কোটী কমল ফুটে,
মধুপ হ'য়ে মায়ের পায়ে বেড়াই মধু লুটে।
শিশির মাখা শরত-রাণী—দুর্গা, দশভুজা,
বন্দি সদানন্দময়ী—ছন্দে লহ পূজা!

স্বদেশী-সাধনায় মাতৃজাতি

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

বাঙ্গালার মা-ভগ্নীদের কর্ত্তব্যের দু' একটি ত্রুটির কথা আজ বলিব। বলিব—সন্তান যেমন মায়ের নিকট আব্দার করিয়া বলে তেম্নি আব্দার করিয়া। বাঙ্গালার হিন্দু-ঘরের মা-ভগ্নীরা হিন্দু জীবনের ভগবন্মুখী আদর্শবাদকে ব্রত, পূজা, পার্ব্বণ, একাদশী, অতিথিসেবা, পতিসেবা প্রভৃতির দ্বারা রক্ষা করিতেছেন, ইহাঁ কেহই অস্বীকার করিতে পারে না, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বাঙ্গালীর সংসারে দুঃখ-দারিদ্র্য ও বিলাসিতার কালিমা ছড়াইতেছেন। ইহা কি কোন মা ভগ্নী অস্বীকার করিতে পারেন? কাঁচের চুড়ি বিলাতি, একটু আঘাত লাগিলেই ভাঙ্গিয়া চুরমার হয়, ইহা জানিয়াও তাঁহারা বেদে-বেদেনী যাইবামাত্র কাঁচের চুড়ি ক্রয় করেন। খদ্দরের কাপড়, দেশী কাপড় পরিলে দেশের লোকে দু'টি পয়সা পায়, দেশের পয়সা দেশে থাকে, ইহা জানিয়া শুনিয়াও তাঁহারা অনেকে বিলাতি কাপড় পরিয়া থাকেন। ইহার ফলে বৎসরে ৮৪ কোটী টাকা বিদেশে চলিয়া যায়। তাঁহারা যদি তাঁহাদের স্বামী ভ্রাতা বা পুত্রগণকে একটু জিদ্ করিয়া বলেন যে, তোমরা প্রাণান্তে বিদেশী কাপড় আমাদের ঘরের আঙ্গিনায় আনিতে পারিবে না, তবে সাধ্য কি পুরুষেরা বিদেশী কাপড় স্পর্শ করে? মা সকলেরা যদি ছেলেদের মানুষ করিবার জন্য তাহাদিগকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পাঠান, তবে সাধ্য কি ছেলেরা সরকারী স্কুলে পড়িয়া কেবল কেরাণী আর কুলীর দলে পরিণত হয়? কাহারা আজ বাঙ্গালার অন্তঃপুর হইতে রামায়ণ মহাভারত দূর করিয়া দিয়া সেখানে "বিষবৃক্ষ" রোপণ করিয়াছেন? গ্রামের "কথকতা" "রামায়ণ" প্রভৃতি লুপ্ত হওয়ায় তাহার স্থানে সখের থিয়েটার, যাত্রা প্রভৃতিকে স্থান দিবার অধিকার দিয়াছে কে? সে কি আমাদের বাঙ্গালা দেশের অন্তঃপুরের মা-ভগ্নীরাই নহেন? সখের থিয়েটারে "থাক" "চিন্তামণির" অলঙ্কাভরণের জন্য নিজেদের হাতের স্বর্ণাভরণ খুলিয়া দেন কাহারা? সে কি আমাদের বাঙ্গালাদেশের মা-ভগ্নীরা নহেন? গো-হাড়, গো-রক্ত দিয়া পরিষ্কৃত লিভারপুলের নুন ও জাভার চিনি দিয়া দেবতার ভোগ রাঁধিয়া দেন কে? সেও কি আমার বাঙ্গালার হিন্দু নারীরা নন? বস্তুতঃ আজ দেশে যা কিছু অনাচার, যা কিছু পাপাচার প্রবেশ করিয়াছে তাহার অধিকাংশের জন্য বাঙ্গালার মা-ভগ্নীদেরই দোষী করিব। মায়েরা আজ কলার বাসনায় কাপড় কাচা ছাড়িয়া সোডা সাবান রিঠের আশ্রয় লইয়াছেন, মায়েরা আজ পাটকাটি গন্ধক ছাড়িয়া দেশলাইয়ের আশ্রয় লইয়াছেন, মায়েরা আজ সিন্দুর-চন্দন ছাড়িয়া পমেটম-পাউডারের আশ্রয় লইয়াছেন বলিয়াই ত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আজ এত অভাবের তাড়না!

পূর্ব্বে বাঙ্গালার মা, ঠাকুরমা, দিদিমারা খাওয়াদাওয়ার পর টেঁকো লইয়া সূতা কাটিতে বসিতেন, বাড়ীর আঙ্গিনায় কাপাস গাছ হইত, তাহাতে তুলা হইত। তাঁহাদের হাতেকাটা সূতায় তাঁতি, জোলারা দিব্য কাপড় গামছা বুনিত আর ব্রাহ্মণেরাও সেই সূতায় বিশুদ্ধ উপবীত গ্রন্থি দিয়া পরিধান করিতে পারিতেন। ঠাকুরমা দিদিমাদের কাছে রামরাবণের যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম, কালীয়দমন, কংশবধ প্রভৃতির উপাখ্যান শুনিয়া ছেলেমেয়েদের তাহা এমন আয়ত্ত হইয়া যাইত যে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহারা তাহা ভুলিত না। কিন্তু আজকালকার বাঙ্গালার সংসারের দিকে তাকাইলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে

পাই মা-ভগ্নীরা আহারান্তে যদি পড়িতে হয় তবে অমনি একখানা "বিন্দুর ছেলে" কি "অভাগী" লইয়া বসেন। আর ছেলেমেয়েরা মা-ঠাকুরমাদের কাছে পৌরাণিক উপাখ্যানের পরিবর্ত্তে শেষে কাহার কিরূপ টুক্‌টুকে বর ক'নে আসিবে তাহারই আলোচনা শ্রবণ করে, কাজেই শৈশব হইতে মা ঠাকুরমা দিদিমার কাছে শিশুরা ঐ যে টুকটুকে বর ক'নের কথা শুনে সেই কথাটাই তাদের মনে ছাপ পড়িয়া যায়। ভবিষ্যৎ-জীবনে যখন তাহাদের জীবন-তরু পত্র পুষ্প কিসলয়ে পরিশোভিত হইয়া উঠে, তখন শৈশবের সেই টুকটুকে বর-ক'নের চিত্রই তাদের প্রাণে আকুলতা আনিয়া দেয়।

"লেখা পড়া করে যেই
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই"

মা ঠাকুরমা থাকিয়া থাকিয়াই সন্তানের কাণে এই কথা বর্ষণ করেন, ফলে বালকবালিকা শৈশব হইতেই লেখাপড়া শিখে, শুধু গাড়ীঘোড়া চাড়িবার জন্যই। ফলে পরিণত বয়সে যদি তাহারা হাকিম উকিল হইবার জন্য কোটরগত চক্ষু লইয়া, জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার পৃষ্ঠে সার্টিফিকেটের বোঝা বাঁধিয়া সরকারের দ্বারে ধর্‌ণা দিতে থাকে, তবে তাহাদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি ?

বাঙ্গালার প্রতি লোকের গড়ে প্রত্যহ আয় কত ? লর্ড কর্জ্জন গণিয়া পড়িয়া বলিয়াছেন—মাত্র /০ এক আনা। মা ভগ্নীরা স্বামী ভ্রাতা বা পুত্রের আর্থিক দুরবস্থা জানিয়া শুনিয়াও থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখাইবার জন্য তাঁহাদিগকে পীড়াপীড়ি করেন। ফলে কোন সংসারেই মাসকাবারে এক পয়সাও উদ্বৃত্ত থাকেনা—দেনায় পুরুষের মাথা বিকাইয়া যায়। যাঁহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দু'পয়সা রোজগার করেন তাঁহারা যে অন্তঃপুরের পীড়াপীড়ি ছাড়া কখনও থিয়েটার বায়স্কোপে টাকার ছিনিমিনি খেলিতে যান না, ইহা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝিতে পারেন। এক্ষেত্রেও মা-ভগ্নীদের অপব্যয়ের দোষ না দিয়া পারি না।

পাশ করা জামাই চাই—পাশ করা ছেলে চাই—একথা বলিয়া স্বামীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন কারা ? সে কি আমাদের মা-ভগ্নীরাই নহেন ? তাঁরা যদি একবার একটি দিনের জন্যও ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন তাঁহাদের স্বামী কত দুঃখে, কত কষ্টে দু'পয়সা রোজগার করেন, তাহা হইলে বোধ হয় অতি পাষাণেরও চোখে দু' ফোঁটা জল না পড়িয়া পারে না! পাশ করা ছেলেরা আজকাল পেটের ভাত জোগাড় করিতে পারে না, গাধার মত কেবল সার্টিফিকেটের বোঝা আর অহমিকা তাহারা বহন ও পোষণ করিয়াই বেড়ায়। এ কথা জানিয়া শুনিয়াও মা-ভগ্নীরা যে মেয়ের জন্য পাশ করা জামাইয়ের জন্য স্বামীর হাতে ভিক্ষার ভাণ্ড তুলিয়া দেন, তাহা কোন্ বিবেচনায়—বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কেন, জমাজমিওয়ালা, সচ্চরিত্র, সরল প্রাণ, মোটামুটি ভাত কাপড় দিতে সক্ষম জামাতা কি তাঁহাদের পছন্দ হয় না ?

বাঙ্গালাদেশ যে আজ রসাতলে যাইতে বসিয়াছে ইহার মূল উৎস অন্তঃপুর। অন্তঃপুরের মা-ভগ্নীরা বিলাসের মাত্রা কমাইলে কি বাঙ্গালী হিন্দু আজ এত নিঃস্ব হইয়া পড়ে ? পুরুষের জন্য সংসারে আর কি ব্যয় হয় ? একটা পুরুষের একটা ঘড়ি, একটা আঙটি ও বড় জোর একজোড়া চশমা হইলেই তিনি মনে করেন তাঁহার বিলাসের সমস্ত সম্ভারই হইল। কিন্তু মা-ভগ্নীদের বেলায় কি তাই ? হাতে, পায়ে, নাকে, কাণে, কোমরে, সর্ব্বাঙ্গে সোণার গহনা, ভাল কাপড়, চুলের ফিতে, গায়ের সাবান, সুগন্ধি তেল না পাইলে তাঁহারা জীবনটাকে ব্যর্থ ও বিড়ম্বনাময় বলিয়া মনে করেন। একটি কুড়ি টাকা মাহিনার কেরাণীবাবুর নিজের পেটে অন্ন থাকুক আর না থাকুক—তাঁহার পত্নীর অঙ্গে নিতান্ত পক্ষে ৪।৫ শত টাকার গহনা চাই-ই-চাই। নহিলে পরিবারের নাকি ভদ্রসমাজে মিশিবার উপায় নাই ! অবশ্য আপদ-বিপদকালের জন্য গহনা ভাল বটে, কিন্তু চোর ডাকাত দস্যু তস্করের উপদ্রব শুধু এই

গহনার জন্য, আর গহনায় যে টাকা ব্যয় হয় তাহা আর কস্মিন্‌কালে কমে ছাড়া বাড়ে না। কিন্তু সেই ৪।৫ শত টাকা দিয়া জমি জমা করিলে গৃহস্থের ধন ধান্যের পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়াই চলে! দুঃখের বিষয় সেদিকে মা-ভগ্নীদের নজর কই ?

বাঙ্গালার হিন্দু-ঘরের ভাইয়ে ভাইয়ে যে ভাগ-বাটোয়ারা, গৃহবিবাদ ইহার জন্য মা-ভগ্নীদের স্বার্থ মাখান' দুরভিসন্ধি যে দায়ী এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন কি? কে নিত্য রাত্রে বোবা-কালা-অক্ষম ছোট ভাই, ছোট ভাই-বৌকে পৃথক্ করিবার জন্য স্বামীর কাণে বিষ উদ্গার করিয়া থাকেন? কে ভাইয়ে ভাইয়ে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া সোণার সংসার ছারেখারে দিয়া থাকেন? — সে কি আমাদের মা-ভগ্নীরা নহেন? তাঁহাদের প্রাণে যদি উদারতা, দয়া, মায়া, মমতার কিছুমাত্র লেশ থাকে তবে কি ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগ বাটোয়ারা হইয়া মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয় ?

লেখক একটি মহানুভব মহিলার কথা জানেন। তিনি বন্ধ্যা ছিলেন, স্বামীর বংশে বাতি দেওয়ার অন্য কেহ না থাকায় তিনি নিজে স্বামীকে পীড়া-পীড়ি করিয়া তাঁহার আবার বিবাহ দেন এবং আজিও তাঁহার সপত্নীকে নিজের ছোট বোনের মত আদর যত্ন স্নেহ করিয়া আসিতেছেন। কিসে তাহার সপত্নী স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে পারিবে—কিরূপে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে পবিত্র দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, তিনি সেইজন্য অহোরাত্র সপত্নীকে নিজ হাতে বেশ ভূষা পরাইয়া, তাহার চুল বাঁধিয়া, সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু পরাইয়া দিয়া থাকেন! ভাবুন দেখি এই মহীয়সী মহিলাটির প্রাণটা কতদূর উদার! এরূপ মহিলা বাঙ্গালার হিন্দু সংসারে ক'টি আছেন ?

স্ত্রীলোকের স্বামী দেবতা, স্বামীই পরমেশ্বর, স্বামীই ইহ পরকালের পতি - ইহা শতবার স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই স্বামী যদি বিপথে গমন করেন, তবে তাঁহাকে স্নপথে আনিবার জন্য মা-ভগ্নীদের মধ্যে বড় কম চেষ্টাই দেখা যায়। স্ত্রী যে স্বামীর সখা, মিত্র, সচিব একথা তাঁহারা ভুলিয়া যান কেন? স্বামী থিয়েটারে অভিনয় করিয়া, অস্থানে কুস্থানে বেড়াইয়া, মিথ্যা জুয়াচুরি করিয়া ঘরে ফিরেন, ৫০, টাকা বেতনের ষ্টেশনমাষ্টার-স্বামী ৫ শত টাকা আনিয়া মাসে মাসে গৃহিণীর হস্তে অর্পণ করেন, কই কোন মহিলা ত তাহাতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না—কথাটি পর্য্যন্ত বলেন না! লেখক জানেন, বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনের একজন নামজাদা প্রচারিকা তাঁহার স্বামী বিলাতি কাপড় চোপড় পরেন বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যতদিন তাঁহার স্বামী বিলাতি কাপড় চোপড় ত্যাগ না করিবেন ততদিন তিনি স্বামীর ঘর করিবেন না—স্বামীর মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। আদর্শবাদীদের নিকট হয় ত এই বিদূষী যুবতীর এরূপ আচরণ নিন্দনীয় হইতে পারে, কিন্তু দেশের স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে, নারীর কর্ত্তব্যের দিক্ হইতে বিচার করিতে গেলে বলিতে হইবে ইনি ঠিক উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন!

স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের জননী গুরুদাসকে একদিন পাতকুয়ায় ডুবাইয়া মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, গুরুদাসের অপরাধ তিনি একটি পেনসিল চুরি করিয়া আনিয়াছিলেন। জানিনা কবে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এরূপ মায়ের সৃষ্টি হইবে!

সত্য কথা বলিতে কি আজ হিন্দু-সমাজে, হিন্দু-জাতির মধ্যে এই যে অনাচার, অবিচার, স্বেচ্ছাচার, মিথ্যাবাদিতা, নীতিজ্ঞানহীনতা, বিদেশী দ্রব্যাদির প্রতি অনুরক্তি, ভোগবিলাসে দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা দেখা যাইতেছে তাহার মূলে হিন্দু-রমণীর শৈথিল্যই বিরাজমান। ভ্রমর যদি অভিমান ভরে পিত্রালয়ে না যাইয়া গোবিন্দলালকে স্নপথে আনিবার চেষ্টা করিত তবে বোধ হয় রোহিণী-মুগ্ধ গোবিন্দলালের জীবনের যবনিকা ওরূপ শোচনীয় ভাবে পড়িত না।

আমরা গত ২০ বৎসর কাল এই যে চরকা, খদ্দর, ভ্রাতৃপ্রেম, প্রভৃতি বিষয়ে এবং অস্পৃশ্যতা,

মদ্যত্যাগ প্রভৃতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছি, যদি আমাদের মা-ভগ্নীরা অন্তঃপুর হইতে একবার অভয়বাণী দেন, তবে শত শত বক্তৃতাতে এতদিন যাহা না হইয়াছে, তাঁহাদের একদিনের চেষ্টায় তাহা হইবে।

"অন্ধকার নাহি যায় বিতর্ক করিলে
মানে না সে বাহুর আক্রমণ,
একটি আলোক রেখা সম্মুখে ধরিলে
মুহূর্ত্তে সে করে পলায়ন।"

একবার মা-ভগ্নীরা যদি অন্তঃপুর হইতে ভীমগর্জ্জনে বলিয়া উঠেন,—এই রহিল তোমার হাতাবেড়ী, বিলাতি নুন, বিলাতি চিনি, সাপের চর্ব্বি, বাঘের চর্ব্বি দিয়া রান্না করিব না; এনামেলের, এলুমিনেমের বাসন ঘরে ঢুকিতে দিব না, বিলাতি কাপড় ঘরের আলনায় রাখিতে দিব না, ছেলেদের হাতে জার্ম্মানীর চুষিকাঠি দিব না, বাবুদের সকালে ডিস্‌পেপসিয়ার সৃষ্টিকর্ত্তা চা জ্বাল দিয়া দিব না; বিলাতি চুড়ি, এসেন্স, সাবান, দেশলাই, হ্যারিকেন ঘরের আঙ্গিনায় ঢুকিতে দিব না, মুখে মদের গন্ধ বাহির হইলে তাহাকে বাড়ীর দরজায় আসিলে সম্মার্জ্জনী প্রহার করিব; সার্টিফিকেট-সর্ব্বস্ব, স্বাস্থ্যহীন ছেলেদের হাতে মেয়েগুলোকে সমর্পণ ক'রে তাদের দুখের পাথারে ভাসাইয়া দিবনা, বরং বিবাহ না দিয়া কুমারী করিয়া ঘরে রাখিব, কচি কচি দুধের বালবিধবাদের হাতের শাঁখা ভেঙ্গে আর তাদের তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে ধরণী উষ্ণ করিব না, তবে গান্ধী-চিত্তরঞ্জন-তিলক-লজপত-সরোজিনী-হেমপ্রভা-মোহিনীদেবীর হাজার হাজার বক্তৃতায় এতদিন যাহা না হইয়াছে তাহা দু'দিনেই হয়।

মা-ভগ্নীদের এক ওজর আছে, পুরুষের হাতের ক্রীড়নক তাঁরা, পুরুষে কেন তাঁদের কথা শুনিবে! তাঁদের দুর্ব্বলতা ত এইখানেই! কেন তাঁরা নিজেদিগকে কেবল হুকুমের দাসী মনে করেন? ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার ক্ষমতা কি তাঁদের নাই? তাঁরা কি হস্তপদবিশিষ্ট মানুষ নন? যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবেন তাহা করিবার ক্ষমতা কি তাঁহাদের নাই? যে পুরুষ তাঁদের কথা পদাঘাতে দূরে ঠেলিয়া ফেলিবে তাঁহারা তেমন পুরুষের দাসীপনা নাই বা করিলেন! সমাজ নিন্দা করিবে তা করুক। বিবেক হইল সংসারে সব জিনিষের চেয়ে বড়। বিবেককে জলাঞ্জলি যে দেয় সে পুরুষ হোক, নারী হোক, কোন মতে মানুষ নয়।

মা-ভগ্নীরা যেন সর্ব্বদা মনে রাখেন দেশের স্বার্থের জন্য আজ তাঁহাদিগকেই অগ্রে দাঁড়াইতে হইবে। বীর বাদলের জননীর ন্যায় তাঁহাদিগকেই অন্ধের নিধিকে বিপদ-সাগরে পাঠাইতে হইবে—কুন্তীর ন্যায় প্রাণাধিক পুত্রকে—রাক্ষসের মুখে প্রেরণ করিতে হইবে। এই যে তারকেশ্বরে মা-ভগ্নীর ইজ্জত নষ্টকারী মোহান্তের বিরুদ্ধে অহিংস সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে, কই বাঙ্গালার মা সকল তাহাতে পুত্র সন্তানগণকে পাঠাইতেছেন কই? শ্যামের বাঁশী ঐ যে বাজিতেছে, এমন সময় কুল-মান ত্যাজিয়া তাঁহারা কদম্বমূলে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন কই? মা বোনেরাই ত দেশের প্রাণ। শক্তির অংশ তাঁরা, সন্তানের ধমনীতে শক্তি সঞ্চার তাঁরা না করিলে কে করিবে? দেশ কি এমনই ভাবে দিন দিন উৎসন্নের দিকে যাইবে? বাঙ্গালা কি আর জাগিবে না? আর কি ভারতজননী জাতিসঙ্ঘের মহাসভায় রাজমাতার বেশে গৌরব-কিরীট পরিয়া সিংহাসনে বসিবেন না?

মা-ভগ্নীগণ! আর এখন ঘুমাইয়া থাকিও না। ঐ দেখ বাতায়নের মধ্য দিয়া কেমন বালার্ক তরুণ তপনের ক্ষীণ কনক-রশ্মি-রেখা আসিতেছে, একবার এই শুভ প্রভাতে উঠিয়া বল—আমরা উঠিয়াছি, জাগিয়াছি, আমাদের ঘুমঘোর ভাঙ্গিয়াছে, আর তোমাদের ভয় নাই সন্তানগণ! আজ হ'তে দেশ-মাতৃকার যজ্ঞবেদীতে আহুতি দিতে আমরা অবতীর্ণ হইতেছি।

সঙ্কলিকা

ম্যালেরিয়া ও তাহার প্রতীকার—

ম্যালেরিয়ার সময় আসিয়া পড়িয়াছে, এখন হইতে প্রতিরোধের উপায় না করিলে শীঘ্রই ঘরে ঘরে সবাই জ্বরে পড়িবে।

ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে আমরা নিস্তার পাইতে পারি; অতি অল্প ব্যয়ে ইহার প্রকোপ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি এ কথা বোধ হয় সবাই জানেন না। ম্যালেরিয়া জ্বরের এক প্রকার বীজাণু আছে, এই বীজাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়া রক্তের মধ্যে চলাচল করিয়া জ্বরের সৃষ্টি করে; মশা এই বীজাণু একজনের শরীর হইতে অন্য জনকে দেয়—এইরূপে ম্যালেরিয়ার সময় জ্বরের প্রকোপ বাড়িয়া চলে। এই সময়ে অর্থাৎ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে, মশা ডিম পাড়ে এবং মশার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় বলিয়া জ্বরেরও বিস্তার বাড়িতে থাকে।

ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে (১) শরীরে প্রবিষ্ট ম্যালেরিয়ার বীজাণুর ধ্বংস করিতে হইবে, (২) মশার কামড় হইতে নিজকে বাঁচাইতে হইবে, (৩) মশা যাহাতে ডিম পাড়িয়া কুল বৃদ্ধি না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রতিকারের উপায়—

(১) কুইনাইনই ম্যালেরিয়া বীজাণু ধ্বংসের একমাত্র ঔষধ। সপ্তাহে তিনবার ৫ গ্রেন করিয়া কুইনাইন খাইতে হইবে তাহা হইলে যে বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিয়াছে তাহা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। দাস্ত পরিষ্কার রাখিতে হইবে, না হইলে ত্রিফলা (হরিতকী, আমলকী ও বহেড়া) ভিজান জল প্রত্যহ প্রাতে খাওয়া উচিত।

(২) মশারী নিয়মিত ব্যবহার করা উচিত অভাবে সন্ধ্যার সময় ঘরে ভাল করিয়া ধূনা জ্বালাইয়া ঘর বন্ধ করিয়া রাখিলে মশার উপদ্রব কম হয়। কেরোসিন তেলের গন্ধে মশা কম থাকে, হলদে রংএর কাপড়, জামা ও বিছানায় মশা কম আসে।

(৩) মশা স্থির ময়লা জলে ডিম পাড়ে, যে সব সার গাদার গর্ত্তে, নালায়, ডোবায় মশা ডিম পাড়ে তাহা ভরাট করা উচিত; যেখানে জল জমে তাহাতে কেরোসিন তেল ছিটাইয়া দিলে মশা ডিম পাড়িতে পারে না। ডিম পাড়িতে না পারিলে মশার বৃদ্ধি কমিয়া যায়।

এই তিনটী উপায় এখন হইতে সকলের অবলম্বন করা উচিত; তাহা হইলে জ্বরের হাত হইতে অনেকটা পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে। —সঞ্জিবনী।

রোগীর সেবা—

(১) রোগীর ঘর ও বিছানা—

যে ঘরে অনেক দরজা জানালা এবং বেশী আলোক আসে ও হাওয়া খেলে সেই ঘরে রোগীকে রাখিবে। যদি রোগী সংক্রামক রোগাক্রান্ত হয় তাহা হইলে বাটীর সুস্থ লোকদিগের ঘর হইতে যে ঘরটী সর্ব্বাপেক্ষা দূরে সেই ঘরে রোগীকে রাখিবে। রোগীর ঘরে আসবাব যত কম রাখিবে তত ভাল, কারণ বেশী আসবাব রাখিলে ঘরে ভাল হাওয়া খেলিবে না। এই ঘরে রোগীর শুইবার জন্য খাট, এবং পথ্য ও ঔষধ রাখিবার জন্য একটি আলমারি বা টেবিল এবং ডাক্তার প্রভৃতির জন্য দুই একটি টুল বা চেয়ার ভিন্ন অন্য কিছু রাখিবে না। রোগীর ঘর প্রত্যহ দুইবেলা ঝাঁট না দিয়া ভিজা নেকড়া দিয়া মুছিবে, তাহা হইলে ধূলা চারিদিকে উড়িয়া যাইবে না। রোগীর শরীর, বিছানা এবং ঘরের কোনও জায়গায় যেন ময়লা না থাকে। রোগীর মল মূত্র ও কফ প্রভৃতি খুব শীঘ্র সরাইয়া ফেলিবে এবং তদ্দ্বারা তাহার বিছানা কাপড় প্রভৃতি দূষিত হইবামাত্র বদলাইয়া পরিষ্কার কাপড় ও বিছানা দিবে। রোগীর, বিশেষতঃ সংক্রামক রোগীর মশারি, বিছানার চাদর ও কাপড় প্রভৃতি ময়লা হইলেই গরম জলে ফুটাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। রোগীর গা ঢাকিয়া দিয়া ঘরের দরজা জানালা সর্ব্বদা খুলিয়া রাখিবে। রোগী যত বিশুদ্ধ বাতাস পায় তাহার পক্ষে তত ভাল। কেবল যখন তাহার গা খুলিয়া মুছান হইবে তখন দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিবে। প্রত্যহ রোগীর গা পরিষ্কার করিবে। এইজন্য গরম জলে একখানি তোয়ালে ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া তদ্দ্বারা একজন রোগীর গা রগড়াইয়া দিবে এবং সেই সঙ্গে আর একজন আর একখানি পরিষ্কার শুষ্ক তোয়ালে দিয়া তাহার গায়ে যে জল লাগিয়া থাকিবে তাহা মুছাইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ জামা পরাইয়া কিম্বা পরিষ্কার শুষ্ক চাদরে গা ঢাকিয়া দিবে। রোগীর মাথা প্রত্যহ চিরুণী দিয়া আঁচড়াইয়া মাথার ময়লা বাহির করিয়া দিবে এবং দাঁত মাজাইবে।

(২) রোগীর খাদ্য—

রোগীকে দুধ, সাগু, বার্লি, এরারুট, মুগ, মশুর প্রভৃতি ডালের কিম্বা কই মাগুর প্রভৃতি মাছের ঝোল এবং আনারস, ডালিম, কমলালেবু প্রভৃতি ফলের রস চিকিৎসকের উপদেশ মত খাইতে দিবে। সাগু, বার্লি, এরারুট প্রভৃতি দুধের ও মিছরির সহিত কিম্বা কাগজিলেবুর রস ও লবণের সহিত মিশাইয়া দিলে রোগীর খাইতে ভাল লাগে এবং সহজে হজম হয়। দুধের সহিত পরিষ্কার চূণের জল মিশাইয়া দিলে দুধ সহজে হজম হয়। পেটের অসুখের রোগীর দুধ অপেক্ষা দধি ও ঘোল সহজে হজম হয়। হাঁপানী রোগীকে রাত্রে লঘু আহার করান উচিত। শোথ রোগে লবণ যত কম খাওয়া যায় তত ভাল। বাতে নিরামিষ আহার ও বহুমূত্র রোগে চিনি ত্যাগ করা উচিত। বাতশ্লেষ্মা, বিকার প্রভৃতি রোগে চিকিৎসকের আদেশ ব্যতীত কিছুই খাইতে দেওয়া উচিত নয়। শোথ ব্যতীত অন্য সকল রোগে জলপান বিশেষ উপকারী।

(৩) ঔষধ খাওয়ান ও জ্বর দেখা—

চিকিৎসক যে সময় যে ঔষধ খাওয়াইতে বলিবেন ঠিক সেই সময় রোগীকে সেই ঔষধ দিতে হইবে। তিক্ত ঔষধ খাওয়াইবার পূর্ব্বে রোগীকে একটু সুপারি কিম্বা হরীতকী চিবাইতে দিলে ঔষধ বেশী তিক্ত লাগে না। বিস্বাদ বড়ী কিম্বা পুরিয়া পাকা কলা চটকাইয়া তাহার মধ্যে দিলে রোগী সহজে গিলিয়া ফেলিতে পারে। থারমমিটার যন্ত্রের যেখানে তীর আঁকা আছে অর্থাৎ ৯৮·৪ ডিগ্রী উত্তাপ শরীরের পক্ষে স্বাভাবিক। শরীরের তাপ তীরের নীচে চলিয়া গেলে কিম্বা ১০৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিলে আশঙ্কার কারণ হয় এবং চিকিৎসককে জানান উচিত। —স্বাস্থ্য।

নারী হরণ নিবারণের জন্য ছাত্রদের সভা—

সম্প্রতি স্থানীয় হার্ডিঞ্জ হষ্টেলের ছাত্রেরা এক সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন—

১। বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ যে সব স্থানে অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে সেই সব স্থানে আত্মরক্ষার জন্য "নারী রক্ষা সমিতি" স্থাপন করিতে হইবে।

২। সব বিদ্যালয়ে, এমন কি বালিকাবিদ্যালয়েও, বাধ্যতামূলক ব্যায়াম-শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

৩। দুর্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও অপমানিত রমণীদিগকে সসম্মানে সমাজে আশ্রয় দিতে হইবে।

৪। অবরোধ প্রথা উঠাইয়া দিয়া বাঙ্গালার স্ত্রীলোকদিগকে আত্ম-নির্ভরশালিনী হইবার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

৫। স্ত্রীলোকেরা যাহাতে সর্ব্বদা তাঁহাদের কাছে একখানি করিয়া তীক্ষ্ণধার কৃপাণ রাখেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।'

—সময়।

আমাদের সমাজে নারীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই—

এক কথায় পুরুষ যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ভোগ করছে নারীকেও আমরা সেই স্বচ্ছন্দ ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী দেখতে চাই। পুরুষেরা কোনো দিন তা নারীকে দিবে এবং দিলেও নারীরা সত্যি পাবে, এ বিশ্বাস আমাদের নেই। নারীকেই স্বাধিকার অর্জ্জন করতে হবে, তা ছাড়া আর কোন পথ নেই। যুগ-যুগান্ত ধরে নারী ধীরে ধীরে তার অধিকার (যা' আগে কোনোদিন কোথাও ছিল কি না জানা নেই) ফিরে পাবে এ ভরসা আমাদের নেই। অকস্মাতের দাবীই পৃথিবীতে সবার চেয়ে বড় দাবী। নারী একদিনেই তার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে ও করবে। সনাতন অচলায়তন একদিনের ভূমিকম্পেই ধ্বসে যেতে পারে; যুগান্তকালের পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা একদিনের দাবানলেই সাফ হতে পারে—দিনে দিনে তিলে তিলে তার ক্ষয় হবার সম্ভাবনা নেই। —আত্মশক্তি।

হিন্দুর ঘরে শিশু হত্যা—

প্রতিবৎসর আমাদের হিন্দুর ঘরে যে কত ভ্রূণ হত্যা হইতেছে তাহার খবর বোধ হয় অনেকেই রাখেন না। ১৯২১ সালের সেনসাস্ রিপোর্ট পাঠে জানিতে পারা যায় যে ভারতে বিধবার সংখ্যা প্রায় ২ কোটি তন্মধ্যে বাল-বিধবার সংখ্যা—গণনা হইয়াছে ১৮৮১০৭১ জন। তাহারা কে কি বয়সের তাহা এই তালিকা হইতেই বুঝিতে পারিবেন :—

০	হইতে	১	বৎসরের	৭৫৯ জন।
১	„	২	„	৬১২ „
২	„	৩	„	১৬০০ „
৩	„	৪	„	৩৪৭৫ „
৪	„	৫	„	৮৬৯৩ „
৫	„	১০	„	২০২২৯৩ „
১০	„	১৪	„	২৭৯১২৫ „
১৪	„	২০	„	৫১৭৮৯৮ „
২০	„	২৫	„	৯৬৬৬১৬ „
				১৮৮১০৭১

উপরোক্ত প্রায় দুই কোটি বিধবার সকলেই যে সংযমী, ব্রহ্মচারিণী তাহা নহে। যে বাল-বিধবার পিতা ষাট বৎসর বয়সে ষোড়শীর পাণিগ্রহণ করিয়া পার্শ্বের ঘরে বসিয়া তরুণী ভার্য্যার সহিত আমোদ করিতে পারেন—যে বাল বিধবার ভ্রাতা "লণ্ডন রহস্য" আনিয়া তাহা দ্বারা ঘরের শোভা বর্দ্ধিত করেন এবং যে বাল-বিধবার ভ্রাতৃবধূ সন্ধ্যায় হারমোনিয়ম বাজাইয়া কোকিলকণ্ঠে "এসেছি এসেছি,বঁধু হে নিয়ে এই হাসিরূপ গান" গাইতে পারেন, এমন, ধারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যে বাল-বিধবার দিন কাটাইতে হয়, সে সংসারে তাহার যৌবনের ইন্দ্রিয়-লিপ্সা যদি জাগিয়া উঠে এবং সেই জন্য যদি স্খলিতপদ হয় তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। এই সমস্ত বাল-বিধবাদের অনেকের গর্ভসঞ্চার হয়, যাঁহারা অর্থশালিনী তাঁহারা কাশী কিংবা অন্য কোন দূর তীর্থ (?) স্থানে যাইয়া গর্ভ স্খলন করিয়া আসেন, আর যাঁহাদের সে সাধ্য নাই তাঁহারা কেহ হয় ঔষধের দ্বারা গর্ভ নষ্ট করেন, না হয় গোপনে প্রসব করিয়া সদ্যজাত শিশুসন্তানের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলেন। প্রতিদিন বাঙ্গালার হিন্দুর ঘরে ঘরে যে কত ভ্রূণ হত্যা হইতেছে তাহরে আর ইয়ত্তা নাই। কত রাস্তা, ঘাট, পুকুর, খানার ডোবায় মুমূর্ষ শিশুর দেহ পাওয়া যাইতেছে। এই যে প্রতি বৎসর হাজার হাজার ভ্রূণ হত্যা হইতেছে, এই যে প্রতিদিন দুই কোটী বাল-বিধবা একবেলা এক মুষ্টি ভাত চোখের জলে মিশাইয়া খাইতেছে, এই যে প্রতিদিন ২ কোটি বাল-বিধবাকে জীবন্তে দগ্ধ করা হইতেছে, ইহাদের জন্য প্রাণ কাঁদিতেছে কয়জনের? এই যে এক কলিকাতা সহরে ৮৮৩৬ জন বারাঙ্গনা বিরাজ করিতেছে, ইহাদের গর্ভধারিণীরা সমাজের কোন্ ক্রটিতে, কি লাঞ্ছনায় আজ বারবনিতা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে তাহা কেহ তাকাইয়া দেখিয়াছেন কি?

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

পরাশর সংহিতায় এই অনুশাসন কি তালপত্রে লিপিবদ্ধ রাখিবার জন্য রচিত হইয়াছিল? স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় কি উন্মাদ ছিলেন?

যাদের ঘরে ঘরে প্রতিদিন ২ কোটি বাল-বিধবা জীবন্ত আগুণে পুড়িয়া মরিতেছে, প্রতিদিন শত শত ভ্রূণ হত্যার শোণিত যে দেশকে কলঙ্কিত ও রঞ্জিত করিতেছে, সে দেশের অবস্থা কেমন তাহা সহজেই অনুমেয়। এখন কি জাতির শাস্ত্রের যুক্তি তর্ক লইয়া বসিয়া থাকিবার সময়?—না এখন দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকিবার সময়? এই দুই কোটি বাল-বিধবার বিবাহ হইলে দেশে বারাঙ্গনার সংখ্যাও কমিয়া যায়, ভ্রূণ হত্যাও নিবারিত হয় আর ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুজাতি, তোমার বংশ সংখ্যাও বাড়ে। কিন্তু আত্মবিস্মৃত, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর জাতি তোমরা এখনও আপন ভুল বুঝবে কি?

—মজলিস।

নারী

শ্রীজ্যোতিঃ সেন।

জেগেছিলে কোন্ প্রভাতে
কোন্ কুসুমের কোলে,
কোন্ আলোকের চিক্‌মিকিতে
কোন্ বিহগের রোলে?
হৃদয় ভরা স্নেহ প্রীতি
সাত সাগরের জল,
সেবা প্রেমে উজল হ'য়ে
করছে গো টলমল;

পারবে কি তায় দিতে তুমি
রিক্ত করি বুক,
করতে সবুজ নিখিল ভূমি,
আনতে বিপুল সুখ?
তবেই তুমি ভারত নারী,
ধরায় তুমি দেবী,
আকাশ, আলো, বাতাস, বারি
ধন্য তোমায় সেবি।

প্রত্যাবৃত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(৫)

আজ কয়েকদিন নাতবউয়ের ব্যবহার সারদার বড়ই অসহ্য বলিয়া বোধ হইতেছিল। তিনি প্রথম দিন দেখিলেন সে তাঁহার গৃহেই শয়ন করিল। দুইদিন পরে যখন তিনি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন সে উত্তর দিল না। বেশী পীড়াপীড়ি করাতে কাঁদিতে লাগিল। শরীর অসুখ করিয়াছে ভাবিয়া তিনিও আর কিছু বলেন নাই।

কিন্তু দেখিতে লাগিলেন সে সর্ব্বতোভাবে অসীমের সংস্রব ত্যাগ করিয়া চলিতেছে। অসীম যেদিকে থাকে সে সেদিকেও যায় না। অসীমের জল, পান দাসীর হাতে দিয়া চালান করে। সেদিন তাঁহার কাছেই সে বসিয়াছিল এবং তাঁহার পাকাচুল তুলিয়া দিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতেছিল; সেই সময় দাসী আসিয়া বলিল "দাদাবাবু বললেন তাঁর জামা আছে বাক্সের মধ্যে, সেটা এখনি বার করে দিতে হবে।"

তাহার কথা শুনিয়া সেবিকা ঝনাৎ করিয়া চাবীটা তাহার সামনে ফেলিয়া দিল। বিস্মিতা দাসী বলিল, "কোন্ চাবী তা আমি কি করে জানব?"

সেবিকা তাহার মধ্য হইতে একটা চাবী আলাদা করিয়া দিল।

দেখিয়া সারদা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "তা, না হয় তুমিই গিয়ে দিয়ে এসো না কেন বাপু। কি হয়েছে তোমার, এরকম ভাব হয়েছে কেন?"

সেবিকা মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল; সারদা এত বলিলেন সে কিছুতেই উঠিল না। ওদিকে অসীম জামার জন্য খুব গোলমাল করিতেছিল—"না হয় চাবিটাই নিয়ে আয় না ঝি, আমি নিজেই জামা বার ক'রে নিচ্ছি।"

দাসী চাবি লইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। সারদা রুদ্ধরোষে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেবিকা খানিক তাঁহার কাছে মাথা নত করিয়া বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

নির্জ্জন একটা ঘরে সে মনের রুদ্ধ উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিয়া সামান্যা বালিকার ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। হায়! কে জানিবে কেন সে অসীম যেদিকে থাকে সেদিকে যায় না? অসীম যে তাহাকে দেখিলে গম্ভীর হইয়া যায়, তাহার মুখে স্পষ্ট বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠে।

অসীমকে সে কত ভালবাসে তাহা সে কেমন করিয়া বুঝাইবে? এ সংসারে কেই বা তাহা অনুভব করিবে?

আজ প্রথম সেবিকার মনে হইল সে মরিয়া গেলে বোধ হয় ভাল হইত। অসীম স্বচ্ছন্দে দীপালিকে বিবাহ করিয়া আনিয়া সুখী হইতে পারিত, সংসারের সকলেই সুখী হইত। আজ এই প্রথম মরিবার ইচ্ছা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল।

তখনি সে চমকাইয়া উঠিল,—না না, মরিবে সে কেমন করিয়া? মরিবার পথ যে তাহার বন্ধ! সে স্বেচ্ছায় সেবার ভার হাতে করিয়া লইয়াছে, মরিলে কে সকলের সেবা করিবে?

বৃদ্ধ শ্বশুরের কথা ভাবিয়া তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। প্রকৃত স্নেহ লাভ করিয়াছে সে ইঁহারই কাছ হইতে, তিনি যে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছেন তাহার উপরে। তাহার সেবা না পাইলে তিনি যে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিবেন। না, মরিবার কল্পনা করাও তাহার পক্ষে পাপের কাজ হইয়াছে।

সেই মূহুর্ত্তে সরিতের কথা মনে পড়িল। সরিত বলিয়াছে স্বামীকে সুখী করাই রমণী-জীবনে শ্রেষ্ঠ কাজ। সকল সেবার শ্রেষ্ঠ সেবা স্বামী-সেবা।

সে কই, স্বামীকে তো একটী দিনের জন্যও সুখী করিতে পারে নাই। দিনের পর দিন কেবল দুঃখই দিয়া আসিয়াছে। সংসারে স্বামীস্ত্রী রূপে পরিচিত হইয়াও তাহারা যেমন অপরিচিত এমন আর কেহ নাই। দুইজনে এত কাছে বাস করিয়াও কেহ কাহারও নিকট একটু স্নেহের দাবী করিতে পারিতেছে না।

ইহার চেয়ে একেবারে দূরে সরিয়া যাওয়া কি ভাল নহে? হাঁ, সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। দীপালির সহিত অসীমের বিবাহ দিতেই হইবে। হয়তো তাহার প্রতি কর্ত্তব্য মনে করিয়াই অসীম দীপালিকে গ্রহণ করিয়া সুখী হইতে পারিতেছে না, মুখ ফুটিয়া কোন কথা কহিতে পারিতেছে না। এ সঙ্কোচ ভাঙ্গিয়া দেওয়া তাহারই কর্ত্তব্য। স্বামী ইহাতে সুখী হইবেন, তাঁহার সুখ দেখিয়া সেও সুখী হইবে নিশ্চয়।

সম্মুখে এই একটা লক্ষ্য স্থির করিয়া সে প্রাণে বড় শান্তি অনুভব করিল। তাহার চোখের জল পড়িতে পড়িতে শুকাইয়া গেল। উর্দ্ধপানে চাহিয়া সে অস্ফুটস্বরে বলিল "দেখো মা, যেন নিজের কর্ত্তব্য পালন করে যেতে পারি, যেন নিজেকে এই আবর্ত্তের মাঝে না ডুবিয়ে ফেলি।"

সারদা তাহাকে শুনাইয়া দিবার জন্য আরও অনেক কথা ঠিক করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার খুব জ্বর আসিল। জ্বরের আক্রমণে তিনি জানিতেও পারেন নাই সেবিকা কোন ঘরে থাকিল।

কয়েকদিন জ্বরের আতিশয্যে তিনি অচৈতন্য-প্রায় পড়িয়া রহিলেন। বৃদ্ধ বয়সে, বিশেষ তাঁহার মত স্থবিরার পক্ষে জ্বর হইলে তাহা কাটাইয়া উঠা বড় কঠিন। ললিতবাবু অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই হইল। বৃদ্ধার জ্বর শেষে বিকারে পরিণত হইবার মত হইল।

রাত্রিতে একটু জ্ঞান হইলে তিনি চাহিয়া দেখিলেন মাথার কাছে বসিয়া সেবিকা তাঁহার মাথায় আইসব্যাগ ধরিয়া আছে। চকিতে তাঁহার মনে হইল অসীমের সহিত সেবিকার বিবাদ এখনো মেটে নাই। সেবিকা যে এখনও বসিয়া আছে ইহাতে তিনি একটু রাগের সহিত বলিলেন "হ্যাঁ নাতবউ, রাত এত হয়েছে এখনও যাওনি শুতে? ঝিকে বল আমার কাছে থাকতে, তুমি যাও বলছি।"

সেবিকা নড়িল না।

অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে তিনি বলিলেন "আমার কথা বুঝি কাণে ওঠে না তোমার? তুমি যাবে কিনা বল দেখি?"

সেবিকা নিজের মনে কাজই করিয়া যাইতে লাগিল।

অসহিষ্ণু ভাবে সারদা তাহার হাত হইতে আইসব্যাগটা ছিনাইয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, তীব্র কণ্ঠে বলিলেন "ভগবান কবে যে আমার মরণ দেবেন আমি তাই ভাবি। পোড়া যম সবাইকে নেয়, আমায় কেন নেয় না?"

ঝি কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, ব্যাপার দেখিয়া সে অসীমকে সংবাদ দিতে ছুটিল।

অসীম আসিতেই সেবিকা সরিয়া দাঁড়াইল।

অসীম তাহার পানে লক্ষ্য না করিয়া সারদার পানে চাহিয়া ঔৎসুক্যের সহিত বলিল "কি হয়েছে ঠাকুর মা? হটাৎ আইসব্যাগটা অমন করে টেনে ফেলে দিলে কেন?"

সারদা ফিরিয়া শুইয়া একটা দম লইয়া বলিলেন "আমার আর ভালো লাগে না বাপু। এবার তো মরবই। যাবার আগে যদি তোরা এমনি করিস, মরার পরেও যে শান্তি পাব না আমি।"

অসীম তীব্র ভাবে পত্নীর পানে চাহিল, তাহার পর বলিল, "কিছু হয়নি তো ঠাকুরমা। যদি কিছু মনে ভেবে থাক, সব মিছে। তোমার অসুখ বলেই আমি ওকে তোমার সেবা করতে এখানে রেখেছি। রোগের সময় যে যা বলবে তাই শুনতে হবে। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, দেখতে হবে না, আমরা যা করি তাই দেখে যাও শুধু।"

সারদা চুপ করিয়া রহিলেন। অসীম বাহিরে যাইবার সময় স্ত্রীর পানে লক্ষ্য করিয়া বলিল "বাইরে এসো, একটা কথা শোনো।"

বাহিরের বারাণ্ডায় একটা আলো জ্বলিতেছিল। সেবিকা বাহিরে আসিয়া দেখিল অসীম আলোর কাছে তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। স্ত্রীকে দেখিয়া ফিরিয়া বলিল "এ সব কথা ঠাকুরমার কাছে বলা হয়েছে কেন?"

সেবিকা সকল আঘাত সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সে শান্তভাবে বলিল "আমি কিছু বলি নি।"

তীব্রকণ্ঠে অসীম বলিয়া উঠিল "না, তুমি বল নি আমি বলেছি, কেমন? সব কথা না জানাতে গেলে হয় না? তফাতে রয়েছ ভালই, আবার এ সব গোল বাধাবার মানে কি?"

সেবিকা এবারও চুপ করিয়া গেল, একটা উত্তরও করিল না।

অসীম অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল "যার লজ্জা নেই তাকে কেউ কি লজ্জা করিয়ে দিতে পারে? নিজের মুখ দেখাতে যদি লজ্জা না হয়, স্বচ্ছন্দে তুমি সকলের সঙ্গে বলে বেড়াও গে, কোনও আপত্তি নেই তাতে। তোমার মত মেয়েরা কিছুতেই যে লজ্জা বোধ করবে না, তা আমি বেশ জানি।"

সে চলিয়া গেল। সেবিকা সেখানে খানিক দাঁড়াইয়া রহিল। স্বামীর কথার অর্থ সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না।

ধীরে ধীরে সে আবার গৃহে ফিরিল। দাসী তাহার পানে চাহিয়া বলিল "আপনি আবার এলেন যে বউ মা"

"আমার ইচ্ছে। তুই যা ঘুমাতে" বলিয়া সে পাখাখানা তার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া সারদার কাছে বসিল।

দাসী খানিক হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল "আপনি আজ ক'রাতই তো জেগে কাটাচ্ছেন; আমি একদিন থাকলে—"

বাধা দিয়া সেবিকা বলিল "তোকে বেশী ব'কতে বারণ করছি ঝি। এখনি ঠাকুরমার ঘুম ভেঙ্গে যাবে এ ঘরে বেশী কথাবার্ত্তা বললে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যা।"

দাসী আর কথা কহিতে সাহস করিল না। দরজা ভেজাইয়া দিয়া সে চলিয়া গেল।

(৬)

সারদার অবস্থা যেদিন খারাপ হইয়া গেল, সেদিন হেমলতা বারাণ্ডায় পা ছড়াইয়া বসিয়া বেশী করিয়া দোক্তা দিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন "এ আমি আগেই জানি। এদানী মা যেমন খিটখিটে হয়েছিলেন তাতে সবাই জানতে পেরেছে। যাক, এখন সবগুলিকে বর্ত্তমান রেখে আস্তে আস্তে সরে যান, গঙ্গায় হাড়খানা পড়ুক।"

তাঁহার কথা গুলো খুব ভাল হইলেও অসীমের গায়ে কশাঘাতের মত লাগিল। তথাপি সে একটা কথাও কহিল না। ললিতবাবু গৃহ মধ্যে ছিলেন, বাহির হইয়া একটু রাগের ভরে বলিলেন "কথা গুলো এখনকার সময়ের মত একটুও নয়। বুঝতুম, যদি তুই একটা সেবার কাজ করেও বলতে।"

ঝঙ্কার দিয়া হেমলতা বলিয়া উঠিলেন "কি সেবার কাজ করতে যাব আমি? ও ছুঁড়ির যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই তাই ওই রোগীর মেথরের

কাজ পর্য্যন্ত করছে। আমায় কি তাই করতে বল তুমি ?"

ললিতবাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন "দরকার হ'লে সবই করতে হয়। মেথরের কাজও করতে হয়, আবার ব্রাহ্মণ হয়েও চলতে হয়। সময় যখন যেমন আসবে তেমনি ভাবে তার ব্যবহার করবে, এই হচ্ছে মূল কথা।"

রাগ করিয়া হেমলতা উঠিয়া গেলেন। সেবিকা তখন নিদ্রিতা সারদার মাথার কাছে বসিয়া বাতাস করিতেছিল, ঝড়ের মত সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া হেমলতা বলিয়া উঠিলেন "উঠে যাও তুমি, আমি দেখব এবার থেকে সব। দেখি পারি কিনা! সবাই আমায় এত হেনস্থা করবে কেন? আমি কি কিছু পারি নে? করবার লোক আছে বলেই করি নে; যদি তুমি না থাকতে, আমারই কি করতে হ'তো না সব? এর জন্যে এত কথা কেন?"

কথায় কথায় অভিমানিনী হেমলতার চোখে জল আসিত। তিনি চোখ মুছিতে লাগিলেন। সেবিকা অবাক হইয়া গেল; বলিল "কে কি বলেছে তোমায় মা? আমরা কেউ ত কোনও কথা তোমাকে বলি নি।"

দীপ্তভাবে হেমলতা বলিলেন "থাক্ গো থাক্, আর গোড়া কেটে আগায় জল ঢালতে হবে না। সব এক কাট্টা আমি কি আর বুঝি নে? যাও বাছা উঠে যাও, আমি কাজ করতে পারি কিনা দেখ।"

সেবিকা হেমলতাকে বিলক্ষণ ভয় করিত। তাঁহার কথা শুনিয়া আস্তে আস্তে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে জানিত হেমলতা যাহা বলিবেন তাহা আর ছাড়িবেন না। তাঁহার জেদ বড় বেশী ছিল, তথাপি সে দীনভাবে আর একবার বলিল "কেন মা আপনি আবার এলেন? আমি তো রয়েছি, তবে—"

অসহিষ্ণু ভাবে হেমলতা বলিয়া উঠিলেন "হয়েছে হয়েছে, ঢের হয়েছে। মাপ কর বাছা, তোমার হাতে ধরছি যাও তুমি।"

সেবিকা বাহির হইয়া আসিল।

আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, হেমলতা উঠিলেন না। স্বামীর উপর রাগ করিয়া জোরে বাতাস করিতে লাগিলেন। দাসী আসিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল "খাবেন চলুন মা, বামুন ঠাকরুণ ভাত বেড়ে বসে আছেন।"

হেমলতা হাতের পাখাখানা উঁচাইয়া বলিলেন, "বেরো হারামজাদি। ভাত তুলতে ব'ল্‌গে যা, আমি খাব না।"

ভয়ে সে পলাইল। সেবিকার কাছে গিয়া সে এ কথা জানাইল। সেবিকা সভয়ে হেমলতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হেমলতা তাহার পানে একবারও চাহিলেন না।

সেবিকা একবার ডাকিল "মা।"

হেমলতা উত্তর দিলেন না।

সেবিকা আবার ডাকিল "মা উঠুন, খাবেন চলুন ভাত শুকিয়ে গেল যে।"

হেমলতা উত্তর দিলেন না। সেবিকা এত সাধ্য সাধনা করিল, কিন্তু হেমলতা নিরুত্তর।

বেগতিক দেখিয়া সে ললিতবাবুকে সংবাদ দিল।

সেদিন রবিবার। স্ত্রীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় খুব বেশী রকম প্রীত হইয়া তিনি অমৃতবাজার পত্রিকা-খানা গভীর মনোযোগের সহিত পড়িতেছিলেন, অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়ার জন্য চোখে চশমা দিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

সেবিকা তাঁহাকে ডাকিয়া কোনও ভূমিকা না করিয়াই বলিল "বাবা, মা আজ কিছুতেই সেখান হতে উঠ্‌ছেন না। খাবেনও না, কথাও বলবেন না; আপনি একটু বলে দেখুন না—আমি তো হার মেনে গেছি।"

ললিতবাবু একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন "ওকে যেতেই বা কে সেধেছিল যে তাতো বুঝতে পারি নে। এমন দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির স্ত্রীলোক বোধ হয় দ্বিতীয়টী দেখা যায় না। কি করব, যখন বিয়ে

করেছি তখন কর্ত্তব্য পালন করেই যেতে হবে। কি ভুলই করেছি, তখন যদি এ দয়াটুকু না করতে যেতুম।”

কথাগুলি তিনি নিজে নিজেই বলিতেছিলেন ও উঠিয়া কাপড়খানা ভাল করিয়া পরিতেছিলেন। সেবিকা তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া চলিয়া গেল।

হেমলতা ঠিক জানিতেন এইবার স্বামী তাঁহাকে খোসামোদ করিতে আসিবেন। বাস্তবিকই যখন ললিতবাবুকে বারাণ্ডায় উঠিতে দেখা গেল তখন তিনি গভীর মনোযোগের সহিত বাতাস করিতে লাগিলেন।

ললিতবাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার মার গায়ে হাত দিলেন, হাত খানা একবার পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর স্ত্রীর পানে ফিরিয়া বলিলেন “অসীম ডাক্তার ডাক্‌তে গেছে, না?”

হেমলতা উত্তর দিলেন না।

ললিতবাবু যেন সেদিকে নজর না করিয়া চিন্তাপূর্ণ মুখে বলিলেন “আচ্ছা, সে তো গেছে অনেকক্ষণ, বোধ হয় ঘণ্টাখানেক হবে। এখনও ফিরে এলো না, মানে কি?”

এবারও হেমলতার মুখে কথা নাই।

ললিতবাবু তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন “আচ্ছা তোমারই বা ব্যাপারখানা কি? আমি কি তোমায় বলেছি যে রোগীর কাছে এসে তুমি বসে থাক? আমি কি জানি নে যে রোগীর সেবা তুমি করতে পার না? সেই জন্যেই তোমায় ঠাট্টা করে একটা কথা বললুম্. এতে তোমার এতটা রাগ করা কি বড্ড অন্যায় কাজ হয় নি হেম?”

হেমলতা আরও জোরে বাতাস করিতে লাগিলেন, স্বামীর কথার উত্তর দেওয়া যে প্রয়োজনীয় তাহা মনে করিলেন না।

ললিতবাবু মনে মনে বিরক্ত হইলেও পত্নীকে ভয় করিতেন। ক্রোধ ও গাম্ভীর্য্য ভরা সেই মুখখানার পানে চাহিয়া তাঁহার ভয় হইতেছিল; তিনি অনেক খোসামোদ করিলেন, হেমলতা তথাপি নীরব।

ললিতবাবু হার মানিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন “দেখ, হাত জোড় করছি তোমার পদের কাছে। এমন কিছু মন্দ কথা বলিনি যে এতটা রাগ করতে পার। এই নাক কাণ মলছি,” আর কখনও যদি তোমায় একটা কথা বলি। আজকের মত দয়া করে ওঠো, দুটি খেয়ে এসে বসে থাকো দিন রাত্, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই; বউমাকে না আসতে দাও, সে আসবে না। তোমার উপরেই আমি সব ভার দিচ্ছি আজ হতে।”

আবার বউমার নাম শুনিয়া হেমলতা জ্বলিয়া উঠিলেন। ললিতবাবু সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন “বউমা সেবার কাজটা ভাল পারে আর সব জানে শোনে বলেই তার হাতে ভার দিয়েছিলুম। সে সেবা করতে ভালও বাসে তেমনি। যদিও আমি জানছি এ সেবার কাজ হতে বঞ্চিত করে তাকে এক রকম দণ্ডিত করা হল, তবু তোমার জন্যে বাধ্য হয়ে তাও আমাকে করতে হবে।”

এবার হেমলতা আর সহিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন “বটে?” রাগে তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। বউমার প্রতি এত টান তাঁহার অসহ্য!

আশ্চর্য্য ভাবে পত্নীর পানে চাহিয়া ললিতবাবু বলিলেন “কি তুমি বলতে চাও আমি কিছু বুঝতে পারছি নে। যা তোমার মনের ইচ্ছে স্পষ্ট করে বলই না কেন?”

হেমলতা গর্জ্জন করিয়া বলিলেন “থাক্, আর বলার দরকার দেখছি নে। স্পষ্ট বলে ফেললেই হতো যে আমার হাতে রোগী দিয়ে তোমার বিশ্বাস হয় না, পাছে আমি বিষ খাইয়ে মেরে ফেলি! রইল তোমার রোগী, তোমার বউমাকে ডেকে বসাও এখানে, আমি চললুম।”

পাখাখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া তিনি দুপ্‌দাপ্ করিয়া চলিয়া গেলেন। এক কথা বলিতে আর এক কথার উদ্ভব হইল দেখিয়া ললিতবাবু হা করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

হেমলতার স্বভাবটাই এই রকম। কাহারও কথা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। জেদটা তাঁহার খুব বেশী রকমের ছিল। তিনি চান সকলেই তাঁহার নিকট করুণাপ্রার্থী হইবে, তিনি যাহা বলিবেন সকলে তাহা শুনিয়া যাইবে। শুধু এই জন্য সারদার সহিত তাঁহার একদিনও মিল হয় নাই। ললিতবাবু সেবিকার পক্ষ হইয়া স্ত্রীর সহিত যুদ্ধ করিতেন বলিয়া হেমলতা সেবিকাকে মোটেই দেখিতে পারিতেন না। অসীমের উপর তিনি প্রসন্না ছিলেন, তাহার কারণ অসীমও সেবিকাকে দেখিতে পারিত না। মুখে কোনও দিন তাহা সে প্রকাশ না করিলেও তীক্ষ্ণবুদ্ধি হেমলতা তাহার চালচলন দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, তিনি অসীমকে যাহা বলিতেন সে তাহাই বিশ্বাস করিত। অসীম সতীনকাঁটা হইয়াও শুধু এই গুণে তাঁহার আপনার হইয়াছিল।

বেলা প্রায় তিনটার সময়ে অসীম বাড়ীতে ফিরিল। সেবিকার কাছে ঔষধ দিয়া তাহা খাওয়াইবার নিয়ম বলিয়া দিয়া সে ফিরিতেছিল সেই সময় কক্ষ হইতে হেমলতা তাহাকে ডাকিলেন।

অসীম হেমলতার শুষ্ক মুখ ও জলভরা চোখ দুটি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল "আজ আবার কি হয়েছে নতুন মা ?"

হেমলতা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলনে "আমি আজ তোমায় একটা কথা বলতে ডেকেছি বাবা : আমি আর এ সংসারে থাকব না। জানোই তো আমার বাবা আমায় অনেক টাকা দিয়ে গেছেন মরবার সময়। সে সব টাকা ওঁর কাছ হতে আদায় করিয়ে দাও আমাকে, আর একটা বাসা ভাড়া করে দাও, আমি আলাদা হয়ে সেখানে থাকব। তুমি মাঝে মাঝে গিয়ে আমায় দেখে এসো। আমার কেউ নেই বলে সবাই আমায় হেনস্থা করবে ? কেন, আমার কি কোন উপায় নেই ? লক্ষ্মী বাবা আমার, এই কাজটী তোমায় আজ করে দিতেই হবে। কাল আবার তোমার কাছারি আছে, কাল হবে না। আজ বাসা ঠিক করে কাল সকালেই আমি আমার ঝিকে নিয়ে চলে যাব সেখানে। এখানে থাকতে আমি জল গ্রহণও করব না।"

ব্যাপার যে আজ কিছু গুরুতর তাহা অসীম বুঝিল। সে বলিল "ব্যাপার কি আগে আমায় বল। এত বড় সহরে একটা বাসা পাওয়া কিছু কঠিন কাজ হবে না। আমি এখনই গিয়ে সব ঠিক করে দিচ্ছি।"

হেমলতা রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "বউমার পক্ষ হয়ে রোজ যে উনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসবেন তা আমি কোনও ক্রমে সহ্য করতে পারব না। উনি আস্কারা দিয়ে দিয়েই তো বউকে মাথায় তুলছেন। কোন্ দিন আবার বউয়ের মুখে কি অপমানের কথা শুনতে পাব ঠিক কি ? আগে হতে সরে যাওয়াই ভালো তার চেয়ে।"

অসীম ঠিক ধারণা করিয়া লইল দোষটা সেবিকারই। সে নিজে তাহার দোষ দেখিতে পায় বলিয়া তাহাকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না। পিতা যে সেবিকার পক্ষ হইয়া বিবাদ করিতে আসেন ইহা অত্যন্ত অন্যায়। সে ভাবিল, ভাল মানুষ পিতা সেবিকাকে আজও চিনিতে পারেন নাই। সে যে কত বড় সয়তানী তাহা না জানিতে পারিয়া তিনি তাহাকে ভালবাসেন। পিতার চক্ষু ফুটাইয়া দেওয়া দরকার।

উপস্থিত হেমলতাকে প্রবোধ দিয়া বলিল "নতুন মা, আমি তোমার ভালর জন্যেই বলছি, এখন এ গোলমালটা কোর' না। ঠাকুরমার অবস্থা ভারি খারাপ, এখন বাড়ী ছেড়ে গেলে এত নিন্দে হবে তোমার তা আর বলতে পারি নে। সঙ্গে সঙ্গে লোকে আমাকেও নিন্দে করবে, কেন না আমি তোমার বাসা ঠিক করে দেব। বাবারও মনটা খারাপ রয়েছে, কেমন করে তাঁকে এখন টাকার কথা বলি ? আমার মতে দুচার দিন বাদে যা হোক তোমার বন্দোবস্ত একটা ঠিক করে দেবই।"

হেমলতা ভাবিয়া দেখিলেন কথাটা যথার্থ।

তিনি এত জেদি হইলেও লোকনিন্দার ভয় তাঁহারও ছিল।' বলিলেন, "তবে তাই ভাল।"

অসীম বলিল, "শুধু শুধু উপোস করে থেকে কষ্ট পাচ্ছ কেন নতুন মা? তুমি না খেলে কার কি ভেবে দেখ দেখি। সকলেই বেশ খেয়েছে, কষ্ট পাচ্ছ কেবল তুমিই। যাও খেয়ে নাও গে। অমন করে আত্মাকে কষ্ট দিতে নেই।"

হেমলতা ভাবিয়া দেখিলেন ঠিকই ত; যাহাদের উপর তাঁহার রাগ, তাহারা দিব্য খাইয়াছে; না খাইয়া কষ্ট পাইতেছেন কেবল তিনিই। অসীমের পানে চাহিয়া বলিলেন "তুমি বলে যাও বামুন-ঠাকরুণকে এ ঘরে আমার ভাত দিয়ে যেতে।"

আসল কথা তিনি একবার তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া আবার নিজে ডাকিতে লজ্জা বোধ করিতে-ছিলেন। অসীম তাহা বুঝিল এবং যাইবার সময় বামুনঠাকুরাণীকে আদেশ দিয়া গেল।

সেবিকার উপর সে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইহার প্রতিবিধানের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। উপস্থিত ঠাকুরমায়ের ব্যারাম বলিয়া কিছুই সে করিতে পারিল না।

পরদিন সকালবেলা বৃদ্ধা সারদা ইহসংসার হইতে সরিয়া গিয়া সকলের পথ সরল করিয়া দিলেন।

(ক্রমশঃ)

নারী-সৌন্দর্য্য

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্য-সাংখ্যতীর্থ বি, এ।

ভগবান গীতায় বলেচেন—"শ্রী বাক্‌চ নারীনাম্" অর্থাৎ নারীদিগের শ্রী ও বাক্যের মধ্যে আমি বিরাজমান।

বাস্তবিক কথা এই, নারীর শ্রী ও বাক্যের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য, তাকে প্রকাশ করতে পারে এমন শক্তি পুরুষের নেই। গলা যতই সাধ আর শরীরটাকে যতই ঘস আর মাজ নারীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য পুরুষের কৃত্রিম সৌন্দর্য্য অপেক্ষা বেশী হবেই।

শ্রী বা সৌন্দর্য্যের সঙ্গে রূপের সহযোগ আছে বটে কিন্তু রূপই যে সৌন্দর্য্য তা কেউ যেন না মনে করেন; তবে রূপ সৌন্দর্য্যের সহায়ক ও পরিপোষক একথা সকলেই স্বীকার করেন। আবার এ কথা ঠিক যে রূপ না থাকলেও সৌন্দর্য্য থাকতে পারে।

গীতায় ভগবান দান-ধ্যান, আহার-বিহার প্রায় সব বিষয়কে তিনভাগে ভাগ করে দিয়েছেন, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনের মাপ-কাটীতে। তবে তিনি সৌন্দর্য্যকে তিনভাগে ভাগ কর্ব্বার অবসর পাননি। খুব সম্ভব সেই সময় কৃষ্ণার্জ্জুনের দিকে শত্রুপক্ষ হ'তে বাণবৃষ্টি হ'তে থাকে আর ভগবান বাধ্য হয়ে তাড়াতাড়ি ক'রে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত ক'রে ফেলেন। অবশ্য এটা আমার অনুমান মাত্র আর আমি এই অনুমান কচ্চি আত্মরক্ষার জন্য।

যাক্ সে কথা। সৌন্দর্য্য কয় প্রকার? না, তিন প্রকার—সাত্ত্বিক সৌন্দর্য্য, রাজসিক সৌন্দর্য্য ও তামসিক সৌন্দর্য্য। নারীর মধ্যে যে যে সময় সাত্ত্বিক সৌন্দর্য্যের প্রকাশ পায় তাঁর মোটামুটি দুই একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্।

স্নান কর্ব্বার পর এলোচুলে ফর্সা কাপড় প'রে থাকলে নারীর মধ্যে এই সাত্ত্বিক সৌন্দর্য্য স্ফুটতর রূপে দেখা দেয়। আবার এই সৌন্দর্য্য আরো বৃদ্ধি পায় কাপড়খানা যদি হয় গরদের, আর এই গরদের কাপড় প'রে সে যদি ঠাকুরঘরে পঞ্চপাত্রী পুষ্পপাত্রী প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

অবশ্য সাত্ত্বিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলে এই ভাবটা আপনি ফুটে উঠেই। এই সৌন্দর্য্যের আর একটা বড় মধুর অবস্থা লক্ষ্য করেচি—মা যখন তার প্রথম বুকের ধনকে বুকে চেপে রেখে, বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে থাকেন তখন যে পবিত্র মধুর সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয় তা বুঝি অপর কোন অবস্থাতেই প্রকাশ পায় না। ছেলে বিছনায় শুয়ে আনন্দে মেতে আছে, মা একটু অবসর পেলেই রান্নাঘর হ'তে ছুটে এসে, ছেলের শরীরের উপর ঝুঁকে প'ড়ে নিজের মুখ ছেলের মুখে রেখে, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরছেন ছেলেও একহাতে মায়ের চুলের ঝুঁটী ধ'রে, আর এক হাত দিয়ে মাকড়ীটা টান্‌তে টান্‌তে আধ-আধ স্বরে বলচে "মা! মা! মা!" মা সেইরূপ ভাবে থেকেই বল্‌চেন, "কি! কি! কি!" এমন সময় ডাক পড়ল, "বৌ, একবার রান্নাঘরে শীগ্গির এস ত।" মা অমনি এক সেকেণ্ডে ছেলেটাকে দুশবার চুমু খেয়ে, সজোরে একবারে ছুটে পালিয়ে গেলেন। মাতৃত্বের প্রথম অভিব্যক্তির এই সৌন্দর্য্য যার নয়নকে তৃপ্তি দিতে পারেনি তার নয়নের সার্থকতা আছে ব'লে আমাদের মনে হয় না।

সাত্ত্বিক সৌন্দর্য্যের আর একটা অবস্থা আছে যেটাকে বোঝাতে হ'লে দুএকটা অবান্তর কথা পাড়তে হবে। একখানা ইংরেজী বইএ পড়েছিলাম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-মহিলার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পার্থক্য এই যে প্রাচ্য-মহিলার পুরুষের সঙ্গে কথা কইবার সময় তার মধ্যে sex consciousness পুরা মাত্রায় বজায় থাকে আর পাশ্চাত্য-মহিলার মধ্যে এভাব আদৌ থাকে না। অর্থাৎ প্রাচ্য-মহিলা কথা কহিতে কহিতে সর্ব্বদাই ভাবে, "আমি মেয়ে মানুষ, এবং কথা কইচি একজন পুরুষের সঙ্গে." তখন এই ভাবটা তার মুখে বেশ ফুটে ওঠে। ইংরাজ-লেখক বলেচেন, "ভূমধ্যসাগরের এপার হতে জাপান পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই মেয়েদের এই অবস্থা অর্থাৎ অবনতমুখী হয়ে তারা কথা কয়। সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের মেয়েদের অবস্থা আমি জানি না কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ে যে সত্যি সত্যি sex-consciousnessএ ভরপুর থাকে একথা খুবই সত্য এবং আমার চক্ষে এই অবস্থাটাও সাত্ত্বিক সৌন্দর্য্যের প্রকাশক।

সাত্ত্বিক সৌন্দর্য্যের আরও অনেক লক্ষণ আছে তন্মধ্যে—একটা যৌবনের প্রারম্ভে মেয়েদের মুখে অকারণে হাসি ফুটে ওঠা। অলঙ্কার শাস্ত্রে আছে, "হসিতং তু বৃথাহাসঃ যৌবনোদ্ভেদসম্ভবঃ"; মেয়েদের চৌষট্টীরকম হাব-ভাবের মধ্যে "হসিত" বলে একটা হাব-ভাব আছে, যেটা হচ্চে "বৃথাহাস"। আমাদের বাঙ্‌লা-সমাজে ঘরে ঘরে যে ছোট-ছোট বোনগুলি আছে তারা সুখে দুঃখে সব অবস্থাতেই এই হাসি নিয়ে সংসার আলো করে রেখেছে। এদের এই 'বৃথাহাস' না থাকলে সংসার নিশ্চিত্ত হয়ে উঠ্‌তো, বিজন অরণ্যে পরিণত হ'তো।

এই গেল সাত্ত্বিক সৌন্দর্য্যের কথা। এবার রাজসিক সৌন্দর্য্যের কথা বলি। রাজসিক সৌন্দর্য্য, নারীর মধ্যে বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না, ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে যায়, চপলার মত দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে যায়। কাজেই দর্শকও এ সৌন্দর্য্য বেশীক্ষণ উপলব্ধি কর্ত্তে পারে না। মুক্ত কেশরাশিতে সাত্ত্বিক সৌন্দর্য্য থাকে কিন্তু সেই কেশে চিরুণী উঠলেই তাহা রাজসিক হয়ে দাঁড়ায়। বেশভূষা অলঙ্কারে রাজসিক সৌন্দর্য্যই প্রকাশ পায় কারণ এই সৌন্দর্য্য দর্শকের চিত্তে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। নারীর চোখের জলটাও রাজসিক সৌন্দর্য্যের লক্ষণ, তা সে দুঃখ শোক থেকেই হোক আর আনন্দের আতিশয্যেই হোক। দেবর বা ভগ্নীপতিকে নিয়ে আলাপ কর্ব্বার সময়, স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য-কলহ কর্ব্বার সময়, নারীর মধ্যে যে সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে সে সবই হচ্চে রাজসিক কারণ তার মধ্যে আকর্ষণ থাকলেও সে ক্ষণস্থায়ী, অল্প সময়ের মধ্যেই সে দৃশ্য দর্শকের মন হতে বিলীন হয়ে যায়।

এরপর রইল তামসিক সৌন্দর্য্য। এই সৌন্দর্য্যের

দুই একটা লক্ষণ পূর্ব্বে বলেছি বাকীগুলো পাঠকের বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তির উপরই চাপান রহিল। এই সৌন্দর্য্য এতদিন লোকে লুকিয়ে রাখতো, সমাজ-চক্ষুর গোচরে আনতে দিত' না কিন্তু আজকাল' বাঙলায় মাসিক ও সাপ্তাহিকের কৃপায় এই সৌন্দর্য্য চারিদিকেই ছড়িয়ে পড়ছে, যাদের ইচ্ছে যায় কলিকাতার কয়েকখানি মাসিক সাপ্তাহিকের পাতা ওলটালেই এই সৌন্দর্য্য দেখতে পাবেন।

আসামদেশীয় মহিলাদিগের সামাজিক প্রথা

আসাম পর্য্যটক—শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী।

(৩)

ব্রত—গ্রাম্য ভাষায় ইহাকে "বর্ত্ত" বলা হয়। ইহার অর্থ—স্বর্গসুখ বা ধনাদি কামনায় নিয়মিত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান। বঙ্গীয় উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু রমণীগণ অনন্ত চতুর্দ্দশী ব্রত, দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত, অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত, সাবিত্রী ব্রত, কাত্যায়ণী ব্রত, শিবরাত্রি ব্রত, একাদশী ব্রত প্রভৃতি পালন করিয়া থাকেন। ভাদ্র মাসের শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথিতে অনন্ত ব্রত, শুক্লাষ্টমী তিথিতে দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত, চান্দ্র বৈশাখ মাসের শুক্ল তিথিতে অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত, জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে সাবিত্রী ব্রত, কার্ত্তিক মাসের শুক্লাষ্টমীতে কাত্যায়ণী ব্রত, ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথিতে শিবরাত্রি ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দূর্ব্বা ঘাস দ্বারা দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত উদ্‌যাপন হইয়া থাকে। ইহার সম্যক্ বিবরণ ভবিষ্য পুরাণে বিবৃত আছে। কথিত থাকে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সত্য যুগের উৎপত্তি হইয়াছিল। কাত্যায়ণী ব্রতানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য—শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পতি লাভ করা। কাত্যায়ণী শব্দের অর্থ "দূর্গা"। মহর্ষি কাত্যায়নই সর্ব্বাগ্রে ইঁহার পূজা করেন। একাদশী দ্বিবিধ—শুক্লা ও কৃষ্ণা। যে সময় সূর্য্যের দৃষ্টি হইতে চন্দ্রের একাদশ কলা (Phase) বহির্গত হইয়া যায় সেই সময় "শুক্লা একাদশী" এবং যে সময় চন্দ্রের একাদশ কলা সূর্য্যের দৃষ্টিপথে প্রবেশ করে, সেই সময় "কৃষ্ণা একাদশী" হয়।

অসমীয়া ব্রাহ্মণ, খাৰ্ত্তি কায়স্থ ও কামরূপ ও গোয়ালপাড়া অঞ্চলের দৈবজ্ঞ (গণক) জাতির বিধবারা "অম্বুবাচী ব্রত পালন করিয়া থাকেন। এই ব্রত বাঙ্গালাদেশে কেবল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য জাতির বিধবাদিগের মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পূর্ব্বে বৈদ্য জাতির বাস ছিল না। ইদানীং কর্ম্মোপলক্ষে জনকয়েক বৈদ্য সেখানে গিয়া বসবাস করিতেছেন। আসামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ব্যতীত অন্য জাতির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অম্বুবাচী ব্রত পালন নাই। সেখানে এই দুই শ্রেণীর অতি অল্পসংখ্যক বিধবাই "একাদশী ব্রত" করিয়া থাকেন এ সম্বন্ধে দৈবজ্ঞ জাতির বিধবাদিগের কথা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। কাছাড়ের হাইলাকান্দি অঞ্চলের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু-বিধবা মাত্রেই একাদশীর উপবাস করিয়া থাকেন। পশ্চিম-বঙ্গীয় উচ্চ-শ্রেণীর সধবা ও বিধবা মহিলারা এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-পল্লীর সন্নিকটবর্ত্তী কোন কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের কৈবর্ত্ত বা তথাকথিত মাহিষ্য-মহিলারা স্বেচ্ছায় কোন মাসে একটী, কোন মাসে দুইটী বা তিনটী—এইরূপে বৎসরে অনেকগুলি ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু অসমীয়া উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু মহিলারা অম্বুবাচী ও একাদশী ভিন্ন আর কোন ব্রত পালন করেন না।

আমিষ ভক্ষণ—ব্রাহ্মণ ও গণক জাতির বিধবারা এবং ধুবড়ী ও গোয়ালপাড়া অঞ্চলের

কায়স্থ বিধবারা আদৌ আমিষ ভক্ষণ করেন না। কামরূপ অঞ্চলের অতি অল্পসংখ্যক কায়স্থ বিধবাকে মৎস্য মাংস ভক্ষণে বিরত দেখা যায়। আমাদের অনুসন্ধান-মতে সেখানকার চোদ্দ আনা কায়স্থ-বিধবা মৎস্য মাংসাশী। কলিতা জাতির বিধবারা অবাধে উহা খাইয়া থাকেন। কামরূপ মহামায়ার রাজ্য (কোন্ সময় হইতে ?) বলিয়া সেখানে বিধবাদিগের মৎস্য, মাংস ভক্ষণ দূষণীয় নহে। হাইলাকান্দি অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বিধবাগণ নিরামিষাশী। অনেকে রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সামাজিক চালচলন—১। রীহা, মেখেলা অসমীয়া মহিলাদিগের জাতীয় পরিচ্ছদ। আপার আসাম ও সেণ্ট্রাল আসামের (মঙ্গলদৈ মহকুমা ব্যতীত) স্ত্রীলোকেরা রীহা ও মেখেলা নামক পরিচ্ছদ পরিধান করেন। মেখেলা—কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত (বঙ্গ-মহিলাদিগের শাড়ীর উপরিভাগ ঠিক যে ভাবে জড়ান থাকে) জড়ান থাকে। ২। এই দুই অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা কাণে কোরিয়া, কেরু অথবা থুরিয়া; গলায় গলপতা, মণি মাদুলি, গেজেরা, ডুকুডুকি; হাতে সচরু খারু, বালা এবং আঙ্গুলে আংটি পরিধান করেন। মঙ্গলদৈ হইতে কামরূপ ও গোয়ালপাড়ার অসমীয়া মহিলারা কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত মেখেলা পরিধান করেন, বুকের উপর রীহা জড়ান এবং "আগুরণে" নামক একখানি ছোট কাপড় মস্তকে দেন। অলঙ্কারের মধ্যে সাধারণতঃ তাঁহারা কাণে কোরিয়া, নাকে নথ বা নাকফুল, হাতে পতিয়া খারু এবং পায়ে মল পরিধান করেন। এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ কোমরে করধনী, গলায় গলপতা, মণি, মাদুলি প্রভৃতিও ব্যবহার করিয়া থাকেন। (৩) আসামের সহর-বন্দরে যে সকল অসমীয়া মহিলা বাস করেন, বঙ্গ-মহিলাদিগের সংস্পর্শে আসিয়া কেবল তাঁহারাই "শাড়ী" পরিধান করিতে শিখিয়াছেন। (৪) শ্রীহট্ট অঞ্চলের যোগী ও মণিপুরী জাতীয় রমণীরা তাঁতে কাপড় গামছা বয়ন করেন, কিন্তু আসামে প্রত্যেক শ্রেণীর মহিলারা নিজ নিজ গৃহে তাঁতের সাহায্যে বস্ত্র, গামছা ইত্যাদি বয়ন করিয়া থাকেন। (৫) কোন স্থানে যাইতে হইলে সম্ভ্রান্ত-ঘরের অসমীয়া মহিলারা কাষ্ঠনির্ম্মিত দোলায় আরোহণ করেন। কামরূপ, দরঙ্গ ও শিবসাগর জেলার বড় বড় পল্লীতে বর্ত্তমানেও এই দোলার প্রচলন দেখা যায়। দোলাগুলি সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে ৩ হাত হইয়া থাকে। কোচ * জাতীয় লোকেরা বরাবর "দোলা" বহন করিয়া আসিতেছিল। ইদানীং তাহাদের অনেকেই ঐ কাজ ছাড়িয়া দিয়া কৃষিকার্য্যে মনযোগ দিয়াছে। ভ্রাতৃপ্রতীম শ্রীযুক্ত বীরহরি দত্ত বরুয়া বলেন (বিগত ৩রা জুলাই তারিখের পত্র)—গৌহাটীর মত সহরে বর্ত্তমানে মাত্র দুইখানি পাল্কি আছে। (৬) প্রাচীনকালে বঙ্গ-মহিলারা "কানাড়া" ছাঁদে চুল বাঁধিতেন—

"ধনী কানাড়া ছাঁদে বাঁধে কবরী।
মম মালতীমাল তাহি উপরি।"—গোবিন্দ দাস।
"কানড় খোপায় কনকচাঁপা পাটের খোপা দোলে।"—কবিক।

১৬টী গুচ্ছের বিননী ৪টীতে পরিণত করিয়া কুন্তল বাঁধাকে কানাড়া ছাঁদে চুল বাঁধা বলে। কানড় সাপ যেরূপ কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে, ইহা দেখিতে সেইরূপ বলিয়া "কানাড়া" নামে খ্যাত। ফিতা দিয়া চুল বাঁধিবার রীতি অসমীয়া মহিলাদিগের মধ্যে কস্মিনকালে ছিল না, এখনও নাই। চুল দিয়াই তাঁহারা খোপা বাঁধেন। তাঁহাদের খোপাগুলি সাধারণতঃ ঝুলান।

সামাজিক প্রথা—১। কলিতা, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতির পুষ্পিতা কন্যার বিবাহ হইলে প্রথম বিবাহের পরই কন্যা শ্বশুরালয়ে যাইয়া থাকে; কারণ

* আহোম রাজগণের আমলে আসামে দাস-দাসী ক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজানুগৃহীত ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ বিনাব্যয়ে দাসদাসী পাইতেন। তৎকালে ক্রীত দাসদাসীগণের মধ্যে অধিকাংশ ছিল কোচ-জাতীয়, তৎপূর্ব্বে ছিল কলিতা-জাতীয় দাসদাসী।

পুষ্পিতা কন্যার "দ্বিতীয় বিবাহ" নাই। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, অথবা গণক-কন্যার মত দ্বিতীয় সংস্কারের পূর্ব্বে বিবাহ" হইলে তাহাদের "দ্বিতীয় বিবাহ" হয়। ইহার পরই তাহারা শ্বশুরবাড়ী যায়। ২। লখিমপুর জেলায় কেওট ও কলিতার মধ্যে ভূরি ভূরি অসবর্ণ বিবাহ হয়। অবসরপ্রাপ্ত একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বরদলৈ মহাশয় বলেন * "নদীয়াল জাতির সহিত তাহাদের বিবাহও হইয়া থাকে।" কামরূপ অঞ্চলে এই জাতি জল আচরণীয় নহেন। শিবসাগর ও লখিমপুর অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও দৈবজ্ঞের জাতীয় অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তি দ্বিতীয় সংস্কারের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। যখন তাঁহারা দেখেন কন্যা নিতান্ত বড় হইয়া উঠিয়াছে তখন তাঁহারা হিন্দু বলিয়া পরিচিত যে কোন শ্রেণীর পাত্র হউক না কেন, সে ব্যক্তির সাংসারিক অবস্থা একটু ভাল দেখিলে তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। ৩। গোয়ালপাড়া ও কামরূপের কোন শ্রেণীর হিন্দু-কন্যার বিবাহে "গাঁথিয়ান খুন্তা" বিধি নাই। সুরমা উপত্যকা ও পার্ব্বত্য বিভাগ ব্যতীত আসামের অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মণ ও দৈবজ্ঞের জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। (৪) বাঙ্গালীদিগের প্রথামত কন্যার বাড়ী হইতে বরের বাড়ীতে হরিদ্রা পাঠাইবার রীতি অসমীয়াদিগের মধ্যে নাই। অধিবাসের দিন এবং "কলরগুরিত গা ধুয়া"নর কালে কন্যাকে হরিদ্রা মাখান হয়। ৫। অধিবাসের সময় ৩ জন কিম্বা ৫ জন সম্পর্কীয় মহিলা আসিয়া কন্যার মাথায় তৈল ঢালিয়া তৎপরে তাহার মস্তক স্পর্শ করে। ৬। হাইলাকান্দি অঞ্চলে বিবাহের পরদিন পাকস্পর্শ হয় না সেখানকার অনেক স্থানে উহা প্রায় রহিত হইয়া গিয়াছে এবং কোন কোন স্থানে উহা প্রচলিত আছে। যেখানে প্রচলিত আছে সেখানে চতুর্থ মঙ্গলবারের পরদিন পাকস্পর্শ হইয়া থাকে। ৭। বাঙ্গালীদিগের প্রথামত পত্নীর মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর পাণিগ্রহণ করিবার রীতি অসমীয়াদিগের মধ্যে আছে। ৮। স্ত্রীর বড় ভগ্নীর (বড় শালীর) সহিত স্বামীর কথা কহিবার প্রথা অসমীয়াদিগের মধ্যে আদৌ নাই। হাইলাকান্দি অঞ্চলে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শিক্ষিত শূদ্রাদি স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ ভগ্নী সহ আলাপ করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেকেই তাঁহাকে স্পর্শ করেন না। দ্বারবঙ্গে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা বড়শালীর সম্মুখে আসাও দূষণীয় মনে করেন। ৯। ভাগ্নেবউয়ের সহিত মামাশ্বশুরের কথা কহা অসমীয়ারা দূষণীয় বলিয়া মনে করেন। ১০। আসামে গর্ভিণীকে "সাধ" দেওয়া হয়। কামরূপে ইহাকে "জেঠেরা" দেওয়া বলে। সাধের সময় পিত্রালয় হইতে খাদ্য-দ্রব্য প্রেরিত হয়। দ্বারবঙ্গে ব্রাহ্মণ-সমাজেও সাধ-ভক্ষণ প্রথা আছে। সেখানে উহাকে "সধোরি" বলা হয়। ১১। শ্রীহট্ট অঞ্চলে এক্ষণে "চড়ক পূজা" নাই, ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে তথায় উহার প্রচলন ছিল। অসমীয়াদিগের মধ্যেও চড়ক পূজা নাই। ১২। মানস করিয়া মাথায় চুল রাখা অথবা দেবালয়ে ধ্বজা দিবার প্রথা আসামে নাই। ১৩। বাঙ্গালার বহুস্থানে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাইষষ্ঠীর ধুমধাম পড়িয়া যায়। আসামে এই প্রথা অজ্ঞাত।

* লখিমপুর জেলার হাবেজা চা-বাগান হইতে বিগত ২৪শে জুন তারিখের পত্র।

বিবিধ বার্ত্তা

উৎকল মহিলা সম্মিলন—

গত ৩০শে জুন তারিখে উৎকলে এক বিরাট মহিলা সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত অধিবেশনে ৫০০ মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় সভায় যোগদান ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আচার্য্য রায় সম্মিলনে প্রদর্শিত শিল্প দ্রব্যাদির ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভায় কয়েকজন ইউরোপীয় মহিলাও যোগদান করিয়াছিলেন।

ভারতে বিধবার সংখ্যা—

১৯২১ সালে যে লোক গণনা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় ভারতে হিন্দু-বিধবার সংখ্যা ২ কোটি, ৬৮ লক্ষ, ৩৪ হাজার ৮ শত ৩৮ জন। ১ বৎসর হইতে ২৪ বৎসরের মধ্যে কতজন বিধবা তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১ বৎসর বয়সের বিধবা ৭৫৯ জন।

২ বৎসর বয়সের বিধবা ৬১২ জন।

২	হইতে	৩	বৎসর বয়সের বিধবা		১৬০০	জন
৩	"	৪	"		৩৪৭৫	"
৪	"	৫	"		৮৬৯৩	"
৫	"	১০	"		১০২২৯৩	"
১০	"	১৪	"		২৭৯১২৪	"
১৪	"	২০	"		৫১৭৮৯৮	"
২০	"	২৫	"		৯৬৬৬১৭	"

উপরোক্ত তালিকা হইতে বোঝা যায় যে ভারতের প্রায় ১৯ লক্ষ বিধবা যুবতী আর প্রায় ১৫ হাজার বিধবা অতি শিশু অর্থাৎ মায়ের হাত ধরিয়া হাঁটিতে পারে কি না সন্দেহ।

দেশের এ অবস্থা দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে না কি?

কমলা লেকচারার—

স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা কমলার স্মৃতি রক্ষা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ৪০,০০০ টাকা দিয়াছিলেন। এই অর্থে প্রতি বৎসর ভারতীয় দর্শনের ধর্ম্ম শিক্ষা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অন্ততঃ তিনটি বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। অনুসারে বর্ত্তমান বর্ষে ডাঃ আনি বেসান্তকে কমলা লেকচারার নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি এ বাবদে ১০০০৲ বৃত্তি এবং একখানি স্বর্ণ পদক পাইবেন।

পতিতা বালিকা আশ্রম—

কলিকাতায় পতিতাদের গৃহে প্রায় ২০০০ বালিকা আছে। বড় হইলে এই সব বালিকাকে পতিতারা পাপ ব্যবসায়ে লিপ্ত করিবে। এই বালিকাদের উদ্ধারের জন্য পুলিশকে আইন দ্বারা ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে কিন্তু তাহাদিগকে কোথায় রাখা হইবে, তাহা স্থির না হওয়ায় পুলিশ তাহাদিগকে পাপ নিকেতন হইতে সরাইতে পারিতেছে না। এ কারণ কলিকাতা ভিজিলেন্স এসোসিয়েশন ইহাদের জন্য একটি আশ্রম নির্ম্মাণার্থ জনসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থী। এই কার্য্যের জন্য এক লক্ষ টাকা লাগিবে। টাকা কড়ি সমস্ত কলিকাতা ভিজিলেন্স এসোসিয়েশন, ২৫নং চৌরঙ্গী, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আশা করি দেশবাসী এ দানে কৃপণতা করিবেন না।

সুতা কাটিবার কল—

ত্রিপুরার কালীকচ্ছ নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় স্বল্প মূল্যের একটি সুতা কাটিবার কল আবিষ্কার করিয়াছেন। উক্ত কলের দ্বারা অল্প সময়ে বেশী সুতা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ছোট ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত ইহাতে সুতা তৈরী করিতে পারিবে।

আমরা এরূপ কলের বহুল প্রচার কামনা করি।

মেদিনীপুরে বিধবা-বিবাহ—

(১) মেদিনীপুর জেলার খাজারডিহি গ্রামে শ্রীযুক্ত ভূপতি চরণ ঘোষ শ্রীমতী পঞ্চমী দাসী নাম্নী একটি ১২ বৎসর বয়স্কা বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। বালিকাটি ৭ বৎসর বয়সে বিধবা হয়। বরকন্যা উভয়েই সদ্গোপ জাতীয়।

(২) উক্ত জেলার খাকুরদা গ্রামে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ দত্ত একটি বালবিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। বর কন্যা উভয়েই কায়স্থ জাতীয়। কন্যার নাম শ্রীমতী সরোজিনী দাসী, বয়স ১৩ বৎসর, ৭ বৎসর বয়সে বিধবা হয়।

(৩) ঐ জেলার আমলাচুটি গ্রামে শ্রীযুক্ত মিহিরচন্দ্র রাণা শ্রীমতী কিরণবালা দাসী নাম্নী একটি বালবিধবার পাণি

গ্রহণ করিয়াছেন। কন্যাটি ৮ বৎসর বয়সে বিধবা হয়। বর্ত্তমানে তাহার বয়স ১২ বৎসর। বর ও কন্যা উভয়েই কর্ম্মকার জাতীয়।

গত ১৯২৩ সালে মেদিনীপুরে একটি বিধবা-বিবাহ-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এ বিবাহ তিনটি উক্ত সমিতির সহায়তায় সম্পূর্ণ হিন্দুমতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

আমরা এই সমিতির দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

সৎকার্য্যে দান—

মেদিনীপুরের দাসপুর থানার অন্তর্গত কেলোগাছা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধানাথ মাইতি মহাশয় স্বীয় পত্নীর ইচ্ছানুসারে সোয়াখালি গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য ৫০০০৲ দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি চিকিৎসালয়ের ভূমি ক্রয় ও গৃহনির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিতেও স্বীকৃত হইয়াছেন।

দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিগণকে আমরা এ আদর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী মহিলার কৃতিত্ব—

সাঙ্গুভেলি কোম্পানীর প্রোপ্রাইটার, চট্টগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী চৌধুরী বর্ত্তমান বৎসরে রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী মহিলা এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই।

বাঙ্গালী মহিলার এ কৃতিত্বের সংবাদে আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম। ইঁহার ভবিষ্যৎ সর্ব্বপ্রকার সাফল্যে মণ্ডিত হউক—ইহাই কামনা করি।

নারী-শিক্ষার জন্য দান—

রাজপুতানার কিষণগড় ষ্টেট-কাউন্সিলের চীফ মেম্বর দেওয়ান বাহাদুর কে, এল, পাণ্ড দস্কর, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীদের বৃত্তি ও পদক দেবার ব্যবস্থা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের হাতে ১৭০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আশা করি বাঙ্গালার ধনীসম্প্রদায় এই আদর্শ গ্রহণ করিয়া দেশে নারী শিক্ষা প্রচারে সহায়তা করিবেন।

মহিলা শিল্প প্রদর্শনী—

আগামী, শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে ঢাকা মহিলাসঙ্ঘ একটি মহিলা-শিল্পপ্রদর্শনী খুলিবেন। উক্ত প্রদর্শনীতে মহিলাদের নির্ম্মিত সর্ব্বপ্রকার শিল্প দ্রব্য প্রদর্শন ও বিক্রয় চলিবে। সর্ব্ব প্রকার তাঁতের কাপড়, বেতের ও তালপাতার কাজ, মাটির পুতুল ও অন্যান্য দ্রব্য, সূচি শিল্পের দ্রব্যাদি, চিত্র প্রভৃতি এই প্রদর্শনীতে সাদরে গৃহীত হইবে। স্থান, তারিখ ও অন্যান্য বিষয় জানিবার জন্য ৮ নং ওয়াইজ ঘাট, ঢাকা—এই ঠিকানায় সম্পাদিকার নিকট লিখিতে হইবে।

এই প্রদর্শনী সর্ব্ব বিষয়ে সফলতা লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা।

অকেজো বাঙ্গালীর সংখ্যা—

বাঙ্গালার অকেজো লোকসংখ্যা ৪৬৬৯৫৩৬জন। তন্মধ্যে উন্মাদ ১৮৮৯৩ জন, কালা ৩১২৬৪ জন, অন্ধ ৩০৪৬৮ জন এবং কুষ্ঠগ্রস্থ ৫১৪৫১ জন। তাহার মধ্যে—

উন্মাদ	পুরুষ	১১১০২ জন।
„	স্ত্রীলোক	৭৭৯১ জন।
কালা	পুরুষ	১৮৯৩৯ জন।
„	স্ত্রীলোক	১২৩২৫ জন।
অন্ধ	পুরুষ	১৮৭০২ জন।
„	স্ত্রীলোক	১৪৭৬৬ জন।
কুষ্ঠগ্রস্থ	পুরুষ	১১৪৪৮ জন।
„	স্ত্রীলোক	৪০০৩ জন।

এই প্রকারে দুর্ভাগ্য দেশের প্রায় একলক্ষের উপর লোক দেশের ও সমাজের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া জীবন কাটাইতেছে!

মাতৃমন্দির



আগমনী।

Printed at Fine Art Press, Calcutta.



মাতৃমন্দির



২য় বর্ষ | আশ্বিন—১৩৩১ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শরৎ

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।

ত্যাগের মন্ত্র জপায় শরৎ,
শিখায় করিতে দান,
শূন্য আজিকার নীল নভোপথ,
মাঠে ধরেনাক ধান।

মেঘমালা আজ করেছে নিঃশেষ
যত ছিল জলভার,
তাই তার আজ উদাসীন বেশ,
নদী বহে জলধার।

ধরণী সাজিল সম্পদে যার
সে আজ হয়েছে দীন,
উজ্জল মুকুট তপন রাজার,
কিরণে নিখিল লীন।

মুক্তির পথে

শ্রীমতী মঞ্জরী দেবী।

দেশ যখন জাগে তখন সকল দিক দিয়াই জাগরণের লক্ষণ নানা ভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে। অনেক সময় সেই জাগরণের বিকশিত মূর্ত্তি বিদ্রোহের রূপ ধরিয়া আসিতে পারে, পার্শ্ববর্ত্তী অনেকের দেহমনে আঘাত ও বেদনার সৃষ্টি করিতে পারে কিন্তু তথাপি আমরা এই জাগ্রত বিদ্রোহ-প্রতিমূর্ত্তিকে গলা টিপিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে পারি না। রোগীর প্রলাপ বকা এবং বিকারে হাত পা ছুঁড়িয়া প্রহার করিতে যাওয়া তবু ভাল, কিন্তু অসাড়, নির্জ্জীব, প্রাণহীন প্রশান্ত ভাব যে মৃত্যুর লক্ষণ।

আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতদিন প্রাণবন্ত থাকে ততদিনই সাড়া দেয়—প্রাণের লক্ষণ আমরা সর্ব্বকর্ম্মে সর্ব্বঅঙ্গসঞ্চালনে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। যে অঙ্গ কোন স্পর্শে, কোন আঘাতে সাড়া দেয় না আমরা জানি তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তেমনি কোন একটা জাতি যদি যুগের পর যুগ ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্ব্ববিধ অবিচার অত্যাচার নির্ব্বিচারে সহিয়া যায়, ন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে তাহার প্রাণে এতটুকু সাহসের চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত না হয় তবে আমরা বুঝিব সেই জাতিরও মৃত্যু হইয়াছে।

জাপান জাগিয়াছে, চীনও বহুশতাব্দীর অলসনিদ্রার পর জাগিয়া উঠিয়াছে। এটা জাগরণের যুগ—এই জাগ্রতযুগে পৃথিবীর সর্ব্ব অংশে সর্ব্বজাতি কালের সঙ্গে তাল রাখিয়া উন্নতির সম্মুখ পথে যাত্রা করিয়া চলিয়াছে। সবাই জাগিয়াছে—সবাই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে কিন্তু জাগিয়াও জাগে নাই এই হতভাগ্য ভারতের নির্ব্বীর্য্য অধিবাসীবৃন্দ। কত রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তন, কত অত্যাচার লাঞ্ছনার ঝঞ্ঝাবাত্যা এই দেশবাসীর বুকের উপর দিয়া রক্তচরণে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া গেল কিন্তু দেশ তবু জাগিল না, জাতির অন্তরে প্রাণের স্পন্দন তবু জাগিয়া উঠিল না। এই জাতি যে কতযুগ ধরিয়া তিল তিল করিয়া মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে এবং কত যুগ ধরিয়া যে ইহার কাণে জাগরণের বিজয়মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে কে জানে!

কবি গাহিয়াছিলেন—

"না জাগিলে সব ভারত-ললনা
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা"

কবি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ভারত যদি জাগে তবে সর্ব্বাগ্রে জাগিতে হইবে এই ভারতের যত ললনাদিগকে। একটা জাতি শুধু পুরুষশক্তি দ্বারাই বলশালী এবং শক্তিমান হইতে পারে না, তাহাকে সম্পূর্ণ-জাগ্রত, প্রতিষ্ঠিত এবং সর্ব্বকর্ম্মে পরিচালিত করিতে হইলে নারীশক্তিরও সাহায্য এবং সহানুভূতি চাই।

এই নারীশক্তিকে অবহেলা করিয়া, পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া কোন জাতিই পৃথিবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম যে কোন প্রান্তে যাই, সকল দেশের সকল জাতির ভিতরই দেখিতে পাই এই নারীজাতির সম্মান সর্ব্বাগ্রে, এই নারীশক্তিকে সকল জাতিই স্থান দিয়াছে পুরুষের পার্শ্বদেশে। কিন্তু আমাদের দেশ এই নারীশক্তিকে চিরকাল ধরিয়া দাবাইয়া রাখিয়াছে—তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছে পুরুষের পশ্চাদভাগে। আমাদের সমাজ, আমাদের ধর্ম্ম এই নারীশক্তিকে চিরকাল অজ্ঞানতার পূতিগন্ধময় অন্ধকার গহ্বরে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিয়াছে।

ইহাতে লাভ হইয়াছে এই যে একটা জাতির একটা অঙ্গ একেবারে পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে—বহু-শতাব্দীর অন্যায় অবৈধ অবরোধে একটা অঙ্গ একেবারে শিথিল দুর্ব্বল অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। সেই লুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইলে আজ আমাদিগকে সঙ্কীর্ণমনা স্বার্থসর্ব্বস্ব হইয়া থাকিলে চলিবে না—দেশের এবং দশের পরিত্রাণের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া আমাদিগকে যদি আজ সহস্র বিপদ ও বিদ্রূপের সম্মুখীন হইতে হয় তবে তাহাও আমাদিগকে প্রসন্ন চিত্তেই হইতে হইবে।

ব্যক্তিগত এবং সমাজগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে নিজের দেশ ও জাতি অনেক বড়। বৃহৎ লাভের কাছে ক্ষুদ্র সুখসুবিধা, ক্ষুদ্র স্বার্থ মানবসমাজ চিরকাল বিসর্জ্জন দিয়া আসিতেছে। আমাদের ক্ষুদ্র সমাজের সংস্কার সাধন দ্বারা যদি দেশের মুক্তি-পথ উন্মুক্ত হওয়ার পক্ষে সহায়তা করে তবে আজ দ্বিধাদ্বিরুক্তি না করিয়া আমাদিগকে সেই সংস্কারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। দেখিতে হইবে গলদ কোথায়—বুঝিতে হইবে ভাঙন ধরিয়াছে কোনখানে। রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিলে রোগ নিরাময় হইতে বেশীদিন লাগে না—বেশী বেগও পাইতে হয় না।

আমরা শুনিয়া থাকি বটে 'নারী অবলা' কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কি তাই? নারী আজ আমাদের দেশে অবলা হইয়া, দুর্ব্বলা হইয়া প্রবলের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইতেছে। এই যে দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের নৃশংস অত্যাচার—এজন্য দায়ী কে? দায়ী কি পুরুষই নয়? আমাদের দেশের সমাজপতিগণের স্বার্থপূরিত বিধানরাশি আমাদের নারীজাতিটাকে কি একেবারে পঙ্গু অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখে নাই?

আজ যদি দেশের কল্যাণ কামনা করি—যদি মুক্তি আনিতে চাই তবে ঐ শক্তিদৃপ্ত অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী পুরুষের রক্তচক্ষু দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে না—সমাজচ্যুতি, নরকপ্রাপ্তির ভীতিতে পিছাইয়া গেলে চলিবে না। আজ আমাদের অন্তর্নিহিত সুপ্তশক্তিকে উদ্বোধিত জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে—দেখাইতে হইবে আমরা সেই পদ্মিনী, ঝান্সীর রাণীর জাত—আমাদের দেবী সিংহবাহিনী, দশভূজা, দশপ্রহরণধারিণী; আমাদের মা কালী করালবদনী, খর্পরধারিণী দানবদলনী!

যে রক্ষক সেই যদি ভক্ষক হইয়া দাঁড়ায়—যার কাছে বিচারের প্রত্যাশা করিতেছি সেই যদি অত্যাচারীর প্রচণ্ডমূর্ত্তিতে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায় তবে কোন্ সাহসে আর তা'র কাছে আত্মসমর্পন করিতে যাইতে পারিব? আজ পুরুষ নারীর প্রতি যে অত্যাচার করিয়া চলিয়াছে সেই পুরুষেরই কাছে নারী তার ধর্ম্মের জন্য, মুক্তির জন্য কাতর প্রার্থনা করিতেছে, সাশ্রুনেত্রে, শুষ্ক কণ্ঠে, ব্যথিত চিত্তে মুক্তির জন্য কৃপাভিক্ষা করিতেছে। মুক্তি চাই, মুক্তি চাই—ধর্ম্মে, কর্ম্মে, শিক্ষায়, সমাজে সর্ব্বত্র আজ নারী মুক্তি চাহিতেছে। দেশের স্বার্থান্ধ পুরুষ! চোখ চেয়ে দেখ—তোমারই হাতে মুক্তি-মন্ত্রের চাবী রহিয়াছে। দ্বার খুলিয়া দাও। অর্গলবদ্ধ প্রাচীরের অন্ধকার হইতে লাঞ্ছিতা জীবন্মৃতা নারীর কণ্ঠোচ্চারিত স্বর ঐ শোন বলিতেছে—

"সময় হয়েছে নিকট এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"

(শিশির)

কমলার পত্র

শ্রীমতী প্রীতিকণা দত্ত-জায়া।

নীল্ফামারী,
১২শে ভাদ্র, ১৩৩১।

স্নেহের বোন মিনতি,

জীবনের পরপারে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে খেয়া-নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে আজ তোমায় এই চিঠিখানা লিখ্‌ছি। তোমায় জীবনের আমার এইখানাই প্রথম চিঠি, আর এইখানাই শেষ! শুধু চিঠিই শেষ নয় বোন,—জীবনের শেষ, খেলার শেষ, হাসি কান্না সুখ দুঃখের শেষ,—সমস্ত সম্বন্ধের অবসান,—তারপর যে কি আছে তাত জানিনে ভাই!

জীবনে তোমায় কখনো দেখিনি,—দেখ্‌বার সাধ ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সাধের অঙ্কুর হৃদয়েই শুকিয়ে গেল, ভগবান আর 'তা' পূর্ণ হ'তে দিলেন না। শুনেছি তুমি সুন্দরী,—স্বামীর কণ্ঠের যোগ্য কুসুম-মালিকা, স্বামী তোমার মতন রত্ন পেয়ে সুখী হ'য়েছেন, তাঁর ব্যর্থ জীবনে তুমি সার্থকতার নন্দন-কানন রচনা ক'রেছ, তোমার চরণ-স্পর্শে স্বামীর গৃহাঙ্গনে শত সুষমা ফু'টে উঠেছে;—এ বার্ত্তা শুনে সত্যসত্যই ভাই সুখী হ'য়েছি আমি। যে আসন তুমি আজ অধিকার ক'রেছ, সেই আসনের যতদিন আমি একছত্রাধিশ্বরী ছিলুম, ততদিন ত তাঁর মুখে বিদ্যুতের ঝলকের মতও এক তিলের জন্য একটু হাসির রেখা দেখিনি, শুধু বিষাদ, শুধু নিরানন্দ, শুধু দীর্ঘশ্বাস দেখে এসেছি। কতদিন স্বামীর মুখে একটু হাসি দেখবার জন্য কত চেষ্টা ক'রেছি, নির্লজ্জের মত কত আচরণ ক'রেছি, কিন্তু কই ভাই, একদিনও ত আমার চেষ্টা সফল হয় নি। আজ আমি এই চিরবিদায়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, বুকের নীচে আমার জমাট অন্ধকার,—এ সময়ও যদি মনে করতে পারতুম বোন, যে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁর হাসি ভরা মুখখানি কোনো দিন দেখেছি, তবে বোধ হয় আজ আমার হৃদয়খানি আলোয় আলোময় হ'য়ে যেত, তরলিত জ্যোৎস্না-ধারায় প্রাণটা শ্বেত কুমুদের মত অনাবিল আনন্দ নিয়ে ফু'টে উঠ্‌তো,—আমার যাত্রার পথ আলোকিত দেখ্‌তুম, সুরভিত অনুভব কর্ত্তুম। তা'ত আমার কপালে ঘটেনি বোন। তাই চারিদিকে দেখ্‌ছি শুধু বিরাট অন্ধকার,—আকাশ পাতাল ঘেরা অন্ধকার!

একদিন আমার কাণে এলো, সদানন্দ তিনি—আমায় জীবন-সঙ্গিনী ক'রেই অমন 'বিমর্ষ' হ'য়ে গেলেন, সেই দিন মনে হ'ল, হায় হতভাগিনী আমি একজনের আনন্দ আহ্লাদ সব ডুবিয়ে দিয়েছি! প্রাণে অনুতাপের জ্বালা অনুভব কর্ত্তে লাগিলুম, জীবন অসহ্য বোধ হ'তে লাগ্‌লো। যদি স্বামীকেই সুখী কর্ত্তে না পারলুম, তবে নারী-জীবন আমার কিসের জন্য? বাল্যকাল হ'তে ত শুধু শিখে এসেছি—স্বামীকে সুখী করাই নারী-জীবনের চরম সার্থকতা। কিন্তু আমার জীবনে সে পুণ্যার্জ্জনের সুযোগ ঘট্‌লো কই? বরং বিপরীত ফলই ফলেছে; আনন্দের সৌরকরোদ্ভাসিত আকাশ আমি নিবিড় মেঘ-মালায় ঢেকে দিয়েছি, আমার তপ্ত নিশ্বাসে একটী স্বর্ণ শতদল শুকিয়ে যাচ্ছে। জীবনটা আমার ঘৃণায়, লজ্জায়, অনুতাপে অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লো।

তখন ভেবে ভেবে একদিন স্থির সিদ্ধান্ত করলুম, এই ব্যর্থ বিড়ম্বিত জীবনটা বাতাসে উড়িয়ে দেবো। স্বামী-ত তাহ'লে সুখী হবেন, আবার বিয়ে ক'রে মনোমত পত্নী লাভ ক'রে তিনি তাঁর হারিয়ে ফেলা হাসি আবার ফিরিয়ে পাবেন। আমি অন্তরীক্ষে ব'সে ব'সে তা' দেখে প্রাণে শান্তি

পাব। জীবনে যা পাইনি, মরেত' তা' পাবো! কি জানি কেন, হঠাৎ মনের গতিটা বদ্‌লে গেল। কে যেন আমার মনের পুর থেকে ব'লে উঠ্‌লো, 'ম'রে শান্তি পাওয়াই কি নারী-জীবনের চরম উদ্দেশ্য রে? তা'ত নয়, প্রাণ মন দেহ-দিয়ে স্বামীর সেবা কর্, তাহ'লেই জীবন ধন্য হবে, জীবনের পরে শান্তি পাবি।' ·····বিবেকের সেই আদেশ ভগবানের বাণী ব'লে মাথা পেতে নিলুম,—তাই হোক, তাই হোক, আমার এ ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা কুলোয়, স্বামীর পূজায় তাতে একটুও কৃপণতা কর্ব্বো না,—স্বামি পূজাই যে নারীর ভগবদারাধনা। স্বামী সেবা ক'রেই জীবন ধন্য কর্ব্বো, চাই না পার্থিব সুখ।

মরণের পথ থেকে আমি আবার ফিরে দাঁড়ালুম, মৃত্যু-কামনা পাপ ব'লে শিউরে উঠ্‌লুম, তারপর বিবেকের সেই নির্দ্দেশিত মহা-কর্ত্তব্যকে বরণ ক'রে নিয়ে পথ চল্‌তে লাগ্‌লুম। কিন্তু কই স্বামী ত সুখী হলেন না আমার পূজায়, হৃদয় নিংড়ে যে অর্ঘ্য দিবারাত্র দিলাম তাঁর চরণে তাতে ত পরিতৃপ্ত হ'লেন না তিনি। আমায় দেখ্‌লেই তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন, আমি তাঁর ঘরে ঢুক্‌লেই তিনি কোনো কাজের অছিলা করে বেড়িয়ে পড়তেন, যতটা সম্ভব তিনি আমায় এড়িয়ে চলতে লাগ্‌লেন। এক গ্লাস জলও যদি তিনি আমার কাছে হাসি মুখে চেয়ে নিতেন তাহ'লে বোধ হয় আজ আমার একটা সান্ত্বনার সামগ্রী থাকতো। প্রাণপণে তাঁর সেবা করেছি বটে, কিন্তু সে সেবায় নিজেই তৃপ্তি পাইনি, যাঁর সেবা করেছি তিনিও সন্তুষ্ট হননি, তবে আমার সে সেবার মূল্য কি, সে সেবায় সুখ কি? যাঁকে সেবা করা যায় তিনি যদি অস্বস্তি বোধ করেন তবে সে সেবা যে পীড়নের রূপান্তর মাত্র। মন আবার বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌লো, মরণের আকাঙ্ক্ষা আবার মাথা তু'লে দাঁড়ালো, মরণ আমায় হাত ছানি দিয়ে ডাক্‌তে লাগ্‌লো,—আয়, আয়, আয়!

এমন সময় বিমল আমার পেটে এলো, আর মরা হ'লো না, জীবনের উপর যেন একটা মমতা এসে পড়লো। ভাব্‌লুম, ঐ অদূরে আমার দুঃখ দৈন্যের অমানিশার ঘনান্ধকার দূরীভূত ক'রে সুখের সূর্য্য উঠ্‌ছে।—যাক্ সে কথা, কি বলতে কি ব'লে ফেলছি! সাজিয়ে গুছিয়ে তোমায় কিছুই লিখ্‌তে পাচ্ছি না বোন,—আর এ সময় কি লেখা আসে? যাবার সময় তোমায় আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানিয়ে যাবো এই জন্যে বহুদিন পরে আজ এই কাগজ কলম নিয়েছি। কিন্তু কি লিখবো বোন? নিজের বুকফাটা দুঃখের কথাই যে কেবল এসে পড়্‌ছে। যাক্ সে কথা। সত্যই বোন, যখন শুনলুম, তুমি স্বামীকে সুখী করতে পেরেছো, তখন আমার বড়ই আনন্দ হ'লো, আজও সে আনন্দ হারাইনি। সতিন চিরকাল ঈর্ষ্যার সামগ্রী ব'লেই জীবন ভ'রে শুনে আস্‌ছি, নিজের জীবনে সতিন পেয়েও কিন্তু ঐ কথাটার যাথার্থ্য কিছু উপলব্ধি কর্ত্তে পারিলুম না;—তোমায় ত আমার একটুও হিংসে হয়না, বরং তুমি স্বামীকে সুখী করতে পেরেছো এই জন্য ছোট হ'লেও তুমি আমার অগাধ শ্রদ্ধার পাত্রী। হয়ত তোমার এ কথা বিশ্বাস হবেনা, কারো হয়ও না, কিন্তু ভাই, মরণ-সময়ে ত আর মিথ্যে ব'লে জীবনের বোঝা ভারী করতে মানুষ পারেনা, এটা ত' বোঝ, তাই বুঝে এই হতভাগিনী সর্ব্বস্ব-রিক্তাকে বিশ্বাস কর। আশীর্ব্বাদ করি,—জন্মে জন্মে তুমি এম্নি স্বামী-সোহাগিনী হও।

বোধ হয় শুনেছো, আমি ধনী পিতার কন্যা, কিন্তু কালো কুসিৎ। স্বামী অর্থ-লোভেই আমায় বিয়ে ক'রেছিলেন। কিন্তু আমায় গ্রহণের বিনিময়ে বাবা তাঁকে যা' দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়নি, তাই তিনি আমায় নিয়ে কেবল দুঃখ ও অশান্তিই ভোগ ক'রেছেন, সুখী হ'তে এক দিনও পারেন নি। আমিও পিতার ঐ অপরাধের জন্য স্বামীর সোহাগ ভালবাসা—যা' নারী-জীবনের একমাত্র প্রার্থিত,—তা' হ'তে বঞ্চিত হ'য়েছি।

তারপর স্বামিগৃহ থেকে কি অপরাধে আমি চির-নির্ব্বাসিতা তাও বোধ হয় শুনেছো।

বিমল পেটে এসেছে, তখন সবে চার মাস। সেবার রথের যোগে অনেকেই পুরী দর্শনে যাচ্ছিলেন। স্বামী ও শাশুড়ীর সঙ্গে আমিও গেলুম, জানিনা ভাই, সেদিন কি অ-যাত্রায় পা বাড়িয়েছিলুম। সেই যাত্রাতেই আমার কপাল ভাল ক'রে ভাঙ্গলো। মন্দির থেকে ঠাকুর দর্শন ক'রে ফিরে আস্‌ছি স্বামী ও শাশুড়ীর সঙ্গে, হঠাৎ ভিড়ের মাঝে প'ড়ে আমি পথ হারিয়ে ফেল্লুম। যেখানে আমরা বাসা নিয়ে-ছিলুম, তার নাম ঠিকানা আমি জানতুম না। ভয়ে আতঙ্কে আমি কেঁদে ফেল্লুম,—হায় হায় ঠাকুর, তোমায় দেখ্‌তে এসে কি এই হ'লো ভাগ্যে আমার? রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সেবক আমার অবস্থা শু'নে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, "এস মা, আমি তোমার সন্তান, কোনো ভয় নেই, তোমায় নিরাপদে আমরা বাসায় বা বাড়ীতে পৌঁছে দেবো।" প্রাণে তখন অনেকটা আশা এলো, কিন্তু বাসার নাম ঠিকানা তাঁকে আমি দিতে পারলুম না, দেশের নাম ঠিকানা তাঁকে বল্লুম। তিনি আমায় তাঁদের আশ্রমের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেই আশ্রমে কয়েকজন নারী-সেবিকা ছিলেন, তাঁদের ওপরেই আমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত হ'লো।

সেই সেবকের সঙ্গে আমি এসে স্বামিগৃহে পৌছেই শুনলুম সমাজপতিদের বিচারে আমাকে পুনগ্র্হণ নিষিদ্ধ হ'য়ে গেছে, এমন কি স্বামীকে পর্য্যন্ত রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হ'য়েছে! সেবক অনেক যুক্তি তর্ক দেখালেন, কিন্তু সমাজপতিরা আমাকে সমাজে নিয়ে ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিতে পারেন না ব'লে একবাক্যে জবাব দিয়ে বস্‌লেন। সেবক স্বামীকে তাঁর মতামত জিজ্ঞেস করলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বল্লেন, "দ্বিচারিণীকে আমি গৃহে স্থান দিতে পারি না।" হায়, হায়, স্বামীর মুখে ও-কথা শুন্‌বার আগে যদি পৃথিবী দ্বিধা হ'য়ে আমায় স্থান দিতেন! তারপর আমি স্বামীকে জীবনের শেষ একবার দেখ্‌তে চাইলুম, কিন্তু সে প্রার্থনাও আমার অগ্রাহ্য হ'লো।—কি জানি, আমার দর্শনে যদি তাঁর পাপ স্পর্শে! পিতৃগৃহেই সুতরাং আমার স্থান হ'লো ···সেই থেকে আজ এই সাত বছর আমি স্বামীসুখ-সৌভাগ্যে বঞ্চিতা।

তারপরেও দু'একবার মরবার সাধ হ'য়েছিল কিন্তু বোন, তাঁর দেওয়া নিধি, আমার বড় আদরের, বড় স্নেহের, বুক চেরা ধন বিমলের দিকে, তাকিয়ে আমি সে পথ থেকে পিছিয়ে এসেছি।

আজ দু'মাস আমি মরণ-শয্যায় প'ড়ে আছি। অন্তিমসময় একবার তাঁর শ্রীচরণ দু'খানি দেখ্‌বার সাধ ছিল, এজন্য তাঁকে দু'খানা চিঠি অবধি লিখে-ছিলুম, কিন্তু বোন, এ হতভাগিনীকে একবার চোখে দেখ্‌লেও হয়ত তাঁর পাপ হবে অথবা সমাজ তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখ্‌বে, এই ভয়েই বুঝি তিনি আমার এই মরণসময়েও একবার দেখা দিতে সাহস করেননি, অথবা তাঁর প্রবৃত্তি হয়নি; তাই তাঁকে আর বিরক্ত করতে ইচ্ছা নেই। বেশী কিছু যে আর লিখ্‌তে পারছি না বোন, সময় যে আমার হ'য়ে এলো। তোমার কাছে আমার একটা শেষ অনুরোধ, অন্তিম প্রার্থনা,—আমি ত ভাই বিমলকে ছেড়ে চল্লুম, কার হাতে আর আমার স্নেহের ধনকে দিয়ে যাবো? তোমারি হাতে দিয়ে যাচ্ছি। তুমি তাকে বুকে টেনে নিয়ে স্নেহের আঁচলে ঘিরে মায়ের অভাব ভুলিয়ে রেখো দিদি! আমার ভরসা আছে, তোমার হাতে তার আদর স্নেহের ত্রুটী হবেনা।

স্বামীর চরণে অচলা ভক্তি রেখো বোন। তাঁকে আমার বিদায়-প্রণাম দিও। আর যদি পারেন তিনি যেন এ হতভাগিনীকে ক্ষমা করেন। এখন বিদায় দাও ভাই, ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি তোমরা সুখী হও। ইতি।

আশীর্ব্বাদিকা—

তোমার হতভাগিনী দিদি

কমলা।

নারীর অবস্থা

শ্রীমতী উষাপ্রভা সেন।

নারীর সকল অবস্থার মধ্যে বৈধব্যই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও নারী যদি বিধবা হয় তবে কেহই তাহাকে ভাগ্যবতী, ধনবতী বলিবে না ভাগ্যহীনা দুঃখিনীই বলিবে। সে সময় তাহার বয়স যত অল্প বা যত অধিকই হউক সমাজের নির্দ্দেশ হেতু বৈধব্যের সকল আচার অনুষ্ঠানই তাহাকে পালন করিতে হইবে, সে যত ধনের অধিশ্বরীই হউক একবেলা আহার ও একখানা সাদা কাপড় হইতে তাহার অব্যাহতি নাই। একবেলা ভিন্ন দুইবেলা আহারের সামর্থ্য যাহার নাই, অতুল ঐশ্বর্য্যাধিশ্বরী হইলেও সে যে দুঃখিনী কে এ কথা অস্বীকার করিবে?

আমাদের এক আত্মীয়ের মৃত্যুতে আমাদের মৎস্যাহার বন্ধ হইয়াছিল, আমরা সর্ব্বদাই অশৌচান্তের দিন গুণিতাম ও মাছ না খাইয়া থাকিতে পারা যায়না বলিয়া হা হুতাশ করিতাম, তাহাতে আমার একটি মুসলমান সখীর বালিকা-কন্যা বলে "আপনাদের তো এই কটা দিন গেলেই হলো, কিন্তু আপনার '——' যে আর কোনদিন মাছ খেতে পারবে না, দুবেলাও খাবে না, একবেলা খেয়ে তাকে থাকৃতে হবে।" মেয়েটির কথা মনে বেশ একটা দোলা দিয়ে গেল। সকলের অশৌচের, শোকের শেষ আছে কিন্তু বিধবার অশৌচের আর শেষ নাই! ঠাকুরমা, দিদিমা ও শাশুড়ীকে চিরদিন একবেলা খাইতে ও একাদশী করিতে দেখিয়া আসিতেছি মনে তো কোনদিন কোন প্রশ্ন উঠে নাই; সরল মেয়েটির সোজা কথাগুলির ধাক্কায় মনটা যেন কেমন হইয়া গেল। বিধবা সামাজিক রীতি অনুসারে সর্ব্বপ্রকার ভোগ, বিলাস হইতে বিচ্যুত, কিন্তু শরীরীর শারীর-ধর্ম্ম পালনও কি বিলাসিতা? বিধবার কি ক্ষুধা তৃষ্ণাও পাইবে না?

বিধবা হইবার কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স নাই, আজ যাহারা দিনে ৩।৪ বার খাইতেছে, বিধবা হইলেই তাহাদের সেই খাওয়া একবারে আসিয়া ঠেকে একবেলায়, তাছাড়া মাছ প্রভৃতি অনেক কিছু ত্যাগ করিতে হয়, সর্ব্বোপরি একাদশী আছে। এই সব ছোট ছোট মেয়েরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় যখন এলাইয়া পড়ে, তখন কোন্ সহৃদয় স্নেহপরায়ণ ব্যক্তির মনে না হয় এ ব্যবস্থা অমানুষিক ও বর্ব্বরোচিত? আমি স্বচক্ষে কত বিধবা দেখিয়াছি—একাদশীতে জলস্পর্শ না করিয়া অর্দ্ধমৃতবৎ হইয়া থাকে এবং দ্বাদশীর দিনও ভালরূপে খাইতে পারে না। একাদশীর গ্লানি কাটিতে ২।৩ দিন লাগে।

মুসলমান বালিকাটি বলিল "আমাদের মধ্যে এরূপ নয়।" সে বেশ একটু গর্ব্বের সহিতই এ কথাটি বলিয়াছিল। আমাদের রক্ষণশীলেরাও হয়তো সগর্ব্বে বলিবেন "ওঃ ভারি বিধবা! মাছ খায়, মাংস খায়, দুইবেলা খায়, ওরা আবার বিধবা কোন জায়গায়? আমাদের বিধবা মরলেও জলস্পর্শ করবে না, সাক্ষাৎ পুণ্যের প্রতিমূর্ত্তি।" এখন জিজ্ঞাস্য এই যে যাহা মানুষকে কষ্ট দেয়, পীড়ন করে সেই রীতি ভাল না যাহা মানুষকে স্নেহে সহজ ভাবে রাখে সেই রীতি ভাল? শাক্যসিংহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"যে হত্যা করে সেই অধিকারী না যে রক্ষা করে সেই অধিকারী?"

জলধর সেন মহাশয়ের "একটু জল" নামক গল্পে ছোট বিধবা মেয়েটি 'একটু জল' 'একটু জল' করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, তাহার মা ভাই কাহারও সাধ্য হইল না যে ঐ শিশুর শুষ্ক কণ্ঠে একবিন্দু জল দিয়া

তাহার অন্তিম-তৃষ্ণা নিবারণ করেন। ইহার উত্তরে শ্রদ্ধাস্পদ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন "আমি অশক্ত বিধবাদের জল গ্রহণে মত দিলাম"। এবং "অমুক (তাঁহার নাম মনে নাই) তাঁহার বিধবা পুত্রবধূকে ভগবৎ-প্রসাদী ফলমূল ও গঙ্গাজল দিয়াছিলেন।" এস্থলে অশক্ত বিধবা বলিতে কি বুঝায়? যতক্ষণ বিধবা মৃতবৎ না হইবে ততক্ষণ তাহার জলখাওয়াও হইবে না। সকল বিধবাই জল অভাবে মৃতবৎ না হইতে পারে কিন্তু তৃষ্ণা সকলেরই হয়। তাহারা জল খাইতে পারিবে না কেন? তাহাদের পতির মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া? একাদশীতে জল খাইলে কি পতির প্রতি কর্ত্তব্যের হ্রাস পাইবে না পরলোকবাসী পতি বিধবা পত্নীকে জল খাইতে দেখিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবে?

"ভগবৎ-প্রসাদী ফলমূল ও গঙ্গাজল খাইতে দিয়াছিলেন।" ভগবৎ-প্রসাদী নহে কি? আমরা তো জানি যে জগতের সবই ভগবৎ-প্রসাদী। তিনি কি তাঁহার পুত্রবধূর জন্ম ভগবানের নিকট বিশেষরূপে ফরমাস দিয়া খাবারগুলি আনাইয়াছিলেন? আর গঙ্গাজল কিছু সবদেশে পাওয়া যায় না। সুতরাং গঙ্গাহীন দেশের বিধবা জল খাইতে পারিবে না! সহৃদয় ও সদ্বিবেচনার ব্যবস্থা বটে!

প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের স্ত্রী মরিলে তাঁহার পিতামাতা, আত্মীয় বন্ধু, পুত্র-কন্যা এমন কি তিনি নিজেও আবার বিবাহের জন্ম অস্থির হইয়া উঠেন, কেন না তাঁহার মন খারাপ হয়, ঘরে মনে বসেনা, অতএব শীঘ্রই তাঁহার বিবাহের দরকার।

ভারতবর্ষে প্রকাশিত "বিজিতা" নামক উপন্যাসে বিধবা প্রতিভাকে দেখা যায়। প্রতিভা এত অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে যে, স্বামীর কথা তাহার কিছুই মনে নাই। প্রতিভা শৈলেন্দ্রকে ভালবাসিয়া হৃদয়ের যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, অবশেষে ইহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্ম তাহাকে পলায়ন করিতে হইল। স্বামীকে যাহার স্মরণ নাই তাহার অন্তরে অতি সহজে অপরের স্থান হইতে পারে। 'তুই যে বিধবা' এ কথা অন্যে তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে, কঠোর শাসনের দ্বারা তাহার হৃদয়কে রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে কি? অথচ তাহারই সম্মুখে বয়সে তাহা হইতে অনেক বড় একজন পুরুষ পত্নীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ করিয়া পরমসুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, একবারও তাহাকে আমরা তাহার মৃত পত্নীর নাম উল্লেখ করিতে শুনি নাই। অধিকন্তু তাহার পূর্ব্ব স্ত্রীর একটি পুত্রও আছে। অবশেষে এই প্রতিভা পরকালে শৈলেন্দ্রকে যেন পায় এই প্রার্থনা করিল। সে তো তাহার স্বামীকে প্রার্থনা করিল না! সে যে কেন বৈধব্য পালন করিল, কেন শৈলেন্দ্রকে ইহকালে সে পাইল না ইহার কারণ কিছুই বুঝা যায় না।

আমাদের সমাজ-হিতৈষীগণের দৃষ্টি নারী যাহাতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে না পারে। "আমার জিনিসকে অপরে অধিকার কেন করিবে" এই ইচ্ছা হইতেই এই ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রী যেরূপ স্বামীর, স্বামীও তেমনি স্ত্রীর। একই মন্ত্রে পরস্পর বিবাহিত হয়। পুরুষ কোন সুবিচারে তাহা অপরকে দান করে? নারী আশ্চর্য্যও হইতে পারে যে পুরুষ কিরূপে ১০।২০।৩০।৪০ বৎসর একত্র বাসের পর আবার অনায়াসে বিবাহ করে! উভয়ে যদি উভয়কে প্রার্থনা করে তবেই তো পরলোকে মিলন হইবে। ফলে সে ভার নারীর ঘাড়ে ফেলিয়া রাখিয়া ফাঁকির দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করা মানুষের উচিত নহে। যদি সত্যই পরলোকের প্রতি বিশ্বাস থাকে, তবে জোড় করিয়া নারীকে নিবৃত্ত না করিয়া পুরুষও দ্বিতীয়বার বিবাহ হইতে নিবৃত্ত হউন, পরলোকগত পত্নীর সহিত অক্ষয় মিলনের ইচ্ছায় ইহলোকে যশ ও অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া মুসলমান ও খৃষ্টান-সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া, সগর্ব্বে উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হউন।

অতীত যুগের প্রতি চাহিয়া দেখি যে সীতাকে রাবণ চুরি করিয়া লইলে রাম কত চেষ্টায়

তাঁহাকে উদ্ধার করেন। এখনকার পুরুষ রাম হইতে অনেক বুদ্ধিমান। তাঁহারা কি এরূপ চুরিকরা স্ত্রীর জন্য নির্ব্বোধের মত বৃথা এত কষ্ট করিতেন? দিব্যি আর একটি বিবাহ করিতেন; রাম তাহা করিলে অনর্থক রাক্ষসরাজ্য ধ্বংশ, বানরবংশ ধ্বংশ হইত না, নির্ব্বিবাদে গোল চুকিত। রাম কি বুদ্ধির কাজ করিয়াছিলেন? বর্ত্তমান কালের পুরুষ রামের মত নির্বুদ্ধিতা করেননা ইহা ভাগ্যের কথা, নতুবা নারীগণের আর সতীত্ব থাকিত না। কই আজকাল বলপূর্ব্বক কোন গুণ্ডা কোন নারীকে লইয়া গেলে তাহার স্বামী তো এত গোলমাল করেন না! সে স্ত্রী যদি দাসীর পদও প্রার্থনা করে তবু তাহাকে স্থান দেন না! কি সুন্দর কর্ত্তব্যপরায়ণতা! বর্ত্তমান উন্নতযুগের ইহা সুন্দর দৃষ্টান্ত! পুরুষকে এ বিষয়ে অভিনন্দন করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম। নারীসম্মানে ও নারীভক্তিতে পুরুষ কেবলমাত্র বিখ্যাত পিতৃভক্ত আওরঙ্গজেবের সহিত তুলনীয় হইতে পারে।

জীবন প্রবাহ

শ্রীমতী ভক্তিসুধা হার।

চল্‌তে হবে কর্ম্মপথে
হবেই চলিতে,
গোপন বুকের নীরব কথা
উথ্‌লে ওঠা প্রাণের ব্যথা
বল্‌তে হবে বিশ্ব-সভায়
হবেই বলিতে,
চল্‌তে হবে কর্ম্ম-পথে
হবেই চলিতে।

কুণ্ঠাবরণ গুণ্ঠা তোমার
হবেই তুলিতে;
লাগ্‌তে হবে সকল কাজে
জাগ্‌তে হবে সবার মাঝে
ঘুম ভেঙ্গে যে আজ্‌কে হবে
নয়ন খুলিতে;
কুণ্ঠাবরণ গুণ্ঠা তোমার
হবেই তুলিতে।

আজ্‌কে যে তান তুলতে হবে
নূতন সুরেতে,
এই ধরণীর গন্ধে গানে
জাগ্‌বিরে তুই নবীন-প্রাণে
শঙ্কা-ভীতি, লজ্জা-সরম
রইবে দূরেতে;
আজ্‌কে যে তান তুল্‌তে হবে
নূতন সুরেতে।

আজ তোমারে সবার মাঝে
হবেই দাঁড়াতে,
তন্দ্রা-অলস স্বপন টুটে
নূতন-আলোয় আয়রে ছুটে
কঠিন-হৃদয় সিক্ত করি'
প্রেমের ধারাতে;
আজ তোমারে সবার মাঝে
হবেই দাঁড়াতে।

মন্দাকিনী

শ্রীমতী কুলবালা দেবী।

(১)

একে শারদীয়া মেলা, তায় আবার সেদিন রাজকুমারী মন্দাকিনীর জন্মোৎসব। উৎসবের আয়োজনটা এবারেও প্রতি বৎসরের মত বিরাট রকমেরই হয়েছে। রাজার একটা নতুন খেয়াল হয়েছে, প্রকাণ্ড নীল দীঘির মাঝ-জলে লাল পাথরের তৈরী একটী রক্তকমল এমন ক'রে ভাসিয়ে রাখা হবে, যেন সেটী দেখাবে সরোবর-জাত সদ্য ফোটা কমল; যে আগে সাঁতরে গিয়ে পদ্মটী তুলে এনে রাজকুমারীকে এই উৎসব-দিনে উপহার দেবে সেই হবে মন্দাকিনীর স্বামী।

তবে দু'জন ছাড়া এ প্রতিযোগিতায় আর কেউ অধিকার পাবে না। একজন প্রতাপপুরের রাজকুমার শশাঙ্কমোহন, আর একজন রাজার পালক-পুত্র আদিত্যনারায়ণ। এই জন্য এবার উৎসবের খুব ধুম। দেশ-দেশান্তর হ'তে আত্মীয়-স্বজন আসতে সুরু হয়েছে বহু পূর্ব্ব হতেই, কুবেরের ভাণ্ডার উজাড় করে এনে রাজপুরী সাজান হয়েছে তবু যেন কত এখনও বাকি।

পত্রে পুষ্পে মঙ্গলকলসে তোরণগুলি সজ্জিত হ'য়ে দেশবাসীকে আনন্দ-আলয়ে আহ্বান ক'চ্ছে। আবাল-বৃদ্ধ দলে দলে আসছে উৎসবের আনন্দ বাড়ি'য় তুলতে। কত শোকাতুরা বৃদ্ধ বৃদ্ধা আজকের দিনে জরাকেও বিস্মৃত হ'য়ে সুবেশে রাজকুমারীকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছে, আবার মরণোন্মুখ রোগী যে সেও তার শীর্ণ কম্পিত দেহকে লাঠির ভরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে যেখানে রাজসূয় যজ্ঞের মত দান-ভাণ্ডার মুক্ত ক'রে দেওয়া হয়েছে প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করবার জন্যে।

রাজকুমারীর তিলমাত্র অবকাশ নেই। বহুমূল্য বসনভূষণ-ভূষিতা সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা মন্দাকিনী মূর্ত্তিমতী উৎসব-রাণীর মত অন্তঃপুর-উৎসবের ভার নিয়েছে নিজে।

নীল দীঘি হ'তে পদ্ম তোলবার সময় নির্দ্দেশ করা হয়েছে গোধূলি বেলায়। আর দেরী নেই। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দীঘির পাড় লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌ল। সকলের মনেই এই কথাটা জাগছে —আর একটু পরেই ভাগ্যলক্ষ্মী কে জানে কাকে জয়মাল্য পরিয়ে দেবেন।

নির্দ্দেশিত সময়ে দুটী সবল সুন্দর যুবক দীঘির জলে পূর্ণ উদ্যমে সাঁতরে চল্‌লো পদ্মটী লক্ষ করে। একবার আদিত্য কিছু এগিয়ে যাচ্ছে আবার তখনি কুমার শশাঙ্ক আদিত্যের দুহাত আগে চলে যাচ্ছে। উভয়েই সন্তরণে পটু, এখন জয় পরাজয় অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। আর একটু, আর এক পলকেই আদিত্য পদ্ম স্পর্শ করবে! কিন্তু এ কি, হাজার কণ্ঠে ও কার জয় ঘোষিত হল? কুমার শশাঙ্ক-মোহনের জয়!"

বাতায়ন-পথে দুইখানি মুখ বেশ দেখা যাচ্ছে, একখানি উল্লাসে উৎফুল্ল, একখানি বিষাদে ম্লান। পূর্ণিমার রাত, চাঁদের আলো আর সুরভিত দক্ষিণ বাতাসের পরশ মেখে ফুলবাগানের শোভা শত ধারায় উছলে পড়ছিল, কামিনীঝাড়ের কেয়ারির চারি পাশ দিয়ে মাধবীলতা লতিয়ে জড়িয়ে যেখানটীতে বিশ্রাম-কুঞ্জ গড়ে উঠেছিল ঠিক তারি সামনা সাম্‌নে দুটী বিশ্রাম-বেদীতে বসেছিল উৎসবক্লান্তা মন্দাকিনী ও তাহার সখী মঞ্জুলা।

মঞ্জুলাই প্রথম কথাটা উত্থাপন করলে—"দিদি,

আমি বেশ দেখেছি আদিত্যই প্রথম পদ্ম স্পর্শ করেছিলেন, কুমার ত একরকম জোর ক'রেই তাঁকে ঠেলে দিয়ে পদ্ম তুলে নিলে।" "হাজার হাজার লোকের দৃষ্টিশক্তি তবে সেই সময় লোপ হয়েছিল বল?" মন্দাকিনীর স্বরে বিদ্রূপ মাখা।

"কিন্তু দিদি যাই বল, আদিত্য যতখানি ভালবাসেন কুমার তার শত অংশের এক অংশও পারবে না, এ তুমি স্থির জেন'; তাই বলি তুমি আদিত্যকেই,--"

মন্দাকিনীর অধরে উপেক্ষার হাসি ফুটে উঠল। সে বললে "তুই কি পাগল হলি মঞ্জু, না ভুলে গেছিস আমি রাজার মেয়ে আর আদিত্য বাবার আশ্রিত অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী ছাড়া আর কিছু নয়। আশৈশব পরাশ্রিত, রাজানুগ্রহে পালিত।"

আদিত্যের প্রতি মন্দাকিনীর তাচ্ছিল্য ভাব মঞ্জুলা বহু পূর্ব্ব হইতেই লক্ষ্য করে আসছিল, আজ মন্দাকিনীর স্পষ্ট উক্তিতে তার সারা বুক ব্যথার খোঁচায় একবার খচ ক'রে উঠল। মঞ্জুলা আবার কঠিন স্বরে বললে "আত্মমর্য্যাদাভিমান ভুলে যাও দিদি, আমি বেশ জানি তোমার অভাবে জীবন তাঁর মরুময় হ'য়ে উঠবে।"

"তোর কি ধারণ মঞ্জু সে আমায় ভালবাসে? কক্ষন' নয়। দরিদ্র সে, ভালবাসে আমার রূপৈশ্বর্য্য।" "ভুল, সম্পূর্ণ ভুল তোমার।"

মঞ্জুলা উত্তেজিত হয়ে বললে "আদিত্যের ভালবাসা কামনার গন্ধলেশহীন এ আমি শপথ ক'রে বলতে পারি। আরও বলতে পারি তাঁর ভালবাসার মূল্য এই রাজ্যের ভাবী অধিশ্বরীর জীবন বিনিময়েও নিরূপণ হয় না।"

এত বড় কথাটা আর কাহারও মুখ দিয়ে বার হ'লে কি যে অনর্থ হ'ত তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে, কিন্তু পিতৃমাতৃহীনা মঞ্জুলাকে মন্দাকিনী সহোদরাসম স্নেহ ক'রত বলে সকল অপরাধই ছিল তাঁর মার্জ্জনীয়।

কিছুদিন হ'তে মন্দাকিনীর মনেও কেমন একটু সন্দেহের আবছায়া পড়েছিল, তাই উপযুক্ত অবসর বোধে সকল সন্দেহের সমাপ্তি করবার আশায় মন্দাকিনী তখন বলে ফেলল "আচ্ছা সত্য বল দেখি তুই আদিত্যকে ভালবাসিস কিনা?"

মঞ্জুলা নীরব। এর উত্তর যে তার সারা দেহ মনে নিশিদিন দিয়েও সে তৃপ্তি পায় না। হৃদয়ের গোপন-মন্দিরে সংগোপনে সে আদিত্যকে পূজা করে, কিন্তু মনের মৌন দেবতায় প্রসন্ন করবার আকাঙ্ক্ষা তো সে কোনও দিন রাখেনি, সেই অনাপৃজ্জিত গৌরবের পূজাই যে ছিল তার একমাত্র কাম্য।

মন্দাকিনী সস্নেহে বললে "এতদিন কেন বলিসনি মঞ্জু?"

স্নেহের সাড়ায় চোখের জল আর বাধা মানল না, চাঁপা গাছের ঝাঁকড়া ডালটার অনেকখানি ছায়া পড়েছিল মঞ্জুলার মুখে, তাই মন্দাকিনী দেখতে পেলে না তার দুই চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরে পড়ছে। মন্দাকিনী বললে "তুই এ বিশ্বাস করিস মঞ্জু—নিঃস্বার্থভাবে সে আমায় ভালবেসেছে?"

—"অবিশ্বাসের তো কারণ নেই দিদি আমি কত দিন দেখেছি তোমায় ঘুমন্ত দেখতে দেখতে তিনি আত্মহারা হয়ে গেছেন, কিন্তু তোমায় তা কখন জানতে দেন নি, যেদিন হতে বুঝেছি তোমার নীরব পূজায় তাঁর আত্ম সমর্পিত সেই দিন হতেই আমিও তাঁকে মনে মনে পূজা করেছি কামনা-লেশ না রেখে—মঞ্জুলার কথা গুলি কান্নায় ভেজা।

মন্দাকিনী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার মঞ্জুলার মুখের দিকে চাইল, কিন্তু বুঝে উঠতে পারল না মঞ্জুলার তৃপ্তি ত্যাগে,—না ভোগে!

(২)

কঠিন রোগে আদিত্য শয্যাশায়ী। বসন্ত-ব্যাধি সংক্রামক, সুতরাং রোগের সূত্রপাতেই তাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ঔষধ পথ্য নিয়মিতই দেওয়া হচ্ছে, সেবারও ত্রুটী নেই, আদিত্যের যন্ত্রণা-কাতর মুখের দিকে অপলক আঁখি দুটী সদা সতর্ক

রেখে মঞ্জুলা শুশ্রূষায় নিযুক্ত। তবু রোগ উপশম হয় কই? মৃত্যু-সংগ্রামে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝতে পেরে সকলেই হতাশ হয়ে পড়ছিল।

প্রায় সপ্তাহকাল পরে একদিন গভীর রাত্রে আদিত্যের জ্ঞানের লক্ষণ দেখে মঞ্জুলার ব্যথিত অন্তর সেবাসার্থকে ধন্য হয়ে উঠল বটে, কিন্তু তার মুখখানি ছেয়ে যে চিন্তার ছোপ ধরেছিল তা-তো কই একটুও মিলিয়ে গেল না।

উজ্জ্বল আলোয় কক্ষ আলোকিত, বাহিরেও বর্ষাস্নাতা অনন্ত সৌন্দর্য্য সেই শান্তপ্রকৃতি নিস্তব্ধ নিশিথিনীকে জ্যোৎস্না বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। খোলা জানালা দিয়ে ঘরেও চাঁদের আলো এসেছিল অনেকখানি।

মঞ্জুলা তখন আদিত্যের পায়ের গোড়ায় বসে উছলে পড়া চোখের জলকে কোন মতে চেপে রাখছিল, পাছে এক ফোঁটাও তাঁর পায়ে পড়ে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে আদিত্য একবার চারিদিকে চাইল, তার পর ক্ষীণস্বরে বললে, "মন্দা, আমি কোথায়?"

"ভাল যায়গায় আছেন, আপনি পীড়িত।"

উৎকণ্ঠা ভরে আদিত্য হঠাৎ উঠে বসল, মঞ্জুলার হাতখানা খপ ক'রে ধরে ফেলে বললে—"এ স্বপ্ন নয়তো মন্দা, কত যুগযুগান্ত ধরেই না তোমায় এমনি ক'রে পেতে চেয়েছি, পায়নি কেন মন্দা? তোমার আমার মধ্যে কি একটা যেন এত দিন আড়াল দিয়ে রেখেছিল, এখন দেখছি সে ব্যবধান আর আমাদের মাঝে নেই।"—আদিত্যের চোখ দুটি তখনও অর্দ্ধ মুদিত।

মঞ্জুলা মনে মনে বললে "হায় কোথায় তোমার মন্দাকিনী, সে যে তোমার সুখময় ভবিষ্যৎকে অবহেলার দলে একক্ষণ কুমার শশাঙ্কের পাশে কুসুম-শয়নে শায়িতা, আজ যে তার ফুলশয্যা-যামিনী। ওগো কেমন করে নিষ্ঠুর হয়ে তোমায় সে কথা জানাব! আজ সে কত সুখী আর চির-কাঙালিনী এ হতভাগী তার কাঙাল-ক্ষুধা নিয়ে অমৃত পারাবারের তীরে দাঁড়িয়ে আছে কোন্ কল্পলোকে পাওয়া নিষেধ-অধিকারের দাবী নিয়ে।…

আদিত্যের রোগ-দুর্ব্বল কম্পিত দেহ বাহু-বেষ্টনে ধরে শুইয়ে দিয়ে মঞ্জুলা কোমল কণ্ঠে বললে "অত ব্যস্ত হবেন না আপনি, এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য হননি।"

"না মন্দা, এখন আমি রোগমুক্ত, বল তুমি আমায় আর—"

উজ্জ্বল আলোটা আরও একটু উজ্জ্বল করে দিয়ে একটু কি যেন ভেবে নিয়ে মঞ্জুলা আলোর সামনে এসে দাঁড়াল, তার পর মাথাটা একটু উঁচু করে বললে "আমায় চিনতে পাচ্ছেন না, আপনি যাকে ভাবছেন আমি সে নয়, তাঁর সখী মঞ্জুলাকে মনে আছে কি?"…

বেশ পরিষ্কার চোখে আদিত্য মঞ্জুলার মুখের দিকে চেয়ে দেখল, সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত্তনাদ করে শয্যায় লুটিয়ে পড়ল।

(৩)

কালের পরিবর্ত্তন বুকে নিয়ে জলস্রোতের মত দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অতীত হয়ে গেছে। এখন মন্দাকিনী অপুত্রক বিধবা, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-ধারিণী। মঞ্জুলা আজও কুমারী।

রোগ মুক্তির পর হতে আদিত্যকে কেহ আর দেখেনি, তার স্মৃতিও সকলের মন থেকে প্রায় মুছে গেছে, তবে একজন এখনও তাকে ভুলতে পারেনি,—সে মঞ্জুলা। মঞ্জুলা দিনান্তে একবারও দুই বিন্দু অশ্রু উপচারে আদিত্যের পূজা করতে ভুলে যেত না।

হঠাৎ একদিন লোকমুখে রাষ্ট্র হয়ে গেল আদিত্যনারায়ণ নাকি বহু ধন উপার্জ্জন করে ফিরে এসেছে। শতদ্রু-সৈকতে প্রাসাদ-সম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে সস্ত্রীক বাস করছে।

তখন অপরাহ্ন বেলা। মুক্ত বাতায়নে বসে মঞ্জুলা ভাবছে,—সত্যই কি তিনি মন্দাকিনীকে

ভুলতে পেরেছেন, মন তা বিশ্বাস করতে চায় না যে! তবেতো মন্দাকিনী ঠিকই বলেছিল,—পুরুষ ভালবাসতে জানে না ক্ষণিক রূপের মোহে তারা অমনি পাগল সাজে তারপর সেই ক্ষণভঙ্গুর মোহ কেটে গেলে দেখতে পাওয়া যায় হাল্কা বাতাসের মৃদুস্পর্শে ঝরা শেফালিকার মত তার ঝরে পড়ে।

চিন্তানিবিষ্টা মঞ্জুলার পাশে এসে মন্দাকিনী মৃদু হেসে বললে "কি ভাবছিস মঞ্জু, আদিত্যের নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রত্যক্ষ পরিচয় তুই একদিন পেয়েছিলি না?"

মঞ্জুলার মুখ ম্লান হয়ে গেল—গোধূলির ম্লান আকাশের মত। আজ আর সে মন্দাকিনীর কথার প্রতিবাদ খুঁজে পেলে না।

মন্দা ইদানীং ব্যথিতার নীরব ভাষা বেশ বুঝতে পারত। সস্নেহে মঞ্জুলার হাতখানি ধরে কোমল কণ্ঠে বললে "দেখ মঞ্জু, যেমন করে হ'ক সেই অকৃতজ্ঞের সঙ্গে একবার আমায় দেখা করতেই হবে, কেন তা শুনবি?—তোর জন্যে, তোর—

মঞ্জুলা বাধা দিয়ে বললে, "আমার জন্যে?"

"—হ্যাঁ তোরই জন্যে তোর জীবনের সম্পূর্ণ দায়ী সে-ই।"

"এ তোমার মস্ত ভুল, তিনি তো কোন দিনই আমায়—"

"তবে কেন তুই নিজের জীবনকে চিরব্যর্থতায় ভরিয়ে রাখলি বোন?"

মঞ্জুলা নত হয়ে বললে "না দিদি, আমার জীবন চির-সার্থকতায় পরিপূর্ণ।"

মন্দাকিনী একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললে "তুই সত্যিক ভালবাসতে শিখিছিলি মঞ্জু, এমনটী যদি সবাই পারতো!"...

(৪)

বাসন্তী প্রভাতে অরুণের সোনার কিরণ আদিত্যনারায়ণের শুভ্র ধবল প্রাসাদ-শিরে যখন সোনালি জাল বুনছিল সেই সময় দুটী যোগিনী দ্বারে এসে দাঁড়াল, দ্বারবান সসম্ভ্রমে যোগিনীদের চরণে প্রণত হয়ে দ্বার ছেড়ে দিল। যোগিনীদ্বয় এমন ভাবটী জানালে তারা যেন প্রভুর পরিচিত আত্মীয়। একজন ভৃত্য দ্বিতলের একটী কক্ষ দেখিয়ে বললে "ঐ খানেই তিনি সর্ব্বদা থাকেন, আপনারা যান, আমাদের ও ঘরে প্রবেশাধিকার নিষেধ।"

কম্পিত চরণে দুরু দুরু বক্ষে উভয়ে এগিয়ে চলল। সূক্ষ্ম রেশমী পর্দ্দা ঠেলে এক প্রকাণ্ড ঘরে তারা প্রবেশ করল। বিলাসীর কক্ষ অগুরু-চন্দনগন্ধে ভরপুর, ষড়ৈশ্বর্য্যে সুসজ্জিত। ঠিক সামনেই এক অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী ষোড়শী সুন্দরী সহাস্যে দাঁড়িয়ে আছে। যোগিনীদ্বয় স্তম্ভিত ও ততোধিক বিস্মিত! চন্দ্র সূর্য্য যদি শরীর ধারণ করে মর্ত্তে নেমে আসতেন তা দেখেও বোধ হয় উভয়ে এত আশ্চর্য্য হত না। কিন্তু একি? এযে শ্বেতমর্ম্মর-গঠিত মন্দাকিনীর মূর্ত্তি!...

কক্ষে তখন এক বিরাট নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল, সেই নীস্তব্ধতা ভঙ্গ করে উল্লাসিতা মঞ্জুলা বলে উঠল "ধন্য একনিষ্ঠ পূজারী, তোমার সাধনা-শক্তি, প্রেমমহামন্ত্র-বলে আজ তুমি পাষাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছ!"—পাষাণীর সেই উৎসব-দিনের বেশ! জর্দ্দারংয়ের সাড়ির আঁচলখানি তেমনি ভাবেই কোমরে জড়ান, হিরক-চূর্ণের উজ্জ্বল আভা সেদিনও মন্দাকিনীর গোলাপী গণ্ডে মিশে বিচিত্র বর্ণ-মাধুরী ফুটিয়ে তুলেছিল। হাতে সেই রক্ত কমল! মূর্ত্তির চরণতলে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে আদিত্য উপবিষ্ট! এতো বিলাসী কোটিশ্বর আদিত্যনারায়ণ নয়,—এযে ত্যাগের পরম শান্তিময় মূর্ত্তি—ভবানীপতি!

যোগিনীদের মস্তক আপনা হতেই যেন প্রণাম-নত হয়ে পড়ল যোগীর পায়ের কাছে।

মন্দা ডাকিল—"আদিত্য।"

"কেন মন্দা?"

"তুমি জান বোধ হয় আমি পরস্ত্রী, অদৃষ্ট বিড়ম্বনায় এখন বিধবা।

"জানি মন্দা, কিন্তু—"

"কিন্তু নয়, এই মুহূর্ত্তে তুমি এ মূর্ত্তি ভেঙ্গে ফেল।"

"হাঁ, সে সঙ্কল্প অনেক দিন হ'তে আমার মনে আছে। তবে এতদিন করিনি কেবল তোমারই অপেক্ষায়। একদিন তোমারই সামনে বিদায়-বিসর্জ্জন আরও সুখময় করে তুলব বলে প্রতিক্ষায় বসে আছি।"

কথা শেষ করেই সেই পাষাণ-প্রতিমা বুকে তুলে নিয়ে আদিত্য বললে "এস মন্দা, মঞ্জুলা তুমিও এস।"

দুকূল-প্লাবী মহানদ শতদ্রু ভীমগর্জ্জনে বয়ে যাচ্ছে কত দূর দূরান্তরে, সেই নদীর উঁচু বাঁধে এসে তিনজনে দাঁড়াল। একটু নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে, আদিত্য একবার ব্যথাতুর দীপ্ত দৃষ্টিতে মঞ্জুলার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বললে "ক্ষমা কর মঞ্জুলা, তোমার পূণ্যময় প্রেম অযোগ্যে অর্পণ করেছিলে! ভুলে যাও এ হতভাগ্যকে? আর মন্দা তুমিও—" মুখের কথা তার মুখেই র'য়ে গেল; পাষাণ মূর্ত্তি বুকে দৃঢ় করে চেপে ধরে আদিত্য নিমেষমধ্যে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

"একি করলে, ওগো আর একটু অপেক্ষা কর"—বলে আর্ত্তচীৎকার করে মঞ্জুলা জলের বুকে ঝাঁপিয়ে পরল। সঙ্গে সঙ্গে শতদ্রুর ফেনীল জলরাশি তখনি উচ্ছল হয়ে তরঙ্গ ভঙ্গে নেচে চলল—দুটী মর্ত্ত-দুর্লভ পবিত্র প্রেমময় জীবন বলি নিয়ে!

নিবেদন

শ্রীমতী সলিলা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চাহি না ত জগতের ধন অলঙ্কার,
দাও মোরে নম্রতা-ভূষণ;
মান, উচ্চপদ নাহি চাই এ ভবের
হৃদে পূর্ণ শান্তি কর দান।
সহিব জীবনে নাথ যত সহাইবে,
নাহি হব দুঃখেতে কাতর;
লাঞ্ছনা, তাড়না শত বল কি করিবে,
তুমি যদি হৃদে থাক মোর।
সব চিন্তা, উচ্চ আশা ভুলায়ে আমার
তুমি মাত্র হও লক্ষ্য সার,
তব আরাধনা, সেবা হ'ক প্রেমাধার
জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত মোর।
ধুয়ে মুছে শুচি করি এ হৃদি-আসন,
কর তুমি পূর্ণ অধিকার।
যতটুকু ভক্তি আছে, অর্ঘ্য করি দান,—
লও ওগো রাজ রাজেশ্বর।
নিভৃত হৃদয় মাঝে প্রেমের মন্দিরে,
আরাধ্য দেবতা হও মোর,
শিরে দাও পদরজঃ, কর আশীর্ব্বাদ,
ধন্য হ'ক জীবন আমার।

পূজা ও সৌন্দর্য্য

শ্রীমতী লীলা দেবী।

পূজা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার ক'রে নিতে পারি না ব'লেই উভয়কে বিচ্ছিন্ন ক'রে উভয়েরই অবহানির এনে থাক। এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধকে বোধ হয় আমাদের জ্ঞানী পূর্ব্বপুরুষেরা ভালো ক'রে জেনেছিলেন ব'লেই পূজার সমস্ত আয়োজনকেই বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে ভূষিত করবার জন্যে এত রকম বিধিব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত ক'রেছিলেন। তাই বোধনের বাজনা, তোরণের আম্রপল্লব ও পূর্ণ কুম্ভ, তাই নৈবেদ্য সম্ভার, ও পুষ্পপাত্রের ১০৮ অরবিন্দ, তাই ধূপ ধূনা অগুরু চন্দনের ছড়াছড়ি, ফুলের মালার আলিম্পন ও আরতীর পঞ্চপ্রদীপ। তাই মাঙ্গলিক শঙ্খনিনাদ ও সানায়ের করুণ কোমল সুমধুর সঙ্গীত এক সৌন্দর্য্যের দ্যোতনা করে। অবশ্য এগুলি সমস্তই বাহ্যিক কিন্তু বাহ্যিকতা ভিন্ন সাধারণের মধ্যে কোন ভাব বা রূপকে প্রকাশ করাও যায় না। তাই তাঁরা বাহ্যিকতার আশ্রয় নিয়ে, পূজা যে অন্তর্লোকের সৌন্দর্য্যসমৃদ্ধির ব্যক্ত মূর্ত্তি সেইটারই অভিব্যক্তিতে পূজার নিয়মপ্রথা প্রচলিত ক'রেছিলেন। অবশ্য আমার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও যুক্তিহীন হ'তে পারে কারণ যোগশাস্ত্র আলোচনা ক'রলে দেখা যায় যে বাহ্যিক পূজার প্রত্যেকটী অঙ্গ আধ্যাত্মিক বা আত্মযোগের এক একটী ইঙ্গিত মাত্র কিন্তু সে স্থলেও ভাবুকতার দিক দিয়ে দেখতে গেলে যোগের ঘনীভূত অবস্থা বা আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন এক বিপুল প্রেমের পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর প্রেম যেখানে আছে সেখানে সৌন্দর্য্যকে বাদ দেওয়া যায় না—প্রেম, সৌন্দর্য্য ও আনন্দ পরস্পরের নামান্তর মাত্র। ধ'রতে গেলে পূজারই দ্বিতীয় নাম প্রেম। অতএব আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে দেখতে গেলেও পূজা ও সৌন্দর্য্য পরস্পরের অপেক্ষা রাখে। পূজার অর্থ পবিত্রতা—এই পবিত্রতা মানসিক ও দৈহিক দুই হিসাবেই প্রযুজ্য। সেইজন্যেই শাস্ত্রে আছে শুদ্ধ না হ'লে পূজার অধিকার নাই। কিন্তু আজকাল এই শুদ্ধতা কেবলমাত্র বস্ত্র পরিবর্ত্তন ও অস্পৃশ্যতাবাদ-সংস্কারে গিয়ে পৌঁছেছে। যথার্থ পবিত্রতা সাধনা-সাপেক্ষ। মনের পবিত্রতা যে কি জিনিষ, তাতে যে মানুষের কত বড় সম্পদ সুগোপন আছে তা বোধ হয় আমরা সব সময় লক্ষ্য করি না। নিজের মন যাঁর পবিত্র, তিনিই নির্ভীক উদার পরিতৃপ্ত ও মহৎ, তিনিই প্রেমিক ও সুন্দর! অপরে তাঁর অনিষ্ট করবার শত প্রয়াস সত্ত্বেও নখাগ্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করতে পারে না কারণ প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মে 'যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ'।

এই পবিত্রতাই পূজা। যেখানে এই পূজা বা পবিত্রতা আছে সেখানে অনন্ত সৌন্দর্য্যের উৎস অফুরন্ত। যে ব্যক্তির মন ঐরূপ পবিত্র তাঁর মুখে যে জ্যোতিঃ যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আলোক ও তেজ উদ্ভাসিত হয় তাহাই সৌন্দর্য্য। তাঁর আয়ত চক্ষের আবেশপূর্ণ চাহনিতে যে নিষ্কাম প্রেম, হাস্যদীপ্ত অধরে যে বিশ্বপ্রীতি, প্রশস্ত ললাটে যে পরাজ্ঞানের মহিমা প্রোজ্জ্বল থাকে, তাহাই সৌন্দর্য্য! তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এক বিপুল সৌন্দর্য্যের আধার। যে দ্যুতি, যে নির্ম্মলপ্রভা তাঁদের কাছে গেলে অনুভব করি তাহাই সৌন্দর্য্য। এই অনুপমেয় সৌন্দর্য্য চোখের বিশালতায়, বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে বা অধরের লালিমায় স্ফুট নহে, তাহা তাঁহার একান্ত ভালবাসার ফলে, পবিত্রতারূপ জ্ঞান ও আনন্দ লাভের জ্যোতিতে।

এইরূপ সৌন্দর্য্যই সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্ব-

জাতিতে, ও সর্ব্বাবস্থায় বাঞ্ছনীয়। এর ক্ষয় নেই, বিলোপ নেই। যৌবনের ক্ষণিকতা, রোগের বিভীষিকা, শোকের কালিমা এ সৌন্দর্য্যের বিন্দুমাত্রও হানি ক'রতে পারে না।

আজকাল আমরা রূপের প্রাচুর্য্য লাভের জন্য কত রকম প্রয়াসই না ক'রে থাকি! কত হেজেলিন্, ভেজেলিন্ কত স্নো, ব্লুম্, ক্রীম্, সোসান্, কত পাউডারের যে শ্রাদ্ধ করি তার আর ঠিক্ ঠিকানা নেই। এর ফলে সৌন্দর্য্য বাড়া তো দূরের কথা কিছুদিন বাদে মুখের কোমল চামড়া ব্রণ মেছেতা ইত্যাদি চর্ম্মরোগের আকর হয় ও স্বভাবতঃ ফর্সা রংও ঐ সকল জিনিষ ব্যবহারে একেবারে মলিন ও প্রভাশূন্য হ'য়ে পড়ে কারণ ক্রমাগত মুখের উপর কোন না কোন প্রলেপ পড়ায় মুখস্থ ছিদ্রগুলি বন্ধ হ'য়ে যায়। আর তাও যদি কেউ না স্বীকার করেন, যদি কারো এই বিশ্বাসই থাকে যে ঐ সব cosmetic ব্যবহারে তাঁদের সৌন্দর্য্যের কখনই ক্ষতি হবে না তা হলেও কালকে বা অদৃষ্টকে তো cosmetic দিয়ে এড়ান যায়না, এটা অস্বীকার করবার মত যুক্তি বোধ হয় কেউ এখনও খুঁজে পাননি। অবশ্য পাশ্চাত্যে এর আলোচনা ও উপায় যথেষ্ট হ'য়েছে ও হ'চ্ছে, দৈহিক সৌন্দর্য্য চিরদিন বজায় রাখার জন্যে তারা নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত আছে। কিন্তু যে সৌন্দর্য্যের মূল মুখোস বা চর্ম্ম পরিবর্ত্তন বা যে কোন বস্তুবিজ্ঞানের সাহায্যের উপর নির্ভর করে, সে সৌন্দর্য্য কি যথার্থই চোখ জুড়ান, প্রাণ জুড়ান হ'তে পারে? সে সৌন্দর্য্য কি হৃদয় ঢালা আত্মোৎসর্গ, অফুরন্ত প্রেম ও শ্রদ্ধার অধিকারী?

যথার্থ সুন্দর হবার জন্যে আমাদের আত্ম পূজা বা পবিত্রতার দরকার। অবশ্য ভেদে এই পূজার বিবিধ নাম—পূজা, পবিত্রতা, প্রেম, আনন্দ, সৌন্দর্য্য—ও সব শেষ প্রকাশ বা সৃষ্টি করণ। কারণ এতগুলি বিভূতি বা ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য যে মনের উপলব্ধ হ'য়েছে সৃষ্টি করা তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই সৌন্দর্য্য অলীক যৌবনের অপেক্ষা রাখে না, যৌবনই ইহার চিরবশীভূত থাকে, ব্যাধির মালিন্য এ সৌন্দর্য্যের ক্ষতি হয় না কারণ ব্যধিকেও এই সৌন্দর্য্য হাস্যমুখে প্রিয়তমের দান ব'লে বরণ করে, শোকের কালিমা তার মুখে অশান্তির অন্ধকার আনতে সমর্থ নয় কারণ শোককে এই ইন্দ্রিয়-বিজয়ী সৌন্দর্য্য প্রেমালিঙ্গন দিয়ে কৃতার্থ ক'রেছে। এই চির-যৌবনের উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"মোদের পাক্‌বেনারে চুল পাক্‌বেনা,
মোদের ঝ'রবেনারে ফুল ঝ'রবেনা।"

নয়নাভিরাম

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী।

তুমি যে আমার প্রাণে রয়েছ নিয়ত জাগি,
পরাণ কাঁদিয়া রয়ে তোমার মিলন মাগি'।
হে নয়ন অভিরাম,
দরশ অবিরাম
যাচিছে তৃষিত আঁখি আকুল পিয়াসা লাগি,
মরম আপনা ভুলে আমরণ অনুরাগী।
হৃদয়ে হৃদয়ে রাখা,
মোহন মুরতি আঁকা
চাহিছে পরাণ মম সকল করম ত্যাগি'
হে মম সাধন-নিধি, তোমারে পাবার লাগি।

ঘটক আগমন

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী।

রাজসাহী জেলার চারিদিকে রাজা মহারাজা, রাণী মহারাণী ও ধনী জমীদারগণের বাস। তাঁহাদের পুত্রকন্যাদিগের বিবাহ দিবার বয়স হইলে তাঁহারা গ্রামে গ্রামে ঘটক পুরোহিত ও পুরাতন দাসদাসী পাঠাইয়া পাত্র ও কন্যা নির্ব্বাচন করাইতেন। কাহার ঘরে কাহার সন্তানসন্ততিগণের বিবাহ হইতে পারে তাহা সকলেই অবগত আছেন। চৌধুরী কন্যার কুলীন ভিন্ন কাপ শ্রোত্রিয়ের সঙ্গে বিবাহ হয় না। ধনবান উচ্চ কুলীন আবার কাপের ঘরে বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হইতে মোটেই রাজি নয়। কন্যাগত কুল—সেইজন্য হরিপুর, কাশিমপুর ও নালোরের মেয়েদিগের সেকালে বিবাহ দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার ছিল। আজকাল অনেক সুবিধা হইয়াছে, তেমন কঠিন আর নাই। আমাদিগের ঘরের সুন্দরী ভগিনীদিগের বড় মানুষের পুত্রের সহিত বিবাহ হইত। মৈমনসিংহের জমীদারগৃহে অনেকেরই সেকালে বিবাহ হইয়াছে।

"হাটিকুমড়োলের" লাহিড়ীদিগের ঘটক ও অন্যান্য লোকজন পাড়ায় পাড়ায় মেয়ে দেখিয়া অবশেষে শ্যামবর্ণা হরিপ্রিয়া দিদিকেই পছন্দ করিয়া "পালোট" (পরিবর্ত্তে) ছোট দিদির বড় দাদা সারদাভূষণ সান্যালের সহিত লাহিড়ী-কন্যা চিন্ময়ী দেবীর ও তাহার ভ্রাতা বিপিন লাহিড়ীর সঙ্গে ছোটদিদির সম্বন্ধ স্থির করিয়া গেলেন। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল যে কাল, অত্যন্ত চঞ্চল দুরন্ত দস্যু মেয়ের এমন বিবাহ হওয়া একটা বড় সৌভাগ্যের কথা। মেয়ের অদৃষ্ট খুব ভাল।

সারদা দাদার সম্বন্ধে দু'চারি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। তিনি সেকালের হিন্দুকলেজের জুনিয়র সিনিয়র পাস, ৪৫৲ টাকা বৃত্তিপ্রাপ্ত খ্যাতনামা ছাত্র ও সরকারী জেলা স্কুলে হেডমাষ্টারী করিতেন। অঙ্কে সুপণ্ডিত, স্কুলে ছেলেদের শিক্ষা দেবার পক্ষে কিরূপ ছিলেন জানি না, তবে গৃহে ও সমাজে একেবারে অচল। সামাজিক বিধিব্যবস্থা মানিতেন না, যাহা তাহা করিয়া বসিতেন। বুদ্ধিমতী মাতার শাসনে কোনরূপে চলিয়া যাইত। প্রবীণারা তাঁহার সঙ্গে স্ব ইচ্ছায় কথা কহিতেন না। ভাষা "হালুম খালুম গেলুম"—পূরা কলকাত্তাই। গ্রামে পুষ্পগন্ধবিশিষ্ট fool) বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এক একদিন এক এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া গ্রামসুদ্ধ হাসাইতেন। এক কালীপূজার রাত্রে ঘরে বসিয়া বসিয়া পুঁথিপত্র পড়িতেছেন, আহার করিতে ডাকিলে কিছুতেই আসেন না; ব্রাহ্মণ তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইতেছিল, তখন পিসীমা স্বয়ং যাইয়া পুত্রকে আহার করিবার জন্য ডাকিতে লাগিলেন। কোন উত্তর না পাইয়া তিনিও রাগ করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় ঘর হইতে সারদা দাদা বলিয়া উঠিলেন, "মা, আমি খাইয়াছি, এখন উঠিতে মাথা ঘুরিতেছে, হাঁটিতে পারি না।" পিসীমা আবার খুব রাগের সহিত যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খাইয়াছিস্?" তখন তিনি বলিলেন "Wine"; তাহাতে পিসীমা জানিতে চাহিলেন সে কি জিনিস। সরল পুত্র বলিলেন "কারণ"। শুনিয়া তিনি ত একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিলেন ও বলিলেন "আজ যা হইবার হইয়াছে, পুনর্ব্বার যদি 'কারণ কারণ' খাও ত বাড়ী ও গ্রাম হইতে "পাক" দিয়া গলাধাক্কায় বাহির করিয়া

দিব। তোমার বাপ পিতামহের বাড়ী না, আমার পিতৃদত্ত বাড়ী, ইহাতে হাড়ী ডোমের খাদ্য অনাচার চলিবে না। খবরদার।" সমস্ত রাত্রি দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরে রাখিয়া দিলেন। কথাটা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া হাসিঠাট্টার তরঙ্গ বহিয়া গেল। পিসীমাই লজ্জায় কিছুকাল বাড়ী হইতে বাহির হন নাই।

আর এক সময় শ্রী বর্দ্ধমানে সারদা দাদা সমাজ-সংস্কারক হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বিধবা-বিবাহ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সাজসজ্জা করিয়া কোন এক ধনীর অন্দরমহলের বাহির দ্বারের পার্শ্বে লুকাইয়া থাকিয়া দাসদাসী-দিগকে দিয়া প্রস্তাবটা অন্তঃপুরে পাঠাইয়াছিলেন; তাহার পর, কথাটা চারিদিকে জানাজানি হইলে অতিশয় অপমানিত হইয়া সে স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। শ্রী এই ব্যাপারে অনেক দিন আর স্বামীর মুখদর্শন করেন নাই। সারদা দাদা যাহাকে বিবাহ করিতে ক্ষেপিয়াছিলেন তিনি সম্পর্কে শ্যালিকা ও বঙ্গদেশের এক প্রধান রাজবংশের রাজমাতা। এসব মহিমময়ী রমণী ও এসব সাধ্বী নারী সংসারে বিরল।

মাতৃ-বন্দনা

শ্রীমতী বেলা গুহ।

নাহি জ্ঞান, নাহি শক্তি,
নাহি শ্রদ্ধা, নাহি ভক্তি,
অনুরক্তি-হীনে মুক্তি দাওগো জননি!
আরাধিব কোন্ মন্ত্রে,
পূজিব মা কোন্ তন্ত্রে,
নাহি জানি কোন্ ফুলে পূজি পা দুখানি?
কিরূপে করিব পূজা
অয়ি মাতঃ দশভুজা,
কৃপা করি হৃদি-পদ্মে কর অধিষ্ঠান;
পাপ-তাপ ঘুচাইয়া,
আঁখি-জল মুছাইয়া,
দেখাও সত্যের পথ উজ্জল মহান্!
মাতৃ-স্নেহ ক'রে দান
তৃপ্ত কর শুষ্ক প্রাণ,
অধমে কৃতার্থ কর শুভদৃষ্টি দানে;
করুণা-কিরণ দিয়া
জ্ঞান-আঁখি বিকশিয়া
রহ চির বিরাজিতা হৃদয়-আসনে।

প্রত্যাবৃত্ত

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(৭)

শ্রাদ্ধাদি মহা ধূমধামে সমাধা হইয়া গেল। হেমলতার অপর বাসায় যাইবার কথা আর উঠিল না, কারণ স্বামীস্ত্রীর বিবাদ সেখানেই মিটিয়া গিয়াছিল। ললিতবাবু পত্নীর মনের ভাব বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া সতর্ক হইয়াছিলেন। সেবিকার সম্বন্ধে কোন কথা তাঁহার সম্মুখে উত্থাপন করিতেন না। হেমলতা যদি কোন দিন তাহার সম্বন্ধে কোন কথা উঠাইতেন, তিনি অন্য প্রসঙ্গ আনিয়া তাহা চাপা দিয়া ফেলিতেন।

অসীম কোর্টে প্র্যাকটিস করিতেছিল। ললিতবাবু নিজের ভার পুত্রের মাথায় দিয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে বাড়ীতে বসিয়াছিলেন, কোর্টে যাইবার তাঁহার কোনও আবশ্যকতা ছিল না।

এই সময় তিনি একটা জমিদারী কিনিয়া ফেলিলেন। হেমলতা জিজ্ঞাসা করিলেন "জমীদারী কার নামে কেনা হল?"

ললিতবাবু উত্তর করিলেন "উপস্থিত আমার নামেই তো রইল, তারপর যা হয় দেখা যাবে।"

দিন দিন অসীমের খ্যাতি বাড়িয়া যাইতেছিল, পিতাও আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিতেছিলেন।

অন্তঃপুরের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক খুব কম ছিল। আজকাল রাত্রে ও দুপুরে আহারের সময় ব্যতীত আসিতেই পান না। জমীদারী কিনিয়া তাহার বন্দোবস্ত করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সেদিন দুপুরবেলা আহার করিতে আসিয়া তিনি বহুদিন পরে আবার বিবাদ শুনিতে পাইলেন। অবশ্য বড় একপক্ষেই চলিতেছিল, অপর পক্ষ সম্পূর্ণ নির্ব্বাক।

আহারে বসিয়া তিনি বলিলেন "ব্যাপার কি? মাস তিনেক ঝগড়াটা বন্ধ ছিল, আবার হঠাৎ আরম্ভ হল; এর মানে?"

হেমলতা মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন "মানে আমার মাথা। তোমার ছেলের বউ হতে মান সম্ভ্রম কিছু আর থাকবে না, তা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ছি ছি ছি! কি লজ্জার কথা, মনে করতেও গা যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে। ছোটলোকের মেয়ে, ভদ্রতা জানবে কোথা থেকে? আর তোমাকেও বলি,—অমন সোণারচাঁদ ছেলের আর কি পাত্রী খুঁজে পাও নি? ভিক্ষা যাদের ব্যবসা, তাদের ঘরে গেছলে ছেলের বিয়ে দিতে? তখন যদি আমি আসতুম, কখনো এমন বিয়ে হতে দিতুম না। পাত্রীর আবার অভাব বাংলায়? অমন ছেলে যে রাজকন্যা নিয়ে আসতে পারত।"

অতীতের কথা ভাবিয়া ললিতবাবু বৃথা আক্ষেপ না করিয়া শান্ত ভাবে বলিলেন, "যা হয়ে গেছে তার জন্যে অনুশোচনা করা বৃথা। এখন আসল কথাটা কি তাই বল। বউমা কি করেছে?"

হেমলতা বলিলেন "আচ্ছা, সত্যি কথা বল দেখি, তোমার ছেলের বউ হয়ে সে কিনা ভিক্ষা করতে যায় তোমারই ঝিয়ের কাছে সামান্য কয়েকটা

পয়সা? ঘোর কলি আর কাকে বলে? তুমি না লক্ষপতি জমীদার? তোমার ছেলের বউ দুই আনা পয়সার জন্যে ঝিয়ের খোসামোদ করে? আচ্ছা, আমার কাছে চাইলে কি ক্ষতি হতো তার? আমি কি দিতে পারতুম না পয়সা? অসীমের কাছে চাইতেই বা কি হয়েছিল? সেই কবে ঝগড়া হয়েছে মা মারা যাবার আগে, সেই ঝগড়া নিয়ে এখনও মনের মধ্যে তাল বাধিয়ে বসে আছে। স্বামী হাজার কথাই বলুন, সে সব কি ঝেড়ে ফেলেনা মানুষে? তুমি যে আমায় হাজার কথা শুনিয়ে দাও, আমি যদি সব কথা মনে গেরো দিয়ে রাখতুম, এতদিন যে একখানা রামায়ণ হয়ে যেতো তা দিয়ে। আমি রাগ করি বটে কিন্তু বেশীক্ষণ থাকে না। অমন উদ্ভুটে রাগও আমার নয় যে আজ তিন মাস স্বামীর সঙ্গে কথা নেই, মুখ দেখাদেখি নেই। সাধে বলছি ছোটলোকের মেয়ে! নিজের মান সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়ে যে ছোটলোকের পায় ধরতে যায় কয়েকটা পয়সার জন্যে, তাকে কি বলতে ইচ্ছে করে বলতো তুমি?"

হেমলতার অপরিসীম স্বামীভক্তির কথা শুনিয়া ললিতবাবু শুধু একটু হাসিলেন; বলিলেন "কাজটা বেজায় রকম খারাপ হয়েছে বটে। আচ্ছা, সে আমি পরে বিবেচনা করে দেখছি। অসীমের সঙ্গে ঝগড়ার কথা কি বলছো?"

হেমলতা বলিলেন "ঝগড়ার সব কথা অবশ্য আমি জানি নে। তবে ঝির মুখে শুনলুম বউমা অসীম যেদিকে থাকে সেদিকে যায় না, অসীমও বউয়ের নাম পর্য্যন্ত মুখে আনে না, বউমার কথা কেউ তার সামনে বললেও সে রেগে ওঠে। কি যে হয়েছে ওদের মধ্যে জানিনে তো। আমি বলি, অসীম যাই বলুক সব সাজে তার, কারণ সে ছেলে, মেয়েমানুষের এত দর্প, এত তেজ কেন? সকলের কাছে মাথা তার নুইয়ে রাখতে হবে এটুকু জ্ঞান নেই? কাঙালের মেয়ের এত তেজ মানায় না কিছুতেই। যার বাপ পথে ভিক্ষা করে খেত, যেতেন কোন কাঙালের ঘরে, ভিক্ষে করতে হত সারাজীবন ধরে. কপালে ছিল তাই. অসীমের মত ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, তার আবার গর্ব্ব, তার আবার অহঙ্কার; বরং করলেও করতে পারি আমি। দেখেছ তো আমার বাপের সংসার? তুমি কি কম টাকা পেতে এক একটা কেসে? কুড়ি বাইশ হাজার টাকা দিয়েই গেলেন আমায়। আমার বাপের টাকাতে তুমি বড়লোক এ কথা বরং আমি বলতে পারি।"

কথাটা খট করিয়া ললিতবাবুর কাণে বাজিল, হৃদয়ের মধ্যেও সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়া উঠিল। মুখখানা তাঁহার অত্যন্ত অন্ধকার হইয়া আসিল। তিনি মুখ না তুলিয়াই বলিলেন "ঠিক এ কথা।"

তিনি উঠিতে যাইতেছিলেন। হেমলতা বিস্ময়ে বলিলেন "ও কি, উঠছো যে?"

ললিতবাবু বলিলেন "পেট ভরে গেছে আর খেতে পারছিনে।"

হেমলতা বলিলেন "বাঃ, সামান্য একটু খেয়েই পেট ভরে গেল? এখনও মাছ দুধ সব পড়ে রইল, শুধু ডাল দিয়ে চারটি ভাত খেয়েই উঠলে, না, বসো, ওই দুধটুকু নিদেন খেয়ে যাও। একে এই হাড়ভাঙা খাটুনি, তাতে একটু দুধ ঘি মাছ, কিছু খাবে না। বাঁচবে কি করে?"

পত্নীর এ সহৃদয়তার পানেও ললিতবাবু চাহিলেন না, বরং বিরক্তি দেখাইয়া বলিলেন "খিদে না থাকলেও খেতে হবে, এমন কোনও কথা থাকতে পারে না, এ আদরের নামে অত্যাচার। আবার খানিক পরে অম্বল হয়ে উঠবে তখন, তখন আবার ডাক্তার ডাকো, ওষুধ আনো। আগে হতে সাবধান হওয়া ভাল, না রোগ বাড়িয়ে তুলে শেষে সাবধান হওয়া ভাল?"

স্বামীর বিরক্তি দেখিয়া হেমলতা আর কিছু বলিতে পারিলেন না। বাস্তবিকই ললিতবাবুর ডিসপেপসিয়া ছিল এবং অত্যাচার হইলে সময় সময় তাহা এত বাড়িয়া উঠিত যে তখন তিনি শয্যাগত হইয়া পড়িতেন।

ললিতবাবু তাড়াতাড়ি আচমন করিয়া পানের ডিবা হইতে দুইটা পান তুলিয়া লইয়া বাহির হইতেছিলেন, হেমলতা বলিলেন "এই খেয়ে একটু না জিরিয়ে নিয়েই আবার যাচ্ছ কোথায় ?"

ললিতবাবু বলিলেন "বাইরে এখনও ঢের কাজ পড়ে আছে।"

তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলেন।

প্রাচীরের ওদিকে সেবিকার গৃহ। অসীম তখন কোর্টে চলিয়া গিয়াছে, সেবিকা আহারে বসিয়াছে। হঠাৎ দরজার উপর ললিতবাবুকে দেখিয়া সন্ত্রস্তে সে মাথায় কাপড় টানিয়া ভাত ফেলিয়া উঠিল।

প্রশান্ত ভাবে ললিতবাবু বলিলেন "আমায় দেখে লজ্জা কি মা ? তুমি আমার মেয়ে, বাপের কাছে মেয়ের লজ্জা নেই। তুমি খাও, তারপরে তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

সেবিকা জড়সড় ভাবে বলিল "আপনি আগেই তা বলুন না কেন বাবা ? আমি পরে খাব'খন না হয়।"

ললিতবাবু বলিলেন "না, আগে তুমি খাও তারপর বলছি।"

সেবিকার বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত একদিনও তিনি এদিকে আসেন নাই। আজ তিনি দরজায় দাঁড়াইয়া, সেবিকা ভারি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল।

ললিতবাবু তাহার আহার্য্যের পানে লক্ষ্য করিয়া গভীর দুঃখের সহিত বলিয়া উঠিলেন "একি মা ? আমাদের সকলের ভাল খাবার জোটে, তোমার জোটে না ? চাকর ঝি যে ভাত খায় তুমিও সেই ভাত খাও ?"

সেবিকা ভাত আড়াল করিবার চেষ্টায় ছিল কিন্তু সে চেষ্টা তাহার ব্যর্থ হইয়া গেল। সে বলিল "এতো আমি ইচ্ছে করে খাই বাবা। সরু চালের ভাত খেতে আমার মোটেই ভাল লাগে না, আর বেশী তরকারী, মাছ খাওয়াটাও আমি পছন্দ করি নে। এই তো সব চেয়ে ভাল খাবার বাবা।"

ভাণ্ডার গৃহের চাবি হেমলতার হস্তে, তিনিই স্বহস্তে চাল ডাল মাপিয়া দিতেন। সেবিকা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না যে তিনিই দাসী চাকরের সহিত তাহাকেও এই ক্ষেত্রে দণ্ডায়মানা করিয়াছেন। সারদা মারা যাইবার পর হইতে তাহার এই নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে।

ললিতবাবু তাহার গোপন চেষ্টা বুঝিয়াছিলেন, তিনি শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "তোমার যদি এই পছন্দ হয় তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। যদি অসুবিধা বোধ কর কিছু আমায় জানাতে লজ্জা ক'রনা বউমা। আমি বার বার তোমায় বলে দিচ্ছি আমায় তোমার বাপ বলে ভেবো—শ্বশুর বলে ভেব না। আমার মেয়ে নেই, আমি তোমাকেই মেয়ে বলে জেনেছি।"

কথাটা বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চোখ অশ্রু পূর্ণ হইয়া উঠিল। অসীমের পরে একটী মেয়ে হইয়াছিল। তাহার হৃদয় ঠিক সেবিকার মতই কোমল ছিল। কাহারও সেবা করিতে পারিলে সে নিজের জীবন ধন্য বলিয়া জ্ঞান করিত। মাত্র নয় বৎসরের হইয়া সে চলিয়া গিয়াছে। সেই মেয়েটীকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। সেই ভালবাসাটা সব পড়িয়াছিল গিয়া সেবিকার উপর। মৃতার ভাব লইয়া সেবিকার সহিত তিনি মিলাইয়া দেখিয়াছিলেন, যদি সে বাঁচিয়া থাকিত সেবিকার মতই সেবাব্রতকে জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মরূপে বরণ করিয়া লইত। সেও ঠিক এমনি কর্ম্মে অনলস ছিল, তাহার মুখেও এমনি একটা শান্ত কোমল ভাব আঁকা থাকিত। এ পর্য্যন্ত একদিনও তিনি সে মেয়ের কথা মুখে আনেন নাই। আজ বড় আঘাত পাইয়া তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "মা, তোমাকে পেয়ে আমি সুজাতার শোক ভুলে গেছি। তোমার ব্যথা আজ সুজাতার ব্যথা বলেই আমার মনে হচ্ছে।"

সেবিকা লজ্জিতভাবে কোনরকমে আহারটা সারিয়া লইল। আচমন করিয়া আসিয়া সে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া বলিল "কি কথা বলবেন বাবা ?"

ললিতবাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "শুনলুম তুমি আজ ঝির কাছে দুই আনা পয়সা চেয়েছিলে? পয়সা তোমার কিসের জন্যে দরকার মা?"

সেবিকা মাথা নীচু করিয়া রহিল। কাজটা অন্যায় তাহা সে জানে, কিন্তু উপায় নাই তাহার। সে বড়লোকের পুত্রবধূ, সোণায় তাহার সকল অঙ্গ আচ্ছাদিত, কে বিশ্বাস করিবে যে সে দুই আনা পয়সার জন্য দাসীর কাছে মাথা নোয়াইবে? দাসীটি হেমলতার পিত্রালয়ের। সে পয়সা নাই বলিয়া হেমলতার নিকটে গিয়া বধূর এই নীচতার কথা দশখানা করিয়া লাগাইয়াছিল।

ললিতবাবু বলিলেন "লজ্জা কি ভয় আমার কাছে কিছু কোরো না। আমি বেশ বুঝতে পারছি বড় দায়ে না পড়লে কখনও তুমি মাথা নোয়াতে যাও নি। সত্য কথা বল, আমি তোমাকে তো কিছুই বলব না মা।"

সেবিকা তেমনই অবনত মুখে বলিল "মা চিঠি দিয়েছেন আজ কতদিন, তার উত্তর দেব কিন্তু—"

ললিতবাবু বলিলেন "বুঝেছি। আচ্ছা মা, ঝির কাছে না চেয়ে আর কারও কাছে চাইলে তো পারতে। তোমার কাছে কি কিছু নেই?"

সেবিকা নীরব হইয়া রহিল।

ললিতবাবু বলিলেন "আমারই অন্যায় হয়েছে এটা। এবার হতে আমি তোমায় হাতখরচা কিছু কিছু দেব। এখন এই নাও এই টাকা কটা রেখে দাও মা। বিকেলে তোমার একটা বন্দোবস্ত আমি ঠিক করে দেব। আর তোমার খাওয়ার উপরেও এবার হতে নজর রাখতে হবে আমার। আমরা সব ভাল খাব আর তুমি যে অখদ্য খাওয়া খাবে, তা হবে না। আমি বলছি মা, তোমার যখন যা দরকার হবে আমায় জানিয়ো। মা থাকতে তিনিই সব জানাতেন; এখন তুমি নিজে না বললে আমি জানব কি করে?"

টাকা কয়টা তাহার হাতে দিয়া তিনি ফিরিলেন। আর সব সাংসারিক ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিতে পারিবেন কিন্তু তাহাদের বিবাদের তো কিছুই মীমাংসা করিতে পারিবেন না। আজ যদি মা থাকিতেন!

ভাবিতে ভাবিতে তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

(৮)

অসীম তখন কোর্টে যাইবার জন্য পোষাক পরিতেছিল, সেই সময় ভৃত্য রামলাল আসিয়া দুইখানা পত্র তাহার সম্মুখে রাখিল।

অসীম পত্র দুইখানা উল্টাইয়া দেখিল দুই খানিই দার্জ্জিলিং হইতে আসিতেছে, একই হাতের লেখা। একখানি তাহার নামে, অপরখানি সেবিকার নামে।

এ পত্র কে যে দিয়াছে তাহা বুঝিতে তাহার একটুও দেরী হইল না। তাহার প্রশান্ত ললাট আবার কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। হৃদয় গুরুভারে আবার আক্রান্ত হইয়া পড়িল।

স্ত্রীর পত্রখানার পানে সে কঠোর ভাবে চাহিল। কে জানে এই পত্রখানা কি সব গোপনীয় কথা তাহার নিকট হইতে বহন করিয়া আনিতেছে। কত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস এই পত্র খানির ভিতর পূর্ণ করিয়াছে।

একবার খুলিয়া দেখিবে কি সে?

না না, দরকার কি? অসীম তো তাহাকে ত্যাগই করিয়াছে, তাহার সহিত অসীমের তো কোনও সম্পর্ক নাই। সে যাহা ইচ্ছা করুক না কেন, অসীমের তাহাতে কি?

রামলালের হাতে সে পত্রখানা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এখানা বাড়ীর মধ্যে দিগে যা।"

রামলাল বলিল "মার?"

অসীম বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল "না।"

রামলাল আর কথা কহিতে সাহস না করিয়া চলিয়া গেল। অসীম নিজের নামীয় পত্রখানার পানে একবার চাহিল। খুলিবে কি সে এ পত্র খানা? খুলিলে দেখিতে পাইবে কেবল কর্ত্তব্য

সম্বন্ধে কঠিন উপদেশ, বন্ধুতার ভাণে শত্রুতা। পত্রখানা না পড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া পথে ফেলিয়া দিলে ক্ষতি কি?

তথাপি খুলিতে হইল। দুর্দ্দমনীয় কৌতূহল যে তাহা করিতে দিতে চায় না। সে শুনিয়া নিবৃত্ত হইতে চায় পত্রখানা কতগুলি উপদেশ বহন করিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু পত্রখানায় উপদেশ কিছুই ছিল না। সেবিকার নাম দীপালির নাম তাহাতে নাই। সে যেন সব ভুলিয়া গিয়াছে, তাহাদের উভয় বন্ধুর মধ্যে যেন কেহ দাঁড়াইয়া আছে। সেই কলেজ জীবনে তাহারা যেমন অকৃত্রিম বন্ধু ছিল, কেহ দূরে গেলে সে যেমন ভাবে অপরকে পত্র দিত, এ পত্রখানা সেই রকমের। নিজের দার্জ্জিলিং ভ্রমণ বৃত্তান্ত সে উৎসাহের সহিত বর্ণনা করিয়া গিয়াছে। সর্ব্বশেষে জানাইয়াছে সে পূজার সময় বহরমপুর ফিরিয়া আসিবে। এখনও তাহার বেড়াইবার স্থান কয়েকটা আছে, সে কয়টা দেখা শেষ না হইলে সে আসিতে পারিবে না।

সে আরও লিখিয়াছে এখানেও কয়েকটী তাহার বন্ধু জুটিয়া গিয়াছে। তাহাতে অসীম যেন হিংসা না করে, কারণ অসীমের পার্শ্বে সে কাহাকেও স্থান দিতে পারে নাই।

"অপদার্থ কোথাকার!"

অসীম পত্র খানা দুই হাতে দলা পাকাইয়া এক কোণে ফেলিয়া দিল। সে মানস চক্ষু দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল সেই পত্র খানা পাইয়া সেবিকার কি অপরিসীম আনন্দ হইয়াছে। সে ভাবটা দেখিবার জন্য তাহার মন ভারি চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু কোর্টে আজ জরুরী কেস থাকায় সে আর বিলম্ব করিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি করিয়া পান লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

সারাদিন কোর্টে থাকিয়া সে কিছুতেই শান্তি পাইতেছিল না। যাহাকে সে নিজেই নিজের কাছ হইতে দূর করিয়া দিয়াছে, যাহার ভাল মন্দ, পতন উত্থান সম্বন্ধে সে একেবারে উদাসীন, আজ তাহার 'মুখের আনন্দের রেখাটা দেখিবার জন্য সে ব্যগ্র হইয়া পড়িতেছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সাক্ষীকে ক্রস্ করিতে করিতেও দুই একবার তাহার মনে হইতেছিল এতক্ষণ বোধ হয় সেবিকা সেই পত্রখানা বক্ষে লইয়া সজলনয়নে প্রার্থনা করিতেছে 'ওগো তুমি শীঘ্র ফিরিয়া এসো।'

অন্যদিন সে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী আসিত না, আজ বেলা একটু পড়িয়া আসিতেই পদব্রজে বাড়ী চলিয়া আসিল, তখন কোচম্যান কোর্টে যাইয়া তাহাকে আনিবারজন্য গাড়ী ঠিক করিতেছিল।

পিতা তখন কয়েকটী বন্ধুর সহিত নানা কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, হঠাৎ তাহাকে হাঁটিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন "এ আবার কি? গাড়ী যায় নি এখনও, হেঁটে এলে যে তুমি?"

অসীম একটু হাসিয়া বলিল, "আমার যে বন্ধুর বাসায় রোজ যাই আমি ফিরবার সময়ে, সে বাড়ী চলে গেছে। গাড়ীর জন্যে আর কতক্ষণ বসে থাকব? সবাই চলে গেল, কাজেই আমিও চলে এলুম।"

ললিতবাবু বলিলেন "তোমাদের বন্ধও তো এলো? কাল বুঝি কোর্ট বন্ধ হবে, না?"

অসীম "হাঁ" বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

পোষাক খুলিয়া ঠাণ্ডা হইয়া সে বারাণ্ডায় একখানা চেয়ারে বসিল। সেবিকা দাসীর হাতে দিয়া জলখাবার ও চা পাঠাইয়া দিল।

আজ অসীমের মনটা চঞ্চল, মেজাজটাও গরম। সদ্য প্রস্তুত চা হইতে তখনও ধোঁয়া উঠিতেছে, কিন্তু সে একবার তাহাতে আঙ্গুল দিয়া দেখিয়াই বিরক্তি ও রাগের সহিত প্লেট ও কাপ প্রাঙ্গনে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, খাবারের ডিস লইয়া নিজের আদরের কুকুর জেলিকে দিল, রাগের সহিত চীৎকার করিয়া বলিল "এমন চা, এমন খাবার না দিলেই হয়।

চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, খাবারগুলো শক্ত হয়ে গেছে। না হয় নাই খাব এবার হতে বাড়ীতে, আমি কালই আলাদা বাসা ঠিক করে চলে যাব। বাবা যাদের ভালবাসেন, তাদের নিয়ে থাকুন, আমি বামুন চাকর রেখে বেশ থাকতে পারব।"

প্লেট ও কাপের ঝন্ ঝন্ করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবার শব্দ ও অসীমের চীৎকার শুনিয়া হেমলতা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন। পার্শ্বের গৃহের দরজার কাছে সেবিকা দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মুখ তখন একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে, হেমলতাকে দেখিয়াই সে গৃহ মধ্যে চলিয়া গেল।

অসীম তাঁহাকে দেখিয়া একেবারে জলিয়া উঠিয়া বলিল "আচ্ছা নতুন মা, আমার জলখাবার আর চা টা কি তুমিও করে দিতে পার না? সত্যি যদি তোমাদের কষ্টই হয়, সে কথা স্পষ্ট করে বলে ফেললেই পার।"

হেমলতা একেবারেঁ এতটুকু হইয়া গিয়া বলিলেন "কেন পারব না বাবা? ওই তো এক কাপ মাত্র চা, আর কখানা লুচি, কে না পারে করতে? ওতে কষ্টই বা কিসের? বড় বেশী ক্ষণের কাজও তো নয় যে—"

দ্বিগুণ চড়িয়া উঠিয়া অসীম বলিল "বড্ড বেশী ক্ষণের যে কাজ নয় তা তো আমিও জানি। তবু চা ঠাণ্ডা, ওবেলাকার ঠাণ্ডা শক্ত লুচি, আর যা তা করে পাক করা মোহনভোগ, এই তো প্রত্যেক দিনই পাই। কোনও দিন চায়ে দুধ কম, কোনও দিন মিষ্টি একেবারেই নেই, এসব কি? তুমি যদি পার, কাল থেকে করে দিও সব। যে আমায় দেখতে পারে না সে যে আমার খাবার কত ভাল করে তৈরী করবে তা জানা কথা।

হেমলতা এতক্ষণে একটু যো পাইলেন। মুখখানা ভার করিয়া বলিলেন "আমার কি করতে অসাধ বাবা? ছেড়ে যদি না দেয়, কি করে করি বল? আর বাবা, আমি তো সৎমা, চিরকাল পর হয়েই আছি। নিজের লোকে যদি এমনি করে—"

বাধা দিয়া চীৎকার করিয়া অসীম বলিল "কে আমার নিজের লোক? আমি ওকে বিয়ে করেছি এই মাত্র। আমি অনেক দিন আগেই তো ছেড়ে দিইছি ওকে; ইচ্ছে হয় নিজের পথ খুঁজে নিক গে যাক এখন। আমার স্ত্রী বলে কখনও কাহারও কাছে পরিচয় যেন না দেয়।"

হেমলতা সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন "যাক বাবা, এখন এই এলে কোর্ট হতে, আর মেলা বকাবকি করলেই মাথা ধরে যাবে'খন।"

দাসীর পানে তাকাইয়া বলিলেন "যা তো ঝি, শীগগির করে খানিকটে জল বসিয়ে দিগে। আমি এখনি আবার চা খাবার করে আনছি। চারটি ময়দা নিয়ে শীগগির মাখগে যা। রামলাল গেল কোথা? এসে একটু বাতাস করুক না কেন বাপু? চাকর যেন নবাব হচ্ছেন দিন দিন। এই বাছা এল খেটেখুটে, বাড়ীতে এসে যে একটু শান্তি পাবে তার যো-টী নেই।

অপ্রস্তুত রামলাল কোথা হইতে একটা পাখা যোগাড় করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

হঠাৎ হেমলতার এতটা যত্ন দেখিয়া অসীমের লজ্জাবোধ হইতেছিল। নিজের কথাটাও সে ভাবিয়া দেখিল। সে কখনও এ রকম হয় নাই। দুদিনের জিনিষ সে আরও জিদ করিয়া এই কয়েকদিন আগে খাইয়াছে, আজিকার এই রাগটা অকস্মাৎ হইয়া উঠায় সে কিছুতেই নিজেকে সামলাইতে পারে নাই।

হেমলতা তাড়াতাড়ি রন্ধনগৃহে চলিয়া গেলেন। রামলাল সমানভাবে পাখা টানিতে লাগিল। সে একরকম প্রায় হাতে করিয়া অসীমকে মানুষ করিয়াছে। ছোটবেলার মতই সে তাহার সহিত ব্যবহার করিত। আজ সে বুঝিতে পারিল অতীত আর সে অসীম নাই, সে এখন বাবু হইয়াছে, তাহাকে এখন সম্মান করা বিশেষ দরকার।

অসীম তাহার পানে চাহিয়া বলিল "থাক আর

বাতাস করতে হবে না। পাখাখানা আমার হাতে দিয়ে তুমি অন্য কাজ কর গে যাও।"

রামলাল মাথা চুলকাইয়া বলিল, "আমার এখন আর কোনও কাজ নেই। বাবুর কাছে লছমন আছে।"

ভ্রূকুটী করিয়া অসীম বলিল "নেই তো বেশ, পাখা দিয়ে যাও আমাকে।"

পাখা তাহার হাতে দিয়া রামলাল পলাইল।

খানিক পরে চা ও খাবার লইয়া হেমলতা দর্শন দিলেন। সেগুলি টেবিলে রাখিয়া অসীমের হাতে পাখা দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন "পোড়ার মুখো চাকর পালিয়েছে বুঝি? বড় আস্পর্দ্ধা বেড়েছে যে ওর। রোসো, ওকে যদি না তাড়াতে পারি কাল, তবে আমার নামই নয়। বিটলে বুড়ো খালি খাবার যম। এক থালা করে ভাত ঠেস্‌তে এদিকে নির্লক্ষণ মজবুৎ।"

অসীম চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলিল "না তার দোষ নেই। বাবা তামাক চাচ্ছিলেন তাই আমি তাকে পাঠিয়েছি।"

হেমলতা আক্রমণের আর সুযোগ পাইলেন না। গজ গজ করিতে করিতে বলিলেন "কেন, লছমন আছে, গুলুয়া আছে, তারা কেউ গিয়ে তামাকটা আর দিতে পারলে না?"

বলিতে কি—সেবিকার মনে এই আঘাতটুকু দিয়া অসীম হৃদয়ে বর্ব্বরোচিত আনন্দ অনুভব করিতেছিল বড় কম নয়।

সেদিন জ্যোৎস্না মাখা রাতটী। চারিদিক ধবধবে জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছে। অসীম দ্বিতলে শয়ন করিত। সে রাত্রে সে খোলা ছাদে বসিয়া আছে। সামনে কুল কুল নাদে প্রবাহিতা গঙ্গা। ওপারে সারি সারি গাছগুলি পায়ের কাছে ছায়া ফেলিয়া সর্ব্বাঙ্গে জ্যোৎস্না জড়াইয়া দণ্ডায়মান। ধীবরদের ছোট ছোট কুটীরে তখনও আলো জ্বলিতেছে, গঙ্গাবক্ষে তাহাদের ছোট ছোট নৌকাগুলি ভাসিতেছে।

অসীম বরাবরই সৌন্দর্য্যের একটী প্রিয় ভক্ত, আজ সমস্ত দিন মন তাহার ভারগ্রস্ত ছিল; যামিনীর এই সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহার প্রাণে আনন্দ আসিয়াছে, সে আপন মনে গুন গুন করিয়া তাহার প্রিয় গানটী গাহিতেছে—"প্রাণের পথ বেয়ে গিয়াছে সে গো।" আজ তাহার মনে সেই একটী দিনের নিমেষের তরে দেখা একটী কিশোরীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার হৃদয় দলিয়া সে চলিয়া গিয়াছে, তাহার সন্ধান সে জীবনের মধ্যে পাইবার আশা করে না। বার বার সে তাই গভীর আক্ষেপের সহিত, হৃদয়ের সব ভাষা ঢালিয়া দিয়া গাহিতেছিল—

"প্রাণের পথ বেয়ে গিয়াছে সে গো,
চরণ চিররেখা আঁকিয়া যে গো।"

বাস্তবিকই কখন সে আসিয়াছিল, কখন সে চলিয়া গেল কিছুই সে জানিতে পারে নাই। যখন জানিল তখন শুধু তাহার চরণের রেখাই হৃদয়ে অঙ্কিত। তাহার শূন্য হৃদয়-আসনখানা সেই দেবীর ছায়া লইয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে—'এসো গো এস। তোমারই আসন এ, আর কারও নয়। তোমার বস্তু তুমিই আসিয়া গ্রহণ কর। ওগো চির ঈপ্সিত, ওগো কত জনমের আরাধনার ধন, তুমি এস গো এস।'

সে বুঝি তাহার আরাধনাই করিতেছিল। হঠাৎ পশ্চাতে চুড়ির ঠুন ঠুন শব্দ শুনিয়া সে অত্যন্ত চমকাইয়া ফিরিল। এ কে? এতো তাহার ধ্যানের প্রতিমা নয়। যাহাকে নিয়ত ঘৃণা করিয়া আঘাতে আঘাতে বক্ষ ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সেই যে!

কোন্ লজ্জায় আবার সে তাহার মুখ দেখাইতে আসিল অসীমের কাছে? চারি মাস পরে সে আবার স্বামীর কাছে কেন? বৈকালে খাবার নষ্ট করিয়া অসীম যে অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল তাহাই দেখিয়া বুঝি সে আসিয়াছে! ওরে ঘৃণিতা, সে অনুশোচনা তাহার নিজের হঠাৎ রাগ হইবার জন্য, অন্য কোনও কারণে নহে।

অসীম কথা কহিল না। চক্ষু ফিরাইয়া আবার গঙ্গার ওপার পানে চাহিল।

সেবিকা নিজেই অগ্রসর হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। সঙ্কোচের কোন ভাব না দেখাইয়া বেশ শান্ত ভাবে বলিল "আমি আজ তোমায় একটা কথা বলতে এসেছি।"

সে ভাবিয়াছিল অসীম নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিবে, 'কি ?' কিন্তু অসীম নীরব।

সেবিকা নিজের ভুল বুঝিয়া আরও শক্ত হইল, বলিল "আমি দেখছি আমাকে নিয়ে তোমাদের সংসারে অনেক গোলমাল হচ্ছে। আমি সেই জন্যে চলে যাব। কিন্তু চলে যাবারি আগে তোমাকে সুখী করে যেতে চাই। আমি জেনে যেতে চাই তুমি সুখী হয়েছ, সেই চিন্তাই আমার সান্ত্বনা হয়ে দাঁড়াবে।"

অসীম এবার কথা কহিল "কি রকমে সুখী করতে চাও আমাকে তুমি ?"

সেবিকা বলিল "আমি দীপালির সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে যেতে চাই।"

অসীম আত্মবিস্মৃত ভাবে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল "দীপালি ?"

সেবিকা পূর্ব্ববৎ শান্তভাবে বলিল "হ্যাঁ দীপালি।"

অসীম আপনাকে সামলাইয়া বসিয়া পড়িল, বলিল "তুমি দীপালির কথা কি করে জানলে ?"

সেবিকা বলিল "আমি জানি।" সে যে সরিতের মুখে সে কথা শুনিয়াছে তাহা বলিল না, অসীমও আর জানিতে চাহিল না। যে কথাটা ভুলিয়াছিল তাহা আবার অসীমের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। সে বেশ বুঝিল এ কথা নিশ্চয়ই আজ সরিত লিখিয়াছে। আজিকার ঝগড়াটা বাধাইবার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সেবিকার ছিল—ইহা বেশ জানা যাইতেছে।

অসীম ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া আপন মনে বলিল "আমার বিয়ে করতে তাকে কোনই আপত্তি নেই কারণ সে খুব ভাল মেয়ে, আর আমি তাকে খুব ভালবাসি। তুমি দূরে যেতে ইচ্ছা করছ, ভালই। আমার মতেও সেইটেই ভাল। কোথায় থাকবে তুমি তা' বলতে বোধ হয় আপত্তি নেই ?"

সেবিকা অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল "ঠিক কি ক'রে বলতে পারি ? আমার কাকা এখানে আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে থাকতে পারি।"

অসীম বলিতে যাইতেছিল "সরিতের বাড়ীতে ?" কিন্তু খুব সামলাইয়া লইল। বলিল "সরিত আসছে যে আজকাল।"

"তা আমি জানি" বলিয়া সেবিকা ফিরিয়া চলিল। নির্জ্জন সিঁড়ির পথে নামিতে নামিতে সে একবার উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল "নির্দ্দয়—পাষাণ !"

সে যে তাহার কতখানি বিসর্জ্জন দিতে গেল অসীম তাহা একটুও বুঝিল না। দীপালিকে বিবাহ করিতে পারিবে, তাহার পথের কাঁটা আপনিই সরিয়া যাইবে, এই আনন্দেই সে অধীর হইয়া উঠিল। জগতে ভালবাসার প্রতিদান নাই, জগত পাষাণের চেয়েও কঠিন-হৃদয় মানুষকে বক্ষে ধরিয়া রাখে। (ক্রমশঃ)

ব্যর্থ বেদনা

শ্রীমতী প্রতিভা দেবী।

অন্তরেরো নিভৃত অন্তরে—
থরে থরে
কবে একদিন
ফুটেছিল কুসুম নবীন,
নিয়ে তার
নব গন্ধ মধু রসভার।

রুদ্ধ দ্বার গোপন নিলয়ে
ছিল গুপ্ত হয়ে,
আপনারি বিকাশ-গৌরবে
সুষমা সৌরভে,
তরুণ প্রেমের রঙে গোলাপী আভায়
আছিল ঘুমায়ে স্নিগ্ধচ্ছায়।

অমৃত স্বপনে,
কেন ধরা দিলে সখা নয়নে নয়নে,
হাসির লহরী তুলে কি কহিলে ভাষা,
জাগায়ে অজানা শত আশা।

সুরে সুরে,
বাঁশীখানি পুরে
কেন ধরে ছিলে তান?
প্রসুপ্ত এ প্রাণ
চকিতে যে উঠিল বিকশি
পুলকে বিলসি।

কেন তার
গোপন হিয়ার
তন্ত্রী পরে
ধীরে ধীরে ধীরে
পেলব পরশখানি দিলে বুলাইয়ে,
ভুলাইয়ে
তার আপনারে,
মরম-বীণার তারে তারে,
ফুটায়ে তুলিলে সুরখানি—
আত্মহারা প্রণয়ের বাণী।

অনাদরে
অবহেলা ভরে
তুমি ত ফিরায়ে নিলে মুখ,
জীবনের সুখ
সাধ আশা ভেঙ্গে চুরে দিয়ে,
কৌতুকে হাসিয়ে
তুমি গেলে চলে
অবহেলে।

অশান্ত এ অন্তরের আকুল ক্রন্দন—
এযে সখা মানে না বন্ধন;
আর্ত্তস্বরে
মর্ম্ম দীর্ণ ক'রে
সে যে চায় লুটাইতে তোমারি চরণে,
বারণ না শোনে,
মানিতে চাহেনা কোনো মানা;
অশ্রুঝরা দুটি আঁখে কহে শুধু 'না না'।

রন্ধন-বিদ্যা

ছানার কালিয়া

শ্রীমতী পুষ্পকুন্তলা রায়।

উপাদান :—ছানা, নানিতাল আলু, ঘি, তৈল, হলুদ, জিরে, ধনে, লঙ্কা, তেজপাতা, লবণ, জাফরাণ, গরম মসলা।

পাথরের বাটীতে সামান্য দইয়ের সহিত জাফরাণ গুলিয়া রাখিয়া নানিতাল আলুগুলি ছাড়াইয়া, একটী আলুকে চারি টুকরা বা পছন্দ অনুযায়ী কাটিয়া লইতে হইবে। হলুদ, ধনে, জিরে, লঙ্কাগুলি বাটিয়া আলাদা আলাদা রাখিতে হইবে। এর পর একটু ভাল ছানাকে ভালরূপ জল নিংড়াইয়া একখানি থালার উপর রাখিয়া, জাফ্‌রাণ মিশ্রিত দই তাহার সহিত ভালরূপে মাখিয়া থালার উপর পুরু অবস্থায় রাখিয়া চৌকো ভাবে কাটিয়া লইতে হইবে। এমন ভাবে কাটিতে হইবে যেন মাছের টুকরার মত দেখায়। এইটী কর্ম্মীর পছন্দ অনুযায়ী হলেও মন্দ হয় না।

পাক প্রণালী :—কড়াতে ঘি চাপাইয়া চৌকো ভাবে যে ছানাগুলি কাটিয়া রাখা হইয়াছে তাহাকে খুব ভালরূপ ভাজিয়া লইতে হইবে। ভাজা হইয়া গেলে একটী পাত্রে রাখিয়া কড়াতে সরিসার তৈল চাপাইয়া আলুগুলিও খুব ভালরূপ ভাজিতে হইবে। ভাজার কাজ হইয়া গেলে আলাদা পাত্রে রাখিয়া দিয়া পুনরায় কড়াতে সামান্য পরিমাণ তৈল চাপাইয়া তৈলে কয়েকটী তেজপাতা ও কিছু জিরা, ধনে, লঙ্কা দিয়া ভাজিতে হইবে। একটু ভাজা হইয়া উঠিলে তাহাতে আলুভাজাগুলি দিয়া মসলা ও আলুগুলিকে খুন্তীর সাহায্যে সামান্য জল ছিটা দিয়া বেশ একটু নাড়িতে হইবে। যখন দেখিবে যে খুব ভালরূপ ভাজা হইয়া উঠিয়াছে তখন পরিমাণমত জল ও বাটনা দিয়া ছানাভাজাগুলি ছাড়িয়া দিতে হইবে। জল ফুটিয়া উঠিলে মাপ মত লবণ দিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। মাঝে মাঝে একটু নাড়িয়া দেওয়া উচিত। যখন জল শুকাইয়া উঠিবে তখন গরম মসলাগুলি বাটিয়া ঘিএর সঙ্গে মিশাইয়া কালিয়ার মধ্যে দিয়া নামাইয়া ভালরূপ ঢাক্‌নার সাহায্যে বন্ধ করিয়া দিলে "ছানার কালিয়া" তৈয়ার হইল।

ফেণী পিঠা

(আসামদেশীয় প্রাচীন পিঠা)

শ্রীমতী নিকুঞ্জলতা চলিহা।

আসামী বড়াধানের চাউল ৴১ সের, ঘি ৴২ সের, একতারবন্দ-চিনির রস ৴২ সের (পরিষ্কার চিনি), দুধ আবশ্যক মত।

চাউলগুলি পরিষ্কার জলে ধুইয়া ভিজাও। ১॥ ঘণ্টা পরে জল ঝড়াইয়া, বেশ ঝড়ঝড়ে কর। এখন ঢেঁকীতে আটা প্রস্তুত কর। খুব সূক্ষ্ম চালুনীতে দুই তিনবার চালিয়া লও। আটা যতই ময়দার মত হইবে, পিঠাও সেইরূপ সুখাদ্য হইবে। আটায় একটু একটু দুধ দিয়া ময়দার লুচীর ন্যায় মোলায়েম করিয়া মাখ। ছোট ছোট লেচী কাটিয়া বেলানায় খুব পাতলা করিয়া বেল। যত পাতলা হইবে, ততই নরম, মুখরোচক হইবে। কড়ায় ঘি দিয়া আগুনে চড়াইয়া দাও। ধোঁয়া মরিয়া গেলে, এক একখানা লুচী বেশ শক্ত করিয়া ভাজ; কিন্তু লাল যেন না হয়। চিনিরসে ডুবাইয়াই উঠাও। বেশ ঠাণ্ডা হইলে খাইতে দিবে।

আগমনী

[রচনা—শ্রীমতী সুমতি চট্টোপাধ্যায়]

কে তোমারে পাঠালে গজে বল না ?
যে তোমারে পাঠায়েছে সে বুঝি কিছু বুঝে না।
নিতে পারে পরেরি মেয়ে যত্ন বুঝি জানে না ;
এসেছ মা বাপের বাড়ী কৈলাসে আর যেও না ॥

—oo—

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

স্থায়ী। খাম্বাজ—ঢিমে-তেতালা।

১ ২´ ৩
II { পা -ধঃ মা পা পঃ I র্সাঃ -ণঃ ধা মমা | পা -া -া -গা |
কে ০ তো মা রে পা ঠা লে গজে ব ০ ০ ল

০ ১ ২´
মা -া -া -া | মাঃ ধঃ ধা ধা I ণা ণধা পা পা |
না ০ ০ ০ যে তো মা রে পা ঠা০ য়ে ছে

৩ ০
| পধা ধপা মা গরগা | গা মপা পা -া } II
সে০ বু০ ঝি কিছু০ বু ঝে০ না ০

অন্তরা।

১ ২´ ৩
II { মমা মা ধা ধা I ণাঃ ধণঃ পা ধা | -া র্সণা না র্রা |
নিতে পা রে প রে রি০ মে য়ে ০ যত্ন বু ঝি

০ ১ ২´
| র্সা ণাঃ র্সাঃ } | { সা সা না না I র্সা র্সর্সা ণা ণধা |
জা নে না এ সে ছ মা বা পের্ বা ড়ী০

৩ ০
| ণা র্রা র্সা ণণা | ধা পধা পা -া } II II
কৈ লা সে আর্ যে ও০ না ০

ব্যথার দান

শ্রীমতী স্নেহময়ী দেবী।

(১)

বৈকাল বেলা। রাস্তায় জল দিয়া গিয়াছে, ফুটপাত দিয়া অবশ ক্লান্ত চরণে কেরাণীর দল বাড়ী ফিরিতেছে। সেই সময় মেস হইতে শুভেন্দু বাহির হইয়া লালদীঘির রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল, খানিক দূর যাইতে না যাইতে পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া তাহার স্কন্ধ ধরিয়া বেশ একটি ঝাঁকুনি দিয়া কহিল "হ্যালো ইন্দু, ভাল আছ ত ?" শুভেন্দু বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল বন্ধু বিমল হাসি হাসি মুখে দাঁড়াইয়া আছে। উৎসাহপূর্ণ কণ্ঠে কহিল "একি রে বিমল এমনসময় যে,কবে এলি ?" বিমল হাসিয়া কহিল "বাবা যে এখানে বাড়ী কিনেছেন, পাঁচ ছ দিন হল আমরা এসেছি, তুই বুঝি কিছুই জানতিস্ নে ?"

শুভেন্দু অপ্রস্তুতভাবে কহিল "না, হ্যাঁ মণীর মুখে শুনেছিলুম বটে তোর বাবা এবার থেকে কলকাতাতেই থাকবেন।" বিমল শুভেন্দুর হাত ধরিয়া কহিল "চল্ না আমাদের বাড়ী, এখান থেকে বেশী দূর নয়।" শুভেন্দু ব্যস্তভাবে হাত ছাড়াইয়া লইবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া কহিল "আঃ ছাড়্ লাগছে, এখন যাবার সময় নেই, অন্য একদিন দেখা যাবে।" বিমল কিন্তু হাতটি আরও শক্ত করিয়া ধরিয়া উত্তর দিল "তবেই হয়েছে, তোরা হচ্ছিস্ কবি মানুষ, আমার কথা কি আর মনে থাকবে ? এই এখনই একটা মস্ত ভুল করে ফেল্লি।" শুভেন্দু বিস্মিত হাস্যে কহিল "কখন রে ?" বিমল হাসিমুখে কহিল "এই বল্লি তুই মণীর কাছে শুনেছিলি আমরা এখানে এসেছি, অথচ আমায় দেখে আকাশ থেকে পড়লি, এ ভুল তোর অক্ষম্য, নয় কি ?" শুভেন্দু জোরে হাসিয়া উঠিল, বিমল তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া কহিল "রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাজে বকার চেয়ে চল্ যাওয়া যাক্।" শুভেন্দু আর বেশী আপত্তি না করিয়া বন্ধুর অনুসরণ করিল।

বিমল দুচারটা রাস্তা ঘুরিয়া একটি রাস্তার মোড়ের মাথার একখানি প্রকাণ্ড সাদা রঙের বাড়ীর ফটকের মধ্যে ঢুকিল। বাড়ীর সামনে সুন্দর একটা বাগান, তাহার মাঝে মাঝে সানের বেদী, বেদীর উপর টবে করা নানাজাতীয় বৃক্ষ রহিয়াছে। বাগানের শেষ সীমায় মোটরের ঘর দেখা যাইতেছে, গন্ধরাজ, কামিনী ও রমণী ঝোপের আড়ালে কতকগুলি সাদা খরগোস চরিয়া বেড়াইতেছে; ম্যাকলোলিয়া গাছের উপর একটা কাকাতুয়া বসিয়া আর্ত্তরবে চীৎকার করিতেছে, একজন মালী বসিয়া চারাগাছগুলির তলা হইতে আগাছা সব তুলিয়া ফেলিয়া দিতেছে, গাড়ী বাড়াব্দার থাম জড়াইয়া মাধবীলতা উঠিয়াছে, সোপানের ধাপে ধাপে বাহারী টবে করা পাম ও অন্যান্য বৃক্ষ রহিয়াছে।

বিমল শুভেন্দুকে লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষটি দেশী ও বিলাতী আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। কার্পেটে মোড়া ঘরটির চারি কোণে চারিটি ছোট ছোট টিপাইয়ের উপর চারিটি ফুলদানি। মধ্যে একটি গোল টেবিল, চারিপাশে অসংখ্য গদী আঁটা চেয়ার, বিচিত্র পেণ্টিং করা দেয়ালে বহু চিত্র শোভিত। ঘরটির ভিতর একখানি চেয়ারে বিমলের পিতা বিমানবাবু বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, পাশের একখানি চেয়ারে জননী মহামায়া বসিয়া একখানি ইংরাজী পুস্তক পড়িতে-ছিলেন। বিমল শুভেন্দুকে পিতামাতার সহিত

পরিচয় করাইয়া দিল। শুভেন্দু নমস্কার করিল। বিমানবাবু স্মিত হাস্যে তাহাকে বসিতে বলিলেন। মহাশয়া চশমার ভিতর হইতে প্রীতিপূর্ণনেত্রে শুভেন্দুর পানে চাহিয়া পুস্তকখানি রাখিয়া তাহার সহিত আলাপ জুড়িয়া দিলেন।

বিমল নিতান্ত ফাঁকে পড়িয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া কহিল "মুকুলকে দেখছি না যে, সে কোথায় মা?" সহসা পর্দ্দা সরাইয়া একটী আঠার উনিশ বছরের তরুণী প্রবেশ করিয়া কহিল "আজ যে বড় চা না খেয়েই বেড়িয়েছিলে দাদা?" সহসা একজন অপরিচিতকে দেখিয়া সে একটু অপ্রতিভ হইল। বিমল হাসিয়া কহিল "এই দেখ মুকুল, তুই যার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ক্রমাগত আমায় বলছিলি তাকে আজ পাকৃড়াও করে এনেছি। জানেন বাবা মাসিকপত্রে শুভেন্দুর কবিতা পড়ে মুকুল ওর একটী ভক্ত হয়ে উঠেছে।" নিজের বিস্ময় প্রকাশ হইয়া পড়ায় লজ্জায় মুখ রাঙা করিয়া মুকুল শুভেন্দুকে একটী ছোট্ট নমস্কার করিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। শুভেন্দুও মনে মনে যথেষ্ট লজ্জিত হইয়া প্রতি নমস্কার করিল। মুকুল লজ্জিত ভাবটা ঝারিয়া ফেলিয়া কহিল "দেখছেন বাবা, দাদাই ত আগে বন্ধুর খুব সুখ্যাতি করে বলেছিল শুভেন্দু বাবুকে একদিন আমাদের বাড়ী আনবে।" পরে শুভেন্দুর প্রতি চাহিয়া কহিল "সত্যি" আপনার কবিতা আমার খুব ভাল লাগে, 'মঞ্জরী' আর 'প্রতিবাসীতে' আপনার যা কবিতা বেরোয় সমস্তই আমি পড়ি, এবার "মঞ্জরীতে' 'অঞ্জলি' বলে কবিতাটি আমার খুব সুন্দর লেগেছে, মাও খুব প্রশংসা করছিলেন।"

শুভেন্দু দীপ্ত মুখে "কহিল আপনি বুঝি কবিতা পড়তে খুব ভালবাসেন?" মুকুল ঘাড় হেলাইয়া কহিল "খুব, আমার লাইব্রেরীতে সমস্তই প্রায় কবিতার বই। আপনার 'পথের রেণু' 'সুরের রেখা' আমার আছে।" রিষ্টওয়াচের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মুকুল উঠিয়া পড়িয়া পিতার দিকে চাহিয়া কহিল "চারটে ত বেজে গেছে বাবা, চা খাবেন কখন?" অতি ব্যস্তভাবে সে প্রস্থান করিল, বিমান বাবু উঠিয়া পড়িয়া কহিলেন "এস শুভেন্দু, চা খাবে এস।" সকলে জোর করাতে শুভেন্দু বেশী আপত্তি করিল না।

(২)

শুভেন্দুর নামে একখানি পত্র আসিল, খামের উপর ঠিকানা দেখিয়া বুঝিল ইহা কার। অতি আগ্রহে খুলিয়া পড়িল। তাহাতে লেখা আছে—

ইন্দুদা,

ছুটিত তোমাদের অনেক দিন হয়ে গেছে, তবে আসতে এত দেরী করছ কেন? মা ভারি ব্যস্ত হয়েছেন, যত শীগ্‌গির পার চলে এস। প্রণাম নিও।

ইতি
তোমার বাণী

পড়িয়া শুভেন্দু মনে মনে লজ্জিত হইয়া পড়িল। সত্যই ত আজ পাঁচ ছয় দিন হইল তাহাদের কলেজের ছুটি হইয়া গিয়াছে, অন্যবারে ছুটির পরদিনই সে বাড়ী চলিয়া যায় এবার কি বিমান বাবুদের স্নেহে পড়িয়া সে এ কথাটা ভুলিয়া গিয়াছে? সেখানে জননী পুত্রের আসার দিনগুলি গুণিতেছেন, আর বাণী? তাহার কথা স্মরণ হইতেই শুভেন্দুর মুখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, সে স্থির করিল কালই রওনা হইবে।

শুভেন্দুর বাড়ী এলাহাবাদে, তাহার পিতা একজন ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন এবং অনেক সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সে কলিকাতায় থাকিয়া এম্-এ পড়িতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে কাব্যচর্চ্চাও জোরে চলিতেছিল; এরি মধ্যে সে একজন শ্রেষ্ঠ কবি নামে পরিচিত। বাণী তাহার পিতৃবন্ধু নরেশবাবুর একমাত্র কন্যা। নরেশবাবু একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন, শুভেন্দুর পিতার সহিত তাঁহার বাল্যকাল হইতে বন্ধুত্ব এবং সেই বন্ধুত্ব চিরদিনই তাঁহাদের প্রগাঢ় ছিল। নরেশ

বাবুর পত্নী পাঁচ বছরের এক কন্যা রাখিয়া প্রস্থান করায় তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন, বন্ধুর একান্ত অনুরোধেও তিনি আর বিবাহ করেন নাই। বাণী শুভেন্দুর বাল্য সহচরী, দুর্জনেই দুজনকে অত্যন্ত ভালবাসিত। নরেশবাবু ও অরবিন্দবাবু হাসিয়া কহিতেন 'ইন্দুর সঙ্গে বাণীর বিয়ে দেব।'

শুভেন্দুর জননীকে বাণী মা বলিয়া ডাকিত, রমাসুন্দরীও তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। বাণীর পিতা অকালে চলিয়া যাওয়ায় অভিভাবকশূন্য বালিকার সম্পূর্ণ ভার অরবিন্দবাবু লইলেন, তাহাকে নিজ বাটীতে আনিলেন, রমাসুন্দরী ও অরবিন্দবাবুর বাবুর স্নেহ যত্নে বাণী শীঘ্রই পিতৃশোক ভুলিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে সে শৈশব ছাড়িয়া কৈশরে পা দিল, এই সময় অকস্মাৎ অরবিন্দবাবুও বন্ধুর আহ্বানে কি জানিনা, সুদূরে যাত্রা করিলেন।

কলিকাতায় থাকিয়া শুভেন্দু বি-এ পাশ করিলে জননী জেদ করিলেন—বাণী বড় হইয়াছে তাহার পিতার চিরদিনই ইচ্ছা ছিল তাহার সহিত শুভেন্দুর মিলন হয়। শুভেন্দুর কিন্তু বিষম আপত্তি, শেষে জননীর বিষাদক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া সে কহিল "এ বছরটা যাক্ মা।" মাও ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

শুভেন্দু বাড়ী আসিতেই প্রথমেই জননী ব্যস্ত হইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শুভেন্দু হাসি মুখে মায়ের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিল, বিমলের পিতার আগ্রহে সে একটু দেরী করিয়া ফেলিয়াছে সে কথাও বলিল। জননী আশ্বস্তা হইলেন।

বৈকালে শুভেন্দু আপন কক্ষে খোলা জানালার ধারে চেয়ারে বসিয়া বই পড়িতেছিল এমন সময়ে বাহির হইতে কে বীণানিন্দিত স্বরে কহিল "ইন্দুদা, ভেতরে যাব কি?" শুভেন্দু হাসিয়া কহিল "কে বাণী, এস।" বাণী রঙ্গিন পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। শুভেন্দু দেখিল বাণী বেশ বড় হইয়া পড়িয়াছে, তবু তাহার সুন্দর মুখখানিতে চির শৈশবতা মাখানো রহিয়াছে, সমস্ত অঙ্গে সৌন্দর্য্য-জ্যোৎস্নার রাশি ঝলমল করিতেছে। শুভেন্দু মুগ্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। বাণী সঙ্কুচিত হইয়া টেবিলের ধারে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া একখানি মোটা খাতা টানিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মৃদুস্বরে কহিল "ইন্দুদা, এবার কি কবিতা লিখেছ পড়ালে না ত?" শুভেন্দু একটু হাসিয়া কহিল "মাত্র ত আজ এসেছি, তাও সকালে তোমায় দেখিনি ত, কাকে কবিতা শুনাব?" বাণী লজ্জায় মুখ রাঙা করিয়া কহিল "বাঃ, আমি বুঝি তাই বলছি?" সে খাতাখানি লইয়া পলাইয়া গেল, শুভেন্দুর মুখে একটু গোপন হাস্য খেলিয়া গেল।

একটু পরেই রমাসুন্দরী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, কহিলেন "এই যে ইন্দু, বেড়াতে যাস্‌নি যে?" শুভেন্দু বইখানি রাখিয়া দিয়া কহিল "ভাল লাগছে না।" মা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন 'ইন্দু, বাণী ত এধারে বেশ বড় হয়ে পড়েছে, মিছে কেন দেরী কচ্ছিস্ তা-ত বুঝতে পারছি নে।" শুভেন্দু মুখ নত করিয়া কহিল "আর দু চার মাস আমায় সময় দাও মা।" রমাসুন্দরী ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন "দু চার মাস করে দুবছর ত কাটিয়ে দিলি ইন্দু, আরও সময় চাচ্ছিস্?" শুভেন্দু এইবার মিনতি করিয়া কহিল "শুধু দুটো মাস সময় দাও মা, তোমার ছেলে ত পালিয়ে যাচ্ছে না?" রমাসুন্দরী বিষণ্ণ মনে প্রস্থান করিলেন।

(৩)

বৈকালে মুকুল বাড়ীর সম্মুখের উদ্যানে বেড়াইতেছিল এমন সময় দেখিল শুভেন্দু ধীরে ধীরে আসিতেছে। সে একটু অগ্রসর হইতেই শুভেন্দু তাহাকে নমস্কার করিল, প্রতি নমস্কার করিয়া উচ্ছ্বসিতস্বরে কহিল "কবে এলেন?" শুভেন্দু ধীরে ধীরে কহিল "প্রায় আট দিন হল এসেছি।" মুকুল বিস্মিত হইয়া কহিল "আট দিন এসেছেন, তবে আমাদের বাড়ী আসেন নি কেন?"

শুভেন্দু একটু থামিয়া কহিল "একটু কাজ ছিল বলে আসতে পারিনি।" কথাটা মিথ্যা, ইচ্ছা করিয়াই সে আসেনি।

মুকুল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল "আচ্ছা শুভেন্দুবাবু, আপনার বাড়ীতে কে কে আছেন?" শুভেন্দু মৃদু হাসিয়া কহিল "আমাদের বাড়ীতে মা আছেন আর—" সে থামিয়া গেল, কেননা বাণীর পরিচয় সে কি রকম ভাবে দিবে? সহসা তাহার কণ্ঠে কিছু যোগাইল না। মুকুল আগ্রহান্বিত হইয়া কহিল "আর বলে থামলেন কেন, বলুন বলুন?" শুভেন্দুর মুখ দিয়া অকস্মাৎ বাহির হইয়া গেল "আর বাণী আছে।" মুকুল বিস্মিত হইয়া তাহার পানে চাহিয়া কহিল "বাণী কে?" শুভেন্দু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল "বাণী আমার একজন আত্মীয়া।" সম্মুখের বৃক্ষ হইতে একটা সাদা ধপ্‌ধপে গোলাপ ফুল ছিঁড়িয়া তাহার পাপড়ি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে নতদৃষ্টি তাহার উপর নিবদ্ধ করিয়া মুকুল ধীরে ধীরে কহিল "ওঃ!"

দুইজনেই স্তব্ধ। সহসা বিমল আসিয়া হাসিমুখে কহিল "এই যে ইন্দু এসেছিস্, চল্ না আজ একটু মোটরে করে বেড়িয়ে আসা যাক্। মুকুল, তুই যাবি?" মুকুল কি ভাবিয়া কহিল "না থাক্ আজ একটু কাজ আছে।" বিমল অবাক হইয়া কহিল "সে কি? সকালে তুই-ই ত বলছিলি না—" মুকুল তীব্র স্বরে কহিল "সকালে মনে ছিল না যে আজ বিকেলেই লাইব্রেরীর বইখানা শেষ করতে হবে।" কথা কয়টি বলিয়াই সে ধীরে ধীরে গাড়ী-বারান্দার দিকে অগ্রসর হইল। বিমল কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল "ইন্দু, চল্ আমরাই যাই।" শুভেন্দু হাসিয়া কহিল "এ, প্রস্তাব তোমার আজ আমার প্রত্যাখ্যান করতে হচ্ছে, কারণ এক জায়গায় আমার নেমন্তন্ন আছে।"

বিমল একটু আহত হইয়া কহিল "তবে আর কি হবে বল, কাল কিন্তু আসিস্ নইলে আমি গিয়ে ধরে আনব।" শুভেন্দু অল্প হাসিয়া প্রস্থান করিল। সে বরাবর মেসেই গেল, তাহার যে নিমন্ত্রণ ছিল তাহা যেন সে ভুলিয়া গেল।

পরদিন বৈকালে শুভেন্দু বিমলদের বাড়ী গেল, দেখিল ড্রয়িংরুমে মুকুল বসিয়া একখানি বই পড়িতেছে। তাহাকে দেখিয়া মুকুল মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া নমস্কার করিতে যাইতেই তাহার কোল হইতে বইখানি কার্পেটের উপর পড়িয়া গেল। শুভেন্দু তাহা কুড়াইয়া মুকুলের হাতে দিতেই উভয়ের আঙ্গুলে আঙ্গুল ঠেকিয়া গেল, মুকুলের মুখ লাল হইয়া উঠিল; ঠিক সেই সময় বিমল আসিয়া উচ্ছ্বসিতস্বরে কহিল "এই যে এসেছিস্, আমি মনে করেছিলুম আসবিনে বুঝি।" শুভেন্দু একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া স্বাভাবিক স্বরে কহিল "এ ধারণাটা তোমার কেন হল বিমল?" হাসিমুখে বিমল কি বলিতে যাইতেছিল মুকুল বাধা দিয়া কহিল "শুভেন্দুবাবু, আপনার শেফালিকা কি বেরিয়ে গেছে?" শুভেন্দু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া কহিল "হ্যাঁ, সে ত মাসের প্রথমেই বেরিয়ে গেছে, কেন আপনি কি পান নি?" মুকুল ক্ষুব্ধস্বরে কহিল "না কই আমি ত পাই নি।" শুভেন্দু হাসিয়া কহিল "আমার কাছে কখানা আছে আপনাকে দেবো' খন।" আশ্বস্তা হইয়া মুকুল কহিল "দেবেন ত? মাসের প্রথম হতেই আমি শেফালিকার প্রতিক্ষা করে আসছিলুম কিন্তু দাদা বললে সে নাকি এ মাসে বেরোবে না, দেখুন ত কি অন্যায়।" বিমল হাসিয়া কহিল "অন্যায়টা কি? কবিতার দিকে কোন জন্মেও আমার ঝোঁক নেই, তবে মুকুর তাড়ার চোটে গুরুদাসবাবুর দোকানে গেলুম, শেফালিকা নাম ভুলে গিয়ে বললুম মশাই মঞ্জুরিকা কবে বেরোবে, তাঁরা বললেন সে ত এ মাসে বেরোবে না ফাল্গুন মাসে বেরোবে, আমি মুকুকে এসে তাই বলেছিলুম।" মুকুল ও শুভেন্দু জোরে হাসিয়া উঠিল, কোন মতে হাসি থামাইয়া মুকুল কহিল "মাগো, দাদা কি অদ্ভুত, শুভেন্দুবাবুর শেফালিকাকে কি না হেমেন্দ্রবাবুর

মঞ্জুরিকা করে দিলে, আমি প্রথম হতেই এই সন্দেহ করে আসছিলুম।" তারপর সে উঠিয়া পড়িয়া কহিল "আসুন শুভেন্দুবাবু, এক কাপ্ চা খেয়ে যাবেন, এস দাদা।" বিমল ও শুভেন্দু উঠিয়া পড়িল।

(৪)

সম্মুখে মুকুলের জন্মদিন আসিল। শুভেন্দুকে বিমলবাবু অনেক করিয়া বলিয়া দিয়াছেন সে যেন নিশ্চয় আসে।

শুভেন্দু চিন্তিত হইল। বড়বাজারের প্রায় সব দোকান ঘুরিয়া অবশেষে সে উপহারের উপযোগী একটী হীরার আংটি কিনিল। জন্মদিনে উৎসবের পর বারোটা রাত্রে সব বন্ধু চলিয়া গেলেন, শুভেন্দু বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে মুকুলও তাহাকে বিদায় দিবার জন্য আসিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া পকেট হইতে আংটির বাক্সোটি বাহির করিয়া ধীরে ধীরে শুভেন্দু কহিল "সকলের সঙ্গে দিলে তখন যদি আপনার চোখে না পড়ে তাই এ ক্ষুদ্র উপহারটি দিতে পারিনি, ক্ষমা করবেন।" মুকুল হাত বাড়াইয়া উপহারটি গ্রহণ করিয়া কম্পিত স্বরে কহিল "ধন্যবাদ আপনাকে।" শুভেন্দু নমস্কার করিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

মেসে বৈকাল বেলা শুভেন্দু বিমলবাবুর একখানি পত্র পাইল, পড়িয়া সে স্তম্ভিত হইল, বিমলবাবু লিখিয়াছেন—শুভেন্দুর সঙ্গে মুকুলের বিবাহ হয় ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা, শুভেন্দুর কি মত সে যেন তাহা লিখিয়া পাঠায়।

শুভেন্দু সমস্যায় পড়িল, তাহার সহিত মুকুলের বিবাহ—ইহা কখনও সম্ভব নয়! সেখানে তাহার জননী প্রতিক্ষা করিতেছেন, বাণী আর মুকুল ইহার মধ্যে মুকুলকেই বাদ দিতে হয়। তখনি সে লিখিয়া পাঠাইল—তাঁহার এ শুভ ইচ্ছা তাহাকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে হইতেছে, একটী জরুরি কাজের জন্য সে কালই বাড়ী যাইবে, তাড়াতাড়িতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারিল না। বিমলবাবু যেন তাহাকে ক্ষমা করেন।

সত্যই সে পরদিন বাড়ী চলিয়া গেল সেখানে গিয়া জানাইল বাণীকে সে এই মাসে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছে। জননী প্রথমে বিস্মিত হইলেন কিন্তু আনন্দে শীঘ্রই তাঁহার সে বিস্ময় কাটিয়া গেল। সেই মাসেই বাণীর সহিত শুভেন্দুর বিবাহ হইয়া গেল।

* * * * * *

ইহার কুড়ি বৎসর পরের কথা। শুভেন্দু এখন আর সেই যুবক নাই, সেএকজন প্রবীণ ইঞ্জিনীয়ার। আপাততঃ সে বাঁকিপুরে সপরিবারে বাস করিতেছিল।

একদিন সকালে সে বাহিরের ঘরের সম্মুখে বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল সেই সময় একখানি 'কার' বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিল। তাহা হইতে নামিলেন একজন কোটপ্যান্ট্ধারী ভদ্রলোক। শুভেন্দু বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া কহিল "একি তুমি, বিমল!" বিমল তাহার সম্মুখে আসিয়া হাস্যমুখে কহিল "হ্যাঁ, আমি সেই বিমলই বটে, চিন্‌তে পেরেছ তা হলে; ওঃ কতদিন পরে আবার দেখা বলত!" শুভেন্দু তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া ঘরে একখানি চেয়ারে বসাইয়া আপনি তাহার সম্মুখে আর একখানি চেয়ারে বসিয়া কহিল "তোমাদের খবর কি বিমল?" বলিয়াই তাহার একজনের কথা মনে পড়িয়া গেল।

বিমল কহিল "হ্যাঁ, আমাদের সব ভাল।" শুভেন্দু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল "মুকুল ভাল আছেন ত, তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে বোধ হয়?" বিমল মুখ ম্লান করিয়া কহিল "মুকুল? সে ত নেই, তুমি কি শোননি তোমার চলে আসার পরই সে বেণারসে মেয়েদের স্কুলে টিচার হয়ে চলে যায়? বাবা আমি সকলেই বারণ করেছিলুম সে শোনেনি, আজ ছ বছর হল সে মারা গেছে। কুমারী ছিল, আমাদের একান্ত অনুরোধেও সে বিয়ে করে নি। কাশীতে চোদ্দ বছর টিচার ছিল।"

বিমল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল, দুইজনেই স্তব্ধ। পনের মিনিট পরে বিমল পকেট

হইতে একটী মোড়ক বাহির করিয়া ধীরে ধীরে কহিল "মুকুলের মরবার সময় আমরা কাশীতে গেছলুম, একদিন নির্জ্জনে আমায় ডেকে মুকুল এই মোড়কটা দিয়ে বললে "দাদা শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে যদি কখন তোমার দেখা হয় তবে তাঁকে এটা দিও। তারপর আমি মাদ্রাজে গিয়ে ওকালতি করি, তোমার খোঁজ নিইনি, আজ ছ মাস হল দেশে এসেছি, তোমার খবর পেয়ে এইটে দিতে এসেছি, জানি না এর ভেতরে কি আছে।"

শুভেন্দু কম্পিত হস্তে মোড়কটি খুলিয়া দেখিল একটী ছোট ভেলভেটের বাক্সের ভিতরে একটী হীরার আংটি ঝক্‌মক্ করিতেছে। সে চমকিয়া গেল, তাঁহার মনে পড়িল কুড়ি বছর আগে একদিন মুকুলকে জন্মদিনের উপহার বলিয়া এই আংটি সে দিয়াছিল।

যাইবার সময় মুকুল আংটিটি ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছে, আংটির তলায় একটি ক্ষুদ্র কাগজে শুভেন্দু পড়িল বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে "ব্যথার দান।"

অকাল বোধন

শ্রীমতী বিমলাবালা দেবী।

মহাশক্তি জেগেছিল অকাল বোধনে,
আজো তার স্মৃতিরেখা ভাতিছে নয়নে।
সেদিন সুদূরগত, সবংশে রাবণ হত,
মত্ত রঘুবীর যবে যুঝে রক্ষঃরণে,
মনে পড়ে সেইদিন বোধন পূজনে॥

ভুবন পাবন রামচন্দ্ররূপ হেরি,
মোহিতা কন্দর্পশরে দুষ্টা নিশাচরী।
যেরূপ দরশে হায়, পাপরাশি দূরে যায়,
সেই সুধা পাত্রভেদে বিষরূপ ধরি,
মজিল রাক্ষসী পিতৃবংশ ধ্বংস করি॥

কামমুগ্ধা নিশাচরী অনৃতবাদিনী,
যাইয়া রাবণ পাশে গাহিল কাহিনী।
কুলটার মিথ্যাভাষে, দশস্কন্ধ মহারোষে,
কপট যোগীর বেশে পশি সে বনানী
হরি' সীতাসতী যায় নিজ রাজধানী॥

জ্বলিল যে মহানল সেই সে কারণ,
সপ্তসিন্ধু জলে তার হয় নির্ব্বাপণ।
মহাবংশ রক্ষোকুল, হইল কম্পিতমূল,
হইল লঙ্কেশ শেষে বিগত চেতন
হইল সফল মহাশক্তির সাধন॥

অকাল বোধনে মনে পড়ে কত কথা,
কবিগুরু-মহাকাব্যে আছে সে বারতা।
যাইয়া মানস-সরে, মারুতি সংগ্রহ ক'রে
আনি দিল নীলোৎপল অষ্টোত্তর শতা,
পরীক্ষিতে রামে দেবী খেলে চতুরতা॥

হরিল একটি পদ্ম দেবী মায়াবলে,
মহাপূজা সিদ্ধ নাহি হয় তার ফলে।
তবে হায় রঘুবীর, অবিচল ধীর স্থির,
প্রেমাশ্রু প্লাবিত পড়ি দেবী পদতলে,
নিবেদিল আত্মাহুতি ভক্তি-বিল্বদলে॥

"লোকে বলে দেবী! মোরে কমললোচন,
উৎপাটিয়া চক্ষু এক করিব অর্পণ।
প্রসীদ পরমেশ্বরী, ক্ষম দাসে ক্ষেমঙ্করি।'
এত বলি তীক্ষ্ণ শর করিল গ্রহণ,
আবির্ভূতা বিশ্বমাতা হইলা তখন॥

মহাশক্তি পূজা সেই অপূর্ব্ব কথন,
আজো স্মৃতি সমুজ্জ্বল—অকাল বোধন।
কিন্তু এ অভাগা দেশে, কি দশা হ'য়েছে শেষে,
উঠে গেছে মহাপূজা সে শক্তি সাধন,
এখন বিফল তাই অকাল বোধন॥

একখানি চিঠি

শ্রীমতী মোহিনী দেবী।

কল্যাণীয়—

আজকাল মহিলাদের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য অনেক মহোদয় অনেকরূপ চেষ্টা করিতেছেন তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদার্হ। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁহাদের সেই চেষ্টা শুধু সহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ, পল্লীগ্রামে এখনো সেই পূর্ব্বের মত নারী-নির্য্যাতন পূর্ণদমে চলিতেছে। প্রতিকারকারী মহোদয়গণ যদি অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে একটু মনোযোগ দেন তাহা হইলে বহু হতভাগিনী নির্য্যাতনের হাত হইতে মুক্ত হইয়া জীবনে একটু শান্তিলাভ করিতে পারে। আজ যে পত্রখানা তোমায় পাঠাইতেছি ইহার সবই সত্য ঘটনা এবং ঘটনার স্থল কলিকাতার নিকটবর্ত্তী একটি পল্লীগ্রাম। এই দুঃখপূর্ণ ঘটনার নায়কনায়িকাগণ সুস্থ শরীরে, খোসমেজাজে এখনো জীবিত আছেন, এত বড় রকমের একটা অত্যাচার করিয়া তাঁহাদের মনে কোন প্রকার গ্লানি বা অনুশোচনা নাই। আজ এই ঘটনাটী লিখিতেছি, ভবিষ্যতে আরও নির্য্যাতিতা কন্যা ভগিনীদের বিষয় জানাইব।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন একটি গ্রামে দুই মাতৃভক্ত (?) ভাই বাস করিতেন। এঁদের অবস্থা বেশ সচ্ছল। বিবাহের পর বড় ভাইটির একটি কন্যা সন্তান হয় এবং এই কন্যাটি হইবার পরই বড় বধূর শরীর বিশেষ খারাপ হইয়া পড়ে। ছোট মেয়ে লইয়া অসুস্থ শরীরে সংসারের কাজকর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া সম্পন্ন করা কতদূর কষ্টসাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু শাশুড়ী ঠাকুরাণী বধূর কার্য্যের ত্রুটির জন্য বিশেষ রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন। এই সময় বধূর শরীর আরও খারাপ হইয়া উঠে কিন্তু শাশুড়ী ছাড়িলেন না, কাজ করাইয়া লইবার জন্য বধূকে যথেষ্ট নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিলেন। এক একদিন এমন নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতেন যে তাহাকে রোদন করিতে করিতে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিকবর্ত্তী কোন লোকের বাড়ীতে দৌড়াইয়া যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু মানুষ অত্যাচার কতদিন সহ্য করিতে পারে? এইরূপ প্রহার খাইতে খাইতে বধূটি সাঙ্ঘাতিক পীড়িত হইয়া পড়িল এবং কয়েকদিনের মধ্যেই সকল যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া তাহার সেই আকাঙ্ক্ষিত দেশে গমন করিল্ যেখানে স্নেহসহানুভূতিহীন স্বামী বা প্রহারকারিণী শাশুড়ী নাই।

ছোট ভাইটীর বিবাহ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হইয়াছিল, অল্প বিস্তর নির্য্যাতন সে বধূর উপরও হইয়া আসিতেছিল। শাশুড়ী ঠাকুরাণী একদিন ডাকিলে ছোট বধূর আসিতে একটু বিলম্ব হওয়ায় তিনি একখানি পিঁড়ি ছুড়িয়া তাহাকে এমন্ ভাবে আঘাত করিলেন যে বধূটি রোয়াকের উপর হইতে আছড়াইয়া উঠানে পড়িয়া গেল এবং তাহাতেই তাহার জীবনের অবসান হইল। তখন উপায় কি? তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না মাতাঠাকুরাণী এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রদ্বয় বধূটিকে তাড়াতাড়ি পুষ্করিণীর জলে ডুবাইয়া রাখিয়া প্রচার করিলেন যে বধূ জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। একটু আধটু গোলযোগ যে না হইয়াছিল তাহা নহে কিন্তু টাকার জোরে সব হয়—এঁরাও নির্ব্বিবাদে নিস্তার পাইলেন।

এই সময় মাতাঠাকুরাণী বড়ছেলের পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া পড়িলেন। বাঙ্গলাদেশে কন্যার অভাব নাই। যথাসময়ে বড়টি

পুনরায় একটি সালঙ্কারা কন্যাকে মাতাঠাকুরাণীর দাসী হইবার জন্য আনয়ন করিলেন।

কিছু দিন কাটিলে একদিন রাত্রে স্বামীদেবতা বালিকাবধূকে পদসেবা করিতে আদেশ দিলেন। স্ত্রীর স্বামীই পরমদেবতা, তাঁহার আদেশ অমান্য স্ত্রী কিছুতেই করিতে পারেনা। বধূ স্বামীর পদসেবা করিতে লাগিল। দুইতিন ঘণ্টা পদসেবা করার পর কখন জানেনা সে স্বামীর পদতলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। স্বামীমহাশয় নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন বধূ তাঁহার পদতলে নিদ্রামগ্না, এই আর কোথায় যাইবে, তিনি সেই নিদ্রাকাতরা বধূকে এমন এক লাথি মারিলেন যে বালিকা ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিয়া কয়েক হাত দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। চীৎকার শুনিয়া মাতাঠাকুরাণী ও ছোট ছেলে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং বড় ছেলে বধূর অবাধ্যতার কথা তাঁহাদের জ্ঞাপন করিলেন। ব্যাপার শুনিয়া তাঁহারা ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া গেলেন এবং সোদরপ্রতিম কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং স্নেহশীলা জননী বড়বাবুর কার্য্যের প্রশংসা করিয়া বধূকে বিশেষ শাস্তি দেওয়া উচিত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্মার্জ্জনী আঘাতে বধূকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল।

মেয়েটির পিতার অবস্থা তেমন সচ্ছল নহে, তবু নিজের মেয়ে ত! পিতা তাহাকে নিকটেই রাখিলেন। প্রায় তিন বৎসর মেয়েটি পিত্রালয়ে থাকার পর উভয় পক্ষের মধ্যে একটা মিটমাট হয় এবং কন্যার পিতা পুনরায় তাহাকে জামাতা-গৃহে রাখিয়া গেলেন।

কথায় বলে স্বভাব না মরলে যায় না। দিনকতক বেশ ভালভাবে কাটার পর বধূর উপর আবার নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। অনবরত অত্যাচার, কথায় কথায় প্রহার, অনাহারজনিত কষ্ট সহ্য করিতে করিতে কয়েকমাসের মধ্যেই সে পীড়িত হইয়া পড়িল। ডাক্তার বৈদ্য দেখান দূরের কথা শশ্রূঠাকুরাণী ও স্বামীদেবতা বধূকে একটি নির্জ্জন কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন কারণ বধূর রোগশয্যার আর্ত্তনাদ তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। মেয়েটি রোগ-যন্ত্রণা, অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন রাত্রে সেই নির্জ্জন কক্ষে গলায় দড়ি দিয়া সকল কষ্টের হাত হইতে মুক্ত হইল। পরদিন প্রাতে কক্ষ হইতে কোন সাড়া শব্দ না পাওয়ায় স্বামীদেবতা ও শাশুড়ী ঠাকুরাণী দরজা খুলিয়া দেখিলেন বধূ গলায় দড়ি দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। গ্রামের মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। নানান জনে নানান কথা বলিতে লাগিল। কিন্তু পয়সায় সব হয়। কলসীর জলের মত হড় হড় করিয়া পয়সা খরচ করিয়া তাঁহারা নিস্তার পাইলেন। প্রমাণ হইল—তাঁহারা যত্ন চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, বধূটি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করিয়াছে।

আর লেখনী সরিতেছেনা। দুই মাস পরেই স্বামীপুঙ্গব অন্যত্র বিবাহ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু এই যে নির্দ্দোষী বালিকার অশরীরি আত্মা হায় হায় করিয়া অশান্ত ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় না কি? শুধু কি এই বালিকা! এই প্রকার বাঙ্গলার বুকে কত শত বালিকা, কত শত রমণী যে নিত্য নির্য্যাতিতা হইতেছে তাহার খবর কে রাখে?

আজ এই পর্য্যন্ত। ভবিষ্যতে অন্যান্য নির্য্যাতিত কন্যা ভগিনীদের সংবাদ তোমাদের জানাইব। ইতি

মায়ের আগমনে

শ্রীমতী তমাললতা বসু।

তখন সবে সকাল হয়েছে, চোখটি খুলে সবে মাত্র চেয়েছি, এমন সময় বাইরের দরজায় ভিখারী খঞ্জনী বাজিয়ে গেয়ে উঠলো—

"উঠ গিরি ত্বরা করি
আনগে প্রাণের গৌরি"

সময়োপযোগী গানটি কাণে এসে যেন সুধা বর্ষণ কর্ত্তে লাগলো।

আলস্য ত্যাগ করে উঠে এসে বাইরে দাঁড়ালুম, একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, শারদীয়া প্রকৃতি অপূর্ব্ব শোভাময়ী, মনে হ'লো -

"আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে
হে মাত বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।"

প্রাণ ভ'রে উঠলো। চারিদিকেই মার আগমনী ঘোষিত হ'চ্ছে।

অনেকদিন পরে প্রবাস থেকে মা যেন সন্তানদের কাছে ফিরে আস্‌ছেন। তাই মার সন্তানরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে মার দর্শন আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠছে।

চক্ষু মুদ্রিত করে হৃদয়ের মধ্যে মার সেই বরাভয়প্রদায়িনী মূর্ত্তি স্মরণ করলুম। দেখলুম দশভুজামূর্ত্তিতে দশহাতে দশপ্রহরণ ধারণ ক'রে সিংহপৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে মা আমার অসুরদলনে নিযুক্তা

আবার মার নয়ন দুটিতে করুণার অজস্র ধারা ঝরে পড়্‌ছে। মুখে স্নেহমাখা মিষ্ট হাসি। দশহাতে তিনি সন্তানদের অভয় দান করছেন। তাঁর সর্ব্বালঙ্কারভূষিত দেহ থেকে অপূর্ব্বজ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মেঘের মত কালো কেশরাশি পৃষ্ঠদেশে এলিয়ে পড়েছে। মার মস্তকে স্বর্ণমুকুট, অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত রাঙাপায়ে নীলোৎপল ও রক্তজবা শোভা পাচ্ছে, তাঁর দক্ষিণে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণপতি এবং বিষ্ণুপ্রিয়া ইন্দিরা, বামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, এবং বিদ্যাবুদ্ধিপ্রদায়িনী বাণী বীণাপাণি।

মা যেন সন্তানদের অভয় দিয়ে বলছেন "হে আমার প্রিয় পুত্রকন্যাগণ, তোমাদের আর ভয় নাই, আমি এসেছি, তোমাদের দুঃখ দূর কর্ত্তে এসেছি, সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধিকারী গণপতিও এসেছেন, তোমাদের ধন ধান্য দান কর্ত্তে স্বয়ং লক্ষী অবতীর্ণা, বিদ্যা বুদ্ধি প্রদান কর্ত্তে বীণাপাণি মুক্তহস্তা, শত্রুদলনকারী দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় স্বয়ং অগ্রগামী, তবে আর তোমাদের ভয় কি? একবার বুক বেঁধে, নব বলে বলীয়ান্ হয়ে সকলে দাঁড়িয়ে ওঠো, ঘুম ছেড়ে জাগো, অলসতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো।

"বার বার তোমাদের দুঃখ দূর কর্ত্তে এসে তোমাদের প্রাণের আগ্রহ ও একাগ্রতা না দেখে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরছি। এবার ওঠো, বাঙ্গালার পুত্রকন্যাগণ, নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও।

"তোমাদের দেশের পয়সা দেশ দেশান্তরের লোক এসে নিয়ে যাচ্ছে, আর চরিদিকে পয়সা ছড়ান থাক্‌তেও তোমাদের কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা নেই। পথে ঘাটে যে কোন কাজে সর্ব্বত্রই দেখি বিদেশীরাই অগ্রণী, মিস্ত্রির কাজ করছে চীনেরা, ব্যবসা করছে মাড়োয়ারীরা, মোটর চালাচ্ছে শিখেরা, হোটেল দোকান বাজার সবই বিদেশীর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

"বাঙ্গালাদেশ—বাঙ্গালীর জন্মভূমি, চির বাসস্থান। কিন্তু সব কাজেই বাঙ্গালীর সংখ্যাই কম। কেবল আপিস্‌অঞ্চলে দেখ্‌লে বুঝতে পারি যে বাঙ্গালী কি রকম ভাবে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে কেরাণী-জীবন যাপন করছে!

"হায়! এই যে ধনধান্য ভরা শস্যশ্যামলা

রত্নৈশ্বর্য্যময়ী বাঙ্গালীর মাতৃভূমি, তোমাদের জন্মভূমি, স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী অযাচিত ভাবে তোমাদের বিবিধ দ্রব্যসম্ভার দান করছেন, তোমরা মায়ের সে স্নেহের দান অগ্রাহ্য করে, বিমাতার চাকচিক্যময়ী দানই সাদরে গ্রহণ কর্ত্তে অগ্রসর হ'চ্ছো। তোমাদেরই দেশের চির প্রসিদ্ধ বাণী 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।' তোমরা তার অবহেলা ক'রে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে বিদেশীর মুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছ। বাঙ্গালাদেশ অথচ বাঙ্গালী ব্যবসাদার খুঁজেই পাওয়া যায় না।

"আজ বৎসরের পর ফিরে এসে আমি একি দেখলুম, আমার প্রিয় সন্তানরা জীবন্মৃত অবস্থায় পরাধীনভাবে দুঃখের জীবন যাপন করছে! কাহারো পেটে অন্ন নাই, পরণে কাপড় নাই, কেউ বা ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ, কেউ বা অখাদ্য আহার করে ভীষণ রোগে আক্রান্ত, কেউ বা কন্যার বিবাহের ও সংসারের ভাবনায় মুহ্যমান। কঙ্কাল সার দেহ, স্ফূর্ত্তিহীন প্রাণ এই নিয়ে, আর দলাদলি বাদবিসম্বাদ ভ্রাতৃবিচ্ছেদ পরনিন্দা পরচর্চ্চা এই করে' জীবন যাপন কর্ত্তে ব্যস্ত। তোমাদের জন্যে এত যে দ্রব্যসম্ভার সাজিয়ে নিয়ে এলুম, তা তোমরা একবার ফিরে দেখতেও সময় পেলেনা। কাজেই দ্বারে দ্বারে ফিরে এবারও আমার বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতে হয় বুঝি!"

চোখ খুলে ব্যাকুল হয়ে জোড়হাতে বলে উঠলুম—"হায় মা স্নেহময়ী, করুণাময়ী জগত জননী,

'কুপুত্র যদ্যপি হয়
কুমাতা কখন নয়'

তাই বলি মা, তুমি বিমুখ হয়ে বার বার অমন করে চলে যেওনা, তাহলে তোমার সন্তানরা চির অন্ধকারেই থেকে যাবে। তুমি তোমার এই অধঃপতিত সন্তানসন্ততিকে মাটি ময়লা ধুয়ে দিয়ে তোমার স্নেহের কোলে স্থান দিয়ে সুমতি দাও, দুঃখ দূর করো। শোকে দুঃখে তাপে অত্যাচারে অবিচারে দলিত মথিত সন্তান-প্রাণে শান্তি দাও। মাগো, তুমি না চাইলে আর কে তোমার সন্তানদের মুখ চাইবে মা?"

"ভাঙ্গা বুক বেঁধে, মলিন মুখে হাসি এনে, তোমার পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে নিয়ে তোমার সন্তানসন্ততি অপেক্ষা করছে। তাদের মোহতিমির বিদূরিত ক'রে, জ্ঞান প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে দাও মা।"

"শক্তিময়ী মা আমার, তুমি সদানন্দময়ী তবে তোমার সন্তানদের প্রাণে এ নিরানন্দ কেন মা?"

"এ নিরানন্দ দূর করে আনন্দধারায় তাদের প্রাণ অভিসিঞ্চিত করে তোলো—তোমার চরণে এই প্রার্থনা।"

জন্মভূমি

শ্রীমতী তরুলতা দাসী।

নম জন্মভূমি! এ জগতে তুমি
　স্বভাব-শোভায় ভরা,
শান্তি নিকেতন, পুণ্য তপোবন
　মা তুমি মানস-হরা।
নম জন্মভূমি! পাতিয়াছ তুমি
　স্নেহের আঁচল খানি,
পবিত্র সুন্দর বক্ষের উপর
　তনয়ে রেখেছ টানি।

ধান্যে ভরা মাঠ পণ্যে ভরা হাট
　জলভরা নদী নদ,
শ্যামল কোমল তরু, দুর্ব্বাদল
　মা তব পরিচ্ছদ।
যথা তথা থাকি মনে যেন রাখি
　তোমার অসীম স্নেহ,
করি নমস্কার নাহি মা আমার
　তোমার তুল্য কেহ।

সঙ্কলিকা

মহিলা প্রগতি—

ভারতবর্ষে কোচিন রাজ্যই সর্ব্বপ্রথম নারীদের ভোট দিবার অধিকার এবং নির্ব্বাচনে দাঁড়াইবার অধিকার দান করেন। সেখানেই নারী এবং পুরুষদের মধ্যে সকল রকমের প্রভেদ একেবারে দূর করিয়া দেওয়া হয়। কোচিন প্রদেশের মত ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের নারীরা এত শিক্ষিত নহেন। শিক্ষিত নারীর সংখ্যাও কোচিনে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বেশী। কোচিনের মহারাণীও খুব শিক্ষিতা এবং প্রজাদের উন্নতির জন্য সতত ব্যস্ত রহিয়াছেন। * * *

বম্বের একজন বণিক-দাতার অর্থে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের জন্য একটি বিশেষ হোষ্টেল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ছাত্রী-আবাসটী একটি দেখিবার জিনিস। * * * এই বিশেষ কার্য্যে দাতার দানকে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না, কারণ দাতা স্পষ্টই বুঝিয়াছেন যে, নারী এবং পুরুষ একসঙ্গে না চলিতে পারিলে দেশের কোন আশা নাই। এই নূতন ছাত্রী-আবাসে ১০০ জন ছাত্রী থাকিবার মত স্থান হইয়াছে। * * *

মাদ্রাজের আদায়ার বিদ্যালয়ের মেয়েদের একজন ডাচ-মহিলা বাইসাইকেল চড়া শিখাইতেছেন। তিনি তাঁহার নিজের বাইসাইকেল এই কার্য্যে দান করিয়াছেন। গত ছইমাসে ১৫ জন মহিলা বেশ ভাল বাইসাইকেল চড়িতে শিখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের কার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে খোলা হাওয়ায় ব্যায়ামের জন্য শরীরও ভাল হইতেছে। * * * বাইসাইকেল চড়িতে শিখিলে মেয়েদের অনেক সময় স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করিবার সুবিধা হয় এবং এপাড়া ওপাড়া যাইতে হইলে থার্ড ক্লাশ গাড়ী ডাকিয়া ছয় আনা পয়সা ভাড়া দিতে হয় না।

আফগানিস্থানের বর্ত্তমান আমীর আমান-উল্লা দেশের নানাপ্রকার উন্নতি করিবার সময় নারীদের ভুলিয়া যান নাই। দুইবৎসর পূর্ব্বে মহারাণীর নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে একটি মেয়েদের বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এই দেশে আর কখনও নারী-বিদ্যালয় খোলা হয় নাই। বিদ্যালয়টি পর্দ্দা-বিদ্যালয় হইলেও ইহাতে দেশের অনেক উপকার হইতেছে। বিদ্যালয়ের চারিদিকে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হইয়াছে। বিদ্যালয়টিতে ৩৫০ জন ছাত্রী আছে। সকলেই বুদ্ধিমতী। বিদ্যালয়ে পাঁচ বৎসর পড়িতে হয়। ছোট মেয়েদের সাত বছর বয়স হইতে লেখাপড়া শুরু করিতে হয়। বিদ্যালয়ে পড়া, লেখা, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, চিত্রাঙ্কন, সেলাই-শিল্প ইত্যাদি সহজ ভাবে শিখান হয়। শিক্ষয়িত্রীরা ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষিত হইয়া গিয়াছেন।

সুদূর চীনদেশের উচাও সহরের নারীরা একটি দৈনিক কাগজ বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই কাগজে নারীদের সংক্রান্ত ব্যাপার এবং সংবাদাদি ছাড়া অন্য কিছুই থাকিবে না।

জাপানে নারী-শ্রমিকদের একটি সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার সভ্য সংখ্যা ১০০। এই সংখ্যার মধ্যে সকল রকমের নারীই আছেন। এই সঙ্ঘ ক্রমশঃ তাঁহাদের দল বাড়াইতেছেন এবং ক্রমে তাঁহারা জাপানের সমস্ত নারী-শ্রমিকদের কেন্দ্র-সঙ্ঘ হইবেন বলিয়া মনে হয়। সঙ্ঘ নারী-শ্রমিকদের সকল প্রকার উন্নতির দিকে দৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ গুলিতে এই প্রকার নারী-শ্রমিক-সঙ্ঘের বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রবাসী।

ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়—

ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বাঙ্গালার পল্লীগুলি ধ্বংশ হইতে বসিয়াছে। * * * মশকই যে এই রোগের উৎপত্তির কারণ তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন, অথচ এই মশককুলের ধ্বংশের আমরা কোনরূপই চেষ্টা করি না। ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে প্রথমতঃ জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। আগে আমাদের দেশে সময়ে বৃষ্টি হইত, সে বৃষ্টির ফলে পল্লীপথের আবর্জ্জনাসমূহ উত্তমরূপে ধৌত হইয়া লোকসঙ্কুল স্থান হইতে বহুদূরে চলিয়া যাইত। তাহার ফলে সময়ের সুবৃষ্টির দরুণ পল্লীগ্রামের জলনিকাশের কার্য্য সম্পাদন হইত। এখন সময়ে সুবৃষ্টি হয় না, সুতরাং ভালরূপে জল নিকাশও হয় না। পল্লীর বনপথ পরিষ্কার করিতে হইবে, বাড়ীর নিকট যে সব ডোবা বা গর্ত্ত আছে তাহা বুজাইয়া ফেলিতে হইবে। জলাশয়গুলি যাহাতে কলুষিত না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। মশক দংশন হইতে অব্যাহত থাকিবার জন্য "সন্ধ্যার পর আর নগ্ন গায়ে" থাকা চলিবে না, সকলকেই জামা বা কাপড় গায়ে দিয়া থাকিতে হইবে। মশারি খাটাইয়া রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে হইবে। * * * প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় গৃহমধ্যে ধূপ-ধুনা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ধূপ ধুনার গন্ধ মশকগণ সহ্য করিতে পারে না—ইহা সকলে মনে রাখিবেন। আগে প্রত্যেক হিন্দুর সংসারে তুলসী ও কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছ সযত্নে রক্ষিত হইত। ইহারা রস টানিয়া, স্যাঁতসেঁতে জমী শুষ্ক করে। তাহার ফলে স্বাস্থ্যরক্ষা কার্য্যে অনেক উপকারে আসে। সে প্রথা পুনঃ প্রচলন করিতে হইবে। শয়নঘরে খাট, পালঙ্ক, তক্তাপোষ ভিন্ন অন্য কিছু রাখা চলিবে না। বাঙ্গালীকে আবার তৈলমর্দ্দনে অভ্যস্ত হইতে হইবে; উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দনকারী ব্যক্তিগণের ম্যালেরিয়ার আক্রমণ অনেক কম হইয়া থাকে। পল্লীগ্রাম ম্যালেরিয়ার লীলা-নিকেতন বলিয়া পল্লী পরিত্যাগ করিলে চলিবে না, পল্লীরক্ষার জন্য চেষ্টাশীল হইতে হইবে। * * * অর্থে পার, সামর্থ্যে পার, যত্ন লইয়া, চেষ্টা করিয়া, কতক নিজেরা চাঁদা দিয়া, কতক লোকাল বা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যাহাতে গ্রামের জঙ্গল বিদূরিত হয়, রাস্তাঘাটের সংস্কার হয়, সুপেয় জলসংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে তাহার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে হইবে। দেশরক্ষা, সমাজ রক্ষা, বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে এরূপ ব্যবস্থা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। —অর্চ্চনা।

মাতৃ-মন্দির



কৈলাস প্রত্যাবর্ত্তন

PRINTED AT THE FINE ART PRESS



২য় বর্ষ | কার্ত্তিক—১৩৩১ | ৭ম সংখ্যা

বিজয়া

রায় শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম্-এ-বি-এল বাহাদুর।

আজি সে কোথায় গেল, কিবা ছিল কি হইল,
কি হইল পলকেতে সে আনন বিহনে;
আলোকে আলোকময় ছিল এ দিবস-ত্রয়
এ আলোকহীন পুরী দ্যুলোকের বরণে;
বহিল আনন্দে তার আনন্দের পারাবার
মন্দিরে অঙ্গনে পথে নিরানন্দ ভুবনে;
যেন উষা পূর্ব্বাকাশে দিবস শর্ব্বরী হাসে,
যেন নিশি পৌর্ণমাসী নিশিদিন গগনে;
প্রফুল্ল প্রসূনাবলী— ফুল্ল যেন বনস্থলী
পিককুলে-কাকলীতে পরিপূর্ণ প্রভাতে,
হর্ষময় কলরবে তিন দিন মত্ত সবে,
সুশোভিত ছিল সব ত্রিদিবের শোভাতে;
আজি সব কোথা গেল, কিবা ছিল কি হইল,
কি রহিল বল এই নিরানন্দ নীরবে;
কি আলোক, কিবা আশা, কিবা সান্ত্বনার ভাষা
রহিল তিমিরাচ্ছন্ন ছিন্ন ছিন্ন এ ভবে।

সে কি সব নিয়ে গেছে ? কিবা কিছু বাকী আছে ?
কিবা কিছু চিরন্তন দিয়ে গেছে সন্তানে,
আলোক আঁধায়ে যায় সমভাবে দেখা যায়,
আনন্দ আনন্দ ভুলে থাকে যার সন্ধানে,
আনন্দের সে প্রতিমা, সুষমার সে উপমা
গঙ্গাজলে ভেসে গেছে গঙ্গাধর সদনে;
নিমগ্ন হ'য়েছে কায়া, লগ্ন তার অঙ্গছায়া
নিস্তরঙ্গ গঙ্গাজলে অচঞ্চল আসনে,
কৌমুদী নিভিলে পরে নীলতর নীলাম্বরে
যে ছায়া বসিয়া থাকে অনাকুল আননে
এ যে আনন্দের পরে আজি তাই ঘরে ঘরে,
এ যে শান্তি, লিপ্ত যাহা দেবতার চরণে;
এ যে শান্তি, দেবতার সব প্রসাদের সার,
দেবপদে অন্তরের অতি নম্র প্রণামে
আপনি নামিয়া আসে, অন্তরে বাহিরে ভাসে,
এ প্রপঞ্চ আবরিয়া বৈকুণ্ঠের বিরামে;
দেবতার দরশন, আনন্দের সন্ধিক্ষণ
ক্ষণপ্রভা সম হেসে মিশে যায় তখনি;
পা দু'খানি চ'লে যায়, পদধূলি বিশ্ব ছায়,
সে ধূলিতে চির তৃপ্ত শান্ত থাকে অবনী;
এই শান্তিজল আজ বহুক এ বিশ্বমাঝ,
শান্ত হ'ক এ অনন্ত সে অমৃত পরশি;
শান্ত হোক্ রোগ শোক, পাপ তাপ শান্ত হোক,
দ্বেষ হিংসা ধৌত করি' এস শান্তি বরষি';
এস শান্তি নভস্থলে, এস শান্তি ভূমণ্ডলে,
এস শান্তি অন্তরীক্ষে, পর্ব্বতের কন্দরে,
এস নীল সিন্ধুজলে, শ্যামল বিটপীদলে,
এস শান্তি মানবের এ অশান্ত অন্তরে;
শান্ত কর মত্ত ক্রোধ, ভ্রাতৃবৃন্দে এ বিরোধ,
এই ভেদ এক মার এই সব নন্দনে,
শান্ত কর সব ভাণ, জাতি-কুল-অভিমান,
শান্ত কর ধনমদ নির্ধনের বন্দনে;

শান্ত কর দুরাশায়, পরবিত্ত-পিপাসায়
শান্ত কর লোলুপের এ নৃশংস কবলে ;
শান্ত কর ধর্ম্মবৈরী, জগৎ হিতের অরি,
শান্ত কর অন্যায়ের এ প্রসার ভূতলে ;
শান্ত কর ক্ষমতার অবিনয়, অত্যাচার ;
শান্ত কর ক্ষমাহীন মানসের তাড়নে ;
শান্ত কর সবাকার সর্ব্ববিধ অহঙ্কার,
শান্ত কর জ্ঞান-গর্ব্ব ভক্তি-বারি-সেচনে।

ভারতের নারী

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু বি, এ।

বিলাতের ওয়েমব্লি নামক স্থানে যে বিরাট সাম্রাজ্য প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে, তন্মধ্যে একটা ভারতীয় বিভাগ আছে, একথা সকলেই জানেন। একদিন তথায় নারী সপ্তাহের ভারতীয় দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ঐ দিন ভারতীয় নারী সম্বন্ধে মহারাণী মেরীর একটি বক্তৃতা পঠিত হইয়াছিল, বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন রাজকুমারী হেলেনা ভিক্টোরিয়া। মহারাণী ঐ বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"আমি দুইবার ভারতে ভ্রমণ করিয়া ভারতীয় নারীদিগের সহিত মিলামিশা করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহাতে এখনও আমার তাঁহাদের গাম্ভীর্য্য, করুণা ও সরলতার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। তাঁহাদের কথা আমি সর্ব্বদাই চিন্তা করি এবং সর্ব্বদাই আমি তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করি। আমি দুইবার তাঁহাদিগকে নারীর মহৎ কার্য্যক্ষেত্র "সংসার ও পুত্র পরিবারের" সম্বন্ধে বাণী প্রেরণ করিয়াছি। নারীর হস্তে গঠিত সংসার হইতেই জাতি ও সাম্রাজ্য গঠিত হয় ভারতের যেরূপ অবস্থা তাহাতে সুস্থ, সবল ও সতেজ পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। যাহাতে এই সমস্ত পুত্রসন্তান সংযত ও শান্ত চিত্তের অধিকারী হয় এবং মঙ্গলকর আদর্শ সম্মুখে ধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে, ভারতের নারীর সেই দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। জগতের কুত্রাপি ভারতের ন্যায় অন্তঃপুর পবিত্র নহে—এই অন্তঃপুরচারিকারা কত কি মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, তাহারও ইয়ত্তা করা যায় না। কারণ সংসারের প্রতি ভালবাসা এবং পুত্রপরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যপালন ভারতীয়ের জীবনের মূল লক্ষ্য। আমার মতে জগতের কুত্রাপি অন্য নারী এবিষয়ে ভারতীয় নারীর ক্ষমতায় সমতুল নহে।"

কেন মহারাণী এই কয়টি কথা বলিয়াছেন, তাহা ভারতীয়রা বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। ভারতের নারী শিক্ষায়, দীক্ষায়, 'সভ্যতায়', চালচলনে, কথায়, বার্ত্তায় প্রতীচ্যের fast womenদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। মার্কিণ বা যুরোপের fast women বা sport womenরা কেমন পুরুষের সমকক্ষতা করিয়া আকাশে উড়িতে পারে, জলে ডুবিতে পারে, ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, গল্‌ফ খেলায় পুরুষকে হারাইতে পারে, চাকুরীক্ষেত্রে পুরুষকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিতে পারে! ভারতে এখনও এই 'শুভদিনের' উদয় হয় নাই।

কিন্তু তাহা না হইলেও মহারাণী মেরি ভূয়োদর্শনে ভারতের নারীকেই জগতে সংসার ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক প্রতীচ্য সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া হউক, বা অন্য যে কোন কারণে হউক, দুঃখ করেন যে, এদেশে পূর্ব্বরাগ না হইয়া বিবাহ হয়, বর ক'নে নিজের সুখ দুঃখ না বুঝিয়া অবস্থার সম্পত্তির মত ক্রীত-বিক্রীত হয়, স্ত্রীপুরুষে অবাধ মিলামিশা হয় না বলিয়া নারী সমাজ বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে এবং সে জন্য সামাজিক হিসাবে বিদেশীদের সহিত আমাদের প্রকৃত মিলন হয় না, চাকুরী বা ব্যবসায়ক্ষেত্রে নারী পুরুষের প্রতিযোগিতা করেন না বলিয়া পুরুষও নারীর সমকক্ষতায় প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন না ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহারা এইটুকু বুঝেন না যে, বাহিরের ধূলি কর্দ্দমাক্ত পঙ্কিল মলিন পথে নারী বিচরণ না করিয়াও বিদুষী ও গুণবতী হইতে পারেন, পরন্তু মাতৃত্ব ও গৃহস্থালীর দাবীতেও তাঁহারা পুরুষের অশেষ সম্মানার্হ দেবীত্ব পদে অভিষিক্ত হইতে পারেন। নারীর কর্ম্মক্ষেত্র অন্তঃপুর, একথা এখন প্রতীচ্যেরও বহু নারী স্বীকার করিয়া থাকেন। আমি বলি না যে নারীকে পিঞ্জরের পক্ষীর মত বন্দিনী করিয়া রাখা কর্ত্তব্য, আমি বলি না তাঁহাকে অশিক্ষিতা ও নিরক্ষরা করিয়া রাখিয়া কেবল গৃহের দাসীবৃত্তিতে অভ্যস্তা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদের এই দেশে আমাদের আর্য্য-সভ্যতার ভাবধারার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া পুরুষের সহিত তাঁহাদের অবাধ মিলামিশা ঘটানও কর্ত্তব্য নহে, জীবিকার্জ্জনের জন্য তাঁহাদিগকে কালেজী শিক্ষা দেওয়াও সমীচীন নহে, গৃহস্থালী ও সন্তান পালন হইতে তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দিয়া প্রজাপতির মত ডানা মেলিয়া উড়িতে দেওয়া সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর নহে; ভারতে আর্য্যসভ্যতার বাঁধাবাঁধি আছে বলিয়াই আজ মহারাণী মেরীর মুখে ভারতীয় নারী এই সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে।

আমি অন্যত্র নারী-মঙ্গল সম্বন্ধে লিখিয়াছি যে, আমাদের 'হায় রে সেকাল' অথবা 'আহা মরি একাল', এই দুইয়ের কোনটারই অন্ধ স্তাবক হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমাদের প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার যুগে কন্যাও পুত্রের মত শিক্ষিতা ও মার্জ্জিত-রুচি হইতেন। সতীশিরোমণি সাবিত্রী ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সীতাও তাই। শকুন্তলার জীবনেও শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। তখন শুদ্ধান্ত ছিল বটে, কিন্তু এত 'আবরুর' ঘটা ছিল না। সীতা অসূর্য্যম্পশ্যরূপা বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে স্বামীর সঙ্গে ভীষণ দণ্ডকারণ্য চারিণীও হইয়াছিলেন। দময়ন্তী, শৈব্যা, চিন্তা,—দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

তাঁহারা সংসারধর্ম্মই নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন—মাতৃত্বই নারীর চরম অধিকার বলিয়া মানিয়া লইতেন। তাহাতে সমাজ বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত চলিয়া যাইত। নারী শিক্ষিতা, বিদুষী গুণবতী হউন, ইহা কাহার না ইচ্ছা? কিন্তু বাহিরের জগতের স্বার্থ মলিন দ্বন্দ্বের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, মহারাণী যাহাকে পবিত্র অন্তঃপুর বলিয়াছেন, তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তাঁহাদিগকে সংসার সংগ্রামে পুরুষের সঙ্গিনী হইতে হইবে। ইহাই সকল আর্য্য ভাবধারার শিক্ষা। কেবল এদেশে নহে, য়ুরোপেরও কোনও কোনও অংশে ভারতের এই ভাবধারা কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার দুই একটা পরিচয় দিতেছি। রুষিয়ায় ও বলকানে শ্লাভ জাতির বাস। এই শ্লাভরা আর্য্য জাতিরই বংশধর। য়ুরোপের মধ্যে ইহারা যতটা আর্য্য-রক্ত বিশুদ্ধ রাখিয়াছেন, তত আর কেহ নহে। আমি ইহাদের নারীজাতির রীতি প্রকৃতির কতকটা পরিচয় দিতেছি। পাঠক ইহা হইতে নারীর কর্ম্মক্ষেত্র কোথায় তাহা বুঝিতে পারিবেন।

বলকানের শ্লাভ নারী।

বলকান উপদ্বীপ য়ুরোপের অন্তর্ভুক্ত প্রতীচ্য সভ্যতায় প্রভাবান্বিত। কিন্তু বলকানের শ্লাভ

জাতির নারী য়ুরোপের নারী হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন প্রকৃতির। বলকানের শ্লাভদিগের মধ্যে আমাদের মত একান্নবর্ত্তী পরিবারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এক এক পরিবারকে ব্রাভস্তভো বলে। এই ব্রাভস্তভোর অন্তর্ভুক্ত নর-নারীর বিবাহ হয় না। শ্লাভরা এই হেতু অহঙ্কার করিয়া অন্যান্য য়ুরোপীয়ান জাতিকে বলিয়া থাকে যে, তাহারা আপনার রক্ত-সম্বন্ধের লোকের সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় না। তাহাদের বিবাহ সম্বন্ধ ব্রাভস্তভোর পুরুষগণ নির্দ্ধারণ করে। বিবাহকালে বর ও বধূর প্রথম সাক্ষাৎ হয়—তাহাদের পূর্ব্বরাগের ব্যবস্থা নাই। বাল্যবিবাহ অথবা বাল্যে সম্বন্ধ নির্ণয় বলকান শ্লাভদের মধ্যে খুবই প্রচলিত। এমন কি বিহার বা উড়িষ্যার মত জন্মের পূর্ব্বেও শ্লাভদের কন্যার বাক্‌দত্তা হইয়া থাকে। অবশ্য প্রতীচ্য সভ্যতার প্রভাবে এ সব প্রথার অনেক পরিবর্ত্তন হইতেছে।

গৃহস্থালীর ও কৃষিরকার্য্য শ্লাভ নারীদিগের দ্বারা সম্পন্ন হয়, পুরুষরা প্রতিবেশী শত্রুদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিতেই নিযুক্ত থাকে। অথবা পর্ব্বতে গো-মেষ চারণ করে। এখনও শ্লাভ নারীরা কাষ্ঠ ও জল আহরণ রূপ ভারি কাজ করিয়া থাকে।

নারীরা পুরুষদিগের সহিত একত্র ভোজন করে না। গৃহের পুরুষদের আহার শেষ হইলে অবশিষ্ট অংশ নারীরা আহার করে। এ বিষয়ে বলকান শ্লাভ নারী আমাদের ভারতীয় নারীরই অনুরূপ। আরও অনেক বিষয়ে ভারতীয় নারীর সহিত তাহাদিগের সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। শ্লাভ পুরুষরা অপরিচিতের সম্মুখে কখনও স্ত্রীর সহিত কথা কহে না। তাহাদের স্ত্রী পুরুষ অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতির ন্যায় পরস্পর নাম ধরিয়া ডাকে না।

পূর্ব্বরাগের ব্যবস্থা না থাকিলেও শ্লাভ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেমের অভাব হয় না। শ্লাভ নারী স্বামীর একান্ত অনুরাগিণী। এখনও দেখা গিয়াছে যে, যুদ্ধকালে স্ত্রী স্বামীর সহিত যুদ্ধে অনুগমন করিয়াছে এবং স্বামীর মৃত্যুতে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। এখনও শুনা যায়, শ্লাভ নারী প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া তুর্ক সীমানা অতিক্রম করিয়া গভীর রাত্রিকালে দণ্ডে প্রোথিত স্বামীর মুণ্ড আনয়ন করিয়াছে।

শ্লাভ নারী গৃহস্থালীর সকল কার্য্যই সম্পন্ন করে। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহই মনে করে না যে, তাহারা পুরুষের ক্রীতদাসী। শ্লাভ নারীদেরও নানা অধিকার আছে। শ্লাভদের মধ্যে আমাদের পশ্চিমের সীমান্ত পাঠানদের মত বংশগত প্রতিহিংসা গ্রহণের প্রথা বর্ত্তমান থাকিলেও নারী ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে। নারীদের আমোদ প্রমোদের অভাব নাই। অবসরকালে উত্তম পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া শ্লাভ নারী তাহাদের জাতীয় "কোলো" নৃত্যে যোগদান করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রতীচ্য সভ্যতা-নুযায়ী পূর্ব্বরাগের পর বিবাহ না হইলেও স্ত্রী-পুরুষের প্রেম অসম্ভব নহে, পরন্তু নারী গৃহস্থালীর কার্য্য সম্পন্ন করিলেও গৃহের ক্রীতদাসী নহে।

রুষিয়ার নারী।

রুষিয়া য়ুরোপের অন্তর্ভুক্ত—এখানেও প্রতীচ্যের সভ্যতার বিস্তৃতি ও প্রভাব অনুভূত। অথচ রুষিয়ার সাধারণ নারী অন্যান্য য়ুরোপীয় বা মার্কিণ নারীর মত Foot women বা দ্রুত উন্নতিকামী নারী নহে। ইহার একটা প্রধান কারণ এই যে, রুষিয়া আমাদের মত বহুকাল পরাধীনতার দৃঢ়শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল—৩ শতাব্দী যাবৎ তাতার বিজেতা রুষিয়ায় আধিপত্য করিয়াছিল। আমি অন্যত্র তাতার নারী সম্বন্ধে প্রবন্ধে দেখাইতেছি যে, তাহাদের মত ঘোর পর্দ্দানশীনা জগতে কুত্রাপি নাই। সুতরাং দীর্ঘকাল তাতার শাসনের ফলে রুষিয়া যে তাতারদের আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছে, এখনও তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই।

অধিক দিনের কথা নহে, মাত্র ২ শত বৎসর পূর্ব্বে রুষিয়ার নারী তাতার নারীর মত পর্দ্দার অন্তরালে বাস করিত! পিটার দি গ্রেট প্রথম অবগুণ্ঠন মোচনের আইন প্রণয়ন করেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে রুষিয়ার গৃহস্থের সদর ও অন্দর ছিল। বিবাহের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বালিকারা এইরূপে অন্দরে বন্দিনী হইয়া থাকিত। এখনও রুষিয়ার পল্লীমফঃস্বলে আমাদের দেশের মত ঘটক ও ঘটকী আছে, তাহারা বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া দেয়, কোর্টসিপ দ্বারা বিবাহ রুষিয়ার সহরে সীমাবদ্ধ, কোথাও ক্বচিৎ দুই একটা পূর্ব্বরাগের পর বিবাহের কথা রুষিয়ার গ্রামে শুনা যায়। রুষিয়ার কৃষক কামিনীরা এখনও গৃহের বাহির হইলে মস্তকে অবগুণ্ঠন দিয়া থাকে।

রুষিয়ার কৃষকদিগের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন আমাদেরই মত অচ্ছেদ্য, আইনের দ্বারা বিবাহ-বিচ্ছেদ তাহাদের মধ্যে নাই বলিলেই হয়। যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উভয়ে স্বতন্ত্র থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লয়—স্বামী পুত্রসন্তানদিগকে এবং স্ত্রী কন্যাগুলিকে নিজের হেপাজতে রাখে। নারীর বিবাহকালীন যৌতুক (স্ত্রীধন) তাহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিজস্ব থাকে, মৃত্যুর পর তাহার কন্যা অথবা অন্য কোন নিকট নারী আত্মীয়ার নিজস্ব হয়।

রুষিয়ায় চারিপুরুষের তফাৎ না হইলে সগোত্রে বিবাহ হয় না, ইহাই গ্রীক ধর্ম্মের বিধান। সগোত্রে বিবাহ হইলে প্রায়ই সন্তান-সন্ততি উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়, একথা রুষিয়ানরা মানে।

লিটন বিরাট রুষ রাজ্যের একাংশ। এখানে নারীর চরিত্র সম্বন্ধে আমাদেরই দেশের মত কঠোর সামাজিক নিয়ম প্রতিপালিত হয়। রুষিয়ার অন্যত্র নারীর যত সম্মান এখানে তদপেক্ষা অনেক অধিক। আমাদেরই মত এখানকার রুষিয়ানরা 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' প্রবাদের সার্থকতা স্বীকার করে। তাহারা "যখন গৃহে গৃহিণী থাকে না, তখন রোদন করে।" আবার নারী দুশ্চরিত্রা হইলে এখানে যত কঠোর সামাজিক শাসনের বিধান আছে, অন্যত্র তত নাই। দুশ্চরিত্রা নারীর গৃহ দ্বার প্রতিবেশীদের দ্বারা আলকাতরা দ্বারা লেপিত হয়, উহা নারীর অপমানের চিহ্ন।

রুষিয়ার উচ্চশ্রেণীর নারীরা অতীব উচ্চশিক্ষিতা, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং লোকের মনোমুগ্ধকারিণী,—রুষিয়ায় যাঁহারা পর্য্যটন করিতে গিয়া তাঁহাদের সহিত মিলামিশা করিয়াছেন, তাঁহারাই এই কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রায়ই ৫।৬টী ভাষায় ব্যুৎপন্না হইয়া থাকেন, এজন্য তাঁহাদের মতামত প্রায়ই উদারভাবাপন্ন হয়। এ বিষয়ে তাঁহারা ইংরাজ বা জার্ম্মান নারী অপেক্ষা বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এইটুকু যে, তাঁহারা এত গুণে গুণবতী হইয়াও fast women নহেন তাঁহারা quite womenly, তাঁহাদের নারীসুলভ দয়া কোমলতা লজ্জা-বিনয়-সর্ব্বজন বিদিত। তাঁহারা বড় বড় নাচতামাসায় বা ভোজে যোগ দান করেন বটে, কিন্তু মার্কিণ বা অন্যান্য য়ুরোপীয়ান নারীর মত তাঁহাদের পোষাকের 'বাড়াবাড়ি' নাই অথবা এক কথায় ইংরাজীতে যাহাকে 'Side' বলে তাহা আদৌ নাই। এই বিদুষী গুণবতী রুষিয়ার নারীরা ঘরসংসারে অতীব আসক্তা, আমাদেরই দেশের নারীর মত 'ঘরসংসার' তাঁহাদের অস্থিমজ্জাগত, অথচ তাঁহারা আপনাদিগকে পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করেন। একজন পর্য্যটক রুষিয়ান বিদুষী মহিলাদের সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন: "Russian women of the upper classes do not feel that their interests are separate from those of their men nor do they think their sex inferior and imagine that submissive self-effacement is their highest ornament yet no country in the world has given us more beautiful examples of wifely devotion and self-

sacrifice than Russia. কথাটা খুব লম্বাচৌড়া। যে দেশে সতীদাহ বা জহরব্রত প্রচলিত ছিল, যে দেশে এখনও স্নেহলতা আগুনে পুড়িয়া মরিতে ভয় পায় না, সে দেশের লোক একথা শুনিলে হাসিবে। জগতে রুষিয়ার মত পতিভক্তি দেখা যায় না, একথাটা সীতা সাবিত্রী বা পদ্মিনীর দেশে কেমন বেখাপ্পা লাগে। তবে একথা ঠিক যে রুষিয়ার বিদূষী সম্ভ্রান্ত মহিলারা নানা গুণে ভূষিতা হইয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্মে পশ্চাদপদ নহেন।

যদি ইহা রুষিয়ায় সম্ভব হয়, তবে ভারতে হইবে না কেন? যে দেশে প্রাচীন যুগে সীতা সাবিত্রী শৈব্যা, দময়ন্তীর সঙ্গে খণা গার্গেয়ী মৈত্রী অরুন্ধতীর উদ্ভব হইয়াছিল, সে দেশে নারী কেবল কি পাতিব্রত্য ধর্ম্ম ও সংসার ধর্ম্ম পালন করিলেই যথেষ্ট হইবে? সাবিত্রী ও সীতাও যে উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন, তাহার প্রমাণ পুরাণে আছে, সে প্রমাণ আমি অন্যত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। তবে তাঁহারা পাততাড়ি বগলে করিয়া পাঠশালায় গিয়াছিলেন, এমন প্রমাণ আমরা পাই নাই। ঘরেই সেই শিক্ষার ব্যবস্থা হইত। আত্মীয় স্বজন অথবা গুরু পুরোহিতের মুখে যে উপদেশ তাঁহারা প্রাপ্ত হইতেন তাহাই তাঁহাদের শিক্ষার ভিত্তি ছিল। এখন কালধর্ম্মে উহা লোপ পাইয়াছে। যাত্রা, কথকতা রামায়ণ বা চণ্ডীর গানেও যে লোক শিক্ষা হইত তাহাও ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতু যত্নতঃ—মিথ্যা এ ঋষি উপদেশ প্রদত্ত হয় নাই, একথাটা যেন আমরা অনুক্ষণ স্মরণ রাখি; নতুবা জাতি হিসাবে আমরা যে বহু নিম্নে থাকিয়া যাইতেছি, তাহাতে বিস্ময় প্রকাশের কোন কারণ নাই।

সাধের সাধনা

শ্রীমতী লীলা দেবী।

তোমার সুর আর আমার বাণী
মুক্তি দিল পরস্পরে,
এই তো শুধু জানি;
সুরটী তোমার আমার কথায়
বাঁধন নিল সার্থকতায়,
কথা আমার সুরের শিখায়
বাঁধন ছেড়ে অসীম পানে
বাইল তরী খানি!
আমি যে গো ফুলেরি দল
তুমি যে তার গন্ধ বিমল;
দলের মাঝে সাধ ক'রে চাও বাঁধ্‌তে তুমি ঘর,
দলগুলি চায় সুবাস স্রোতে
বাঁধন খুলে মুক্ত হ'তে,
তাইতো সাধের মুক্তি সাধন ক'রল পরস্পর!
সুরটী তোমার কথার মাঝে
প'ড়ল ধরা ব্যাকুল লাজে'
কথা আমার উদাস সাজে
বৈরাগিণী মানি!'
তোমার সুর আর আমার বাণী।

পথনির্ণয়

(গল্প)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ বি এল।

রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়াছে। স্তিমিত চন্দ্রালোকের শেষরশ্মি বাতায়ন পথে হতভাগিনী শিবাণীর আলুলায়িত কুন্তল জালে পড়িয়া নিতান্ত স্নেহভরে যেন তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছিল। এই দারুণ দুঃখের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া চিন্তার মর্ম্মদাহে হতভাগিনী বিনিদ্র নয়নে সমস্ত রজনী জাগিয়া বাতায়ন পাশে রজনীশেষে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সহসা তাহার দুয়ারের কবাটে ভীতি তাড়িত আকুল করাঘাত পড়িতে লাগিল। ব্যস্ত হইয়া সে দুয়ার খুলিল;—খুলিয়াই দেখে দ্বারে এক অর্দ্ধনগ্ন রক্তাক্ত যুবক! একি সর্ব্বনাশ! শিবাণী বিস্ময়ে চিৎকার করিয়া উঠিতে গেল, কিন্তু সহসা সেই যুবক তাহার পাদু'খানি ধরিয়া বসিয়া পড়িল—একটীও কথা বলিতে পারিল না—অত্যন্ত পরিশ্রমে দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছিল, মূর্চ্ছিত হইয়া তাহারই পদপ্রান্তে পড়িয়া গেল। শিবাণীর হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল—তাহার হৃদয় সমবেদনায় ভরিয়া গেল। সে যে মানুষ। হোক খুনে, হোক বদ্‌মায়েস, হোক অপরাধী, এওত মানুষ, বিপন্ন-আশ্রয় প্রার্থীকে সে আশ্রয় দিবে না? সন্ত্রস্ত হইয়া মূর্চ্ছিত যুবকের দেহ গৃহ মধ্যে টানিয়া আনিয়া সে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরেই বাহিরে চীৎকার উঠিল—ভীতি কম্পিত বক্ষে ত্রস্ত পদে বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল! কিছুক্ষণ এদিক ওদিক চারিদিক খুঁজিয়া পাহারাওয়ালা চলিয়া গেল, সে ধীরে আসিয়া মূর্চ্ছিত যুবকের পার্শ্বে বসিয়া তাহার চেতনা সম্পাদনের চেষ্টা পাইল। ভোরের পাখী ২।১টী করিয়া ডাকিয়া উঠিল। সঙ্গিনীর দল গঙ্গাস্নানে যাইবার পথে শিবাণীকে ডাকিল, শিবাণী বিজড়িত স্বরে উত্তর দিল "না ভাই আমার শরীর ভাল নাই, আজ আমি যা'ব না।"

(২)

আজ বহুদিন পরে আবার সেই অতীত জীবনের ব্যথার পূর্ব্বকাহিনী শিবাণী মনে পড়িল। মনে পড়িল শৈশবের সেই খেলা ধূলা; সেই সরলতার সত্য যুগ, সেই দুঃখিনী মায়ের অনাবিল স্নেহ; সে যেন আজও তাহার চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠিল। কুলীন কন্যা মাতুলালয়ে পালিতা, বাল্য পিতৃহীনা, উপযুক্ত ঘরে ও বরে সেই শৈশবেই বিবাহ হইয়াছিল—এ কথা সে পরে শুনিয়াছে, অতীত স্বপ্নের বিস্মৃত প্রায় স্মৃতির আভাসের মত সে কথাও তাহার একটু একটু মনে পড়িতে লাগিল। তারপর কি কুক্ষণে গ্রামে মড়ক ঢুকিয়া তাহার বংশ নির্ব্বংশ হইয়া গেল। একমাত্র বালিকা কন্যাকে অবলম্বন করিয়া তাহার মাতা অকূল শোকেও জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। তারপর তিনি শিবাণীর শ্বশুর কুলের সন্ধান করিয়াছিলেন। সে কুলেও মড়কে সমস্ত নির্ব্বংশ—কেবল শিবাণীর স্বামী বালক রমানাথ জীবিত ছিলেন। এই প্রবল মড়কের পর পিতামহী বালক রমানাথকে সঙ্গে করিয়া তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন, সে অবধি আর কেহ তাহাদের কোনও সংবাদ রাখে না। কোথায় জামাতার অনুসন্ধান করিবেন? কোনওরূপে তাহাকে লইয়া তাহার মাতা পিতার বাস্তুভিটায়

সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইতেন। বিধাতার মনে তাহাও সহিল না। প্রৌঢ়া একমাত্র কন্যাটিকে রাখিয়া পরলোকের পথে যাত্রা করিলেন, আহা সে কথা মনে হইয়া শিবাণীর হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল, মনে পড়িল মায়ের সেই শেষ আশীর্ব্বাদ—"ভগবান তোমাকে দেখবেন।" কই ভগবান্ ত তাহাকে দেখিলেন না! তখন শিবাণীর বয়স কেবলমাত্র দ্বাদশ বৎসর। প্রতিবেশী রামলোচনের গৃহে সে আশ্রয় পাইয়াছিল। কিন্তু এই রামলোচনের পুত্র রমণীমোহন হইতেই আজ তাহার এই দশা, রমণীমোহন তাহাকে প্রথম জানাইল সে স্বামিহীনা। তারপর ধীরে ধীরে সহানুভূতির বাতাসে তাহাকে ভোগের পথে টানিয়া আনিবার জন্য সে কি ছলনা! মনে পড়িল সেই চূড়ামণি যোগের সময় কলিকাতায় গঙ্গাস্নানে রমণীমোহন তাহার মাতা ও শিবাণীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে।

তারপর কেমন করিয়া পথের মধ্যে কৌশল করিয়া পথ ভুলাইয়া তাহাকে এই জঘন্য পল্লীতে আনিয়া তুলিয়াছিল, কেমন করিয়া নরাধম ভালবাসার প্রলোভন দেখাইয়া বিধবাবিবাহের প্রলোভনে মজাইয়া তাহাকে এই নরকের পথে টানিয়া আনিয়াছে—আর আজ তাহার আকাঙ্ক্ষা পুরিয়াছে বলিয়া তাহাকে অকূলে ভাসাইয়া সে আর চোখের দেখা দিবারও অবকাশ পায় না। সত্য বটে আজ রামলোচন রায় নাই, তাঁহার সমস্ত জমিদারীর কাজ রমণীমোহনকেই দেখিতে হয়, সত্য বটে সে একদিন শিবাণীর বস্ত্র অলঙ্কারের জন্য অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করে নাই, কিন্তু কই এই এক বৎসর ধরিয়া ত' কেবল মাসের খরচা ছাড়া আর কিছু পাঠায় নাই। তাহাও আবার এই দুই মাস বন্ধ। হায়, সরল বিশ্বাসের—ভালবাসার এই পরিণাম! ভালবাসা; কই শিবাণী কি তাহাকে ভালবাসিত? না; ক্ষণিকের মোহে—মুহূর্তের দুর্ব্বলতায়—পাপকে প্রশ্রয় দিয়াছিল মাত্র। রমণীমোহনের উপর আজ তাহার বিজাতীয় ঘৃণা জাগিয়া উঠিয়াছে। সে কোথায় ছিল, আর নরাধম তাহাকে কোথায় নামাইয়াছে। হায়! কেন সে ভুলিল—এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? আর কি সে পথে ফেরা যায় না? সমস্ত জীবন দিয়াও কি ইহার প্রতিকার নাই? শিবাণী কয়দিন ধরিয়া তাহাই ভাবিতেছিল। জীবন আর তাহার নিকট লোভনীয় নহে। আত্মগ্লানিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার চক্ষু বসিয়া গিয়াছে। সমস্ত অলঙ্কার বেশবিন্যাস দূরীভূত করিয়া আজ কয়েকদিন ধরিয়া সে কেবল কখনও ভগবানকে, কখনও মৃতা মাতাকে, কখনও মৃত স্বামীকে কাতর প্রাণে ডাকিয়া ঐকান্তিকভাবে তাঁহাদের করুণা ভিক্ষা করিতেছে। এই তীব্র মর্ম্মদাহে পাপপথ তাহার নিকট অত্যন্ত বিষময়ী বলিয়া বোধ হইতেছে। রাত্রি কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতে ভাবিতে কাটিয়া গিয়াছে—প্রত্যুষেই আজ এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। এই নিরাশ্রয় যুবক অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহারই ঘরে ঢুকিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিল। তাহার কাপড়ে রক্ত, পায়ে রক্ত, হয়ত কাহাকে খুন করিয়া আসিল—কিছুক্ষণ পরেই পাহারাওয়ালাও "খুনে খুনে" বলিয়া গোল করিয়া উঠিল। সত্যইত' এ খুনে, সে কি খুনেকে আশ্রয় দিবে? তাইত, কিন্তু তাহার মত পাপিষ্ঠাও ত ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিতেছে, আর এই খুনে কি তদপেক্ষাও পাপী? হোক্ পাপী, হোক্ খুনে, সে যখন অমন কাতরভাবে প্রায় হতচেতনাবস্থায় তাহার পা ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছে তখন তাহার হৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল। সে গৃহমধ্যে তাহার মূর্চ্ছিত দেহ টানিয়া আনিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। আজ প্রাত্যাহিক গঙ্গাস্নানের অপেক্ষা সে এই নিরাশ্রয়ের সেবাকে গুরুতর পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করিল।

(৩)

অনেক শুশ্রূষার পর ধীরে ধীরে যুবক নয়ন মেলিল, শিবাণী দেখিল তাহার গলায় যজ্ঞসূত্র

আছে—হায় সেওত কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা, কুলীন ব্রাহ্মণের বধূ, তথাপি আজ সে কি হইয়াছে! ভাবিয়া অনেক ইতস্ততঃ করিয়া যুবকের মুখে গঙ্গাজল দিল। ক্রমে শুশ্রূষার পর যুবকের চৈতন্যোদয় হইল, সে উঠিয়া পলাইতে চাহিল, শিবাণী তাহাকে ধরিয়া বসাইল। যুবক প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিল না যে এই ত্রিসংসারে তাহাকে আশ্রয় দিতে পারে এমন কেহ আছে। তাই শূন্য দৃষ্টিতে শিবাণীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। সহানুভূতি ও করুণার ছায়া সে মুখে ফুটিয়াছে দেখিয়া তাহার চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বুক বাহিয়া পড়িতে লাগিল। এমন করুণা, এমন সহানুভূতি সে আশা করে নাই। শিবাণী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে বলিল। তারপর তাহাকে ক্ষুধিত দেখিয়া যথাযোগ্য পরিচর্য্যার বন্দোবস্ত করিয়া বিশ্রামের অবকাশ দিল। দুর্ব্বল শ্রান্ত দেহের ও চিন্তাক্লিষ্ট মনের পক্ষে নিদ্রাই মহৌষধ কিন্তু ভবিষ্যৎ যাহার অন্ধকার তাহার সুনিদ্রা হইবে কেন? যাহা হউক যুবক যখন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইল তখন শিবাণী তাহার নিকটে আসিল। যুবক বলিল, আর সে সেখানে থাকিতে চায় না—সে নরহত্যাকারী, অনর্থক এখানে থাকিয়া তাহার আশ্রয়দাত্রীকে বিপদে ফেলিতে তাহার প্রবৃত্তি নাই। শিবাণী ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছে যে সেই অঞ্চলের একটী গণিকা তাহার উপপতির দ্বারা সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হইয়াছে এবং তাহার সে উপপতি পলায়ন করিয়াছে। সে অনুমানে বুঝিল এই যুবকই ঐ অপরাধে অপরাধী। সে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি এমন কাজ করিলে কেন?" যুবক বলিল "সে অনেক কথা, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া লাভ নাই, তাই বলিব না ভাবিয়াছিলাম, আজ তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ তাহাতে চিরজীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব, তোমাকে বলিলে আমার পাপের বোঝা আর একটু লঘু হইবে।

"বহুদিন পূর্ব্বে আমার প্রথম যৌবনে আমি একাকী কাশী থাকিতাম। সেখানে টোলে পড়িতাম, ত্রিকুলে আমার আপনার বলিতে কেহ ছিল না, কিন্তু কিছু অর্থ ছিল, কাজে কাজেই একটী ঘর লইয়া সেইখানেই একাকী থাকিতাম, সমস্ত দিনের মধ্যে রাত্রিতে ঘরে আসিতাম, দিবসে অধ্যাপকের গৃহেই আহার করিতাম, তাঁহার সাংসারিক কার্য্যের সহায়তা করিতাম ও আমার পড়া লইয়াই থাকিতাম। তখন ব্যাকরণ পরিশেষ করিয়াছি এমন সময়ে অধ্যাপকের সাধ্বী গৃহিণী স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া গঙ্গালাভ করিলেন। আমরা যেন মাতৃহীন হইলাম। প্রৌঢ় অধ্যাপক একটী মাত্র পুত্র লইয়া বিষম বিপদে পড়িলেন; নিজের অর্ব্বাচীনতায় আবার সেই বয়সে একটী চতুর্দ্দশীকে ঘরে আনিলেন। যেইমাত্র তিনি আমাদের অধ্যাপক গৃহে আবির্ভূতা হইলেন অমনি যেন কি এক যাদু-বিদ্যা-বলে আমাদের অমন সরল স্নেহপরায়ণ অধ্যাপক আর এক মানুষ হইয়া গেলেন। পুত্রটীর প্রতি আর তেমন স্নেহ নাই, আমাদের পরেও সর্ব্বদা সন্দেহ,—পাছে আমরা পূর্ণবয়স্ক যুবক তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর কৃপাদৃষ্টিতে পড়ি; সুতরাং আমদের আর সেখানে স্থান হইল না, বিরক্ত হইয়া সমস্ত দিন বাসাতেই থাকিতাম। নিজেই রন্ধন করিয়া খাইতাম, কেবল বিকালে গঙ্গারঘাটে যাইতাম, সেখানে সন্ধ্যাবন্দনা সারিয়া চলিয়া আসিতাম, কখনও সহাধ্যায়িগণের সহিত দেখা হইলে নানাবিধ কথা আলোচনা হাস্য কৌতুকে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিতাম।

"একদিন দ্বিপ্রহরে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছি, তখন বর্ষাকাল, কেদারের ঘাটের প্রবল স্রোতে একটী একাদশ বর্ষীয়া বালিকাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, সে ঘাট অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন, বালিকার বিধবা মাতা, অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া জলে ঝাঁপাইয়া বালিকাটির

বস্ত্র ধরিলেন, কিন্তু কাপড় খসিয়া হাতে থাকিল, বালিকা ডুবিতে ডুবিতে স্রোতের বেগে নীত হইল, তখন আমি যাইয়া বলিকাকে ধরিয়া বহুকষ্টে তাহাকে কুলে আনিল। বিধবা আমাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, বালিকাটির চৈতন্য সম্পাদন করিবার জন্য তাহার মাতা ও আমি তাহাকে ধরিয়া নিকটে আমার বাসায় লইয়া গেলাম। বালিকাটির নাম চঞ্চলা। ব্রাহ্মণ-কন্যা—বাসবিধবা। আর কেহ না থাকায় তাহার বিধবা মাতা তাহাকে লইয়া কাশীবাসিনী হইয়াছেন।

"দরিদ্র বালিকার মাতা ছত্রে রাধুঁনীগিরি করিয়া কোনওরূপে দিনপাত করেন, আমি একাকী থাকি, আমারও কেহ নাই শুনিয়া তিনি অবকাশ-কালে কন্যাসঙ্গে আমাকে দেখিয়া যাইতেন ও কদাচিৎ আমার রন্ধনাদিও করিয়া দিতেন।

"কিন্তু এই সংস্রবই আমার কাল হইল, সংস্কৃত কাব্যের আদিরসাত্মক কবিতা যখন পড়িতাম তখন মন বড় ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইত।

শিবাণী জিজ্ঞাসা করিল "বিবাহ করিলেন না কেন?" যুবক ভ্রূকুটী করিয়া শিবাণীর দিকে চাহিল তারপর বলিল "বিবাহ নাকি খুব শিশুকালেই হইয়াছিল, আমি কেবল শুনিয়াছি—কুলীনের ঘরের বিবাহ কি না! সে কুলীন-কন্যাও নাকি ইহলোকের যন্ত্রনার হাত অনেক দিন এড়াইয়াছিল। আমার মত নরাধমের ঘর যে তাহার করিতে হয় নাই—সে তাহার বহু সৌভাগ্য। আর বিবাহের কথা তখন মনে আসে নাই, তখন কেবল মনের সঙ্গে চাতুরী খেলিতেছি। অনেক বড় বড় বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জলের কথা শুনিয়াছি—ব্রহ্মচর্য্যের অভিমান হইয়াছে—নিজকেও খুব বড় বলিয়া ভাবি, মনে যে আমার নরক তাহা নিজেও তখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

"কিছু দিন পরে চঞ্চলার পীড়া হইল, তখন আমাকেই ঘন ঘন তত্ত্বতাল্লাস লইতে হইত, অনেক সময় বিধবা কেবল আমাকেই তাহার নিকট রাখিয়া যাইতেন। চঞ্চলাও আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিত, অত্যাচার আবদার করিত, এইরূপে স্নেহের বন্ধন আরও দৃঢ় হইল। ক্রমে সে আরোগ্য লাভ করিল।

"চঞ্চলার বয়স তখন চতুর্দ্দশ—সৌন্দর্য্যও কম ছিলনা, বিধবা তাহার দিকে চাহিতেন এবং নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেন, কখনও আমাকে বলিতেন—"বাবা, আমি বহু পাপ করিয়াছি নহিলে আমার এমন হইল কেন?"

"এই সময়ে কলেরা রোগে বিধবা প্রাণত্যাগ করিলেন, মরিবার কালে আমাকেই বলিলেন "বাবা চঞ্চলার আর কেহ নাই, তুমি উহাকে দেখিও।"

"আমি চঞ্চলাকে একটি বর্ষিয়সী বিধবার নিকট রাখিলাম কিন্তু চঞ্চলা প্রায়ই আমার নিকট আসিত, দ্বিপ্রহরে জোর করিয়া আসিয়া আমাকে রাঁধিয়া দিয়া যাইত। এইরূপ যুবকযুবতীর অবাধ মিলনে আমার মন কলুষিত হইল। পরে সে পোড়ারমুখীর নিকট শুনিয়াছি সেও আমাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, "চঞ্চলা তুমি এত বেশী আমার নিকট আসিওনা, লোকে মন্দ বলিবে।" সে বলিল,—"বলুক, আমি লোকের কথা গ্রাহ্য করিনা, মা আমাকে আপনার কাছে রাখিয়া গিয়াছেন—আপনার কাছে না থাকিলে কার কাছে থাকিব?" আমি তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলিতাম, সে নীরবে শুনিত, ভালমন্দ কোনও উত্তর করিত না। ক্রমে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিল, চারিদিকে নিন্দা ছড়াইয়া পড়িল, শাস্ত্র অতল জলে ডুবিল, ধৈর্য্য লজ্জা দূরে গেল—চঞ্চলাই আমার ঘরে আসিল।" শিবাণী বলিল "বিধবাবিবাহও ত' শাস্ত্রসঙ্গত, তাহাকে বিবাহ করিলেন না কেন?"

যুবক বলিল "ভাবিলাম যাহা করিতেছি ইহা পাপ—পাপই করি। পুণ্যের আবরণ দিয়া পাপকে ঢাকিয়া লাভ কি? আর কাশীতে কি বিধবা-বিবাহ চলে? কিছু দিন পরে বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত

সমাজে মুখ দেখান ভার হইল, তাহাকে লইয়া বৃন্দাবনে পলায়ন করিলাম, কিন্তু চঞ্চলা বুঝিল যে তাহার রূপ আছে, যৌবন আছে; আমার মত দরিদ্রের আদরে তাহার অতৃপ্তি আসিল। এই সময়ে আমার বসন্ত হইল, চঞ্চলা সেবা করিত বটে কিন্তু কেমন উদাসীন ভাবে। আমি যে বাঁচিয়া থাকিব এ কথা সে ভাবে নাই, হঠাৎ সে একদিন আমাকে ফেলিয়া এক ধনীবাবুর সহিত বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

"আমি বাঁচিয়া উঠিলাম, টাকাকড়ি তখন ফুরাইয়া গিয়াছে, আবার অর্থের প্রয়োজন, কলিকাতায় আসিলাম, এখানে চাকুরী জুটিল কিন্তু সেই রাক্ষসীর উপর তীব্র প্রতিহিংসায় আমার মন জলিয়া যাইতে লাগিল। প্রায় দুইমাস হইল খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলাম যে পাপিয়সী সোনাগাছিতে পাপ ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। আমি একদিনে সুযোগ পাইয়া তাহার গৃহে ঢুকিলাম, সে আমাকে অপমান করিয়া দরোয়ান দিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিল। এই অপমানের যন্ত্রনায় পাগলের মত হইয়া চাকুরী ছাড়িলাম, সর্ব্বদা সন্ধানে ফিরিতাম—গতকল্য সুযোগ পাইয়া আমার এতদিনের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া শানিত ছুরিকা তাহার বক্ষে বসাইয়াছি। কিন্তু এ কার্য্যে যে শান্তি পাইব ভাবিয়াছিলাম তাহা ত পাইলাম না! ইহাকেই একদিন গঙ্গার স্রোত হইতে বাঁচাইয়াছিলাম, আজ আবার ইহাকেই নিজ হাতে হত্যা করিলাম। এই অজ্ঞান স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়া পাপের মাত্রা বাড়াইলাম, তখন ভয় হইল তাই পলাইয়াছি কিন্তু এখন মনে হইতেছে পলাইয়া ভাল করি নাই; আমি ধরা দিব—যাহার কেহ নাই তাহার পাপময় জীবনে প্রয়োজন ?"

শিবাণী জিজ্ঞাসা করিল "আপনার নাম ত' বলিলেন না ?" যুবক বলিল "আমি অত্যন্ত হতভাগ্য, ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিলাম, শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইলে বৃদ্ধা পিতামহী আমাকে লইয়া কাশীবাসী হইয়াছিলেন—এখন আর কেহই নাই। আমার নাম বলিলে সেই দেবতার কুলের সহিত সম্বন্ধ আসিয়া পড়ে, কিন্তু তোমাকে না বলিয়া পারিব না, তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ—আমার নাম রমানাথ বন্দোপাধ্যায়।"

সহসা শিবাণী মুখ ফিরাইল, তাহার চোখে যেন কি পড়িল, সে তখনই ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

(৪)

অনেক কষ্টে শিবাণী ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছে। এইত তাহার স্বামী—তাহার ইহকালের, পরকালের জন্ম জন্মান্তরের দেবতা, সেত' ইহাকেই মৃত ভাবিয়াছিল—আজ কি দেবতা তাহার প্রতি সদয় হইয়াছেন ? আজ কি তাহার সমস্ত পাপ, সমস্ত দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিয়া পতিতপাবন দেবতা তাহার স্বামীরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন ?

সে কি তাঁহার পায়ে আশ্রয় পাইবে, সে কিছুই চায়না, অনাহারে মরিতে হয় সেও ভাল তবুও তাঁহার পায়ে মাথা রাখিয়া মরিবার সাধ কি তাহার মিটিবে ? তিনি কি এই পতিতার কাহিনী জানিলে ইহাকে তাঁহার পায়ে আশ্রয় দিবেন ? তিনি যদি তাহাকে আশ্রয় দেন তবে সে লোকালয় যদি ত্যাগ করিতে হয় তাহাতেও সম্মত, বনমধ্যে অর্দ্ধাশনে থাকিয়া ও তাঁহার পদসেবা করিয়া তৃপ্ত হইবে ! বোধ হয় তাঁহার পা'দুখানি একবার বুকে ধরিতে পারিলে তাহার সমস্ত মর্ম্মদাহ জুড়াইয়া যাইবে। সে শুইয়া শুইয়া অনেক কাঁদিল, সহসা তাহার মনে পড়িল তাইত, প্রবল মনোবেদনায় ইনি অস্থির আর আমি আমার এই পতিত দেহ লইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইব! হয়ত ইহাতে তাঁহার ব্যাথা সহস্র গুণ বাড়িবে। এই দুঃখের সময় তাঁহার দুঃখ আরও বাড়াইয়া সে কি স্বামীর সেবা করিবে ? এখন থাকুক আগে তাঁহাকে বাঁচাইয়া, তাঁহাকে রক্ষা করিয়া ক্রমে সে তাঁহাকে সমস্ত কথা, তাহার পাপ জীবনের ইতিহাস নিঃশেষে খুলিয়া বলিবে।

কিন্তু—একি, কিসের গণ্ডগোল? শিবাণী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া দেখিল পুলিস তাহার স্বামীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। রমানাথ বলিল "আমি চলিলাম, তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলে -ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন।" দারোগা কনষ্টবলকে বলিলেন "গুতাঁ মারিয়া বাহির কর।" শিবাণী উন্মত্তবৎ রমানাথের পায়ের উপর আছাড় খাইয়া বলিল, "আপনি যান, ভগবান যদি থাকেন তবে আমি আপনার উদ্ধার করিব, আশীর্ব্বাদ করুন—" বলিতে বলিতে সে মূর্চ্ছিতা হইল, দারোগা এবং সমবেত নরনারী শিবাণীর এই আচরণে আশ্চর্য্যান্বিত হইল, ঝি তাহাকে ধরিয়া কোলে লইল, রমানাথও এই অপরিচিতার অদ্ভুত ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইল—কিছুই বুঝিতে পারিল না।

(৫)

দীনবন্ধু দাস কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করেন। প্রভূত পসার, যথেষ্ট টাকা করিয়াছেন, মটর ফিটন কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু পুত্রহীন, একটী মাত্র কন্যা, বড় ঘরে তাহার বিবাহ দিয়াছেন। এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, হিন্দুধর্ম্মের উপর অত্যন্ত বিশ্বাস আসিয়াছে। বিলাতফেরত হইলে কি হয়, কৌলিক গুরু আনিয়া দীক্ষা লইয়াছেন। পূজা-সন্ধ্যা-আহ্নিকেই অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। মক্কেলও কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িতে চায় না। তিনি অসমর্থ দরিদ্রের নিকট হইতে পয়সা না লইয়া তাহাদের মকর্দ্দমা করিতে ইতস্ততঃ করেন না। মকর্দ্দমা হাতে বেশী নেন্‌না এবং যাহা সত্য বলিয়া বুঝেন তাঁহাই হাতে নেন, তাহার জন্য যথাসাধ্য খাটেন, পয়সার দিকে লক্ষ্য রাখেন না। গৃহিনীও বৃদ্ধা, অত্যন্ত নৈষ্ঠিক, হিন্দুধর্ম্মপরায়ণা এবং স্বামীর অনুকূলা। দাসমহাশয়ের দানধ্যান পূজা আহ্নিক ও নিত্যনৈমিত্তিক পূজাপার্ব্বণে তিনি যে বিলাতফেরত তাহা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে কিন্তু নব্য বিলাতফেরতেরা তাঁহার এই নিষ্ঠা দেখিয়া অন্তরালে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেও ইতস্ততঃ করেনা।

শিবাণী সন্ধ্যার পর গাড়ী করিয়া বৃদ্ধা ঝি স্বামীর মাকে সঙ্গে লইয়া দাসমহাশয়ের অন্তঃপুরে যাইয়া তাঁহার গিন্নীর পায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া বলিল—"মা, আপনি সাধ্বী সতী, পাকা চুলে সিন্দুর পরিতেছেন; আমার স্বামী বড় বিপদাপন্ন, আত্মীয় স্বজন কেহ নাই-আজ আপনার তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইবে।" দাস-গিন্নী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া স্বামীকে ডাকিলেন, শিবাণীকে বলিলেন "মা, তুমি নিঃসঙ্কোচে ইঁহাকে সমস্ত বুঝাইয়া বল, কোনও লজ্জা করিও না, আমাকে মা বলিয়াছ, ইঁহাকে লজ্জা কি?" এই বলিয়া দাস গৃহিণী স্বামীকে শিবাণীর কথা বলিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। শিবাণী তখন শুধু স্বামীর কথা নহে, তাহার পতিত জীবনের ইতিহাস, স্বামীর জীবনের ইতিহাস, তাহার বর্ত্তমান অবস্থা, তাহার বর্ত্তমান মনভাব সমস্তই একে একে তাঁহাকে খুলিয়া বলিল। দাসমহাশয় পরম সহানুভূতির সহিত সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন "মা তুমি আমার ধর্ম্ম-কন্যা, আমি মিথ্যা মকর্দ্দমা লইনা, তোমার স্বামী যদি সত্য স্বীকার করেন আমি যথাসাধ্য তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিব। আমাকে তোমার একটী পয়সাও দিতে হইবে না। তোমার ভাল হইবে, তোমার স্বামীকে যদি ভগবানের কৃপায় আমি উদ্ধার করিতে পারি তবে তাহার পদসেবা করিলে তোমার সমস্ত পাপ দূর হইবে। তোমার মকর্দ্দমার সমস্ত খরচ আমি বহন করিব। তোমার স্বামী ফিরিয়া আসিলে তুমি কি করিবে?"

"বাবা, তখন তাঁহাকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিব, তিনি যদি আমাকে পায়ে রাখেন ভাল, না হইলে তাঁহার পায়ে মাথা রাখিয়া আমি মরিব—আমি তাঁহার পত্নীর অধিকার চাহিনা, শুধু দাসী হইতে পারিলেই কৃতার্থ হইব।" দাসমহাশয় বলিলেন "মা, বৃদ্ধের একটী পরামর্শ শোন, স্বামীর সহিত হিন্দুস্ত্রীর সম্বন্ধ চিরকালের, অতএব স্ত্রীর প্রার্থনায় স্বামীর যত কল্যাণ হয় অত আর কিছুতেই হয় না,

তুমি ব্রহ্মচারিণী হইয়া কায়মনোবাক্যে ভগবানকে ডাকিয়া তাঁহার নিকট স্বামীর ও নিজের মঙ্গল চাও, আর বাহিরের চেষ্টার দ্বারা যাহা হয় আমি তাহার ত্রুটী করিব না ; এখন তবে এস, আমি যথাসময়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করিব।" শিবাণী দাসমহাশয় ও দাসগিন্নীকে নমস্কার করিয়া ফিরিয়া আসিল।

সে চীৎপুরের বাসা ছাড়িয়া কালীঘাটে আসিয়া থাকিল। বৃদ্ধা ঝি মাত্র বাসায় থাকিল, স্বপাকে একসন্ধ্যা হবিষ্যান্ন মাত্র আহার ও গঙ্গা স্নান করে এবং প্রাণপণে দিবারাত্রি ভগবানকে ডাকে।

তাহার মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল—দুইমাস পরে শিবাণীকে দেখিলে আর সে শিবাণী বলিয়া চেনা যায় না, তাহার শরীর একটু কৃশ হইল বটে কিন্তু রূপ যেন বাড়িয়া উঠিল, সে রূপের সহিত একটা তেজের আভা যেন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল - যে আভা দেখিলে প্রাণে মাতৃভাবের উদয় হইয়া শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আপনি মাথা নত হইয়া আসে। সেই গৃহস্থবধূর অঙ্গে স্বামিব্রতচারিণী, ব্রহ্মচারিণীর বিমল রূপের আভা প্রকটিত হইল।

রাত্রিতেও তাহার ঘুমাইবার অবসর নাই, একান্ত মনে স্থিরাসনে বসিয়া সে তাহার স্বামীর মূর্ত্তি চিন্তা করে, তাহার মধ্যেই নারায়ণের আবির্ভাব দেখিতে চেষ্টা করে, তখন বড় বড় মুক্তাফল-সদৃশ অশ্রুর ধারা দুটি ডাগর চক্ষু হইতে গঙ্গা-যমুনার ধারার মত বক্ষ বাহিয়া ঝরিয়া পড়ে। এমন সুখ ত' সে জীবনে পায় নাই, এইরূপ করিয়া শিবাণী এই দুঃখের মাঝেও একটা শান্তি পাইতে লাগিল।

(৬)

চঞ্চলা মরিল না। হাঁসপাতালে চিকিৎসার পর সে আরোগ্য লাভ করিল। ব্যারিষ্টার দাসমহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় রমানাথের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তাহার মাত্র একমাস কারাদণ্ড হইল, পাপের এই ফল পাইয়া রমানাথ ক্ষুব্ধ হইল না। সে আদালতের বিচারের সময় হইতেই দাসমহাশয়ের মুখে তাহার জন্য শিবাণীর এই চেষ্টাযত্ন, উদ্যম ও ত্যাগস্বীকারের কথা সবিস্তারে শুনিয়া অন্তরে শিবাণীর প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ হইল। কিন্তু দাসমহাশয় কেবল শিবাণী যে তাহার কে—এই একটী মাত্র কথা তাহাকে বলেন নাই।

শিবাণীও স্বামী সন্দর্শনাশায় এই একমাস উৎফুল্ল হইয়া থাকিল। রমানাথের মুক্তির দিবস দাসমহাশয় নিজে গাড়ী করিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন ; নির্জ্জনে একটী একটী করিয়া শিবাণীর ইতিহাস তাহার নিকট বলিলেন, তাহার আত্মগ্লানি, তাহার বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের কথা তাহাকে বলিয়া বলিলেন "শিবাণীর পতনের চেয়ে তাহার উত্থানই মহত্বপূর্ণ, তাহার এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিলে তাহাকে মানবী বলিয়া বিশ্বাস হয় না ; সে তোমারই আশায় জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এখন তাহাকে গ্রহণ করিবে, না সে আবার তাহার ব্যর্থজীবন লইয়া চিরকাল দুঃখ পাইয়া মরণের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবে ? সমাজ কি করিবে তাহা জানিনা কিন্তু তুমি তাহাকে যতটা জান সমাজ হয়ত ততটা জানিতে চাইবে না। এ অবস্থায় সমাজ লোক ধর্ম্ম সকল ছাড়িয়া তাহাকে লইবার মত বল ও প্রবৃত্তি তোমার আছে ?" রমানাথ বাষ্পগদগদ স্বরে বলিতে লাগিল "আপনি আমার পিতৃতুল্য, আমি অত্যন্ত পাপিষ্ঠ, আমার যদি ত্রাণের পথ থাকে তবে শিবাণীই আমার সে পথ। সে আমার পত্নী, সে আমার সহধর্ম্মিণী, আমি তাহাকে গ্রহণ করিয়া যদি নরকেও যাইতে হয়—তাহাতেও স্বীকৃত।"

দাসমহাশয় ডাকিলেন—"মা শিবাণী, এস, তোমার স্বামীকে প্রণাম কর।" আলুলায়িত কুন্তলা একটী তপস্বিনী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। পরণে তাহার একখানি লালপেড়ে শাড়ী, হাতে তাহার শঙ্খবলয় এবং সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুরের চিহ্ন ; ঈষদুন্মুক্ত অবগুণ্ঠনে সে ধীরে আসিয়া রমানাথের

পদদ্বয়ের উপর মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিল। রমানাথের পা দুখানি তাহার পবিত্র অশ্রুধারায় সিক্ত হইল; রমানাথও আশীর্ব্বাদ করিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইল। দাসমহাশয় ও দাস গিন্নীর চক্ষুও এই পবিত্র মিলন দেখিয়া সজল হইল। উভয়ে দাসমহাশয় ও তাঁহার গিন্নীকে নমস্কার করিল। তাঁহারা বলিলেন "আমাদের আশীর্ব্বাদ করিবার ক্ষমতা নাই, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তোমরা ধর্ম্ম ও সৌভাগ্য লাভ কর।" "শিবাণীকে আমরা নিজের কন্যার মতই দেখি, আজ আমাদের এই সামান্য উপহার তোমরা গ্রহণ কর।"—এই বলিয়া দাসগৃহিণী শিবাণীকে নিজহস্তে স্বর্ণবলয়ে ভূষিত করিলেন।

দাসমহাশয় বলিলেন "বাবা, তুমি ব্রাহ্মণ, কোনও তীর্থস্থানে স্বধর্ম্মপরায়ণ থাকিয়া বর্ণোচিত কর্ত্তব্য অবলম্বন করিয়া শিবাণীর সহিত বাস কর। আর মনে রাখিও যে মাত্র দৈহিক মিলনে স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ পর্য্যবসিত নহে। এ সম্বন্ধ যেমন ইহলোকের তেমনি পরলোকের। অজ্ঞানতাবশতঃ তোমরা যে পাপ করিয়াছ সমস্ত জীবন ধর্ম্মাচরণ করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত কর।"

শিবাণী কেবল মাত্র বলিল—"বাবা, আপনাদের স্নেহ আশীর্ব্বাদ যে সকলের চেয়ে মূল্যবান—এ জ্ঞান যেন আমাদের চিরকাল থাকে।"

এই কয় মাসের অবিরত তপস্যায় হৃদয়ের মধ্যে যাঁহার স্পর্শ লাভ করিয়াছিল আজ সেই সচল বিগ্রহকে লাভ করিয়া শিবাণীর তপস্যা জয়যুক্ত এবং তাহার মাতৃ-আশীর্ব্বাদ সার্থক হইল। সে দেশ ও সমাজ হইতে বহুদূরে নিভৃত তীর্থস্থানে পতিদেবতার পদে আত্মনিবেদন করিয়া সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণীর আসন অধিকার করিয়া ধন্য হইল।

নিবেদন

শ্রীমতী ভক্তিসুধা হার।

আমি ফুলের মতন রূপ শোভা ল'য়ে
তব মনোবনে ফুটিব প্রিয়,
তুমি নিঃশেষ করি' দুইটি নয়নে
সুরভি-সুষমা লুটিয়া নিয়ো।

আমি হৃদয়-পাত্র প্রেম-মধু-রসে
পূর্ণ করিয়া দাঁড়াব যবে
তুমি অধরে অধর পরশি নীরবে
আকুল তিয়াসা জুড়ায়ে লবে।

তুমি বিজন-আঁধারে পথ-হারা হ'লে
ব্যাকুল হতাশে ভাবিবে শুধু,
আমি নয়নে জ্বালায়ে স্নিগ্ধ আলোক
অজানার পথ দেখাব বঁধু।

আমি ধনী হ'য়ে যবে বিলাব আমার
সঞ্চিত যত ধনের রাশি,
তুমি তোমার কাঙাল কুটীরখানিরে
পূর্ণ করিয়া নিয়ো গো আসি!

ওগো তুমি ব্যথাতুর আঘাতে যখনি
পোহাইবে নিশি জাগিয়া,
আমি কল্যাণ-করে সেবিব তোমায়
চুম্বনে ব্যথা ঢাকিয়া।

আমি দিব বঁধু দিব সবটুকু মোর
যা আছে, তোমারে ঢালিয়া;
তুমি শতরূপে মোরে পরাণে পরাণে
রেখো প্রিয় শুধু আঁকিয়া।

ভারতের নারী ও লর্ড লিটন

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, "লাষ্ট ডে অব পম্পে"র অমর লেখক লর্ড লিটনের পৌত্র, ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড লিটনের পুত্র, ইংলণ্ডের আভিজাত্য সম্প্রদায়ের অন্যতম, বাঙ্গালার লাট লর্ড লিটন ঢাকা নগরীতে পুলিশ প্যারেডে বাঙ্গালার — তথা ভারতের নারীগণকে লক্ষ্য করিয়া একটা অতি আপত্তিজনক উক্তি করেন। তিনি বলেন, "এ দেশের নারীরা কোন কোন রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের প্ররোচনায় পুলিশের বিরুদ্ধে ধর্ম্মনাশের অভিযোগ করে।" তাঁহার এই উক্তি যে চরম-নাইয়ের লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা মুসলমানি-রমণীগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল সেইরূপ মনে হয়। তাঁহার এই অসম্ভব উক্তির জন্য সমগ্র ভারতময় তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল। শ্রীমতী নাইডুর সভানেত্রীত্বে কলিকাতা টাউনহলে একটি এবং ময়দানে চার চারিটি বিরাট সভা করিয়া লাটের এই বিসদৃশ উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত লর্ড লিটন তাঁহার উক্তির প্রত্যাহার করেন নাই, ব্যাকরণগত ফাঁকা প্রমাণ দেখাইয়া তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে তিনি ভারতের সমগ্র নারীজাতিকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ উক্তি করেন নাই, পরন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইতর শ্রেণীর নারীকে লক্ষ্য করিয়া। তাঁহার এই কথাও যদি সত্য হয় তবে বলিতে হইবে লর্ড লিটন তাঁহার বংশমর্য্যাদা, পদমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়াছেন। নতুবা একটা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার মুখে কি কখনও এরূপ কথা প্রকাশ পায়? তাঁহার উচিত অনতিবিলম্বে ভারতের নারী সম্প্রদায়ের নিকট ত্রুটি স্বীকার করা এবং নিজের উক্তির প্রত্যাহার করা। তাহাতে তাঁহার সুযশঃ আরও বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। অস্তগমনোন্মুখ কবি রবি এই ব্যাপারে লর্ড লিটনের ছুতিয়ালী করিয়াছেন। তিনি লাটসাহেবকে লিখিয়াছিলেন, তাঁহার বক্তৃতায় নাকি ভারতের নারী সমাজের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার বক্তৃতাটা কবিবর সম্যকরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, অতএব বক্তৃতার ব্যাখ্যাটা একটু সুস্পষ্টরূপে করিয়া দেখান হউক।" হায় রে হায়! নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত, বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ জগতের এত কাব্য-সাহিত্যের মর্ম্ম বুঝেন আর এই সামান্য উক্তিটা তাঁর বোধগম্য হইল না! তা না হইবারই কথা। যে কবির তুলিকায় "চিত্রাঙ্গদা" একজন পণ্যাঙ্গিনীর ন্যায় চিত্রিতা হইয়াছেন, যে কবির কাব্যরাশি পাশ্চাত্যের অবাধ নারী-প্রেমের লহরীমালায় সমাবৃত, হিন্দুনারীর প্রকৃত আদর্শ যিনি জীবনে দেখিবার সুযোগ পান নাই, সেই কবি রবীন্দ্রনাথ যে লর্ড লিটনের মুখে ভারতীয় নারীর অবমাননাসূচক বক্তৃতার ভাব ও ভাষা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে!

আমাদের বিশ্বাস লর্ড লিটন যখন ঢাকা নগরীতে এইরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তখন তিনি আদপেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, এটা ভারতবর্ষ! বোধ হয় প্যারিস সহরের নয়ন-মনলোভা মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষের সমক্ষে উদ্ভাসিত হইতেছিল। তিনি কি জানেন না এটা ভারতবর্ষ, এদেশের রমণী একটা মাত্র বিষয় জানে—সে হইল তাঁহাদের ধর্ম্ম রক্ষা। কত শত রাজপুতের মেয়ে জলন্ত হুতাশনে ঝম্প প্রদান করিয়া "জহর ব্রত" করিয়াছিল, তাহা ত তাঁহারই দেশবাসী কর্ণেল টড লিখিয়া গিয়াছেন! লর্ড লিটন কি সে সংবাদও রাখেন না? ধর্ম্মরক্ষার জন্য এদেশের

মহিলা ধূলিমুষ্টির ন্যায় জীবন পরিত্যাগ করিতে পারে! কোন কোন দেশে এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছে তাহারা গাড়ীতে উঠিয়া সম্ভ্রান্ত পুরুষলোককে একা গাড়ীতে পাইলেই ভয় দেখায়,—যদি তুমি আমাকে এত টাকা না দেও তবে পরবর্ত্তী ষ্টেশনে যাইয়া তোমাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করিব, বলিব তুমি আমার প্রতি অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিয়াছ! তখন সম্ভ্রান্ত পুরুষলোকটি সম্মান-প্রতিপত্তি-সুযশঃ হারাইবার ভয়ে স্ত্রীলোকের প্রার্থনা মত অর্থ দান করিয়া তবে অব্যাহতি লাভ করেন। কিন্তু এই ভারতবর্ষে, গত দেড় শত বৎসরের ইংরেজ-শাসিত ভারতের ইতিহাসে তাঁহারা কি এমন একটা উদাহরণও দেখাইতে পারেন যে কোন ভারতীয় মহিলা এই ভাবে সম্ভ্রান্ত পুরুষলোকের কাছ হইতে টাকা আদায় করিয়াছেন?—কখনই না।

ভারতের লজ্জাশীলা স্ত্রীলোকের স্বভাবই এই যে সে মরিয়া গেলেও নিজের ধর্ম্মহানির কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করে না। অত বড় সুর্পনখা, যে রাম লক্ষ্মণের নিকট আসিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল, সেও লঙ্কায় যাইয়া রাবণের নিকট এমন অভিযোগ করে নাই যে রাম লক্ষ্মণকে সে বিবাহ করিতে চাওয়ায় লক্ষ্মণ তাহার নাসিকা কর্ত্তন করিয়াছেন! বাজারের গুটি কয়েক বারবণিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভারতীয় নারী চরিত্রের প্রতি মন্তব্য প্রকাশ করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। ভারতের সমাজ বারবণিতাকে কখনও আপন সমাজের সীমানায় স্থান দেয় নাই এবং যতদিন সমাজের শৃঙ্খলা ও পবিত্রতা থাকিবে ততদিন ঐ সমস্ত কলুষিতা নারীকে হিন্দু সমাজ কৃমিকীটাদির মত, ঘৃণ্য জীবের মতই দেখিবে। কোন সচ্চরিত্র ভারতবাসীই বারবণিতাকে প্রীতির চক্ষে দেখে না। তাহারা কলুষিত উপায়ে ঘৃণ্য জীবিকা অর্জ্জন করে, যদি জীবিকা অর্জ্জনই তাহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয় তবে ঘরে বসিয়া চরকা কাটিয়াও সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আজকাল এক শ্রেণীর লোক ইহাদিগকে করুণার চক্ষে দেখিতে বলেন। এই সমস্ত ঘৃণ্য বার-নারীদের প্রতি আবার করুণা কিসের? ইহা-দিগকে সহর হইতে দূর দূরান্তরে কোন নির্জ্জন প্রদেশে দূর করিয়া দেওয়াই উচিত। উরগদষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় ইহারা চিরকালই বর্জ্জনীয়। সে যাহা হৌক লর্ড লিটন যদি মুষ্টিমেয় বারনারীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই উক্তি করিয়া থাকেন তবে তাহা তাঁহার হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতারই পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে।

তাঁহার জানা উচিত ছিল, তিনি যখন রাজ-প্রতিনিধি তখন যা-তা একটা কিছু বলিয়া ফেলা তাঁহার পক্ষে সাজে না। ভারতে স্ত্রীলোককে জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী, মহামায়ার অংশ স্বরূপিণী বলিয়া পূজা করে। ভারতের স্বামী পর্য্যন্ত স্ত্রীকে "আর্য্যে" ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় সম্বোধন করে নাই। "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা"—ইহা এ দেশেরই বাণী। কোন কোন স্থলে দুই একটি পশু স্ত্রীকে লাঞ্ছনা, যন্ত্রনা দেয় সত্য, কিন্তু সাধারণ ভাবে স্ত্রীকে ভারতে লক্ষ্মীস্বরূপিণী বলিয়াই মনে করে। "মাতৃবৎ পরদারেষু" ইহা এদেশেরই নীতি শাস্ত্রের বাণী, কাজেই এ দেশের মাতৃজাতিকে লক্ষ্য করিয়া কোন গ্লানিসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিলে সমস্ত দেশ যে তাহার এক বাক্যে প্রতিবাদ করিবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। ভারতের নারী-সমাজ আজ অন্ধকারে, মোহ-নিদ্রা-ঘোরে আচ্ছন্ন, নতুবা লর্ড লিটনের এই মন্তব্যে আজ দলিতা ফণিনীর মত ভারতের নারী-শক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইত। ইংলণ্ডে, আয়র্লণ্ডে যদি আজ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইত তাহলে পার্লামেণ্ট মহাসভা প্রশ্নের উপর প্রশ্নে একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত। কিন্তু এ যে বিষহীন পরাধীন বিজিত ভারতবর্ষ! এ জাতিকে বুটের তলে মাড়াইলেও তাহা চাটিয়া খাইবে, পিক্ত-

পুরুষকে You Indian liars বলিয়া সিনেট হাউসে দাঁড়াইয়া গালাগালি করিলেও এ জাতি অধোবদনে তাহা বেমালুম হজম করিবে! তাইতে বোধ হয় লর্ড লিটন এত বড় একটা অসম্ভব উক্তি করিতে সাহস পাইয়াছিলেন!

এ কোন দেশ? কোন্ দেশের নারীকে তিনি অবমানিত করিয়াছেন?—যে দেশের রাজার মেয়ে স্বামীর সঙ্গে বল্কল পরিয়া বনবাসে যাইত—যে দেশে রাজার রাণী স্বামীর ঋণ শোধার্থে নিজে পরের গৃহে বিক্রীত হইত—যে দেশে মৃত স্বামীর প্রাণের জন্য স্ত্রী কালান্তক যমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত। দেহ বিক্রয় করিয়া জীবিকার্জ্জন যদি এদেশের নারীর আদর্শ হইত তবে আর ভারতের ঘরে ঘরে অনশনক্লিষ্টা, বুভুক্ষিতা, জীর্ণ শীর্ণ কলেবরা হাজার হাজার রমণীকে আমরা দেখিতে পাইতাম না। দৈহিক ভোগ এ দেশের নারী চরিত্রের আদর্শ নহে; তাহা যদি হইত তবে যে দিন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শত শত হিন্দুর প্রতিবাদ সত্বেও দুহিতা কমলার পুনর্বিবাহ দিয়াছিলেন, সেদিন হইতে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিধবাবিবাহের ধুম পড়িয়া যাইত। কিন্তু সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, তিতিক্ষাই যে এ দেশের নারীর আদর্শ। হিন্দুনারী অন্যান্য স্বাধীন দেশের নারীর ন্যায় মুক্ত আকাশের তলে খোলা প্রাণে বেড়াইতে না পারিয়াও সুখী, ভারত-নারীর এ আদর্শ জগতের ইতিহাসে একটা অভিনব বস্তু। এই আদর্শ বজায় আছে বলিয়াই আজও হিন্দুজাতি শত শত বিদেশী জাতির প্রবল আক্রমণের ঝঞ্ঝাবাতকে অগ্রাহ্য করিয়া টিকিয়া আছে। কত শত ভিখারিণী ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া দিন যাপন করে, কিন্তু তথাচ মুহূর্ত্তের জন্য কোন প্রকার পাপ বৃত্তির দ্বারা অন্ন সংস্থানের চিন্তা বা কল্পনা পর্য্যন্ত করে না। এই যে গত বৎসর ডিব্রুগড় চা বাগানের হীরার মামলা হইয়া গেল, সে মামলার কথা কাহার না মনে আছে? কুলী-বালিকা হীরা পর্য্যন্ত শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর কুৎসিত প্রস্তাবে মত্ত সিংহীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল। এদেশের প্রবাদ বাক্যই এই "পুরুষের চোর ও স্ত্রীলোকের অসতী" অপবাদের মত অপবাদ আর ইহ জগতে নাই।

আমরা সত্য সত্যই লর্ড লিটনের উক্তি শুনিয়া বড় ব্যথিত ও দুঃখিত হইয়াছি। এখনও তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলে আমরা জানিব হঠাৎ ভ্রমক্রমে তিনি ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। ভারতের নারী-জাতির সম্মান রাজপুরুষ তাঁহারা, তাঁহারা যদি না রাখিবেন তবে রাখিবে কে? পরাধীন জাতি বলিয়া অবশেষে কি আমাদের মা-ভগ্নীদের প্রতিও তাঁহাদের বিদ্রূপ-বাণ বর্ষিত হইবে? আমরা সব সহিতে পারি, পারি না—মা ভগ্নীর লাঞ্ছনা। ভারতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় স্ত্রীলোকের ইজ্জত রক্ষার জন্যই এদেশে যাহা কিছু যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়াছে। সীতার অবমাননায় অত বড় লঙ্কার সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল—দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় কুরুবংশ সমূলে বিনষ্ট হইল,—দেবকীর লাঞ্ছনায় কংস ধ্বংস হইল। এদেশের প্রাচীন আব-হাওয়া পরিবর্ত্তিত হইলেও এখনও স্ত্রীলোক দেখিলে ভাল লোক মাত্রেই রাস্তা ছাড়িয়া দাঁড়ান। ভারতীয় আদালতের বিচারে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোককে গালাগালি কিংবা স্ত্রীলোকের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিলে তার কঠোর শাস্তি হয়।

কুমারী এলিসকে ভারতের সীমান্ত প্রদেশ হইতে অসভ্য আফ্রিদিরা ধরিয়া লইয়া গেলে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য ইংলণ্ডীয় গভর্ণমেণ্ট হইতে ভারত গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত কি পরিমাণে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা আমরা ভুলি নাই—অমৃতসরে একজন খ্রীষ্টান মহিলার অবমাননার জন্য অত বড় জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইয়াছিল তাহাও আমরা বিস্মৃত হই নাই, এক্ষেত্রে আমরা যদি আমাদের মাতৃজাতিকে অবমাননার হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য দুই একটি প্রতি-বাদ সভা করি তাহা কি দোষের? কোন শ্বেতাঙ্গ

রমণীর প্রতি কেহ অবমাননাসূচক ভাষা প্রয়োগ করিলে লর্ড লিটনের প্রাণে যেরূপ ব্যথা লাগে, আমাদের দেশের মা-ভগ্নীদের প্রতি কেহ কোনরূপ অবমাননাসূচক ভাষার প্রয়োগ করিলে আমাদের প্রাণেও সেইরূপ ব্যথা লাগে। পরাধীন, বিজিত জাতি বলিয়া আমাদের প্রাণের স্পন্দন যে একেবারে লোপ পাইয়াছে তাহা নহে।

আমরা কি চাই? আমরা চাই শাসকজাতির কাছে একটু ভালবাসা, একটু সহানুভূতি, একটু মমত্ববোধ, একটু দয়া, দাক্ষিণ্য ও তিতিক্ষা। তোমাদের মুখের একটু মিষ্ট কথা শুনিলে আমরা আহ্লাদে সোহাগে আটখানা হইয়া যাই। লর্ড রিপণ আমাদিগকে ভালবাসিতেন, দেখ দেখি এখনও প্রত্যেক ভারতসন্তান কত কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার নাম করে। লোককে গালাগালি করিয়া, লোকের উপর অযথা অত্যাচার করিয়া কখনও তাহার হৃদয় অধিকার করা যায় না। আজ যদি ভারতবাসী বুক চিরিয়া দেখাইতে পারিত তবে দেখাইত তাহাদের প্রাণের পরতে পরতে লর্ড লিটনের এই উক্তিতে কত ব্যথার দাগ পড়িয়াছে! লর্ড লিটনই এই ব্যথা দিয়াছেন, আবার তিনি ত্রুটি স্বীকার করিলে এই ব্যথা লোপ হইবে। ভারতবাসী চিরকাল ক্ষমাশীল।

ভারতমহিলা রাজনৈতিকদের প্ররোচনায় পুলিশের নামে মিথ্যা অভিযোগ করে—লর্ড লিটন এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। একথা সর্ব্বৈব তাঁহার স্বকপোলকল্পিত। পুলিশ যদি নিজের কর্ত্তব্য ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ পালন করে তবে কেন ভারতবাসী তাহাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ করিবে? পুলিশ ত এদেশেরই লোক। লর্ড লিটন একবার হারুণ-অল্-রসিদ অথবা লর্ড হার্ডিঞ্জএর মত ছদ্মবেশে বাঙ্গালার জেলায় জেলায় ঘুরিয়া দেখুন ত পুলিশ তাহার কর্ত্তব্য কতটা পালন করিতেছে?

লর্ড লিটন মনে করেন আমরা বুঝি তাঁহাদের । তাহা সত্য নহে। দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা, সুশাসন, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন সকলেই চায়। এইটুকু সব সময় পাই না বলিয়াই ত আমরা অভিযোগ করি। এদেশের পুলিশ আর ইংলণ্ডের পুলিশে যে কত পার্থক্য তাহা কি তিনি জানেন না? সেদেশের পুলিশের সম্বন্ধে মুন্সী ঈশ্বর শরণের একখানি চিঠি গত ৯ই সেপ্টেম্বরের অমৃত-বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠে জানা যায় যে লণ্ডনের পুলিশ স্ত্রীলোক দেখিলে সর্ব্বাগ্রে অতি সম্মানের সহিত তাঁহাকে পার্কে প্রবেশ করিবার পথ করিয়া দেয়। স্ত্রীলোকের প্রতি লণ্ডন-পুলিশের এইরূপ ভদ্র আচরণ দেখিয়া মুন্সী ঈশ্বরশরণ একজন কনষ্টেবলকে বলিয়াছিলেন, আহা, আমি যদি স্ত্রীলোক হইতাম! এখন দেখুন, মুন্সী ঈশ্বর শরণ নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি নহেন, তিনি পর্য্যন্ত ইংরেজ পুলিশের নারী জাতির প্রতি সম্মান দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছেন আর আমাদের দেশে? লর্ড লিটন একবার ছদ্মবেশে মফঃস্বলের কোন একটি থানায় যাইয়া দেখুন তথায় দারোগাবাবু স্ত্রীলোকের প্রতি কিরূপ অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করেন! চরমনাইয়ের নারী লাঞ্ছনার কথা লর্ড লিটন মিথ্যা এবং রাজনৈতিকদের প্ররোচনা মনে করিতে পারেন, কিন্তু এদেশবাসী কখনই তাহা অবিশ্বাস করিবে না। এমন কি লর্ড লিটন নারী-জাতিকে লক্ষ্য করিয়া যে ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার জন্য নিরপেক্ষ সম্ভ্রান্ত ইংরেজ মহিলারা পর্য্যন্ত লজ্জায় মাথা হেট করিয়াছেন। দার্জ্জিলিং হইতে একজন বিদুষী মহিলা "ফরওয়ার্ড" পত্রে যে চিঠি দিয়াছিলেন তাহা পাঠেই জানা যায় ইংরেজ মহিলারা পর্য্যন্ত এই উক্তিতে কতটা লজ্জাবনত হইয়াছেন।

পৃথিবীটা গোলাকার নহে—চতুষ্কোণ, সূর্য্য চন্দ্র একদিন একত্রে আকাশে উদিত হইবে, ভারত মহাসাগরটা হঠাৎ একদিন একটা মহাদ্বীপে পরিণত হইবে, এই সমস্ত অসম্ভব কথা ভারতবাসী বিশ্বাস করিলেও করিতে পারে, কিন্তু পুলিশের নামে

মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিবার জন্য ভারতের নারী আপন সতীত্ব নাশের মিথ্যাকথা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে পারে এ কথা কখনই বিশ্বাস করিবে না। কেন করিবে না? এ দেশের নারী যে স্বতন্ত্র ধাতু-প্রকৃতি দিয়া গঠিত! এ দেশের নারী পরপুরুষের চিন্তা পর্য্যন্ত ধর্ম্ম হানিকর বলিয়া মনে করে। চুরি না করিলেও চুরি করার চিন্তা পর্য্যন্ত এদেশের শাস্ত্রে পাপ বলিয়া কীর্ত্তিত। সাবিত্রীকে যখন তাহার পিতা বলিয়াছিলেন যে, সত্যবানের অল্প আয়ুঃ উহাকে তুমি বিবাহ করিও না, তখন সাবিত্রী মুক্তকণ্ঠে তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, বাবা একবার যখন মনে মনে সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন তাঁহাকে বিবাহ না করিলে যে আমি দ্বিচারিণী হইব? দেখুন দেখি কত বড় মহান্ আদর্শ! বৃন্দাবনের কেলে সোনা, পীতধড়া মোহন চূড়া ছাড়িয়া মথুরার রাজা হইয়া যখন বৃন্দাবনে গোপিনীদের সঙ্গে রাজবেশে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য কেহই ঘরের বাহির হইল না, এমন কি বাতায়নের মধ্য দিয়াও কেহ তাঁহার দিকে তাকাইল না, সকলেই বলিল আমরা কি পরপুরুষ দেখিয়া "দ্বিচারিণী" হইব? আমরা যমুনা-পুলিন বিহারী, মোহন-মুরলীধারী, চন্দন-চর্চ্চিত-ভাল, নীল কলেবর, পীত-বসন বনমালীর ভক্ত, কই ও ত আমাদের সেই কালা নয়, ওকে কেন দেখিব? এত বড় পাতিব্রত্য, সতীত্ব মহিমা ছিল ব্রজাঙ্গনাগণের! যাহারা মূর্খ, দু'পাতা ইংরাজী পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া যাহারা নিজেদিগকে মহা বিদ্বান মনে করে, তাহারাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা-মাধুরীর মধ্যে একটা ব্যক্তিত্বের আরোপ করিয়া উহাকে ব্যাভিচার-দুষ্ট করিয়া তুলে। কিন্তু যাঁহারা "শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়" খানির আধ্যাত্মিক তত্ত্ব গূঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাঁহারা জানেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই লীলামাধুরী একটা সম্পূর্ণ দেহতত্ত্বের ব্যাপার। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ কদম্ববৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া এই দেহ-বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'আয়' 'আয়' বলিয়া সংসার-তাপদগ্ধ, মোহগ্রস্ত জীবকে ডাকিতেছেন, আর তাঁর সেই মোহন বাঁশীর সুরে মুগ্ধ জীব সমস্ত ফেলিয়া তাঁহার দিকে ছুটিতেছে! রাধ্ ধাতুর অর্থ আরাধনা করা, আর কৃষ্ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা। যাহারাই ভগবানকে প্রাণমন দিয়া আরাধনা করে ভগবান তাহাদিগকেই আকর্ষণ করেন। সূক্ষ্মভাবে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব ইহাই। কিন্তু এই সূক্ষ্ম রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বকে স্থূলত্বে পরিণত করিয়া একদল বৈষ্ণব বৈষ্ণবী ইহাকে তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। এমন কি পাশ্চাত্য-শিক্ষার অঞ্জন পরিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে একটা ব্যক্তিত্বের আরোপ করিয়া অতবড় আধ্যাত্মিক ব্যাপারকে লোকসমক্ষে সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। যাহা হোক এই বৃন্দাবন-লীলা দেখিয়া যাঁহারা মনে করেন, ভারতের স্ত্রীলোক বুঝি পরপুরুষের আহ্বানে কুলমান ত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করে না, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ভগবান স্বতন্ত্র একটা উপাদান দিয়া এ দেশের স্ত্রীলোককে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নারায়ণ জ্ঞানে অতিথি সেবার জন্য এদেশের স্ত্রীলোকই আপন হাতে ইন্দীবরতুল্য পুত্রকে কাটিতে পারে, আবার ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষার জন্য এদেশের স্ত্রীলোকই আপন পুত্রকে রাক্ষসের সম্মুখে প্রেরণ করিতে পারে। রাজ্য ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া এদেশেরই দ্রৌপদী স্বামীর সহিত বনবাসে জীবন কাটাইয়া ছিলেন।

পাশ্চাত্যদেশে রূপ-ঐশ্বর্য্য-লাবণ্যের উপর দাম্পত্যপ্রেম নিবদ্ধ বলিয়া তথায় প্রতিদিন স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর ও দারান্তর গ্রহণ করিতেছে! সে জন্য তথায় "ডাইভোর্স কোর্ট" সর্ব্বদাই লোকে লোকারণ্য। কিন্তু এদেশে কত স্ত্রী স্বামী-শাশুড়ীর হাতে নির্য্যাতিতা হইতেছে, কত স্ত্রী কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত স্বামীর সেবা করিতেছে, কত স্ত্রী স্বামীকে ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইতেছে, তবুও মুহূর্ত্তের জন্য পত্যন্তর

গ্রহণের কল্পনা পর্য্যন্ত করে না। হিন্দু স্ত্রী স্বামীর বিয়োগে পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের জন্য পত্যন্তর গ্রহণের কল্পনা করে না। সে জানে পরলোকে আবার স্বামীর সহিত তাহার পুনর্ম্মিলন হইবে— সে আবার তাহার স্বামীর পাদপদ্ম পূজার অধিকার পাইবে! এই পরলোকমুখী আদর্শবাদ হিন্দু সমাজে বিদ্যমান আছে বলিয়াই হিন্দুসমাজে, হিন্দুর অন্তঃপুরে এখনও শান্তি পবিত্রতার পূর্ণ কৌমুদী স্নিগ্ধ কিরণ বিকীরণ করিতেছে, আর পাশ্চাত্য রমণী ও প্রাচ্যের রমণীতে এইখানেই পার্থক্য। একজনের জীবনের লক্ষ্য দৈহিক ভোগ সুখ, আর একজনের জীবনের লক্ষ্য পারলৌকিক শান্তি। হিন্দুর বিবাহ দেহে দেহে বিবাহ নহে, বিবাহের মন্ত্রই হইল, "আজি হইতে তোমার আত্মা আমার হউক, আর আমার আত্মা তোমার হোক।" লর্ড লিটন যদি ভারত নারীর জীবনের আদর্শ টুকু পূর্য্যালোচনা করিতেন তবে আমাদের বিশ্বাস তাঁহার মুখ হইতে কখনও ওরূপ বিসদৃশ উক্তি বাহির হইত না। সামান্য একজন চৌকিদার কনষ্টেবল দারোগা যদি এরূপ উক্তি করিত, তবে কোন দুঃখ ছিল না, কিন্তু তিনি একটা প্রদেশের কর্ণধার, স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি, একটা বড় ঘরের বংশধর, তাঁহার মুখে এ কথা শুনিয়া ভারতের নারীসমাজের মাথা যে একেবারে কাটা গিয়াছে!

একে ত আমরা এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি যে, নারীজাতিকে দুর্ব্বৃত্তদের হাত হইতে রক্ষা করিবার শক্তি সামর্থ্য আমাদের নাই। ট্রেণে নারীর উপর গোরার অত্যাচার, ষ্টেশনে ভিখারিণীর উপর শ্বেতাঙ্গের অত্যাচার, পল্লীতে বৈষ্ণবীর উপর মুসলমান গুণ্ডার অত্যাচার! তারপর যদি দেশের শাসনকর্ত্তারা নারীজাতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন, তবে ত দুর্ব্বৃত্তেরা আরও প্রশ্রয় পাইয়া বসিবে। আজ কাল দেশে পুলিশের যা কিছু কর্ম্মশক্তি তাহা নিয়োজিত হইয়াছে কংগ্রেসকর্ম্মীদের পশ্চাদানুসরণে। কোথায় কোন্ যুবক চরকার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিল, কোথায় কোন্ যুবক "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিল, কোথায় কোন্ যুবক দেশমাতৃকার পূজার বেদীতে স্রক্ চন্দন বিল্বাঞ্জলি দিবার জন্য ঘর সংসার ছাড়িল, পুলিশের কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত হইয়াছে প্রধানতঃ তাহাই দেখিবার জন্য। সেই কারণে এত যে নারী হরণ, এত যে চুরি ডাকাতি তাহার বিশেষরূপ তদন্ত ও প্রতীকার হইতেছে না। তার উপর যদি শাসনকর্ত্তাদের মুখে এমন কথা প্রকাশ পায় যে ভারতের কোন কোন নারী মিথ্যা করিয়া পুলিশের নামে অভিযোগ করে, তবে ত মুস্কিলের কথা। পুলিশ আমাদের শত্রু নহে, আমাদের মিত্র। কেননা তাহারা না থাকিলে নিরাপদে গৃহস্থের নিদ্রা যাওয়াও অসম্ভব। কিন্তু সেই পুলিশ অন্যায় করিলেও কি তাহার প্রতীকার আমরা আশা করিতে পারি না? ভারতের নারী মিথ্যা করিয়া সতীত্ব হানির অভিযোগ করে এ কথা স্মরণ করিতেও যে দেহ শিহরিয়া উঠে! আমরা বলি, লর্ড লিটন এখনও এদেশের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের নারীর প্রতি একটা শ্রদ্ধা ভক্তির ভাব পোষণ করিতে শিখুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন এ দেশের নারী কত উচ্চ—কত গরীয়সী —কত মহীয়সী!

নারী অবস্থাপন্ন ঘরের স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা হইলে তিনি সম্মানার্হা ও ভদ্র পদবাচ্য হইবেন, আর দরিদ্র হইলে তাঁহার প্রতি অসম্মান দেখাইতে হইবে—এ যুক্তি কোন নিরপেক্ষ লোক সমীচিন বলিয়া মনে করে না। নারী ধনী ঘরের হৌন আর পথের ভিখারিণীই হৌন, তিনি সর্ব্বত্র সমানভাবেই সম্মানার্হা। অবস্থার খাতিরে কোন নারী ছিন্নবাস পরিধান করিলেই যে তাঁহাকে—"অভদ্র" "ইতর" "নীচ" আখ্যায় আখ্যায়িত করিতে হইবে ইহা কখনও ভদ্র সমাজের অনুমোদিত নহে। দরিদ্র নারীর হৃদয়েও অপত্যস্নেহ, দেবদ্বিজে ভক্তি, আতিথেয়তা, ভগবিশ্বাস, দয়া, স্নেহ, করুণা আছে, সেও জানে সতীত্বই নারীজাতির একমাত্র অমূল্য সম্পদ। এ

কথা যে একটা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পক্ষে জানা উচিত,ছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

লর্ড লিটনের জন্মস্থান এই ভারতবর্ষ। তিনি যখন এখানে গবর্ণর হইয়া আসিবেন বলিয়া "লণ্ডন টাইম্‌স্‌" সংবাদ দেন, তখন আনন্দে বুকটা দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম—তাঁহার আমলে বঙ্গের নারীজাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ত হইবেই, তাহা ছাড়া নারী চিকিৎসালয়, নারী সমিতি, নারী শিল্পাশ্রম প্রভৃতিরও যথেষ্ট উন্নতি হইবে। কিন্তু যাদের ভাগ্য মন্দ তাদের সব দিকেই মন্দ হয়। এদেশে পদার্পণ করিতে না করিতে কি জানি কি আব্‌হাওয়ার গুণে লাট সাহেবের মনটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যে লর্ড লিটন ইংলণ্ডে নারীজাতির কল্যাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন, যাঁহার ভগ্নী ইংলণ্ডের নারী সমাজের অন্যতম নেত্রী তিনি এদেশে আসিয়া অবধি নারীজাতির উন্নতির জন্য কিছুই ত করিলেন না, অধিকন্তু ভারতের নারীর প্রতি অসংযত ভাষা প্রয়োগ করিয়া এ দেশবাসীর মনে বৃথা একটা তীব্র বেদনার সঞ্চার করিলেন। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন, কিন্তু এখনও বেথুন কলেজে এম্‌-এ পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইল না! দেশে একটা নারী-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা হইল না! কত শত নারী অন্নাভাবে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে রাজকোষ হইতে তাহাদেরও সাহায্যার্থে কিছু দেওয়া হয় না! সরকার হইতে "চরকা" বিতরণ করিলে এই সমস্ত দুস্থা নারীরা সূতা কাটিয়া উদরের অন্ন সংস্থান করিতে পারে, কিন্তু মন্ত্রীদের ৫৩৩৩৲ টাকা করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা চলিতে পারে, ইহাদের বেলায় বঙ্গীয় সরকারের তহবিলে টাকা থাকে না। বিচারপতি স্যার ইউয়ার্ট গ্রীভ্‌স্‌ কলিকাতার পতিতালয় হইতে উদ্ধারিতা বার হাজার বালিকার আশ্রয়স্থান স্থাপনের জন্য জনসাধারণের নিকট অর্থপ্রার্থী হইয়াছেন। লর্ড লিটন হস্তান্তরিত বিভাগ ত নিজের হাতে গ্রহণ করিয়াছেন, এখন উদ্বৃত্ত টাকাগুলি দিয়া এই আশ্রম স্থাপনের সহায়তা করুন না? শুধু আইনের বলে (Immoral traffic law) বালিকাগণকে উদ্ধার করিলে ত চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আশ্রয় স্থানও ত প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আবার এই আশ্রম যাহা স্যার গ্রীভ্‌স্‌ প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছেন, তাহাতে গেলে বালিকাগণকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লওয়া হইবে এই ভয়ে অনেক হিন্দুরই উহাতে আপত্তি আছে।

লর্ড লিটন ৫।৭লক্ষ টাকা সরকারী তহবিল হইতে একটা হিন্দুমতের আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য দান করুন না কেন? হিন্দুরা তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রশংসা করিবে। ব্যয় সঙ্কোচ কমিটি (Inchcape committee) স্পষ্টভাবে ব্যয় সঙ্কোচের জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন, কই এ পর্য্যন্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টে তদনুযায়ী কতটুকু ব্যয় সঙ্কোচ হইয়াছে? মার্কিণ, লণ্ডন প্রভৃতি ধনী দেশের গভর্ণর, ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল প্রভৃতির মাহিনা যাহা নহে, দরিদ্র ভারত-বর্ষে তদপেক্ষা দ্বিগুণ। গভর্ণর বাহাদুর গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় পূর্ব্ববর্ত্তী দুইজন শাসকের অনুসরণ না করিয়া বাঙ্গালার নারী সমাজের মঙ্গলের জন্য কিছু করুন—দেশ তাঁহার প্রশংসায় মুখরিত হইবে। কোন সিভিলিয়ানের কত বেতন বাড়িল তাহা শুনিয়া আমাদের কোন লাভ নাই। দেশে নারী শিক্ষার বিস্তার করিতে, নারীর স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে লর্ড লিটন আজ সমস্ত দিক্‌কার ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া সমস্ত শক্তি নিয়োগ করুন, আর তাঁহার যে অতর্কিত উক্তির জন্য দেশব্যাপী অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করুন; তাহাতে তাঁহার পদমর্য্যাদা (Prestige) বিন্দুমাত্র লাঘব হইবে না বরং দেশ বিদেশে তাঁহার সৎসাহসের প্রশংসা ধ্বনি উত্থিত হইবে।

প্রফুল্ল

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য বি-এ।

"প্রফুল্ল" নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। বাংলার যৌথ পরিবারের একখানি বিয়োগান্ত চিত্র ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। পরিবারের একজন স্বার্থপর ও কূট বুদ্ধি হইলে সোণার সংসার যে অচিরেই ধূলিসাৎ হয়, শান্তি সুখের উৎস যে শীঘ্রই মরুভূমির আকার ধারণ করে, "সাজানো বাগান" শ্মশানে পরিণত হয় প্রফুল্ল নাটকে কবি তাঁহার নিপুণ তুলিকায় তাহা অঙ্কিত করিয়াছেন।

উমাসুন্দরী তিনটী নাবালক শিশুকে লইয়া বিধবা হইলেন। যোগেশ, রমেশ ও সুরেশ—তিন ভাই একমাত্র পৈতৃক বিত্ত দারিদ্র্যেরই উত্তরাধিকার লাভ করিল। কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যোগেশ কলিকাতার কোন সওদাগরী আফিসে কার্য্য করিতে লাগিল, সচ্চরিত্রতা ও অধ্যবসায়ের বলে অবস্থার অভাবনীয় উন্নতি সাধন করিল। মধ্যম ভ্রাতা রমেশ জ্যেষ্ঠের খরচায় পড়াশোনা করিয়া এটর্ণি হইল। কনিষ্ঠ সুরেশ ভাইএর টাকায় স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইতে লাগিল, পড়াশোনায় আদৌ তাহার মনোযোগ ছিলনা। যোগেশ সাধু ও সরল প্রকৃতির লোক ছিল; এই কারণে তাহার পত্নী জ্ঞানদা মৃত্যু কালে বলিয়াছিল, "আমি শিবপূজো করে শিবের মত স্বামী পেয়েছিলেম।" কৃতঘ্ন রমেশ জ্যেষ্ঠের এই গুণাবলীকে দুর্ব্বলতা মনে করিয়া জ্যেষ্ঠকে প্রতারণা পূর্ব্বক স্বার্থ উদ্ধারে সচেষ্ট ছিল। লেখাপড়া না শিখিলেও সুরেশের ভ্রাতৃভাব যথেষ্ট ছিল, তাহার সত্যনিষ্ঠা ছিল, সে পরিবারের মর্য্যাদা রক্ষণে কখনও দ্বিধা বোধ করিত না।

উমাসুন্দরীর বৃন্দাবন যাত্রার উদ্যোগ হইতেছে এমন সময় সবাদ আসিল যোগেশ যে ব্যাঙ্কে আজীবন সঞ্চিত টাকা জমা রাখিয়াছিল তাহা ফেল হইয়া গিয়াছে; এ সংবাদে যোগেশ দিশেহারা হইল, মানসিক যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মদ ধরিল। রমেশের সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হইল। পাওনাদারদিগকে ঠকাইবার ভাণ করিয়া রমেশ যোগেশের অংশ বেনামী করিয়া লইল। সুনাম নষ্ট হইল দেখিয়া যোগেশ উন্মাদ গ্রস্ত হইল। এই সময় সংবাদ আসিল যে যোগেশের ব্যাঙ্ক শুধরাইয়া উঠিয়া জমা টাকা ফিরাইয়া দিতেছে। কিন্তু চতুর রমেশ এই সংবাদ গোপন করিয়া যোগেশের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় তাহার নিকট হইতে সম্পত্তির অংশ লিখিয়া লইল। কাঙ্গালীচরণ নামে একটী প্রতারক জগমণি নাম্নী একটী রাক্ষসী রমণীকে লইয়া ডাক্তারখানা খুলিয়াছিল। সুরেশ কাঙ্গালীচরণের বাড়ীতে যাতায়াত করিত। রমেশ কাঙ্গালীচরণকে হাতে আনিয়া চুরির অভিযোগে সুরেশকে পুলিশে ধরাইয়া দিল। বিচারে সুরেশের জেল হইল। এ সংবাদ পাইয়া উমাসুন্দরী পাগলিনী হইলেন। যোগেশ ও তাহার পত্নী জ্ঞানদা শিশুপুত্র যাদব সহ গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া ভাড়াটিয়া বাড়ীতে একটি আশ্রয় লইল। যোগেশ ঘোর মদ্যপ হইয়া কু-স্থানে কাল কাটাইতে লাগিল। ঘটি বাটি বাঁধা রাখিয়া তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল। ভাড়ার জন্য যে তিনটী টাকা জ্ঞানদার হাতে ছিল তাহাও একদিন যোগেশ লাথি মারিয়া কাড়িয়া লইল। এই সময় জ্ঞানদা পীড়িত হইল। তাহার আসন্নমৃত্যু অবস্থা দেখিয়া বাড়ীওয়ালী

তাহাকে গৃহের বাহির করিয়া দিল। ইতিপূর্ব্বে সংবাদ রটিয়াছিল জেল হইতে বাহির হওয়ার পর সুরেশের মৃত্যু হইয়াছে। নিষ্কণ্টক হইবার জন্য রমেশ মদন নামক জনৈক পাগলের দ্বারা যাদবকে ধরাইয়া আনিয়া গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। অনাহারে আবদ্ধ থাকায় সে পীড়িত হইয়া পড়িল। রমেশের পত্নী প্রফুল্ল ইহা জানিতে পারিয়া যাদবের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল; রমেশের সকল চেষ্টা বিফল হইল; যাদব সারিয়া উঠিতে লাগিল। রমেশ ক্রোধে প্রফুল্লকে মারিয়া ফেলিল। সুরেশ সন্ধান পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল, রমেশ কাঙ্গালীচরণ ও জগমণি সহ পুলিশ ধৃত হইল, যোগেশের "সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল"। প্রফুল্ল নাটকের ইহাই সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা।

জ্ঞানদা ও প্রফুল্ল এই পরিবারের গৃহলক্ষ্মী ছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রফুল্ল চরিত্রেরই আলোচনা করিব।

প্রফুল্ল আদর্শ হিন্দু বধূ। গুরুজনের শুশ্রূষা, বয়স্যাগণের প্রতি সখ্যবৃত্তি, স্বামীকর্ত্তৃক তিরস্কৃতা হইয়াও হাস্যমুখে তাঁহার হিতাচরণ, পতি নিন্দায় কাতরতা, গৃহকর্ম্মে তৎপরতা, পরিজনের প্রতি সদয় ব্যবহার, বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্টি—হিন্দু রমণীর এই আকাঙ্খণীয় গুণসমূহ প্রফুল্ল-চরিত্রে মূর্ত্তিমান হইয়া রহিয়াছে। গুরুজনের মধ্যে প্রফুল্ল পাইয়াছিল শাশুড়ী, ভাসুর, বড় জা ও তাহার স্বামীকে। বিধবা শাশুড়ীর সেবাশুশ্রূষা প্রফুল্ল অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত। তাঁহার জন্য পূজার আয়োজন করা, তাঁহার বাসন পরিষ্কার করা, তাঁহার উনুন ধরান, তাঁহার কাছে থাকা এই গুলি প্রফুল্ল প্রতিদিন অবহিত চিত্তে সম্পাদন করিত। উমাসুন্দরীর বৃন্দাবন যাত্রার প্রস্তাব উঠিলে পর সরলা প্রফুল্ল বলিয়াছিল যে সেও শাশুড়ীর অনুগমন করিবে। সে না গেলে শাশুড়ীর আগুণ ধরাবে কে? বাটনা বাটিবে কে? পূজার আয়োজনই বা কে করিবে? ঘরে আসিয়া ভাসুরের আহারে, বিশ্রামে যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় তাহার প্রতি প্রফুল্ল সতর্ক থাকিত, বড়জা'র মারফতে প্রায়ই ইহার তত্ত্ব লইত। শেষে অদৃষ্ট বিপর্য্যয়ে যোগেশের বিকৃতি ঘটিলেও প্রফুল্ল তাহার কর্ত্তব্যের ত্রুটী করে নাই। আবেগ ও সহানুভূতিতে সে স্থির থাকিতে পারিত না, অহরহঃ জ্ঞানদার কাছে থাকিয়া জা ও ভাসুরের দুঃখোপশমের প্রয়াস পাইত। ফলতঃ জ্ঞানদাকে সে জ্যেষ্ঠের ন্যায় শ্রদ্ধা করিত। সহোদরা ভগিনীর ন্যায় তাহারা যেন অভিন্ন ছিল। সুরেশ যোগেশের জন্য মাদুলী আনিবার প্রস্তাব করিলে প্রফুল্লও রমেশের জন্য একটি মাদুলীর ফরমায়েশ দিল, তাহার বিশ্বাস ছিল—মাদুলীতে রমেশ অমঙ্গলের হাত এড়াইতে পারিবে, তাহার সিঁথির সিন্দুর অক্ষয় হইবে, তাহাদের বিবাহজীবন সুখময় হইবে। সতীলক্ষ্মীর এই আশঙ্কার মূলে হিন্দুনারীর হৃদয়ের অন্তরতম ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্নেহ ও অনুরাগ পাপ-শঙ্কী, সুতরাং প্রফুল্লের মনে ইহা অহরহঃই জাগরূক থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। সুরেশের কারাদণ্ড সংঘটন ব্যাপারে রমেশ সাক্ষ্য আদায়ের জন্য প্রফুল্লকে জেদ করিয়াছিল, প্রফুল্ল স্বামীকে এই অন্যায় প্রস্তাব হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। কুলবধূকে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে দেখিয়া সুরেশ অভিযোগ স্বীকার করিল; ফলে তাহার জেল হইল। এ সংবাদে প্রফুল্ল অত্যন্ত ব্যথিত হইল, কিন্তু শাশুড়ীর নিকট প্রকাশ করিল না। পিশাচী জগমণি এই নিদারুণ সংবাদটি যোগেশের অন্দর মহলে প্রচার করিবার জন্য তাহাদের বাড়ী গেল। প্রফুল্ল ও জ্ঞানদা এই রাক্ষসী মূর্ত্তিকে ডাইনী বলিয়া ঠাহর করিল এবং ইহাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। কিন্তু জগমণির ভাবভঙ্গীতে উমাসুন্দরীর কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা বাড়িয়া উঠিল। জগমণি কথা প্রসঙ্গে সুরেশের কারাদণ্ডের সংবাদ

উমাসুন্দরীর কাণে পৌঁছাইয়া দিল। উমাসুন্দরী পুত্রের শোচনীয় পরিণামে উন্মাদিনী হইলেন; প্রফুল্ল প্রধানরূপে তাঁহার শুশ্রূষায় ব্যাপৃতা রহিল। সে তখনও মাতৃত্ব লাভ করে নাই, জ্ঞানদার একমাত্র পুত্র যাদবই বংশের দুলাল ছিল। প্রফুল্ল যাদবকে পুত্রবৎ স্নেহ করিত। কাকীমার স্নেহে যাদব মাকে যেন ভুলিয়া যাইতেছিল। যাদব কাকীমা ছাড়া কিছু বুঝিত না। এই স্নেহের দুলাল যাদবকে চক্রান্ত করিয়া যেদিন রমেশ গৃহছাড়া করিয়া দিল, প্রফুল্লর মনে সেদিন যে ক্ষোভ ও দুঃখ হইয়াছিল তাহা অননুমেয়। স্বামীকে সৎপথে আনিবার জন্য প্রফুল্লর সকল চেষ্টা ও যত্ন বিফল হইতে লাগিল। পতিদেবতার এই বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ে প্রফুল্ল প্রমাদ গণিতেছিল; কিন্তু ইহার প্রতীকার যেন অবলা নারীর শক্তির বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞানদাকে হাত করিবার জন্য রমেশ প্রফুল্লকে পাল্কি করিয়া পাঠাইয়া দিলে প্রফুল্ল জ্ঞানদা ও যাদবকে দেখিয়া আসিবার সুযোগ পাইল। আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রফুল্ল সমবেদনায় অশ্রুমোচন করিল, নিজের গহনা খুলিয়া দিতে চাহিল, জ্ঞানদা গহনা লইল না, সামান্য কয়েকটি টাকা রাখিয়া প্রফুল্লকে বিদায় দিল। যাদবের যাহাতে কষ্ট না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য জ্ঞানদাকে অনুরোধ করিয়া প্রফুল্ল বিষণ্ণ মনে বিদায় লইল। জ্ঞানদার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিলে রমেশ মাতৃহারা শিশুর বিনাশ সংঘটন করিয়া নিরুপদ্রব হইবারই ইচ্ছা করিল। এজন্য মদন পাগলা নামক জনৈক কাণ্ডজ্ঞানহীনকে নিযুক্ত করা হইল; মদন পাগলা যাদবকে ধরিয়া আনিল। রমেশ জগমণি ও কাঙ্গালীচরণের চক্রান্তে ও সাহায্যে যাদবকে অনাহারে আটক করিয়া রাখিল। মদন পাগলার মুখে যাদবের এই অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া প্রফুল্লর মাতৃহৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। স্বামিকর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইতে হইবে এই কথা নিশ্চিত জানিয়াও প্রফুল্ল মাতৃহারা শিশুটির সেবা করিতে লাগিল। যাদব শত্রুর রাজ্যে আহার মাতৃসমা কাকীমাকে পাইয়া যেন হাতে চাঁদ লাভ করিল,—সে সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল। রমেশ প্রফুল্লর এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিল, প্রফুল্ল ইহা শুনিল না, যাদব তাহার শুশ্রূষায় সারিয়া উঠিতেছে দেখিয়া সে নির্য্যাতন ভ্রূক্ষেপ করিল না। স্বামীর দুর্ম্মতি হইয়াছে দেখিয়া প্রফুল্ল অবশ্য ব্যথিত হইয়াছিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া স্বামীকে তিরস্কারসূচক কিছুই বলিল না; স্বামীর কৃতকার্য্যের প্রতীকারের জন্য নীরবে প্রয়াস পাইয়াছিল মাত্র,—ইহাতে তাহার আড়ম্বরের লেশমাত্র ছিল না। অন্যের মুখের নিন্দাবাদ হইতেও সে দূরে দূরে থাকিত। এত গুণবতী হইয়াও সে স্বামী-সোহাগ হইতে বঞ্চিত ছিল, কিন্তু ভ্রমেও পতির নিন্দাবাদ করে নাই। সে সতীর ন্যায় পতিনিন্দাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিত। মদন পাগলা পারাভস্ম আনিয়া দিলে প্রফুল্ল যাদবকে তাহা খাওয়াইল, যাদব সুস্থ হইয়া উঠিল। ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া রমেশ প্রফুল্লর উপর ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল, তাহার গলা টিপিয়া ধরিল; প্রফুল্ল স্বামীর হস্তেই স্বামীর চরণ দর্শন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। মৃত্যুকালে সে আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়াছিল, "তুমি স্বামী, তোমার নিন্দা ক'রবোনা, জগদীশ্বর করুন যেন আমার মৃত্যুতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। তুমি বড় অভাগা, সংসারে কাউকে কখন আপনার করনি। আমার মৃত্যুকালে প্রার্থনা—জগদীশ্বর তোমায় মার্জ্জনা করুন।" রমেশ কুকর্ম্মের বিপরীত ফল পাইল; সে রাজদ্বারে নিগৃহীত হইল। প্রফুল্লকে কিন্তু স্বামীর এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া যাইতে হয় নাই।

এইরূপ কত শত প্রফুল্ল মরমে মরিয়া অমূল্য জীবনকে অকালে কালের কবলে ডালি দিতেছে,—কত আদর্শ সতী স্বামী-কর্ত্তৃক উপেক্ষিতা

ও নির্য্যাতিতা হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই, অনাদর ও নির্য্যাতনের ফলে বাংলায় অলক্ষ্মীর ছায়া পড়িয়াছে,—বাংলার গৃহশ্রী অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত না রমেশের ন্যায় পুরুষাধম আত্মসংশোধন করিবে, ততদিন বাংলার উন্নতির আশা স্বপ্নেই পর্য্যবসিত থাকিবে; কখনও বাস্তবে পরিণত হইবে না;—সতীলক্ষ্মীর মর্ম্মান্তিক অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নয়।

বঙ্গবধূ

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নমি গৃহ-দেবী বঙ্গের বধূ
আধো ঘোমটায় লজ্জা ভার,
রাঙা শাড়ী আর সিঁদুর বিন্দু
শাঁখের কাঁকন সজ্জা যার।
কোমল পরশে করিয়াছ সারা
গৃহ অলিন্দ শান্তিময়,
শান্ত স্নিগ্ধ মধুর আলাপে
কর সুদা দেহ-শ্রান্তি জয়।

অচলা করেছ লক্ষ্মীরে তুমি
গেহে, মধুময়ী স্বর্ণ-প্রাণ,
অন্নপূর্ণা রূপে ঘরে ঘরে
কর ক্ষুধাতুরে অন্ন দান।
প্রভাতে শুভ্র-বসনা হইয়া
রত হও দেব-অর্চ্চনায়,
শুচিতায় যায় ভরিয়া হৃদয়
তোমার মন্ত্র-মূর্চ্ছনায়।

তোমার কক্ষ-কলস-বারিতে
গেহতল সদা সিক্ত রয়,
স্বরগ হইতে দেবতা-আশীষ
আঙিনায় তব ঝরে সদাই।

তুলসীতলায় জ্বেলেছ যে দীপ
জ্বলেছে তাহাতে লক্ষ ঝাড়,
আলিম্পনের চিত্র-ভূষণে
শোভে অতুলন কক্ষ যার।

অফুরান দয়া, প্রীতির কুসুম
ফুটে আছে তব চিত্তময়,
দুয়ারে আসিয়া ভিখারী তোমার
মুষ্টিভিক্ষা নিত্য পায়।
পিপাসার্ত্তের কাতর কণ্ঠ
তব নীর-ক্ষীরে সিক্ত হয়,
ভারে ভারে স্নেহ করি বিতরণ
হৃদয় এখন রিক্ত নয়।

ভুবন ভুলান' হাসিতে তোমার
করেছ হৃদয় দীপ্তিমান,
সোহাগে সেবায় চির অকাতরে
করেছ সকলে তৃপ্তি দান।
কলরোলে' শিশু তব ক্রোড়দেশে
হেরি যশোদার অঙ্গ সাজ,
দেব-অঙ্গনা সম বিরাজিছ
ওগো স্নেহময়ী বঙ্গে আজ।

প্রত্যাবৃত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(৯)

হেমলতা তখন অসীমের জন্য খাবার তৈয়ারী করিতে বসিয়াছিলেন, দাসী তাঁহার সাহায্য করিতেছিল। এই দাসীটি হেমলতার বড় প্রিয়পাত্রী। দেখিতে সে খুব ভালমানুষ ছিল, যেন সে কিছুই লক্ষ্য করে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সেরূপ ছিল না। সকল দিকেই তাহার লক্ষ্য তীব্র ছিল; খুব ছোট একটা ঘটনাও তাহার চক্ষু এড়াইয়া যাইতে পারিত না। সে যেখানে যাহা দেখিত, শুনিত তাহা তৎক্ষণাৎ আসিয়া হেমলতাকে জানাইত।

সেদিনকার রাত্রিতে যে সেবিকা ছাদে গিয়াছিল তাহা দাসীর চোখ এড়াইতে পারে নাই। দুর্ভাগ্যহেতু সে তখন আহারে বসিয়াছিল বলিয়া তাহাদের কোনও কথা শুনিতে পায় নাই। এক একজন লোক এমনই থাকে বটে, যাহারা পরের কথা গোপনে শুনিয়া হৃদয়ে অতুল আনন্দ অনুভব করে। অনেক ভদ্র মহিলার মধ্যেও এ ব্যাধিটী দেখা যায়; তাঁহারা ইহাকে অত্যন্ত দোষাবহ বলিয়া জানেন, তথাপি ত্যাগ করিতে পারেন না। দাসী যখন তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া উপরে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময় অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে সেবিকা নামিয়া আসিতেছিল। ব্যাপারটা যে বৈকালের মতই একটা কিছু হইয়াছিল, তাহা দাসী বেশ বুঝিল। দেখা বা শোনা যে হইল না ইহার জন্য সে বড় দুঃখীতও হইয়াছিল।

আজ কর্ত্রী ও দাসীতে সেইদিনকার রাত্রির কথাই হইতেছিল। বাহিরে আকাশ তখন ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। আজ অষ্টমী পূজা, সকাল হইতে টিপ্ টিপ্ করিয়া অনবরতই বৃষ্টি পড়িতেছে।

দাসী লুচি কয়খানা গড়িয়া দিয়া মুখটা একটু ভারি করিয়া বলিল "যাই বলুন মা, বৌমার এসে লুচিটা গড়িয়ে দেওয়াও তো উচিত। সেদিন ছোটবাবু অমন করলেন বলে এরকম করে থাকা তাঁর ভারি অন্যায়। সত্যিই তো, পুরুষ ছেলে কাজ করে আসবে যখন তখন যদি তার দিকে একটু না চাওয়া যায়, সে রাগ করবেই তো।"

হেমলতা তপ্ত ঘৃতে একখানা লুচি ছাড়িয়া দিয়া খুন্তি দিয়া সেটা চাপিতে চাপিতে বলিলেন "ও মেয়ের কথাই আলাদা। সাধে আর আমি দেখতে পারি নে ওকে? শ্বশুরের আদর পেয়ে মাটীতে পা আর পড়ে না! দেখেছিস ঝি, আমার সঙ্গে পর্য্যন্ত আর ভাল করে কথা বলে না সেদিন থেকে। কাছে আর আসা হয় না, নিজের ঘরটীতে বসে পেঁচার মত কি ভাবছে কেবল ওই জানে।"

হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ শুনিয়া দাসী মুখ ফিরাইয়া দেখিল সেবিকা। অপ্রস্তুত ভাবে সে বলিয়া উঠিল "এই যে, বউমার নাম করতে করতেই বউমা এসেছেন। অনেককাল বাঁচবেন। আহা,

তাই বাঁচুন, পাকা চুলে সিঁদুর পরুন, দশটা লোকে নাম করুক।"

সেবিকা তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। সে যেন কি বলিবে ভাবিয়া আসিয়াছে এমনি মুখখানা করিয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।

দাসী বলিল "ও দেয়ালে ঠেস দিও না বউমা। দেখছ না কালি যে কি হয়ে আছে, ওই সব কালি তোমার কাপড়ে গায়ে লেগে যাবেখন; এই পিঁড়িখানায় বস।"

সেবিকা নড়িল না।

হেমলতা আপন মনে আরও বেশী করিয়া তাহাকে দেখাইবার জন্যই লুচি খুব ফুলাইয়া ভাজিয়া তুলিতে লাগিলেন। তাহার পর খানকতক কচুরীও ভাজা হইয়া গেল। সেবিকা শূন্য নয়নে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল তাহার কাজ কে করিতেছে। এমনই করিয়া সকল কাজই তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িতেছে। শুধু শূন্যতা লইয়া সে বাঁচিয়া থাকে কি করিয়া?

শুধু ডিমের ডালনাটা তখনও বাকী ছিল। হেমলতা এতক্ষণে মুখ তুলিবার অবকাশ পাইলেন, কথাও এতক্ষণে তাঁহার মুখে ফুটিল। সেবিকার পানে চাহিয়া বলিলেন "কোনও কথা আছে নাকি?"

সেবিকা মাথা নাড়িয়া জানাইল "আছে।"

হেমলতা অন্তরে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন "কথা যা বলবার থাকে বলে ফেল না কেন? আমার এখনো ঢের কাজ আছে। ডালনাটা তৈরী করে অসীমকে আর ওঁকে খাওয়াতে হবে, চা করতে হবে।"

সেবিকা বলিল "তবে এখন থাক, অন্য সময় ব'লবখন।"

হেমলতার কৌতূহল হইয়াছিল, তথাপি আত্ম-মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য জোর করিয়া বলিলেন "তাই বোলো, এখন আমার মোটেই সময় নেই। বামুন ঠাকরুণও ঠিক এমনি সময়ে জ্বর করে বসল। পারাও যায় না বাপু এত খাটুনী খাটতে। অন্য কেউ হলে শর্ম্মা কি উঠতেন? নেহাৎ কেবল স্বামী আর ছেলে, তাই এসেছি। মরে মরেও এ কাজ আগে করে দেওয়া চাই।"

কথা শেষ করিয়া তিনি কড়া চড়াইয়া খানিকটা তৈল ঢালিয়া দিলেন।

তাঁহার এ অপূর্ব্ব পতিভক্তি ও পুত্রস্নেহ সেবিকাকে অন্যভাবে স্পর্শ করিল। তিনি যথার্থই তাহাকে জ্বালাইবার জন্য এ কথা বলিয়াছিলেন। সেবিকা যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল, এ কথা গুলি শুনিয়া আর গেল না, আবার দাঁড়াইল।

ডালনাটা চড়াইয়া দিয়া হেমলতা দাসীকে কি বলিবার জন্য ফিরিতেই সেবিকাকে দেখিতে পাইলেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তিনি বলিলেন "যা কথা বলবার আছে বল না কেন বাপু? এখনি আবার ওরা খেতে আসবে।"

সেবিকা মৃদুস্বরে বলিল "আমি এখানে থাকব না, তাই বলতে এসেছি।"

হেমলতা বলিলেন "এখানে থাকবে না, যাবে কোথায়? বাপ তো নেই, এক তো বিধবা মা, সেই থাকে ভাইয়ের বাড়ী। কাকা আছে সৈদাবাদে, সেও তেমনি লোক। বার শ' জন্মে ভাইঝির খোঁজ নেয় না এমনি তো গুণের কাকা! মদ খাচ্ছে আর যা মাইনে পাচ্ছে উড়াচ্ছে! থাকবে কোথায়, ভার নেবে কে তোমার?"

সেবিকা চুপ করিয়া রহিল, খানিক পরে মুখ তুলিয়া বলিল সে আমি ঠিক করেছি।"

মুখখানা খুব গম্ভীর করিয়া হেমলতা বলিলেন "ঠিক করে থাক ভালই। সে জন্যে আর আমাকে বলতে আসা কেন তবে? এখন নিজেরা লায়েক হয়েছ, আমাদের মতের কিছু তো দরকার দেখি নে। যা খুসি তোমার কর গে যাও।"

সেবিকা বলিল "আমি শুধু সে কথা বলতে আসি নি।"

হেমলতা বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তবে আবার কি বলবে?"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সেবিকা বলিল "আপনার ছেলের বিয়ের কথা বলতে এসেছি।"

হেমলতা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন "কার?"

সেবিকা বলিল "আপনার ছেলের।"

হেমলতা বলিলেন "অসীমের?"

সেবিকা বলিল "হ্যাঁ।"

হেমলতা তাহার পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিলেন; কিছুক্ষণ পরে বলিলেন "তুমি বললেই সে যে বিয়ে করবে এমন কোনও মানে নেই।"

সেবিকা বলিল "মানে যথেষ্ট আছে মা। তিনি রাজি হয়েছেন, পাত্রী ঠিকই রয়েছে। আপনি এখন যদি একটু চেষ্টা করেন এই অঘ্রাণ মাসেই তাহলে বিয়েটা হয়ে যায়।"

হেমলতা বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না; তাহার পর বলিলেন "সত্যি কথা বলছ, না ঠাট্টা করছ?"

সেবিকা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "আপনি মা, আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করতে পারি আমি? আপনি আপনার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেই তো সব কথা জানতে পারবেন মা। আমার কথা যদি বলতে চান আমি সম্পূর্ণ মত দিচ্ছি এতে। আপনি সব ঠিক করুন।"

হেমলতা মুখ খানা ভার করিয়া বলিলেন "তোমাদের কথা তোমরাই জানো বাছা। আমায় বলছ বলতে অসীমকে,—বেশ বলব, তাতে আর কি?"

সেবিকা চলিয়া গেল।

অসীম বাহিরের গৃহের বারাণ্ডা হইতে দাসীকে ডাকিয়া বলিল "চা হয়েছে ঝি? যদি হয়ে থাকে বাবাকে এখানে দিয়ে যাও, আমি ওখানে গিয়ে খেয়ে আসছি।"

হেমলতা অসীমকে ডাকিয়া বলিলেন "একটা কথা শুনে যাও অসীম। ঝি চা নিয়ে যাচ্ছে, লুচি তরকারী গুলো নিয়ে যাবে কে তাই ভাবছি।"

অসীম ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে হাসিয়া বলিল "অত বাছবিচার করতে গেলে চলে না মা। বাজারের তৈরী জিনিষ গুলো, হোটেলের খাবার যারা খেতে পারে তারা সকলের হাতেই খায়। আজকালকার দিনে জাতের বিচার করা চলবে না। দুদিন বাদে হয় তো এমন সময় আসবে যেদিন হিন্দু মুসলমান একই লাইনে বসে খাবে। ঝি তো জাতে কৈবর্ত্ত, ওতো তবু পদে আছে।"

হেমলতা বলিলেন "হ্যাঁ, তোমার যেমন কথা। হিন্দু মুসলমান এরা আবার এক লাইনে খাবে! তার চেয়ে বলনা কেন সবই মুসলমান হবে?"

অসীম বলিল "না মা, মুসলমান হবে কেন? যদি আমরা মানুষ হতে চাই তবে জাতির পার্থক্য, জাতির অহঙ্কার আমাদের বিসর্জ্জন দিতেই হবে। ভারতের আর সে দিন নেই মা। বাড়ীর মধ্যে বসে আছ, বাইরের কথা কিছু জানতে পারছ না। বাইরে এদিকে খুব গণ্ডগোল চলছে। ভারতের আকাশ এতদিন অন্ধকার হয়ে ছিল, আলো কাকে বলে তা কেউ জানতে পারিনি। এবার একটু আলো ভেসে এসেছে। আমরা এখন সব বাধা বিপদ ঠেলে সেই আলোর রাজ্যটা লুট করতে যাব। যাদের ঘৃণা করে এতদিন দূরে রেখেছি আজ আমরা দেখছি তারা ঘৃণার পাত্র নয়, তারাও আমাদের ভাই। তোমাদেরও এমন করে ঘরে বসে থাকা চলবে না মা।"

হেমলতা সশঙ্কে বলিলেন "আমাদের আবার কি করতে হবে; তোমরা ফৌজ হয়ে যুদ্ধ করতে যাবে, আমরা হাতিয়ার হয়ে যাব নাকি?"

অসীম তাঁহার ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল "তোমাদেরও এবার বেরুতে হবে যে। আমরা শুধু বাড়ীর মধ্যে তোমাদের পাব, যেখানে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র সেখানে পাব না, তা হবে না। সেখানেই তোমাদের প্রকৃত পরীক্ষা হবে। দেখব সেখানে তোমরা আমাদের ঠিক চালাতে পার কিনা। এতে তোমাদেরও ভাল হবে, সমস্ত জগৎটাকে চিনতে পারবে, সব কথা জানতে পারবে।"

হেমলতা মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন "দরকার নেই বাবা, এই আমার ভাল। বেশ থাকি আমরা এই বাড়ীর মধ্যে, তোমরা ওঠো, জাত বিচার না মান কোনও ক্ষতি নেই, আমাদের সংসার নিয়ে আমরা এর মধ্যে থাকি। এখন খাবারগুলো যে জুড়িয়ে গেল তার উপায় কি করি? ঝি না হয় ডেকে আনুক না এখানে।"

অসীম বলিল "না না, বুড়োমানুষ আবার এই বৃষ্টিতে ভিজবেন কেন? দাও না তুমি ঝির হাতে, ও নিয়ে যাক সব।"

হেমলতা তবু বলিতে গেলেন "তরকারী।"

অসীম বলিয়া উঠিল "আঃ, কি যে ওই সংস্কারগুলো তোমাদের মোটে আমি বুঝতে পারিনে। দাও বলছি ওর হাতে। ভারী তো জাত তার আবার অভিমান। তোমাদের জন্যেই যে আমাদের পতন, এ কথা ঠিক। কেবল কুসংস্কার ভিন্ন তোমাদের আর কিছু যদি থাকে! হাজার লেখাপড়া শেখ, তবু ওগুলো ছাড়তে পারনা কেন?"

অনিচ্ছার সহিত হেমলতা দাসীর পানে চাহিয়া বলিলেন "তবে তুই-ই নিয়ে যা।"

সে আপত্তির কথা উত্থাপন করিতে না করিতে অসীম তাহাকে একটা তাড়া দিয়া উঠিল। ভয়ে সে আর কথা কহিতে পারিল না, সবগুলি লইয়া চলিয়া গেল।

হেমলতা অসীমের সম্মুখে চা ও খাবার দিয়া বলিলেন "সে সব যাকগে চুলোয়, আমি এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি তোমায়, কথাটা কি সত্যি?"

অসীম এক নিশ্বাসে চায়ের কাপ খালি করিয়া ফেলিয়া লুচি ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বলিল "কি?"

হেমলতা বলিলেন "তুমি নাকি আবার বিয়ে করতে চাও?"

অসীমের মুখখানা সাদা হইয়া গেল। একটা ঢোক গিলিয়া সে বলিল "কে বললে?"

হেমলতা বলিলেন "শুনতে পেলুম।"

অসীম ঠিক জানিয়া লইল সেবিকা বলিয়া গিয়াছে। উঃ এতদূর! সে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিবার জন্য এতদূর ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে!

কোনও উত্তর না দিয়া সে লুচি মুখে দিয়া চিবাইতে লাগিল, মনটা অত্যন্ত তিক্ত হইয়া গেল বলিয়া কোন খাবারই ভাল লাগিল না।

আধ খাওয়া করিয়া সে উঠিতেছে দেখিয়া হেমলতা বলিলেন "ওকি, খাবার সব পড়ে রইল যে?"

ম্লান হাসি হাসিয়া অসীম বলিল "চা খেয়ে আজ পেট ভরেছে। দেখ নতুন মা, তোমার কথাটার উত্তর দিতে ভুলে গেছি, সত্যিই আমি বিয়ে করব। অগ্রাণ মাসের একটা দিন দেখে রেখ, দরকার হয় আমিও দেখতে পারি। আমি পুরুষ, আমার সমাজের সামনে আবার বিয়ে করবার অধিকার আছে। সমাজ এতে 'না' বলতে পারবে না।"

কথাটা শেষ করিয়াই সে তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল। হেমলতা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

খানিক পরে দাসী বাসন আনিয়া উঠানে ফেলিয়া রন্ধন গৃহে আসিল। হেমলতাকে তদবস্থায় দেখিয়া সে বলিল "কি হয়েছে মা?"

হেমলতা নিজের চিন্তা লুকাইয়া বলিলেন "না, কিছু নয়।"

দাসী বলিল "বউমার কথা বলেছিলেন?"

হেমলতা বলিলেন "বলেছিলুম, দেখছি অসীম বিয়েতে রাজি। এতে আমি খুসিই হয়েছি। কিন্তু তবু যে কেন এক একবার বুকের মধ্যে একটা অজানা ব্যথা বেজে উঠছে জানি নে।"

(ক্রমশঃ)

নারী-নির্য্যাতন

ডাক্তার আর সেনগুপ্ত এম্-ডি, এফ-আর এইচ-এস, এম্-আর-এস (লণ্ডন)।

সংবাদপত্রে হিন্দুযুবতী-হরণের ঘটনাবলী উপর্য্যুপরি পাঠ করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতেছি। আমরা পল্লীগ্রামকে সর্ব্ববিষয়ে শান্তিপ্রদ বলিয়া মনে করিতাম। মহাত্মা গান্ধীর মত:—'পল্লীগ্রামের সুখসাচ্ছন্দ্যের উপর দেশের সুখসাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে।' বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমান মিলনের দিনে পল্লীগ্রামের ঐরূপ বিভৎস ব্যাপার কতদূর ঘৃণিত ও লজ্জাকর তাহা সহজেই অনুমেয়। এই ব্যাপারে আমাদের দেশের নেতাদিগের কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না কেন? তাঁহারা কি ইহাকে দেশের কাজের মধ্যে মনে করেন না? আমাদের মাতা ভগ্নী প্রভৃতির রক্ষাকার্য্য কি দেশের কাজের অন্তর্গত নহে? আশা করি তাঁহারা শীঘ্রই এবিষয়ে মনোযোগী হইয়া প্রকৃত দেশসেবকের পরিচয় দিবেন এবং নারী-নিগ্রহের যাবতীয় ব্যাপারের প্রতিকার-কল্পে যথাযথ চেষ্টা ও সাহায্য করিয়া মাতা ভগ্নী প্রভৃতির ইজ্জৎ সম্মান রক্ষা করিবেন। বলা বাহুল্য যে শুধু দুর্ব্বৃত্তদিগের কবল হইতে নিগৃহিতা নারীর উদ্ধার সাধন এবং দুর্ব্বৃত্তদিগের শাসনদণ্ড দমনের প্রতিবিধান করিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না, যাহাতে সরলা, সচ্চরিত্রা, নিপীড়িতা নারীকে পুনরায় সমাজে গ্রহণ করা হয় তাহার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদিগের দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত আমরা আমাদিগের মাতা ভগ্নী প্রভৃতিকে রক্ষা করিতে পারিতেছি না বলিয়া কোথায় দুঃখিত ও লজ্জিত হইব এবং তাহাদিগকে দুর্ব্বৃত্তদিগের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া হারানিধি লাভ করিয়া কোথায় আনন্দে অধীর হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিব, তা' না করিয়া আমাদিগের অপরাধে তাহাদিগকেই অপরাধী করিতেছি,—আমাদিগের অক্ষমতার জন্যে তাহারা নির্য্যাতিতা ও লাঞ্ছিতা হইয়া সমাজ পরিত্যক্ত বা অস্পৃশ্যা হইতেছে। ইহা হইতে ঘৃণা, লজ্জা ও দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমার মতে যদি সমাজচ্যুত হইতে হয়, আমাদিগেরই হওয়া উচিত কারণ আমরা পাষণ্ড দুর্ব্বৃত্তদিগের হাত হইতে আমাদিগের মাতা ভগ্নীকে রক্ষা করিতে পারিতেছি না। তাহারা আমাদিগের সম্মুখ হইতে আমাদিগের মাতা ভগ্নী প্রভৃতিকে ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে সুতরাং এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত, এই দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতার শাস্তি আমাদিগেরই ভোগ করা উচিত। সচ্চরিত্রা, নিপীড়িতা নারীকে পুনরায় সমাজে স্থান দিলে এক পক্ষে যেমন সত্য, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়, অপর পক্ষে তেমনই পাষণ্ডদিগের ভবিষ্যৎ অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে সুরক্ষিত রাখা হয়; কারণ নির্য্যাতিতা নারীদিগকে সমাজে স্থান না দিলে তাহারা অনন্যোপায় হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অসৎপথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে এমন কি তাহারা যে দুর্ব্বৃত্তদিগের হাতে লাঞ্ছিতা হইয়াছে আমাদিগের ঘৃণা ও অবহেলার দোষে পুনরায় তাহারা সেই পাষণ্ডদিগেরই করতলগত হইবে; সুতরাং ইহা অপেক্ষা দুঃখের, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের এবং ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় জগতে আর কি আছে? যদি আমাদিগের দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতার জন্য কঠোর শাস্তি তাহাদিগকে ভোগ করিতেই হয়,—যদি তাহাদিগকে সরল, নির্দ্দোষ ও সচ্চরিত্রা জানিয়াও ত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের উদ্ধার সাধনের প্রভূত চেষ্টার প্রয়োজন কি? যদি তাহাদিগকে পতিতা ও সমাজচ্যুতা হইতেই হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে পাষণ্ডদিগের হাতেই লাঞ্ছিতা হইতে দাও, তাহারা মরুক, তাহারা আমাদিগের দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতার কঠোর শাস্তি ভোগ করুক।—বৃথা মায়াকান্না করিয়া শত্রু হাসাইয়া, মিত্র কাঁদাইয়া নির্য্যাতিতা ও লাঞ্ছিতা নারীকে উদ্ধার করিয়া পুনরায় পাষণ্ডদিগের কবলে ফেলিয়া দিয়া তাহাদিগের দ্বিগুণ অভিসম্পাত লইবার প্রয়োজন কি আছে?

বিদুলা

শ্রীমতী সুধাহাসিনী রায়।

বিদুলা একজন ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূতা, তেজঃস্বিনী, ক্ষত্রধর্ম্মনিরতা এবং বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞা রমণী ছিলেন।

এই তেজঃস্বিনী রমণী স্বীয় ভোগবিলাসী পুত্র সঞ্জয়কে নানাপ্রকার কঠোর বাক্যে উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধে পাঠাইয়া মাতৃত্বের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি একদিন পুত্র সঞ্জয়কে শত্রুহস্তে পরাজিত এবং শায়িত দেখিয়া কহিলেন "কাপুরুষ, গাত্রোত্থান কর, পরাজিত হইয়া শত্রুগণের হর্ষ ও মিত্রগণের শোকবর্দ্ধন পূর্ব্বক শয়নে থাকিও না। ক্ষু নদী অল্প জলে পরিপূর্ণ হয়, মুষিকের অঞ্জলি অল্প দ্রব্যে পূর্ণ হয় এবং কাপুরুষ অল্পমাত্র লাভেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। হে অধম! কি নিমিত্ত বজ্রাহত মৃতের ন্যায় শয়ান রহিয়াছ? গাত্রোত্থান কর; শত্রু হস্তে পরাজিত হইয়া নিদ্রিত হইও না। তুমি অস্তগত না হইয়া স্বকর্ম্ম দ্বারা বিখ্যাত হও; তিন্দুকাষ্ঠের অলাতের ন্যায় মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রজ্বলিত হও, তুষাগ্নির ন্যায় চিরকাল ধূমায়িত হইও না; চিরকাল ধূমায়িত হওয়া অপেক্ষা ক্ষণকাল প্রজ্বলিত হওয়া শ্রেয়ঃ। হে পুত্র! স্বীয় প্রভাব উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হও, নচেৎ প্রাণত্যাগ কর; ধর্ম্ম-পরিত্যক্ত হইয়া জীবিত থাকিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। হে ক্লীব! তোমার কীর্ত্তিসকল বিলুপ্ত হইয়াছে, ভোগ-মূল রাজ্যধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তবে আর কি নিমিত্ত বৃথা জীবন ধারণ করিতেছ? বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনার পতনসময়েও শত্রুর শির গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত নিপতিত হয়; ছিন্নমূল হইলেও কদাপি ভগ্নোদ্যম হয় না। এই কুল তোমার দোষেই নিমগ্ন-প্রায় হইয়াছে, অতএব তুমি ইহার উদ্ধার কর।

"যে ব্যক্তি অধ্যয়ন, তপস্যা, বিক্রম প্রভৃতি দ্বারা অন্যকে পরাভব করিতে সমর্থ হয়, সেই যথার্থ পুরুষ। হে পুত্র! মূর্খের ন্যায়, কাপুরুষের ন্যায়, দুঃখজনক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা তোমার কদাপি বিধেয় নহে; শত্রুগণ যে ব্যক্তিকে তাচ্ছিল্য করে এবং যে ব্যক্তি হীনবীর্য্য ও নীচাশয়, বন্ধুগণ তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া কখনই সুখী হয় না।"

বিদুলানন্দন সঞ্জয় জননীর বাক্যে উত্তেজিত হইয়া সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় তাঁহার বাসনানুরূপ সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

পাণ্ডব-জননী কুন্তী বিদুলার এই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে নষ্টরাজ্য উদ্ধার সাধনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

বাগ্দেবীর প্রতি

শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর।

আশৈশব জননী গো পূজিনু শ্রীপদ
আবাল্য সেবার অর্ঘ্য করিনু রচনা,
তাই কি মা এই দণ্ড এহেন বিপদ?
একি দিয়ে ভক্তে তুই করিলি বঞ্চনা!
যক্ষরক্ষোগণ মাঝে করিলি প্রেরণ,
অমর্কের বৃত্তি মোর শিরে করি দান,
পাঠালি সেবিতে নর-বাহন চরণ,
পাঠাইলি 'ঘটোৎকোচে' শুনাইতে গান?
বারাণসী অন্নসত্রে ভিক্ষা মেগে খাব',
বৈশালীর পথে হব শকট চালক,
বৃন্দাবনে মাধুকরী করিয়া বেড়াবো,
নবদ্বীপধামে হব গোধন-পালক।
পাতালেও যেতে রাজী জ্ঞানী গুণী সহ,
নরকে প্রভুত্ব মোর হয়েছে দুর্ব্বহ।

আদুরী

(গল্প)

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ।

(১)

পূজার অনেক আগেই আদুরী তাহার বাপের বাড়ী আসিত। আজ পাঁচ সাত বৎসর তাহার বিবাহ হইতে চলিয়াছে, কোন বৎসর এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। লোকে বলিত আদুরী নহিলে তাহার বাপের বাড়ীর গ্রামে পূজাই অচল। আসলে তাহার বাপের বাড়ীতে পূজাই হইত না, একখানি বারোয়ারীর ঠাকুর আসিত তাহাতে আদুরীর বাপের কিছু টাকা দেওয়া ছিল মাত্র, আর চণ্ডীমণ্ডপটাও ছিল আদুরীদের বাড়ীর ঠিক লাগোয়া। আগে খুব ধুমধামের সহিত পূজা হইত, কাঙালী ভোজন, যাত্রা গান, কথকতা কত কি হইত, এখন সে সবের কোন বালাই নাই। নানা-প্রকার দলাদলি ও মামলা মোকর্দ্দমায় প্রতিবেশীদের পরস্পর মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ, নেহাৎ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের উপরোধ অনুরোধে ও কয়েকটি সেকেলে বিধবার নিতান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়ে কোন প্রকারে মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয় মাত্র। গ্রামে ঐ একখানি মাত্র পূজা, বড় লোক দুই এক ঘর আছেন বটে কিন্তু তাঁহাদের ইহাতে কোন প্রবৃত্তি নাই।

যাই হোক পূজার পূর্ব্বে আশ্বিনের প্রথমেই আদুরী তাহার বাপের বাড়ী আসিয়াছে। ছেলেবেলায় সে যেমন ফুল তুলিত ছেলের মায়ের বয়স লইয়া এখনও তেমনি সে ফুল তুলিতে বাহির হইত। একখানি চেলির সাড়ী পরিয়া সমস্ত সকালবেলাটা সাড়া পাড়াখানির বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া আসিত। কোথাও বা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দুদণ্ড গল্প করিত, কোথাও বা সে নিজ হইতে পড়সীদের খুড়ী জেঠী প্রভৃতি সম্বোধন করিয়া সকলকার কুশল সংবাদ লইত। ছোটলোকদের বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া তাহাদেরও ছোট ছোট সুখদুঃখের খবর লইতে সে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না। সমস্ত গ্রামখানির লোকে তাহাকে নিতান্ত আপনার বলিয়া দেখিত। সাক্ষ্য দেওয়ার হাঙ্গামায় তাহার বাপ ভৈরব আচার্য্যের সহিত অনেকের বিবাদ ছিল কিন্তু তাহার সহিত কাহারো এতটুকু মনের গোল ছিল না। অমন যে ব্রজ জেলেনী, যার কাছ হইতে একটি চিংড়ী মাছ ফাউ লইতে হইলে খরিদ্দারকে কত মারামারি করিতে হয়, আদুরী বাড়ী আসিয়াছে, শুনিলে একসের মাছ তাহার একদিন আদুরীদের বাড়ী দিয়া আসা চাই। সৌরভ গোয়ালিনীও আমরা জানি একবার পূরা একমাসের দুধের দাম ভৈরব আচার্য্যকে ছাড়িয়া দিয়াছিল।

আদুরীর গায়ে গহনা ছিলনা, মাত্র হাতে দুগাছি রুলী, গলায় একটী সরু সোনার হার, তবু ঐ সামান্য গহনাতে তাহাকে কি সুন্দর মানাইত। তাহার স্বামীর উপার্জ্জন খুব কমই ছিল, আদুরীও তাহাতে কিন্তু এতটুকুও অসন্তোষ ছিল না। বলিত—সবারই স্বামীত সমান উপার্জ্জন করতে পারে না। কিন্তু তাহাদের ভালবাসা ছিল একবারে অটুট। সমস্ত পূজার সময়টি আদুরীর স্বামী তাহার দরিদ্র পিতার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিত এবং আদুরীও ভ্রাতারা যাহা খাইত তাহাতেই পরম তৃপ্তির সহিত আদুরী স্বামীকে খাওয়াইয়া ভুক্তাবশেষে নিজের আহারটা সমাধা করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিত।

লোকে বলিত আদুরীর চোখে জল কেহ কোনদিন দেখে নাই, হাসি একটু তাহার অধরে লাগিয়াই আছে। তাহার স্বামীও তাই ঠাট্টা করিয়া বলিত—আদর চিরকালই আমার আদর।

(২)

সেদিন সকালে ফুল তুলিতে গিয়া আদরিণী শুনিয়া আসিল তাহার সই আসিতেছে। আগামী কল্যই সে আসিবে। ছেলেবেলাকার সই, সইএর কথায় তাহার মনটা ভারি সুখী হইয়া উঠিল। যদিও সে মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণের কন্যা আর সই তিলি জাতীয় কৃষকের কন্যা, তবু ছেলেবেলা হইতে একত্রে থাকার দরুণ তাহার মনে কোন প্রকার ছোট বড়র রেখাপাত করিতে পারে নাই।

আদর সন্ধ্যাবেলায় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আরও পাঁচটি ভাইভগিনীর সহিত বিশ্রম্ভালাপের সময় তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিল - আচ্ছা মা, শুনচি নাকি আমার সইএর একটি ছেলে হয়েছে ?

আদরিণীর মা বলিলেন—তোর আবার সই কে হ'লরে ?

আদরিণী বিস্মিত হইয়া বলিল—এই ক বছরের মধ্যে তুমি আমার সইকেও ভুলে গেলে মা? সইএর মা তোমায় কত চাল গুড় আলু দিয়েছে মনে করে দেখ দেখি।

আদুরীর মায়ের এতক্ষণে হুঁস হইল—তখন সেই অনটনের সময় সই পাতানোর গুপ্ত কাণ্ডটাও মনে আসিল। জাতিতে তাহারা তখন যতই নিকৃষ্ট থাকুক তাহাদের আলু গুড় কি তরী তরকারী মোটেই নিকৃষ্ট ছিল না, এবং আদুরীর সইএর মারফত তাহা প্রতিদিনই তাহাদের গৃহে যথারীতি আসিয়া উপস্থিত হইত। মা বলিলেন—ওগো মনে পড়েছে, তুই অনুদের কথা বলছিস্? তাই বল্। আর বলিসনে মা, তোদের সঙ্গে ত এত ভাব ছিল, অনুর বাবাটা কিনা শেষকালটায় আমাদের বিরুদ্ধে আদালতে হলপ প'ড়ে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এলো।

আদুরী শুনিয়াছিল অন্য রকম, তাছাড়া এই সাক্ষী দেওয়ার কচকচানীটা হইতে সে দূরে থাকিবারই চেষ্টা করিত। কোনরকমে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার জন্য তোমাদের মধ্যে গোল করিতে পার কিন্তু আমাদের কি? আমরা যে সই তেমনি সই-ই আছি।

সেদিন সকাল হইতে না হইতে আদুরী তাহার সইদের বাড়ীর দুয়ারে গিয়া ডাক দিল—সই, ও সই—কবাটটা খোল না ভাই।

মুখে হাতে জল না দিয়াই অনুপমা বাহিরে আসিয়া বলিল—কি ভাগ্যি, আজ কার মুখ দেখে উঠলুম। তুমি ভাল আছো ত সই?

আদুরী একবারে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া বলিল —তুই ভাল আছিস ত ভাই? চ-চ তোর খোকনমণিকে দেখাবি ভাই।

অনুপমার মাও খোকাকে লইয়া ঘরের বাহিরে আসিতেছিল, আদুরী অনুমানে এইটি অনুপমার খোকা বুঝিয়া ফুলের সাজিটা একবারে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল—হাঁ সই, এইটি তোর খোকা, না? বেশ দেখতে হ'য়েছে ত। ওরে খোকা ও খোকা—বলিয়া একবারে অনুপমার মায়ের কোল হইতে এক রকম কাড়িয়া সে তাকে আপনার কোলে তুলিয়া লইল। অনুপমার মা হাসিয়া বলিল—আ পাগলী মেয়ে, আমাদের সব ছেলের ময়লা লাগা কাপড়, ঠাকুর দেবতার ফুল তুলতে এসেছিলে তুমি—

আদুরী ছেলেটিকে চুমো দিতে দিতে বলিল—ঠাকুরে আর ছেলেতে তফাৎ আছে মনে করতে চাও সই-মা? তা কখনই না।

তাহার ছেলে হয় নাই তাই প্রত্যেক কচি শিশুর পরে তাহার একটা অহৈতুক টান বাড়িত, পরের ছেলে কোলে তুলিয়া আদুরী ভাবিত পরের ছেলের কল্যাণে সে যদি নিজের ছেলেকে কোনদিন বুকে ধরিতে পায়!

* * * *

তারপর দুই সইয়ে কত কথা হইল, বিবাহের পর এই তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ সুতরাং কথা আর ফুরাইতে চাহে না। কার স্বামী কি রোজগার করে, কোথায় থাকে কিছু বাদ পড়িল না এবং

কথা কহিতে কহিতে বেলা যে দশটা বাজিয়া গিয়াছিল সেদিকে দুই জনেরই খেয়াল রহিল না।

অনেকবেলা পর্য্যন্ত আদুরীকে অনুপস্থিত দেখিয়া আদুরীর মা মনে করিল আর কিছু নয় আদুরী যে বলিয়াছিল তাহার সইএর কথা, নিশ্চয় সই আসিয়াছে এবং সইএর বাড়ীতে সে ধন্না দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে।

তাঁহাকে অধিক দূর খুঁজিতেও যাইতে হইল না। পড়শী আতরমণি, যাঁহার পেশাই হইল পাড়া-বেড়ান এবং পরচর্চ্চা লইয়া দিন কাটান, তিনি কোথা হইতে দুটি পুইডাঁটা পাইয়াছিলেন তাহা আচার্য্য-বাড়ীতে দিতে আসিয়া খবর দিলেন—তুমি একবার দেখে এসো আদুরীর মা, আদুরীর তোমার রকমখানা কি! কোথাকার তেলীবাড়ীর অনুপমা, তার একটা হনুমান বাচ্চার মত ছেলে হয়েছে, সেটাকে নিয়ে কি রকম আদুরীর দুধ-খাওয়ানো, কাজলপড়ানো চলেছে দেখে এসোগে। আমরাও এককালে ছেলেমানুষ ছিলাম কিন্তু এমন ধারাটি ত দেখিনি বাবা! কালে কালে কতই না দেখবো! তুই বামুনের মেয়ে আর সে যাই হোক শূদ্রের বাড়ীর ঝি, ছিঃ ছিঃ—বলিতে বলিতে শুচিবাই-গ্রস্থা আতর আদুরীর মায়েরও শুচিবাইটাকে জাগ্রত করিয়া চলিয়া গেলেন।

আদুরীর মা তাঁহার ছোট ছেলেটাকে হুকুম করিলেন একবার আদুরীকে ডেকে নিয়ে আয় দেখি, আজ তাকে গোবর খাওয়াবো, গঙ্গা নাওয়াবো তবে ছাড়বো। এমন অবুঝ মেয়ে দুটি যদি ভুভারতে জন্মেছে! মিছেই লেখা পড়া শিখিয়েছিলুম গা।

(৩)

খানিক পরে আদুরী ছোট ভাইটির হাত ধরিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল। মুখে একগাল হাসিয়া তাহার মাকে বলিল— মা, সইএর কি পরিষ্কার ছেলেটি দেখে এলাম। আহা, বামুন কায়েতের ঘরের ছেলে কোথায় লাগে।

মা তখন কৃষাণদের ও ছেলেদের মুড়ী দিতে ব্যস্ত ছিলেন, আদুরীর কোন কথার উত্তর করিলেন না, সংক্ষেপে কহিলেন—তুমি ঘরের দাবায় উঠো না, ঐ খানেই দাঁড়াও।

আদুরী ঘরের রোয়াকটার নীচে দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিল—মা, ধন্যি তোমার শুচিবাই বাপু, আগে ত এত ছিল না। রাস্তা দিয়ে চ'লে এলেও অপবিত্র হবো মনে করো নাকি?

মা স্বরটাকে যথা সম্ভব রুষ্ট করিয়া বলিলেন—ওরে তার জন্য নয়রে, রাস্তা দিয়ে সব মানুষই চলে তা আমি জানি। আজ তোর ও ফুলও রাখ, স্নান না সারা পর্য্যন্ত বাইরে থাক। কোথায় ছিলি এতক্ষণ শুনিনি? সেই চাষাবাড়ীতে যে বসে থাকলি, বসেই না হয় থাকলি—ছেলে কোলে ক'রে সোহাগ দেখাবার দরকার কি ছিল? মনে করেছিস আজও সেই ছোটটি আছিস, কেমন? এখন তোতে আর তোর সইএতে কত তফাৎ হ'য়ে গেছে জানিস্?

আদুরীর রাগে গা গিস্ গিস্ করিয়া উঠিতেছিল কিন্তু অতি দুঃখে কাষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল—কতখানি তফাৎ তার কিছুই হদিস পাইনি মা, এখন কি করতে হবে তাই বলো?

মা বলিলেন—মাথা আর মুণ্ডু করতে হবে, কাল দিয়েছিস আবার আজও ডুব দিয়ে আয়; তারপর অসুখবিসুখ একটা হোক। তাব'লে জাতজন্ম ত খোয়াতে পারা যায় না! কথাতেই বলে আচারে লক্ষ্মী বিচারে পণ্ডিত।

তিনি তাড়াতাড়ি গিয়া একটা কাচের বাটীতে করিয়া খানিকটা তেল আনিয়া খুব সন্তর্পণে আদুরীর কাছে নামাইয়া দিয়া বলিলেন—তেল রইল, মেখে স্নান ক'রে শুদ্ধ স্বস্থ হ'য়ে আয়।

আদুরীর এতক্ষণে সমস্তটা হৃদয়ঙ্গম হইল। ভাবিল মায়ের শাস্তি দিবার মত কারণ একটা হাতের কাছে আসিয়াছে বটে। মনে পড়িল ছেলেবেলার কথা, তখন তাহারা এমন ছিল না কিন্তু এই কয়বৎসরের মধ্যে ছেলে বয়স হইতে এতখানি

দূর বয়সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যেখানকার পেশাটাই হইতেছে ছুঁৎমার্গ। পরস্পরের মধ্যে মিলনের এখানে কোন কদর নাই, নির্ব্বিচারে মেয়েলী শাস্ত্রের এই ছুঁৎমার্গটাকে মানিয়া যাইতেই হইবে। তাহার মনে পড়িল যে সইকে সে তাঁহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছে, সই আসিলে কি করিয়া তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিবে?

(৪)

স্নান সারিয়া আসিয়া ভিজা চুলগুলি না শুকাইয়াই আদুরী ঘরে খিল দিয়া কাগজে কি লিখিতে লাগিল। অবশেষে পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী শ্রীচরণেষু লিখিত চিঠিখানি ছোট ভাইকে দুই আনা পয়সা কবলাইয়া ডাকে দিয়া আসিতে বলিল।

ছোট ভাই চিঠি ডাকে দিয়া আসিল, বাড়ীর আর কেহ এ খবর রাখিল না এবং রাখিবার দরকারও কাহারো ছিল না।

হঠাৎ দেখা গেল পূজার ষষ্ঠীর দিন জামাতা শ্রীমান রাধিকাপ্রসাদ পাল্কী বেহারা লইয়া আচার্য্য বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত।

অসময়ে পত্র না দিয়া জামাতার এরকম অপ্রত্যাশিত আগমনে সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিল। আদুরীর মা জামাইবাড়ীতে কোন বিপদ আপদ উপস্থিত হইয়াছে কি না খবর জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন।

জামাই জানাইল তার জন্ম নয়, এবার আমাদের গ্রামে বারোয়ারীতে পূজা বসেছে, মা তাই বল্লেন নিয়ে আসতে। একলা তিনি মহাপূজার কাজ পেরে উঠবেন না বলে আমায় পাল্কী সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

এতক্ষণে ব্যাপারটা সবার কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল। মা আদরিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে যাবি নাকি? আদুরী মুখটি নীচু করিয়া বলিল—যখন পাল্কী বেহারা নিয়ে এসেছেন তখন না গেলে আর উপায় কি মা?

মা পড়শীদের কাছে আদুরীর মতামত তুলিয়া বলিলেন - মেয়ে শ্বশুরঘর চিনলে বাপের ঘর অতি সহজে ভুলবে তা আর আশ্চর্য্য কি!

পড়শীরাও বলিল—তাই ভুলুক, ঐ ঘরই ত জন্ম জন্ম ডাকে করতে হবে।

মা বলিলেন—তা করুক, কিন্তু মেয়েও আস্তে আস্তে কেমন পর হয়ে যায় তাই ছাখো। কেন, পাল্কী এসেছে তার কি হয়েছে? আমরাও এককালে ঝি ছিলুম! অনায়াসে জামাইকে বল্লেই ত পারে পূজোর পর নইলে যাবো না। আমার বিশ্বাস ঐ আদুরীই চিঠি লিখিয়ে জানিয়েছে;—কালে কালে কতই হবে মা!

বৈকালের দিকে আদুরী তাহার সইএর সহিত দেখা করিতে গেল। সই অনুপমা বলিল—এরি মধ্যে চললে সই? একদিন তোমাদের বাড়ীতেও যাবো মনে করেছিলাম তাও আর হ'লো না।

আদুরী কষ্ট হাসি হাসিয়া মনে মনে বলিল—সেই অপমান হ'তে রেহাই দেবার জন্যই ত আমার এ বিদায় যাত্রা। মুখে বলিল—তার কি হ'য়েছে ভাই, আবার কতবার আসব, আবার কতবার দেখা হবে। অনুপমার খোকাটিকে কোলে লইয়া দুটি টাকা খোকাটির দুই হস্তে দিয়া একটু চুমু খাইয়া আদুরী বিদায় লইল।

অনুপমাও তাহার সঙ্গে আসিল। আর জীবনে দুই সইতে দেখা হইবে কিনা তাহারই পুনঃ পুনঃ আলোচনা হইতে লাগিল। বাড়ীর কাছ বরাবর আসিয়া অনুপমা বলিল—এতদূর যখন এসেছি, জামাইবাবুকে একটা প্রণাম করে যেতে পারবো না?

আদরিণী শুষ্ক স্বরে বলিল - আর প্রণাম ক'রে কি হবে সই, সেও মানুষ তুইও মানুষ।

সে কেবলি শঙ্কিত হইতেছিল প্রণাম করিবার সময় যখন সে ঘরের দুয়ারে উঠিবে শুচিতার ধুয়া ধরিয়া নিশ্চয় তাহার মা ঘৃণায় মুখ ফিরাইবেন, আর সত্য সত্যই ফুটিয়া যদি কিছু বলিয়া ফেলেন তাহা হইলে সে অপমানের হাত হইতে তাহার সখীকে বাঁচাইবার উপায় কি?

বাহির বাড়ীতে জামাই রাধিকাপ্রসাদ তাস খেলিতেছিল, বুড়ি ঝি আসিয়া ডাক দিল—ওগো জামাই বাবু, একবার বাড়ীর মধ্যে যাও, তোমায় কে একজন দেখতে এসেছেন।

জামাই ইস্তকবিন্তি হাঁকিতে হাঁকিতে বলিল—তিনি কি দয়া ক'রে এখানে একবার দেখা দিয়ে যেতে পারেন না?

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, এই ডাক শুনিয়া আর আর খেলোয়াড়েরা উঠিয়া পড়িল। জামাইও উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে গেল।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে যাইবে এমন সময় রাধিকাপ্রসাদ দেখিল ঘরের দাবার কাছে কে একটি অপরিচিতা স্ত্রীলোক তাহার স্ত্রীর কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পরণে তাহার ময়লা সাদা কাপড়, হাতে পা'য়ে অলঙ্কারের বাহুল্য নাই, দেখিলে না ভদ্র না অভদ্র দুই-এর মাঝামাঝি বলিয়া মনে হয়। সেই বুড়ি ঝি-ই পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল—জামাইবাবু ঐটি তোমার সই হয়, ভাল ক'রে দেখে নাও।

ও, সই! জামাই অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিল, বলিল—তা সই ঘরের ছাঁচতলায় কেন? ঘরের ভিতরের দিকে আসুন না।

বুড়ি ঝি বলিল—না, ওরা এখন দু সইয়ে গা হাত ধুতে যাবে।

আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই অনুপমা গড় হইয়া প্রণাম করিয়া জামাইবাবুর পায়ের ধূলা যেখানে পড়িয়াছিল সেখান হইতে দুটি ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল।

আতুরীর মাথায় ঘোমটা দেওয়া ছিল, সে ডাকিল—আয় সই গা ধুয়ে আসিগে, তারপর তুই বাড়ী যাবি আমিও বাড়ী আসবো। এই বলিয়া সে অনুপমার হাতটি ধরিয়া খিড়কীর রাস্তায় বাহির হইয়া গেল। তাহারা বাড়ীর বাহির হইয়া গেলে বুড়ি ঝি জামাইবাবুর কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল—জামাই বাবু, তোমার সইকে ঠাট্টাসাট্টা করতে গিয়ে যেন ছুঁয়ে ফেল' না। জেতে ওরা তেলি, কলুর জাত আর কি। আমিই দেখেছি ওর ঠাকুরদাকে ঘানি ঘুরিয়ে তেলের ব্যবসা করতে, আজ যেন অবস্থা ফিরেছে—

জামাই বাবু যেন অত্যন্ত অবাক হইয়া পড়িয়াছে এই ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল—বল কি? কি সর্ব্বনাশ!

সন্ধ্যার পর আতুরী সইকে বিদায় দিয়া গা হাত ধুইয়া ঘরের মধ্যে আসিলে স্বামী রাধিকাপ্রসাদ বলিল—শোন, তুমি ডুব দিয়ে এসেছ? আতুরী বলিল—না।

স্বামী ব্যগ্রস্বরে বলিল—তবে আর এক পাও এগিয়ো না। আমার কথা শোন, একটা ডুব দিয়ে এসো, তৈলীর মেয়ের গায়ে হাত দাও ডুব দিতে পারো না!

আতুরী তাহার স্বামীর দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল এখন বচনসুধায় আরও স্তম্ভিত হইয়া গেল। স্বামীদেব আবার বলিল—যাও, দাঁড়িয়ে রৈলে যে? রাত্রি দশটায় ট্রেণ, জানত? ভেবে কি হবে বলো, আমি যদি না শুনতাম তাহ'লে কথা ছিল কিন্তু যখন শুনে ফেলেছি—তোমার কোন আপত্তিই টিকবে না।

আচ্ছা যাচ্চি—বলিয়া আদরিণী তাড়াতাড়ি পুকুর হইতে একটা ডুব দিয়া আসিয়া হি হি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা' তোমাদের শাস্ত্রে মানুষ বড়, না মানুষের তৈরী আচার বড়? কথাটার উত্তর দাও।

রাধিকা খানিক ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—আচারই বড়, কেন না শাস্ত্রের যে তাই বিধান।

আদরিণী বলিল—চমৎকার, তুমিই ব্রাহ্মণের যোগ্য বংশধর, আমায় একবার পায়ের ধূলা দাও; এবং স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল। স্বামী অবাক হইয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সঙ্কলিকা

নারী-নিগ্রহের প্রতিকার—

* * * বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে যে সব পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় হইতেছে তাহা স্মরণেও প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাঁহারা সহরবাসী তাঁহারা কেবল সহরের অনাচার দেখিয়াই হয়ত গ্রামের একটা চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করিয়া কর্ত্তব্যের একটা লিষ্টি করিয়া নেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে পল্লীগ্রামে আস্তে আস্তে এমন ব্যভিচার প্রবেশ করিতেছে, যাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারেন না;—ভদ্র হিন্দু গুণ্ডাদ্বারাও অসংখ্য নারী নির্য্যাতিতা হন, সন্দেহ নাই। কিন্তু কেন এরূপ হয়—কে তাহার খোঁজ রাখে?

সহরে মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা সন্তোষজনক না হইলেও যে কতকটা আছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। পাড়াগাঁয়ে কিন্তু তাহার হাজারাংশের একাংশ থাকিলেও আক্ষেপের বিষয় ছিল না মোটেই। সেখানে মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করার মত অপব্যয় দ্বিতীয়টী আছে বলিয়া অভিভাবকগণ স্বীকার করিতে চাহেন না। সুপ্ত নারী-জাতিকে জাগাইয়া দিবার মত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর বিশেষ অভাব। গোবেচারা পাঠশালার "মূর্খ বৈদ্যগোছের" শিক্ষকগণ, অবসর মত মাসিক ২।৩ টাকা সাহায্যের লোভে ৪।৫টা ছাত্রী লইয়া বসেন, উদ্দেশ্য মাসিক টাকা আদায়—শিক্ষাদান নহে। তাহাতেও আর এক অন্তরায় বিদ্যমান। এগার ছাড়িয়া বারতে পদার্পণ করিলেই ছাত্রীদিগকে পর্দ্দার অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সর্ব্বনাশ! এতবড় ধেড়ে মেয়ে কি আর ঘরের বাহির হইতে পারে! স্ফুটনোন্মুখ জীবনের এখানেই এক অঙ্ক শেষ হইয়া যায়।

তারপর বিবাহ। বাল্য-বিবাহ মেয়েদের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। বাল্যকালে যখন তাহারা হাসিবে, খেলিবে, বেড়াইবে, ও জ্ঞানার্জ্জন করিবে, তখনই তাহাদিগকে ২।১টী সন্তানসন্ততির গর্ভধারিণী হইয়া সংসারের বেড়াপাকে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হয়।

শারীরিক ব্যায়ামের প্রথা স্ত্রীলোকদের মধ্যে আদৌ নাই। "ব্যায়ামের অভাবে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুষ্টি সাধিত হয় না"—এ কথা বোধ হয় কেবল পুরুষদের জন্যই লিখিত হয় নাই, মেয়েদের পক্ষেও এ কথা খাটে। কিন্তু তাহাদের তা হইবার যো নাই। সুখে হউক, দুঃখে হউক, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক তাহাদিগকে আজীবন গৃহকোণেই আবদ্ধ থাকিতে হইবে। বিধাতার উন্মুক্ত আকাশতলে বসিয়া একটু উন্মুক্ত বায়ু সেবনও তাহাদের অদৃষ্টে নাই; অপরাধ—তাহারা নারী। শারীরিক ব্যায়ামের অভাবে ও অকাল-মাতৃত্বে তাহাদের জীবনের উন্মেষকালেই স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়। তার মধ্যে নিত্য নৈমিত্তিক অভাব তো লাগিয়াই আছে। বড় ঘরের রমণীগণ তো মোমের পুতুল সাজিয়া কর্ত্তাদের সন্তোষ বিধান করিয়া থাকেন। ফলে গুণ্ডার অত্যাচারে, চোর ডাকাতের উপদ্রবে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বড়, কি ছোট, কোন রমণীই রোখিয়া দাঁড়াইতে পারেননা বা নিজ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হন না।

বিধবা-সমস্যাও খুব বড় সমস্যা। বাল্য-বিবাহের ন্যায় বৃদ্ধের তরুণীগ্রহণের ফলেও বাল-বিধবায় দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে। নারীজাতির জীবন লইয়া সমাজের কর্ত্তারা ছিনিমিনি খেলিতেছেন। * * * ভারতে মাতৃস্তন্যপায়ী বিধবার সংখ্যা তিন শতের উপর! ১৪ হাজারেরও উপর বিধবা মায়ের হাত না ধরিয়া হাটিতে পারে না। * * * এই যে কয়েক লক্ষ বিধবা দেশ জুড়িয়া বিদ্যমান, ইহাদের না আছে শিক্ষা, না আছে সংযম—ইহারা না বুঝে ব্রহ্মচর্য্য। সুতরাং ছলে বলে কৌশলে ইহারা অনেকেই গুণ্ডা কর্ত্তৃক নির্য্যাতিতা হয়; ইহারা সমাজে আশ্রয় পায় না কাজেই অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের অন্য উপায় না পাইয়া সহরে আসিয়া বসে। সমাজ বিধবা সৃষ্টির কারখানা হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বিধবাদের জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের শান্তিতে ও সৎভাবে জীবিকার্জ্জনের কোন পথ অদ্যাপিও দেখাইয়া দেন নাই। নিম্ন ও অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই ঐরূপ অসংযমী বিধবার সংখ্যা বেশী বলিয়া স্বীকার করিলেও একথা ঠিক যে সকলেই নারী। বিধে কাহারও অধিকার অস্বীকার করিলে চলিবে না। * * *

বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, গ্রামের যাহারা ধনী, গণ্যমান্য বলিয়া খ্যাত তাহারাই বেশী লম্পট। কেহ কিছু বলিতে পারে না; ফলে জমিদারের প্রাসাদে, বড় লোকের আড্ডায় কত অসহায়া নারীর উপর অত্যাচার হইয়া থাকে, তার ইয়ত্তা কে করিবে? শিক্ষার দোষে দেশের যুবকশক্তিও অনেকটা ঐ ভাবেই অনুপ্রাণিত হইতেছে। অত্যাচার নির্য্যাতন হইতে নিজ নিজ মাবোনকে রক্ষা করা এখন আর তারা তত দরকার বলিয়া মনে করে না। * * *

সব চেয়ে বড় কথা হইল এই, নারীজাতিকে জানাইয়া দিতে হইবে—তাহারাও মানুষ, তাহাদেরও শক্তি আছে, তাহাদের বাহুতেও বল আছে। তাহাদের নিজের মান, নিজের ইজ্জত চেষ্টা করিলে তাহারা নিজেরাই রক্ষা করিতে পারে। পুরুষের দিকে চাহিয়া থাকিলে আর চলিবে না। জগতের সমস্ত শক্তি পুরুষের একচেটিয়া নহে। কি সমাজে, কি রাজনীতিতে, কি স্বাস্থ্যনীতিতে—নারীর স্থান পুরুষের চেয়ে কোন অংশেই কম নহে। স্বাধীন দেশের স্বাধীন রমণীদের চরিত্র-গাথা তাহাদের ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। কুসংস্কার, আবর্জনা প্রভৃতি সমাজের বুক হইতে দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া নারীজাতিকে উন্নত করিতে হইবে। তবেই প্রতিকার সম্ভব। —আনন্দবাজার পত্রিকা।

রোগীর সেবা—

রোগীর সেবা তাহার অবস্থা ও রুচি অনুসারে বিভিন্ন হইবে, কিন্তু নীচে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম দেওয়া হইল এগুলি প্রায় সকল অবস্থাতেই প্রযুজ্য।

১। যে সকল লোককে রোগী পছন্দ করে না সেরূপ লোককে রোগীর ঘরে আসিতে দিবে না।

২। রোগীর ঘর সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে।

৩। রোগীর অপ্রীতিকর বা তাহার সহিত সম্পর্কশূন্য কোনও কথা রোগীর ঘরে কহিবে না।

৪। রোগীর ঘরে চুপে চুপে বা অপরিস্ফুট ভাবে কাহারও সহিত কথা কহিবে না। যে সকল কথা বলিবে তাহা রোগী যেন বেশ শুনিতে পায়। রোগীকে শুনান উচিৎ নয় এরূপ কথা বলিতে হইলে বাহিরে যাইয়া বলিবে। বাহিরে যাইবার সময়েও রোগী যেন বুঝিতে না পারে যে তোমরা কথা বলিবার জন্যই বাহিরে যাইতেছ।

৫। কতকগুলি লোক মিলিয়া রোগীর ঘরে হট্টগোল করিবে না।

৬। রোগী কোন্ অবস্থায় শুইতে পছন্দ করে তাহা লক্ষ্য করিবে, চিকিৎসকের আপত্তি না থাকিলে সেই অবস্থাতেই শোয়াইয়া রাখিবে।

৭। রোগী যখনই যাহা আদেশ করিবে তাহাতে চিকিৎসকের আদেশ না থাকিলে তাহা তদ্দণ্ডেই পালন করিবে। অযথা আলস্য করিয়া দেরী করিয়া রোগীর অপ্রীতিভাজন হইবে না।

৮। বাতাস দিতে হইলে দেখিবে প্রত্যেক বারের হাওয়া যেন রোগীর গায়ে লাগে অথচ পাখা তাহার গায়ে না লাগে। মাথায় বাতাস দিতে হইলে গায়ে চাদর ঢাকা দিয়া মাথার উপরের দিক হইতে বাতাস দিবে—মুখের দিক হইতে নয়। মুখে বাতাস দিতে হইলে মুখের একপাশ হইতে পাখা নাড়িবে। মুখের সামনে পাখা নাড়িও না।

৯। রোগীর গায়ে মশা, মাছি বা পিপীলিকা বসিলে তাহা সঙ্গে সঙ্গে তাড়াইয়া দিবে। রোগী কিছু বলিতে না পারিলেও তজ্জন্য অশান্তি বোধ করে।

১০। মাথায় বরফ দিতে হইলে তাহা ন্যাকড়ার মধ্যেই দাও আর রবারের থলির মধ্যেই দাও ভাল করিয়া গুঁড়া করিয়া দিবে নতুবা বড় বড় চাপের কোণগুলি মাথায় ব্যথা দিবে অথচ মাথা ভাল ঠাণ্ডা হইবে না।

১১। বরফের পরিবর্ত্তে জল বা অডিকোলন দিলে সঙ্গে সঙ্গে বাতাস দেওয়া দরকার নতুবা ভাল ঠাণ্ডা হয় না।

১২। কিছু খাওয়াইবার সময় উহা যেন রোগীর গায়ে না পড়ে। ১ ফোঁটা জল বা দুধ পড়িলেও তাহা সঙ্গে সঙ্গে মুছাইয়া লইবে। মুখের পাশ দিয়া কিছু গড়াইয়া পড়িলেও তাহা সঙ্গে সঙ্গে মুছাইয়া লইবে। খাওয়াইবার সময়ে মুখ ও গলার উপর একটি তোয়ালে চাপা দিয়া খাওয়ান ভাল, ইহাতে ঐসকল স্থানে কিছু লাগিতে পায় না আর মুখের পাশ দিয়া গড়াইয়া যাইলেও ঐ তোয়ালে দিয়া সঙ্গে সঙ্গে মুছিয়া লওয়া যায়।

১৩। জল ভিন্ন যে কোনও জিনিষ খাওয়াইবার পরে মুখে একটু পরিষ্কার জল দেওয়া ভাল, ইহাতে রোগীর মুখ পরিষ্কার হয়, রোগীও শান্তি বোধ করে।

১৪। রোগীর গায়ে ঘাম হইলে তাহা সঙ্গে সঙ্গে মুছাইয়া দিবে।

১৫। অনেক রোগী বেড-প্যানে মল ত্যাগ করিতে পারে না, তাহাদের জন্য সরা, ডিস্, থালা, কাগজ, চট বা ন্যাকড়ার ব্যবস্থা করিবে। মলত্যাগের পর শুষ্কতার আগে ভিজা ন্যাকড়া দিয়া মুছাইয়া পরে শুকনা ন্যাকড়া দিয়া মুছাইয়া দিবে।

১৬। চিকিৎসকের অনুমতি লইয়া মধ্যে মধ্যে রোগীর গা মুছাইয়া দিবে।

১৭। সকল সময়ে রোগীকে আরোগ্যের আশা দিবে কিন্তু তাই বলিয়া তাহার কষ্টের প্রতি উপেক্ষার ভাব প্রকাশ করিবে না।

১৮। সেবা করিবার সমস্ত সময় মনোযোগটি রোগীর প্রতি অর্পণ করিবে। মনে রাখিতে হইবে অসুখের সময় রোগীর অন্য কাজ থাকে না, সে নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবিধা অসুবিধাগুলিকেই বড় করিয়া দেখে।

যথার্থ সেবা করিতে হইলে মানব প্রকৃত সেবকের ভাব জানা দরকার। ইহা বড় সহজ নয়। প্রায় সকলেরই এমন

একজন আছে যাহাকে, সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে বা ভক্তি করে। রোগীকে সেই পরমাত্মীয় মনে করিয়া লইলে সেবা অনেকটা সহজ হইয়া পড়ে। —স্বাস্থ্য।

নারীর আর্থিক স্বাধীনতা—

পুরুষদের বেলায় আমরা ইহা সবাই স্বীকার করি, যে, পর-মুখাপেক্ষিতায় তাহাদের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয়, এবং স্বাবলম্বী হইতে পারিলে তাহাতে চারিত্রিক উৎকর্ষ হইবার অধিক সম্ভাবনা ঘটে। নারীদের বেলায় কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে সকল দেশেই বিলম্ব ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে, স্বাবলম্বন নারীদের পক্ষেও মঙ্গলজনক। শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য মৃত্যু পর্য্যন্ত নারীর পরমুখাপেক্ষী ভাল নয়। কোন প্রকৃতিস্থ পিতা, স্বামী, ভ্রাতা, বা পুত্র মনে করেন না, যে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া কন্যা, পত্নী, ভগিনী বা মাতার ভরণপোষণ করিতেছেন, ইহা সত্য। কিন্তু ইহাও সত্য যে, সকল পিতা, স্বামী, ভ্রাতা বা পুত্র প্রকৃতিস্থ বা আদর্শ স্থানীয় নহে। নারীমাত্রেরই সকল সময়ে ঐরূপ নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় থাকে না। নারীর স্বাবলম্বনের উপায় থাকিলেই তিনি পিতার স্নেহ, পতির প্রেম, ভ্রাতার প্রীতি ও পুত্রের ভক্তি হইতে বঞ্চিত হন না। সুতরাং নারীর স্বাবলম্বিনী হইবার জন্য তাঁহার উপার্জ্জনের ক্ষেত্র বিস্তৃততর হওয়া ভাল। পরিবারের সহিত যুক্ত থাকিয়া উপার্জ্জন করিতে পারা নারী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর।

—প্রবাসী।

পূজার শেষে

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

পূজা ও আরতি বন্ধ আজিকে
ভক্ত গিয়াছে চ'লে,
ক্ষীণ দীপ-শিখা শুব্ধ কক্ষে
স্তিমিত-নয়নে জ্বলে।
বেদীর উপর দেবতা নাহিক'
শূন্য যে চারি ধার,
মন্দিরতল, অঙ্গন-বুক
করে শুধু হাহাকার!
হোমের আগুন জ্বলেনাক' আজ
গন্ধ হ'য়েছে শেষ,
কোথা ফুলরাশি বিল্ব তুলসী?
নাহিক চিহ্ন লেশ
বন্দনা-গান, শঙ্খ-নিনাদ
সকলি গিয়াছে থেমে
সুদূর হইতে নীরবতা-রাশি
দেউলে এসেছে নেমে।
পূর্ণকুম্ভে চূত-পল্লব
শিহরিয়া যেন বলে—
"ওরে সন্তান, কাঁদ শুধু আজ,
জননী গিয়াছে চলে।"

মাতৃ-মন্দির



দেশজননীর একনিষ্ঠ পূজারী
চিত্তরঞ্জন।



মাতৃমন্দির



২য় বর্ষ | অগ্রহায়ণ—১৩৩১ | ৮ম সংখ্যা

পূজা

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

বনখানি সুরভিত, কৌমুদী প্লাবিত;
আলোক জড়ায়ে আছে আঁধারের গলা;
পাদধৌত তরঙ্গিনী সতত চঞ্চলা
কল কল রবে চলে আলাপি' সঙ্গীত।
লতিকা-বিতানে মঞ্চ করি বিরচিত
বনদেবী পূজিছেন প্রকৃতি-চরণ;
করিছে বর্ষণ তরু, কৈবল্যকারণ—
পবিত্র শিশির বারি হইয়া কম্পিত।
বিলাইছে ফুলবালা মধুর সুবাস,
বিহগ করিছে সুখে মঙ্গল কূজন,
তুষার-উষ্ণীষ নগ আনন্দে মগন;
ছুটিছে সমীর তুলি সুরভি উচ্ছ্বাস।
তটিনী বিম্বিত চাঁদ, পুলকে কাঁদিয়া,
আকাশের চন্দ্র পানে আছে তাকাইয়া।

পতিতা

(কথিকা)

শ্রীমতী বেলা গুহ।

সে ছিল পতিতা। বিশ্বের দরবারে রূপযৌবনের ব্যবসা করেই তার অধিকাংশ জীবন কাটিয়েছে। বিশ্বের চোখে—সমাজের কাছে আজ সে হীনা, ঘৃণিতা! সমাজে তার স্থান অতি নীচে।

তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হ'ল গঙ্গার ঘাটে। সেদিনের সে স্মৃতি আজও আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে জেগে আছে!

সেদিন স্নানযাত্রা—গঙ্গার তীরে কতযাত্রী, যেদিকে তাকাই দেখি শুধু যাত্রীর মেলা, কাণে শুনি শুধু তাদের আনন্দের কলরব!

আমি স্নানান্তে সিক্তবসনে মন্দিরে যেই প্রবেশ করব, ঠিক্ এমনি সময়ে তার সঙ্গে আমার দেখা হ'ল। দেখলুম সে ফুল নিয়ে দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে আকুল নয়নে যাত্রীর চলাচল দেখ্‌ছে। তার সেই বাঁকা বাঁকা চোখ তুলে আমার পানে তাকালো। উঃ, কি সে করুণ বেদনা-ভরা চোখের চাহনি!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—তুমি কে?

সে করুণকণ্ঠে বল্‌ল,—আমি? আমি বড় অভাগিনী! আর বল্‌তে পারল না। ব্যথার ভারে তার কণ্ঠস্বর গাঢ় হ'য়ে এল, চোখের পাতা ছল্‌ছলিয়ে উঠ্‌ল।

খানিক চুপ করে নিজকে সাম্‌লে নিয়ে সে আবার বলল,—মন্দিরে ঢোকবার আমার যে অধিকার নেই, আমি যে পতিতা, অস্পৃশ্যা, ঘৃণিতা!—উঃ, আমার উপায় কি হ'বে?

তার সেই নিরাশ, কাতর বাণী শুনে আমার, হৃদয় ব্যথিত হ'য়ে উঠ্‌ল। আমি সান্ত্বনার স্বরে বল্‌লুম—তোমার হৃদয় যদি ব্যাকুল হয়েই থাকে, তবে নিশ্চয় তাঁর চরণ দর্শন তোমার ভাগ্যে ঘট্‌বে।

আমি মন্দিরে প্রবেশ করবার জন্য চেষ্টা করছি কিন্তু যাত্রীর ধাক্কা খেয়ে অনেক দূর পিছিয়ে পড়লুম, মন্দিরে ঢুক্‌তে না পেরে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম।

এমন সময় এক গলিত কুষ্ঠ রোগী অতিকষ্টে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। তার সর্ব্বাঙ্গ পচে গিয়েছে, দুর্গন্ধে কেউ সামনে যেতে পারছে না। মাঝে মাঝে সে ক্ষতের যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করছিল। সবাই তাকে তিরস্কার করতে করতে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে মন্দিরে ঢুক্‌তে লাগল। আমিও নাকে কাপড় চেপে সড়ে দাঁড়ালুম।

*　　*　　*　　*

একি! যে নাকি বিশ্বের চক্ষে ঘৃণিতা, হীনা, সমাজের নিকট পতিতা, সেই অভাগিনী নারীর কোলে, ও কে?—ওই তো সেই গলিত-দেহ কুষ্ঠ-রোগী! ওই তো সেই পতিতা নারী যার কিছু নেই, বিশ্বের দরবারে সমস্ত হারিয়ে রিক্তা হ'য়েছে, রূপযৌবন বেচে যে আজ পথের ভিখারিণী! যুগযুগান্ত ধরে যে করুণাধারা প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হচ্ছে নারীর গোপন অন্তর তলে, সে বুঝি তা' আজও হারায় নি—সে ধারা বুঝি আজও শুকায় নি! সেই সর্ব্বতোমুখী করুণাধারা তার জীবনের সমস্ত কালিমা ধৌত করে তাকে আজ সেবার মাধুর্য্যে মহীয়সী করে তুলেছে! ধন্য, ধন্য নারী, তুমি পৃথিবীতে ধন্য! সংসার-মরুভূ মাঝে তুমি সুধা-নির্ঝরিণী!

আমার আর দেবতা দর্শন হ'লনা—সেই দয়াবতী পতিতা নারীই যে আমার সাধনার দেবী।

দুস্থা রমণীর জীবিকা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

আজকাল যে কোন সাময়িক কাগজ খুলিলেই দেখিতে পাই—'নারী-সমস্যা', 'নারী-নিপীড়ন', 'নারী-বিদ্রোহ' শীর্ষক প্রবন্ধ বঙ্গসাহিত্যকে বিশেষ সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। এই সব প্রবন্ধের লেখক-লেখিকাগণ কেউ বা গদ্যে, কেউ বা পদ্যে দীর্ঘ ও দীর্ঘতর বাক্যবিন্যাসে নারীগণকে ডাকিতেছেন। যেন দেশের রমণীগণ চিত্তদুয়ার রুদ্ধ করিয়া ঘুমাইতেছেন,—সেই ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্যই এই আয়োজন।

কিন্তু ঘুম ভাঙিলেই ত হইবে না। কাজ করা চাই যে। শান্তিপূর্ণ নিদ্রার একটা সার্থকতা আছে। তাহাতে শরীর অন্ততঃ সুস্থ থাকে, কিন্তু জাগিয়াও যাহারা কাজ না করিয়া অলসতায় দিন কাটাইয়া দেয়, তাহাদের দেহমন শীঘ্রই যে গ্লানিতে ভরিয়া যায়।

স্ত্রীলোকে কাজ করিবে, এ কথা বলিলেই অনেকে প্রতিবাদ করিবেন, তাহা আমরা জানি। তাঁহারা কোমলাঙ্গী, কুসুমসদৃশা, লতিকার সহিত উপমিতা। কাজ করা কি তাঁহাদের সাজে? অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমরা পুরুষ হইয়াও নারীর চেয়ে অধিকতর অলস ও শ্রমবিমুখ, একথা ভুলিয়া যাই। এমন কোন গৃহ আছে এ জগতে, যেখানে একটি স্নেহের সুকোমল স্পর্শে সমস্ত গৃহস্থালীর নিতান্ত অনাবশ্যক বস্তুটিও একটি রহস্য নিকেতন হইয়া দেখা দেয় না? সুতরাং নারী কাজ করিবে না এ মত প্রকৃতপক্ষে কাহারও নয়। কিন্তু কাজ করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিবে ইহা কাহারও সহ্য হয় না, ইহাতে আমাদের অভিমানে বুঝি আঘাত লাগে!

একদিন ছিল যখন আমাদের এ অভিমান খাটিত। দেশে একান্নবর্ত্তী-প্রথা প্রচলিত ছিল—যিনি বা যাঁহারা উপার্জ্জন করিতেন, সমস্ত পরিবার পরিজনের জন্যই করিতেন। দেশে লোক কম ছিল, অভাব কম ছিল, অনেকেই পল্লীগ্রামে বাস করিতেন, প্রায় সকলেরই কিছু কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। জিনিষপত্রের এমন অগ্নি-মূল্য হয় নাই, বিলাসিতাও এত বাড়ে নাই। অন্নদায় কন্যাদায় প্রভৃতি বিবিধ "দায়ে" লোকে এখনকার মত বিব্রত হইয়া উঠে নাই। তখনও মানুষ নিজের চেয়ে নিজের আসবাবপত্রের মূল্য এমন অসম্ভবরূপে বাড়াইয়া দেয় নাই।

কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। এখন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়াও বাঙ্গালীর ছেলে পেটের ভাতের জোগাড় করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। যেদিকে তাকাও দেখিবে কেবল ম্লান, জীর্ণ, শীর্ণ, অর্দ্ধাহারী মূর্ত্তি; আশা নাই, হাসি নাই, আবেশ নাই। সমস্ত প্রাণবসন্তটুকুর উপর কে যেন অকালে শীতের জড়তা আনিয়া দিয়াছে। বাঙ্গালীর সংসারে উপার্জ্জনকারীর সংখ্যা কম, অথচ অনেক পোষ্য। ইহাদের মধ্যে অক্ষম স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। বাঙ্গালীর ঘরে বিধবার সংখ্যাও বড় কম নয়।

স্বামী বা পুত্র বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকের তত কষ্টের কারণ নাই। কিন্তু এরূপ কেউ না থাকিলে বাঙালী-বিধবার কি দুর্দ্দশা হয়, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। স্বামী যদি কিছু রাখিয়া যান, তাহা হইলে পাঁচজন আত্মীয় বান্ধব তাহা ফাঁকি দিয়া খায়, আর যদি কিছু না থাকে, তাহা হইলে ত কথাই নাই। কি পিতৃগৃহে, কি শ্বশুরালয়ে, সর্ব্বত্রই হিন্দুবিধবা গলগ্রহস্বরূপা। পিতৃগৃহে যতদিন পিতা মাতা জীবিত থাকেন ততদিন বরং দিন একরূপে কাটে কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যু হইলে ভ্রাতৃবধূর ব্যবহার ক্রমেই উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া উঠে। শ্বশুরগৃহে

ভাসুর, দেবর এবং তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীগণের ব্যবহারও খুবই খারাপ। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম নাই, তা নয়। নিজেদের উপার্জ্জনের সংস্থান নাই বলিয়া, এবং বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকায় বিধবাগণকে বাধ্য হইয়া এই সব লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। যাঁহাদের সহ্য করিবার শক্তি কম তাঁহারা বাধ্য হইয়া হয় আত্মহত্যা করেন, নতুবা বিপথে যান। একবার পদস্খলন হইলেই আর উপায় নাই। আত্মীয় গৃহে তাঁহাদের স্থান নাই, সমাজ তাঁহাদের দেখিবে না, নিজেদেরও উপার্জ্জনের ক্ষমতা নাই, সুতরাং পেটের দায়ে বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে কদর্য্য পঙ্কিলতার মধ্যে বাস করিতে হয়। নিতান্ত মরণ হয় না বলিয়াই বিধবাগণ বাঁচিয়া থাকেন, জীবনের কোন মোহে, আনন্দে নয়।

যদি উপার্জ্জন ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে এই শ্রেণীর বিধবাগণের আত্মীয়নিরপেক্ষ হইয়াও স্বাধীনভাবে বাস করা সম্ভব হয়। আর আত্মীয়-স্বজনও তাঁহাদিগকে ততটা ভার বলিয়া মনে করে না, কারণ সংসারে নিতান্ত মন্দ লোক না হইলেও অনেক সময় পেটের দায়ে বাধ্য হইয়া লোকে বিধবাগণকে পোষণ করিতে অসমর্থ হয়।

আমাদের দেশে কুম্ভকার, তন্তুবায়, এবং কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রীলোকে পুরুষের প্রায় অর্দ্ধেক কাজ করে। অপর কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ প্রথা নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সংসারের কাজে খুব বেশী সময় লাগে না। সংসারের কার্য্যান্তে বাকী সময় প্রায়ই পরনিন্দা, পরচর্চ্চা অথবা কলহেই কাটিয়া যায়। সময় এইরূপে নষ্ট না করিয়া তাঁহারা কিছু কিছু কাজ করিয়া সংসারের আয় যদি বাড়ান, তাহাতে অগৌরবের কিছু আছে কি? আমাদের মতে ইহাতে লজ্জার কিছুই নাই। এইরূপ মিথ্যা অভিমানেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে।

এখন কথা হইতেছে—স্ত্রীলোক কিরূপ কাজ করিবে? সকলেই মনে রাখিবেন আমি এ প্রবন্ধে দরিদ্র বাঙালী-গৃহস্থের কথাই আলোচনা করিতেছি। আমার বিবেচনায় স্ত্রীলোকে এরূপ কাজ করিবে যাহা তাহাকে মানায়।

আজকালকার দিনে প্রথমেই মনে পড়ে চরকার কথা। এ বিষয়ে দেশপূজ্য নেতৃগণ এত বিশদরূপে বলিয়াছেন, যে আর কিছুই বলিবার দরকার করে না। ইহাতে শুধু যে অর্থাগম হয় তা নয়, মনের বিক্ষেপ দূর হয়, একাগ্রতা আসে। সেকালে ব্রাহ্মণ-বিধবাগণ চরকা এবং টেকোয় সূতা কাটিয়া অনেকে জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। এখন দুই-ই উঠিয়া গিয়াছে। এখন আর মাতৃহস্তের পবিত্র সূতা পাই না, পৈতা বলিয়া যাহা গলায় দিই তাহা ম্যাঞ্চেষ্টারের ৪০ নম্বরের সূতা মাত্র। অনেকে উল, কার্পেট বুনেন। কিন্তু তাহাতে সময় এবং অর্থের অনুরূপ আয় হয় কি? চরকা কাটিয়া যদি একটি পরিবারের বস্ত্রাভাব দূর হয়, তবে সে কি কম লাভ? বস্ত্র ত কতই পরি, তাহাতে মাত্র লজ্জা নিবারণ হয়; কিন্তু বাড়ীর তুলায়, ঘরের সূতায় প্রস্তুত কাপড় পরিয়া যে প্রকৃত (Positive) আনন্দ পাই তাহা কি কলের কাপড়ে পাই?

পল্লীগ্রামে এখনও অনেকে কাঁথা সেলাই করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করেন। অনেকে তাহাতে এমন নিপুণতা দেখান যা বাস্তবিকই অদ্ভুত। এই সব কাঁথা মনোযোগ অভাবে আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎকৃষ্ট হয় না। লোকেরও দৃষ্টি ক্রমে অন্যদিকে যাইতেছে, যাহার বিছানায় যত দামী তোয়ালে বা চাদর পাতা থাকে তাহাকে তত সৌখীন মনে করি, কিন্তু এইসব মনোহর কারুকার্য্য-খচিত কাঁথা দেখিলে মুখ টিপিয়া হাসি। ইচ্ছা করিলে এই সব শিল্পকে পুনরায় বাঁচান যায় না কি? অনেকে সুন্দর সুন্দর সিকা তৈয়ারী করিতে পারেন, তাহাতেও বিচিত্র নিপুণতা প্রকাশ পায়।

রথ, চৈত্রসংক্রান্তি প্রভৃতি পার্ব্বণে গ্রামে গ্রামে যে সব মেলা বসে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে মাটির পুতুল বিক্রীত হয়। অনেকেই ইহা বিনা পরিশ্রমে প্রস্তুত করিতে পারেন। যাঁহারা

সাধারণতঃ বিক্রয় করিতে আনেন তাঁহাদের হাতে পুতুলের দুর্দ্দশা অনেকেই দেখিয়াছেন,—চোখের কালি মাথায় এবং ঠোঁটের লাল্ দাগ কপালে পড়ে। এবার চৈত্রমেলায় আমি পাখী বলিয়া একটি মাটীর খেলানা আনিয়াছি, তাহার পিঠ কুমীরের মত, ঘাড় কুকুরের মত এবং মুখ দেখিয়া তাহাকে হাঁস বলিয়া ভুল হইবে। বুদ্ধিমতী মহিলাগণের হাতে পড়িলে এ শিল্পের বোধ করি এরূপ দুর্দ্দশা থাকিবে না। অনেকস্থলে নারিকেল গাছের খুব প্রাচুর্য্য, তাঁহার পাতায় ঝাঁটা তৈয়ারী করিলে প্রচুর আয় হইতে পারে।

আমাদের দেশে আচার, আমসত্ত লোকে খুব ভালবাসে। সর্ব্বত্রই ইহার প্রচলন। অথচ দেখিতে পাই প্রতিবৎসর প্রচুর কাঁচা আম ঝড়ে পড়িয়া নষ্ট হইতেছে, এদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। আমের আচার উৎকৃষ্ট হইলে যে আমের চেয়েও রসনা তৃপ্তিকর হয়, ইহা অনেকেই জানেন। যদি বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা যায়, তবে ইহা অতি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়া শুধু বিধবার নয়, অনেক বেকার ভদ্র যুবকেরও অন্নসংস্থান হইতে পারে। এইরূপ মাত্র আমের নয়, কুল, চালতা, আমড়া, তেতুল' প্রভৃতিরও অতি উৎকৃষ্ট আচার হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এদিকে কেহ ফিরিয়াও চাহেন না।

সেলাইএর কলের দাম অনেক কমিয়াছে। কেহ কেহ তাহার ব্যবহারও করিতেছেন। কিন্তু আরও অধিক প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এইরূপ কত শত শিল্প আছে যাহা শ্রমসাধ্য নয়, ঘরের মধ্যে বসিয়াই সম্পন্ন করা যায়, এবং মুখ্যভাবে অর্থোপার্জ্জন না হইলেও সংসারের অনেক খরচ বাঁচিয়া যায়। আলস্য, পরনিন্দা, কলহ, প্রভৃতি ভুলিয়া এই সবে মন দিলে সংসারের শান্তি কতকটা ফিরিয়া আসিতে পারে।

দেশে নারীদের জন্য নানাবিধ আশ্রম হইতেছে। কিন্তু পল্লীগ্রামের নিরাশ্রয়া বা বিধবাগণ যে সহজে আত্মীয়বর্গ বা প্রতিবাসিগণের সান্নিধ্য ছাড়িয়া সহসা এই সব আশ্রমে আসিবেন আমার তাহা মনে হয় না। তাঁহারা এই প্রকার সামান্য সামান্য কার্য্যে মনোযোগ দিলে সচ্ছন্দে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারেন। যাঁহারা ভগবানের কৃপায় পতিপুত্রশালিনী তাঁহারাও আলস্যে সময় না কাটাইয়া এইরূপে কাজ করিয়া পতিপুত্রের ভার কথঞ্চিৎ লাঘব করিতে পারেন।

ধিক্কৃত

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ।

কণ্ঠ হ'তে ঝুটা মোতির মালা
খুলিয়া সবে লইল যবে কঠিন রূঢ় করে
তুলিয়া দিয়া মিথ্যা গ্লানির ডালা—

মাথার পরে পূর্ণ করি, অঙ্গে দিল আঁকি
বিপুল ঘৃণা মসীর ছাপে ছাপে,
টানিয়া দিল বাহির করি আসন হতে তুলি
রুধিয়া দ্বার কঠিন অভিশাপে—

কৃত্রিমতার বাঁধন যত লূতার মত বেড়ি
ছেয়ে যে ছিল হাজার পাকের ঘেরে,
গরল শ্বাসে জ্বলিয়া গেল, ভস্মস্তূপে তারি
প্রভাত তোমার আসিল নামি ধীরে!

শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্র

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

শরৎচন্দ্র শরচ্চন্দ্রের মত বাঙ্‌লার সাহিত্যাকাশ আলো করে বসে আছেন। তাঁর লেখা পড়তে ইচ্ছুক নন এমন সাহিত্যিক আছে বলে ত আমাদের মনে হয় না। যে কোন লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখগে তাঁর প্রত্যেক পুস্তক দু-তিন কপি করে সংগৃহীত, তাও আবার হাতে হাতে বিলি, সেল্‌ফে বই ওঠেনা বা মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিশ্রামের অবসর পায় না। সুদূর মফঃসল হতে আত্মীয়ের নামে চিঠি আসচে বাড়ী যাবার সময় একসেট্ শরৎ চাটুর্য্যের গ্রন্থাবলী নিয়ে যেতে; পল্লীস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাইব্রেরীর কর্ত্তারা হাঁ করে বসে আছেন্—কবে শরৎবাবুর আর একখানি পুস্তক প্রকাশিত হবে; ডেলিপ্যাসেঞ্জারের দল শরৎচন্দ্রের উপন্যাস হাতে করে ট্রেনের নিত্য-নৈমিত্তিক সহস্র অসুবিধা অম্লানবদনে সহ্য করে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন। শারদীয় পুস্তকাবলী সমগ্র জাতিটার মধ্যে একটা মাদকতা এনে দিয়েচে।

শরৎবাবুর এ সফলতার কারণ কি? তার প্রধান কারণ তিনি যে কটি বস্তুকে কেন্দ্র করে বিরাট সাহিত্যক্ষেত্র প্রস্তুত কর্চ্চেন সেই কটি বস্তুর মত মধুর জিনিষ ইহসংসারে আর কিছু আছে বলে আমাদের মনে হয় না। এই বস্তুকয়টি চিত্তের অতি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি এবং মূলতঃ এক হলেও বাহ্যতঃ বিভিন্ন প্রকার। তাদের নাম—প্রীতি, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা, প্রণয়, অনুরাগ, অভিমান ও সহানুভূতি। তিনি বুদ্ধিমানের মত পুরাণ 'নভেলিষ্টদের' মামুলী মসলা—প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ, জিঘাংসা, রিরাংসা প্রভৃতিকে একপাশে ঠেলে রেখেচেন,—বিশেষ প্রয়োজনে একটু আধটু কেবল ব্যবহার করেন, তাও স্বকীয় বস্তুকয়টির পুষ্টিসাধনোদ্দেশ্যে

শরৎচন্দ্রের পুস্তকাবলীর বহুল প্রচারের দ্বিতীয় কারণ—তাঁর প্রত্যেক পুস্তকে ভাষা-সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে দুটী করে অবান্তর বিভাগ থাকে—একটী সমাজ সম্বন্ধে এবং অপরটী মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে। সাহিত্যিকর্তায় তাঁর নিপুণ হস্ত যেমন স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ গতিতে চলাফেরা কর্ত্তে পারে তেমনি আবার প্রত্যেক পুস্তকে তিনি ভবিষ্য সমাজের উপযোগী এমন এক একটী চিত্র অঙ্কিত করে বসেন যা পড়্‌তে লোকের যেমন আগ্রহ হয়, আবার পড়ে ভাবনা চিন্তায় তেমনি ভরপুর হয়ে যেতে হয়। শরৎবাবু বক্তৃতামঞ্চে সমাজসংস্কারের সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন না বটে কিন্তু সাহিত্যের সাহায্যে এমন নূতন নূতন চরিত্রের অবতারণা কর্ত্তে সুরু করে দিয়েচেন যা পড়ে কেউ তাঁকে 'কালাপাহাড়' বল্‌চে, কেউ তাঁকে 'অশ্লীলতার অবতার' বলচে, আবার কেউ বা বল্‌চে 'শরৎবাবু যথার্থ সমাজসংস্কারকগণের অগ্রদূত।'

আমরা অনেক সাহিত্যিকের সহিত আলোচনা করে দেখেচি, সকলেরই বিশ্বাস শরৎবাবু এমন কতকগুলি স্ত্রীচরিত্র অঙ্কিত করেচেন যার ফলে নারী-সমাজে একটা বিশেষরকম ওলট পালট এসে পড়বে, তবে কেউ তাতে ভয় পাচ্ছেন আর কেউবা আশা-উৎফুল্ল-নেত্রে সেই ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আছেন, কখন শারদীয় আদর্শ বাঙলার সমাজ অবনত মস্তকে গ্রহণ করে নির্ভীকভাবে চল্‌তে আরম্ভ কর্ব্বে।

শরৎবাবুর অন্তরের কথা কি? কোন্ কল্পনা-লতাটীকে সমাজক্ষেত্রে বদ্ধমূল করে দেখার জন্যে তিনি আজীবন সাহিত্য সাধনায় ব্রতী আছেন? আমার মনে হয় কেবলমাত্র একটি জিনিষ তাঁর বাচ্য, তাঁর সাধ্য,—সেটী হচ্ছে এই যে ভালবাসা

স্বর্গীয়, স্বচ্ছ ও এক এবং এই ভালবাসার মধ্যে বৈধ অবৈধের রেখা টানা যায় না। এই ব্যাপারটীকে প্রমাণ কর্ব্বার জন্তে তিনি আর একটী বদ্ধমূল সমাজ-বৃক্ষকে একেবারে প্রভঞ্জনের মত উৎপাটিত করে "ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখা" করে তুলেচেন। সে জিনিষটী হলো—"সতীত্ব"। তিনি দেখাতে চান যে সতীত্ব জিনিষটী একটা হীরকখণ্ডের মত বজ্র কঠোর প্রস্তর বিশেষ, একে সহজে ভাঙাও যায় না এবং আগুনে পুড়িয়ে ছাই করাও যায় না, এর মধ্যে একটা বিরাট অন্তঃসারতা আছে।

শরৎবাবুর ভাষার মধ্যে এমন মধুরতা কেন বলতে পারেন? পুরুষ বা নারী যে অবস্থায় যে ভাবে কথা কয় তিনি ঠিক সেই ভাবের ভাষা প্রয়োগ কর্ত্তে পারেন বলে। সাহিত্য-লেখকদের কেমন একটা ভ্রান্ত ধারণা যে, কথিত ভাষাকে অলঙ্কার ভূষিতা না কর্ত্তে পারলে বুঝি ভাষার কদর থাকে না। শরৎবাবু সে পথকে উরগক্ষত আঙুলের মত অম্লানবদনে বর্জ্জন করেচেন। তাই তাঁর 'বিরাজ বউ' হাসতে হাসতে স্বামীকে বলতে পেরেচে—"তুমি কম সয়তান!" সাবিত্রী সতীশের মত দুষ্ট, দুর্দ্দান্ত, অবোধ ভাইটির কাণ্ড দেখে ব্যাকুল অন্তরে, উপরদিকে চেয়ে বলতে পেরেচে—"ভগবান, স্বাক্ষী থেকো!" নারীদের কতকগুলি মিষ্টমধুর বাঁধাবুলি আছে, সেগুলি তাদের অপূর্ব্ব স্বর ও ভঙ্গিমার সাহায্যে যেমন ভাবে উচ্চারিত হয় শরৎবাবু ঠিক তেমন ভাবেই বইএ লিখেচেন।

শরৎবাবুর ভাষা, তাঁর মনের কথা, তাঁর চরিত্রাবলী—এই তিনটী বিষয় নিয়ে পৃথক পৃথক বহুল সমালোচনা হয়েচে, হচ্চে এবং হবেও। আমাদেরও ইচ্ছা আছে, সময় এবং সুযোগ পেলে এই সব বিষয়ে গোটাকতক কথা বলবো। এখন তাঁর চরিত্রাবলী বিশেষতঃ "নারী-চরিত্রের" সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলে এই প্রবন্ধ শেষ করে যাই। সকলেই একবাক্যে বলে থাকেন শরৎবাবু নারী-চরিত্র বিশ্লেষণে মনস্তত্ত্বের চরমোৎকর্ষ দেখাতে পারেন। আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে তা স্বীকার করি। শরৎবাবু যে সমস্ত চরিত্রাংশ ফুটিয়ে তুলেচেন তাঁর অধিকাংশই বাস্তব সত্য এবং দৈনন্দিন জীবনের স্বাক্ষীস্বরূপ। সত্য বলতে কি আমার পরিচিত মহিলাদের মধ্যে কাকেও আমি 'সাবিত্রী', কাকেও 'বিরাজ', কাকেও 'বিন্দু', কাকেও 'রাজলক্ষ্মী', কাকেও 'জ্যাঠাই মা' বলে মনে করি।

যাক্ বাজে কথা। এখন শরৎবাবুর নারী-চরিত্রের গোটাকতক বিশেষত্বের বিষয় উল্লেখ করে এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করি। শরৎবাবু দেখাতে চান—

১। নারীর ভালবাসা একটী বাস্তব পদার্থ। স্ত্রীপুরুষের মিলনে নারীর হৃদয়ে যদি একবার অনুরাগ জন্মে যায় তবে সেই অনুরাগ সহস্র বাধা বিঘ্নের মধ্যেও সমান ভাবে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হতে থাকে। দেশ ও কালের ব্যবধান এই অনুরাগকে কোনরূপ ক্ষীণ বা বিনষ্ট কর্ত্তে পারে না।

২। নারী কখনো প্রতিশোধ নিতে জানে না। যদি পুরুষের উপর প্রতিশোধ নেবার প্রবৃত্তি তার মধ্যে জেগেও ওঠে তবে সেই প্রতিশোধ এমনভাবে নিয়ে থাকে যাতে নিজেরই সর্ব্বনাশ ছাড়া আর বেশী কিছু কর্ত্তে পারে না—পুরুষের অনিষ্ট করা তার সাধ্যে ঘটে না।

৩। নারী কখনো অলভ্য বস্তুকে লাভ কর্ব্বার জন্য লালায়িত হয় না। যদি বিধির বিড়ম্বনায় এমন কোন পুরুষের উপর স্নেহ-প্রবণ হয়ে পড়ে যাকে স্নেহের অতিরিক্ত একবিন্দু অপর কিছুই দেবার অধিকার তার নেই, তবে সেই পুরুষের সহস্র অনুরোধও তাকে কেবল স্নেহ ছাড়া আর কিছু সে প্রাণান্তেও দেবে না; নিষ্ঠুর নির্ম্মম হৃদয়ে তার কাতর প্রার্থনা পদদলিত কর্ব্বে!

৪। ভাব-গুপ্তিতে নারী অদ্বিতীয়। যদি বাল্যকালের মেলামেশা হতে কোন পুরুষের উপর তার অনুরাগ জন্মে এবং পরে যদি সে বুঝতে পারে

এ অনুরাগ তার পক্ষে অবৈধ, তবে সেই পুরুষের সঙ্গে এমনভাবে শত্রুতা কর্ব্বে যাতে তার হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে গেলেও জগৎ দেখবে এরা দুজনে সাপে নেউলে, বা আদায় কাঁচকলায়।

৫। নারী রূপ অপেক্ষা গুণেতেই বেশী মুগ্ধ, আবার গুণ অপেক্ষা নির্গুণে আরো মুগ্ধ। যে লোক সংসারে উদাসীন, দুষ্ট, বালকসুলভ চপল, অলস, ভবঘুরে, তাকে সংসারী কর্ব্বার জন্য, তাকে স্নেহ যত্ন কর্ব্বার জন্য নারীর প্রাণ আপনা হতেই ব্যাকুল হয়ে পড়ে। তাকে সহস্র বিপদ হতে উদ্ধার কর্ব্বার জন্য নারী নিজের বুক সর্ব্বাগ্রে পেতে দিয়ে বসে।

এইবার এই বিশেষত্বগুলি উদাহরণ দ্বারা বোঝাতে চেষ্টা কর্ব্বো। পাঠকপাঠিকা প্রথম বিশেষত্বটী মনে করুন। একটা পিলেরুগী পেট-মোটা বাচ্চা মেয়েকে শ্রীকান্ত ছেলেবেলায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে বেড়াত, সহস্রভাবে উৎপীড়ন করে তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিত কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সেই মেয়েটা—সেই রাজলক্ষ্মীটা মনে মনে এই উৎপীড়ক ছেলেটাকেই ধ্যান ক'র্ত্তো। তারপর সেই রাজলক্ষ্মী বিখ্যাত সুন্দরী, বিখ্যাত গায়িকা পিয়ারীবাইজী হয়ে উঠলো, আর বহুকাল পরে ঘটনাচক্রে শ্রীকান্তও তারই বাড়ীতে এসে উপস্থিত! পিয়ারী এক দৃষ্টিতে তার সেই ধ্যেয় বস্তুকে চিনে নিয়ে চিরকালের জন্য তারই চরণে আত্মবিক্রয় করে দিলে; তাকে কোথাও যেতে দেবেনা, চক্ষের আড়াল কর্ত্তে দেবে না—সে যখন পালিয়ে গেল, তখন সে কেঁদে কেঁদে পাগলিনী হল।

কিরণময়ী উপেনের উপর অভিমান করে তাকে জব্দ কর্ব্বে। উঃ, সে কি জব্দ! কি প্রতিশোধ! দিবাকরকে নিয়ে বর্ম্মায় পলায়ন! কেমন উপেন, তুমি জব্দ হলে কি না? তারপর উন্মাদিনী হয়ে পথে পথে ভ্রমণ! এইবার উপেন? উপেন পরপারে চলে গেল, কিরণময়ী পাগলাগারদে ঢুকলো।

সাবিত্রী মনে জানে বুঝেছিল সতীশকে স্নেহ যত্ন ছাড়া আর অধিক কিছু দিবার অধিকার তার নেই। সতীশ সাবিত্রীর নিকট হতে আরো অধিক পাবার জন্যে কি কাণ্ডই না কর্লে! দুর্দ্দান্ত সতীশ,—চরিত্রহীন সতীশ সাবিত্রীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অঙ্গার করে তুলতে লাগল, কিন্তু কিছুই আদায় কর্ত্তে পার্লে না, শেষ পর্য্যন্ত সেই এক জিনিষ—স্নেহযত্ন।

কঠোর পল্লীসমাজের বিধবা রমা দেখলে রমেশ,—তার সহস্র অশান্তির মূল রমেশ আবার ঘুরে ফিরে দেশে ফিরে এলো এবং এসে বসবাস কর্ত্তে সুরু করে দিল। রমার মাথায় বজ্রাঘাত পড়লো, একে যে আর কাছে ডেকে 'রমেশ দা' বলবার অধিকার তার নেই! তাই এমনি শত্রুতা সুরু করে দিল যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তা দেখে অবাক হয়ে গেল, রমেশ নিজে স্তম্ভিত হয়ে ভাবলে এই কি সেই রমা! বিধির বিড়ম্বনা বটে!

সাবিত্রী দুষ্ট, দুর্দ্দান্ত, সংসারে উদাসীন, অমিতব্যয়ী সতীশকে নিয়ে কি জ্বালাতনেই না পড়েছিল কিন্তু তা সত্বেও তার সেই অবাধ্য ভাইএর জন্য সদাসর্ব্বদা তার একটী চক্ষু আর একটী হাত উন্মুক্ত করে রেখেছিল।

আমি মোটামুটী কয়েকটি বিশেষত্বের উল্লেখ ক'র্লাম এবং উদাহরণ সমেত তা বুঝিয়ে দিলাম। আরো অনেক বিশেষত্ব আছে, সব বর্ণনা কর্ত্তে গেলে প্রবন্ধের কলেবর সুবৃহৎ হয়ে পড়ে।

মোটকথা শরৎবাবু নারী-চরিত্র বিশ্লেষণে যে অদ্বিতীয় এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত। তবে তিনি অনেক সময় অত্যন্ত এক্স্‌ট্রীমে উঠে পড়েছেন এবং তা হতে অনেক বিষয়ে অবাস্তবিকতার ছায়াপাতও হয়েচে। এসম্বন্ধে এবং শরৎবাবুর নারী-চরিত্র সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত আলোচনা বারান্তরে করা যাবে।

প্রত্যাবৃত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(১০)

বিজয়ার দিন নয়টার ট্রেণে সরিত বহরমপুর ষ্টেশনে নামিয়া পড়িল।

বহুদিন পরে সে নিজের দেশে ফিরিয়াছে। অসীমের জন্ম তাহার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে নিজেই জানিত না অসীমকে সে এতটা ভালবাসে। যখন সে দেখিল অসীম কি জানি কেন তাহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন সে কিছুদিন তাহার নিকট হইতে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করিল। ছোট বেলা হইতে এ বাড়ীতে যাতায়াত করিয়া সে আপনার লোকের ন্যায়ই হইয়া গিয়াছিল। কিছুদিন দূরে গিয়া সেই ভাবটা বিসর্জ্জন দিয়া সে পরের ন্যায় আসিতে ইচ্ছা করিয়াছিল।

সে পূর্ব্বেই অসীমকে পত্র দিয়াছিল যে সে বিজয়ার দিনে নয়টার ট্রেণে বহরমপুর পৌছাইবে। ট্রেণ হইতে নামিবার সময়ও তাহার খুব আশা ছিল অসীম আসিয়াছে। কিন্তু নামিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল অসীম আসে নাই।

মুহূর্ত্তের জন্ম তাহার মনে হইল অসীম বোধ হয় তাহাকে এখনও সেই বিরক্তিপূর্ণ নেত্রে দেখিতেছে। সে যে দার্জ্জিলিং হইতে কত উচ্ছ্বাসময় পত্র প্রেরণ করে, তাহার উত্তর লেখা থাকে সামান্ত দুচার লাইন মাত্র। নেহাৎ না দিলে নয় তাই অসীম যেন বাধ্য হইয়া উত্তরটা দেয়। সে যে যথার্থ বন্ধুর মত অসীমকে ফিরাইতে গিয়াছিল, তাহার মনের অন্ধকার দূর করিয়া দিতে গিয়াছিল তাহা অসীমের নিশ্চয়ই বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে।

সরিত চুপ করিয়া একটুখানি দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে ষ্টেশনের বাহিরে আসিল।

বাড়ী হইতে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্ম গাড়ী আসিয়াছিল। আর একবার একটী নিশ্বাস ফেলিয়া সে গাড়ীর পাদানে পা রাখিয়া সবেমাত্র উঠিতে যাইতেছে, সেই সময় কাহার আহ্বান তাহার কাণে আসিল "ওহে সরিত, বলি, কাণে কি কম শুনছ নাকি, না সাহেব হয়ে গেছ দার্জ্জিলিংয়ে থেকে, বাঙ্গালী বন্ধুদের কথা আর কাণে যাবে না?"

সরিতের হৃদয়খানা কাঁপিয়া উঠিল। খুব আশা করিয়া সে মুখ ফিরাইল, কিন্তু সে অসীম নয় সুধীর। সুধীর ততক্ষণে কাছে আসিয়া পড়িল। সরিতের পৃষ্ঠে একটা চপেটাঘাত করিয়া বলিল "দেখ দেখি, চিনতে পারবে?"

সরিত আপনাকে সামলাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিল "ভয় নেই। সাহেবী পোষাকে থাকলেই সাহেব হয় না, এর মধ্যে সেই বাঙ্গালীরই হৃদয় আছে।"

সুধীর তাহার পোষাকের পানে চাহিয়া বলিল "এ পোষাক তোমাকে কখনই মানায় না সরিত। যে বাঙ্গালী বলে নিজের গর্ব্ব করে, তার গর্ব্ব অক্ষুন্ন রাখতে বাঙ্গালীর সোজাসুজি কাপড় চাদর ভাল। তোমার যে বাঙ্গালীর হৃদয় আছে তা জানা যাচ্ছে না, কারণ সেটা লুকিয়ে আছে এই পোষাকটার অন্তরালে। বাঙ্গলামায়ের সন্তান যারা তারা

সর্ব্বাংশে বাঙ্গালীই থাকবে, সেটা তোমায় মনে করিয়ে দিতে হবে না নিশ্চয় ?"

সরিত অপ্রস্তুত ভাবে টুপিটা গাড়ীর মধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলিল "ঠিক কথা বলেছ। আমরা যেন বর্ণসঙ্কর হয়ে যাচ্ছি দিন দিন। মনটা থাকে বাঙ্গালী, পোষাকটা হয় সাহেবী। ভয় হয় পাছে কাপড় চাদরে কেউ না মানে। শূন্যগর্ভ মানটাই চাই কিনা, আসল কাজের লোক হতে গেলে যে দীনতাই দরকার, সে-ই যে আমাদের উচ্চ সম্মান দেবে, তা বুঝিনে। যাক আক্কেল হয়ে গেছে খুব।"

সুধীর হাসিয়া বলিল "আর নিজের লোকদের ছেড়ে পরের কাছে বসা এটাও ভাল নয়। তোমার পয়সা আছে, তুমি বড়লোক, তা বলে তুমি যে একেবারে সাহেবদের মাঝখানে গিয়ে বসবে, সেটাও কোন রকমে মানায় না। থার্ডক্লাস, ইণ্টারক্লাশ এই দুটো যখন বাঙ্গালীরই, তখন বসতে হবে, তাদেরই মাঝখানে। তোমার পয়সা আছে, তুমি বিদ্বান ব'লে সাহেবরা আদর করে তোমায় কাছে বসাবেন, আর যারা তোমারই এক একটী ভাই, তাদের পয়সা নেই, তারা লেখাপড়া জানেনা বলে তাদের 'বি অফ্, ইউ ব্লাডি নিগার' বলে তাড়িয়ে দেবেন। তোমার তখন অনুভব করা উচিত যে—"

সরিত হাতযোড় করিয়া বলিল "তোমার পায় পড়ি সুধীর, আর ওসব কথাগুলো তুলো না। আমি ঠিক বলছি আমার আসন ওই থার্ডক্লাসের ভারতবাসীর মধ্যে, দেখে নিয়ো এবার হতে।"

সুধীর তাহার পকেটের পানে লক্ষ্য করিয়া বলিল "আর পয়সা আছে বলে তুমি যে দেশী বিড়ি ফেলে, দেশের কথা ভুলে বিলাতি সিগার খাবে, তাতেও নিজেকে খাঁটি স্বদেশী বলতে পারবে না তা আমি বলে দিচ্ছি।"

সরিত সিগার-কেসটা বাহির করিয়া সম্মুখস্থিত ফুলবাগানে ছুড়িয়া ফেলিল। ফিরিয়া বলিল "আজ হতে বিড়িই ধরব। আর কি বলতে চাও বলে ফেল।"

সুধীর তাহার ভাব দেখিয়া হাসিতেছিল, বলিল "বলতে গেলে এখনও ঢের আছে। আমরা দিন দিন এত বিলাসী হয়ে পড়েছি যে ছোট খাট অনেক জিনিস মোটে কেয়ারে আনি নে। প্রতিদিনকার অভ্যাসগুলি—হেস না যেন আমার কথা শুনে, যেমন ঘুম থেকে ওঠা, মুখ ধোওয়া, স্নান করা, অভ্যাসমত চা খাওয়া, ঢের জিনিস আছে যাদের সঙ্গে আমাদের দেশের আগে কখনও পরিচয় ছিল না, অথচ আমরা তাকেই দেশের জিনিস বলে দেশে চালাতে চাই।"

সরিত একটু হাসিয়া বলিল "তুমি তো আগে এত ন্যাশানালিষ্ট ছিলে না সুধীর, হঠাৎ হয়ে উঠলে কি করে তাই ভাবছি!"

সুধীর বলিল "একটা ঝড় উঠেছে যে দেখতে পাচ্ছো না ? আজকাল ন্যাশানালিষ্ট প্রত্যেকেই। প্রকৃত যে কয়টী, তাই দেখা হচ্ছে আসল কাজ। সে যাই হোক, তা দেখবার জন্যে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই, আমরা ঠিক নিজের কাজ করে গেলেই হল। তুমি এখন এখানে থাকবে তো ?"

সরিত একবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল "সবে তো এই ট্রেণ থেকে এসে নামলুম, এখনই জিজ্ঞাসা করছ কতদিন থাকব ?"

সুধীর হাসিয়া বলিল "তোমার খেয়ালই যে অপূর্ব্ব। হয় তো আবার সন্ধ্যার ট্রেণে চলবে কলকাতায়। কাজেই জিজ্ঞাসা করতে হয় থাকবে কি না ?"

সরিত বলিল "উপস্থিত জেলা ছেড়ে কোথাও যাচ্ছিনে। দুই একদিন বিশ্রাম করে পাড়াগাঁগুলো বেড়াতে যাব।"

সুধীর বলিল "আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ হবে কি ?"

চকিতে আজ কয়েকমাস পূর্ব্বকার একটী দিনের

কথা সরিতের মনে জাগিয়া উঠিল। সেদিন কে জানিত অসীম তাহার কাছ হইতে দূরে সরিয়া যাইবে?

সরিত বিমর্ষভাবে বলিল "যাব তো ইচ্ছে আছে, দেখি কতদূর কি করে উঠতে পারি। এখন ঠিক করে কিছুই বলতে পারব না। কি জানি আজ তোমায় কথা দিয়ে যাব, রাত্রেই যদি মরে যাই।"

সুধীর আবার তাহার পিঠে একটা চড় মারিয়া বলিল "ফের ওসব কথা বলবে যদি, ভাল হবে না। মরবে মরুক অপদার্থ বড়লোক গুলো, যারা দেশের পানে ফিরে চায় না, দেশের দুঃখীর অবস্থা বুঝে দেখে না, নিজেদের উচ্চতার অহঙ্কার মনে জাগিয়ে, মাথায় সম্মানের বোঝা নিয়ে পরের অনুকরণ করে বেড়ায়। তোমার উপরে আমরা অনেক আশা রাখি ভাই, তুমি যে দেশের ছেলে, দেশের কাজ করবে এ আমি বেশ বলতে পারি।"

সরিত তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল "থাক, অতটা গর্ব্ব ক'র না। জানতো, মানুষের মন সব সময় সমান থাকে না। আজ আমি খেয়ালের বশে দেশের ছেলে হয়ে কাজ করব, কাল আবার হয়তো দেশের শত্রু হয়ে দাঁড়াব। আকাশে এখনও মেঘ আছে, আমার মধ্যে এখনও বিলাসিতার আক্রমণ আছে। যখন আমি আমাকে শেষ শয্যায় শায়িত করতে পারব দেশের কাজ করে, তখন আমার প্রশংসা কোরো। বেঁচে থাকতে আমার কথা যেন মুখে এনো না। ওতে আমায় দুর্ব্বল করবে বই সবল করতে পারবে না।"

মুখখানা সরাইয়া লইয়া সুধীর বলিল "সে ভাল কথা। যাক, এ কথা ছাড়ছি, এখন সংসারের কথা দুটো বলি। এই তো উপযুক্ত সময়; বিয়ে করলে না, কিছু না। এটা কি বড় ভাল কাজ হচ্ছে তোমার?"

সরিতের মুখখানা অন্ধকার হইয়া আসিল। সে বলিল "বিয়ে ক'রে লাভ?"

সুধীর মুখখানা নানা রেখায় রঞ্জিত করিয়া বলিয়া উঠিল "লাভ? লাভ যথেষ্ট। দেশের কাজে যেমন ছেলের দরকার, মেয়েরও তেমনি দরকার। দুখানা হাতে যে কাজ করবে, চারখানা হাতে সে কাজটা কত অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে যাবে মনে ভেবে দেখ দেখি।"

সরিত বলিল, "সহায় লাভের কথা বলছ তো? তোমরাও তো আছ। আমি যদি হাঁফিয়ে পড়ি কোন কাজ করতে, তোমাদের ডাকব। বিয়ে করে একটা সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে আমার একটুও নেই ভাই।"

সুধীর সদুঃখে বলিল "আমাদের কথা বলেই ঠেলতে পারছ। যদি তোমার মা বাপ থাকতেন, তাঁদের কথা কোন মতেই ঠেলতে পারতে না। সংসারে একটা মোটে বোন, সেও বয়সে ঢের ছোট, একটা তাড়া দিলেই কোথায় লুকাবে।"

ভগিনীর কথা শুনিয়া সরিতের মুখের অন্ধকার দূর হইয়া গেল; হাসিতে তাহার মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল "ওঃ, তাই ভাবছ তুমি? বিনীতাকে তেমন মেয়ে ভেব না যে একটা তাড়া দিলে পালাবে। সে উল্টে আমাকেই এমনি শাসন করে যেন আমিই তার ছোট ভাই। বাস্তবিকই তাকে আমি ভয় করে চলি। আর ভয় না করলেই বা উপায় কি? তার প্রধান অস্ত্র আছে চোখের জল; পাছে সে অস্ত্র বার করে, এই ভয়েই আমায় অস্থির থাকতে হয়।"

সুধীর বলিল "অসীম কেন যে আজ ষ্টেশনে আসেনি আমি তাই ভাবছি। আমায় সে কাল বিকেলে তোমার পত্রখানা দেখিয়ে, বললে 'তুমি যদি ভাই দয়া করে একটু ষ্টেশনে যাও।' তার কথা শুনেই আমি আসলুম। কি যে হয়েছে তার তা জানিনে, তাদের বাড়ীতেই একটা গোল বেধেছে। ললিতবাবুর মুখখানাও তেমনি অন্ধকার। অবশ্য বাড়ীর ভেতরের খবর যদিও আমি কিছু জানি নে, তবু আন্দাজে বুঝতে পারছি সেখানেই

গোল বেধেছে। তুমি তো যাও, তাদের বাড়ীর মধ্যে—"

বাধা দিয়া সরিত বলিয়া উঠিল "যেতুম বটে। সেটা পাষ্টএ চলে গেছে, প্রেজেন্টের মধ্যে আর নেই, কিম্বা ফিউচারেও থাকবে না।"

বিস্মিত হইয়া সুধীর বলিল "তোমাদের সবাই এক একটী হেঁয়ালী। যাই হোক্ আমার পরের কথা বলবার বিশেষ দরকার নেই, তোমার কাছে সবই প্রকাশ পাবে এটা ঠিক কথা। আমি এখন তাহলে যাচ্ছি, বিকেলে বিসর্জ্জনের পরে আবার দেখা করবখ'ন।"

সরিত তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল "গাড়ীতেই চল না কেন? তোমাদের বাসার কাছে নামিয়ে দিয়ে যাব। আমাকেও তো সেই রাস্তাতেই যেতে হবে।"

সুধীর মাথা নাড়িয়া বলিল "উঁহু। আমার এদিকে যেতে হবে এক বন্ধুর কাছে, বিশেষ রকমের দরকার আছে, নইলে এমন করে আরামে গাড়ীতে বসে যাবার প্রলোভনটা ত্যাগ করতুম না। বিকেলে নিশ্চয়ই যাব ভাই। খাবার আয়োজনটা যেন করা থাকে, এখন হতেই বলে রাখছি।"

সরিত তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া বলিল "নিশ্চয়ই। কোন্‌দিন শুধু মুখে ফিরেছ, বল দেখি?"

সুধীর বলিল "সেটা তোমার দয়ায় নয়, তোমার বোনের দয়ায়। তুমি তো গলাধাক্কা দিয়ে তাড়াতেই চাও হে, ভাগ্যে সে ছিল তাই খেতে পাওয়া যায়।"

সে চলিয়া গেল। কোচম্যান গাড়ী ছুটাইল।

(ক্রমশঃ)

জননী

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

জয় মা জননী জয় মা জয়!
লক্ষ যুগের কলুষ, তোমার
পুণ্য পরশে হয় মা ক্ষয়!

ধরার মলিন ধূলিরাশি যবে
আসে উপহাসি' হা-হা কলরবে,
তোমারি-চিন্তা-শান্তি-ধারায়
সকল বেদনা হয় মা লয়!
জয় মা জননী জয় মা জয়!

আঁধার যখন আবরে অবনী,
গরজে অশনি, ঝঞ্ঝা বয়,
সে আঁধার মাঝে তোমারি চরণ
আর্ত্তজনের স্মরণ হয়!
পিতা কভু ছাড়ে মমতা ভুলিয়া,
তুমি তবু কোলে লওত তুলিয়া,
স্নেহ যে তোমার সর্ব্ব-বিজয়ী
তার কাছে কিছু নয় মা নয়!
জয় মা জননী জয় মা জয়!

হিন্দুমহিলা-জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ৺আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতির স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র পড়িয়াছিলাম। সেই পত্রে তাঁহারা একটি হিন্দুমহিলা-জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দেশবাসীর নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় দেশের কেহ টাকাকড়ির সাহায্য করিয়াছিলেন কিনা জানি না, তবে আবেদনপত্রে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নাম দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, যখন অনন্ত কর্ম্মী আচার্য্যদেবের ন্যায় লোক এই সদনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন তখন ইহা নিশ্চয়ই "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায়" পর্য্যবসিত হইবে না। কিন্তু আমাদের সকল আশাই আকাশকুসুমে পরিণত হইয়াছে, আচার্য্য রায়ের মুখে আর সে বিষয়ে উচ্চবাচ্য শুনিতে পাই না। এদিকে দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুযায়ী স্ত্রীশিক্ষা দিবার জন্য দেশের মধ্যে যে প্রবল আগ্রহের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট আভাষ চতুর্দ্দিকেই দেখা যাইতেছে। নিতান্ত গোঁড়া ব্রাহ্মণও যিনি, তিনিও এখন মেয়েদের বাল্যবিবাহের ঘোরতর বিরোধী এবং কি করিয়া অনূঢ়া, অবিবাহিতা কুমারী মেয়েদের আর্য্যধর্ম্মানুমোদিত শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে তাহার উপায় চিন্তা করিতেছেন। ডাঃ গৌরের "কনসেণ্ট বিলের" সমর্থন অনেক গোঁড়া হিন্দু পর্য্যন্ত করিয়াছেন, কেন না জগতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক চেতনার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া এখন তাঁহারা প্রাণে প্রাণে এ সত্যটা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, জাতির পরাধীনতার বন্ধন মোচন করিতে গেলে শুধু পুরুষের চেষ্টায় তাহা হইবে না, পরন্তু নারী জাতিকেও এই মুক্তিসংগ্রামে নামাইতে হইবে। তাহা ছাড়া পণপ্রথার বিষময় চাপে বাধ্য হইয়া লোককে কন্যাগণকে অবিবাহিতা রাখিতে হইতেছে। কিন্তু বিনা কার্য্যে, বিনা শিক্ষায় মেয়েদের যদি ঘরে রাখা যায় তাহার ফলও খারাপ হইবে এই আশঙ্কায় অনেকের প্রাণই উদ্বেলিত হইয়াছে। কাজেই বলিতে হয়, হিন্দুবালিকাদের শিক্ষার জন্য উচ্চতর বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার যদি কোন প্রশস্ত সময় থাকে তবে এখনই মাহেন্দ্রক্ষণ,—অমৃতযোগ। শ্রীশ্রীগৌরীমাতার অক্লান্ত পরিশ্রমে বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের জন্য একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণের চেষ্টা চলিতেছে। সেই অট্টালিকায় আশ্রমের শিক্ষাপ্রণালী আরও উচ্চতর করিয়া হিন্দুমহিলা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করা হইবে। আমরা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের শিক্ষয়িত্রী, অনুষ্ঠাত্রীবর্গের কাহারও কাহারও নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠার সংবাদ রাখি এবং মাতাজী দুর্গাপুরী দেবী, মাতাজী সুতপা দেবী প্রভৃতির ন্যায় আদর্শস্থানীয়া হিন্দুবিদুষীর নেতৃত্বাধীনে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে যে তাহা হিন্দু জনসাধারণের একটা প্রবল অভাব দূর করিবে সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। দেশের আপামর সাধারণের কর্ত্তব্য অর্থাদির দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা। এই আশ্রমটীকে একটা জাতীয় মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার চেষ্টা অনেক দিন হইতেই করা হইতেছে এ সংবাদ আমরা রাখি এবং অনেক দিন হইতেই এই প্রতিষ্ঠানটির শাখাপ্রশাখা বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইতেছে তাহাও আমরা জানি, কিন্তু এতদিনেও প্রতিষ্ঠানের কর্ত্রীগণের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত না হওয়ায় আমাদের মনে এই

ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে দেশের রাজা, মহারাজা, জমিদার, ধনাঢ্য ও শিক্ষিত লোকেরা এদিকে তেমন দৃষ্টি প্রদান করেন নাই।

বেথুন কলেজাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট স্কুল কলেজে হিন্দুর ঘরের মেয়েরা দু'পাতা ইংরাজী পড়িয়া শেষে যে আচারে, ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায়, চালচলনে একেবারে আধা "মেম সাহেব" হইয়া পড়েন একথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর ফলে দেশের হিন্দু মুসলমান-ঘরের ছেলেরা যখন আজ বিকৃত-ধর্ম্ম, শিথিল ধর্ম্ম, নৈতিক চরিত্রহীন, আলস্যপরায়ণ, উপার্জ্জনে অক্ষম একটা বিলাসী সম্প্রদায়ে পরিণত হইতেছে, তখন মেয়েরাও যে তদপেক্ষা আরও নিকৃষ্টতর হইয়া পড়িবে তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? আমাদের হিন্দু-ঘরের মেয়েদের চাই এরূপ শিক্ষা যাহার দ্বারা স্বামীভক্তি, দেবদ্বিজে অনুরক্তি, অতিথিবাৎসল্য, পূজা, পার্ব্বণ, ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতিতে তাহাদের মন অবিচলিত থাকে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তকানুসারে উপরোক্ত স্কুল কলেজ সমূহে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হিন্দুজাতির পক্ষে আত্মঘাতী শিক্ষা,—ওরূপ বিষময়ী শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে মেয়েদিগকে অশিক্ষিতা রাখাও সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর। আজকাল অনেক শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক মেয়েদের হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত শিক্ষা দিবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতিতে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে পাঠাইতেছেন! কি করেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক নব্য যুবক মেয়ে লেখাপড়া অর্থাৎ 'এ-বি-সি-ডি' না জানিলে এবং উচ্চৈঃস্বরে হারমোনিয়ম সহযোগে, দুই একটা গান করিতে না পারিলে সে মেয়েকে আদৌ বিবাহ-যোগ্য মনে করেন না। এই সমস্ত শিক্ষিত হিন্দুগণ যেই মাত্র সারদেশ্বরী আশ্রম প্রভৃতির ন্যায় উচ্চ শিক্ষালয়ের সন্ধান পাইবেন, সেই অবিচলিত চিত্তে তাঁহাদের কন্যাগণকে তথায় প্রেরণ করিবেন। সারদেশ্বরী আশ্রমের কর্ত্রীগণের উচিত আর নীরব না থাকিয়া অবিলম্বে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানটির বিস্তৃতি সাধন করা। আশ্রমের কর্ত্রীগণের একটি প্রধান ত্রুটি এই, যে তাঁহারা এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের সংবাদ জনসাধারণের গোচর করেন নাই। আমাদের মত দুই চারিজন লোক যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার বিষয় একটু চিন্তা করেন, অথচ অর্থাভাবে, সময়াভাবে কিছু করিতে পারেন না, তাঁহারাই শুধু এই আশ্রমের সংবাদ রাখেন। আশ্রমের কর্ত্রীগণ যেভাবে হিন্দুনারীর আদর্শ বজায় রাখিয়া মেয়েদিগকে বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, সাংখ্য হইতে ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল, চরকা ও বয়নশিল্প প্রভৃতির শিক্ষা দেন তাহাতে তাঁহাদের শিক্ষাপ্রণালীর দিকে এতদিনে দেশের লোকের নিশ্চয়ই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত, যদি তাঁহারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য তেমন চেষ্টা করিতেন।

আজকাল নব্য তুরস্কের দেখা দেখি ভারতের মুসলমানসমাজও অবরোধপ্রথার কঠোরতা দূর করিয়া মেয়েদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। এ সময় গোঁড়া মুসলমানগণ কেন যে এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় হইতে দুই একটি মুসলমান মহিলা প্রতি বৎসর ম্যাট্রিক্, আই-এ, বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যে ক্রমেই মুসলমান সমাজ ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের বাহিরে গিয়া পড়িতেছেন তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? আমরা আশা করি মাদ্রাসার কর্ত্তৃপক্ষগণ মুসলমান বালকগণকে শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান মেয়েদের জাতীয় ভাবে শিক্ষা দিবার জন্য অবিলম্বে চেষ্টা করিবেন।

শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার প্রমুখ দেশনেত্রীগণ মহিলা-কর্ম্মীসংসদ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া মেয়েদিগকে কার্য্যকরী শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের

উদ্দেশ্য যে ভাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু কার্য্যকরী শিক্ষায় মেয়েদের জ্ঞানোন্মেষের কোন সহায়তা হইবে না। জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইটি বস্তু লাভ না করিতে পারিলে কোন লোকেরই জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ হয় না। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে মেয়েদের শিক্ষাপ্রণালী শুধু কার্য্যকরী শিক্ষার মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া তাঁহাদিগকে ব্যবহারিক জগতের শিক্ষাও দিতে পারেন। আজকাল বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী ও শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদারের স্থান অতি উচ্চে অবস্থিত। ইঁহারা দুই জনেই আদর্শ হিন্দু-মহিলা। আচার-ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে ইঁহারা হিন্দুজননীর আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। পুরাকালে গার্গী প্রভৃতি বিদুষী মহিলাগণ যেমন প্রকাশ্য সভাসমিতিতে উপস্থিত হইলেও নিজেদের জীবনকে সংযম, তিতিক্ষা, ধর্ম্মপরায়ণতায় এমনভাবে গঠিত করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের দেখিলেই দ্রষ্টার মাথা আপনা হইতেই ভক্তিভরে নত হইত, সেইরূপ ইঁহারা দুইজনে সভা সমিতিতে উপস্থিত হইয়াও বাঙ্গালীজাতির শ্রদ্ধা ভক্তি এরূপ আকর্ষণ করিয়াছেন যে ইঁহাদিগকে দেখিলে শ্রদ্ধায় সকলের শির অবনত হয়। ইঁহারা দুই জনেই বিদুষী, অথচ শিক্ষিতা এবং সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভবা, বাগ্মীতায় দুই জনেই অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাক্ষাৎ প্রতিনিধি বলিয়া কংগ্রেস কমিটিতে ইঁহাদের প্রতাপ অসাধারণ। এখন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি যদি ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিবার জন্য তাঁহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ না করিয়া জাতিগঠনের দিকে মনোনিবেশ করেন, আমাদের বিশ্বাস তবে প্রকৃত কাজের মত কাজ হয়। জাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিতে না পারিলে কখনই জাতিগঠন হইবে না, ইহা যেন কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ মনে রাখেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে "অসভ্য জাপানের" (?) সম্রাট্ মিকাডো এই সত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়াই ঘোষণা করিয়াছিলেন :—"Henceforth education will be so diffused that there will be not a single family with an ignorant man or a man with an ignorant family" অর্থাৎ অতঃপর আমার রাজ্যে শিক্ষাকে এরূপ বিস্তৃত করিতে হইবে যে কোন পরিবারে যেন একটিও লোক অশিক্ষিত না থাকে।" ক্ষুদ্র জাপান যে আজ এত উন্নত,—এত সমৃদ্ধ, তার মূলে এই শিক্ষা-বিস্তার নিহিত।

কংগ্রেস কমিটি ছেলেদের মধ্যে জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের যতই চেষ্টা করুন, তাহা কোন মতেই তেমন ব্যাপক হইবে না। জাতীয় স্কুল সমূহের মধ্যে যেখানে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা দেওয়া হয়, কেবল সেইগুলির মধ্যে কোন কোনটি টিকিয়া থাকিবে, আর যে সমস্ত জাতীয় বিদ্যালয়ে টেক্‌নিক্যাল বা শিল্প-কারিকরী শিক্ষা দেওয়া না হয় তাহা থাকিবে না। জাতীয় গবর্মেণ্ট ভিন্ন পুরুষের মধ্যে জাতীয় শিক্ষার প্রসার হইতে পারে না। তবে হিন্দুর মেয়েকে শিক্ষালাভ করিয়া জজীয়তি, ম্যাজিষ্ট্রেটী, ব্যারিষ্টারী, ওকালতী, ডাক্তারী, হাকিমী, বা কেরাণীগিরি করিতে হইবে না বলিয়া জাতীয় শিক্ষা হিন্দু মেয়েদের মধ্যে বেশ ব্যাপক ভাবেই চলিবে। কংগ্রেস কমিটি নানাভাবে অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা কি একটা জাতীয় মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে অথবা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের সহিত যোগদান করিয়া এই আশ্রমটিকে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে পারেন না? শ্রীমতী সন্তোষকুমারী গুপ্তা আমাদের হিন্দু-ললনাগণের গৌরবের স্থল। দুঃখের বিষয় তাঁহার ন্যায় উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে যত্নবতী না হইয়া শ্রমিকদের মধ্যে আপন কর্ম্মক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে এরূপ কর্ম্মক্ষেত্র বাছাই আদৌ উপযুক্ত হয় নাই। তাঁহার মত একজন বিদুষী, উচ্চ শিক্ষিতা, উদ্যোগিনী মহিলা যদি এই বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে কায়মন নিয়োগ

করিতেন তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস এতদিনে একটা হিন্দুমহিলা-জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতে পারিত।

আমরা আশা করি, দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া দেশনায়ক ও দেশনেত্রীগণ অবিলম্বে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুমোদিত একটা উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্রতী হইবেন।

স্মৃতি

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী।

বহুবর্ষ চলে গেছে বহু স্মৃতি নিয়া
হৃদয়ের ছিন্নপত্রে হিসাব লিখিয়া,
যোগ বিয়োগের ঘর
গরমিল পূর্ব্বাপর,
যোগের কোটায় খালি বিয়োগের জের
খতিয়া দেখিতে গেলে শূন্য পড়ে ঢের।
অতীতের নিদর্শন
স্মৃতি করে আকর্ষণ
যা গিয়াছে পুনর্ব্বার তাই আনে তুলে,
ভুলিতে চাহিলে কভু নাহি যাই ভুলে;
শৈশব কৈশোর আর
যৌবনের সমাচার
একে একে ফুটে উঠে কল্পনার আগে
পুরাতনে জাগাইয়া নব অনুরাগে।
বাল্যের সে ধূলাখেলা
স্বজন বান্ধব মেলা
হাসি কান্না দ্বন্দ্ব প্রীতি বিচ্ছেদ মিলন,
ক্ষণে অভিমান, ক্ষণে প্রিয় সম্ভাষণ,
যৌবনের প্রাণ খোলা
ভালবাসা আত্ম ভোলা
দিয়া নাহি তৃপ্তি মানে, আরো দিতে চায়
নিয়া দিয়া কাড়াকাড়ি, প্রণয় বাড়ায়।
তুমি আমি নাহি দূর
সবখানি ভরপুর
হিয়ায় হিয়ায় বহে প্রেমের জোয়ার,
আনন্দ মিলনে ভাসে জীবন দোঁহার।
সে দিনের যত কথা
আজি শুধু মর্ম্মব্যথা,
ছিল, নাই, আসিবে না আবার কখন,
যা যায় সে একেবারে স্মৃতির স্বপন।
বিস্মৃতির মাঝখানে
স্মৃতি জাগাইয়া আনে
হরষ বিষাদ, কত বর্ষ কত দিন
ধরিয়া রাখিতে নারে ক্রমে হয় ক্ষীণ,
আধ-মোছা চিত্র হেন,
বর্ণ রাগ নাহি যেন,
তবু স্মৃতি আঁকাইয়া ধরে নেত্র পরে,
আঁকা বাঁকা দৃশ্যপটে শোভে থরে থরে।
যুগান্তর গেছে ব'য়ে
আধেক জীবন ল'য়ে,
আজি সব ফাঁকা ফাঁকা শূন্যতায় ভরা,
"হরণ পূরণ" বিশ্বে নাহি যায় করা।

ঋণমুক্তি

(গল্প)

শ্রীমতী কুলবালা দেবী।

"এ কথা সত্যি রাণী, সেই সামান্য টাকার জন্য শরৎ তোর সঙ্গে বড় নিষ্ঠুর ব্যবহার করছে?"

জ্যেষ্ঠা ভগিনী বাণীর প্রশ্নের উত্তরে রাণী একটি ছোট্ট "না" বলিয়া নিরুত্তর হইল বটে কিন্তু চাপা নিশ্বাসটাকে সে কিছুতেই বাধা দিতে পারিল না, সেইটুকুই জানাইয়া দিল যে সে বুকজোড়া ব্যথার ঘায়ে দিবানিশি জ্বলিতেছে। বুদ্ধিমতী বাণী সেটা বুঝিল, সে অস্ফুট স্বরে বলিল "উচ্চ শিক্ষিত ধনী-সন্তানকে জামাই করে ঋণের দায়ে বাবা আত্মহত্যা ক'র্লেন, সেই শোকে মা উন্মাদিনী হলেন, তবু তাদের একটু দয়া হল না!"—বাণীর স্বর কাতরতায় ভরা।

কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বাণী বলিল "একজন বাবার কষ্ট বুঝেছিল রাণী। সেও শিক্ষিত ছিল কিন্তু ধনীর সন্তান ছিল না—তাই বুঝি দুঃখীর দুঃখ বুঝেছিল কিন্তু এ পোড়া বরাতে তাও যে সইল না বোন। মৃত্যুর আগে আমায় বল্লে 'বাণী, আমার সকল কর্ত্তব্য পড়ে রইল, তোমার রুগ্ন পিতা উপার্জ্জনহীন তায় আবার কন্যাদায়গ্রস্থ, এ সময় আমি তাঁর কিছু করতে পাল্লুম না। তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন।' বোন, আমি যে—"

বাণী আর বলিতে পারিল না, তাহার অশ্রুভরা করুণ চোখ দুটি গোধূলির ম্লান আকাশের গায়ে ন্যস্ত হইল,—বুঝি সতীর সেই সজল সকাতর দৃষ্টি প্রাণভরা কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস কোন অজানা দেশে বহিয়া লইয়া গেল— দেবোপম পতির পদে নিবেদন করিয়া দিতে।

"দিদি"—রাণী যেন কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। বাণী চোখ মুছিয়া বলিল "মনের ভিতর তুষের আগুন চেপে রেখে দিবানিশি দগ্ধ হ'সনে বোন, যা বলবি বলে ফেল দিদি আমার; মুখ বুজে ভেবে ভেবে জীবনটাকে আর ধ্বংসের পথে নিয়ে যাসনে।"

বাণীর বুকে মুখ রাখিয়া কান্না-রুদ্ধ কণ্ঠে রাণী বলিল "তারা আমায় এক মাসের জন্য আসতে দিয়েছিল, কাল চিঠি এসেছে এবার তিনি আমায় স্বয়ং নিতে আসবেন। কিন্তু টাকার তো কোন কিনারাই হ'ল না দিদি; আর যে অপমান সহ্য হয় না।"—রাণী আর নিজেকে সংযত রাখিতে পারিল না। রুদ্ধ হৃদয়ের সঞ্চিত বেদনা সবখানি বুক চিরিয়া বাহির করিয়া দিল প্রাণভেদী কান্নার সঙ্গে সঙ্গে।

অঞ্চলে রাণীর চোখ মুছাইয়া বাণী বলিল "চুপ কর ভাই, কাঁদতেই আমরা জন্মেছি, জীবনভোরই হয়ত কাঁদতে হবে, সব চোখের জল একেবারে ফুরিয়ে ফেলিস কেন দিদি? শরৎ আসছে তা বলে আর কি হবে, ভগবান যা করেন তাই হবে।"

রাণী ধীর স্বরে বলিল "আচ্ছা দিদি, এতবড় বাড়ীখানা রয়েছে, বাঁধা দিলে কি কেউ দুশো টাকা দেয় না?"

রাণীর কথায় বাণীর মুখখানা যেন কাল মেঘে ঢাকিয়া গেল। সে বেদনাভরা স্বরে বলিল "এ বাড়ী কি আজও আমাদের আছে রাণী, এ যে তোর বিয়ের দেনায় গত বছর বিক্রী হ'য়ে গেছে, এখনো যে আমরা ভিটেটায় দাঁড়িয়ে রইছি সে কেবল উত্তম-ঘোষের অসীম দয়ায়।"

নিরাশার অবসাদে রাণীর মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সে যে ক্ষীণ আশা-দীপটি নিভৃত অন্তরে জ্বালাইয়া এবার পিত্রালয়ে আসিয়াছিল তাহা এক নিমিষেই নিভিয়া গেল। হা ভগবান, এই এক

আশাতেই সে স্বামীকে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে—যে কোন উপায়ে হউক সে এবার টাকা লইয়া তবে আসিবে। বিবাহের দুই বৎসর পর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় রাণীর স্বামী এবং শাশুড়ী-ঠাকুরাণী তাহাকে পিত্রালয়ে আসিতে দিয়াছেন। আজ কিংবা কালই যে স্বামী তাহাকে লইতে আসিবে, তখন সে কি বলিবে; আত্মমর্য্যাদাভিমানী, সম্পদশালী স্বামীর রুদ্রমূর্ত্তির সম্মুখে সে কেমন করিয়া দাঁড়াইবে?

সন্ধ্যাসতীর মঙ্গল আহ্বানে যখন পল্লী-গৃহস্থের ঘরে ঘরে শত শঙ্খ বাজিয়া উঠিল রাণী তখন ঠাকুরঘরে শালগ্রাম শিলার সম্মুখে গিয়া যুক্ত করে প্রার্থনা করিল—আমার সকল শঙ্কার অবসান কর ঠাকুর তোমার চরণতলে একটু স্থান দিয়ে।

* * * *

নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রি তখন, রাণী শঙ্কা-কম্পিত বুকে, সন্তর্পণে কক্ষে প্রবেশ করিল। শুভ্র শয্যায় শরৎ অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে, উজ্জ্বল আলোয় কক্ষ আলোকিত। শরতের গৌর উজ্জ্বল ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ মুক্তাফলসদৃশ শোভা পাইতেছে, সারা মুখখানি সরল সৌন্দর্য্যে মাখা, কে বলিবে এই মানুষের হৃদয়ে এত নিষ্ঠুরতা লুকান আছে! রাণী অপলক নয়নে স্বামীর শান্ত সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত মূর্ত্তি দেখিয়া মনে মনে বলিল "ওগো আমার পাষাণ দেবতা, পাষাণ বুকেই ত অমৃত-নির্ঝরিণী প্রবাহিত হয়, সেই পবিত্র বারিধারায় আমায় অভিষিক্ত করে দাও। দু বৎসর হতে পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে নিয়ে তোমার রুদ্ধ দ্বার ঠেলে বার বার ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে গেছি, আর কত দিন হতাশ প্রতীক্ষায় বসে থাকব প্রভু!"—মর্ম্মান্তিক যাতনায় রাণীর একটু আর্ত্তস্বর অজ্ঞাতে বাহির হইয়া পড়িল, শরৎ চক্ষুরুন্মিলন করিল;—সেই ঘৃণাভরা দৃষ্টি, ক্রোধরঞ্জিত মুখে সেই অন্তরের বিরক্তি ফুটিয়া রহিয়াছে। রাণী আর চাহিয়া থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে চক্ষু নত করিল।

শরৎ শয্যায় উঠিয়া বসিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল "তোমার দিদির স্পর্দ্ধার কথা সব শুনেছ বোধ হয়। আমাদের ঘরে মেয়ে দিয়ে তোমাদের চৌদ্দ পুরুষ সম্মানিত হয়ে গিয়েছে, এখন আমরা ত অভদ্র হবই! ভাল, এখন থেকে আমাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখার দরকার নেই, আজ থেকে তুমি চিরদিনের জন্য এখানে থেকে যাও। তোমার দিদি আমাকে অনেক কথা বলেছেন।"

রাণী স্বামীর পায়ের তলে মুখ গুঁজিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগের সহিত বলিল "ক্ষমা কর দিদিকে; নানা-রকম শোকে দুঃখে তিনি কাতর, তাই হয়ত কি বলতে কি বলে ফেলেছেন।"

শরৎ রাণীকে পায়ের নিকট হইতে টানিয়া সরাইয়া গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল "রেখে দাও তোমার শোক দুঃখ, ও সব মেয়েলী চাল আমার ঢের জানা আছে। দুশো টাকার জন্য আমরা মরে যাবনা কিন্তু মনে জেনো তোমাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এই শেষ, টাকা আদায় করতে পারি কিনা পরে বুঝিয়ে দেব।"

* * * *

সকালবেলা ঠাকুর দালানের রোয়াকে বসিয়া কাদম্বিনী দেবী অন্নজল-সংক্রান্তীর ব্রতের একখানি ত্রুটিহীন বৃহৎ ফর্দ্দ করাইতেছিলেন। ফর্দ্দ শেষ হইলে নায়েব কালীচরণ মাথা চুলকাইয়া বলিলেন "তা মা-ঠাকরুণ এযে হাজার টাকার ওপর খরচা হবে, এবার অন্নপূর্ণা পূজায় বিস্তর টাকা ব্যয় হয়ে গেছে, তহবিল একেবারে খালি।"

কাদম্বিনী দেবী মাংসবহুল মুখখানি হাস্যবিকশিত করিয়া বলিলেন "না হে বাপু, এবার তবিলের টাকায় হাত পড়বে না। শরৎ যখন নিজে গেছে তখন এবার সুদ সমেত টাকা আদায় হ'য়ে আসবে, সে আমার যা-তা ছেলে নয়। ওরা যেমন বুনো ওল শরৎ আমার তেমনি বাঘা তেঁতুল। তোমরা যেমন দু বছরেও আদায় করতে পারলে না!"

নায়েব বলিলেন "কি করব মা, আঠারগাঁর

খবর আমি ভাল রকমই জানি, আমার কথা বিশ্বাস করুন—তাদের এখন দিন চলাই দায়।"

কাদম্বিনী দেবী গম্ভীর স্বরে বলিলেন "ওসব বাজে কথা, জামাইকে ফাঁকি দেবার মতলব—"

"ঠিক বলেছ মা, শুধু ফাঁকি দেবার মতলব নয়, অপমান করবারও মতলব। যে অপমানটা আমায় করেছে তা মনে করে আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে। এর প্রতিশোধ দিতেই হবে!"

কাদম্বিনী দেবী শরতের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। বলাবাহুল্য শরৎ সমস্তই নিজের তৈয়ারী কথা বলিল। কাদম্বিনী দেবী গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"বটে, এত বড় স্পর্দ্ধা, আচ্ছা দেখে নেব। আমি এই বোশেখেই ছেলের বিয়ে দেব। কালী, তুমি আজই বিকেলে রায়নগরে চলে যাও। সেখানকার দেবেন মুখুজ্যেকে চেনো নিশ্চয়, তার একটি সুন্দরী বয়স্থা মেয়ে আছে। তাদের সঙ্গে আমার খুব জানাশোনা আছে, এ বিয়ের সম্বন্ধে একটু বলা-কওয়াও আছে। তুমি গিয়ে পাকা ব্যবস্থা করে এস। ওদের চোখের সামনে দিয়ে শরৎ আমার নতুন বৌ আনবে—তবেই বেটীদের ঠিক অপমান করা হবে। কাদম্বিনী দেবী কেমন মেয়ে এবার আমি ওদের ভাল করেই বুঝিয়ে দেব।"

* * * * * * *

কয়েকদিন পূর্ব্বে স্নানের ঘাটে যে কথাটা শুনিয়া রাণী প্রথমে আদৌ বিশ্বাস করিতে পারে নাই আজ সেই কথাটাই আবালবৃদ্ধের মুখে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল,—দেবেন মুখুজ্যের মেয়ে কিরণের সঙ্গে তাহার স্বামীর বিবাহ।—হউক না বিবাহ, স্বামী ত তাহাকে লইয়া একদিনের তরেও সুখী হইতে পারেন নাই। যদি এ বিবাহে তিনি সুখী হন, হউন না, তাহাতে আর দুঃখ কি? সে তো চিরদিনই অবহেলার ধূলায় লুটাইয়াছে, আজ আর নূতন করিয়া কি দুঃখ হইবে? রাণী নানা রকমে মনকে বোঝাইল, কিন্তু মন যে বুঝিয়াও বোঝে না!

বাণী ও মাতা দেখিলেন রাণী ঝরা ফুলটির মত শুকাইয়া যাইতেছে। প্রায় বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে রাণীর বুকে একবার যে ব্যথা হইয়াছিল এই সময়ে হঠাৎ সেই ব্যথা ভয়ানক রকম বাড়িয়া গেল। এই সঙ্গে আবার অল্প অল্প জ্বর হইতে লাগিল। জ্বর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, যক্ষারাক্ষসী তাহাকে করতলগত করিয়া একেবারে শয্যাশায়ী করিয়া দিল। বিবাহের পর হইতে রাণী একান্তে যে মৃত্যুর উপাসনা করিয়া আসিতেছিল এতদিন পরে সে বুঝি আসিল উপাসিকার সকল দুঃখের অবসান করিতে! পক্ষকাল পরে ব্যারাম আরও বৃদ্ধি পাইল। গ্রাম্য কবিরাজ স্পষ্টই বলিয়া গেলেন—জীবনের আশা খুবই কম।

দুই দিন অজ্ঞান থাকার পর সেদিন অপরাহ্নে রাণীর একটু জ্ঞান হইলে বাণী জিজ্ঞাসা করিল "কেমন আছিস বোন?"

রাণী ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল "বেশ ভাল আছি দিদি। আচ্ছা দিদি, সেদিন যে কথা বলেছিলাম তা করেছ কি, সত্যি বলিস ভাই?"

বাণী সজলনয়নে বলিল "করেছি বোন, সেই দিনই খবর পাঠিয়েছি। কেন যে এল না জানিনে, হয় ত আর আসবে না বোন্। তার কথা ভাই আর ভাবিসনে, এখন ভগবানকে ডাক, তিনিই তোর মঙ্গল করবেন।"

রাণী পূর্ব্ববৎ ক্ষীণস্বরে বলিল "আজ আবার একি কথা বলছ দিদি? তোমার মুখেই শুনেছি স্বামীই নারীর পরম দেবতা, তার ত আর কোন দেবতা নেই।"

বাণী সজলনয়নে বলিল "বলেছিলাম, এখনও বলছি কিন্তু তোর দেবতা যে বিমুখ—"

বাণী আর কিছু বলিল না, কি একটা কাজের অছিলা করিয়া ঘরের বাহিরে গেল। যাইবার সময় দ্বারপার্শ্বে দাড়াইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "তবে তোর সেই পাষাণ দেবতাকেই ডাক, সতীর অন্তিম আহ্বান ব্যর্থ হবে না।"

বৈশাখী বৈকালের পাগল বাতাস রাণীর রুক্ষ চুলগুলি লইয়া খেলা করিতেছিল। রাণী খোলা জানালা দিয়া একদৃষ্টে মুক্ত প্রকৃতির দিকে চাহিয়া আছে। আজ আবার নূতন করিয়া তাহার মনে পড়িতেছে সেই দিনের কথা, এমনি এক গোধূলি বেলায় সে উল্লাস-কম্পিত হৃদয়ে সুরভিত কুসুমমাল্য স্বামীর গলায় জড়াইয়া দিয়াছিল। সে আজ পূর্ণ দুই বৎসরের কথা, সেদিনও দক্ষিণা বাতাস এমনি ভাবে বহিয়াছিল, সেদিনও এমনি অস্তমিত রবির রাঙা আভা দিগ্বধূর ধূসর আঁচল খানি রাঙাইয়া তুলিয়াছিল, সেদিন সে ছিল সংসার-পথের নূতন যাত্রী, আশা আকাঙ্ক্ষায় তরুণ বুকখানি সেদিন তার ভরা ছিল, আর আজ? আজ সে জীবনের সকল বাসনা কামনা অপূর্ণ রাখিয়া কোন্ অজানা দেশে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ওগো খেয়া পারের কাণ্ডারী, এবার তাকে কোন কূলে নিয়ে যাবে! ঠিক এই সময় অদূরে মাঠের প্রান্তে কোন রাখালবালক গাহিয়া উঠিল—"অবেলায় হাট ভাঙলি শ্যামা কি নিয়ে মা ঘরে ফিরি।"

—"রাণী।"

রাণী চমকিয়া উঠিল। কে ডাকে? এ স্বর যে তার চেনা চেনা, এ আদর আহ্বান কার?

শরৎ রাণীর শিয়রে বসিয়া কোলের উপর তাহার মাথাটি রাখিয়া বাষ্পবিজড়িত স্বরে বলিল—"রাণী, আমি এসেছি।"

রাণীর স্তিমিত চোখ দুইটি আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল। সে পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আগে যদি একবার এমনি করে ডাকতে তা'হ'লে—তাহ'লে তোমার পায়ে একটু স্থান করে নিতুম প্রভু, এমন করে মরণের পথে এগিয়ে যেতুম না!"

শরৎ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল "তখন পায়ে ঠাঁই পাওনি বলে আজ বুক পেতে দিতে এসেছি রাণী। ফিরে এস, ফিরে এস রাণী।"

রাণী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "কি করে ফিরব প্রভু, এখনো ত—" রাণীর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, একটা অব্যক্ত বেদনায় সে গোংরাইয়া উঠিল। তারপর? তারপর এক মুহূর্ত্তের মধ্যে রাণী সকল ফেলিয়া অনন্তপথে যাত্রা করিল।

ঠিক সেই সময় বাণী ছুটিয়া আসিয়া শরতের পায়ের গোড়ায় কতকগুলি টাকা ঢালিয়া দিয়া রাণীকে জড়াইয়া ধরিয়া আকুল স্বরে বলিয়া উঠিল "রাণী, আর একটু দাঁড়িয়ে যা, বোন, তোকে ঋণমুক্ত করেছি, মুক্তির আলোয়,—পরিতৃপ্তির আনন্দে মুখখানি ভরিয়ে তোল বোন।"

নিবেদন

শ্রীপ্রমথনাথ দত্ত।

পরাণ আমার চাহেনা মুক্তি
চাহেনাক' কোন কামনা,
চাহি গো তোমায় ওগো প্রাণপ্রিয়,
পুরাও আমার বাসনা।
মুক্ত রেখেছি এ হৃদি-দুয়ার
তুমি যে আসিবে বলে,

নিরাশ ক'রনা হে মোর দেবতা
এস প্রভু এস চলে।
চির দুখ ক্লেশ বরিয়া লইব,
তোমাকে পাবার তরে,
দেখা দাও প্রভু, পুজিব তোমায়
ক্ষুদ্র পরাণ ভরে।

নারী-অবদান

শ্রীবিজয়কুমার ভৌমিক।

বুনো রামনাথের পত্নী—

রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত অসাধারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। নবদ্বীপের প্রান্তরে বনের মধ্যে তাঁহার টোল ছিল। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। দরিদ্রতা-প্রযুক্ত তিনি বিবাহ করিতে চাহেন নাই; অবশেষে স্বীয় অধ্যাপকের অনুরোধে বিবাহ করেন। তাঁহার শিক্ষাগুরু আশীর্ব্বাদ করেন যে তিনি সর্ব্ব বিষয়ে নিজ অনুরূপ পত্নী লাভ করিবেন এবং তাঁহাদের উভয়ের এক মন হইবে।—হইয়াছিলও তাহাই।

সে সময়ে নিয়ম ছিল পাঠসমাপান্তে ছাত্রেরা স্থানীয় ভূস্বামীর নিকট যাইয়া বিদ্যার পরিচয় দিয়া টোলঘর নির্ম্মাণ করিবার জন্য অর্থ সাহায্য ও ভরণপোষণের জন্য ভূমি প্রাপ্ত হইতেন। নিতান্ত দরিদ্র হইলেও তেজস্বী রামনাথ ইহা করেন নাই। দারিদ্র্যকে সানন্দে বরণ করিয়া লইয়া তিনি বনের মধ্যে নিজের সামান্য কুঁড়েঘরে শাস্ত্রালোচনায় নিমগ্ন থাকিতেন, রাজারাজড়ার ধার ধারিতেন না। অতি কষ্টে তাঁহার আহারাদির সংস্থান হইত। তখন মহারাজ শিবচন্দ্র কৃষ্ণনগরের রাজা ছিলেন। তিনি এই দরিদ্র অধ্যাপকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ততোধিক তেজঃপ্রদীপ্ত দরিদ্রতার কাহিনী শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া কিছু দান করিবার আশায় নিজেই একদিন তাঁহার কুটীরে উপস্থিত হইলেন।

শাস্ত্রালোচনা সমাপনান্তে রাজাকে লক্ষ্য করিয়া রামনাথ তাঁহাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কিছু অনুপপত্তি (অভাব) আছে কি?" রামনাথের মনে শাস্ত্রের কথা ভিন্ন অন্য কিছুই স্থান পাইত না। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, "মহারাজ, চারি খণ্ড চিন্তামণিশাস্ত্রের উপপত্তি (সিদ্ধান্ত) করিয়াছি, কিছুই অনুপপত্তি (অসঙ্গতি) নাই; কেমন হে ছাত্রবর্গ, তোমাদের কিছু আছে কি?" মহারাজ তখন বলিলেন "আমি শাস্ত্রের কথা বলিতেছি না, আপনার সাংসারিক কিছু অভাব আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছি।" ইহাতে রামনাথ উত্তর করিলেন "সংসারের কথা আমি কিছু জানিনা, সে গৃহিণী জানেন; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

মহারাজ শিবচন্দ্র রামনাথের অনুমতি লইয়া তাঁহার পত্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ পরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, আপনার সংসারে কিছু অভাব আছে কি? অনুমতি হইলে আমি পূরণ করিতে পারি।" রামনাথ-পত্নী স্বামীর আদর্শেই গঠিত; সেইরূপ সরল, নিস্পৃহ। তিনি উত্তর করিলেন "বাছা, আমার কিছুরই অভাব নাই; আমার পরিবার চেটী আছে, জল খাইবার ঘটি আছে, শুইবার চাটাই আছে। ইহার পর বামহাতে যখন লোহা আছে, তখন আমার আর কিসের অভাব?"

স্বামীর উপযুক্ত পত্নীর এই উপযুক্ত উত্তরে মহারাজ বিস্মিত হইলেন। তিনি কাহাকেও কিছু গ্রহণ করাইতে পারেন নাই।

পরমহংসদেবের মাতা—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মাতা অতি পুণ্যবতী রমণী ছিলেন, তাঁহার মনে কোনওরূপ বিষয়-বাসনা ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাতীরে বাসের অভিপ্রায়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে আসিয়া বাস করেন। রাণীর জামাতা মথুরবাবু তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি পরমহংসদেবের একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। পরমহংসদেবের প্রতি ভক্তিবশতঃ

তিনি তাঁহার সকল আত্মীয়েরই কিছু সংস্থান করিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি পরমহংসদেবের মাতাকেও কিছু গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন "আমার কিছুরই ত অভাব নাই, তা' কি প্রার্থনা করিব? শেষকালে প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিতেছি ও মায়ের প্রসাদ পাইতেছি; ইহা অপেক্ষা মানুষের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?" এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া মথুরবাবু অন্ততঃ সামান্য কিছু গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন, "তবে বাছা, আমাকে দু' পয়সার দোক্তা তামাক কিনিয়া দেও।" মথুরবাবু বুঝিলেন এমন না হইলে কি তাঁহার গর্ভে রামকৃষ্ণের ন্যায় দেবতার জন্ম হয়!

কেট্ বারল্যাস্—

স্কটল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স্ রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে যাইয়া অনেক উচ্চপদস্থ লোকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। ইহাদের কতিপয়ে মিলিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল।

একদিন কোনও ধর্ম্মোৎসবে রাজা ও রাণী পার্থ নগরে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা ধর্ম্মমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদের অনুচরেরা নগরে ছড়াইয়া পড়িল। এই স্থান ও কাল উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল বুঝিয়া ষড়যন্ত্রকারীরা তাহার আয়োজন করিতে লাগিল। তাহারা উৎকোচ দিয়া মন্দিরের কয়েকজন ভৃত্যকে বাধ্য করিল এবং তাহাদের দ্বারা দরজার খিল সরাইয়া রাখিল। একদিন রাত্রে রাজা ও রাণী সহচরীদের সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে অদূরে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শুনিতে পাইলেন। রাজা অনুমানে বুঝিলেন শত্রুরা তাঁহাকে হত্যা করিতে আসিতেছে। তিনি স্বয়ং নিরস্ত্র এবং অনুচরেরাও কেহ নিকটে নাই। এ অবস্থায় বাধা দিবার চেষ্টা বৃথা। তিনি যে ঘরে বসিয়াছিলেন উহার মেঝে কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং তাহার নীচে মৃত্তিকা-গর্ভে একটি প্রকোষ্ঠ ছিল। নিরুপায় হইয়া সকলে মিলিয়া মেঝের তক্তা তুলিয়া ফেলিলেন এবং নিম্নস্থ প্রকোষ্ঠে লাফাইয়া পড়িলে পুনরায় উহা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। ষড়যন্ত্রকারীরা আসিয়া রাজাকে অনেক খুঁজিল; অবশেষে না পাইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। তখন বিপদ অতীত হইয়াছে মনে করিয়া পুনরায় মেঝের তক্তা সরান হইল। রাজা উপরে উঠিলেন এমন সময় অতি নিকটে পুনরায় অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শোনা গেল। গৃহ-নিম্নস্থ প্রকোষ্ঠ পরীক্ষা করিতে তাহারা ফিরিয়া আসিতেছিল। তখন তক্তা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিবার সময় নাই। ভীত রমণীবর্গ চাহিয়া দেখেন দরজায় খিল নাই, খিলের লোহার আংটা দু'টি আছে মাত্র!

ক্যাথারিন ডগ্‌লাস্ নাম্নী রাণীর একজন সহচরী ছিলেন। তিনি অবিলম্বে উঠিয়া গিয়া দ্বিধামাত্র না করিয়া আংটা দু'টির ভিতর দিয়া নিজের একখানি সুকোমল বাহু প্রবেশ করাইয়া দিয়া দাঁড়াইলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এ ঘরে এখন কেহ প্রবেশ করিতে পাইবে না। কোনও পুরুষ মানুষ এখানে নাই। এখানে এখন মহিলারা বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিতেছেন।" পাষণ্ডেরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহারা সকলে মিলিয়া দরজায় আঘাতের পর আঘাত করিতে লাগিল। অবিলম্বে ক্যাথারিনের কোমল দুর্ব্বল বাহু ভাঙ্গিয়া দরজা খুলিয়া গেল। দুর্ব্বৃত্তেরা গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজাকে হত্যা করিল।

বিফল-প্রযত্ন হইলেও এই বীরোচিত কার্য্যের জন্য ক্যাথারিনের নাম সে দেশে বিখ্যাত হইল। বাহুদ্বারা দ্বার-অর্গল বদ্ধ করায় (bar) তাঁহার নাম ক্যাথারিন বা কেট্ বার্‌ল্যাস্ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

পল্লী-বধূ

শ্রীকুমারেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সে যে—বঙ্গ-পল্লী-বধূ,
অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বুক পোরা যার মধু।
লজ্জা যাদের সজ্জা, দেহের শঙ্খ-সিঁদুর অলঙ্কার,
সহিষ্ণুতায় কম নহে যারা সর্ব্বংসহা এ বসুধার।
ঘোমটায় ঢাকা গণ্ডিতে ঘেরা ধর্ম্মের বেড়া-আড়ে
ঘড়ির মতন ক'রে যায় কাজ একপদ নাহি নড়ে।
সে যে—বঙ্গ-পল্লী-বধূ,
অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বুক পোরা যার মধু।

* * * *

কন্‌কনে শীতে বিছানা ছাড়িতে যারা নাহি হেলে দোলে,
ভোরে "ছড়াঝাঁট", "গোয়াল বাড়ানো" ব'লেও কভু না ভোলে;
রোদ না উঠিতে থালাবাটী ধোয়া, কুট্‌নো কুটাটি চাই,
ছেলেদের ভাত এর মাঝে হবে, নচেৎ উপায় নাই।
দুপুর না হ'তে কলসী-কাঁকালে পুকুরেতে যেতে হবে,
নইলে যে ঘরে বৃদ্ধ শ্বশুর জল বিনে মারা যাবে।
সকাল সকাল রান্না না হ'লে ব্যথা পায় যে গো হৃদে,
"বৌ ভাল নয়"—এ কথাটি যার অন্তরে শর বিঁধে।
সে যে—বঙ্গ পল্লী-বধূ,
অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বুক পোরা যার মধু।

* * * *

আধ্‌পেটা খেয়ে ছিন্ন-বসনে কত দিন যায় কেটে,
চাপা দুখে যদি বুক ফেটে যায় মুখ তবু নাহি ফোটে;
নিয়ে ছুতোনাতা গিন্নী যখন তিলকে করিয়া তাল—
চৌদ্দপুরুষ নরকে পাঠায় বাপ মাকে দিয়া গাল,
গোপনেতে মুছে নয়নের ধারা, মুখে অভিযোগ নাই,
মানবীর সাজে স্বরগের দেবী কোথা মিলে বল ভাই?
চিরপরাধীনা গৃহ-পশু-প্রায় দয়ার ভিখারী সদা,
"তোমাদের ছাড়া" আমার বলিতে পদে পদে যার বাধা;
কচি ছেলেমেয়ে লালিতে পালিতে যারা ধাত্রীর বাড়া;
অল্পেতে খুসী হেন ক্রীতদাসী কোথা পাবে বল ধরা?
সে যে—বঙ্গ-পল্লী-বধূ,
অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বুক পোরা যার মধু।

* * * *

বেলা পড়ে গেলে ঘর দোর ঝাঁট, প্রদীপেতে তেল ভরা,
ছেলে নিয়ে কোলে ভুলায়ে খাওয়ানো, পাখী ডেকে কওয়া ছড়া;
সূর্য্য ডুবিলে তুলসীতলায়, ঘরে ঘরে দীপ জ্বালা—
এযে একেচেটে বউ-ঝির কাজ অন্তের নাই পালা।
গাড়ু ও গামছা খড়ম কি জুতা টুলখানি ঠিক রাখা,
গরমের দিনে ভুল নাহি হয় তার সাথে তাল-পাখা।
'আয় ঘুম আয়' বলে মা জননী শিশুরে পাড়ান ঘুম,
নইলে তখন হেঁসেলে গিন্নী লাগান বেজায় ধুম।
রান্না-অন্তে পরিবেশনটি গিন্নিকে দিয়ে সঁপে,
ভয়ে জড়সড় শঙ্কিত মনে রয় কে গো ম্লান মুখে?
সে যে—বঙ্গ-পল্লী-বধূ,
অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বুক পোরা যার মধু।

* * * *

সকলের শেষে বিশ্রাম আশে বিছানায় যায় শুতে,
আগামী দিনের কাজের চিন্তা তবু জেগে উঠে চিতে।
সারাদিন খেটে অঙ্গ এলায়ে বিছানায় যায় প'ড়ে,
"দেবতার" বাণী স্বপনের মত শুনি ওঠে ধড়্‌ফড়ে।
যার তরে তার এ ঘর দুয়ার, লাল শাঁখা-সাড়ী পরা—
ক্ষণিকের তরে শুধু তার সাথে চারচোখে এক করা;
ভকতি পুরিত পরাণে করিয়া তাঁহার চরণসেবা—
শিশু বুকে করি শান্ত হৃদয়ে নিদ্রা যায় গো কেবা?
সে যে—বঙ্গ-পল্লী-বধূ,
অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বুক পোরা যার মধু।

বিলাতের কথা

শ্রীমতী লীলাবতী পাল।

লণ্ডনে এসে প্রথম প্রথম আমার সবই খুব নূতন মনে হ'ত! এদেশ সম্বন্ধে আমার এক অদ্ভুত ধারণা ছিল। ভাবতাম আমাদের দেশের সঙ্গে এদেশের কিছুই বুঝি সাদৃশ্য নাই! আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন আমার বাবাকে (শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল) আমি বিলাতে লিখেছিলাম "বাবা, তুমি যখন দেশে ফিরে আসবে তখন টেম্‌সের জল, বিলাতের মাটী ও লোহিত সাগরের জল এনো, আমি আর কিছু চাই না।" আমার বাবা আমার ফরমাস মত কষ্ট করে সবই নিয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধারণা অনেক বদলায় বটে, কিন্তু আমার সমস্ত ধারণা যে বদ্‌লে গিয়েছিল তা বলতে পারি নে! বিলাতে এসে প্রথম যেদিন রাস্তায় কাদা দেখলাম সেদিন আমি বাস্তবিকই অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম!

বিলাত দেশটা মোটের উপর পরিস্কার। আমাদের দেশের মত রাস্তার ধারে Dust bin বা আবর্জ্জনা ফেলার টিন এখানে থাকে না। যত আবর্জ্জনা বাড়ীর মধ্যে জমিয়ে রাখতে হয়, সপ্তাহে একদিন লোক এসে নিয়ে যায়। আমার মনে হয় এ নিয়মটা এক পক্ষে ভালই, তবে আমাদের দেশে করা চলে না কারণ আমাদের জল বায়ু ভিন্ন।

এখানে বাজার হাট সমস্তক্ষণ লোকে লোকারণ্য থাকে। ফুটপাথে চলা দুরূহ, রাত ১১টার সময়ও বেজায় ভিড় থাকে। এত লোক কোথা থেকে যে আসে এবং রোজ রোজ কি যে কেনে তা বুঝে উঠ্‌তে পারি না। কিন্তু এই যে লোক-সমুদ্র এর মধ্যে শতকরা ৭০ জন স্ত্রীলোক। বিলাতে পাড়ায় পাড়ায় দোকান, এত দোকান বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে আর কোনও সহরে নাই! দোকানগুলিও খুব সুন্দর করে সাজানো।

বিলাতে আসার তিন দিন পরে রাজকুমারী "মেরীর" বিয়ে হ'ল। শুন্‌তে পেলাম যে হাইডপার্কে গেলে শোভাযাত্রা দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। দেখবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হল, ২টার সময় বরকনে যাবে, আমি ১॥ টার সময় গিয়ে দেখি রাস্তার দু ধারের ফুটপাথে হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কচ্ছে, কিন্তু এই যে ভিড়, এতে ঠেলাঠেলি বা গুতাগুতি নাই। জায়গা করে নিতে পারলে দাঁড়ান যাবে নইলে বাড়ী যাওয়া ভিন্ন অন্য পথ নাই। আমি এমন টুপীর ভিড় জীবনে আর কখনও দেখি নাই; এত যে লোক, কিন্তু সবাই নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। যথা সময়ে বরকনে মোটর হাঁকিয়ে চলে গেল, আমি তো অবাক, কোথায় নাগর দোলা, পুতুল নাচ এবং গড়ের বাদ্য? আমার কাছে কিন্তু এ দৃশ্য ভাল লাগেনি। শুনলাম এ দেশের বিয়েতে ধুমধাম কিছু নাই।

নভেম্বর এদেশের নিকৃষ্ট মাস। তখন এখানে শীত খুব বেশী, তাতে আবার সূর্য্যদেবের দর্শন পাওয়া দেবেরও অসাধ্য, তার উপর সমস্ত দেশটা কুয়াসাতে ঢেকে যায়। বেলা ১০টার সময় এত fog বা কুয়াসা হয় যে রাস্তা ঘাট সবই অন্ধকার হয়ে যায়। সময় সময় কুয়াসা এত ঘন হয় যে আধ হাত দূরের কিছুও দেখা যায় না। তখন রাতের মত রাস্তায় গ্যাস এবং চৌমাথায় খুব বড় করে মশাল জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তবুও অনেক দুর্ঘটনা হয়। এই কুয়াসা কিন্তু ৩।৪ ঘণ্টার বেশী থাকে না।

ডিসেম্বর মাসটা হচ্ছে এখনকার আদরের মাস,—যেন আমাদের দেশের আশ্বিন কার্ত্তিক মাস। আমাদের দেশে যেমন পূজোর আগে দেশ শুদ্ধ একটা সাড়া পড়ে যায়, এ দেশেও ঠিক তাই হয়। সমস্ত দোকানগুলি অতি চমৎকার করে সাজান

হয়। মাছ, তরিতরকারীর দোকানগুলি দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যায়।

বড়দিন বা খৃষ্টমাসে এদেশে ছোট, বড়, ধনী, গরীব সকলেই আমোদপ্রমোদ করে। গরীব এদেশে প্রচুর আছে কিন্তু কি সুন্দর তার জন্য ব্যবস্থা! গরীব বিধবা ৫টী সন্তান নিয়ে কি করে বড়দিন করবে, তার তো প্রচুর অর্থ নাই; এজন্য এখানে নিয়ম আছে বড়দিনের জন্য গরীবরা এবং ইচ্ছা করলে বড়লোকেও মুদীর, মাছের, মাংসের ও কেক বিস্কুটের দোকানে বছর ধরে সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু জমা দিয়ে থাকে এবং বড়দিনের সময় সেই পয়সা দিয়ে গরীবরা নানাপ্রকার ভাল ভাল জিনিষ ক্রয় করে। আমাদের দেশের মত নবমীর দিনে গরীব বিধবাকে শিশুদের নিয়ে চক্ষের জল ফেল্‌তে হয় না। এ ব্যবস্থা আমার বড়ই ভাল লেগেছে। বড়দিনের সময় নূতন পোষাক, নূতন খেলনা, নানা প্রকার খাবার ইত্যাদি থেকে এদেশের গরীবরা বঞ্চিত হয় না। Xmas pudding বড়দিনের একটী বিশেষ খাদ্য, সেটা এখানে ২৫শে ডিসেম্বর ধনী গরীব সকলেই খায়।

বড়দিন এদেশের পারিবারিক উৎসব। বড়দিনের দিন কেউ বাইরে যায় না, সবাই ঘরে আমোদ-আহ্লাদ করে। যদি কেউ বাইরে যায় তাহলে বুঝতে হবে সে নিরাশ্রয়, এমন কি বন্ধুবান্ধব পর্য্যন্ত তার নেই। বড়দিনের পরের দিন Boxing day. এ দিনটী ঠিক আমাদের দেশের যেন বিজয়ার দিন। এই দিনে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়ী যায় দেখা শুনা করতে। বিবাহিতা মেয়ে বড়দিনের দিন নিজের বাড়ীতে থেকে উৎসব করে, Boxing dayতে বাপের বাড়ী যায়।

মাতা

শ্রীমতী ভগবতী দেবী।

নমামি তোমারে দেবী তুমি মা জননী,
জগতে প্রত্যক্ষ তুমি মঙ্গলকারিণী।
প্রকাশিতে সৃষ্টি লীলা
ব্যষ্টিভাবে কর খেলা,
শক্তির আধার তুমি, শক্তি-স্বরূপিনী;
দুস্তরে তুমিই মা গো বিপদনাশিনী।

তুমি মা গো এ সংসারে পরমাপ্রকৃতি,
লয় কর একাধারে সৃষ্টি স্থিতি, সতি।
বুঝিবারে তব মর্ম্ম
মানবের নহে কর্ম্ম,
অনন্ত অতুল মা গো মহিমা তোমার;
ধরাতলে তুমি মা গো মোক্ষ-মূলাধার।

মার সম দয়া মায়া না হেরি জগতে,
স্নেহ প্রেম এত মা গো সম্ভবে কাহাতে?
জ্ঞানের অগম্যা তুমি
চিনিতে পেরেছি আমি,
অকাতরে পার দিতে হৃদয়-শোণিত
এমনই ভালবাসা তোমাতে নিহিত।

উপমা তোমারি শুধু তুমি ভূমণ্ডলে,
নিজ মুখ-গ্রাস দাও পুত্র-মুখে তুলে।
মাতৃনামে পাপ যায়
রোগ শোক দূরে হয়,
বুঝিব কেমনে মাগো স্বরূপ তোমার
—অকৃতি, অধমা, হীনা, আমি যে অসার।

একখানি ছবি

শ্রীবিশ্বমোহন সান্যাল।

রহিম সর্দ্দারের দৌরাত্ম্যে সে গ্রামের সকলেই সন্ত্রস্ত। বিশেষতঃ মেয়েরা ত রহিমের নাম শুনিলে সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলে। কত পরিবারের মর্য্যাদা যে তাহার হাতে নষ্ট হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই! কত লোক কত অভিশাপই না তাহাকে দিয়াছে! সত্যযুগ হইলে হয়ত তাহাতেই কাজ হইত, কিন্তু এটা নিতান্ত কলিযুগ কিনা—তাই এখনও রহিম সর্দ্দার গ্রামের জড়তাকে টিট্‌কারী দিয়া হাসিয়া খেলিয়া নিজের লালসাকে পূর্ণমাত্রায় মিটাইয়া লয়। সে হয়ত জানে যে, অভিশাপের পিছনে যদি মনুষ্যত্ব না থাকে, তাহা হইলে ভয়ের কিছুই কারণ নাই!

সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকার সবে মাত্র পৃথিবীর বুকে ঘনাইয়া আসিতেছিল। রহিমের দল তাড়িখানার আসর ছাড়িয়া শীকার সন্ধানে বাহির হইয়াছে। তাহাদের বিকট উল্লাস-ধ্বনিতে সকলেই ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া দিতেছে। পথের ধারের জানালা বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—রমনীদের কণ্ঠধ্বনি শব্দ হারাইয়া ফেলিয়াছে!

*   *   *

বেলা এই গ্রামে নূতন আসিয়াছে। সে গ্রামের জমিদারের একমাত্র কন্যা, কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া করে। এইবার নাছোড়বান্দা হইয়া সে বাবাকে লইয়া গ্রামের জমিদারী দেখিতে আসিয়াছে। রাজকৃষ্ণবাবু আজ ১৮।১৯ বৎসর পরে আদরিণী কন্যার অগ্রহাতিশয্যে গ্রামে আসিয়াছেন।

গ্রামের এই আকস্মিকস্তব্ধতায় বেলা কৌতূহলী হইয়া পড়িল। তাহার যৌবনোচ্ছ্বাসিত মনখানি ইহার কারণ জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল,—সে পথের উপর কার উদ্যানটীতে ছুটিয়া আসিল। ঠিক সেই সময়েই রহিমের সহিত তাহার দেখা। রহিমের দল লাফাইয়া উঠিল! বেলা ত অবাক্! এমন অসভ্য মানুষ কি করিয়া হয়, ইহাই হয়ত সে ভাবিতেছিল। কিন্তু সে কতক্ষণ? একটা লোক তাহাকে কোলে লইয়া ছুটিতে লাগিল। প্রথমটা বেলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু যখন বিপদের পরিমাণ সে বুঝিল, তখন সাহায্যলাভের জন্য চীৎকার আরম্ভ করিল—আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

রাজকৃষ্ণবাবু বেলার চীৎকার শব্দে বাহিরে আসিয়াই যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলন। পরক্ষণেই চাকরবাকর ও লোকজন আসিয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে যাহারা স্থানীয় লোক, তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হায় হায় করিতে লাগিল; কলিকাতা হইতে যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা বেলাকে উদ্ধার করিতে ছুটিল। কিন্তু কে কাহাকে ধরে? অন্ধকারের ভিতর রহিমের দল যে কোথায় মিশিয়া গেল, তাহা তাহারা ঠিক করিতেই পারিল না।

রাজকৃষ্ণবাবু থানায় ডায়েরী করিয়া রহিমের ডেরা খুজিয়া বাহির করিবার জন্য পুলিশের সাহায্য চাহিলেন। দারগাবাবু শিহরিতে শিহরিতে যে জবাব দিলেন, তাহাতে রাজকৃষ্ণবাবুর চক্ষুস্থির!

রাজকৃষ্ণবাবু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে লোক পাঠাইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সদলবলে গ্রামে পৌছিতে পরদিন ৮—৯টা হইয়া যাইবে। ইতিমধ্যে গ্রামের মাতব্বরদের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য সকলকে ডাকিয়া পাঠান হইল। সকলেই রহিমকে অভিশাপ দিতে দিতে রাজকৃষ্ণবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া জুটিলেন। কিন্তু কেহই রহিমের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু

করিতে রাজী হইলেন না। তাঁহাদের স্ত্রীপুত্র লইয়া ঘর করিতে হয় – কোন রকমে ধর্ম্মরক্ষা করিয়া বাস করিতে হয়!

সারারাত রাজকৃষ্ণবাবু ছটফট করিয়াছেন। ভোরের দিকে বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, হঠাৎ সেটুকু তাঁহার প্রিয় খানসামা রামচরণের চীৎকারে ভাঙ্গিয়া গেল! তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন অর্দ্ধমূর্চ্ছিত বেলাকে কোলে লইয়া রামচরণ,—আর চারিপাশে শুভানুধ্যায়ীর দল! সেই গণ্ডগোলের মধ্যে ব্যাপার কিছু জানিবার চেষ্টা না করিয়া রাজকৃষ্ণবাবু বেলাকে ঘরের মধ্যে লইয়া আসিলেন,—একজনকে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলেন।

ডাক্তার আসিয়া যথারীতি চিকিৎসা ও ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। যাঁহারা এতক্ষণ ভিড় জমাইয়া ছিলেন, তাঁহারাও একে একে সরিয়া পড়িলেন। এতক্ষণে রাজকৃষ্ণবাবুর যেন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। কি করিয়া বেলাকে পাওয়া গেল, তাহা জানিবার জন্য রামচরকে প্রশ্ন করিলেন।

রামচরণ কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, বেলাকে বাগানের পথের উপর অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া যায়।

*　*　*

ওদিকে গ্রামের মাতব্বরদের সভা বসিয়া গিয়াছে। রাজকৃষ্ণবাবু এ অবস্থায় কন্যাকে ঘরে স্থান দিতে পারেন কি না তাহা লইয়া শাস্ত্রীয় আলোচনা চলিতেছে। শেষ পর্য্যন্ত স্থির হইল যে হিন্দুধর্ম্মকে বাঁচাইতে হইলে রাজকৃষ্ণবাবুকে কঠিন হইতে হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।...

একটু বেলা হইলে যথাসময়ে রাজকৃষ্ণবাবুর কাণে এই কথা পৌঁছিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন "হাঁ, আমাকে কঠিন হইতে হইবে। যে সমাজের বিপদ ঠেকাইবার ক্ষমতা নাই, অথচ বিধান দিবার দুঃসাহস আছে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে,—ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মেয়েকে আমার বুকে করিয়াই রক্ষা করিতে হইবে।"

বৃদ্ধের দল ছিছিক্কার করিতে লাগিলেন,—তরুণের দল বিস্ময়-সম্ভ্রমে রাজকৃষ্ণবাবুর উদ্দেশে মাথা নত করিল।

মাতৃস্নেহ

শ্রীঅন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী, বাণীবিনোদ।

হ'কনা রাজা, বাদসা, নবাব
　　হ'কনা ফকির নিঃস্ব দীন,
হ'কনা প্রভু, ভৃত্য, পাপী
　　হ'কনা ত্যাগী, সর্ব্বহীন,
মায়ের স্নেহ, মায়ের আদর
　　ভালবাসার বিভেদ নাই,
বিশ্বমাঝে মূর্ত্তিমতী
　　করুণা তাঁর দেখতে পাই।

মায়ের কাছে সবাই সমান
　　আপন পরের নাইক বিচার,
সবাই সেথায় অবোধ ছেলে,
　　সবাই মাতার রত্ন হিয়ার;
শক্তিরূপা বিশ্বমাতা
　　তোমায় নমি ভক্তি ভরে,
শক্তি দেহ, ভক্তি দেহ,
　　মুক্তি দেহ সন্তানেরে।

ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিণয়

(আলোচনা)

শ্রীমতী বিরজাসুন্দরী দেবী।

আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বর্ত্তমান সময়ে কি ভাবে হইতেছে এবং ইহার পরিণাম কি দাঁড়াইতেছে তাহা অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন। শিক্ষা সম্বন্ধে এখন অনেক আলোচনাও চলিতেছে কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য যে চরিত্র গঠন, সে দিকে আমাদের মোটেই দৃষ্টি নাই। 'আমাদের শিক্ষার মূল মন্ত্র হইতেছে ত্যাগ ও সংযম, এখন সেই ত্যাগ ও সংযমের অর্থ হইয়াছে উল্টা। আপনাকে দেশের ও দশের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়াই ত্যাগ। এখন ত্যাগ অর্থে কর্ম্মত্যাগ, ও নিতান্ত ঘৃণিত ভিক্ষাবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া আজ দেশ এত দরিদ্র, এত কাঙাল। এখন অর্থই হইয়াছে আমাদের শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। কাজেই আর কোন দিকে দৃষ্টি দিবার ইচ্ছা ও শক্তি আমাদের নাই এবং সকলের ইচ্ছা না হইলে অল্পসংখ্যক লোকের ইচ্ছায় শিক্ষার নিয়ম পরিবর্ত্তন হওয়াও অসম্ভব।

আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি আমাদের ছেলেমেয়েদের দিন দিন কি শোচনীয় অবস্থা হইতেছে, তথাপি স্কুলকলেজের ভূরি ভূরি পুস্তকের মধ্যে আমাদের জাতির জীবন যুবকগণ যখন স্বাস্থ্য ও আয়ু হারাইয়া ডিগ্রী লইয়া বাহির হইয়া আসে তখন আমাদের আনন্দ আর ধরে না! আমরা বুঝি না যে আমাদের লাভের ঘরে কতটা জমা থাকিল আর ক্ষতির ঘরে কতটা বাদ পড়িল। যাহারা "ভাল-ছেলে" নাম পাইয়া ইউনিভারসিটির উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বাহির হইয়া আসে, তাহাদের দিকে চাহিতে প্রাণ উড়িয়া যায়, চোখে জল আসে, মনে হয় ইহারাই কি আমাদের জাতীয়-জীবনের ভিত্তি, ভবিষ্যতের আশা-ভরসা? এমনি করিয়াই উচ্চ শিক্ষার মোহে আমাদের জাতি ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। আমরা দেখিয়া শুনিয়া প্রতিকারের কোন উপায়ই উদ্ভাবন করিতেছি না। কেনই বা ইহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে, কি প্রকারে ইহার কিঞ্চিৎ প্রতিকার হইতে পারে, সে বিষয় একটু আলোচনা করিবার জন্যই আমার এ প্রবন্ধের অবতারণা।

বড়লোকের বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের ভাল আহারের বন্দোবস্ত থাকে আবার (টিফিন আওয়ারে) বাড়ী হইতে দরোয়ান কিম্বা ঝি স্কুলে জলখাবার লইয়া যায়, তাহাদের পড়ার খাটুনীও কিছু কম, গৃহশিক্ষক অনেক সাহায্য করে। গরীবের ছেলেদের অবস্থার সঙ্গে স্কুল কলেজের ব্যবস্থার খাপ খায় না বলিয়াই তাহাদের হইয়াছে মরণ। দরিদ্রের সন্তান জন্মিয়াই জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভাবকে অনুভব করিতে থাকে এবং অনেকেই উহা দূরীকরণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া স্বাস্থ্যের প্রতি মোটেই লক্ষ্য রাখে না বা ভীষণ দারিদ্র্যবশতঃ লক্ষ্য রাখিতে পারে না। মায়ের হয়ত সংসারের সমস্ত কাজ শেষ করিয়া রান্না করিতে হয় বলিয়া রান্নায় বিলম্ব হয়। ছেলেকেও হয়ত অনেক পথ হাঁটিয়া স্কুলে যাইতে হইবে বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র আহার করিতে হয়! ফলে কোন দিন অর্দ্ধসিদ্ধ ডাল ভাত খাইয়া, কোন দিন বা আলু-ভাতে ভাত খাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে স্কুল অভিমুখে দৌড়িতে হয়। সারাদিন ঐ ভাবেই কাটে, ছুটীর পর ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্ন দেহটী লইয়া বাড়ী ফিরিয়া ঠাণ্ডা ভাত আর ডাল বা কিছু তরীতরকারী খাইয়া জীবন ধারণ করে এবং ক্রমে স্বাস্থ্য ভঙ্গ

করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শিক্ষার পদ্ধতি পরিবর্ত্তন যদি নিতান্তই অসম্ভব হয় তাহা হইলে ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুলে জলযোগের ব্যবস্থা থাকা উচিত। স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়াইতে হইলে যেমন বেতন দিতে হইবেই, সেই সঙ্গে জলযোগের ব্যবস্থার জন্য আরো কিছু ধরিয়া লইয়া বাধ্যতামূলক করিয়া লইলে সেটি প্রত্যেকেই দিবে। সেখানে ধনী দরিদ্র সকলের নিকট হইতে সমান হারে লইতে হইবে এবং সকলের জন্য সমান ব্যবস্থা থাকিবে। এইরূপ ব্যবস্থা না করিলে আমাদের ছেলেমেয়েদের বাঁচিবার উপায় নাই।

পাঠ্যাবস্থায় ছেলেদের শরীর পুষ্টির জন্য প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর আহারের দরকার। তাহা ত জোটেই না, তাহার মধ্যে আবার ফুটবল খেলার অনুকরণ করিতে গিয়া নির্জ্জীব বাঙ্গালী যুবকগণ আরো ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। এই খেলাতে শরীরের যতটা শক্তির ক্ষয় হয় তাহা পূরণ করিবার মত আহার কয়জন যুবকের ভাগ্যে জোটে? অথচ এই খেলার জন্য ছেলে বুড়ো অনেকেই কোমর আঁটিয়া লাগিয়া যান, ছেলেদিগকে উৎসাহিত করেন;—খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই! জাতিকে বাঁচাইতে হইলে এই দরিদ্র দেশের ছেলেদের ফুটবল খেলা বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য কিনা তাহাও একটু বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত নয় কি?

মেয়েরাই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি, কারণ তাহারা মাতা। এইজন্য মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আমরা আজকাল ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা একভাবে করিতেছি বলিয়া মেয়েরাও কেবল অর্থকরী বিদ্যাই শিখিতেছে। ছেলেদের ত অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার ফল বর্ত্তমানে ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, দুই চারি বৎসর পর মেয়েদেরও তাহাই হইবে না কি? মেয়েরাও তো সংখ্যায় নেহাৎ কম পাশ করিতেছে না। ক্রমে তো এই পাশের সংখ্যা বাড়িতেই থাকিবে, তখন তাহাদের জন্য কি ব্যবস্থা হইবে? তাহারা সূতা কাটিয়া বস্ত্র বয়ন করিয়া অথবা ঐ রূপ কোন গৃহশিল্প করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারিবে কি? পারিলেও তখন পুনরায় নূতন করিয়া সেই সমস্ত শিল্প শিক্ষা করিতে সময় লাগিবে না কি? এইরূপ শিক্ষার ফলে সাংসারিক জ্ঞান একেবারেই হইতেছে না। মেয়েদের এই প্রকার শিক্ষা অন্নবস্ত্রহীন দরিদ্র বাঙ্গালীর পক্ষে নিতান্ত বিষময় হইয়া উঠিতেছে। কেবল বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিতে যাইয়াই তাহারা তাহাদের হৃদয়ের প্রধান বৃত্তিগুলি অর্থাৎ ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালবাসা, সেবা, সহিষ্ণুতা এককথায় বলিতে গেলে মাতৃত্ব হারাইয়া ফেলিতেছে। এ কথায় কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, শিক্ষা দ্বারা এসব হারাইবে কেন বরং ভালমন্দ বুঝিতে পারিয়া এইসব গুণে আরো বিভূষিতা হইবে। কিন্তু ইহা ভুল। এই সমস্ত গুণ লাভ করিতে হইলে শৈশব হইতে পারিবারিক শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং সে শিক্ষা মাতা কিম্বা অভিভাবিকাদের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া, তাঁহাদের কাজের সাহায্য করিয়া শিখিতে হয়। দেখিয়া শুনিয়া যে শিক্ষা হয় পুস্তক পাঠে তাহা হয় না। আজকালকার স্কুল কলেজে পড়া মেয়েদের পক্ষে সে শিক্ষা পাওয়া অসম্ভব, কারণ তাহাদের সকালে উঠিয়া স্কুল কলেজের পড়া, তারপর স্নান, আহার, অল্প বিস্তর প্রসাধন করিয়া সাড়ে ন'টা দশটার মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়, গাড়ী বা মোটরের প্রতীক্ষায়। তারপর স্কুলে রওয়ানা, সেখান হইতে ফিরিতে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা, তারপর খাওয়া, চুল বাঁধা ইত্যাদি আছে। তারপর আবার সন্ধ্যার পর পড়া। সারাদিন সংসারের কাজকর্ম্ম, রন্ধন, সন্তান পালন, রোগীর সেবা ইত্যাদি কি ভাবে চলে তাহারা এই সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলির খোঁজখবর করিবারও অবসর পায় না, মাতা প্রভৃতিকে একটু আধটু সাহায্য করা তো

দূরের কথা। আমরাও কতকগুলি পুস্তক অধ্যয়ন করিতে শিখাইয়াই মেয়েদের শিক্ষিতা বলি, তাহারাও তাই বোঝে। মেয়েদের শিক্ষাটা ঠিক পুরুষদের অনুকরণে না হইয়া, যাহাতে তাহাদের গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম করিবার অভিজ্ঞতা জন্মে, স্বাস্থ্য অটুট থাকে তাহা করাই বোধ হয় আমাদের দরিদ্র দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। তবে প্রত্যেক মেয়েরই কিছু কিছু ইংরাজী শিক্ষা করা দরকার তাহা না হইলে মেয়েরা অনেক কিছু জানিবার বুঝিবার বিষয় হইতে বঞ্চিত থাকে।

তারপর স্বাস্থ্য। এই যে ৭।৮ ঘণ্টা না খাইয়া স্কুলে বদ্ধ থাকিয়া পড়া, এরই জন্য অধিকাংশ মেয়েদের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে; মাথাধরা, দৃষ্টিহীনতা, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি রোগ একচেটিয়া হইয়া বসে এবং দুএকটী সন্তান প্রসব করিয়াই কেহ কেহ এমন রুগ্না হইয়া পড়ে যে চিরদিন তাহাকে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ইহার ফলে অনেকেই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া অসহায় শিশুদের মাতৃহীন করিয়া যায় এবং মাতৃহীন শিশুরাও শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে; যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারাও চিররুগ্ন হয়। ইহারাই আমাদের ভবিষ্যৎ-বংশধর! এইত গেল সহরের উচ্চশ্রেণীর লোকের শিক্ষার কথা, পল্লীর শিক্ষা আবার ইহার বিপরীত; নিরক্ষর বলিয়া তাহাদের না আছে স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান, না আছে প্রসূতি ও শিশুরক্ষার জ্ঞান। নিতান্ত অযত্নে শিশুর প্রাণ নষ্ট হয়, কিন্তু তাহাদের বিশ্বাস অপদেবতার দৃষ্টিতে মারা যায়।

আমাদের দেশে একদিকে যেমন শিক্ষার চাপ, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষার অভাব, এই দুইটাই ভীষণ মারাত্মক হইয়া আমাদের জাতীয়-জীবন ধ্বংস করিতে বসিয়াছে। জাতিকে বাঁচাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে স্বাস্থ্য ও চরিত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। আর শিক্ষাটা যাহাতে ধর্ম্ম ও নীতি-মূলক হয় সে বিষয়েও বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে; ইহাই ভারতের বৈশিষ্ট।

তারপর পরিণয়ের কথা। পারিবারিক শিক্ষায় যাহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতির, এমন দুইটী পরিবারের মধ্যে বিবাহসূত্রে মিলন হইলে প্রকৃতগত বৈষম্যের জন্য মিলন মধুর হইতে পারে না। মানুষের রুচি চিরদিনই ভিন্ন প্রকারের আছে এবং থাকিবে। নিজেদের ইচ্ছামত বধূকে গড়িয়া তুলিবার পক্ষে বাল্যবিবাহ অনুকূল হইতে পারে, কিন্তু তাকে লেখাপড়া শিখান ও স্বাবলম্বী করান'র পক্ষে বাল্যবিবাহ নিতান্ত প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। উত্তমরূপে জ্ঞানের উন্মেষ না হইতেই জড়তার বেষ্টনী দিয়া মেয়েদের বিবাহ দেওয়াতে তাহারা তাহাদের বিবেক হারাইয়া ফেলিয়াছে। কাজেই বাল্যবিবাহ সমীচীন নহে। পিতামাতা পুত্রকন্যাকে যেরূপ ভাবে শিক্ষা দিবেন, বিবাহ দিবার সময় সেইরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে যাহাতে বিবাহ হয় তাহাই দেখিবেন। তাহা হইলে তাহাদের জীবনযাত্রা সুখের হইবে। এ বিষয়টা আর একটু বিশদ করিয়া লিখিতেছি। যেমন,—দুইটী শিক্ষিত পরিবার, দুই দিকই আর্থিক অবস্থায় উন্নত, এক পরিবার সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত, অন্য পরিবারের শিক্ষা প্রকৃত হিন্দুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দুইটী পরিবারের মধ্যে যদি বিবাহবন্ধন স্থাপিত হয়, তাহা হইলে পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন মেয়ে হিন্দুত্বে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে না। সে চাহিবে, তাহার অভ্যাসমত চলিতে কিন্তু দেখিবে সকলই বিপরীত। তেল মাখা, আলতা পরা অসভ্যতা মনে করিবে; জুতো পায়ে না দিলে হাঁটিতে কষ্ট ও পায় ব্যথা পাইবে; খদ্দরের শাড়ী পরিলে শরীরের চামড়া উঠিয়া যাইবে মনে করিবে; নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া শ্বশুর, শাশুরী, স্বামী, দেবর, ননদ প্রভৃতি আত্মীয়পরিজন ও দাস-দাসীকে খাওয়ানকে সে সবচেয়ে হীন কাজ মনে করিবে; শ্বশুর, শাশুরী, স্বামী প্রভৃতির সেবা করা-ফরমাইস খাটা, এবং সন্তানপালনকে সে আয়া খানসামার কাজ বলিয়া মনে করিবে। এইরূপ শিক্ষা-

বৈষম্যের দরুণ চরিত্রবান, বিদ্বান, ধনবান স্বামীকেও সে প্রাণের সহিত গ্রহণ করিতে বা সুখী করিতে পারিবে না এবং সংসারে একটী অশান্তির সৃষ্টি করিবে।

আবার ঐরূপ নিষ্ঠাবান হিন্দুঘরের সুশিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ে সাহেববাড়ী যাইয়া সুখী হইতে পারিবে না। তার লজ্জা, বিনয়, সহিষ্ণুতা দেখিয়া স্বামী ও তাহার আত্মীয় লোকেরা অশিক্ষিতা বলিয়া তাহাকে ঘৃণা ও উপেক্ষার চক্ষে দেখিবে। ভারতীয় নারীর যেগুলি প্রধান গুণ সেগুলিই তাহাদের নিকট দোষের বলিয়া গণ্য হইবে। একজন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয়শিক্ষার প্রভাবে প্রাণপণ ধর্ম্মের সহিত পত্নীর কর্ত্তব্য পালন করিতে চাহিবে, আর একজন পতিপ্রাণা সাধ্বী পত্নীকে অকুণ্ঠিত চিত্তে ত্যাগ করিয়া মনের মত পত্নী গ্রহণ করিতে চাহিবে বা করিবে? আমাদের জাতীয় শিক্ষা এমন একটী ধর্ম্ম ও নীতির মূলে স্থাপিত যে, সে ভাবে যাহারা শিক্ষা পাইয়াছে, তাহারা কখনই এই পবিত্র বিবাহ-বন্ধনকে নিঃশঙ্কচিত্তে ছিন্ন করিয়া, দ্বিতীয় বার পতি বা পত্নী গ্রহণ করিয়া সুখী হওয়ার কল্পনা মনেও আনিতে পারেনা। পাশ্চাত্য মিলনের মধুরতা কল্পনার চক্ষে দেখিয়া, আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন মুগ্ধ হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের ভবিষ্যত ভীষণতার বিষয় উপলব্ধি করিবার সময় নয় বলিয়া সে কথা তাহাদের মনে আসেনা। পরে যখন মোহ ছুটিয়া যায়, তখন ভীষণতা অনুভব করে এবং তাহা হইতে রক্ষা পাওয়ার আর উপায় থাকে না। সেই জন্য পুত্রকন্যাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিণয় সম্বন্ধে পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবক অভিভাবিকাদের বিশেষ ভাবে বিবেচনা করাই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল-জনক। ভারতের শিক্ষা ভারতীয় ভাবে ও বাঙ্গালার শিক্ষা বাঙ্গালার বৈশিষ্ট রক্ষা করিয়া হওয়াই বোধ হয় উত্তম। এ বিষয়ে নবযুগ-প্রবর্ত্তকদের দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আগে জাতির প্রাণ রক্ষার সমস্যা সমাধান করিয়া পরে অন্য চিন্তা করা উচিত বলিয়া মনে করি।

শেষ করে দাও

শ্রীমতী শোভা রুদ্র।

চোখের পরে এই যে আলো,
এই যে কলরব,
ব্যর্থ প্রাণের এই যে হাসি
জাগায় অভিনব,
শেষ করে দাও আজকে স্বামি,
এসব কিছুই চাইনি আমি,
চাইগো শুধু ভগ্ন-প্রাণের
ক্রন্দনেরি রব;
শেষ করে দাও শেষ করে দাও
—শেষ করে দাও সব!

তোমার আলো তোমার বাতাস
ব্যর্থ সে সব আজ,
মিথ্যা তোমার আনা-গোনা
মিথ্যা সকল কাজ;
তোমার ডাকা তোমার আসা,
মিথ্যা তোমার ভালবাসা,
ব্যর্থ তোমার সান্ত্বনা গো—
ব্যর্থ এসব সাজ;
শেষ করে দাও এ সব প্রভু
শেষ করে দাও আজ!

অসমাপ্ত

(গল্প)

শ্রীমতী স্নেহময়ী মিত্র।

লোকে তাকে পাগল ব'লত, আমিও তাকে পাগল বলেই জানতুম। সে থাকত আমাদের সামনের লালরঙের বাড়ীটায়। বি-এ পাশ করে ডাক্তারী পড়ছিল সেই সময় মাথা খারাপ হ'য়ে যায়, লোকে বলে পড়ে পড়ে তার মাথা গরম হয়ে গেছে। সে বাপমার এক ছেলে, কাজেই ডাক্তারটাক্তার অনেক আসে শুনেছি, ডাক্তার এলেই না কি পাগল দরজায় খিল লাগিয়ে দেয়, মার শত অনুনয় বিনয়েও সে সেদিন দরজা খোলে না। সে এক আশ্চর্য্য শ্রেণীর পাগল।

পাগলের বিষয়ে মনোযোগ দেবার মত আগ্রহ আমার ছিল না, তাই কেউ বলতে এলে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে উঠতুম। ছাদে উঠলে দেখতুম সে একখানা মোটা খাতা নিয়ে ছাদে পায়চারি করছে, দেখলে ত পাগল বলে বোধ হত না। আমার ছোট বোন লতি তার সঙ্গে নাকি আলাপটা বেশ জমিয়ে নিয়েছে, সে যখন তখন এসে তার সত্যদা'র (পাগলের নাম সত্যেন্দ্র) গল্প করে।

একদিন লক্ষ্য করে পাগলকে দেখলুম—মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, চোখ দুটি আশ্চর্য্য রকমের, তীক্ষ্ণ তরয়ালের মত কখন ঝক্ ঝক্ করে কখন বা শান্ত নীরব থাকে। মরমের বাতায়ন যেন সদাই মৌন ব্যথা-ভরে নত, দেখলেই মনে হয় কত নীরব বেদনা গোপনে সে বহন করছে। লতি বলে তার সত্যদা পাগল নয়, সে তার সঙ্গে কেমন কথা কয়, তবে মিছিমিছি লোকে কেন তাকে পাগল বলে?

সেদিন তাকে একটু আগ্রহভরেই দেখছিলুম, কৌতুহলও বলা চলে। পাগল অন্যমনস্ক ছিল। আমার হাতের সোনার চুরির শব্দে সে বিস্ময়ভরে তার কাল কাল চোখ দুটি তুলে আমার দিকে চাইল, আমি লজ্জিত হয়ে থামের আড়ালে সরে গেলুম।

একদিন লতি শুষ্ক মুখে এসে বল্লে "দিদি সত্যদা'র ভারি জ্বর, কি হবে ভাই?" মনটা একটু দমে গেল। কি জ্বালা, লতির মত আমাকেও ভুতে ধরল নাকি! কোথাকার কে একটা পাগল, তার জ্বর হয়েছে ত আমি ভেবে মরি কেন? যাই হোক লতিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম "সামান্য জ্বর, ভাল হয়ে যাবে খ'ন।" কিন্তু লতি যেন সারাটা দিন অস্বস্তিতে কাটিয়ে দিলে। পরদিন এসে বল্লে "দিদি, সত্যদার জ্বর ভয়ানক বেড়ে গেছে, জ্ঞান নেই, সত্যি বল না ভাই সত্যদা বাঁচবে কি না?"

তার ভাসা ভাসা চোখ দুটো জলে ভরে এল, কোলের কাছে তাকে টেনে নিয়ে তার গুচ্ছ গুচ্ছ চুলের ভিতর আঙ্গুল দিয়ে নাড়তে নাড়তে আদর করে বললুম "ভয় কি, তোর সত্যদা নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে।" আমার সান্ত্বনায় জানি না সে বিশ্বাস করল কি না; মনমরা ভাবে চলে গেল। তারপর একদিন সকালে শুনলুম পাগল মারা গেছে।

দু চার দিন পরে দুপুরে বসে পড়ছি, লতি একটা খাতা নিয়ে ঘরে ঢুকে বল্লে "সত্যদার ভাঙ্গা টিনের বাক্সোটা গুছুতে এই খাতাটা পেয়েছি, তুমি নেবে দিদি?" খাতাটা দেখেই বুঝলুম এইটাই নিয়ে পাগল ছাতে বেড়াতো। সাগ্রহে লতির হাত হতে খাতাটি নিলুম, মলাট খুলে দু চার লাইন পড়েই বুঝলুম এ পাগলের মনের কথা;—যাই হোক পড়েই দেখি না। তাতে লেখা আছে—

"লোকে আমায় পাগল বলে কেন? আমি কি সত্যই পাগল! তারা ত আমার বেদনার সুর কখন অনুভব করেনি, আমার হৃদয়ের গোপন ব্যাথা ত কখন শুনতে আসেনি, তাই বোধ হয় আমি লোক-চক্ষুর কাছে পাগল। আচ্ছা, যাকে পাবার আশা কখন করিনি বা করতে পারি না, যে আমার চোখের সামনে একদিন সম্পূর্ণ অপরিচিতা ছিল কেন তার স্বর শুনে প্রাণ কেঁপে উঠে? একি বিড়ম্বনা!…

"যে শুনবে সে আমাকে পাগল বলবে তবু আমি নিজেকে পাগল বলে ভাবতে পারব না। একদিন অকস্মাৎ যখন ধূমকেতুর মত ভাবের ধারা আমার হৃদয়ে এসে উদয় হল, কে জানত তখন প্রাণ আমার মানসীর সন্ধানে ছুটবে! তাঁরা থাকতেন আমার পাশের বাড়ীটায়। তাঁদের সঙ্গে প্রথম আলাপ করিয়ে দেয় রমেন, সে অসিতবাবুর ভাগ্নে। প্রথম দিন যখন তাঁদের বাড়ী গেলুম অসিতবাবু হাস্যমুখে অভিবাদন করে বসালেন এবং তাঁর দুই মেয়েকে ডাকতে পাঠালেন। দুজনেই এসে আমার দিকে একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ারে বসল। অসিতবাবু বললেন "সত্যেনবাবু, এই আমার দুই মেয়ে—অমিয়া আর অমিতা।" তারপর মেয়েদের দিকে চেয়ে বললেন "এঁর নাম সত্যেন্দ্রনাথ বসু।"

"বড় মেয়ে অমিয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবে নমস্কার করিয়া কহিল "হ্যাঁ, অপনি ত আমাদের পাশের বাড়ী থাকেন, না? রমেনদা একদিন বলছিল।" অসিতবাবু স্নিগ্ধ স্বরে বললেন "অমিতা, যাও ত মা রমেন আর সত্যেনবাবুর জন্য দু কাপ চা নিয়ে এস ত।" আমি বললুম, "এক কাপই আনুন, আমি চা খাইনা।" অসিতবাবু আগ্রহভরে বললেন "না না এক কাপ খান না।" অমিয়া হেসে বলল "কেন বাবা মিছে ওঁকে জোর করছ, ওঁর হয়ত অভ্যাস নেই।" অমিতা কিন্তু একটীও প্রতিবাদ না করে চলে গেল। একটু পরেই ট্রেতে টি-পট ইত্যাদি নিয়ে এসে টেবিলের উপর রেখে সে চা তৈরি করতে লাগল, আশ্চর্য্য হয়ে দেখলুম সে দু কাপ চা করে, রমেনকে এক কাপ দিয়ে আর একটী কাপ আমার দিকে ঈষৎ ঠেলে দিয়ে চলে গেল। পরক্ষণেই দু ডিস্ খাবার নিয়ে এসে রমেনের সামনে এক ডিস্ রেখে আমার সামনে অপর ডিস্‌টি রাখতে রাখতে হেসে বল্লে "অতিথিকে মিষ্টিমুখ করাতে হয়, না বাবা, আপনি কি বলেন?" অসিতবাবু হাস্যমুখে বললেন "সত্যেনবাবু, আমি অমিতার মতেই মত দিচ্ছি, আপনার বোধহয় আর আপত্তি নেই।" আমি হেসে বললুম "না, আপনারা যখন এত করে অনুরোধ করছেন তখন প্রত্যাখ্যান করবার সাধ্য আমার নেই।" পরিচয়ে জানলুম অমিয়া বিবাহিতা, তার স্বামী বম্বের একজন উকিল; অমিতা কুমারী।

"অসিতবাবুদের বাড়ী প্রায়ই যেতুম। সন্ধ্যাবেলা পড়তে বসতুম কিন্তু ওবাড়ী থেকে যখন পিয়ানোর সুরের সঙ্গে ভেসে আসত—

"তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
মম বিজন গগন বিহারী
তুমি আমারি তুমি আমারি"…

তখন কেন যে জানি না সব ভুল হয়ে যেত, মনে মনে সত্য সত্যই লজ্জিত হয়ে পড়তুম। কদিনেরই বা চেনা কিন্তু তবু অসিতবাবু আমায় তাঁর আত্মীয়ের মতই স্নেহ করে গ্রহণ করেছেন যে!……

"একদিন সন্ধ্যাবেলা গিয়ে দেখি বৈঠকখানায় সবাই বসে আছেন, অমিতা পিয়ানো বাজাচ্ছে। আমি যেতেই নমস্কার করে সে বল্লে "আসুন, একটু পিয়ানো বাজান।" আমি বিনীত স্বরে বললুম "আমি তেমন ভাল জানি না।" সে হেসে বল্লে "তা বললে চলবেনা, রমেনদা বলছিল আপনি খুব ভাল গান গাইতে পারেন, আমরা বুঝি একটাও শুনব না, কেবল বন্ধুকেই শোনাবেন?" কি করি, তখন গাইলুম—

"মাঝি, তরী হেথা বাঁধবোনাকো আজকে সাঁঝে,
ওপারের ওই ঘাটেতে
এমনি সাঁঝে আমার প্রিয়া
যেত ছোট কলসটিকে
কোমল তাহার কক্ষে নিয়া"…

"গানের শেষে চেয়ে দেখলুম সকলে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে উঠে পড়লুম; গাড়ীবাড়াণ্ডায় নামতেই দেখি অমিতা সামনে দাঁড়িয়ে। সে আমার দিকে চেয়ে মৃদু অভিমান-দীপ্ত স্বরে বল্লে "ওঃ এমন করুণ গানও গাইতে পারেন?—জীবনে আর কখন আপনাকে গান গাইতে বলব না।" তার অশ্রুভারাক্রান্ত স্বর শুনে কি বলতে যাচ্ছিলুম কিন্তু চেয়ে দেখলুম সে অদৃশ্য হয়ে গেছে, থামের আড়ালে শুধু তার রঙ্গীন শাড়ীর আঁচলটুকু একবার চোখে পড়ল।

"বাড়ী এসেই লজ্জায় মনটা নুয়ে পড়ল। সত্যই ত এ গান গাইবার আমার কি দরকার ছিল! তার সেই অশ্রুভরা স্বর আমার প্রাণে এসে দারুণ আঘাত দিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম তার সামনে আর কখন গান গাইব না। রমেনটাই ত এই কাণ্ড ঘটালে, কি দরকার ছিল তার সকলের সামনে বলে বেড়ানো—আমি গান জানি! সে যদি অমিতার কর্ণগোচর না করাত তা হলে আজ হয়ত আমাকে এত অপ্রস্তুত হতে হ'ত না। অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হতে লাগল। গান আর কখন গাইবোনা—প্রতিজ্ঞা করলুম। মাঝে মাঝে যে গুণ্ গুণ্ করতুম তাও নীরব হল, কিন্তু তার কণ্ঠ ত কোন দিন নীরব দেখিনি, সে যখন গাইত—

"আমার প্রাণের গানের ঝরণা
হেথা ফুলে ফুলে ফুটিয়া
যেন তারার মত ছুটিয়া"…

তখন তার গানের সুরের সঙ্গে শত আনন্দের কণা তারার মত ছুটে এসে আমার প্রাণের ভিতর বিঁধত!

"তবু তাদের বাড়ী যেতুম। অসিতবাবু এক একদিন গান গাইতে বলতেন, আপত্তি করেই সে অনুরোধ এড়াতুম। সে বোধহয় কারণ কি বুঝেছিল, তাই কোনদিন গাইতে বলত না। আমিও বাঁচতুম, গান গাওয়া ত নয় সকলের সামনে হৃদয়কে খুলে দেওয়া। সেত কখন আমার কাছে কোন সঙ্কোচ করেনি, আমার কিন্তু তার সঙ্গে কথা কইতে একটু সঙ্কোচ আসত, ভাবতাম কাজ কি, দূরে দূরে থাকাই ভাল কিন্তু হৃদয় যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, ফিরব কি করে? ওঃ ভুলে যাচ্ছি, ফিরতেই যে হবে আমার!……

"কি অশান্ত হৃদয় আমার! ভয়ানক দুর্ব্বল আমি, কিছু সহ্য করতে পারি না, সকলের সামনে কেবলি আমার দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে ফেলি। না, আর এখানে থাকা হবে না! ছুটিতে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলুম।

"একদিন সকালে আমার হাতে এল গোলাপী খামে করা একখানি বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র। হঠাৎ প্রাণটা কেঁপে উঠল। খুলতেই দেখলুম যা ভেবেছিলুম তাই-ই ত! অমিতার বিয়ে, অসিতবাবু আমায় সাদরে নিমন্ত্রণ করেছেন।

ভাঙ্গাচোরা হৃদিখানি কোন দিন কি জোড়া যাবে না? কোন দিন কি কেউ আসবে না, আমার এই ব্যথার কাহিনী শুনতে? লোকে হয়ত বলবে পাগলের আবার কাহিনী কি? চিরদিন হয়ত ব্যথার বোঝা বুকে করেই জীবনটা কেটে যাবে! থাক্, বাজে কি লিখছি, এর সমাপ্ত হয়ত কোন দিন হবে না, অসমাপ্তই থাকবে! জীবনের গতি আমার কোন দিকে ফিরেছে কে জানে!…

কন্যাশোকে*

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় কবিগুণাকর বি-এ।

তপি,

তোরে চিতায় দেবার আগে
ওরে আমার স্নেহের নিধি,
কেন নাহি গেলাম আমি,
হায় কি কঠোর ভাগ্যবিধি!

ওরে আমার মাতৃহারা
কোথা আজ্ তোর বিয়ে দিয়ে
জগৎ-আলো করা জামাই
আন্‌ব ঘরে সাজাইয়ে।

তোদের যুগল মূর্ত্তি হেরে
কতই সুখ না পাব মনে,
হায় রে এরূপ কতই আশা
পুষেছিলাম সংগোপনে!

আজ্‌কে সকল আশা ছিন্ন
সকল সাধে পড়ল ছাই,
নে' মা আমায় সঙ্গে করে
আর না হেথা থাক্‌তে চাই।

সকাল থেকে রাত্রি ন'টা
শরীরটাকে জীর্ণ করে'
খেটে খেটে হ'তাম সারা
তোর তরেই মা বেঁচে মরে!

তোরই মুখের পানে চেয়ে
সকল কষ্ট যেতেম ভুলি,
পেতাম যেন নবীন দেহ
শুনে মা তোর মিষ্টি বুলি।

ছিলি গরীব বাপের মেয়ে
আমার সাধ্যমত তবু
খাওয়া পরার দিইনি কষ্ট
করি নাইক ক্রটী কভু।

তবে অনেক সময় মা গো
ঠিক্‌টি আমার মনের মত
পারি নাইক দিতে থুতে—
আজ্ তা' ভেবে জলছি কত!

কারণ মা ত জানিস্ সবি
এ সংসারের সকল ভারই
আমাকেই হায় বইতে হতো
—আর আর সবাই অবতারই!

হায়রে এখন সে সব কথা
জাগ্‌ছে কেবল মনের কোণে,
মার্‌ব কারে? মর্‌ব কি আজ্?
—বেঁচে আছি পাগল বনে'।

তুই যে মা গো উবে যাবি
এক নিমিষে এম্‌নি করে'
আগে যদি জান্‌তেম কভু
বক্‌তেম কি মা ভুলেও তোরে?

বল্‌ব কি আর নাইক উপায়
এখন মরণ হলে বাঁচি,
তোরে ছেড়ে এ কটা দিন
কেমন করে বেঁচে আছি!

আজ্‌কে আমার মেরুদণ্ড
ভেঙ্গে দিয়ে গেছিস্ চলে,
খেটে খাবার শক্তিটুকু—
সে টুকুও গেচিস্ দলে!

আজ্‌কে আমি জড়ের মত
একেবারেই কাজের বা'রে—
তোরই স্নেহের মঞ্জুষায় মা
এ প্রাণটুকু ছিল—হা-রে!

---

* ৺তপিমা দেবী—বয়স ১১ বৎসর, কালাজ্বরে মৃত্যু—১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ শুক্রবার রাত্রি প্রায় ২টা। কাব্য-সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগিণী ছিল—এই বয়সেই বেশ সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিত।

একখানি পত্র

শ্রীমতী মোহিনী দেবী।

কল্যাণীয়—

পূর্ব্বপত্রে নারীনির্য্যাতন সম্বন্ধে আর দুএকটি কথা লিখিব বলিয়াছিলাম তদনুসারে আজ আবার একখানা চিঠি লিখিতেছি।

বাঙ্গলার কোন একটি বিখ্যাত গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার বাস করেন, বালিকাবধূদের নির্য্যাতন করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করাই ইহাদের এক প্রকার পেশা। এই পরিবারের কর্তৃপক্ষ বাড়ীর একটী পুত্রের বিবাহ দিয়া সামান্য একটু কারণে বধূকে একাধিক্রমে ষোল বৎসর পিত্রালয়ে যাইতে দেন নাই। বধূর পিতা অন্তিম-সময়ে কন্যাকে একবার শেষ দেখা দেখিতে চাহেন কিন্তু হতভাগ্য পিতার সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নাই। বর্ত্তমানে বধূটি যদিও দুই তিনটী সন্তানের জননী হইয়াছে তথাপি তাহার কষ্টের সীমা নাই। দিবা-রাত্রি গুরুভার পরিশ্রমে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, শরীরে নানা প্রকার কঠিন রোগ প্রবেশ করিয়া তিল তিল করিয়া তাহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহাতেও তাহার নিস্তার নাই, কোন বিষয়ে এক কণামাত্র ত্রুটি হইলেই উপর হইতে যথেষ্ট নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয় এবং শ্বশুর শাশুড়ী এই বলিয়া শাসন করেন যে এমন বৌ বাঁচিলেই বা কি, মরিলেই বা কি? ছেলের পুনরায় বিবাহ দিতে কতক্ষণ?

এই পরিবারের আর একটি বধূটির কথা বলিতেছি। এই বধূটির স্বামী অল্প বেতনে চাকরী করেন, তাঁহার পোষ্যও অনেকগুলি। বধূটি কয়েকটি সন্তান প্রসব ও সংসারের অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া এক সময় ভীষণ রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। রোগীর কাপড় কে কাচিবে বলিয়া সে এক কাপড়েই প্রায় মাসাধিক কাল শয়ন করিয়া থাকায়, কাপড়খানি ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায়। তখন স্থানীয় লোকের বিশেষ অনুরোধে তাহাকে কোন প্রকারে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করান হয়। কিছুদিন পরে বধূটি পুনরায় উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে সেই উদরাময় শেষে ভীষণ কলেরায় দাঁড়াইয়া যায়। স্বামীদেবতা (?) ও বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষ রোগ সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিলেন এবং তাহার ফল যাহা হইবার হইল। বধূটি রোগযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কয়েক দিন পরেই অনন্ত পথে যাত্রা করিল।

বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে এমন ঘটনা যে কত হইতেছে তাহার খবর কে রাখে? গ্রামে যে সমস্ত রমণী লেখাপড়া জানেন তাঁহারা এইসব দিকে একটু দৃষ্টিপাত করিলে অনেকটা সুবিধা হয়। এ সব নিবারণকল্পে মেয়েদের চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হইবে বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে দেশ-নেতৃগণেরও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

ভবিষ্যতে নারীনির্য্যাতন সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানাইবার ইচ্ছা রহিল। ইতি—

গৃহলক্ষ্মী

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন।

আজকাল স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে আমাদের সমাজে বেশ একটু নাড়া পড়েছে, সাময়িক পত্রাদির মারফতে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ কর্চ্ছেন, বাদ-প্রতিবাদেরও কসুর নাই। সহৃদয়া পাঠিকাগণ এ প্রবন্ধটীকে "বোঝার উপর শাকের আটি" মনে করে মত গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব। আর যদি এতে গ্রহণ-যোগ্য কিছু পান -যা বিবেকের সঙ্গে বেশ খাপ খায়—তবে তা গ্রহণ করবেন, এ আশা করাও বোধহয় নিতান্ত ধৃষ্টতা হবে না।

"শিক্ষা"টা যে উপকারী তাতে কোন মতভেদ থাকা সম্ভব নয় যদিও প্রকারভেদের মতভেদ যথেষ্ট আছে। শিক্ষা বলতেই আমরা সাধারণতঃ কেতাবের ছাপার হরফের অনুশীলন করা বুঝি, অবশ্য শিক্ষার অন্য ধারাও আছে তবে তা হঠাৎ ধারণায় আসে না।

বাঙ্গালীর ঘরের স্ত্রীলোকের পুঁথিগত বিদ্যার ততটা দরকার করে না, যতটা কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজন হয়। সেইজন্য অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বালিকাগণকে সংসারের খুটীনাটি শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতে তারা "পরের ঘরে" গিয়ে পদে পদে বিড়ম্বিতা না হয় ও সেই পরের ঘরের পূজনীয়া ব্যক্তিগণের মুখে পিতা মাতার নিন্দা শ্রবণে নিরালায় বসে তাদের কাঁদতে না হয়। পূর্ব্বে বালিকারা বই হাতে করবার আগে থেকেই খেলার ছলে রন্ধনের অভিনয় দ্বারা দূর ভবিষ্যতের গৃহিণীগিরি মকৃস করত। এখন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বাড়ীর অভিভাবক অভিভাবিকাগণ গায় ধূলা কাদা লাগবে বলে এরূপ খেলার প্রশ্রয় দিতে রাজী নন, মূল্যবান রেশমী জামা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তাঁরা এরূপ খেলার বিরোধী-ই হয়ে থাকেন, ফলে বালিকাদের অন্তর-স্থিত গৃহিণী বৃত্তিটা চিরদিনের জন্য নিঝুম হয়ে থেকে যায়। তারপর বালিকাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা অধিকাংশ সংসারেই হয় না। পাঁড়াগায়ে সাধারণ গৃহস্থঘরে যদিও সাঁজসেঁপুতি পুণ্যিপুকুর প্রভৃতি ব্রত নিয়মের চর্চ্চা দেখা যায়, কিন্তু একটু সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে বিশেষতঃ সহর-অঞ্চলে ওসব আপদ বালাই একেবারেই নাই। ধর্ম্মপ্রবৃত্তিহীন শিক্ষাকে শিক্ষা আখ্যায় আখ্যায়িত করলেও তাকে কুশিক্ষা বই আর কিছু বলা চলে না। উহাতে হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তিগুলি ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। সেই জন্যই আজকাল ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, সংসারেও অশান্তির এত ছড়াছড়ি। ধর্ম্মহীন শিক্ষায় শিক্ষিতা নারী যে সংসারে প্রবেশ করেন সে সংসারকে অচিরেই বিষময় করে তোলেন, তাঁদের সন্তানসন্ততিগণও তাঁদেরই আওতায় লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হয়ে চরিত্রের এই বিরাট ব্যাভিচার অব্যাহত রেখে যায়, এর দৃষ্টান্ত বেশী খুঁজে বের কর্ত্তে হয় না। জমীর অবস্থা অনুসারে যেমন ফসল নির্ব্বাচন করতে হয়, শিক্ষার্থীর সুযোগ সুবিধা শক্তি ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বিবেচনা করেই তার শিক্ষার বিষয় নির্ব্বাচনে অগ্রসর হওয়া দরকার। প্রত্যেক কাজেরই যখন একটা উদ্দেশ্য আছে তখন শিক্ষা সম্বন্ধেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। সাধারণতঃ জ্ঞান লাভই শিক্ষার উদ্দেশ্য বা পরিণতি, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের এই অন্নসমস্যা, বস্ত্রসমস্যার দিনে আমাদের ন্যায় মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ঘরের পক্ষে কেবল মাত্র জ্ঞানলাভেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত মনে করি না। ঘরে ঘরে লীলাবতী খনার অভ্যুদয়ে আমরা খুব খুসী হব না, অবশ্য সেরূপ হওয়া দোষের বলে মনে করি না, যাঁদের সুযোগ সুবিধা আছে তাঁরা সেরূপ

চেষ্টা কর্ত্তে পারেন কিন্তু আমরা চাই জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকরী-শক্তির বিকাশ, আমরা চাই সহধর্ম্মিণীকে সহকর্ম্মিণী দেখতে, আমরা চাই জ্ঞান নিংড়ে পয়সা বার কর্ত্তে। দুপুর বেলায় বাড়ীর কর্ত্তা কাজকর্ম্মে বার হলে পাড়ার দশ বাড়ীর গৃহিণী আসর জমাইয়া তাদের সপিণ্ডকরণে ব্যস্ত থাকেন অথবা পরনিন্দা পরচর্চ্চায় সারা দুপুরটা কাটাইয়া দেন, কিন্তু ইচ্ছা করলে ঐ সময়ে তাঁরা সুযোগ ও সামর্থ্য অনুসারে এমন অনেক কাজ কর্ত্তে পারেন যাতে তাঁদের নিজের সংসারে কিঞ্চিৎ অর্থ সমাগমের উপায় হয়, স্বামীপুত্রের হাড়ভাঙ্গা খাটুনিও কিছু কমে। আজকাল অনেক বাড়ীতেই স্ত্রীশিক্ষার ছড়াছড়ি দেখা যায় কিন্তু তাতে সংসারের কতটুকু উপকার হয় সেইটা দেখাই বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সাধারণতঃ দ্বিতীয়ভাগ শেষ করেই বটতলার দিকে চোখ পড়ে, তাতে না হয় সংসারের সাহায্য, না হয় নিজের মানসিক উন্নতি; আবার এমনও দেখা যায় কোন কোন সংসারে মা সরস্বতীর প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ, এই দুটোর একটাও বর্ত্তমান যুগের উপযোগী নয়। বড়লোকের ঘরে আত্মোন্নতি-মূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করলেই যথেষ্ঠ, সখের খাতিরে চারুশিল্পের শিক্ষাও চলতে পারে কিন্তু দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের ঘরে উহা একেবারেই নাকচ করিয়া দেওয়া উচিত। আর্থিক অবস্থা ক্রমে যতই নিঃস্ব হয়ে পড়ছে, লোকের ভোগ লালসা ততই বেড়ে চলেছে। এই দোমুখো টানে আমরা চোখে সর্ষের ফুল দেখছি অথচ এই মোহ, এই ভোগলালসা ঝেরে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি আমাদের নাই। এই ভাবে কিছুদিন চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কল্পনা করা ড় বেশী কঠিন বলে মনে হয় না। দুই উপায়ে এই স্রোতের গতি ফেরান যায়, তার একটা আয় বৃদ্ধি, আর একটা হচ্চে ব্যয়সঙ্কোচ। এমন কতকগুলি অনাবশ্যক ব্যয় ধীরেসুস্থে আমাদের সংসারে ঢুকে শিকড় গেড়ে বসেছে যে তাদের তাড়ান বড় সহজ কথা নয়। দোক্তা জরদা তামাকের গুল ও চা অভাবে লোক মারা যায়, বা দেহরক্ষার জন্য এই সব উপাদেয় সামগ্রী দরকার এ কথা ডাক্তারী কেতাবে লেখে না বরং ইহাদের অপকারিতাই ঘোষণা করে। পয়সা খরচ করে এই সব বিষ,—যাতে শরীরের অপকার হয়, তা ব্যবহার করা উচিত কিনা একটু ভেবে দেখলেই তার মীমাংসা হয়ে যাবে। যাঁরা এই সব ব্যবহারে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন হঠাৎ ত্যাগ করা তাঁদের পক্ষে কঠিন বটে, কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই। যদি বুঝতে পারেন ইহার কোন উপকারিতা নাই পক্ষান্তরে অনেকখানি অপকারিতাই আছে তাহলে ক্রমে ক্রমে ছাড়তে দোষ কি? একদিকে যেমন অপব্যয়ের মাত্রা কমে যায় অন্যদিকে শরীরও সুস্থ থাকে। নিজ হাতে রেঁধে বেড়ে স্বামীপুত্র আত্মীয়স্বজনকে খাওয়ান পূর্ব্বে মা লক্ষ্মীদের একটা অবশ্য করণীয় কার্য্য ছিল, আজকাল সে রেওয়াজ উঠে গেছে। অবস্থার একটু পরিবর্ত্তন হলে বিশেষতঃ সহর অঞ্চলে সামান্য গৃহস্থের ঘরেও উড়িষ্যানন্দন কায়েমীভাবে আড্ডা করেছেন। রসদের ভার সেই ভাঁড়াটে অন্নপূর্ণার হাতে দিয়ে আসল অন্নপূর্ণা বটতলায় মনোনিবেশ করেছেন বা খুকীর জন্য টুপী প্রস্তুতে ব্যাপৃতা আছেন—এ দৃশ্য কষ্ট-কল্পনার বিষয় নহে। এই যদি শিক্ষা হয় তবে শিক্ষার ব্যভিচার কাকে বলে জানি না।

মধ্যবৃত্ত ঘরের গৃহলক্ষ্মীগণ সামান্য পরিশ্রমে কি উপায়ে সংসারের আনুকূল্য করতে পারেন ভবিষ্যতে আমরা তা দেখাবার চেষ্টা করব।

সঙ্কলিকা

["নারীর চাই কি ?"—শ্রীমহামায়া দেবী]

জগতে নারীর স্থান যে কোথায়, তাই নিয়ে এক মহা গণ্ডগোল। জগতেরও এ এক মহা সমস্যার বিষয়। জগৎ যেন নারীকে নিয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত, সতর্কিত, চিন্তাকুল কিন্তু এ চিন্তা কি তার অহেতুক ?

জগতে একা নারীর দ্বারা নরকের সৃষ্টি হয়নি, হয় না। উঁচুগলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে অক্ষম বলেই নারী অপবাদের ডালি মাথায় বয়ে বেড়ায়; আর বলবার ক্ষমতা রাখেন বলেই পুরুষ এক গণ্ডূষে সমস্ত অন্যায় স্খলন করে মুক্ত হন।

* * * নারী যে এক পাশে পড়ে আছে একি তারই দুর্ব্বলতার পরিচয় নয় ? নারী যে সামান্য পদস্খলনে পরিত্যক্ত আবর্জ্জনার মত দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, একি তারই অক্ষমতার পরিণাম নয় ? নারী কেন নিজেকে ধূলার উপর এমন অবহেলায় লুটিয়ে দেয় ? আত্মিক বল নারীর লুপ্ত।

* * * পুরুষোচিত শক্তি নারীর আছে। কিন্তু এ শক্তি নারীর মুখ্য নয়, গৌণ হিসাবে সময় বিশেষে প্রয়োজন, সর্ব্বথা নয়। আমাদের পূর্ব্ব-আর্য্য-মহিলাগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। ধর্ম্মক্ষেত্রেও যেমন কর্ম্মক্ষেত্রেও তেমনি, এ উভয় ক্ষেত্রেই পুরুষের সম শক্তির পরিচয় তাঁদের মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁরা শাস্ত্রালোচনা করতেও যেমন পারদর্শিনী ছিলেন তেমনি প্রয়োজন হলে অশ্বারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে নাম্‌তেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু আবশ্যক ব্যতীত নয় একথাও স্বীকার করতে হবে। অন্তঃপুরেই তাঁদের বাসস্থান ছিল। কিন্তু আজ যে ভাবে আছেন এ অবস্থায় ছিলেন না একথাও নিশ্চয়।

* * * আবশ্যক হলে বেগে অন্তঃপুরের সীমা অতিক্রম করে তেজস্বিনী নারী পুরুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন, অন্তঃপুরের গণ্ডি ডিঙ্গাতে তাঁর বেগ পেতে হতনা। পুরুষও নারীকে প্রয়োজনে এবং সহায়তা দান করবার জন্য আহ্বান করতে দ্বিধা বোধ করতেন না, নিজের ক্ষেত্রেও তাঁর পাশে স্থান দিতে কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধও করতেন না। এই পরস্পর বিশ্বাস ছিল বলেই নারী পুরুষের ক্ষেত্রের মাঝে বিশেষ কোন গণ্ডি ছিল না, উভয় ক্ষেত্রের সম্মান উভয়ে সমানভাবে বজায় রেখে চলতেন, আবার উভয়ের ক্ষেত্রে উভয়ের গতিও ছিল অবাধ। কিন্তু আজ আমরা সে বিশ্বাস হারিয়েছি। আজ পুরুষও যেমন নারীকে বিশ্বাস করতে রাজী নহেন, নারীও তেমনি নিজেকে বিশ্বাসী রাখতে অসমর্থা। * * *

এখন চিন্তার বিষয় কিসে আমরা শ্রেয়ঃ লাভ করতে পারি। আজ প্রয়োজন আমাদের কি ? ব্যাধি আমাদের কোথায় ? ব্যাধি আমাদের রন্ধ্রে, গভীর অন্তরে, অন্তঃপুরে। প্রয়োজন বাহিরের প্রলেপ নয়; প্রয়োজন ভিতরে প্রয়োগ করবার ঔষধ। পুরুষোচিত শক্তি নারীর তত বেশী প্রয়োজন নয়, কিন্তু বিশেষ করে প্রয়োজন নারীর মানসিক শক্তি। দৈহিক বল নারীর মুখ্য কাম্য নয়, মুখ্য কাম্য আত্মিক বল। —বিজলী।

বিজয়া*

শ্রীমতী মানকুমারী বসু।

ওমা চির আদরিণি!
আজি নাকি যাবে চলি,
যত দীন মাতৃহীন,
কারে পাবে "মা মা" বলি?
এত যেন আনন্দ আশা
এ উৎসব-আয়োজন,
পোহাইলে আজি নিশা
ফুরাইবে প্রয়োজন!
শূন্য চণ্ডীমণ্ডপে যে
পাঁরাবত র'বে শুধু—
বিশ্ব হবে মরুভূমি —
দৃশ্য হবে সবি ধূধূ!
যাবে মা আনন্দময়ি,
সকল আনন্দ নিয়ে,
ব্যথিত ভুলিবে ব্যথা
কার বা আঁচলে গিয়ে?
চলে যাবে ব'লে যাও
আবার আসিবে কবে,
কবে মা আঁধার দেশ
আবার উজল হবে?
তিন দিন দীনহীন
খাইবে উদর ভরি,
হাসিবে দরিদ্রবালা
রাঙা ডুরে সাড়ী পরি;
সাজিবে গৃহস্থ-বধূ
নব রত্ন-অলঙ্কারে;
পূজিবে সকলে "দুর্গা"
সে ষোড়শ-উপচারে।
চিরদিনে মা'র কোলে
প্রবাসী আসিবে ছুটি,
"বাবা, দাদা, কাকা পেয়ে
শিশু হেসে কুটি কুটি;
তিন দিন ধনী দীন,
র'বেনা প্রভেদ কেহ,
মানব দেবতা হয়ে
বিলাবে করুণা স্নেহ!
ধন্য হব, পুণ্য পাব,
জীবন সফল হবে,
বিশ্বধ্যেয়া বিশ্বমাতা,
মরতে পূজিবে সবে!
একটী বরষ?—মাগো!
সে বড় অনেক দিন,
কেমনে রহিব একা —
আমি যে মা, মাতৃহীন!
রাজ-রাজেশ্বরী মম,
মা হয়ে আসিবে কবে?
"মা" বলে ডাকিব ফিরে
এ বিশ্ব আমারি হবে!

* কবিতাটি কার্ত্তিক সংখ্যায় কাগজেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আসিতে বিলম্ব হওয়ায় বর্ত্তমান মাসে বাহির হইল। মাঃ সঃ।



পল্লীবালা



মাতৃমন্দির

২য় বর্ষ } পৌষ—১৩৩১ { ৯ম সংখ্যা



মুছে রেখা জীবন গণ্ডীর

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।

এয়োতি চলিয়া গেছে মুছে রেখা জীবন গণ্ডীর,
খসেছে কঙ্কণ, গেছে রক্তবিন্দু সিন্দুর সীথির।
বন্দী আর নহি আমি, পরিধান সাদা একেবারে,
নাই পাড়; নাইক আঁচলা তার কোথাও কিণারে,
মিশে গেছে সব রং বাধাহীন শান্তির মিলনে,
অবিরত আলো করা তমোনাশা অমল বরণে।
আমার আঙন ঘিরে নাই আর পাষাণ প্রাচীর,
কত জানা অজানার তাই আজ জনতা নিবিড়,
বর্ত্তমান মূর্ত্তি পায়, ভবিষ্যৎ স্বপ্নলোক নয়,
নতুন করিয়া লেখা অতীতের নব পরিচয়।
আমার পরাণ আজ রাজপথ, গৃহ নহে আর,
সকলেরি দাবী চলে সবারি সমান অধিকার।

আলি-জননী বাঈ আম্মা

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

কাঁদ বাঙ্গালী কাঁদ। মাতৃহারা পুত্র যেমন অঝোরে কাঁদে একবার তেমনি তেমনি তেমনি করিয়া কাঁদ। শুন নাই কি আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের স্নেহময়ী জননী বাঈ আম্মা আর ইহ সংসারে নাই! দীর্ঘ অশীতি বৎসর কাল দেশজননীর সেবা করিয়া সেই মহীয়সী মহিলা দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাই বলিতেছি, কাঁদরে বাঙ্গালী কাঁদ। পর্ব্বতের নির্ঝরিণীর জলোচ্ছ্বাস যেমন কোন বাধা, কোন বিঘ্ন না মানিয়া তর্ তর্ করিয়া বহিয়া যায় তেমনি তোমাদেরও শোকোচ্ছ্বাস বহিয়া চলুক—বর্ষাকালে মুষল ধারে বৃষ্টি হইয়া যেমন সমস্ত দেশটা প্লাবিত করে আজ তোমাদের চোখের জলেও তেমনি বাঙ্গলা দেশ থৈ থৈ করিতে থাকুক। কেন কাঁদিবে? তাও আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়? অমন মা যে ভাই ভারতবাসী অনেকদিন পায় নাই—বোধ হয় পাইবেও না! ঐ সেই রাজপুতানার ইতিহাসে একবার পড়িয়াছিলাম বীর বাদলের জননী তাঁর নিজের হাতে পুত্র বীর বাদলকে সজ্জিত করিয়া রণ-ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, আর একালে দেখিলাম আলি জননী! কে পারে—এমন ভাবে দুই দুইটা পুত্রকে কারাগারে পাঠাইয়া বার্দ্ধক্য-জরা-প্রপীড়িত দেহেও দেশের কাজ করিতে? কে পারে—অশীতি বৎসর বয়সেও যুবতীর ন্যায় উৎসাহ উদ্যম লইয়া দেশে দেশে চরকার প্রচার করিতে? যদি আলি-জননীর ন্যায় আর পাঁচটি মহিলাও ভারতে থাকিত তবে ভারতের ইতিহাস এতদিনে অন্যরূপে লিখিত হইত।

বনিয়াদি মুসলমান ঘরের ঘরণী; শিক্ষিত মুসলমান জননায়কের জননী হইয়াও বাঈ আম্মা মুসলমান সমাজের অবরোধ প্রথা মানেন নাই। তিনি শেষ জীবনে প্রত্যেক সভা সমিতিতে যোগ দান করিয়া তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশের দ্বারা দেশবাসীকে স্বদেশী সাধনায় অগ্রসর হইবার জন্য অনুরোধ করিতেন। আজ যে স্বদেশী সাধনাক্ষেত্রে আমরা দুই চারিটি মুসলমান মহিলাকে যোগদান করিতে দেখিতেছি, ইহার মূলে বাঈ আম্মার চেষ্টা নিহিত। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় একজন বিদুষী, আভিজাত্য ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমান মহিলা যদি অবরোধ প্রথার মুখে পদাঘাত করিয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচন করতঃ প্রকাশ্য সভাসমিতিতে যোগদান না করিতেন তবে আমরা আজ এই দুই-একজন মুসলমান মহিলা কর্ম্মীকেও দেখিতে পাইতাম না।

বাঈ আম্মাই মুসলমান নারীদের মধ্যে এই সত্যটুকু বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, অবরোধ প্রথার যবনিকা, সমাজের চিরাচরিত, কুসংস্কারের মোহজাল ছিন্ন করিয়া যদি মহিলারা স্বদেশী সাধনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হন তবে ভারত "যে তিমিরে সেই তিমিরেই" থাকিবে।

মুসলমান সমাজ অবরোধ প্রথায় হিন্দু সমাজকেও উল্লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে। সহর ত দূরের কথা, অতি বড় গণ্ডগ্রামেও মুসলমান নারীদিগকে যেভাবে অবরোধের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়, যে ভাবে রেলে, ষ্টীমারে তুলিবার সময় মুসলমান মহিলাকে চারিদিকে কাপড় চোপড় ঘিরিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তেমন ধারা অবরোধ প্রথার কড়াকড়ি হিন্দুসমাজে নাই। মুসলমান সমাজের মধ্যে অবরোধের কড়াকড়ি দেখানই হইল সম্ভ্রান্ততা দেখাইবার প্রধান উপায়। বাঈ আম্মা মুসলমান সমাজের এই ত্রুটি টুকু লক্ষ্য করিয়া এবং স্বদেশী সাধনায় মহিলারা যোগদান না করিলে এ যজ্ঞ কখনও সুসম্পন্ন হইবে না, এই সত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিজে প্রকাশ্য সভা সমিতিতে যোগদান করিতে আরম্ভ করেন! খেলাফত আন্দোলনের সময় আলি-জননী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া

খেলাফত ফণ্ডে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। মৌলানা মহম্মদ আলি ও মৌলানা শৌকত আলির ন্যায় তিনিও মহাত্মা গান্ধীর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী আপন ত্যাগ, সংযম, বিশ্বপ্রেমের মহিমায় একাধারে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি পাইতেছেন, এরূপ কোন নেতার ভাগ্যে কখনও হয় নাই। কেন হয় নাই? এপর্য্যন্ত যত নেতা রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বরাজ লাভের জন্য মুসলমানদের সহায়তা আবশ্যক, শুধু এই স্বার্থ প্রণোদিত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মুসলমানদিগকে সভা সমিতিতে ডাকিতেন, কিন্তু মহাত্মার মুসলমান-প্রীতি কোন স্বার্থ সাধনের জন্য নয়। তিনি মুসলমানের ধর্ম্মস্থান খেলাফতের অবমাননা দেখিয়া তাহার প্রতীকারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শুধু ইস্লামের ধর্ম কেন, যদি খ্রীষ্টানের, বৌদ্ধের, পার্শীর ধর্ম্মেরও এইরূপ অবমাননা দেখিতেন, তাহা হইলেও মহাত্মা তাহার প্রতীকারে আত্মনিয়োগ করিতেন। কেবল এই বিশ্বপ্রেমটুকুর জন্যই মহাত্মা গান্ধী মুসলমান সমাজের আজ এতটা প্রিয় এবং শুধু এই কারণেই মৌলানা মহম্মদ ও শৌকত আলি তাঁহার একনিষ্ঠ উপাসক এবং শুধু এই কারণেই আলি-জননী বাঈ আম্মা মহাত্মাকে "পয়গম্বরের" মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন।

মুসলমান সমাজ পৌত্তলিক নহেন, কিন্তু একমাত্র মহাত্মার বেলা তাঁহাদের এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। মৌলানা মহম্মদ ও শৌকত মহাত্মাকে দেবতার ন্যায় বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আরাধনা করিতেছেন, এরূপ সহস্র সহস্র ছবি বাজারে বিক্রীত হইতেছে—মুসলমান সমাজে তাহাতে কোনদিন কেহ আপত্তি করে নাই—এমন কি বাঈ আম্মা ইহাতে আনন্দ প্রকাশ ছাড়া কখনও আপত্তি করেন নাই।

মৌলানা মহম্মদ আলি ও শৌকত আলি দেশ সেবার জন্য এই যে অদম্য উৎসাহ, প্রাণের ভিতর এই যে অকপট দেশপ্রেম পাইয়াছেন ইহার মূল উৎস কোথায়? জননী বাঈ আম্মাই এই মূল উৎস। সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে হিমাদ্রীর ন্যায় অচল, অটল ভাবে বাঈ আম্মা পুত্রদ্বয়কে দেশ সেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁর কাছে এই প্রকার উৎসাহ না পাইলে আলি ভ্রাতৃদ্বয় আজ দেশের এত বড় সেবক হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ! ভারতবাসী দেশ সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারে না কেন? কে না বুঝে পরাধীনতার জন্যই আজ তাহাদের এই দুঃখ, কষ্ট, অবসাদ, অবমাননা, নির্জীবতা? ভারতবাসী অন্তঃপুরের প্রেরণা পায় না বলিয়াই আজ ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র তাহারা নিস্তেজ। বাহিরে যে লোক খদ্দর পরিয়া সভায় মুক্তকণ্ঠে, তারস্বরে বক্তৃতা করেন, তাঁহার ঘরে গিয়া দেখিবে মায়ের অঙ্গে, পরিবারের পরিধানে অতি মিহি পাতলা বিলাতি অথবা মিলের কাপড়! পুত্র কি স্বামী যদি কোনরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়া দেশ সেবার কার্য্যে ব্রতী হইতে চায় অমনি মা ও স্ত্রী তাহার প্রতিবন্ধক হন। এই কারণেই দেশে দেশসেবকের অত্যন্ত অভাব। দেশের মা-ভগ্নীরা যদি দেশের যে কি দুর্দ্দশা তাহা বুঝিতেন তবে আজ দেশের অবস্থা অন্যরূপ হইত। আলি-জননী বাঈ আম্মা কিন্তু এ শ্রেণীর মহিলা ছিলেন না। তিনি ইচ্ছা করিলে পুত্রদ্বয়কে অন্য পথে চালিত করিয়া মহাসুখে "রাজমাতার" ন্যায় সংসারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিয়া যাইতে পারিতেন! কিন্তু দেশজননীর ছিন্ন বসন, রুক্ষ কেশ, কঙ্কালসার দেহ, বুবুক্ষাক্লিষ্ট শুষ্ক উদর দর্শনে তাঁহার প্রাণে যে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল! তিনি ভাবিয়াছিলেন, কেন, আমি কি কেহ নই? এই বাহু দু'খানি কি দেশের কাজে নিয়োজিত হইবে না? তাই তিনি কুন্তীর ন্যায় নিজের পুত্র দু'টিকে স্বদেশী-সাধনা-আহবে প্রেরণ করিয়াছিলেন! ধন্য সেই মাতা যে মাতা এই ভাবে পুত্রকে দেশের সেবায় উৎসর্গ করিতে পারে, ধন্য সেই মাতা

যে মাতা হাসিতে হাসিতে পুত্রকে কারাগারে প্রেরণ করিতে পারে! আজ বাঈ আম্মা লোকলোচনের অন্তরালে গিয়াছেন সত্য, কিন্তু জীবাত্মার অবিনাশীত্বে বিশ্বাসী হিন্দু মনে করিতেছে আবার তিনি তাঁহার অসমাপ্ত যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য অন্য ভাবে, অন্য আকারে জন্মগ্রহণ করিয়া আরও বীর সন্তান প্রসব করিবেন। ভারতের আকাশে, বাতাসে সর্ব্বত্র তাঁহার সাধনার ঝঙ্কার ঝঙ্কৃত হইবে, শত শত মহিলা তাঁহার জীবন-কথা স্মরণ করিয়া স্বদেশী কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন।

বাঈ আম্মা কি ছিলেন? তিনি কি ছিলেন তাঁহাকে যাঁহারা না দেখিয়াছেন সে ধারণা তাঁহারা করিতে পারিবেন না। তিনি একটা মূর্ত্তিমতী তেজ, প্রীতি, মৈত্রী ও ভালবাসার প্রতীক ছিলেন। করাচীর মামলায় যখন আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের কঠোর কারাদণ্ড হয় তখন তিনি সেই শক্তিশেল বুকে লইয়া ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন—"ভারতবাসি, যদি বাঁচিতে চাও, যদি জীবন সংগ্রামের দিনে নিজের প্রাণ বাঁচাইতে চাও তবে স্বরাজ লাভে মহাত্মার অহিংস অসহযোগনীতি অবলম্বন কর।" বৃদ্ধার কণ্ঠের সে অমিত তেজস্বিনী বাণী এখনও যেন কাণের ভিতর ঝঙ্কৃত হইতেছে। এরূপ তেজস্বিনী মা না হইলে কি এমন তেজস্বী পুত্র প্রসবিনী হইতে পারেন? শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, আতপতাপ নাই, বৃদ্ধা বাঈ আম্মা ভারতের সর্ব্বত্র স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। দুঃখ হয়, তিনি জীবিত থাকিতে কেন সহস্র সহস্র মুসলমান মহিলা অবরোধের নিগড় ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া আসিয়া তাঁহার সাহচর্য্য করিল না! নব্যতুরস্ক আজ এই অবরোধ প্রথাকে দূর করিয়াছে, ভারতের মুসলমান সমাজ কি এখনও নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিবেন না? বাঈ আম্মা কিন্তু এই সত্যটা বুঝিয়াছিলেন। ভারতে রাণাড়ে, গোখেল, সুরেন্দ্র, ভূপেন্দ্র প্রভৃতি কত নেতার উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু কাহারও "মা" এরূপ ভাবে পুত্রকে স্বদেশী সাধনার মন্ত্রে দীক্ষিত করেন নাই। মনে পড়ে যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরের অশীতিপর বৃদ্ধা মাতাকে দেখিয়াছিলাম হর্ষগদগদকণ্ঠে সমাগত প্রতিনিধিগণকে সম্বর্দ্ধনা করিতে! তারপর এক বাঈ আম্মা ছাড়া আর কাহাকেও সভা সমিতিতে দেখি নাই।

মৌলানা মহম্মদ আলি ও মৌলানা শৌকত আলি একবার চিন্দুওয়ারার মামলায় আর একবার করাচীর মামলায়, কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই দুইবারই তিনি পুত্রদ্বয়কে হাসিতে হাসিতে কারাগারে পাঠাইয়া দেন। আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের জনকের—অর্থাৎ বাঈ আম্মার স্বামীর যখন মৃত্যু হয় তখন বাঈ আম্মার বয়স মাত্র ২৭ বৎসর; সে ১৮৮০ সালের কথা। তাঁহাকে ছয়টি সন্তান সন্ততির লালন পালনের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রাণপণ যত্নে পুত্র-কন্যাগণকে লালন পালন করেন। ইংরাজী স্কুলে মুসলমান বালকদিগকে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করা কোরাণ শরিফের বিরুদ্ধ হইলেও তিনি মহম্মদ ও শৌকতকে প্রথমে বেরিলি ও পরে আলিগড় কলেজে প্রেরণ করেন।

১৯২১ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর লাহোরে একটি বিরাট সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—"আজ আমি আমার মাথার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়াছি। আমি মনে করি সভায় যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই আমার মহম্মদ ও শৌকতের ন্যায় পুত্র সদৃশ। তাঁহারা যেন একমাত্র খোদা ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভয় না করেন, ফাঁসী কাষ্ঠ, কারাগার—এ সমস্তই তুচ্ছ পদার্থ; আমি দেশের জন্য মরিতে, কারাদণ্ড ভোগ করিতে ও সংসারে যত প্রকার মানুষিক দণ্ড আছে তাহা ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি। সকলে আপনারা খদ্দর পরিধান করুন এবং মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা মন্ত্রে দৃঢ় চিত্ত থাকুন।"

এই সভার তিনদিন পরে করাচীর একটি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাঈ আম্মা বলেন,—"দেশবাসী সকলেই আমার পুত্র ও ভ্রাতৃ স্থানীয় বলিয়া আমি

আজ তিন দিন হইল অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়াছি। আমার দুই পুত্র কারাগারে গিয়াছে, আমি সেজন্য একটুও দুঃখিত নহি, আপনারা সকলে আমার পুত্রদ্বয়ের অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ্ত করুন। আমরা সংখ্যায় ৩৩ কোটি ভারতবাসী, সরকার আমাদের কত জনকে জেলে দিবে? আমি তোমাদের সহিত জেলে যাইতে প্রস্তুত আছি। খোদা ছাড়া কোন মানুষে মানুষের প্রাণ লইতে পারে না। ভগবান ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করিও না। সরকারের সহিত অসহযোগীতা কর। আমি হিন্দুমুসলমানে কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না। আমি কাহাকেও হিংসার পথ অবলম্বন করিতে বলিতেছি না, তবে একথাও বলি খোদা ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভয় করিও না। তোমাদের ভিতর ন্যায্য ও অনায্য বলিয়া দুইটি শক্তি আছে। যাহা ন্যায্য তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে পশ্চাৎপদ হইও না। তোমরা খদ্দর পরিধান কর না কেন? পূর্ব্বকালে কি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মোটা কাপড় পরেন নাই? তাহাই যদি হয়, তবে স্থূল বসন পরিধান করিতে তোমাদের এত আপত্তি কেন?"

বাঈ আম্মা একদিকে যেমন ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বীর কোরাণ শরিফে অগাধ বিশ্বাসী এবং ব্যুৎপন্ন ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি আমাদের হিন্দু শাস্ত্রেও পারদর্শিনী ছিলেন। কলিকাতায় একটি সভায় বক্তৃতা করিবার প্রসঙ্গে তিনি গীতার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন,—রামায়ণ মহাভারতের অনেক ঘটনা তিনি প্রায়ই উল্লেখ করিতেন। "আমার পুত্র দুইটিকে আমি দেশের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছি"—ইহাই ছিল তাঁহার মূলমন্ত্র। সিন্ধু যেমন নিজের বক্ষ শীর্ণ করিয়া নদী সকলকে সুমিষ্ট বারিদানে পরিবর্দ্ধিত করে, বাঈ আম্মাও তেমনি তাঁহার হৃদয়ের যা' কিছু স্নেহ-প্রীতির পীযূষ ধারা তাহা দিয়া আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে স্বদেশী মন্ত্রে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় কি এরূপ বীররত্ন প্রসবিনী মায়ের আবির্ভাব হইবে না? বাঙ্গালার জননীরা কি এখনও বুঝিবেন না যে দেশের কার্য্যে পুত্রকে উৎসর্গ করা তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্ম? টাকা পয়সা অর্থ কড়ি সংসারে সকলেই ত আয় করে, তাহাতে আর পৌরুষ কি? মনের মন্দিরে যাহাকে লোকে নিত্য সেবার্চ্চনা ও পূজা করে তাঁরই জীবন এ সংসারে ধন্য;—অক্ষয় স্বর্গদ্বার তাঁর জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত—তিনি মৃত হইয়াও জীবিত। বাঈ আম্মা স্থূল দৃষ্টিতে মহাসিন্ধুর পরপারে গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি সাধকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এখনও জীবিত। তাঁর জীবন দেশের জন্য নিষ্কাম সাধনার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ। তাঁহার জন্য একটা স্মৃতিমন্দির কি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলে তাঁহার প্রকৃত স্মৃতি রক্ষা করা হইবে না। সত্য সত্য বাঙ্গালার, তথা ভারতের নারী যদি এক একজন মূর্ত্তিমতী বাঈ আম্মা হইতে পারেন তবেই তাঁর প্রকৃত স্মৃতি রক্ষিত হয়।

অন্নপূর্ণার মন্দিরে

শ্রীমতী ঊষাময়ী চৌধুরী।

ভিক্ষা মাগিছ রাজরাজেশ্বর
প্রিয়ার চরণতলে?
অতুল সম্পদ্ যার করতলে
তারে কি ভিখারী বলে!
দীনের লাগিয়া চাহ কি অন্ন
করযোড় করি আজ?

ভুবনেশ্বর, দেবের দেবতা
তাঁরো ভিখারীর সাজ!
দেখাইলে প্রভু একি এ দৃশ্য,
চীর-সম্বল বেশে,
লক্ষ্মীর পিতা চিরসন্ন্যাসী—
পথের কাঙাল শেষে!

মা হারা

(গল্প)

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ।

বহুদিন দূর বিদেশে কর্ম্মভোগের পর পূজার ছুটিতে দেশে আসা গেছে, আমাদের সঙ্গীদলের আর আর সকলে প্রায় সারা দুপুর তাস পাশা নিয়ে মত্ত থাকে, আমি একটু হুঁসিয়ার মানুষ! কলেজে পড়বার সময় ইকনমিক্‌সে অনার নিয়েছিলুম, সে কারণ সময়ের মূল্য জ্ঞানটা আমার পুরামাত্রায় ছিল।

অপরাহ্ন বেলায় নিদ্রাভঙ্গে যখন জেগে উঠতাম তখন পশ্চিম আকাশের শেষ বিদায় ছটাটা প্রায়ই ঘরের মধ্যে এসে পৌঁছাত, এক একদিন কচ্চিৎ এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতো, স্ত্রী জল পান নিয়ে অপেক্ষা ক'রতো। তাদের মধ্যে এই পাড়াগাঁয়ে এই ঘৃণ্য দাসত্বটার প্রতি বিরক্তি জাগেনি, আমি অনেক সময় স্ত্রীর সহিত তর্ক করে বলেছি, "তোমরাই তোমাদের স্বাধীনতার যদি এই রকম ক'রে অপচয় ঘটাও, একটা দাসী হবার কামনা সর্ব্বদা অন্তরে অন্তরে পুষে রাখো তবে দাবী মেটাবার জন্য কে গরজ ক'রে অগ্রসর হবে?"

সে কিন্তু মিনতি ক'রেই জবাব দিত "সেবার ক্ষেত্রে, ভালবাসার ক্ষেত্রে আমাদের অধিকার একটুও ক্ষুণ্ণ হ'লে চলবে না।"

আসল কথা ঘরের ভিতরে তাদের যে একটা রাজত্ব আছে, সেখানে তারা সর্ব্বেসর্ব্বা থাকবেই।

এই সব কারণে সন্ন্যাসে বাদসা ব'নে যাওয়ার পক্ষে এই গরম দেশে যতগুলো আয়োজনের আশা করা যেতে পারে তার সব কটা দ্বার ছিল অবারিত। আপিসের তাড়া নেই! বামুন চাকরের দুর্গতি নেই! অবস্থাও কিঞ্চিৎ স্বচ্ছল, সবার উপর সবকটা বারই ছিল রবিবার সুতরাং বেপরোয়া নিদ্রা যাওয়ার পক্ষে একটা বাধাও চক্ষের সম্মুখে ঠেকত না। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু ধূ ধূ ছুটি!

এমনি একটা ছুটির দিনে ঘুম হতে সবে উঠেছি, স্ত্রী প্রতিদিনকার মত তার প্রাত্যহিক পান জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নীচের বারান্দা হ'তে বামী ঝিটা স্ত্রীকে একটা ডাক দিয়ে বল্লে—"ওগো বৌমা বেরিয়ে এসো, সেই হতভাগা দুটো আবার এসেছে। মাগো, যমের অরুচি!"

স্ত্রী একটুও ব্যস্ত না হ'য়ে বল্লেন "যাচ্ছি।"

বোঝা গেল যমের অরুচি দুটো রোজই এসে থাকে, আমি বল্লুম, "ব্যাপারটা কি দেখেই এসো না।"

সে বল্লে, "ব্যাপার আর দেখে আসতে হবে না। ঐ মালী বাউরীর ছেলে মেয়ে দুটো এসেছে, আজ সকাল বেলায় যখন ভিক্ষে ক'রতে এসেছিল তখনি বলে দিয়েছিলুম আসতে।"

"তাদের কি অনুগ্রহ করা হবে?"

"অনুগ্রহ এমন কিছু নয়, দুটো ভাত দেওয়া হবে। কেউ ত আর নেই তাদের, মা-ও ছেলে দুটোকে ফেলে পালিয়েছে।"

মা ছেলে ফেলে পালিয়েছে! কথাটা কেমন নিতান্ত বেখাপ্পা শোনাল। বল্লুম "একেবারে পালিয়ে গেছে? কেন পালাল? তাই কখনো হ'তে পারে?

"পারে না ত আমি মিথ্যে কথাই বলছি!"—ব'লে সে পান জল রেখে রান্না ঘরের দিকে চলে গেল।

বামী ঝি তখন ঝাঁটা হাতে ঘর পরিষ্কার করতে এসে একেবারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম "আচ্ছা বামী, একি সত্যিই মা ছেলে ফেলে পালিয়েছে? পালাতে পারে না, সম্ভব মরে গেছে।"

বামী একটুখানি দাঁড়িয়ে বল্লে "না বাবু, সত্যিই সে মরেনি, হতভাগী ছেলেমেয়ে দুটোকে খেতে দিতে না পেরে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে।"

আমার বিস্মিত-প্রায় মুখ ভাব দেখে বামী আবার বল্লে "তুমি ঠিক ধারণায় আনতে পাচ্চো না বাবু যে কেমন ক'রে সম্ভব হ'লো? কিন্তু এ সত্যিই। সে হতভাগীর আরও একটা ছোট ছেলে ছিল সেটাকে কোন্ গাঁয়ের ওদেরি এক জাত ভাই নিয়ে চলে গেছে। আর ওই ছেলে মেয়ে দুটো যমের অরুচি এই গাঁয়েই পড়ে আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম "তারা কোথায় থাকে?"

বামী ঝাঁটা হাতেই বলতে লাগল "ওই বাউরী পাড়াতেই কারও দাওয়ায় পড়ে থাকে, কোন দিন বা কেউ দুটো দ্যায় কোন দিন বা দ্যায় না। এখনও দু একটা গাছে তাল আছে তাই কুড়িয়ে খায়, ওদের আর কে আছে বলো বাবু?"

ঝাঁট দেওয়াটা শেষ করে সে দাঁড়িয়ে গেল। কি ভেবে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে "তুমি দেখেই এসো না বাবু, ওদের দেখলে সত্যি ভারি দুঃখু হয়। এমি পোড়াকপালী মা, পেটের ছেলেকে কি করে ফেলে পালিয়ে গেল!...শুনচি নাকি ওদের মা কলকাতার কাছে কোন্ কলে খাটতে গেছে, সঙ্গে একটা মানুষও জুটেছে। মরুক্ সে হাড়-হাবাতী!"

বামী আরও অনেকগুলি কথা হতভাগীর উদ্দেশ্যে বলে গেল। আমি চটিটা পায়ে দিয়ে বেড়িয়ে এলুম। দেখলুম এ কি—! এযে নিতান্ত কচি ছেলেমেয়ে। মেয়েটার বয়স বড় জোর বছর ছয় সাত হবে—আর ছেলেটার বয়স বছর তিনেক মাত্র। একটা অসহায় ভাব, একটা শঙ্কা-ব্যাকুল ভঙ্গিমা তাদের মুখে চখে ছেয়ে পড়ছে। সব চাইতে ঐ কচি মেয়েটাই বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রোগ শোক দরিদ্রতা সামনে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে, আর এই অবস্থায় তাকে ভার নিতে হ'য়েছে ঐ কচি ছেলেটার, সেই এখন তার মা বাবা সব, সে যদি যায় কি সরে দাঁড়ায় তাহলে ছেলেটার আর কেউ নেই।

রোগা শীর্ণ ছেলেটা দিগম্বর আর মেয়েটার পরণে একখানা অতি জীর্ণ গামছা মাত্র। সেখানাও হয়ত কেউ দিয়ে থাকবে। এমনি অবস্থা তার কেউ যদি দয়া ক'রে দুটো মুড়ি দিতে চায় তা তার আঁচল পেতে নেবার উপায় থাকে না।

সামনে শীত আসছে, এই খোলা গায়েই তাদের দুটি ভাইবোনকে সারা শীত কাটাতে হবে। প্রথম যখন দেখলুম তখন মেয়েটা ছেলেটার মাথার মরা মাসগুলো নখ দিয়ে খুঁটে তুলে দিচ্ছিল; একটু কোথাও জোটাতে পারেনি যে, তার ভাইটির মাথায় দিয়ে দেয়।

ভাত আসছে দেখে একখানা ভাঙ্গা সানকী একধারে পেতে দিলে। আমি মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করলুম "হারে তোর মা তোদের ফেলে পালিয়ে গেছে?"

মেয়েটি তার করুণ চোখ দুটি তুলে আমার মুখের দিকে চাইলে তারপর ছোট্ট একটি "হাঁ" বলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। চোখ দুটি জলে ভ'রে এলো কিন্তু এক ফোঁটাও ঝ'রে পড়ল না। কেঁদে কেঁদে তার বুকের অশ্রু বুঝি সব শুকিয়ে গেছে!

আমি জিজ্ঞেস্ করলুম "থাকিস কোথায়?"

অতি কষ্টে ভয়ে ভয়ে বল্লে "বাউরী পাড়ায়।"

আমি আবার সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম "তোর আপনার-লোক কেউ নেই?"

সে তার কিছু জবাব দিতে পারলে না, আবার আমার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে বোধ হয় আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবছিল ভদ্র

লোকেও তাদের মত ছোট অন্ত্যজ জাতের খাওয়া-বসার খবর কি হিসাবে নিতে পারে?

গৃহিণী বল্লে "দাঁড়াও, ওকে ওই এঁটো জায়গাটায় গোবর দিতে দাও, তারপর বলবে।"

এতক্ষণে বামীও সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে বল্লে "ওর আপনার লোক আর কে থাকবে বাবু? এক মাসী ছিল, সে একটু মায়া দয়া করতো, তা ওর মেসো এসে তাকে নিয়ে গেছে, যাবার সময় এই ছেলে মেয়ে দুটিকে পাড়ার লোকের হাতে দিয়ে মাসীর কি কান্না—"

দেখছি গরীবেই গরীবের খবরটা রাখে। জিজ্ঞাসা করলুম "বাপকুলেও ব্যাচারাদের কেউ নেই, কেমন বামী?

বামী বল্লে "কেউ না, এই ক বছরের মধ্যে ওলাউঠোয় সব মারা গেছে। ওর বাপটা যে জোয়ান ছিল তার কি বলবো! বাবু, তুমি ত দেখেছ উপ্‌নে বাউরীকে কতবার তোমার বাড়ী আসবার বেলায় ইষ্টিশানে যেতে। বেচারার দুর্ব্বুদ্ধি—বড়বাবুর বুঝি দু'দিন ব্যাগার দেবার কথা ছিল, দ্যায়নি, তাই তাকে কি একটা চোর অপবাদ দিয়ে থানায় দেয়, থানায় দুদিন গাছের ওপর দড়ী দিয়ে হাত পা বেঁধে টাঙিয়ে রেখেছিল, কিছু খেতে পর্য্যন্ত দেয়নি, আমি আউশবাড়ী যাবার সময় নিজের চক্ষে দেখেছি। মালী-বউটা তাকে খালাস করতে অনেক দুয়োরে হাঁটাহাঁটি করেছিল কিন্তু টাকা পাবে কোথায়? তারপর বাড়ী এসে ওলাউঠায় মারা পড়লো।"

ততক্ষণ অবধি ছেলেমেয়ে দুটো দাঁড়িয়ে ছিল, আমি তাদের তখুনি চ'লে যেয়ে খেতে বল্লুম, কিন্তু খাবে কোথায়? বামীকে জিজ্ঞাসা করলুম "ওরা খাবে কোথায়?"

বামী বল্লে "কেন, পুকুরের বাঁধা ঘাটে; ওদের কি আর ঘরবাড়ী আছে বাবু? তোমাদের ভদ্রলোকের বাড়ীর কোন্ ঠেঁয়ে ব'সবে? বাঁধা ঘাটে খাবেদাবে, তারপর আঁজলপুরে জল খেয়ে চলে যাবে। কি আর ব'লব বাবু, ওদের এমন একটু ঠাঁই নেই যে জলের কলসী একটা রাখে, সবদিন আবার পাড়াতেও যেতে পারে না, যেদিন সন্ধ্যে হ'য়ে যায় রাস্তা দেখতে পায় না সেদিন কারও গোয়াল বাড়ীতে পড়ে থাকে, এমন যে বর্ষার জল সব ওদের মাথার ওপর দিয়ে গেছে। আমি বাবু এক একদিন ভাবি, এমন বাদলা, এমন মশার কামড় স'য়ে কি ক'রে ওরা বেঁচে আছে; ধন্যি ওদের জান্!"

আমি বামীকে বল্লুম "তোরা ওদের কোন উপায় ক'রে দিতে পারিস্‌নি?

"আমরা!" বলেই বামী কেমন অসহায় ভাবে আমার মুখের দিকে চাইলে, ভাবটা—তারা একে মেয়েমানুষ তাতে নেহাৎ গরীব, শক্তিই বা কি আছে, সামর্থ্যই বা কতটুকু?

বামী আমার মুখের ওপর বল্লে "স্যাধ্যি থাকলে বাবু তোমাদের ভদ্রলোকদের মত ব'সে থাকতুম না। তোমরা দেশে এসেছো তোমরা কোথায়—"

কেমন একটা আবেগের বশে সেদিন বেরিয়ে পড়লুম। পাঁচজনকে ব'লে ক'য়ে চাঁদা তুলে ওদের যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

অনেক ছোট বড় বাড়ী বাড়ী গেলুম, কিন্তু কথাটা কথা মাত্র ছাড়া অন্যভাবে কেউ গ্রহণ করতে পারল না। দুটো অসহায় বালকবালিকাকে সাহায্য করা উচিত চক্ষুলজ্জার খাতিরে মুখের কথায় অনেকে এ কথা ব'ল্লে বটে কিন্তু তার জন্য ট্যাঁকে হাত দেওয়া—সে কেমন ক'রে হবে? যত গলদ ত ঐখানে, তাদেরও যেমন মাথা গোঁজবার কুঁড়ে নাই অনেকেরও তেমনি কুঁড়ে ঘর ছাইবার সামর্থ্য নাই! অবস্থা বিশেষে কিছু উন্নত বটে। একথা, যার আছে সেও বল্লে যার নেই সেও বল্লে, অথচ এরা পূজা উৎসবও করে, পর্ব্বোপলক্ষে পুণ্য কামনায় দান ধ্যান করতেও ইতস্ততঃ করে না। সে হ'লো—নিজের ইহকাল পরকালের মঙ্গলের জন্য। আসল কথা মানুষকে

মানুষ ব'লে ভাববার পক্ষে দেশের সমাজ যেমন আইন কানুন জারী করেছে, দেশের মানুষগুলিও তেমনি নির্ব্বিকারে বাঁধা রাস্তা ধরেই চলেছে; মানুষের জন্য ভাববার, বিশেষ এদের মত নেহাৎ ছোটলোকদের কথা কাণে তোলবার প্রবৃত্তি কারো নেই—আর সে কথা কইতেও অনেকে গররাজী। যে সংস্কারটা আমাদের জীবনধারার মূলে সনাতন কাল হ'তে জগদ্দল পাথরের মত চেপে ব'সে আছে, তা কেটে স্রোত ফেরাবার আবশ্যক কারও নেই। দেশে ঘুরতে ঘুরতে কেবল একটা বাণীই নজরে পড়েছে,—শুধু আপনাকে বাঁচাও,—সে কেড়েকুড়েই হোক কি যাই ক'রেই হোক; বড় রকম সহানুভূতির কথা স্বপ্ন মাত্র।

অনেকদিন আর ওদের সম্বন্ধে কোন কথাই মনে ছিল না। তবে বাড়ীতে ব'লে গিয়েছিলুম ওই সব সব-হারারা এ'লে ওদের ফিরিয়োনা। তারপর আস্তে আস্তে কখন এই দেশের হাজার দুঃখের ছবির সঙ্গে ওদের ছবিটাকেও মিশিয়ে ফেলেছিলুম মনে ছিল না। আবার পুজোর বন্ধে বাড়ী এসেছি, পাশের বাবুদের বাড়ীতে পূজা উৎসবের ধূম চলেছে, কাক, চিল, কুকুর এরাও ব্যস্ত হ'য়ে দিকে দিকে মহাভোজের কথা প্রচার করছে। মহানবমীর দিন ব্রাহ্মণদের ভোজন সমাধা হবার পর কুটুম্ব সজ্জনেরা খেতে বসলেন, ছোটলোকদের যে কখন ডাক পড়বে তার ঠিকানাই নাই। আমার ভোজ খাবার বালাই ছিলনা ব'লে বেরিয়ে পড়েছিলুম। বাইরে বেরুতেই দেখলুম তথাকথিত নীচ জাতীয় স্ত্রীলোকরা এক একখানি থালা কোলে করে রাস্তার ধারে ঘাসের উপর ব'সে আছে, উদ্দেশ্য—ভদ্রলোকদের ভোজনাবিশিষ্ট এঁটোকাঁটা গুলো কুড়িয়ে খাবে। তার মধ্যে একটা স্ত্রীলোক সর্ব্বাঙ্গে কাপড় ঢাকা দিয়ে ঐ ঘাসের উপরেই প'ড়ে ধুঁকছে, সম্ভব তার জ্বর এ'সে থাকবে। আমি তার পাশের একটা স্ত্রীলোককে তার কোন অসুখ ক'রেছে কিনা জানতে চাইলুম।

একেই তাদের ভদ্রলোকদের উপরে একটা সংস্কারজাত অসীম ভয়ভক্তির ভাব আছে, তার উপর আমার মুখের দিকে চেয়ে যখন জানল আমি এই বড় বাড়ীরই একজন লোক, তখন তাদের কথা কইতে সামর্থ্যে কুলাল না! স্ত্রীলোকটি ঘোমটা টেনে লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিলে। আমি চ'লে যাচ্ছি দেখে ময়লা কাপড়চোপড়ের মধ্য হতে মুখটা বার ক'রে সেই স্ত্রীলোকটাই ধুঁকতে ধুঁকতে বল্লে "বাবু, আমার বড্ড জ্বর হ'য়েছে, এ ম্যালোয়ারী জ্বর বোধ হয়; কবে মরণ হবে বলতে পারো বাবু?"

তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম কুৎসিৎ পারার ঘায়ে তার সারা মুখখানা ছেয়ে গেছে। এরপর আস্তে আস্তে মাংস খসতে আরম্ভ হবে। তারপর পচে ফুলে নিজ কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করবে!

তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষাই পেলুম না, সে যা পাপ করেছে তার ফল তাকে পেতেই হবে।

সন্ধ্যার দিকে নদীতীর হ'তে বেড়িয়ে ফিরে আসছি, দেখি পুকুরের বাঁধা ঘাটটার ধারে সেই ব্যাধিগ্রস্তা মেয়েটা একখানা ভাতের থালা কোলে ক'রে বসে আছে, সম্ভব পূজাবাড়ী হ'তেই এখানা বাগিয়ে থাকবে!

আমি বল্লুম "খেতে বসিস্নি কেন?" সে বল্লে "বাবু, আমার ছেলে পাতা আনতে গেছে,—এলেই বসবো।" অল্প অল্প চাঁদের আলো আসছিল, সেই আলোতেই তারা কাজ চালিয়ে নেবে।

ইতিমধ্যে যে ছেলেটা এলো তাকে আমি চিনতুম না যদিও, তবু যেন কোথায় কবে দেখেছি ব'লে বোধ হ'ল, কিন্তু বহুদিনের রুদ্ধ স্মৃতির দুয়ারে ঘা দিয়ে দিন কালটা ঠিক ধারনায় আনতে পারলুম না। এমন সময় আমার বন্ধু চারু সেধার দিয়ে কোথায় চলেছিল, আমাকে দেখে বল্লে "তুমি বুঝি ঘুরে ঘুরে ছোটলোকদের খাওয়া দেখে বেড়াচ্ছো? কিরে হাবলা, আজ তোর মনিবের বাড়ীতে কাজে যাসনি?" হাবলা বল্লে "আজ পুজোর

দিন গো, আমার মুনিব ছুটি দিয়েছে, তাতে আবার মা এসেছে—"

আমি চারুকে বল্লুম "এতটুকু ছেলে, সে এরমধ্যে চাকরী করতে ঢুকেছে নাকি?" চারু অবাক হ'য়ে বল্লে "বেশ, এর চাইতে কত ছোট ছেলে লোকের বাড়ীতে গিয়ে কাজ নিচ্ছে তুমি তার কি জান? ও ত আজ দু বছর ধ'রে রাখালী করছে, তিনু সরকারের বাড়ীতে আছে, এবারে ওর পনের ট্াকা মাইনে হ'য়েছে। তোর মা আবার এ'লো কবে? বলি মাগী, আবার গাঁয়ে আসা হ'লো যে—সহরের চটকলে খেটে আশ মিটলো না?"

আমার কেমন সন্দেহ বোধ হ'ল। বহুদিনের অতীত একদিনকার ঝাপসা স্মৃতি মনের মধ্যে জেগে উঠ্ল, চারুকে বল্লুম "ওরা কারা চারু?"

চারু বল্লে "তুমি চিনবে কি! ওই হাবলা আর ওর মা। হাবলাটা যখন এতটুকু তখন ওকে ফেলে ওর মা পালিয়েছিল, তারপর আজ ছেলে রোজগার করছে শুনে চলে এসেছে, বেটীর মত পাজী কি আর দুনিয়ায় আছে? গতর খাটিয়ে গাঁয়ে কাজ করতে কষ্ট হয়েছিল তাই গিয়েছিলেন কলে খাটতে। এখন সহরে থাকার মজাটা বুঝছিস্ ত!"

কঠোর ব্যঙ্গস্বর হাবলার মার হৃদয়ে যেন বড্ডই বাজল, একটু অসহিষ্ণু হয়েই সে ব'লে উঠল "সাধে গিয়েছিলুম গো, গাঁয়ে কাজ পাইনি বলেই ত; তোমরা কাজ দিতে পেরেছিলে?"

"আর তোর ভাল হোক! হাবলা বলেই আমার ওর মাকে খেতে দিচ্চে—আমি হ'লে ওমন মায়ের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতুম।" ব'লে চারু অনেকখানি রক্ত চক্ষু ক'রেই হাবলার মার দিকে চাইলে।

এই সময়ের মধ্যে হাবলা ভাত কটা বেড়ে দুভাগ ক'রে ফেল্লে, কম একভাগ নিজে নিয়ে অন্য ভাগ থালা শুদ্ধ মাকে সরিয়ে দিলে। তার মা-টা কিছুমাত্র সময় ব্যয় না ক'রে বসে গেল। যেন কতদিনকার ক্ষুধা তার মধ্যে ছিল, যেন কতযুগ সে খেতে পায়নি!

আমি তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই মা ও ছেলেকে দেখছিলুম আর ভাবছিলুম ভগবান কি ধাতুতে এই মা ও ছেলেকে পাঠিয়েছেন। যে মা ছেলেকে অসহায়ভাবে ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে পেরেছিল তার উপর ছেলের এতটুকু ঘৃণাও নাই! আমার সেই কচি অনাথ বালকটার ছবি জল্ জল্ ক'রে মানসনেত্রে ভেসে উঠল। সে তার দিদির পেছন পেছন অসহায় ভাবে চলেছে—সেইটেই বারম্বার মনে পড়তে লাগল। যাদের পায়ের তলায় মৃত্যু গর্জ্জন করে চলে যাচ্ছে, যারা একবারে সর্ব্বনাশের শেষ কিনারায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, যাদের সাহায্য করতে কেউ নাই তারা যে বেঁচে থাকতে পারে এ ধারণা আমার মোটেই ছিল না। যখন হাবলার মার খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়ে এল তখন আমি বল্লুম "হাঁ হাবলার মা, তুই তোর এমন ছেলেকে ফেলে কি ক'রে পালিয়েছিলি?"

জঠরাগ্নিতে আহুতি পড়ায় তার মেজাজ ঠাণ্ডা হ'য়ে এসেছিল, দাঁত খুঁটতে খুঁটতে সে বল্লে "শুনবে বাবু? আমি সাধে পালাইনি। পালিয়েছিলাম তাই ছেলেটা আমার বেঁচেছে, আমি মজুর খেটে যা রোজগার ক'রতাম তাতে তিনটে পেটের কিছুই হ'তনা, তাই পালিয়ে গেলাম, তাই তোমরা, পাঁচ ভদ্রলোকে আমার হাবলাকে, পুঁটীকে বাঁচালে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম "তোর সে মেয়ে কোথা?" হাবলা বল্লে "দিদির সাঙ্গা হ'য়ে গেছেক বাবু, সে শ্বশুর বাড়ীতে আছে; কিছুতে যেতে চায় না, আমি যেই ব'ল্লাম এইবার আমি খুব একলা থাকতে পারব, তখন দিদি গেল।"

আমি হাবলার মাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলুম "আগে যখন এই দেশে তোদের সব চলেছে, তোদের ছেলেপিলে মানুষ হ'য়েছে, এখনই বা চলে না কেন?"

মাগী বল্লে "তোমরা ত আর বিশ্বেস করবে না

বাবু, আমার মার ওদ্বি ছটা আটটা ছেলে ছিল, তাদের মানুষ ক'রেও গিয়েছিল। তখন ধান ভানার কাজ পাওয়া যেতো, ভদ্দরলোকদের বাড়ী ভানাকুটো ক'রে বেশ আমাদের দিন কাটত। এখন চালের কল হ'য়ে কেউ আর ভানতে দেয় না। সামান্ত গেরস্থ পর্য্যন্ত বাড়ীর খোরাকীর ধান কলে ভেঙে নেয়, কি করবো বাবু তাই বলো ?"

দেখলুম দোষী সে কেবল একলাই নয়—তার আশেপাশের জগত, তার সমাজ তাকে আর এক রকম করে তৈরী করে তুলেছে, নইলে ইচ্ছা করেই সহসা কেউ মন্দ হ'তে চায় না। দারুণ অভাবই তাকে ক্রমে নীচের দিকে জোর করে ঠেলে নিয়ে গিয়েছ। বললুম "সহরেও ত বেশ সুখে থাকতে পাসনি, ব্যারাম নিয়ে ঘরে ত—

মাগী তখন উঠে প'ড়ে বাধা দিয়ে বল্লে "প্রথমটা মনে ক'রেছিলুম বাবু সহরে বুঝি খুব রোজগার-পাতির উপায় আছে, কলে একটাকা ক'রে রোজ, খেয়ে মেখে কিছু জমাতে না পারি সুখে ত থাকব। কিন্তু কিছুই হলনা,—কোথা হতে এক হাড়হাবাতে এসে আমায় মদ ধরালো, বল্লে "এতে সব ভুলবি।" ভোর পাঁচটার বাঁশীতে উঠতুম, সন্ধ্যে সাতটায় ঘরে ফিরতুম, মদেই বেঁচে ছিলুম বাবু, কিন্তু কিছু জমাতে পারলুম না ; উল্টে এই রোগ নিয়ে দেশে এলাম। ভাবলাম কোথায় আর যাবো, হাবলা আমায় ফেলতে ত পারবে না—যাই হোক গর্ভধারিণী মা-ত বটে। একখানা কুঁড়েও বাছার আমার হয়েছে। বেশী দিন ত আর বাঁচব না বাবু, এই গাঁয়ের কোলেই আমি মরবো, তোমরা, আশীর্ব্বাদ করো বাবু, হাবলা যেন আমার মুখে আগুন দেয়।"

আকাশের চাঁদ তখন গাছের ফাঁকে ফাঁকে অনেকখানি উঁচুতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, কাছের বকুল গাছটা হ'তে দুএকটা বকুল ফুল গোপনে চোখের জল পড়ার মত টপ্ টপ্ ক'রে ঝরে পড়ছিল।

আমি চলে এলুম, আর কি জিজ্ঞাসা করবো ভেবে পেলুম না। সব-হারাদের জীবনের এইত গতি ; সকাল হ'তে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত তারা এক তাড়না নিয়ে ঘোরে, সে হচ্চে ক্ষুধা। তার জন্ত তারা কত ধ্বস্তাধ্বস্তি যে করছে তার ঠিক নেই, যে পাপ করতে মোটেই কেউ রাজী নয়, তাতেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আমরা ভদ্রলোকরা দূর হ'তে তাই দেখি, তাদের আর্ত্তনাদ নীরবে শুনি, মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে বলি, চোর-ডাকাত, দশ ধারায় জেলে ঢোকাই !

রাত্রে শুয়েও বার বার কেবল তার একটা কথা মনে পড়তে লাগল—বাবু, গাঁ ছেড়ে গিয়েছিলাম, আবার এই গাঁয়েই আমি মরবো !

মানুষ মানুষেরই সহানুভূতি পেতে বাসনা করে কিন্তু আচলায়তনের রুদ্ধ দুয়ারে আমরা কসাইএর মত ছোরা হাতে করেই দাঁড়িয়ে আছি ; পবিত্রতার আর শুচিতার এমন জাবর কাটছি যে ঠাকুরও অনেককাল মুখ ফিরিয়ে চলে গেছেন আর দুনিয়ার মানুষও আমাদের দিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে !

নারী-অবদান

শ্রীবিজয়কুমার ভৌমিক।

দাহির-মহিষী—

ভারতবর্ষে অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশ হইতে প্রথম মুসলমান অধিকার আরম্ভ হয়। সিন্ধুদেশের রাজা ছিলেন দাহির। মহম্মদ বিন্ কাসিম নামক আরব-দেশীয় মুসলমান বীর বহু সৈন্য লইয়া প্রথম তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। প্রথমবার মুসলমানগণ পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন। কিছুদিন পরে পুনরায় অধিকতর সৈন্য লইয়া আসিয়া রাজধানী এলোর অবরোধ করেন। যুদ্ধে মহারাজ দাহির নিহত হইলেন এবং রাজপুত্র ভয়ে পলায়ন করিলেন। ইহাতে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন রাণী রণরঙ্গিণীবেশে নিজে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বাক্যে উৎসাহিত হইয়া তাঁহার নেতৃত্বে হিন্দু-বীরগণ অনেকদিন পর্য্যন্ত নগর রক্ষা করিলেন। বহুদিন অবরুদ্ধ থাকিয়া অবশেষে নগরে খাদ্যাভাব উপস্থিত হইল। আর নগর রক্ষা করা অসম্ভব দেখিয়া রাণীর আদেশে বীরগণ নগরত্যাগ করিয়া তরবারি হস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইলেন। এদিকে নগরমধ্যে এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করিয়া নগরবাসিনী রমণীগণকে লইয়া রাণী তাহাতে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। বহ্নিকুণ্ডে বীর রমণীগণের এইরূপ অপূর্ব্ব আত্ম-ত্যাগের নাম ইতিহাসে তখন হইতে 'জহর যজ্ঞ' বলিয়া কীর্ত্তিত হইল। বীরাগ্রগণ্যা দাহির-মহিষীর অনুকরণে পরে ভারতে আরও বহুতর 'জহর যজ্ঞ' অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার অনল-প্রভায় রাজ-পুতানার ইতিহাস ভাস্বর হইয়া রহিয়াছে।

যশোবন্ত-মহিষী—

যোধপুরাধিপতি যশোবন্ত সিংহ মোগল সম্রাট্ সাজাহানের সেনাপতি ছিলেন। সম্রাট্ সাজাহান অসুস্থ হইয়া পড়িলে যখন তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল, তখন তিনি জ্যেষ্ঠ দারার পক্ষাবলম্বন করেন। সম্রাটের তৃতীয় পুত্র কূট-নীতিজ্ঞ ও সমরদক্ষ ঔরংজেবের সহিত উজ্জয়িনীর নিকট তাঁহার এক যুদ্ধ হয়। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ মহাবীর, কিন্তু সরল-হৃদয় এবং কিছু দাম্ভিক-প্রকৃতি ছিলেন। কূট-নীতিজ্ঞ ঔরংজেব কনিষ্ঠ সহোদর মুরাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। পরাজিত হইলেও মহারাজ অবলীলাক্রমে শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন।

মহারাজ যশোবন্ত সিংহের প্রধানা মহিষী অতি তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। মহারাজের অনুপস্থিতি কালে তিনিই যোধপুরদুর্গের কর্ত্রী ছিলেন। যুদ্ধ-বিজয়ী স্বামীর প্রতীক্ষায় উৎসুক অন্তরে কালক্ষেপ করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার নিকট সংবাদ পৌঁছিল,—"মহারাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।" এই সংবাদ শুনিয়া তেজস্বিনী রাণীর প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন, "নগরদ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিমালিপ্ত হইয়া যিনি ফিরিতেছেন, তাঁহাকে যেন কোনও প্রকারে নগরে প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়।"

মহারাজ যখন নগরদ্বারে পৌঁছিলেন, তখন তাহা বন্ধ। তিনি শুনিলেন তাঁহার প্রেমময়ী পত্নী পরাজয়ের কলঙ্কে কলঙ্কিত তাঁহাকে নগর-প্রবেশ করিতে দিতে নিষেধ করিয়াছেন।

যে প্রাণাধিক দয়িতের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য তিনি নিতান্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাকেই কর্ত্তব্যচ্যুত হইতে দেখিয়া এইরূপ কঠোরভাবে নগর-প্রবেশ বন্ধ করিবার আদেশ দিয়া যে তেজস্বিতা

তিনি দেখাইয়াছিলেন তাহার জন্যই এই তেজস্বিনী রাণীর গৌরব আজিও কীর্ত্তিত হইতেছে।

জনৈকা জাপ-জননী—

প্রকাণ্ডকায় রুষ-সাম্রাজ্যের সহিত যুদ্ধে ক্ষুদ্র জাপান জয়লাভ করিয়াছিলেন জাপানবাসীর অলৌকিক স্বদেশপ্রেমের বলে; আর সেই স্বদেশ-প্রেমের উৎস নিহিত ছিল অনেক পরিমাণে জাপ-রমণীর অন্তরে।

যুদ্ধের সময় একজন দরিদ্র জাপ-শ্রমিক-যুবক অন্যান্য অনেকের সহিত সৈন্যদলভুক্ত হইবার প্রার্থনা করেন। সৈন্যাধ্যক্ষ অনুসন্ধানে জানিলেন যুবকের বৃদ্ধা ও অসমর্থা মাতা আছেন এবং ঐ একমাত্র পুত্র ব্যতীত তাঁহার আর কোনও অবলম্বন নাই। এরূপক্ষেত্রে কাহাকেও সৈন্যশ্রেণীতে গ্রহণ করা নিষেধ ছিল। এইজন্য যুবককে বিফল-মনোরথ হইয়া ক্ষুণ্নমনে ফিরিতে হইল। পুত্রের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জানিয়া যুবকের মাতাই তাঁহাকে সৈন্য হইতে পাঠাইয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন, "স্বদেশের সেবা করিতে যদি যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার প্রাণ যায়, তাহা হইলে না হয় আমিও গৃহে থাকিয়া অনাহারে প্রাণ দিব; তাহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখ বা ক্ষতি নাই।" এখন পুত্রকে বিষণ্নবদনে ফিরিতে দেখিয়া তিনি অন্তরে আহত হইয়া বলিলেন, "বৎস, এই নগণ্য বৃদ্ধার জন্য তুমি পরমজননী দেশমাতৃকার সেবা করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছু নাই; অতএব আমি এখনই এই ঘৃণিত জীবনের অবসান করিতেছি।" এই বলিয়া বৃদ্ধা নিজ উদরে ছুরিকাঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন; তাঁহার পুত্রের দেশসেবার পথ উন্মুক্ত হইল।

জাপানের একজন সামান্য শ্রমিক-রমণীর এই অপূর্ব্ব মহত্ত্ব কবে আমাদের মায়েরা অনুকরণ করিবেন? শতাব্দী-পূর্ব্বের অসভ্য জাপান এই মায়েদের প্রসাদেই আজ এসিয়ার গৌরব।

থীব্‌স্ রাজ-ভগ্নী আন্টিগোন্—

এক সময়ে থীব্‌স্ নগরে ইটিওক্লস্ ও পলিনিসেস্ নামক দুই ভ্রাতা রাজত্ব করিতেন। কিছুদিন পরে দুই ভ্রাতায় বিবাদ উপস্থিত হইল এবং ইটিওক্লস্ পলিনিসেস্‌কে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পলিনিসেস্ শীঘ্রই সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া থীব্‌স্ নগর অবরোধ করিলেন। দুই ভ্রাতার মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে উভয়েই নিহত হইলেন। পলিনিসেসের অবরোধকারী সৈন্যদল নেতৃশূন্য হইয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল।

ভ্রাতৃদ্বয়ের খুল্লতাত ক্রিয়ন্ এখন রাজা হইলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই আদেশ দিলেন, "ইটিওক্লস্‌কে রাজগৌরবে সমাহিত করা হউক। পলিনিসেস্ দেশের শত্রু; তাহার দেহ উন্মুক্ত প্রান্তরে পশুপক্ষীর আহার হউক। যে তাহার দেহ সমাহিত করিবে তাহাকে পর্ব্বত-গুহায় জীবন্তসমাধি দেওয়া হইবে।"

সেকালে তথায় মৃতের সমাধি না হওয়া একটা ভীষণ ব্যাপার এবং মৃত ব্যক্তির প্রতি যৎপরোনাস্তি অপমানসূচক বলিয়া গণ্য হইত! এইজন্য মৃত ভ্রাতৃদ্বয়ের ভগিনী তেজস্বিনী আন্টিগোন্ ভ্রাতা পলিনিসেস্‌কে সমাহিত করিতে জীবনপণ করিলেন। তিনি গোপনে নগর হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। একাকী সেই মৃতদেহ বহন করিতে অসমর্থ হইয়া ধূলিরাশি সংগ্রহ করিয়া ভ্রাতার সমাধিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে অপমান হইতে রক্ষা করিলেন। এদিকে রাজা ক্রিয়ন্ এ কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার জীবন্ত-সমাধির আদেশ দিলেন। আন্টিগোনও হাসিমুখে দণ্ডগ্রহণ করিলেন। যে সেই তেজস্বিতার প্রতিমূর্ত্তি মহীয়সী রমণীকে পর্ব্বত-গুহায় লইয়া যাইতে দেখিল সে-ই কাঁদিয়া আকুল হইল। কয়েকদিন যাইতে না যাইতে রাজার মনেও অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন; কিন্তু সে লোক যাইয়া দেখিল—সব শেষ হইয়া গিয়াছে!

নিবেদন

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই বিশ্ব সংসারে ভগবানের নিয়মে পুরুষ ও নারীর মধ্যে শারীরিক ও মানসিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও, কর্ম্মক্ষেত্রে উভয়েই সম-মর্য্যাদা-বিশিষ্ট। একের দ্বারা যেমন সৃষ্টিকার্য্য অসম্ভব, তেমনই একের প্রাধান্যও অযৌক্তিক। সৃজন ও পালনের জন্য উভয়ের মিলিত শক্তিই প্রয়োজনীয়। সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই, উভয়ের মধ্যে পরস্পরকে বশীভূত রাখিবার জন্যই বিধাতার এক অপূর্ব্ব বিধান বর্ত্তমান। বিধাতার এই বিধানের বশেই নারী পুরুষের অধীন এবং পুরুষ নারীর অধীন।

বিধাতা নারীকে পুরুষের সহিত সমমর্য্যাদা-বিশিষ্ট করিয়া যেমন 'গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তেমনই একে অন্যের অধীন করিয়া তাহাদিগের পরস্পরের গৌরববর্দ্ধনও করিয়াছেন। জগতে যত-কিছু সুখ, শান্তি, সন্তোষ, সব এই অধীনতার উপরেই নির্ভর করিতেছে! এই পাশ মুক্ত করিয়া স্বাধীন হইবার যে কল্পনা, তাহা বিধির বিধানে বিপ্লব ঘটাইবারই প্রচেষ্টা মাত্র!

এই সংসার-কর্ম্মক্ষেত্রে ভগবান পুরুষ ও নারীর জন্য কর্ম্মবিভাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সৃষ্টির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভগবানের প্রদত্ত বৃত্তি-বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়াই যৌন সম্মিলনে সম্মিলিত নারী গর্ভধারণ করেন এবং এই সৃষ্টি কার্য্যে বিধাতা পুরুষের দ্বারা গর্ভাধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই গর্ভাধান সংস্কার হইতেই পরস্পরের কার্য্য পৃথক পথে পরিচালিত, অথচ পরস্পর সাহায্য সাপেক্ষ। একজনকে গর্ভস্থ ভ্রূণের রক্ষা বিধানের জন্যই বাহিরের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাই পুরুষ কেবল গর্ভাধান করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন, নারীর ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করাও তাঁহারই কর্ম্ম; আর সেই কর্ম্ম-ভারটাও বিধাতা পুরুষের ঘাড়েই চাপাইয়া নারীকে নিশ্চিন্ত থাকিবার অবসর দিয়াছেন। পর্য্যবেক্ষণ করিলে পশুপক্ষীর মধ্যেও এই কর্ম্ম-বিভাগের প্রভাব দেখা যায়। এই কারণেই নারীকে নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সংসার-ধর্ম্ম করিতে হইলে পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিতেই হইবে। নারী পুরুষের অধীনতা-পাশ (?) ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইবার আয়োজন করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে গর্ভধারণের ও সন্তান পালনের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ না করিলে চলিবে না, নারীর যাহা নিজস্ব সেই মহান্ মাতৃত্ব ভাবটাকে বিসর্জ্জন না করিলে হইবে না! প্রবৃত্তি পরিচালিত নরনারীর যৌন সম্মিলনের যাহা ফল, তাহা যখন ফলিবেই—গর্ভোৎপাদন যখন ঘটিবেই, তখন তথাকথিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশার নেশায় যাঁহারা চলিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এসব ঝঞ্ঝাট ভোগ করা বিড়ম্বনা মাত্র এবং বিরক্তিকর। তাই তাঁহারা কৃত্রিম উপায়ে গর্ভরোধের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন! ইহাতে যে নারীত্বের সম্মান—মাতৃত্বের গৌরব একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, তাহা কি তাঁহারা অথবা তাঁহাদিগের প্ররোচকবর্গ স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিবেন না?

স্বাধীনতা কি কেবল স্বেচ্ছাচারিতার দ্বারা লভ্য? অথবা স্বেচ্ছাচারিতার নামই কি স্বাধীনতা? তা' নয়! প্রকৃত স্বাধীনতায় যে সুখ, যে শান্তি, তাহা নিয়মানুবর্ত্তিতার ভিতর দিয়াই প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিয়মবিহীন—শৃঙ্খলাবিহীন যে স্বাধীনতা, তাহা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা নহে, তাহা স্বেচ্ছাচারিতা! তাহাতে সমাজের কল্যাণ হয় না, সমাজ ধ্বংস হয়।

পাশ্চাত্যের সমাজ-রঙ্গমঞ্চে নারী যে নূতন ভূমিকা লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাকে আমরা প্রাচ্যের লোক, দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলিয়াই

বোধ করি। বিধাতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া প্রবৃত্তির নিরঙ্কুশ পরিচর্য্যাই কি কাম্য? শুনিতে পাই তথাকথিত স্বাধীনতায় আঘাত লাগে বলিয়া পাশ্চাত্যের সভ্যা ভব্যা নব্যা নারী-সমাজ বিবাহ-বন্ধনটাকে আর আমল দিতে চান না; কেননা ওটাও যে বন্ধন—স্বাধীনতার পরিপন্থী!

আজকাল আমাদের দেশে অনেক শিক্ষাভিমানিনী নিষ্কর্ম্মা নারী, পাশ্চাত্যের এই বাহ্য আড়ম্বরের মোহে মুগ্ধ হইয়া যেন কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের হাবভাব, আলাপ আলোচনা, সবই যেন পাশ্চাত্য-প্রভাব বিশিষ্ট! পাশ্চাত্যের তথাকথিত শিক্ষিতা ও স্বাধীনা নারীর কার্য্য দেখিয়া ভারতনারী আপনার জাতীয় আদর্শকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেছেন এবং তজ্জন্য নিজেদের বিশিষ্টতা ধ্বংস করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন! বোধ হয় এই সকল মহিলাগণ বিবেচনা করেন যে, নিভৃত নিকুঞ্জে যুবক-যুবতীর অবাধমিলন না ঘটিলেই যেন নারীজন্ম বৃথা চলিয়া গেল;—কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারিলেই যেন নারীর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল;—প্রবৃত্তি-পরিচালিত স্বেচ্ছাচারিতায় বাধাপ্রাপ্ত হইলেই যেন নারীজীবনের সমস্ত সুখই শুষ্ক হইয়া গেল! কিন্তু প্রকৃতই কি তাই?

আমরা মাতৃজাতির প্রতি সমধিক শ্রদ্ধা ও সম্মান সহকারে নিবেদন করিতেছি,—আমরা মাতৃজাতিকে সংযমী মাতৃমূর্ত্তিতেই পূজা করিতে চাই, বিলাসিনী মূর্ত্তিতে নহে! যাঁহারা নারীকে বিলাসিনী ও স্বেচ্ছাচারিণী মূর্ত্তিতে চান, তাঁহারাই আজ নারীহিতৈষীর পোষাক পরিয়া, নানা রঙে নানা ঢঙে নারীচিত্র অঙ্কিত পূর্ব্বক পশুপ্রবৃত্তি পরিবর্দ্ধনের পথ পরিষ্কারের সুযোগ প্রদান করিতেছেন! বুঝিতেছেন না যে, তাঁহারাই প্রকারান্তরে নারীমর্য্যাদার অবমাননা করিয়া ভবিষ্যৎ মানব জাতিকে কিরূপ বিপদের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন! ভারতবর্ষ, সংযমেরই সমর্থন করিবে, উচ্ছৃঙ্খলতার নহে;—দেবত্বেরই পূজা করিবে, পশুত্বের নহে! নারী তাঁহার স্বাধীকারে সগৌরবে অধিষ্ঠিত থাকুন, স্বাধীকারচ্যুত হইয়া আত্মাবমাননার উপায় অবলম্বন করিবেন না,—আত্মহত্যার পথ পরিষ্কৃত করিবেন না!

মা কোথা ?

[একাদশবর্ষীয়া বালিকা ৺তপিমা দেবী রচিত]

কোথা মা গেছিস্ চ'লে ?
ডাকি মোরা 'মা' 'মা' ব'লে !

ঐ ওঠে রবি, ঐ ওঠে চাঁদ,
পাতে নিতি নিতি কত মায়াফাঁদ—
মোরা চেয়ে থাকি অনিমেষ আঁখি
মা কবে আসিবি গেহে ?
কোলে তুলে নিবি স্নেহে।

নিত্য নূতন কত উপহার
দিতে চাই মাগো চরণে তোমার-
আমরা দুখিনী বড় অভাগিনী
করি শুধু হায় হায়,
আয় মাগো ফিরে আয়!

শেষ চিঠি

(গল্প)

শ্রীমতী ভক্তিসুধা হার।

বৌদি,

আজ তোমায় চিঠি লিখ্‌ছি, জানিনা কতদিন পরে। শৈশবে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, আর যৌবনের মধ্যপথেই ছাড়াছাড়ি। আজ যৌবনের শেষসীমা ছাড়িয়ে প্রৌঢ়ত্বের ধাপে পা দিয়েছি; যৌবনের উন্মাদনার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের চঞ্চল আকাঙ্ক্ষাগুলোরও অবসান হ'য়ে গেছে, কিন্তু শান্তি আসেনি। বৌদি, একটা প্রদীপের বুকের মাঝে যে আলোকটা বড় উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলতে থাকে, তাকে যদি তুমি নিবিয়ে দাও তবে সে ঠাণ্ডা হ'য়ে যায় বটে, কিন্তু তার বুকের সেই কালিম টুকু যায় কি? যায় না, একটা দাগ ব'সেই থাকে। আমার এ পোড়া বুকটার অবস্থাও তেমনি। সেখানকার জ্বালা নিভেছে, কামনার বহ্নি থেমে গিয়েছে কিন্তু বুকের মাঝখান চি'রে যে একটা কালো দাগ বসে গিয়েছিল, সেটা আজও মিলিয়ে যায়নি—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থেকেই যাবে!

আজ মনে পড়ছে সেদিনের কথা—সেই যেদিন তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়—কত ভালবাসা, কতখানি বিশ্বাস নিয়ে দুজ'নে দুজ'নকে বরণ ক'রে নিয়েছিলুম। জীবনে আমার প্রকৃত অন্তরঙ্গ বন্ধু যদি কেউ থাকে তবে সে তুমি। বিশ্বাস কর, সত্যি বল্‌ছি বৌদি, মনের গোপনতম কথাটি পর্য্যন্ত তোমার কাছে কোনদিন আমি গোপন করিনি; তাই আজও যা' তোমাকে জানান হয়নি' সেই কথা ব'লে তোমার শান্ত আনন্দময় জীবনের শান্তিটুকুতে আঘাত দিতে এসেছি। মিনতি করছি—আর একবার আমায় মাপ কর। বড় কম জ্বালাতন তো আমি এ পর্য্যন্ত তোমায় করিনি, চিরকাল যেমন স্নেহে সব দোষ-ত্রুটি ক্ষমার চ'খে দেখে এসেছ, আজও তা পারবেনা কি?

আমাকে জানতে তো তোমার বাকী নেই, তবু সকলের মনে যে একটা বিশ্রী ধারণা আমার সম্বন্ধে বদ্ধমূল হয়ে আছে সেই ভুল যদি তোমারও মনের কোণে এতটুকু দাগ্ দিয়ে থাকে তাই, সেটুকু মুছে দেবার জন্য এই সামান্য চেষ্টা। আজ এই বিদায়ের দিনে সকল কথা যদি তুমিও অবিশ্বাস কর, তবে জীবনের পরপারে গিয়েও এ দুঃখ আমার যাবে না।

সেদিনের সেই কথা তোমার মনে পড়ে কি,—যেদিন তোমার সঙ্গে আমার তর্ক হ'ত পুরুষ-মেয়েমানুষের দোষগুণ বিচার নিয়ে? স্ত্রীলোকের নিছক্ গুণের সাজি সাজিয়ে এনে তুমি আমার সামনে ধরতে—এতটুকু দোষ তাতে থাকত না; আর আমি তাদের ছোট বড় হাজার দোষ তোমাকে বোঝাতে ও দেখাতে যেতুম। তুমি কিন্তু তা বুঝতে চাইতে না। নিরুপায় হ'য়ে আমি বলতুম "ওইটিই মেয়েমানুষের প্রধান দোষ, নিজেদের কথার বিরুদ্ধে তারা কিছুতেই কোন কথা মেনে নিতে চাইবে না।" তারপর কত ছোটখাট মান-অভিমানের পালা, সর্ব্বশেষে সন্ধি।

* * *

দাদার সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলা আমার কোন কালেই ঘ'টে ওঠেনি কারণ তাঁর মত একঘেয়ে জীবন যাপন করা আমার মত অস্থির-চিত্ত লোকের কাজ নয়। আমি চাইতুম পৃথিবীটাকে পাল্টে দিতে,

জগতের নিয়মকানুন আপনার হাতে তুলে নিয়ে ইচ্ছেমত তাকে নূতন ধারায় নূতন পথে চালিয়ে নিতে।

মন দিয়ে কিছু বুঝে দেখ্‌বার মত ধৈর্য্য বা ক্ষমতা আমার ছিল না—শুধু বাইরের ভাবোচ্ছ্বাসের সঙ্গে হৃদয়কে মিশিয়ে দিতে চাইতুম। সৃষ্টিছাড়া নানান্ রকম খেয়ালই ছিল আমার পেশা।

এমনি অশান্ত যখন আমার মনের অবস্থা তখন তুমি এমন একজনকে আমার সাম্‌নে এনে দিলে—যার রূপের আলো ফোটাফুলের সৌন্দর্য্যের মতন ছড়িয়ে পড়্‌ছিল কিন্তু হৃদয় ছিল কুঁড়ির মতনই বন্ধ! তার ভেতরে সুরভি পরিপূর্ণই ছিল, কিন্তু তার আভাস পাওয়া যেত খুব কমই। তবু তাতেই যখন আমি মাতাল হ'য়ে উঠ্‌লুম্, তখন তা পূর্ণভাবে ভোগ কর্‌বার উন্মাদনাটাও বড় আকুল হ'য়ে জেগে উঠ্‌ল। তবুও একটি দিনের জন্যও তা' আমি স্বীকার ক'রে নিইনি বা প্রকাশ হ'তে দিইনি—তোমার কাছেও নয়; কারণ আমার চিরদিনের এই অহঙ্কারটুকু ছিল যে সে আগে আস্‌বে আমার কাছে ধরা দিতে। ভালবাসা দেবার আগে পাবার নেশাটাই তখন আমাকে পাগল ক'রে তুলেছিল। তাই দেবার ভাগের সঙ্গে পরিমাণ ক'রে আমার মনে হ'ল পাওনার পাত্র যে খালি!

যেচে নেবার সাধ কোন কালেই আমার ছিল না। তাই সে যখন সমস্ত অন্তর দিয়ে আমাকে বরণ ক'রে নিতে আমার মনের কাছে এসে ধরা দিলে না, তখন আমিও যেন ক্ষেপে উঠ্‌লুম তাকে প্রতিঘাত কর্‌তে। কিন্তু হঠাৎ আমার একদিন মনে হ'ল সে যেন আমার এই চাপা দেওয়া লুকোনো ব্যাকুলতাটুকু বুঝ্‌তে পেরেছে আর পেরেই যেন আমার এই প্রতিশোধ নেবার ব্যর্থ চেষ্টাটাকে বেশ একটু উপহাস কর্‌ছে। আমার মনে হ'ল সেই প্রতিভায় উজ্জ্বল চোখদুটিতে যেন জয়ের উল্লাস ফুটে বেরুচ্ছে। আমি সাবধানে আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে ইঙ্গিতে তাকে বুঝিয়ে দিলুম এটা তার সম্পূর্ণ ভুল। তার জয়ের ধারণাটা নিয়ে একটু পরিহাস কর্‌তেও ছাড়িনি।

সে কিন্তু তবুও হার মান্‌লে না; বিজয়ের বিপুল গর্ব্বে ঘাড় বাঁকিয়ে একটুখানি মৃদু হাসিতে আমায় পরাস্ত ক'রে দিলে। অপমানে, দুঃখে আমি আমার ভেতরের ব্যাকুলতাকে সম্পূর্ণ মোহ বলে উড়িয়ে দিতে চাইলুম, কিন্তু সেকি কখনও পারা যায়? তাকে পরাস্ত কর্‌বার জন্য আমিও যেন ভেতরে ভেতরে উন্মাদ হ'য়ে উঠেছিলুম। মনে হ'ল তাকে বুঝিয়ে দিই তার কাছে আমি কিছুই চাইনে, তাকে দিতেও কিছুই পারব না। এম্‌নি ওলট্‌পালট ভাবের মধ্য দিয়ে ঠিক্ উদ্‌ভ্রান্তের মত যে কতদিন কেটে গেল তার অনুমান আজ আমি কর্‌তে পারব না। ঠিক সেই সময়ে সে আমার মনের অবস্থার উপর কিছুমাত্র দৃষ্টি না ক'রে কিছুদিনের জন্য তার মায়ের কাছে গেল। তারপর একদিন কি ভাবে, কি কথা দিয়ে যে তাকে চিঠি লিখেছিলুম তা আমার মনে নেই; তার জবাবে সে যা লিখেছিল, তার একটি কথা আজও আমার মনে পড়্‌ছে—"ভরসা করি তোমার মন এখন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে, সুতরাং এখন শীগ্‌গিরই একদিন ফির্‌ব ভাব্‌ছি।"

মদির স্বপ্নের মত, সুখের নেশায় যা' একদিন আমার কাছে রঙীন্ ছিল, কল্পনার মণি-মুক্তো দিয়ে যা আমি একদিন বুনেছিলুম্, প্রকৃতির নিষ্ঠুর বিধানে তা এল আমার ভাগ্যে উল্টো হ'য়ে! বাইরের চক্ষে সে-ত' আমার বড়ই নিকট, কিন্তু আমি জানি সে আমার অনেকখানি দূরে। তুমিও তখন ভুল করেছিলে, বৌদি! মনে কর্‌লে এ বুঝি আমার ভালবাসারই রকম, তাই কিছু বুঝ্‌লেনা; তলিয়ে দেখ্‌লে না যে আমার এই বুকের নিভৃত গুহার মধ্যে প্রতিশোধের কি এক তীব্র শিখা দাউ দাউ ক'রে জ্বলছিল। তাই তোমার কাছেও একটু সহানুভূতি পেলুম না! ভাবলুম, সে ত ভালবাসেনি

আমায়! কুমারী-জীবনের গর্ব্ব-অভিমান তখনও তার হৃদয়খানি 'জুড়েই ছিল। আর তাই আমি যখন হৃদয়-হীনের মত নিষ্ঠুর প্রতিশোধের ব্যর্থ আশায় তাকে ঠেলে দিতে যেতুম, তখনই দেখ্‌তুম সে আমার কাছ থেকে অনেকখানি দূরেই আছে। এতদূরে, যে সেখানে আমার হাত পৌঁছায় না। এইবার খুব একটা নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে সব ভেঙে চুরে দিতে ইচ্ছে হ'ল কিন্তু হৃদয় তা মা'নতে চাইলে না। সমস্ত প্রাণ মন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'এযে হতেই হবে।' আমি 'না' বল্‌তে পারলুম না—তাদের সঙ্গে একত্র হ'য়ে সম্পূর্ণ মত দিয়ে বসলুম।

সে এল। বিজয়কিরীট মাথায় দিয়ে গরবিনী সুন্দরী তা'র প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতেই এসেছে—মুখে চোখে তার এমনি একটা ভাব। দেখে আমি মনে মনে হেসে বল্লুম—'তোমার পরাজয়ের দিন আস্‌ছে গো।'

এবার ভেতরে বাইরে আমি তাকে উপেক্ষা দেখাতে গেলুম, কিন্তু আমার ব্যর্থ সন্ধান তার মনের গায়ে আঁচড়টুকুও কাটতে পারেনি! মনে হ'ল সেখানে যে আমি অনেক আগে থেকেই উপেক্ষিত হয়ে আছি। সে যেন আমার প্রত্যেক শিরা উপশিরা পর্য্যন্ত চিনে নিয়েছিল কিন্তু আমার মনের কাছে এতটুকু ধরাছোঁওয়াও নিজে দেয়নি। হয়ত সে মনে করেছিল যতদিন না আমি নিজের পরিপূর্ণ ভালবাসা দিয়ে তার হৃদয় জান্‌তে পারি, ততদিন সেও আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করবে না।

মিথ্যে নয় বৌদি, আজ মনে হচ্ছে আমি, যার অন্তরের প্রত্যেকটি কোণ প্রেমের আলোকে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি—আমি কি করেই বা ভালবাসার যোগ্য হতে পারি? তবে ইচ্ছে করলে সে আমার এ ভুল ভেঙে দিতে পারত। কিন্তু সে তা দিলে না। ভাব্‌লুম,—না, এ আর হয় না। অশান্তির আগুনে তিল তিল ক'রে বুকটা আমার পুড়ে যাচ্ছিল। শুধু একটুখানি দয়া যদি সে আমায় করত তা'হলে কে জানে, হয়ত বা এমন ভাঙা হৃদয়ের অসহ্য বেদনা ব'য়ে আমার সমস্ত জীবন কাটত না—শেষের দিন ঘনিয়ে আস্‌বার আরও কিছুদিন দেরী হ'ত।

* * * *

সেইদিন সেই ঘন বর্ষাবাদলের দিনটি, যেদিন তোমাদের কাছে বিদায় নিয়ে চ'লে এলুম—সেদিনের কথা আজও আমার মনে স্পষ্ট ছবির মত ভেসে উঠ্‌ছে। দাদার নিষেধ, রাগ, সর্ব্বশেষ-স্নেহময় করুণ অনুরোধ, তোমার কাতর মিনতি, ব্যাকুল অশ্রুজল সব উপেক্ষা ক'রে চ'লে এলুম। কিন্তু তখন একবার, শুধু একবার যদি সে আমায় অনুরোধ করত,—যদি বিদায়ের দিনে একবিন্দু অশ্রু, একটুখানি বেদনার আভাসও তার নির্ম্মম হৃদয়ের ভাসাপূর্ণ চোখ দুটিতে দেখ্‌তে পেতুম তা'হলে আমায় সারা জীবন এমন অসহ্য জ্বালায় জ্বলতে হ'তনা, আর দু'জনের জীবনই সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌তে পারত। আশাহত, উপেক্ষিত, উন্মত্ত হৃদয় নিয়ে চ'লে এলুম। কত জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ালুম। সুখের আশায়, শান্তির পিপাসায় সমস্ত প্রাণ হাহাকার করতে লাগল—কোথাও জুড়োবার এতটুকু স্থান পেলুম না। একবার এক সন্ন্যাসীর শিষ্য হ'য়ে দিনকতক পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরলুম পুলিশের লোকে মিথ্যে সন্দেহ ক'রে ধ'রে এনে জেলে পুরে দিলে। মাস তিনেক সেখানে কাটিয়ে দিয়ে এলুম, বড় বেশী কষ্ট হয়নি, কারণ আমার তখনকার মনের অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না।

ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এসে কি মনে ক'রে তাকে একখানি চিঠি লিখলুম। ব্যাকুল মর্ম্মোচ্ছ্বাস তখন আর তাতে ছিল না, ছিল শুধু এক মর্ম্মভেদ, গভীর নিরাশা-মিশ্রিত হৃদয়-ঢালা ব্যথার সুর। সে তার কি উত্তর দিয়েছিল জান বৌদি? যদি সেটা থাকত, আমি আজ নিশ্চয় তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতুম। সে লিখেছিল—

"উন্মত্ততা তোমার থেমে গিয়েছে, এতগুলো দিন বৃথা নষ্ট ক'রে অনুতাপও হয়ত হচ্ছে। তুমি

এখন ফিরে এস, শান্তি পাবে। তুমি এতদিন ধ'রে আমার কাছে যা চাচ্ছ আমার প্রাণে তা পরিপূর্ণই ছিল, কিন্তু তাতে শান্ত হবার মত যোগ্যতার তোমার বড় অভাব। ছিঃ, বড় অশান্ত তুমি! দু'জনের জীবনই একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে গেল। তোমার জন্ম যা মনে সঞ্চিত ছিল নেবার দিনে তাকে উপেক্ষা ক'রে গেছ; আজ আর আমার কিছুই নেই। বড় শুষ্কতা বুকে নিয়ে বেঁচে আছি, এর চাইতে মরণও আমার বহুসহস্রগুণে ভাল ছিল। তোমার অনাদৃতা মেয়ে বেঁচেই আছে। তার জন্মসংবাদ ত' পেয়েছিলে, একবার খবরও নাওনি!"

আমারই দোষে জীবন ব্যর্থ হল? আমিই প্রেমের অপমান করলুম? পূর্ণ সাজি গোপনেই শুকিয়ে গেল, আর আজ শূন্য পাত্র নিয়ে আমাকে বরণ করতে এসেছ? এতদিন ধ'রে কি বিষম যন্ত্রণায় ভুগ্‌ছি সেদিকে দৃক্‌পাত করনি, আর আজ আমার ওপর এই তীব্র ধিক্কার বর্ষণ কর্‌ছ? আবার সমস্ত মন বিষিয়ে উঠ্‌ল। তার সে চিঠিখানা আমি ধীরে ধীরে আগুনে পুড়িয়ে ফেল্‌লুম। বড় তৃপ্তি পেলুম। এইবার নিজেকে তার কাছে সম্পূর্ণ জয়ী মনে হ'ল। যাক্‌, আমার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটাও ব্যর্থতায় ভরে উঠেছে! উঃ বৌদি, আমি যেন তখন সত্যিই পাগল হ'য়েছিলুম! বিপুল গর্বোচ্ছ্বাস যেন আমার চোখ মুখ দিয়ে ফেটে বেরুতে চাচ্ছিল।

কিন্তু এ গর্ব্ব ত রইলনা, মুহূর্ত্তে কোথায় উড়ে গেল। মনে হ'ল সে যেন আপনার ভুল বুঝে আবার তার লুণ্ঠিত মানের ডালি নিয়ে সাম্‌নে এসে দাঁড়াবে—যদি আমায় কাছে পায়। * * * সে কি আমার কাছে কিছুই চায়না—এতটুকু দয়াও না? মাথাটা বড় জোরে ঘুরে উঠল। তার পর যে কদিন আমার কি ভাবে কেটেছে তা মনেও নেই। পথে, ঘাটে, গ্রামে, নদীর তীরে ঘুরে ঘুরে কাটাতুম। কেউ বল্‌ত উন্মাদ, কেউ রটিয়ে দিলে আমি একটা চরিত্রহীন পশু। তোমাদের কাছেও এসব কথা বোধ হয় গেল, নিন্দায়, অপমানে দেশ ছেড়ে গেলাম; আমি কিন্তু কাউকে কিছুই বলিনি, কারণ নিজেই তখন বুঝিনি কি আমার হয়েছে।

* * * *

এম্নি ক'রে কতদিন কোথায় কি ভাবে কেটে গেছে জানিনা, হঠাৎ একদিন ভোরের বেলা জেগে দেখি সমস্ত শরীরে বড় ব্যথা—আমি একটা হাসপাতালে শুয়ে আছি; একজন নার্স আমায় শুশ্রূষা কর্‌ছেন। সব কথা ভুলে গিয়েছিলুম, একে একে আবার সব মনে আস্‌তে লাগ্‌ল। রাগ, অভিমান, প্রতিহিংসা সবই যেন একে একে আমার ভেতরেই মিলিয়ে যেতে লাগল। কেবল আকুল অশ্রুধারায় বুকটা ভিজে সেখানকার আগুনটা ধীরে ধীরে নিভে যেতে লাগ্‌ল। সে কি কান্না! মানুষের চোখে—আমার মত মানুষের চোখে যে এত জল থাকতে পারে—তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লুম। তার মৃত্যুসংবাদের টেলিগ্রামটা তখনও আমার সাম্‌নেই ছিল—কাগজের লাল রংটা যেন আমায় উপহাস ক'রে হাস্‌ছিল। নার্সকে বল্লুম—'আমার আর কি শুশ্রূষা করবেন? শরীরের যন্ত্রণা আমার কিছুই নয়।' তিনি বল্‌লেন 'তারখানা পেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গিয়েছিলেন—মাথায় খুবই চোট লেগেছে। এই অণিমা কি আপনার স্ত্রী?' 'স্ত্রী?—আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখুন, মাথার যন্ত্রণা আমার কিছুই নয়—যন্ত্রণা এই বুকটার ভেতর।' তিনি ধীরে ধীরে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তাঁর স্পর্শটি যেন মায়ের মমতার মত স্নিগ্ধ, ভগিনীর ভালবাসার মত নির্ম্মল। সেই স্নেহ-শীতল স্পর্শটুকু আমায় স্মরণ করিয়ে দিলে তোমার কথা। বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া মাণিকটির মত এই কোমল স্মৃতি আমায় ব্যাকুল ক'রে তুললে। এক নিমেষে শূন্য বুক ভ'রে উঠ্‌ল। তাই এই বেদনা-বিধুর-চিত্ত নিয়ে আজ

তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। তুমি যখন আমার এ চিঠি পাবে তখন আমি এমন এক অজানা সমুদ্রের ওপারে গিয়ে পৌঁছিব—যার সন্ধান কেউ দিতে পারবেনা। আশ্চর্য্য হয়ো'না বউদি, এই না-জানার ভেতর দিয়েই আমার জীবনের অবসান হ'য়ে গেল। অনেক কথাই লিখবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সকল কথা গুছিয়ে বলবার মতন শক্তিও নেই, ধৈর্য্যও নেই। আজ বিদায়-বেলায় তোমার অশ্রু-ধোয়া স্নেহ-করুণ মুখখানি মনে পড়ছে। আমার আজ আর একটা কি আকাঙ্খা মনে জেগে উঠছে জান বৌদি? একখানি কুসুম-পেলব ক্ষুদ্র মুখ বুকের মাঝখানে চেপে ধরতে। তাতে বুঝি বড় শান্তি পেতাম—এ দাগটাও অনেক খানি মিলিয়ে যেত। জীবনে যার কথা ভাবিনি আমার সেই কচি মেয়ে 'এণা'কে আশীর্ব্বাদ করছি - তার জনক-জননীর অভিশপ্ত জীবনের ছায়াটুকুও যেন তার জীবনের পথ মলিন ক'রে না দেয়। জন্ম তার সার্থক হোক্, অন্তর সুন্দর হোক্। সে যখন বড় হবে, তখন তুমি আমার এই চিঠিখানি তাকে দেখিয়ো,—হতভাগ্য পিতার ব্যর্থ জীবনের বিষময় কাহিনী প'ড়ে তার চোখ দিয়ে যদি দু ফোঁটা জলও পড়ে, তাতেই আমার আত্মার তর্পণ হবে।

জীবন-পারের যাত্রা-শেষে যদি অণিমাকে পাই তবে পায়ে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা করব। শ্রদ্ধাপূত ভালবাসার শেষ অঞ্জলি গ্রহণ কর। বিদায়, চির বিদায়! ইতি— হতভাগ্য অলীন্দ্র।

শ্রীকিশোরীমোহন প্রামাণিক।

খোকা

টুকটুকে ঠোঁটটি
  শিউলির বোঁটটি,
    খিল্ খিল্ হাসি হেসে
      মার প্রাণ কাড়্ছে।

কুঞ্চিত চুলগুলি
  নাচে যেন বুলবুলি,
    চুলবুল্ ক'রে সদা
      জ্বালিয়ে যে মারছে॥

চঞ্চল মুখ খানি,
  হাসে দিলে হাতছানি,
    অঞ্চল আঁকড়িয়া
      মা'র গলা ধ'রছে।

হেসে এই দুলছে,
  পুনঃ কেঁদে ফুলছে,
    এর কোলে ওর কোলে
      ঝাঁপিয়ে যে প'ড়ছে॥

গালদুটি সুকোমল
  যেন লাল শতদল,
    কলবল্ ক'রে গৃহ
      মুখরিত ক'রছে।

এটা সেটা ঘাঁটছে,
  পায়ে পায়ে হাঁটছে,
    এই যায় দৌড়িতে,
      এই পুনঃ প'ড়ছে॥

ফুটফুটে বংটি
  কাদা মেখে সংটি,
    আবল তাবল ভাষে
      কত গান গাইছে।

ঐরূপ প্রাণটি
  বিধাতার দানটি,
    হিংসুটে মোর দিল্
      লইতে যে চাইছে॥

সঙ্কলিকা।

বিশ্বে নারীর স্থান—

জাপান।

জাপানদেশবাসীদের বিশ্বাস পুরুষের অন্তঃকরণ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের প্রকৃতি উৎকৃষ্টতর; কাজেকাজেই তাহারা সমস্ত ডাকঘরে কেরাণীগিরি কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্তা। ডাক-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ডাকঘরের পৃষ্ঠপোষকদের নিকট হইতে পুরুষ কেরাণীদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ শুনিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা সমস্ত পুরুষদের সরাইয়া সেই স্থানে স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন রমণীগণ নিযুক্ত হইলে সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যাইবে। শুধু তাহাই নয়; স্ত্রীলোক কেরাণীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে অনেক ব্যয়ও কমিবে।

জাপান মহিলাগণ যদিও এখন পর্য্যন্ত রাজনীতিক্ষেত্রে পদার্পণ করেন নাই তথাপি তাঁহারা পাশ্চাত্য রমণীদের অপেক্ষা অন্যান্য বিষয়ে পশ্চাতে নহেন। জাপান মহিলারাও নানাপ্রকার খেলাতে যোগদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা টেনিস প্রভৃতি খেলায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। অবসরকালে জাপান রমণীগণ নানাপ্রকার ব্যায়াম ও ক্রীড়া করিয়া থাকেন। জাপান সরকার পক্ষ ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছেন যে, এইরূপ ক্রীড়া দ্বারা স্ত্রী-কেরাণীদের শারীরিক ও মানসিক প্রফুল্লতা আসে। তজ্জন্য সরকারপক্ষ রমণীগণের ক্রীড়ার জন্য বিশেষ মনোযোগ এবং বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। শুধু যে নারী-কেরাণীরাই এই ক্রীড়া করিয়া থাকেন তাহা নহে; কি শিল্পী, কি ধাত্রী, এমন কি দাসীকেও টেনিস্ খেলিতে, ঘোড়ায় চড়িতে, নৌকা চালনা করিতে দেখা যায়। রমণীদের এইরূপ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা জাপান-বাসী প্রায় সকলেই অনুমোদন করিয়া থাকেন।

চীন।

সাংহাইয়ের প্রধান প্রধান মহিলারা রমণীদিগকে কার্য্যে লিপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে এক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই ব্যাঙ্কে কেবল স্ত্রীলোকেরাই কর্ম্ম করেন। ইহা দ্বারা চীন রমণীগণকে উৎসাহিত করা হইতেছে। নারী-কর্ম্মীরা কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য ট্রেনিং-বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়া থাকে।

শ্যাম রাজ্য।

শ্যাম রাজ্যে স্ত্রী-পুলিশ অনেকদিন যাবৎ আছে। তাহারা ব্যাঙ্ককে মহিলা-প্রাসাদের পাহারা দেয়। তাহারা পুলিশের পোষাক পরিধান করে বটে কিন্তু তাহাদিগকে অস্ত্রাদি প্রদান করা হয় না। তাহারা আগন্তুকের সঙ্গে প্রাসাদের মধ্যে গমন করে এবং আগন্তুকের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত প্রাসাদ মধ্যে অবস্থান করে। এমন কি প্রাসাদ-কর্ম্মচারী, শ্রমিক, ডাক্তার প্রভৃতিও স্ত্রী-পুলিশের পাহারায় থাকে।

তিব্বত।

ম্যাডাম নীল একজন রমণী পরিব্রাজিকা। তিনি ইতিমধ্যে ভিক্ষুক-যাত্রীর ছদ্মবেশে লাসাতে যাইয়া তিব্বতের মন্দির পরি-ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার ছদ্মবেশ এমন সুন্দর হইয়াছিল যে কেহই তাঁহার আত্মকাহিনী জানিতে পারে নাই। তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর। তিনি অবিকল তিব্বতবাসীর ন্যায় তিব্বতীভাষা বলিতে পারেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা।

দক্ষিণ আফ্রিকার মহিলারা তাহাদের স্বাধীনতার জন্য সর-কার-পক্ষ সমীপে এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিল। এই স্বাধী-নতার প্রস্তাব ৬টা ভোট বেশী পাইয়া জয়লাভ করিয়াছিল। ঐ বিলটী আরও সংশোধিত ও আলোচিত হইবার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়। ইহার শেষ সিদ্ধান্তের নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হয় কিন্তু গবর্ণমেণ্ট পদত্যাগ করায় ইহা স্থগিত হইয়া থাকে। তৎপর শ্রমিকদল প্রধান হইয়াছে এবং স্ত্রীলোকরাও জয়লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টিত আছে।

নিউজীলাণ্ড।

নিউজীলাণ্ডবাসী রমণীগণ ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে জুরিতে বসিবার এবং পুলিশের চাকরী করিবার অনুমতির জন্য আন্দোলন চালাইয়াছিল। এই বৎসরও তাহাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রস্তাবটী সদস্যগণ কর্ত্তৃক পাশ হয় নাই। অতঃপর নিউজীলাণ্ডের রমণীগণ এক সভা আহ্বান করতঃ সদস্যদিগকে দোষারোপ করিয়াছে। প্রধান মন্ত্রীর নিকট তাহারা এক আবেদনপত্র মঞ্জুরার্থে পেশ করিয়াছে, এই আবেদনপত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় উল্লিখিত আছে:—

(১) রমণী অন্যদেশের পুরুষকে বিবাহ করিলেও তাহার নিজের জাতীয়তা বজায় থাকিবে।

(২) যুবক মিষ্টান্ন ও কাগজ বিক্রেতাকে রাস্তা হইতে সরাইয়া দিতে হইবে।

(৩) সমস্ত গাড়ীতে নারীদের বসিবার স্থান বাড়াইয়া দিতে হইবে।

(৪) সম্মতির বয়স ১৬ হইতে ১৮ বৎসর করিয়া দিতে হইবে।

পারস্য।

পারস্যদেশে কার্পেট-শিল্প-বিভাগে স্ত্রীলোক ও ছেলেদের কার্য্যের সুবিধার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তাহারা দৈনিক ৮ ঘণ্টা করিয়া কাজ করিবে। বালক-কর্ম্মীর বয়স অন্যূন ৮ বৎসর হওয়া দরকার এবং নারী-শ্রমিকের কমপক্ষে দশ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে। বালকদিগের ও নারীদিগের কারখানা পৃথক পৃথক স্থানে অবস্থিত এবং মেয়েদের কারখানার যাবতীয় কার্য্যপদ্ধতির ভার মহিলাদের হস্তেই ন্যস্ত থাকিবে।

জার্ম্মানী।

জার্ম্মানীর সর্ব্বপ্রধান নারী-কবি রিকার্ডা হাকের ষষ্ঠিবর্ষীয় জন্মোৎসব ১৮ই জুলাই সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার প্রতিভা শিক্ষিত সমাজ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন। সংবাদপত্রে তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটী ও সরকারপক্ষের প্রতিনিধি তাঁহার সম্মানার্থে এক বিরাট অভ্যর্থনা প্রদান করিয়াছেন। মিউনিক সহরের একটী রাস্তার নাম রিকর্ডা হাকের নামে করা হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া।

সিড্‌নি বন্দরে এক সেতু প্রস্তুত হইতেছে। এই সেতুর কার্য্য সমাধা হইতে ছয় বৎসর সময় লাগিবে। ইহাতে প্রায় ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে। মিস্ কেথ্‌লীন বাট্‌লার নাম্নী জনৈকা রমণী এই পুলের ইঞ্জিনীয়ারের বিশ্বস্ত সেক্রেটারী। তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং ব্যাপারের জটিল সমস্যাগুলির মীমাংসা করেন, নক্সা দেখেন, টেণ্ডার লইয়া থাকেন। যখন এই সেতু নির্ম্মাণের নক্সা ও এষ্টিমেট প্রভৃতি করিবার জন্য অষ্ট্রেলিয়া হইতে লণ্ডনে একজন বিজ্ঞ লোক পাঠাইবার কথা উঠিল, তখন মিস্ বাট্‌লারকেই উপযুক্ত মনে করা হইল। তিনি সম্প্রতি লণ্ডনে আসিয়া সেতু নির্ম্মাণ-কার্য্যাদির নক্সা ও এষ্টিমেট্ তৈয়ারী করিতেছেন। —সঞ্জীবনী।

বসন্তের প্রতিষেধক বিধি—

বসন্ত রোগের সময় লোকেরা যদি নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করেন, তাহা হইলে বসন্তের আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকিবেন—

(১) বসন্তের টীকা গ্রহণ যাঁহারা পূর্ব্বে করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য করিয়া পুনরায় টিকা লইবেন।

(২) প্রত্যহ খাঁটী সরিসার তৈল সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবেন।

(৩) সর্ব্বদা শুচিভাবে থাকিবেন। বাড়ীর সকল স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় সকল ঘরে ধূনা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। কখনও ময়লা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবেন না।

(৪) পচা ও বাসী মাছ একেবারে খাইবেন না। তা'ছাড়া এ সময় মাছ খাওয়াটা একেবারে তুলিয়া দিতে পারিলেই ভাল হয়। কই, শিঙ্গি, মাগুর এবং জোয়াল মাছ এ সময় একেবারেই ত্যাগ করিবেন।

(৫) মাংস বা ডিম খাওয়া একেবারে বন্ধ করিবেন। যাহা প্রত্যহ খাইয়া থাকেন, তাহা ভিন্ন পোলাও বা ঐরূপ গুরুপাক কোন দ্রব্য এ সময় খাইবেন না।

(৬) প্রত্যহ ভোজ্য দ্রব্যের সহিত দু একটা উচ্ছে এবং উহার বিচি ভাজিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। পলতা এবং নিমপাতা ভাজা খাওয়া এ সময় বিশেষ উপকারী। উচ্ছের স্থলে করোলা হইলে আরও ভাল হয়।

(৭) দোকান হইতে দুগ্ধ কিনিয়া পান করা এ সময়ে কর্ত্তব্য নহে। মৎস্য বা দুগ্ধ হইতে বসন্তের উৎপত্তি আরম্ভ হয়। এজন্য দুগ্ধ খাঁটি ও বিশুদ্ধ কিনা তাহা ভাল করিয়া জানিয়া ব্যবহার করিবেন।

(৮) দোকান হইতে তৈয়ারী চা কিনিয়া খাওয়ায় যাঁহারা অভ্যস্ত, তাঁহারা অবশ্য করিয়া এ সময় উহা পরিত্যাগ করিবেন। ঐরূপ চা হইতেও ইহার সংক্রামকতা আসিতে পারে।

(৯) বাজারের খাবার সম্বন্ধেও যতটা পরিহার করিতে পারা যায় ততটা মঙ্গল। থিয়েটার বা বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখিবার জন্য এ সময় একদিনও রাত্রি জাগরণ করিবেন না।

(১০) হরীতকীর আঁটি ফুটা করিয়া সুতায় সাহায্যে পুরুষেরা দক্ষিণ হস্তে এবং মহিলাগণ বাম হস্তে ধারণ করিবেন। ইহা বসন্তের প্রতিষেধক ব্যবস্থা।

(১১) কাঁচা কণ্টিকারীর মূল চার আনা, গোলমরিচ পাঁচটা একত্র শীতল জল সহ বাটিয়া সপ্তাহে দুই দিন করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবেন। এ মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের। শিশুদের মাত্রা ঐ অনুযায়ী বিবেচনা করিয়া লইবেন।

(১২) শ্বেত পুনর্ণবার মূল চূর্ণ এক আনা ও গোলমরিচের গুঁড়া এক আনা শীতল জলসহ মধ্যে মধ্যে প্রাতঃকালে সেবন করিলে বসন্তের পীড়া হইতে পারে না।

(১৩) তেলাকুচা, মাধবী লতা, অশোক, পাঁকুড় ও বেতস এই কয়টি দ্রব্যের পাতার ওজন ।৶১০ আনা, জল আধসের, শেষ আধপোয়া করিয়া, প্রতি সপ্তাহে এক দিন করিয়া পান করিলে বসন্ত হইবে না।

(১৪) বৈকালে মোচার রস দ্বারা শ্বেতচন্দন পেষণ করিয়া কিম্বা বাকসের রস অথবা খাঁটি মধু পেষণ করিয়া সপ্তাহে দুই দিন পান করিবেন।

(১৫) হিঞ্চেশাকের রস মধ্যে মধ্যে পান করিলে বসন্তের

আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। ইহা শ্বেতচন্দন প্রবার সহিত মিশাইয়া সেবনে কখনই বসন্তের আক্রমণ হইতে পারে না।

(১৬) নিম ও বহেড়ার বীজ এবং হরিদ্রা শীতল জলে পেষণ করিয়া প্রতি সপ্তাহে পান করিলেও বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহা প্রত্যহ ব্যবহার করিতে পারিলে আরও মঙ্গল।

—দৈনিক বসুমতী।

পল্লীগ্রামের ধাত্রী—

পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা ধাত্রী যে শিশুমৃত্যুর অনেক সাহায্য করে এ কথা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। এই শ্রেণীর ধাত্রী সদ্য যমস্বরূপ। প্রসব করান'র বর্ত্তমান বিজ্ঞানসম্মত উপায়গুতাহারা মোটেই অবগত নহে, ফলে প্রসবকালে অবৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করায় অনেক প্রসূতি অকালে যমরাজ্যের অতিথি হয়। এই সকল গ্রাম্যধাত্রী মান্ধাতা-আমলের উপায়ে এখনও প্রসব করায় এবং প্রসবের অব্যবহিত পরেই যে সকল কার্য্য করা উচিত তাহা তাহারা সেই পুরাতন নিয়মে করিয়া প্রসূতি ও সদ্য-জাত শিশুকে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত করে। পল্লীগ্রামে নাড়ী কাটা এক বিষম ব্যাপার; বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন না করায় কত শিশু যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় তাহার সংখ্যা করে কে? গ্রাম্য অশিক্ষিত ধাত্রীরা প্রায়ই অপরিষ্কৃত চাচাড়ী দ্বারা শিশুর নাড়ী কাটিয়া শিশুর জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া তোলে। শিশুর নাড়ী কাটা ও সূতা দিয়া তাহা বাঁধিয়া রাখা বড়ই সাবধানে করিতে হয়। এই বিষয়ে যত্ন গ্রহণ না করায় কত বিপদ যে ঘটিয়াছে তাহা ডাক্তারগণ সবিশেষে অবগত আছেন। একখানা কাঁচি, একটু পরিষ্কৃত নেকড়া ও বিশুদ্ধ সূত্র নাড়ীকাটার সময় ব্যবহার করিলে বঙ্গের অনেক শিশু রক্ষা পাইতে পারে। এই সামান্য বিষয়ে অবহেলার দরুণ কত পরিবারে যে শোকের পাথার উত্থিত হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। গর্ভবতী নারীর উপর ইহাদের অত্যাচারের জন্য কত লোকের গৃহ যে শূন্য হয়, তাহা বলা বাহুল্য। প্রসব কালে এই অশিক্ষিত বর্ব্বর ধাত্রীরা যে অত্যাচার করে তাহা বর্ণনাতীত। অনেক ডাক্তার এই অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছেন। সকল পল্লী-ধাত্রীই যে এই শ্রেণীর এমন কথা আমরা বলিনা, তবে অধিকাংশই যে অবৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া প্রসব করাইয়া প্রসূতির জীবন সঙ্কটাপন্ন করে তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই।

এক্ষেত্রে যাহাতে উপযুক্ত ধাত্রীর দ্বারা প্রসব করান ও নাড়ী কাটান হয় তদ্বিষয়ে দেশবাসীর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার সময় আসিয়াছে।

যে সে যাহাতে ধাত্রী সাজিয়া গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের সর্ব্বনাশ সাধন না করিতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ দরকার। পল্লীগ্রামের ইউনিয়ন ও জেলা বোর্ড যদি এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে দৃষ্টিপাত করে তবে পল্লীর শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর হার যে অনেক হ্রাস পাইবে, তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

—স্বায়ত্ত শাসন।

খেলার শেষে

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ।

জননী হ'য়ে স্তন্য দিলে, রাখিলে বুকে করি,
পিতা হ'য়ে পালিলে পরম স্নেহে,
ভ্রাতা হ'য়ে ভগ্নী হ'য়ে সৌখ্যে রাখি ঘিরি
মিত্র হ'য়ে ঢালিলে মধু গেহে।
গুরুর রূপে শিক্ষা দিলে জগৎ-বিদ্যাগারে
সেবক হ'য়ে করিলে কত সেবা,
দয়িত হ'য়ে পরশমণির পরশে হিয়ার পুরে
রচিলে বসি ইন্দ্রজাল কিবা!

বাহিয়া নিলে তরণী সুখ-সাগর সঙ্গমেতে
জনমি' কোলে পুত্র কন্যা রূপে,
কত না বেশে আসিলে কাছে অশ্রু হাসির স্রোতে
ভরিয়া মুঠি হরিয়া নিলে চুপে।
সকল খেলা ফুরাল আজ চাতুরী ছল যত,
দীপালী তব নিভিয়া হোল শেষ,
বসিয়া আছি চাহিয়া পথ, নিপট ছল রত!
আসিবে আজ ধরিয়া কোন্ বেশ?

ফ্যাশন ও আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বি-এল।

ফ্যাশন শব্দটা ইংরাজি শব্দ হইলেও বাংলায় বেশ চলিয়া গিয়াছে। তবে বাবুগিরি বলিলে ইহার অর্থটা আরও স্পষ্ট বুঝা যায়। ফ্যাশনই বলুন আর বাবুগিরিই বলুন, জিনিষটা আদবেই ভাল নয়,—পুরুষের পক্ষেও নয়, মেয়েদের পক্ষেও নয়। ফ্যাশন জিনিষটা পুরুষের পক্ষে যে কত দোষাবহ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা আজ মেয়েদের ফ্যাশন সম্বন্ধে দুই একটা আলোচনা করিব।

আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে ফ্যাশন জিনিষটার বেশ একটা গূঢ় সম্পর্ক আছে। আধুনিক স্ত্রীশিক্ষাও ইহার সংস্রব এড়াইতে পারে নাই। আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যে দু'চারটি যুক্তির অবতারণা করা হয়, তাহার মধ্যে একটি প্রধান যুক্তি বোধ হয় এই যে, লেখাপড়া শিখিলেই মেয়েরা বাবু হইয়া যায়, সুতরাং মেয়েদের লেখাপড়া শিখান উচিত নয়। এ কথাটার মধ্যে সত্য যতটা থাকুক কি নাই থাকুক, ঝাঁঝ তার চেয়ে অনেক বেশী আছে। তবে কথাটার ভিতর সত্য যে এতটুকুও নাই, তাহা বলিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হয়। এ কথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না যে, সাধারণ মেয়েদের চেয়ে অনুপাতে স্কুলকলেজ-যাওয়া মেয়েদের ভিতর বাবুগিরি ভাবটা একটু বেশী।

অনেকে বাবুগিরি বা ফ্যাশনের অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে একটু ফিটফাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটাই বাবুগিরি, সুতরাং অত্যন্ত দোষাবহ। আমরা তাহা মনে করি না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটাই যদি বাবুগিরি হয়, তবে সে বাবুগিরি আমাদের মেয়েদের ভিতর যত বাড়ে, ততই মঙ্গল। কেন না, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, জাতি হিসাবে আমাদের মধ্যে যতগুলি দোষ আছে, অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতাটা বোধ হয় তার মধ্যে অন্যতম। আমাদের মেয়েরা যতই শুচি শুচি করুন না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে তাঁহারা যে খুব উন্নত, তাহা বলিতে পারি না। ছোট্ট একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। হিন্দুর মেয়েরা সাধারণতঃ স্নান না করিয়া হেঁসেলে প্রবেশ করেন না। কিন্তু যিনি পাক করিবেন, তিনি স্নান করিয়া কিরূপ "পরিষ্কার" একখানা কাপড় পরেন, তাহা বোধ হয় হিন্দু পাঠকপাঠিকা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আমার বিশ্বাস শুচিতা বোধ হয় সেই কাপড় দেখিয়াই দূরে পলায়ন করে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" নামক গ্রন্থে আমাদের এই তথাকথিত শুচিতা ও পরিচ্ছন্নতার একটি অতি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের ভিতর সময় সময় এমন দুই একটি অভ্যাস দেখা যায়, যাহাকে বাস্তবিকই খাঁটি ফ্যাশন বা বাবুগিরি ছাড়া আর কোন সংজ্ঞাতেই অভিহিত করা যায় না। সকলেই যে এরূপ হয়, তাহা নয়; বরং প্রকৃত শিক্ষিতা যাহারা, তাহাদের অধিকাংশই এরূপ নয়। তবে কি জানেন, ফ্যাশন একটা রোগবিশেষ, শুধু রোগ নয়, সংক্রামক রোগ; একের দেখাদেখি অন্যের হয়। যে সকল মেয়ে স্কুল কলেজে যায়, তাহাদের একশ্রেণীতে দু'চারটি ফ্যাশনওয়ালা মেয়ে থাকিলে, অধিকাংশের মধ্যেই সে ফ্যাশন সংক্রামিত হয়। ফ্যাশন অতি সাংঘাতিক রোগও বটে। একবার এ রোগে আক্রান্ত হইলে সহজে ইহার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া দুষ্কর। ইহা যে সংসারে প্রবেশ করে সে সংসারের সুখশান্তি নষ্ট করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ত্তমানের ফ্যাশন জিনিষটা

বিদেশীর আমদানী। অবশ্য ইহা যে আমাদের দেশেও বরাবর না ছিল, তাহা নয়, কিন্তু বোধ হয় এরূপ সাংঘাতিক ধরণের ছিল না। আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ইহা এরূপ মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে।

আমাদের দেশের তথাকথিত উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী, এবং তথাকথিত শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা মেয়েদের তুলনা করিলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ হইবে। আমাদের দেশের তথাকথিত নিম্নশ্রেণী বা অশিক্ষিতা মহিলাদের প্রধান ফ্যাশনের বিষয় কি? অলঙ্কার। নানা প্রকার সোনারূপার অলঙ্কার দিয়া গা ঢাকিতে পারিলেই ইহারা ফ্যাশনের চূড়ান্ত মনে করিয়া গভীর আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। অলঙ্কারের ফ্যাশনটা তত মারাত্মক নয় এই কারণে যে, ইহাতে যে অর্থব্যয় করা হয়, তাহা একপক্ষে ঘরেই থাকিয়া যায়। বরং ইহা দ্বারা একটা সঞ্চয় করা হয়, বিপদে আপদে ঐ সকল অলঙ্কার সংসারের অনেক সাহায্যও করিয়া থাকে।

আর আমাদের দেশের তথাকথিত উচ্চশ্রেণী, বিশেষতঃ তথাকথিত শিক্ষিতা মহিলাদের ফ্যাশনের প্রধান বিষয় কি? আমাদের মনে হয় অলঙ্কার তত নয়, যত কাপড়, জামা, সাবান, এসেন্স প্রভৃতি। অত্যন্ত মিহি ও দামী দামী শাড়ী, ব্লাউজ, সেমিজ, জ্যাকেট প্রভৃতি পোষাকপরিচ্ছদ এবং সাবান, এসেন্স, পাউডার, ক্রীম প্রভৃতি বিবিধ টয়লেট বা অঙ্গরাগের সামগ্রীই বোধ হয় তাঁহাদের প্রধান আকাঙ্খিত বস্তু। অর্থনৈতিক হিসাবে দেখিতে গেলে অলঙ্কারের ন্যায় এই সকল দ্রব্যের কোন স্থায়ী মূল্য নাই; কিছুদিন ব্যবহার করিলে এসব দ্রব্যের কোনও মূল্য থাকে না। অথচ আজকাল এই সকল দ্রব্যে এক এক পরিবারের যে কত অর্থ ব্যয় হয়, তাহা, যাঁহারা পরিবারের কর্ত্তা তাঁহারাই বলিতে পারেন। বিশেষতঃ এই সকল জিনিষ অনেক সময় অধিকাংশই বিদেশী থাকে, সুতরাং ইহার দরুণ রাশি রাশি অর্থ আমাদের ঘর হইতে বিদেশে চলিয়া যায়।

অবশ্য, অলঙ্কারও যে এই সব মেয়েরা পছন্দ না করেন, তাহা নয়, খুবই করেন, তবে তাঁহাদের অলঙ্কার সাধারণ মেয়েদের ন্যায় মোটা মোটা অনন্ত বালা জাতীয় হইলে বোধ হয় পছন্দসই হয় না; তাঁহাদের অলঙ্কার অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত সুচিক্কণ হইলে ভাল হয়, অর্থাৎ অলঙ্কারের উপকরণের যত দাম না হউক, গঠন ও কারুকার্য্যের দাম তার চেয়ে অধিক হওয়া চাই।

ফ্যাশন জিনিষটা—যাঁরা ফ্যাশন দেখান, তাঁদের কাছে যত ভালই লাগুক না কেন, যাঁরা সেটা দেখেন, তাঁদের চোখে কিন্তু তত ভাল লাগে না। কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "জাপান যাত্রীর পত্রে" আমাদের দেশের ফ্যাশনওয়ালা ও ফ্যাশনবর্জ্জিতা মেয়েদের তুলনা করিয়া যে একটি সুন্দর আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অতি মনোরম। তিনি লিখিয়াছেন, "আধুনিক বাঙ্গালীর ঘরে মাঝে মাঝে খুব ফ্যাশনওয়ালা মেয়ে দেখিতে পাই, তারা খুব গট্ গট্ করে চলে, খুব চট্‌পট্ করে ইংরাজি কয়, দেখে মস্ত একটা অভাব মনে বাজে,—মনে হয় ফ্যাশনটাকেই বড় করে দেখ্‌ছি, বাঙ্গালীর মেয়েটিকে নয়; এমন সময় হঠাৎ ফ্যাশন-বর্জ্জিত সরল সুন্দর স্নিগ্ধ বাঙ্গালীঘরের কল্যাণীকে দেখ্‌লে তখনি বুঝতে পারি এত মরীচিকা নয়, সচ্ছ গভীর সরোবরের মত এর মধ্যে একটি তৃষ্ণাহরণ পূর্ণতা পদ্মবনের পাপড়ি নিয়ে টল টল করছে।"

বাস্তবিক, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, ফ্যাশন জিনিষটা কাহারও পক্ষে শোভন নয়, কাহারও পক্ষেই সমর্থন-যোগ্য নয়। আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নই, বরং একান্ত পক্ষপাতী। স্ত্রীজাতির উন্নতি না হইলে আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক কোন উন্নতিই সম্ভবপর নয়, ইহাই আমাদের ধারণা। দেশে স্ত্রীশিক্ষার যত অধিক প্রচলন হয়, স্ত্রীশিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেশে যত অধিক প্রবর্ত্তিত হয়, ততই দেশের ও দশের পক্ষে মঙ্গল। সুশিক্ষিতা মেয়েরা সমাজের রত্ন, জাতির গৌরব। এ রত্নের সংখ্যা

দেশে যতই বর্দ্ধিত হইবে ততই দেশ গরীয়ান ও মহীয়ান হইয়া উঠিবে। প্রকৃত শিক্ষার সহিত ফ্যাশন বা বাবুগিরির কোন সংস্রব নাই, বরং যাঁহারা প্রকৃত শিক্ষিতা, তাঁহারা ইহাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। তবে প্রকৃত শিক্ষার স্থলে যেখানে অশিক্ষা বা কুশিক্ষা স্থান পায়, সেখানেই বিলাসিতা বা বাবুগিরির আধিক্য দেখা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার কঠোর ঔজ্জ্বল্যে প্রথমে অনেকের চক্ষুই ঝলসিয়া যায়, তাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার সারটুকু ফেলিয়া খোসাটুকু গ্রহণ করিয়া থাকেন। এ কথা শুধু মেয়েদের সম্বন্ধে নয়, পুরুষদের পক্ষেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।

আমরা মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদ বা অলঙ্কার-পত্রের বিরোধী নই, তবে সেগুলি বিলাসিতাব্যঞ্জক না হইয়া যাহাতে আমাদের অবস্থার উপযোগী হয়, সেদিকেই আমাদের অধিক দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। বাঙ্গালী অতি দরিদ্র জাতি। অধিকাংশ বাঙ্গালীরই আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অন্নসমস্যাই বাঙ্গালীর প্রধান সমস্যা। এক মুঠো অন্নের জন্য আজ সমগ্র জাতিটা চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে। বাবুগিরি বিলাসিতায় অর্থব্যয় করা কি আমাদের অবস্থায় শোভা পায়? তাছাড়া আমাদের মেয়েদের ব্যবহারের জিনিষগুলি যাহাতে সম্ভবমত সমস্তই স্বদেশী হয়, সে বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। একমাত্র মেয়েদের বিলাসোপকরণের জন্যই প্রতি বৎসর কত লক্ষ লক্ষ টাকা যে বিদেশে চলিয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই কবি মনোমোহন চক্রবর্ত্তী স্বদেশীযুগের আমলে একটি গানে লিখিয়াছিলেন,—

"বলিতে লজ্জা করে—প্রাণ বিদরে
বার লাখের কম হবে না—
পুঁতি কাঁচ ঝুঠা মুক্তা এই বাঙ্গালায়
দেয় বিদেশ, কেউ জানে না।
ঐ শুন বঙ্গমাতা, শুধান কথা—
"উঠ আমার যত কন্যা;
তোরা সব করিলে পণ, মায়ের এ ধন
বিদেশে উড়ে যাবে না।"

পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও সেই কথা। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' যে শুধু পুরুষকেই 'মাথায় তুলে নিতে হবে' তাহা নয়, মায়ের জাতকেও 'সমান শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় আমরা বলিতে চাই,—'আমাদের দেশের মোটা খদ্দর আমাদের মাতা ভগ্নিগণের লজ্জানিবারণ ও শীতাতপ দমন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ।'

আমাদের দেশের শিক্ষিতা মহিলাগণের উপর এক গভীর দায়িত্বভার রহিয়াছে। তাঁহারা নারী-সমাজের আদর্শ, তাঁহারা যেভাবে চলাফেরা করেন, সাধারণ মেয়েরা সেইরূপই অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের চালচলন পোষাক পরিচ্ছদ যাহাতে সম্পূর্ণ ফ্যাশনবর্জ্জিত ও সহজ সরল হয়, সে বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। 'ফ্যাশনওয়ালা মেয়ে' 'যারা খুব গট্ গট্ করে চলে' বা 'চট্‌পট্ করে ইংরাজি কয়' তারা কখনই আমাদের সমাজের আদর্শ হইতে পারে না; আমাদের সমাজের আদর্শ তাঁহারাই 'যাঁহারা ফ্যাশনবর্জ্জিত সরল সুন্দর স্নিগ্ধ বাঙ্গালী ঘরের কল্যাণী।' এই সম্পর্কে 'আদর্শ বঙ্গনারী' সম্বন্ধে বাঙ্গালী কবির উক্তিটি বার বার মনে হয়—

"পাশ্চাত্য-ললনা সম বিদ্যুৎবরণী
নহ তুমি; নহে তব অবারিত গতি
সবজ্র বিদ্যুৎ সম; আদর্শ জননী,
সুভগিনী, গৃহলক্ষ্মী, তবু তুমি সতি!
নারীত্ব হয়েছে সখি দেবত্বে বিলীন,—
অধীন কথার কথা, তুমি গো স্বাধীন!"

প্রত্যাবৃত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(১১)

সরিত সমস্তদিন ধরিয়া ঠিক করিতে পারিল না সে অসীমদের বাড়ী যাইবে কিনা। একবার আত্মসম্মান জাগিয়া উঠিল। কেন সে যাইবে? অসীমের শরীর সুস্থ থাকা সত্ত্বেও সে ষ্টেশনে আসিতে পারিল না, সুধীরকে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইল। সে নিজের বন্ধুর প্রতি ভালবাসা ভুলিয়া গেল। সরিতেরই বা এমন কি মাথাব্যথা পড়িয়াছে যে সেই ভালবাসা মনে করিয়া রাখিতে যাইবে?

পরক্ষণে আবার ভাবিল বোধ হয় সাংসারিক গোলযোগের জন্যই সে আসিতে পারে নাই। তাহার মন খারাপ হইয়া আছে, কেমন করিয়া সে আসিবে?

সন্ধ্যাবেলা সে অসীমের বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইল। সুধীর যে আসিবে বলিয়াছিল তাহার কথা একেবারেই সে ভুলিয়া গিয়াছিল। অসীমের কাছে আর কে? অসীমের জন্য সে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

সন্ধ্যার একটু আগে সে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল ফিরাইতেছিল, সেই সময় বাহির হইতে বিনীতা ডাকিল "দাদা।"

সরিত বলিল "কিরে? আয় ঘরে।"

বিনীতা গৃহে প্রবিষ্ট হইল।

সে অপরূপ সুন্দরী। বয়স তাহার বোধ হয় আঠার উনিশ হইবে, তথাপি আজও সে অবিবাহিতা। যখন সরিত পাঁচ বৎসরের ও সে ছয়মাসের তখন পিতামাতা উভয়েই প্রাণত্যাগ করেন। সংসারে এই দুটি ভাইবোনের আপনার বলিতে কেহ ছিল না। বিষয় সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে গেল, ভাই বোন দুটি পুরাতন দাসী কুসুমের নিকট লালিত পালিত হইতে লাগিল। বাস্তবিক এই দাসী তাহাদের মাতার ন্যায় স্নেহ না করিলে তাহারা বাঁচিতে পারিত না।

দুটি ভাই বোনের সৌন্দর্য্য যেমন অতুলনীয়, হৃদয়ও তেমনি অতুলনীয় ছিল। সরিত নিজে কলিকাতায় গিয়া বোনকে বেথুন কলেজে পড়িতে দিয়া আসিল। যাহাতে সে উচ্চ শিক্ষা পায় তাহার দিকে তাহার কঠোর দৃষ্টি ছিল।

কুসুম দুই একবার তাহার বিবাহের কথা তুলিয়াছিল, কিন্তু সরিত তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল ছোটবেলায় বিবাহ দিলে কি ফল হয়।

যখন বিনীতা ম্যাট্রিকুলেশন পাস দিয়া গৃহে ফিরিল, তখন সরিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "এখন কি করতে চাস বিনীতা, এখন তো বিয়ে করতে হবে তোকে?"

বিনীতা মাথা নাড়িয়া অত্যন্ত রাগের সহিত বলিয়াছিল "আমি বিয়ে করবনা দাদা।"

সরিত বলিয়াছিল "ঠিক থাকতে পারবি তো? দেখ আগে বিবেচনা করে, তারপরে আমায় বল। এরপরে খানিক দূর উঠে যদি পড়ে যাস, তাই আমার ভাবনা হচ্ছে।"

বিনীতা মুখ তুলিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিল "কিছু ভয় ক'রনা দাদা। আমি সকলের মা, পদস্খলন কখনও হবে না। তোমার পায়ে পড়ি দাদা, আমায় বিয়ে করবার অনুরোধ ক'রনা। জোর করে যদি বিয়ে দাও, আমি ঠিক আত্মহত্যা করব।"

সরিত তাহার ছোট মুখখানা টানিয়া বুকের মধ্যে ধরিয়াছিল, তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া বোনের মাথার উপরে পড়িয়াছিল। তাহার শিক্ষা দেওয়া সেদিন সার্থক হইয়াছিল। বিনীতার ললাটের চূর্ণ অলকগুচ্ছ সরাইয়া দিতে দিতে আনন্দপূর্ণ কণ্ঠে সে বলিয়াছিল "না দিদি, আমি কখনও তোর বিয়ে দেবার কথা মুখে পর্য্যন্ত আনব না। আমি দেশের কাজ করব বলে এগিয়েছি, তোকে কেন ঘরে রেখে যাব? আমার সঙ্গে সঙ্গে তোকেও যেতে হবে। দুটি ভাই বোনে আমরা সকল বিপদ তুচ্ছ করে ভগবানের নাম নিয়ে এগিয়ে যাব। আজ হ'তে পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা কর তুই, যা একদিন আমাদের দেশে মেয়ে পুরুষ সবাই শিখত। আমিও শিখি, দেখি কে কতদূর এগিয়ে যেতে পারে। আত্মোৎসর্গ কার কত আগে হয় তাই দেখা চাই।"

বিনীতা তাহার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া আসিতেছে। সে নিজে সকল প্রকার বিলাসিতা ছাড়িয়াছে। আগে চা না হইলে সে থাকিতে পারিত না, সে অভ্যাসও জেদের বশে সে ছাড়িয়া দিয়াছে। সে যথার্থই অগ্রসর হইয়াছে কিন্তু তাহার শিক্ষাগুরু দাদা অতদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

বিনীতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিল "বাঃ দাদা, তুমি তো বেশ মানুষ। 'পত্রে কত কথা লিখেছিলে যে ওখানে গিয়ে কত গল্প শুনাব, এখানে এসে অথচ ডুমুরের ফুল হয়েছ। সমস্ত দুপুর ঘুমিয়ে কাটালে।' এখন আবার বেরুবার উদ্যোগ করছ।"

সরিত বলিল "কাল সমস্ত রাত জেগে এসেছি—"

বিনীতা বলিল "এখন?"

সরিত বলিল "অসীমদের বাড়ী যাচ্ছি।"

বিনীতা বলিয়া উঠিল "তুমি তো অসীম অসীম কর, কই অসীমদা তো একদিনও আমাদের খোঁজ নেয় না। সেদিন মার খুব জ্বর হ'ল, হরিকে বললুম অসীমদাকে ডেকে আন। অসীমদা এলো না, ডাক্তার পাঠিয়ে দিলে শুধু। এ কাজটা তো আর আমরা পারতুম না, তাই কিন্তু অসীমদা কর'লে!"

কুসুমকে তাহারা উভয়েই মা বলিয়া ডাকিত।

সরিত ব্রাস দিয়া জামা ঝাড়িতে ঝাড়িতে অন্যমনস্ক ভাবে বলিল "শুনলুম তাদের সব বিপদ আপদ যাচ্ছে। বোধ হয় সেই সমস্ত কারণে সে আসে না। যাই হোক, আজ বিজয়া দশমীর দিন,—ওই যাঃ বিনীতা, তুই আমায় প্রণাম ক'রলিনে তো?"

অপ্রস্তত ভাবে বিনীতা তাড়াতাড়ি প্রণাম করিতে গেল। কথাটা তাহার মনেই ছিল না।

ভগিনীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সরিত বলিল "বল্ দেখি, আমি কি আশীর্ব্বাদ করলুম?"

বিনীতা হাসিমুখে বলিল "যেন এমনি ভাবেই মরতে পারি।"

সরিত হাসিয়া বলিল "দূর, তা কেন হবে? আমি আশীর্ব্বাদ করলুম যেন শীগ্গির আমার একটী ভগ্নিপতি আসে।"

বিনীতা মুখ লাল করিয়া বলিয়া উঠিল "না, যাও দাদা, ও সব কিরকমের কথা, মোটেই পছন্দ করিনে আমি।"

সরিত হাসিটা চাপা দেবার চেষ্টা করিয়া বলিল "তুই বিয়ে না করবি বয়ে গেল, আমি ঠিক এবার বিয়ে করব দেখিস্! একটা পাত্রী যা দেখে এসেছি, সত্যি যদি দেখিস।"

বিনীতা প্রথমটা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

দাদা যে বিবাহের উপর কি রকম বিরক্ত তাহা সে জানিত। অনেকবার শূন্য গৃহে একা থাকিতে যখন তাহার বিরক্তি বোধ হইত, তখন সে ভাবিত একবার সরিতকে বিবাহ করিবার কথা বলিবে। আবার তখনি দেশের কথা মনে হইত। সেই যে পরের মেয়েটা আসিয়া তাহার দাদার উৎসাহপূর্ণ কর্ম্মময় প্রাণটা একেবারে মাটী করিয়া দিবে, ষোল আনাই দখল করিয়া লইবে এবং দুঃখিনী মাতা যে দীন নয়নে চাহিবেন ইহা তাহার অসহ্য।

আজ সে দেশের কথা ভুলিয়া গিয়া আনন্দের সঙ্গে বলিয়া উঠিল "সত্যি দাদা? তা হলে বল না আমায়, আমি এই অগ্রাণ মাসেই সব ঠিক করে ফেলি।"

পরক্ষণেই সে সবেগে বলিয়া উঠিল "না, তুমি বিয়ে করতে পাবে না।"

সরিত বিস্মিত ভাব দেখাইয়া বলিল "কেন রে?"

বিনীতা তীব্র ভাব দেখাইয়া বলিল "বিয়ে করলে মানুষ চতুর্ভুজ হয় নাকি? সকলেই যদি সংসারী হবে, ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাবে কে? তুমি বড়লোক, তুমি কত উপকার করতে পারবে দেশের; কিন্তু সংসার পাতিয়ে বসলে তুমি আর কি কোনও দিকে চাইবে? তখন তুমি সঞ্চয় করবে না বিতরণ করবে? আমি কখনো তোমায় বিয়ে করবার প্রস্তাবে মত দিতে পারব না।"

"সরিত ঘরে আছ?"

বলিতে বলিতে সুধীর একেবারে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। সম্মুখে বিনীতাকে দেখিয়া সে থতমত খাইয়া পিছনে সরিবার উপক্রম করিতেছিল। সরিত লাফাইয়া উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বলিল "যাচ্ছ যে বড়? বিনীতাকে দেখে তোমার এতটা লজ্জিত হবার কোনও কারণ নেই। মুখে খুব লেকচার দিতে পার,—মেয়েদের অন্তঃপুরে বদ্ধ হয়ে থাকবার সময় নয়, তাদের বাইরে এসে ভাইয়ের পাশে, ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে, সে সব কি লোক-দেখানো নাকি? এই আমার বোন বিনীতা। একে তোমার বোন বলেই ধরে নাও। বিনীতা, ইনি আমার বন্ধু, তোমার দাদা সুধীর বাবু।"

বিনীতা সুধীরের পায়ের ধূলা লইয়া একটু হাসিয়া বলিল "আজ মা যাবার সময় তাঁর একটী ছেলেকে দিয়ে গেলেন।"

সরিত সুধীরকে বসাইয়া নিজেও আর একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। বলিল "কোন ছেলেটাকে দিলেন? দুটিতো মাত্র ছেলে তাঁর। এটি কার্ত্তিক না গণেশ?"

বিনীতা সুধীরের পানে চাহিয়া বলিল "এ দেব-সেনাপতি কার্ত্তিক। আমাদের মধ্যে যে সৈন্যগুলো রয়েছে তাদের চালনা করবার জন্যে সেনাপতির দরকার। সুধীর দা, আপনি দাদার ঠাট্টা শুনবেন না। দাদা ভারি বদমায়েস হয়েছে। তাই নিয়েই তো ঝগড়া হচ্ছে আমাদের।"

তাহার সরলতাপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়া সুধীরের মনটাও সঙ্কোচের মাত্রা কাটাইয়া উঠিল। সে একটু হাসিয়া বলিল "সে আমি বেশ জানি। ঠাট্টা না হলে একদণ্ড সরিত থাকতে পারে না। শুধু আপনার কাছে বলে নয়—"

বাধা দিয়া বিনীতা বলিয়া উঠিল "ও কি! আমাকে 'আপনি' বলছেন কেন? আমি আপনার ছোট বোন যে, আমাকে দাদার মত তুই বলে কথা বলবেন। আমি সব চেয়ে ওইরকম সাদাসিদে কথাই ভালবাসি।"

বলিতে বলিতে আবার সে সুধীরের পায়ের ধূলা লইল, এবার সরিতের পায়ের ধূলাও লইল।

সরিত হাসিতে হাসিতে বলিল "আজ তোর মাথাটা দেখছি মাটীতেই লুটোবে। কবার করে প্রণাম করলি বল দেখি? আরও এখনো কত লোককে প্রণাম করতে হবে'খন হয় তো।"

বিনীতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "তাই তো চাই দাদা, আমার মাথা আজ বলে কেন, চিরকালই

মাটীতে লুটান' থাক। উচ্চ নীচ ভেদ না রেখে, জাতি বিচার না করে সকলের পায়ের তলে যেন মাথা পেতে দিতে পারি। আজ আমার হাতেখড়ি হয়ে যাক দাদা, আজ আমার হৃদয়ে মাতৃশক্তির প্রতিষ্ঠা হোক।"

তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, বড় বড় চোখ দুইটী জলে ভরিয়া আসিল। তখনি সেভাব সামলাইয়া অপ্রস্তুত ভাবে হাসিয়া সে বলিল "যাই চা করতে বলিগে।"

তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল। তাহার দুর্ব্বলতা যে আজ এমন করিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িবে তাহা সে জানিত না, সেই জন্য ভারি লজ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সরিত দরজার পানে চাহিয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিল "পাগলী।"

সুধীর বলিল "পাগলী নয় সরিত। যথার্থ হৃদয় যদি কারও থাকে তবে তা আছে বিনীতার।"

সরিত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আমি ওর মধ্যে এমন একটী ভাব দেখতে পাই যা সকল মেয়ের মধ্যে ফুটে না। ভগবান ওকে যে শক্তিটা দিয়ে পাঠিয়েছেন তাতে ওর দ্বারা অনেক কাজ হতে পারবে। আমি এইটুকু ভেবে আনন্দ পাই যে আমি ওরই ভাই। আবার সময় সময় সংসারের দিক হতে যখন ওর দিকে চাই তখন বড় দুঃখ হয়। মনে ভাবি আমিই তো ওর জীবনটা এমন করে ভিন্ন পথে ঘুরিয়ে দিলুম। আমি নিজে যে পথেই যাইনা কেন, ওকেও কেন টেনে নিলুম? ছোটবেলায় যদি ওর মনের মধ্যে আমার ভাবটা না ঢেলে দিতুম, তা হলে আজ বিনীতা এ সময়েই তো ব্রহ্মচারিণী হতে পারত না।"

উত্তেজিত ভাবে সুধীর বলিল "ঠিক ভাইয়ের কাজই করেছ তুমি! বিয়ে দিলে কি হতো জান? এতদিন দুটি তিনটী সন্তানের মা হয়ে বিব্রত হয়ে পড়ত। তাদের দিকে চাইবে, না দেশের দিকে চাইবে? নিজের কথাই তখন মনে থাকত না। তোমার মত যেদিন সকল ভাই হবে সেদিন দেশ যথার্থ উন্নত হয়ে যাবে।"

সরিত একটু উৎসাহিত ভাবে বলিল "ভাইয়ের গুণ বেশী নেই। বোনের গুণ থাকাই হচ্ছে আসল কাজ। উপদেশ আমরা তো সব জায়গায় সকলের কাছেই ছড়াই! হাজার লোকের মধ্যে হয় তো একজন নেয়। মাটী যদি উর্ব্বরা হয় বীজ ছড়ালেই গাছ হবে। বীজও চিরকাল আছে, ছড়াবার লোকও চিরকাল আছে, কথা হচ্ছে সেই মাটীর উর্ব্বরতা আছে কিনা তাই দেখা। উর্ব্বরতা অনুর্ব্বরতা মাটীরই গুণ, আর কিছুর নয়। আজকাল অনেক ভাইই জেগেছে, বোন জাগছে কই? তারা ভাইয়ের কথা কানেই তুলবে না, তা আর অন্য কথা।"

সুধীর বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িয়া বলিল "সে কথা ঠিক।"

সরিত বলিল "আমি ঠাট্টা করে বলেছিলুম বিয়ে করব, এতে রাগ কত। বলে বিয়ে করলে তুমি কোনও কাজ করতে পারবে না।"

ভগিনীর স্বর্গীয় হৃদয়খানার কথা ভাবিয়া সে খানিক গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

ভৃত্য হরিচরণ দুই কাপ চা ও দাসী মানদা দুটী প্লেটে খাবার আনিয়া সম্মুখের টেবিলে রাখিল।

সরিত বলিল "আমি চা খাব না। তুমি সব খানি খেয়ে ফেল সুধীর।"

সুধীর হাত জোড় করিয়া বলিল "মাপ কর, আমরা পাড়াগাঁর ছেলে। দুদিন সহরে এসে বাস করলেও টেষ্টটা সহরবাসীর উপযুক্ত করে গড়তে পারিনি। দেখতেই পাচ্ছ সাদাসিদে বাইরের পোষাকগুলো, মনটাও তেমনি। আমাদের বাড়ীতে চায়ের পাট একেবারেই নেই।"

সরিত হরিচরণের পানে চাহিয়া বলিল "চা নিয়ে যা। গরম দুধ থাকে তো দুই কাপ ভরে নিয়ে আয়।"

সে চলিয়া গেল।

জলখাবার খাইতে খাইতে সুধীর বলিল "আর একটা খাস বিলাতি চলন বলছি, রাগ করো না যেন।"

সরিত হাসিয়া বলিল "বিলক্ষণ, রাগ করব কেন! তুমি যে আমার ভুলগুলো ধরিয়ে দিচ্ছ এতে আমি ভারি কৃতজ্ঞ। দেখ আজ সারাদিন সিগারেট খাইনি আর বিলাতি পোষাকগুলোও ত্যাগ করেছি। আমার ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখ।"

সুধীর বলিল "তা দেখছি। কিন্তু এই যে চেয়ারে বসে টেবিলে খাওয়া এটা কোনও কালে বাঙ্গালীর অভ্যাস নয়। সোজাসুজি মেঝে ঝাঁট দিয়ে আসন পেতে দেবে, বাঙ্গালীর ছেলে পা দুখানা গুটিয়ে বসে দেবতাকে আগে কিছু দিয়ে তারপরে নিজের পেটে দিবে। চেয়ার টেবিলগুলো নেহাৎ খাঁটি বিজাতীয় জিনিস। যদিও সভ্যতা বটে এটা, কিন্তু যদি দেশীয় ভাবটাই জাগিয়ে তুলতে চাই, তবে এটাকেও সঙ্গে সঙ্গে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।"

সরিত বলিল "নিশ্চয়ই। কাল আমি সব-বার করে ফেলব। কিন্তু একটা কথা বলি সুধীর, আমরা যে স্কুলকলেজে পড়ি তার সমস্তটাই তো ইংরাজি, সমস্তটাই তো বিদেশী: আমাদের তা হলে ইংরাজি পড়াটাও খারাপ; সেটা দেশের জিনিস নয়।"

সুধীর মাথা নাড়িয়া বলিল "না তা হতে পারে না। বিদ্যা জাতির হোক বিজাতির হোক সকলের কাছ হতেই জানতে পারা যায়। যখন ভারত শুধু ভারতবাসীরই ছিল, তাঁরাও গ্রীক ল্যাটিন প্রভৃতি পড়েছিলেন। দেশের পক্ষে বিদ্যা শেখার এখন খুবই দরকার, কারণ একে তার দ্বারাই উন্নত করা যাবে; আমরা তা বলে বিলাসিতা গ্রহণ করব কেন? নানা দেশের সঙ্গে সংস্রব রাখব নিজেদের উন্নতির জন্যে। তাদের ভাবটা নেব, কিন্তু বিলাসিতা নেব না। আমরা যে বিলাসিতার জন্যে নই এটা মনে রাখতে হবে। আমরা যে ভিক্ষুক, আমাদের বিলাসিতা সাজবে কেন? অন্য দেশ, মানে ইউরোপ, যার সভ্যতা, যার বিলাসিতা আমাদের অন্ধ করে তুলেছে, সে রাণী যে; তার ছেলেরা নিজেদের ধন, বল, বিদ্যা দিয়ে তাকে জগতের মধ্যে সব চেয়ে উন্নত করেছে। তারা কাজ করে নিয়ে বিলাসিতা করছে। আমরা কি নিয়ে করতে যাব? আমাদের বল নেই, বিদ্যা নেই, ধন নেই। আমাদের মা চিরদিনই এমনি নতমুখে থাকবেন আর আমরা ভিক্ষা করে বিলাসিতা করব?"

খুব উত্তেজিত ভাবেই সে কথাগুলা বলিতেছিল। বিনীতা আসিতে আসিতে তাহার উত্তেজনাপূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া হলে দাঁড়াইয়াছিল। আনন্দে তাহার হৃদয়টা ভরিয়া উঠিতেছিল। হাঁ, এই তো যথার্থ মানুষ। আজ ডি, এল, রায়ের "আবার তোরা মানুষ হ", গানটা তাহার মনে পড়িয়া গেল। কবির গাঁথা সার্থক হইয়াছে, অনেক ছেলে আজ যথার্থ মানুষ বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছে।

সরিত কি বলিতে যাইতেছিল, বিনীতা ঘরে প্রবেশ করিতেই সে থামিয়া গেল। বিনীতা সুধীরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "আপনি ঠিক কথা বলেছেন সুধীর দা। আমাদের মাকে জাগাবার, উন্নত করবার একটী মাত্র জিনিষ আছে, সেটী বিলাসিতা ত্যাগ করা, কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য্যের মধ্য দিয়ে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমাদের সাধনা করতে হবে, দেবতার সহায়তা নিতে হবে। আমাদের উচ্চ, নীচ, জাতি, বিজাতি সব ভুলতে হবে। এই যে আমরা কোটী কোটী সন্তান একই মায়ের বুকে রয়েছি, একই মায়ের দেওয়া অন্ন জল যে আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করছে, তবু পরস্পর থেকে কত দূরে রয়েছি আমরা। অন্য জাতির কথা ছেড়ে দেই, এই হিন্দুর মধ্যেই যে কত এমন জাতি রয়েছে, যাদের স্পর্শ করতে আমরা ঘৃণা বোধ করি। এই অস্পৃশ্য জাতি সকলকে একই কেন্দ্রে এনে ফেলতে হবে। তাদের মধ্যে যে দীনতা জেগে আছে, তা দূর করে দিতে হবে, তাদের জানাতে হবে তারা অস্পৃশ্য নয়, তারাও আমাদের ভাই-বোন। আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে, পিছিয়ে

গেলে চলবে না। হিন্দু মুসলমান কোনও ভেদ আমরা রাখব না। এক ক্ষেত্রে সকলের হাত ধরে দাঁড়াব, একই হৃদয় নিয়ে, একই বাসনা নিয়ে কাজ করতে হবে। চাই কেবল সাধনা, চাই এখন একাগ্রতা, কি বলুন সুধীর দা?"

সুধীর যেন স্বপ্নে দেবীর আদেশ শুনিতেছিল। যে মুহূর্তে সে সুধীরের মত জানিতে চাহিল, উৎসুকনেত্রে তাহার পানে চাহিল, সেই মুহূর্তে সে নিজের জ্ঞান ফিরিয়া পাইল।

তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বিনীতা বলিল "চা খেলে না যে দাদা?"

সরিত একটু থামিয়া বলিল "এত লেক্‌চার শুনলে আর কি চা খেতে ইচ্ছে করে দিদি? এবার তোর দাদা ভারতের খাঁটি ছেলে হবার জন্যে চেষ্টা করবে। তোর মত বোন যার, সে কি কখনও অলস হয়ে থাকতে পারে পাগলী?"

সঙ্কুচিতা হইয়া বিনীতা বলিল "যাও, বোকনা বেশী।"

রক্তাভ অরুণিমা তাহার গণ্ড দুটিতে ফুটিয়া উঠিল। সুধীর বিমুগ্ধনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া ছিল। যাহার হৃদয় এত উন্নত সে আবার এতটা লজ্জাও পাইতে পারে ইহা ভাবিতে তাহার হৃদয় পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বিনীতা চলিয়া যাইতেছিল। দরজা পর্য্যন্ত গিয়া হঠাৎ ফিরিয়া বলিল "গেলে না দাদা অসীমদার বাড়ীতে?"

সরিত আহার শেষে হাত মুখ ধুইয়া তোয়ালেতে হাত মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল "না, আজ আর যাব না।"

বিনীতা দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া বলিল "বিজয়ার প্রণামের বদলে যে খাবারগুলো পেতে, কাল আর তা পাচ্ছনা, এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি।"

বেহারা তখন আলো আনিয়া টেবিলে রাখিয়া গেল। হঠাৎ চোখে আলো লাগায় সরিত হাত দিয়া আলোটাকে আড়াল করিয়া হাসিয়া বলিল "খাবারের জন্যে আমার তো আর সোয়াস্তি হবে না। সারারাত দেখছি ঘুমোতেই পারব না।"

বিনীতা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। তাহার তখন উপাসনার সময় হইয়াছিল, দাঁড়াইয়া কথা কহিবার অবকাশ ছিল না। (ক্রমশঃ)

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কঙ্কণ-ঝঙ্কার শুনি উঠিনু চমকি,
সায়াহ্নের রক্তরেখা ওঠে ঝকমকি
বধূর সীমন্ত-প্রান্তে সিঁদুর ফোঁটায়
পল্লী-পথে ছায়াচ্ছন্ন বিটপি-তলায়।
কক্ষের কলস-বারি করে ছল্ ছল্,
কহে যেন সীমন্তিনী—'চল ঘরে চল,
দিতে হবে প্রদীপ যে তুলসীতলায়,
বাজাতে হইবে শঙ্খ গৃহ-আঙিনায়।'
মেশে নূপুরের সুর জল-কলরবে,
মোহিত হইয়া সন্ধ্যা শুনিছে নীরবে
সে মধুর সুরধারা, ব্যাকুল পবন
মাঝে মাঝে ঘোমটাকে করে উন্মোচন।
পলকের তরে হেরি হিমবিন্দু সম
নোলকশোভিত মুখখানি অনুপম।
নিমিষে লুকায় মুখ ঘোমটা আড়ালে
ঢাকে যেন চন্দ্রমায় ঘন মেঘজালে।
হেরিনু কোমলাঙ্গুলি পুষ্প-কলি সম,
সুনিপুণ গৃহ শিল্পে যাহা নিরুপম;
লক্ষ্মীর আসন রচে কুটীরে কুটীরে,
রাখে বাঁধি গেহতলে নন্দনের শ্রীরে।

স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্যোন্নতির প্রয়োজনীয়তা

ডাঃ সুধাংশুমোহন দেব।

বাঙ্গলার সৌভাগ্যগগন চতুর্দ্দিক দিয়াই কুয়াসাচ্ছন্ন। অলস পরাবলম্বী এ বঙ্গবাসী বিশেষতঃ বাঙ্গালীজাতি, দিন দিনই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে, একবার ফিরিয়াও দেখিতেছে না অধঃপতনের পথে কতদূর অগ্রসর হইল। নব্য-সভ্যতাভিমানী নরনারীগণ আজ যে স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া নিজের অনিষ্ট টানিয়া লইতেছে, সেই পাশ্চাত্য বিলাস-বন্যা, আমাদের অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত জর জর করিয়া তুলিতেছে। স্বাস্থ্য, বল, বীর্য্য, সুখ, সৌভাগ্য, সম্পদ আমাদের সব গেল এই বিলাসস্রোতে ভাসিয়া। যে জাতি একদিন মানুষ বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারিত, তাহারা আজ কু-অনুকরণশীল, কলের পুতুল। সেই জাতিরই সন্তান আজ দুর্ব্বল মস্তিষ্ক, স্নায়বীয় রোগে জীর্ণ শীর্ণ।

আমরা একটু আধটু ছেলের স্বাস্থ্যের দিকে দেখি, কিন্তু মেয়ের স্বাস্থ্যের দিকে ফিরিয়াও তাকাই না। সুস্থকায়, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান ছেলে পাইতে হইলে যে সুস্থকায়, বলিষ্ঠা স্ত্রীজাতির আবশ্যক তাহা আমরা একবার ভাবিয়াও দেখিতেছি না। স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে, নচেৎ সন্তান যে রুগ্ন, দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবী হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পিতার বীজে সন্তানের জন্ম হয় বটে, কিন্তু মাতার শোণিতের সারাংশ দিয়া সেই বীজ পুষ্ট হইয়া থাকে।

আমরা ছেলেমেয়ের বিবাহ দিবার জন্য ব্যগ্র হই, কিন্তু তাহাদের স্বাস্থ্যের দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি করি না। মেয়ে রুগ্না দুর্ব্বল এমন কি স্পর্শ-সংক্রামক সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইলেও তাহাকে, বিবাহ দিতেই হইবে, নচেৎ মহাপাপ! এ কুপ্রথা যেদিন পাপ নামে অভিহিত হইবে, সেই দিন বাঙ্গলার কতকটা শান্তি! অজ্ঞানতায় হিন্দু-সমাজ আজ সকলের নিম্নে—সকলের পিছনে!

আবার যদি সেই সুস্থ সবল বাঙ্গালী দেখিতে চাই, তবে মাতৃজাতি গঠনের দিকে মনোনিবেশ করিতে হইবে, তাহা হইলেই সোণার বাঙ্গলা আবার সুপুত্রের মাতা হইয়া শ্মশান-বাঙ্গলাকে শান্তি-নিকেতন করিয়া তুলিবে। পাশ্চাত্যের অনুকরণে নিজকে কত নীচে টানিয়া আনিয়াছি, তাহা একবার ভাবিলেই বোঝা যায়। কন্যা হইলেই তাহাকে বিলাস বন্যায় ভাসাইয়া দিয়া মোমের পুতুল গড়িয়া তুলি। ছেলেকে বলিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, বিলাস-শূন্য করিয়া গড়িতে চেষ্টা করি কিন্তু মেয়েকে গড়িবার দিকে আদৌ নজর করি না; ফলে দিন দিন বলিষ্ঠা রমণীর অভাব হইতেছে এবং রুগ্ন দুর্ব্বল মানব স্রোতে বাঙ্গলা প্রেতের আবাস ভূমিতে পরিণত হইতেছে। মেয়েদের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার দিকে না চাহিয়া কেবল ছেলেদের গঠনেই সব কিছু করিতে যাইয়া আমরা বড়ই ভুল করিতেছি। যদি ছেলে মেয়ে সমান ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারি তবেই এ দেশের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

একদিন ছিল,—সেদিন গিয়াছে,—যেদিন সুস্থ বলিষ্ঠা হিন্দুরমণীগণ প্রভাতে উঠিয়া নিজ হস্তে আঙ্গিনায় গোবর ছড়া দিতেন, উঠান ঘর ঝাঁট দিতেন; সমস্ত গৃহ কর্ম্ম সারিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া স্বামী পুত্র পরিজনদিগকে খাওয়াইয়া নিজেরা আহার করিতেন। দ্বিপ্রহরে অন্যান্য যাহা সাংসারিক কাজ তাহা সারিয়া সন্ধ্যায় সমস্ত উঠান ঘর পুনরায় ঝাঁট

দিয়া ঘরে ও তুলসীমঞ্চে প্রদীপ ও ধূপধুনা দিতেন; এবং পূর্ব্ববৎ রাত্রিতে স্বামী ও পুত্রকে খাওয়াইয়া নিজেরা আহার করিতেন। গৃহস্থিত পরিজনবর্গের সেবাই ছিল কুললক্ষ্মীদের প্রধান কর্ত্তব্য। তাঁহাদের পরণে একখানি হাতে-কাটা সুতার লালপেড়ে শাড়ী, কপালে একটী বড় সিন্দুরের ফোঁটা ও হাতে সামান্য দুইগাছি শাঁখা থাকিত। এমন সেমিজ, ব্লাউজ, জ্যাকেট্‌, সায়া, এমন সুবাসিত তৈল, এসেন্স, আলতা এবং অন্যান্য বিলাসোপযোগী জিনিষ তাঁহারা সৌন্দর্য্য বাড়াইতে ব্যবহার করিতেন না। কিন্তু তাঁহারা কেমন দেখাইতেন? প্রকৃতির-দেওয়া সৌন্দর্য্যে তাঁহাদিগকে বড়ই সুন্দর দেখাইত। এখানকার মেয়েরা সে সৌন্দর্য্য ঢাকিয়া দিয়া পরী সাজিতে বসিয়া সং সাজিয়াছেন। নিজের দুর্ব্বলতা ঢাকিবার জন্য নাটক নভেল পড়া আর শুইয়া বসিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করাই হইতেছে এখন অধিকাংশ ভদ্র ঘরের রমণীগণের একপ্রকার কর্ত্তব্য। যাঁহারা একদিন কর্ত্তব্য-কর্ম্মে পুরুষ জাতিকে পর্য্যন্ত পরাজিত করিয়াছেন, তাঁহারাই এখন অলসতায় সকলের উচ্চে,—এ কি কম দুর্দ্দশার কথা! মা ছেলেকে স্তন-দুগ্ধ দিতে পর্য্যন্ত অনিচ্ছা করিয়াছেন, ইহাও শুনিয়াছি। হায় রে! বিলাস, তুমি কি জিনিষ! স্বর্গকেও নরক করিয়া তুলিতে পার। রমণীগণ যদি নিজেরা যথাসম্ভব সাংসারিক কার্য্য করেন এবং সংসারের অবস্থা বুঝিয়া চাকরচাকরাণী দ্বারা করাইয়া লন তবে একদিকে যেমন অঙ্গাদি সঞ্চালন দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, তেমনি অন্য দিকে আর্থিকও অনেকটা সুবিধা হয়; একদিকে যেমন পাচকের হাতের অখাদ্য, অর্দ্ধ সিদ্ধ, অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন, ঘর্ম্মাদি মিশ্রিত খাদ্য খাইয়া অজীর্ণে ভুগিতে হয় না, অন্যদিকে তেমনি তাহাদের দূষিত সংক্রামক রোগের বীজও আমাদের দেহে আসিতে পারে না। স্ত্রীজাতির অলসতায় অনেকে এই প্রকার অজীর্ণ ও বহুবিধ রোগে ভুগিতেছেন। যাঁহাদের উপর আমাদের ভালমন্দের এতটা নির্ভর করে তাঁহাদের স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে আমাদের বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নাই। অনেকে ভাবেন স্কুলে পড়াইলে ও গান বাজনা শিখাইলেই কর্ত্তব্য শেষ হইল। কিন্তু হায় আধুনিক স্কুল কলেজ যে বিলাস বিলাসিনী গড়িবার প্রধান কল, তাহা একটিবারও ভাবিয়া দেখেন না।

নিম্নস্তরের দিকে চাহিলে দেখি কুলি মজুরের রমণীগণ কেমন বলিষ্ঠা, দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছে তবুও তাহাদিগের অসুখ বিসুখ নাই, স্ত্রীরোগও নাই বলিলেই চলে। যে দুই একজন ভোগে তাহা কেবল অন্নবস্ত্রাদির অভাবে। দেশের উন্নতি শুধু ছেলেদের দিকে তাকাইলেই হইবে না, মেয়েদের দিকেও সমানভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। আজ জাতি-গঠনের পূর্ব্বে শক্তিময়ী মা গঠনের দিকে দেশের বিশেষভাবে মন দেওয়া উচিত।

রন্ধন-বিদ্যা

"ব্যাংয়ের ছাতার কালিয়া".

শ্রীমতী পুষ্পকুন্তলা রায়।

বক্তব্য :—ব্যাংয়ের ছাতা (হাঁসা ওল*) নানান স্থানে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রকমের জন্মিয়া থাকে। এই ছাতার (ওলের) অনেক রকমের রান্না হইয়া থাকে। বেলা ওল—এই ওল বিকাল হইতে হইতেই ফোটে, ক্ষুদি ওল—এই ওল সাদা ধপধপে ও খুব ছোট হয়, যে জায়গায় ফোটে মনে হয় যেন শেফালী ফুল ফুটিয়াছে। এই সব ছোট জাতির ওলগুলির শুক্তো খুব ভাল হয়। খড়ের গাদায় যে এক রকম ওল জন্মে সে ওল অতি উপাদেয়, সে ওল পাওয়াও যায় খুব কম। আমাদের চট্টগ্রামের মুসলমানেরা ছাতা (ওল) জিনিষটী খায় না। তবে তাহারা যখন এ জিনিষটী পায় তখন নষ্ট হইতে দেয় না, হিন্দুদের ঘরে দিয়া পরমানন্দ অনুভব করে ; হিন্দুরাও তাহাদের ধন্যবাদ দিয়া খাইয়া তৃপ্তি অনুভব করেন। হাঁসা ওলের 'কালিয়া' ভাল হয়, অন্য ওলের তা হয় না।

উপাদান :—ব্যাংয়ের ছাতা (হাঁসা ওল), আলু, ঘি, তৈল, হলুদ, জিরা, মরিচ, ধনে, লঙ্কা, তেজপাতা, লবণ, গরম মসলা।

ব্যাংয়ের ছাতাকে (হাঁসা ওলকে) পছন্দ অনুযায়ী কাটিয়া সিদ্ধ করিতে দিয়া অন্য কাজগুলি করা যাইবে। কারণ এ জিনিষটী সিদ্ধ হইতে অনেক সময় লাগে, সহজে সিদ্ধ হইতে চায় না। সিদ্ধ করিতে দিয়া আলুগুলি ছাড়াইয়া ছাতাগুলি যে অবস্থায় কাটা হইয়াছে তদনুরূপ কাটিয়া লইতে হইবে। হলুদ, জিরা, মরিচ, ধনে, লঙ্কাগুলি পরিমাণ মত বাটিয়া আলাদা আলাদা পাত্রে রাখিতে হইবে। ব্যাংয়ের ছাতা খুব ভালরূপ সিদ্ধ করিয়া যখন দেখিবে খুব নরম হইয়াছে তখন সিদ্ধ জলগুলি নিংড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া আলাদা পাত্রে রাখিতে হইবে।

পাক প্রণালী :- প্রথমতঃ কড়াতে তৈল চাপাইয়া আলুগুলি ভাজিয়া লইতে হইবে। আলুগুলি ভাজা হইয়া গেলে ছাতাগুলিকে ভাজিতে হইবে। ভাজার কাজ হইয়া গেলে আলাদা পাত্রে রাখিতে হইবে। তৎপরে কড়াতে তৈল চাপাইয়া দিয়া, তৈলে কয়েকটী তেজপাতা দিয়া হলুদ, জিরা মরিচ, ধনে, ও লঙ্কা বাটা কালিয়ার অনুপাতে তাহাতে দিয়া সামান্য নাড়িয়া ছাতা ও আলু ভাজাগুলি দিতে হইবে। পরে সামান্য জল ছিটা দিয়া খুন্তির সাহায্যে নাড়িতে হইবে। যখন দেখিবে যে খুব ভালরূপ ভাজা হইয়া উঠিয়াছে তখন পরিমাণ মত জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। এমন ভাবে জল দিতে হইবে যাহাতে সুসিদ্ধ হইয়া গেলেও একটু একটু রসা থাকে। যখন দেখিবে জল ফুটিয়া উঠিয়াছে তখন মাপানুযায়ী লবণ দিবে। নামাইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে গরম মসলাগুলি বাটিয়া ঘিএর সঙ্গে মিশাইয়া কালিয়ার মধ্যে দিয়া নামাইয়া ভালরূপ ঢাকুনার সাহায্যে বন্ধ করিয়া দিলেই **"ব্যাংয়ের ছাতার (হাসা ওলের) কালিয়া"** তৈয়ার হইল।

* চট্টগ্রামের গ্রাম্য ভাষায় এই ব্যাংয়ের ছাতাকে "হাঁসা ওল" বলে।

জয়ী

(কথিকা)

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত ।

পুঞ্জীভূত বেদনাপূর্ণ অলস উদ্দেশ্যবিহীন জীবনখানি লইয়া আমি ত অক্লেশেই দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটাইয়া দিতেছিলাম, তবে ?··· ওগো আমার জীর্ণ সকল অধিকার-হারা হীন জীবনের একমাত্র দেবতা, কোথায় তোমার সেই অভয়বাণী, যাহার মৃদু ঝঙ্কারে একদিন আপনাকে ভুলিয়া, জগত ভুলিয়া, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া তোমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম ? আজ কি নিমিষের ভুলে সে সব ব্যর্থতার কালো অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবে ? ···আঃ, বেশ সুন্দর রাত্রি তো !

—ওই দূর কালো আকাশের বুকে, হাজার হাজার নক্ষত্রবধূর দীপ্তচক্ষু জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ওই তাহাদের সঙ্গ-সুখ-তরে চন্দ্রমার পরিস্ফুট আননখানি আকাশের কোলে ভাসিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এ কি বেদনা, এ কি যন্ত্রণা তুমি আমার অন্তরে জাগাইয়া দিলে প্রভু !······ দেবতা আমার, ফিরে এস, ফিরে এস আজ, অন্তরের সমস্ত তন্ত্রীগুলা আজ তোমায় সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য মোচড় খাইয়া উঠিতেছে ।······

—ভিজে হাওয়ায় থেকে থেকে
কোন্ সাথী মোর যায় যে ডেকে
একলা দিনের বুকের মাঝে
—ব্যথার তুফান তোলে !

এ কি মর্ম্মান্তিক যাতনা গো ! বুকের মাঝে কে আজ অমন নির্ম্মম ভাবে ব্যথার তুফান উঠাইতেছ ! দয়িত আমার, আজ সকল ভুলিয়া আবার ফিরিয়া এস গো ।···

মনে পড়ে দেবতা আমার, সেই বাদল-সিক্ত মৌন নিশিথের কথা ! গোপন চিত্তের বারতা নিয়া আকাশ হইতে ঝর ঝর ধারে কাহার চির-সঞ্চিত অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতেছিল, চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার পাগল হাওয়ার ঘাতপ্রতিঘাতে শিহরিয়া উঠিতেছিল ; সেই দিন—ওগো সেই ক্ষণে আমার এ দুঃখপূর্ণ জীবন-নাটিকার প্রথম অঙ্ক সুরু হইয়াছিল, তাহার পর,—বাঁশী নয় ! কোন্ বিরহী তুমি এই নীরব রাতে আপনার সমস্ত আবেগ বাঁশীর সুরে ঢালিয়া দিতেছ গো ?

যদি মরমে লুকায়ে রবে, হৃদয়ে শুকায়ে যাবে
কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো !
তব চরণ শরণ তরে, এত ব্যাকুলতা ভরে
কেন ধাই—যদি নাহি মিলে গো !

থামাও, থামাও তোমার ও সুর, ওগো মত্ত পথিক ; উহার এক একটী ঝঙ্কার আসিয়া হৃদয়ের সমস্ত তারগুলোকে ছিঁড়িয়া দিতেছে যে গো ! ক্ষান্ত হও ওগো আত্ম-ভোলা বিরহী পথিক !·· আঃ বেশ বাজাইতেছে ত !—

* * *

তবে সকলি কি অর্থহীন,
শূন্যে শূন্যে হবে লীন,
—তবে কেন সে গীত সৃজিলে গো !

জীবন-মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়া এই যে একদিন পল পল ধরিয়া তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া আছি, সে চাওয়া কি ব্যর্থ হইবে, 'ওগো দেবতা আমার ?······

হাঁ, তারপর ! সেই যে ক্ষুদ্র এক নিশীথরাতে সমস্ত ভুলিয়া আপনার ক্ষুদ্র জীবনটী তোমার পায়ে ঢালিয়া দিলাম—কি সে সান্ত্বনাবাণী তোমার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল মনে পড়ে, প্রভু ?······ আঃ, সে স্মৃতি যে এখনও আমার প্রাণে মৃদু স্পন্দন

জাগাইয়া দেয় গো! সে দিনটী কি একবারও ফিরিয়া আসিতে পারে না?......

দারিদ্র্যের নির্ম্মম কশাঘাত, অদৃষ্টের লজ্জিত পরিহাস—হা রে, অভাগী এই বুঝি তোর জীবনের ধ্রুবতারা হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল!......তাই তোমার কাছে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়াছিলাম। আপনার যথাসর্ব্বস্ব তোমার পায়ে লুটাইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু কে জানিত সে দেওয়ার সার্থকতা একদিন ব্যর্থতার কালো আঁধারের বুকে ফুটিয়া উঠিবে, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে একটা আশার বাণী শুনাইয়া আবার তাহা নীরবেই মিলাইয়া যাইবে!

ডাক্তার বলিয়াছে শীঘ্রই আমাকে এই চির পরিচিত ধরণীর মায়া কাটাইয়া কোন্ অজানা অচেনা রাজ্যে আশ্রয় লইতে হইবে। তাই হউক, হে আমার দেবতা তাই-ই হউক! সেই পাওয়াই আমার জীবনের সমস্ত না-পাওয়াকে পূর্ণ করিয়া দিবে!

বিদায়-সঙ্গীতের এ কি বেদনা-ভরা সুর আমার কাণে আসিয়া অন্তরের সমস্ত তন্ত্রীগুলাকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতেছে গো!...

প্রিয়তম, দেবতা আমার! আর কতদিন এইরূপ ক্লান্ত নিরলস নয়নে তোমার পথ-পানে তাকাইয়া থাকিতে হইবে, প্রভু! আর কতদিন, ওগো আর কতদিন! ওই কে অন্তরের সমস্ত উচ্ছ্বাস বাঁশীর সুরে ঢালিয়া দিতেছে, না?

নয়নেরি আশা দেখিতে বাসনা
প্রাণে ব্যথা সখা দিও না, দিও না,
সুধাংশু-বদনে, হের সুধা বিনে,
—চকোর জীবন বাঁচে না, বাঁচে না।

তৃপ্তিবিহীন শুষ্ক জীবনে এ কি বিপদের অশ্রুজল গো! এ কি মর্ম্ম-বিদারক করুণ সঙ্গীত গো! থামাও, থামাও তোমার ও সুর ওগো শান্তি-হারা বিরহী!......ইস্ কে গো?

সেই যে একটি বাদল-সিক্ত রাত্রে তোমার কোমল পরশে আপনা হারাইয়াছিলাম, আজ বুঝি তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিয়াছি—কে জানে!

.. ওই যে আকাশের কোলে ছোট্ট একটী মেঘ ভাসিয়া উঠিয়াছে, ওই যে ধীরে ধীরে তাহা আপনার স্থান বৃদ্ধি করিয়া লইতেছে—কে জানে, উহার শক্তিও হয় ত নিমেষের মধ্যে পৃথিবীর হাসি, কান্না, ভালবাসা, নিষ্ঠুরতা সমস্তের চির-শেষ করিয়া দিতে পারে!......ওই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে কাহার দুইটি চক্ষু জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে, না! কে গো তুমি?......না, না, এসব কি বলিতেছি, কৈ কেহই ত নাই!

দয়িত আমার, আজ হয়ত তোমার অন্তর বাহিয়া কুটীল গর্ব্বের একটা একটানা স্রোত বহিয়া যাইতেছে! হয় ত ভাবিতেছ—বড় নিষ্কৃতিটাই পাইয়াছি, নয়? কিন্তু সে কী সত্য?

এই যে প্রবঞ্চনা, এই যে আত্মত্যাগ—ইহাদের দুইটীর মধ্যে কত তফাৎ ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, হে আমার গৌরবময় দেবতা?...রাত্রি আসিতেছে, গভীরতা আসিবে, তাহার পর এ সুন্দর ধরণীর প্রত্যেক জিনিষটী ছাড়িয়া আমায় চলিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু হাঁ, পলে পলে, যুগ যুগ ধরিয়া তোমার প্রতীক্ষা করিব সেইখানে-যেখানে তোমারও একদিন ডাক আসিবে! সেই দিন, সেই দিন আমি তোমায় আরও কাছে পাইব, ওগো আমার দেবতা! বুকের মাঝে আরও সুন্দর ভাবে তোমাকে পাইব। সেদিন কাহার জয় হইবে, প্রিয়তম? বিজয়ের গৌরবনিশান সেই দিন আমার হাতে!—জয়ী আমি! বিদায়, বিদায় আজ হে আমার হৃদয়-দেবতা! শত শত নতি আজ তোমায় করিতেছি। ওই ওই কে আবার গাহিতেছে—

—ফিরিব নির্ভয় গৌরবে
তোমারি ভৃত্যের সাজে হে—

বিবিধ বার্ত্তা।

মহিলাদের শিল্পশিক্ষা প্রদান—

মাদ্রাজ করপোরেশন মহিলাদের শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দেবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বস্ত্রবয়ন, জামা তৈয়ারী প্রভৃতি মেয়েদের শেখান হইবে। এতদ্ব্যতীত বেত ও কাগজের বাক্স তৈয়ারী এবং অন্যান্য নানাপ্রকার কার্য্যও শিক্ষা দেওয়া হইবে।

মাদ্রাজ করপোরেশনের এই সঙ্কল্প জয়যুক্ত হউক। দেশের বহু নারী কার্য্যাভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া হীনভাবে কালযাপন করিতেছেন, শিল্পশিক্ষার প্রচার হইলে এই সব স্ত্রীলোকেরা কিছু কিছু উপায় করিতে পারেন এবং দেশের হাহাকারও কথঞ্চিৎ দূরীভূত হয়।

ভারতীয় মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়--

ভারতীয় মহিলাদের জন্য পুনায় যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহার ৮ম বার্ষিক কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমে ইহা অতি ক্ষুদ্র ভাবে আরম্ভ হয়, এক্ষণে ইহার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ছয় বৎসরের মধ্যে লক্ষ টাকার উপর দান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং ৯ম বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় নবগৃহে প্রবেশ করিয়াছে। এই নূতন ভবন নির্ম্মাণ করিতে ২৫০,০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে বোম্বাই নগরে একটি নূতন বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। আরও নয়টি বিদ্যালয় ও দুইটি কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আছে।

আমরা এই শুভ প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘজীবন ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

বিধবা-বিবাহ—

গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ শ্রীহট্টের বেজুড়া গ্রাম নিবাসী ৺কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরীর বিধবা কন্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদবালা চৌধুরীর সহিত নোয়াখালীর উকীল শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ বর্দ্ধন মহাশয়ের বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। কুমিল্লার সমাজ-সংস্কারক স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের গৃহে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দু-আচার ও হিন্দু-রীতিনীতি অনুসারেই এই বিবাহ হইয়াছে। বিক্রমপুর, ত্রিপুরা, বরিশাল ও নোয়াখালী সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি বিবাহ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় কলেজের বহু ছাত্রও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

নদীয়া জেলার শিকারপুর-হিন্দু-সংগঠন-সভার চেষ্টায় গত ৬ই অগ্রহায়ণ মুর্শিদাবাদের গৌরীপুর গ্রাম নিবাসী ৺নবীনচন্দ্র মণ্ডলের পুত্র শ্রীমান মহীন্দ্রনাথ মণ্ডলের সহিত ৺হরগোবিন্দ মণ্ডলের অষ্টাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা শ্রীমতী রাজুবালার এবং গত ৭ই অগ্রহায়ণ হরিশঙ্করপুর গ্রাম নিবাসী ৺প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডলের পুত্র শ্রীমান খোকারাম মণ্ডলের সহিত নদীয়া নাসিরের পাড়া নিবাসী ৺অধরচন্দ্র মণ্ডলের ষোড়শবর্ষীয়া বিধবা কন্যা কালিদাসীর শুভ বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উভয় বিবাহ-সভায় স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

লাহোর-বিধবা-বিবাহ-সমিতির উদ্যোগে গত অক্টোবর মাসে মোট ১৭৬টী বিধবা-বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে বঙ্গমহিলা—

লণ্ডন বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে দুইটি বঙ্গমহিলা নূতন ভাবে কৃতীত্ব দেখাইয়াছেন। শ্রীমতী লীলা পাল (শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের কন্যা) বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট বস্ত্রবিভাগের একটি ষ্টলে এবং শ্রীমতী মৃণালিনী ঘোষ কলিকাতার ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কসের ষ্টলে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অতি যোগ্যতার সহিত কার্য্য পরিচালন করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রত্যেককেই আপনাপন ষ্টলে আর আর ইংরাজ-মহিলার সঙ্গে একযোগে কার্য্য করিতে হইয়াছিল; ইংরাজ-মহিলাদের অপেক্ষা ইঁহাদের কর্ম্মকুশলতা কোন অংশেই হীন হয় নাই বরং তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর সুশৃঙ্খলতার সহিতই ইঁহারা কার্য্য করিয়াছেন।

এই বিরাট প্রদর্শনীক্ষেত্রে পুরুষ ব্যতীত ইউরোপ ও আমেরিকার সতের হাজার শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে দুইটি উচ্চবংশীয়া বঙ্গমহিলা স্থান পাওয়ায় বঙ্গমহিলার কার্য্যকুশলতা সভ্যজগতে প্রচারিত হইয়াছে।

সৌদামিনী-বেদ-বিদ্যালয়—

কলিকাতা সারপেণ্টাইন লেনের শ্রীযুক্ত নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার দুই ভ্রাতা তাঁহাদের স্বর্গীয়া জননীর স্মৃতি-রক্ষার্থে এলাহাবাদের ১০৪নং হিউয়েট রোডে একটি বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের নাম হইয়াছে—"সৌদামিনী-বেদ-বিদ্যালয়।"

উপযুক্ত সন্তানগণ স্বর্গগত জননীর স্মৃতি-রক্ষার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থাই করিয়াছেন।

বিদুষী বঙ্গমহিলার পরলোকগমন—

বিখ্যাত পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বিদুষী সহধর্ম্মিণী শান্তিসুধা ঘোষ সম্প্রতি পরলোকে গমন করিয়াছেন। ৺শান্তিসুধার বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। "প্রব"

"উদ্বোধন" প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া বহু শিক্ষাপ্রদ ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। স্বামীর অনুদিত ও সম্পাদিত পুস্তক প্রণয়নে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। এত পাণ্ডিত্য থাকিলেও আত্মপ্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না। মাসিকপত্রাদির প্রবন্ধে তিনি নিজের নাম প্রকাশ করিতেন না। তিনি গীতা পাঠে বিশেষ অনুরাগিনী ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার ভাবী শ্রাদ্ধবাসরে যেন এক সহস্র গীতা বিতরিত হয়।

আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল কামনা করি।

মহিলা ব্যারিষ্টার—

রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ যে, শ্রীমতী মা পুরামাই রোমান এবং ফৌজদারী আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অধ্যয়ন শেষে তিনি ব্রহ্মদেশের প্রথম মহিলা-ব্যারিষ্টার হইবেন। শ্রীমতী পুরামাই রেঙ্গুনের মউ, টুন, বার কন্যা।

মান্দ্রাজ ও কলিকাতার উদ্ধারাশ্রম—

সাত বৎসরের উর্দ্ধবয়স্কা যে সকল বালিকা দুর্নীতির আবেষ্টনে বদ্ধ রহিয়াছে তাহাদিগকে কলুষ-কবল হইতে উদ্ধার করিয়া রক্ষা ও শিক্ষা দেবার জন্য মান্দ্রাজের রমণীগণ বিশেষ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এজন্য ইঁহারা নিজ হইতেই খুব জোরের সহিত আন্দোলন চালাইতেছেন। আমরা ইঁহাদের সাফল্য কামনা করি।

এগার বৎসরের নিম্নে ২০০০ বালিকার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কলিকাতায় একটি আশ্রম স্থাপনার্থ ২৭০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

এ সংবাদে আমরা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীহট্ট-খদ্দর প্রদর্শনীর পারিতোষিক বিতরণ—

শ্রীহট্ট খদ্দর প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ কুমারী হেমাঙ্গিনী সিংহকে বস্ত্রবয়নের জন্য প্রথমশ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছেন। উক্ত প্রদর্শনীতে সূতা কাটার জন্য শ্রীবসন্তকুমারী চৌধুরী, শ্রীহিরণবালা দেবী রৌপ্য-পদক; শ্রীস্বর্ণকুমারী দে ও শ্রীসরযূবালা ৫৲ টাকা করিয়া পুরস্কার; শ্রীসরোজিনী পুরকায়স্থ, শ্রীকামিনীকুসুম চৌধুরী, শ্রীকিরণবালা নাগ, শ্রীপ্রতিমাবালা প্রথমশ্রেণীর সার্টিফিকেট এবং শ্রীকুন্তলপ্রভা চৌধুরী, শ্রীসুলক্ষিণী দত্ত, শ্রীমৃন্ময়ী দেবী দ্বিতীয়শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিদুষীর অকাল মৃত্যু—

সম্প্রতি বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস মহাশয়ের কন্যা সুরুচিবালা দাস বি-এ ২২ বৎসর বয়সে ক্ষয়রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। বোধ হয় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কঠোর পরিশ্রমই এই দুরারোগ্য রোগের উৎপত্তির কারণ। শ্রীমতী সুরুচির অকাল মৃত্যুতে আমরা আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। ঈশ্বর শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গকে শান্তি দান করুন।

নারী-শিক্ষা-সমিতি—

গত ২৪শে নভেম্বর নারী-শিক্ষা-সমিতির ৯ম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমিতির অধীনে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩ হইতে ১৮তে উঠিয়াছে। হিন্দু-বিধবাদের জন্য সম্পূর্ণ হিন্দুমতে, বিদ্যাসাগর-বাণীভবনে ১৬ জন ছাত্রী সাধারণ বিদ্যা এবং বহুবিধ শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। হিন্দু-পরিবারে নাসের খুবই আবশ্যক হয়, এজন্য নাসিংক্লাস খুলিবার বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। মাতৃত্ব ও শিশুমঙ্গল বিষয়ে ছয়টি বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে। চাঁদা, দান, ফিঃ, বিক্রয়লব্ধ-আয়, সুদ এবং গ্রাণ্ট প্রভৃতিতে ২৬৫০০৲ টাকা আয় হইয়াছে, তাহা হইতে মোট ব্যয় হইয়াছে ২০,০০০৲ টাকা; ৬,৫০০৲ টাকা মজুত আছে।

বিগত পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতায় সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত বিষয় তিনটির ব্যবস্থা বিশেষ দরকার—

১। বালিকা-বিদ্যালয়গুলির জন্য বাঙ্গালী-সমাজের উপযোগী পাঠ্যের বিষয় ও তালিকা নির্দ্ধারণ।

২। দেশের দুঃস্থ নারীদিগের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কুটির-শিল্প শিক্ষা প্রদান।

৩। পরিহার্য্য ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে স্বাস্থ্যতত্ত্বের বহুল প্রচলন।

নারী-শিক্ষার বহুল প্রচার না হইলে দেশ গড়িয়া উঠিতে পারে না। আগে চাই উপযুক্ত মা, তবে সেই মায়ের সন্তান হইবে এবং একটা সত্যকারের মানুষ। মাতৃজাতির কল্যাণকামী এই শুভ অনুষ্ঠান সর্ব্ববিষয়ে সাফল্যমণ্ডিত হউক, ইহাই নিবেদন।

সেনেটের মহিলা-সদস্য—

কুমারী সুধাংশুবালা হাজরা বি-এল পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইনিই ভারতের সর্ব্বপ্রথম সেনেটের স্ত্রী-সদস্য।

আলি-জননীর স্বর্গারোহণ—

গত ১৩ই নভেম্বর বেলা ২ঘটিকার সময় মৌলানা শৌকত ও মহম্মদ আলির জননী পূজনীয়া বাই আম্মা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে ভারতের যে ক্ষতি হইল তাহা পূরণ হইবার নহে। দেশজননীর সেবার জন্য শেষ বয়সেও

ইনি যে অদম্য উৎসাহ, অমিত তেজ দেখাইয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অতীব আশ্চর্য্য। এই বীর জননীর সন্তান বলিয়াই আজ আলি-ভ্রাতৃদ্বয় বহুবিধ কষ্ট সহ্য করিয়াও হাস্তমুখে দেশসেবা করিয়া যাইতেছেন। এমন সন্তান এমন মায়েরই সম্ভব। এই মহীয়সী নারীর মহা আদর্শের কণামাত্র যদি এদেশের মা ভগিনীগণ গ্রহণ করিতে পারেন তাহা হইলে দেশ সত্যই ধন্য হইয়া যাইবে।

আফগানিস্থানে স্ত্রীশিক্ষা—

আফগানিস্থানে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ প্রসার লাভ করিতেছে। আমীর-পত্নীর আন্তরিক চেষ্টায় কাবুলের বালিকা-বিদ্যালয়টি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতেছে। সেখানকার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রস্তাব করিয়াছেন—'যে সব বিদ্যালয়ের শিক্ষক পুরুষ, সেখানে ১২ বৎসরের অধিক বয়স্কা মেয়েদের পাঠান হইবে না। বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বয়স ৮০ বৎসরের কম হইবে না।' —যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব, সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলায় নারী-নিগ্রহ—

বাঙ্গলায় নারী-নিগ্রহের স্রোত সমানভাবেই চলিতেছে। সম্প্রতি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতে যে সব পৈশাচিক ঘটনার সংবাদ আসিয়াছে তাহা মনে করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। নির্য্যাতন-কারীদের মধ্যে অধিকাংশই প্রায় গ্রাম্য মুসলমান। হিন্দুমুসলমানের মিলনের দিনে এ সব ব্যাপারকে বিধাতার অভিসম্পাত বলিয়াই মনে হয়। উভয় জাতির এই জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে একের দ্বারা অপরের মা-বোনদের উপর উপর্য্যুপরি এই প্রকার অত্যাচারের কাহিনী শ্রবণ করিলে নিরাশায় প্রাণ ভরিয়া যায়। এ বিষয়ে সরকার বাহাদুর ও উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

রঙ্গপুর ও অন্যান্য কয়েক জায়গায় নারী-রক্ষা-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ এই সব অত্যাচার নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। এজন্য তাঁহারা দেশবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞভাজন।

গান

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

ওমা তোর সোণার ঝাঁপি
খুলেছিস্ পল্লী-বুকে,
এসেছিস্ কল্যাণী আজ
আঙিনায় হাস্তমুখে।
ধানে ভরা হরিৎ ক্ষেতে
আঁচল আজ দিছিস্ পেতে,
ছায়া-ঢাকা কানন বীথি
উথল আজ তোমার রূপে।
হরষ আজ পল্লী জুড়ে
জেগে ওঠে গানের সুরে,
বিষাদ আজ তলিয়ে গেছে;
হাসি আজ সবার মুখে।



২য় বর্ষ | মাঘ—১৩৩১ | ১০ম সংখ্যা

বাণীপূজা

শ্রীমতী অজানিতা দেবী।

এস ত্রিভুবন-বন্দিতা বাণী;
শ্বেত কমল পরে চরণ-সরোজ রাখি
এস সুর-সঙ্গীত-রাণী।
এস জগৎ জাগায়ে মধু গানে,
এস জ্ঞানালোক জ্বালি প্রাণে প্রাণে,
এস নন্দনপুর হ'তে শান্তির ধারা ল'য়ে
শ্বেতবরণী বীণাপাণি।
শুভ বসন্ত-পঞ্চমী-লগনে,
নব উৎসবরাশি ভরা ভবনে
লহ চন্দন-সুরভিত অঞ্জলি-ফুলরাশি
ভকতে আশিস্-ধারা দানি'।
আজি অযুত তনয় তোমা বন্দে
হৃদি- মন্থিত সুরে চারু ছন্দে,
জয় দেবী সরস্বতী কবিকুল-জননী,
প্রণমি' চরণে যুড়ি পাণি।

সুমিত্রার উপদেশ

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

স্ত্রীত্বের পূর্ণ বিকাশ মাতৃস্বরূপে। স্নেহময়ী জননী যখন ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, দেশবাসীর আনন্দ বর্দ্ধন জন্য, জাতিগত সম্মান সংরক্ষণ জন্য, প্রিয়তম পুত্রকে নির্ম্মম হৃদয়ে স্বদেশের কল্যাণ জন্য আহুতি প্রদান করেন, তখন আমরা সেই মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। সেই সীমন্তিনীই পরমা সুন্দরী যিনি বহুসংখ্যক পুত্রের জননী, আর সেই জননীই প্রকৃত জননী, যিনি দেশের কল্যাণকল্পে অকাতরে, অবিকৃত-বদনে পুত্র-শোণিতে মেদিনী সিক্ত করিবার জন্য উপযুক্ত স্থলে তাঁহার অঞ্চলের নিধি, নয়নের নয়ন, প্রাণের প্রাণ পুত্রকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। এই পূর্ণত্ব লক্ষ্য করিয়া এক সময় শাস্ত্রকার মুক্তকণ্ঠে স্ত্রীত্বের প্রশংসা করিতে গিয়া, যেমন ব্রহ্মাণীই জগতের জনয়িত্রী ব্রহ্মা-প্রেতস্বরূপ, সেইরূপ বৈষ্ণবীই জগতের পালয়িত্রী বিষ্ণু-প্রেত-স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

যখন ভারতজননী যুদ্ধস্থল হইতে সমাগত পুত্রের সহযোদ্ধার নিকট হইতে অবগত হইলেন তাঁহার পুত্র সপ্তক বীরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন তিনি অন্য প্রশ্ন না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "গোব্রাহ্মণ রক্ষা করিবার জন্য, ধর্ম্মের মর্য্যাদা সুদৃঢ় রাখিবার জন্য যে যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সে যুদ্ধের পরিণাম কি?"

"আমাদের জয় হইয়াছে!"

"আমাদের জয় হইয়াছে! ধর্ম্ম সংরক্ষিত হইয়াছে—আমার পুত্র সপ্তকের মৃত্যু সার্থক হইয়াছে।" এই কথা কহিয়া দেবী আমার দারুণ শোক সম্বরণ করেন্। এ ত্যাগের কথা স্মরণ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে, আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল হয়। দেশের সম্মান রক্ষার জন্য, দেশের আনন্দ বর্দ্ধন জন্য যথাসর্ব্বস্ব আহুতি প্রদান করিতেও জননীর আমার, দেবীর আমার হৃদয় সঙ্কুচিত হয় না।

বেদচতুষ্টয়ে আমার জননীর দেবীত্ব প্রতিপাদক বহুসংখ্যক শ্রুতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। কোথাও জননী গোধন রক্ষা করিবার জন্য রথারূঢ়া হইয়া, দস্যুকবল হইতে ইহা উদ্ধার করিতে প্রযত্ন করিতেছেন। কোথাও পতির অনুপস্থিতিতে, গৃহের অধিষ্ঠাত্রীরূপে স্বয়ংই দৈনিক কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য অতি সুচারুরূপে যজ্ঞীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। কোথাও বা ব্রহ্মবাদিনী দেবী পুত্রাদির মায়ামমতা বিসর্জ্জন করিয়া অভিষ্ট সাধনে ব্রতী হইতেছেন। কোথাও বা জননী পুত্র যাহাতে অসাধারণ ব্রতের পারগামী হইতে সমর্থ হয় এরূপ ভাবনায় ভাবিত করিয়া তাহাকে স্তন্য প্রদান করিতেছেন। কোথাও বা "মানুষের স্তুতি করিও না" বলিয়া পুত্রকে অপূর্ব্ব শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। এরূপ দৃশ্য প্রাচীন ভারতের প্রতি গৃহে দর্শিত হইত। অতীত যুগের এই সকল কথা, এই সকল প্রাণদ, পুংসবন পবিত্র গাথা অতীত ভারতের গৃহে গৃহে গীত হইত। তাহারই ফলে দেশে দানবীর, যুদ্ধবীর, জ্ঞানবীর প্রভৃতি পুরুষের বহুল পরিমাণে আবির্ভাব হইত।

বৈদেশিক আগমনের সহিত ভারত নানা-প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। নানাপ্রকার ধনরত্নের তিরোভাবে ভারতের এ ক্ষতি হয় নাই। বিদেশীর সংসর্গে, বিদেশীর প্রভাবে, ভারতীয় শিক্ষা দীক্ষা যেরূপ ভাবে মূলোৎপাটিত হইয়াছে, যেরূপ ভাবে পরিক্ষীণ হইয়াছে ইহাতে ভারত, ভারত কেন পৃথিবী যেরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সেরূপ আর অন্য কোনরূপে হয় নাই।

কোহিনুর প্রভৃতি ধনরত্ন বা ভারতের অপূর্ব্ব গ্রন্থরাজি যে বিদেশে নীত হইয়াছে, তাহাতে আমরা কিঞ্চিৎমাত্রও অসূয়াসম্পন্ন নহি। এ সকল মানুষের ভোগ্য, সুতরাং ইহা মানুষেই ভোগ করিবে—আমরা অধিকতর উপযুক্ত হইলেই এই সকল রত্নরাজি আবার আমাদের করতলগত হইবে,—সে আশাও হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকি। আর যদি বা নাই আসে তাহাতেও আমরা কিঞ্চিৎমাত্র দরিদ্র হইব না। কিন্তু আমরা আমাদের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি ও আমাদের জননীরা পুত্রগণকে যে সব অমূল্য উপদেশ ধারা বর্ষণ করিতেন, সে সকল ধারা হইতে বঞ্চিত হইয়া যেরূপ ভাবে হীন পতিত ও দুস্থ হইয়াছি তাহা শত শত কোহিনূরেও পূরণ করিতে সমর্থ নহে।

শ্রীভগবানের কাছে করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, হে ভগবান! তোমার এ লীলাভূমি, তোমার এ প্রিয়ভূমি অধঃপতনের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে। ইহাকে রক্ষা কর, দারুণ দুর্দৈব হইতে ইহাকে ত্রাণ কর; আবার সেই পীযূষধারা প্রবাহিত করিয়া মৃতপ্রায় অবসন্ন জাতিকে সঞ্জীবিত ও শক্তিসম্পন্ন কর। জগতের এ অপূর্ব্ব সভ্যতা বিলুপ্ত হইলে, জড়বিজ্ঞানবাদী তাহা জড়মস্তকে কল্পনা করিতে সমর্থ হইবে না—উদ্ভাবন বা অনুকরণ তো দূরের কথা!

প্রাচীন ভারতের মাতারা কিরূপে সকল-প্রকার পার্থিব-বিভবসম্পন্ন পুত্রকে আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন হইবার জন্য উপদেশ দিতেন—অবসাদ গ্রস্তকে কিরূপভাবে উত্তেজিত করিয়া কর্ত্তব্য পথে আনয়ন করিতেন—মৃতকে কিরূপভাবে সঞ্জীবিত করিতেন, সেই সকল উপাদেয় উপদেশ-ধারা আবার আমাদিগের সমাজমধ্যে প্রবাহিত হউক, আবার মাতারা প্রাচীনকালের মাতাদের ন্যায় দেশের কল্যাণকল্পে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব, তাঁহাদের অঞ্চলের নিধি উৎসর্গ করিতে শিক্ষিতা হউন। সেই আদর্শ এখনকার মায়েদের দেখাইবার জন্য আজ আদর্শ মাতা সুমিত্রার অমূল্য উপদেশ এখানে সঙ্কলিত হইল।

সুমিত্রা লক্ষ্মণের জননী। রামের বন-গমনের কথা শ্রবণ করিয়া অযোধ্যায় যখন অন্তঃপুর-মহিলারা শোকবিহ্বলা হন, সে সময় সুমিত্রাদেবী শোকবেগ সম্বরণ করিয়া কৌশল্যার শান্তি কথঞ্চিৎ পরিমাণে আনয়ন করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। শোকসাগর-নিমগ্না, দৈববিড়ম্বিতা কৌশল্যাদেবী রামচন্দ্রের বনগমনকালে তাঁহার রক্ষা ও যাহাতে তিনি নির্ব্বিঘ্নে বন হইতে প্রত্যাগমন করেন এজন্য দেবতাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুমিত্রাদেবী শোকবিহ্বলা হইলেও অল্প কথার ভিতর বহু অর্থযুক্ত যে উপদেশ লক্ষ্মণকে দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়বত্তা, তেজস্বিতা ও পুত্রের শক্তিবিষয়ক অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। শোকের সময় যিনি নিজের শক্তির বিষয় সন্দিগ্ধচেতা হননা বা উৎসাহের সময় যিনি নিজের কল্পশক্তিকে বহুল পরিমাণে বিবেচনা করেন, তিনি নিজের শক্তি বিষয়ক জ্ঞানে বঞ্চিত হন না, এরূপ নরনারী কার্য্যক্ষেত্রে প্রতারিতও হন না। দেবী সুমিত্রার আত্মজ্ঞানবিষয়ক অভিজ্ঞতা যে প্রচুর পরিমাণে ছিল তাহা তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি বিবর্দ্ধিনী উপদেশে অবগত হওয়া যায়। বর্ত্তমানকালের জননীরা প্রাচীনকালের জননীদের উপদেশ অনুশীলন করিয়া বর্ত্তমানকালের পতিত, দুঃখীত ও উৎসাহহীন পুত্রগণকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করুন।

সুমিত্রাদেবীর উপদেশ—

"সৃষ্টস্ত্বং বনবাসায় স্বনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে।
রামে প্রমাদং মা কার্ষীঃ পুত্র ভ্রাতরি গচ্ছতি॥
ব্যসনী বা সমৃদ্ধো বা গতিরেষ তবানঘ।
এষ লোকে সতাং ধর্ম্মো যজ্জ্যেষ্ঠবশগো ভবেৎ॥
ইদং হি বৃত্তমুচিতং কুলস্যাস্য সনাতনম্।
দানং দীক্ষা চ যজ্ঞেষু তনুত্যাগো মৃধেষু হি॥

রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্।
সুমিত্রা "গচ্ছ গচ্ছেতি" পুনঃ পুনরুবাচ তম্॥

লক্ষ্মণ বনগমনের জন্য জননী সুমিত্রাদেবীর চরণবন্দনা করিলে, পুত্রহিতার্থিনী সুমিত্রাদেবী রোদন করিতে করিতে বন্দনা-তৎপর মহাবাহু লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বলিলেন—

"পুত্র! তুমি রামের অত্যন্ত অনুরক্ত, এজন্য আমি তোমাকে বনবাসের জন্য অনুমতি দিলাম। অনঘ! তুমি বনগামী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের সেবায় অমনোযোগী হইও না, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগামী হওয়াই পরম ধর্ম—একথা সাধুগণ কহিয়াছেন। অতএব উনি বিপন্ন হউন বা সমৃদ্ধিশালী হউন উনিই তোমার গতি। ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের দান, যজ্ঞ, দীক্ষাগ্রহণ ও যুদ্ধে প্রাণত্যাগ বংশপরম্পরাগত অবশ্য-কর্ত্তব্য, চিরন্তন পদ্ধতি, তুমি তাহা পালন করিতে যত্নবান হইবে। পুত্র! তুমি রামকে দশরথ তুল্য, জনকনন্দিনী সীতাকে আমার ন্যায় এবং অরণ্যকে অযোধ্যার ন্যায় জ্ঞান করিয়া সুখে গমন কর।" এই কথা কহিয়া সুমিত্রাদেবী রঘুকুলনন্দন লক্ষ্মণকে বারংবার "যাও, যাও!" কহিতে লাগিলেন।

সুমিত্রাদেবী লক্ষ্মণকে আরও বলিলেন "তুমি অনঘ, আজ আমি তোমার যে নিষ্পাপ মুখখানি দেখিতেছি, বন হইতে প্রত্যাগমন কালেও যেন এই কলঙ্কহীন জ্যোতিঃপূর্ণ মুখখানি দেখিতে পাই। মুখই সুপ্রচ্ছন্ন পুণ্যের ও পাপের পরিচয় জ্ঞাপক। তুমি পাপ-রহিত, দেখ সাবধান, তোমাকে যেন পাপ স্পর্শ করিতে সমর্থ না হয়। জ্যেষ্ঠের অনুগামী হওয়া সাধুসম্মত। তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের দান, যজ্ঞ, সকলপ্রকার শুভ কার্য্যে দীক্ষা আর যুদ্ধে প্রাণত্যাগ পরম্পরাগত চিরন্তন পদ্ধতি; বিপন্নই হও বা সম্পন্নই হও, সাবধান—তোমার এই পরম পবিত্র কুলধর্ম্ম অপ্রমাদি হইয়া পালন করিবে।"

তারপর শোকাকুলা ভগবতী সুমিত্রাদেবী অধিক আর কিছু কহিলেন না। পিতা মাতা আর জন্মভূমির নিকটে থাকিলে কেহ কোনরূপ অভাব দৈন্য বা উদ্বেগ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, তাই স্নেহময়ী পুত্রবৎসলা জননী পুত্রকে কহিলেন—"রামকে দশরথ বিবেচনা করিবে, জানকীকে আমার ন্যায় বিবেচনা করিবে আর অরণ্যকে অযোধ্যা বা অযোধ্যাকে অরণ্য বিবেচনা করিয়া সুখে বিচরণ করিবে। পিতা মাতা আর জন্মভূমিকে রক্ষা করিতে কেহ কখন পশ্চাদ্‌পদ হন না এমন কি শরীর দিয়াও তাহা রক্ষা করিয়া থাকেন। শরীর দেওয়া তোমার কুলধর্ম্ম, দেখ, এরূপ শুভ অবসর উপস্থিত হইলে যেন তোমার মতি বিভ্রম না হয়। কুলধর্ম্ম পরিত্যাগী সকলের কাছে ঘৃণিত হয়। সাবধান, তুমি যেন পবিত্র কুলধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট না হও। আপনাকে যেরূপ অতন্দ্রিত হইয়া তুমি রক্ষা কর, সেইরূপ সীতাকে বিশেষ সাবধানতার সহিত রক্ষা করিবে। বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম বিদ্বানকেও কর্ষণ করিয়া থাকে।"

অপ্রমাদী জিতেন্দ্রীয় লক্ষ্মণ মায়ের আজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়াছিলেন, চতুর্দ্দশ বর্ষের মধ্যে তিনি সীতাদেবীর মুখের দিকে কখন তাকান নাই, তাই তিনি বলিয়াছিলেন "আমি কঙ্কণাদি চিনি না, নিত্য অভিবাদন জন্য কেয়ূর আমি চিনি।" আহা! কি অপূর্ব্ব জিতেন্দ্রিয়তা ও মাতৃআজ্ঞা পালন।

"জীব মাত্রেই সুখাকাঙ্ক্ষী, যদি সুখ চাও তাহা হইলে কর্ত্তব্য পালন করিও। তুমি কর্ত্তব্য পালন করিলে অরণ্যে কান্তারে সর্ব্বত্রই সুখ প্রাপ্ত হইবে।" —এই বলিয়া মাতা অঞ্চলের নিধি পুত্রকে "যাও যাও" বলিয়া বনে গমন করিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

নারী-জাগরণ

শ্রীঅনঙ্গমোহন রায়।

বর্ত্তমান সময়ে নারী-জাগরণ আন্দোলনের একটা প্রবল তরঙ্গ এই দেশের বুকের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে এবং পুরুষকেই তার অগ্রভাগে দেখিতেছি। এ সম্বন্ধে কতজন কত কথাই বলিতেছেন। সেই সমুদয়ের সার সংগ্রহ করিলে মোটামুটি এই পাওয়া যায়—"পুরুষ নারী এক নয়, পুরুষ কর্ত্তা ও নারীর ভাগ্যবিধাতা। তবে নারীকে সঙ্গে না লইয়া পুরুষের যখন চলিবার উপায় নাই, তখন তিনি নিতান্ত অচলা হইলে পদে পদেই বিপত্তি, তাই নারীকে কোন প্রকারে একটু জাগান একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে" ইত্যাদি। যে জন্যই হউক 'নারী জাগরণের' বোধটা যে ক্রমশ পুরুষের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে ইহাও একটা সুলক্ষণ বলিতে হইবে। তবে জিজ্ঞাস্য—এই যে নারী জাগরণের জন্য পুরুষের এত হৈ চৈ, পুরুষ জাগিয়াছেন কি?

স্বামী রামতীর্থের একটি উক্তি পাঠ করিয়াছিলাম যে, কোন ক্ষেত্রে যখন একটী ফুটি ফোটে, মনে করিও না যে, শুধু একটাই ফুটিয়াছে, দেখিতে পাইবে আরো অনেক ফুটিবার মত হইয়াছে। ইহা কেবল উদ্ভিদরাজ্যেই সত্য নয়, আত্মার রাজ্যেও সত্য এবং এই উদ্দেশ্যেই এই কথাটী তিনি বলিয়াছিলেন যে, যখন কোন সদ্ভাব তোমার মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়, ভাবিও না তাহা তোমারই একমাত্র নিজস্ব, অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে আরো অনেক হৃদয়ে তার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে।

পুরুষ জাগিলে নারী না জাগিয়া পারেন না। গার্গী মৈত্রেয়ী হইতে আরম্ভ করিয়া হেরীগণ, মেরীম্যাকডেনিস্ এবং বর্ত্তমান সময়ের তুর্কীনারী ও আমাদের দেশের বাই আম্মা সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি তার বিশিষ্ট সাক্ষী। পুরুষ নারী আলাদাও নয়। দুইয়ে মিলে এক অঙ্কশাস্ত্রের হিসাবে বিপরীত হইলেও দুইত নয়, দুই অর্দ্ধ। দুই অর্দ্ধে এক। একের সঙ্গে অন্য অভিন্নযুক্ত। একই প্রাণ দুইয়ে স্পন্দিত, একই আত্মা উভয়ে ব্যপ্ত। একের শক্তিতে অন্যের শক্তি, একের কল্যাণে অপরের কল্যাণ। এমন জাজ্জ্বল্যমান কথাটা আমরা ভুলিয়া যাই বলিয়াই শুধু "নারী" "নারী" করিয়া অস্থির হই। রূপকথার রাজকন্যা সোনার কাঠি বদল করিলেই জাগিয়া উঠিত। এখানে রাজপুত্রের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই রাজকন্যা জাগ্রত হন, কোন কাঠি বদলের আবশ্যক করে না।

যে দেশের সীতা সর্ব্বাবস্থায় পতির অনুগামিনী, সাবিত্রী বেহুলা পতির মৃতসঞ্জীবনী, জনা মরণ-সমরে পুত্রের মহা উদ্দীপনাদায়িনী এবং সংঘমিত্রা ভ্রাতার হাত ধরিয়া ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিদেশ-প্রবাসিনী, সেই দেশের নারী সম্বন্ধে আমরা ছোট ভাব আমাদের মনে স্থান দেই কেমন করিয়া তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। নারী সম্বন্ধে আমরা ছোট ধারণা পোষণ করি বলিয়াই আমরা ছোট হইয়া আছি এবং তাঁহারাও ছোট হইয়া আছেন।

এক্ষণে মুখে শুধু "জাগ, জাগ" বলিলে নারী জাগিবেন না। পুরুষ, তুমি একবার সত্যি জাগ, তবেই তিনি জাগিবেন। নারীকে তোমার জাগাইতে হইবে না, তুমি জাগিলেই দেখিতে পাইবে তিনিও জাগিয়া আছেন। তোমার কোন শিক্ষাদীক্ষা, নিয়ম নিষেধ, বিধি ব্যবস্থা দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে যাইও না। তাঁহার মধ্যে যে দেবতা আছেন তাঁহাকে প্রকাশিত হইতে দাও, তিনি যে দেবী ইহা স্বীকার কর এবং সেই শ্রদ্ধা তাঁহাকে অর্পণ কর, তাহা হইলেই মহাশক্তি ও কল্যাণরূপিণী নারী জাগ্রত হইবেন। একবার তাঁহার আত্মচৈতন্য জাগ্রত হইলে সেই জাগ্রত চেতনার বলেই তিনি এই বিশ্বে তাঁহার

আপন স্থান অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করিতে পারিবেন, কোন অন্তরায় তাঁহাকে সেই গতিকে আর রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবেনা এবং তাতেই শক্তি ও কল্যাণ স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া গৃহ ও সমাজকে স্বার্থকতা দান করিবে এবং পৃথিবীকে স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত করিবে।

ঝড়ের ডাক্

শ্রীমতী ভক্তিসুধা হার।

ওই শোননা বাবা তুমি
পাগ্‌লা ঝড়ের মাতামাতি,
বল্‌ছে ওরা কপোল চুমি'
"আয়রে ছুটে রাতারাতি।
বদ্ধ ঘরে এক্‌লা ওরে,
মিথ্যে কেন আছিস্ প'ড়ে
আয়না তোরা বাইরে ছুটে'
খেল্‌বি হ'য়ে মোদের সাথী ;
রাত-দুপুরে সবাই জুটে'
কর্‌বি যদি মাতামাতি।"

* * * *

বাইরে থেকে ডাক্‌ছে আমায়
টান্‌ছে যে মোর পরাণ ধ'রে
পড়ায় ফাঁকি দিইনি তোমায়
ওরাই শুধু ভুলায় মোরে!
শুন্‌ছনা ওই শন্‌শনানি
ঝাঁপিয়ে ছুটে দূর বনানী—
জান্‌লা ফাঁকে মার্‌ছে উঁকি
কাঁপিয়ে বাতি মোদের ঘরে ;
ঝটকা এসে বিষম রুখি'
মার্‌ছে ঠেলা দুয়ার ধ'রে।

* * * *

যাচ্ছে নেড়ে কাপড় ধ'রে
পুঁথির পাতা উল্টে দিয়ে
হঠাৎ এসে আদর ক'রে
যায়গো চ'লে হাত বুলিয়ে ;
কেউবা হেসে কাণের কাছে
বল্‌ছে "এস মোদের পাছে
আমরা শুধু ছুটেই চলি
শাসন-বারণ সব এড়িয়ে—
ভীষণ আঁধার দু'পায় দলি'
পাহাড় নদী কাঁপিয়ে দিয়ে।"

* * * *

ঝটকা গাছের ভাঙ্‌ছে শাখা
শক্ত গাছে হেলিয়ে দিয়ে
বল্‌ছে ওরা "যত্নে-রাখা
ফুলগুলি এই যাই মাড়িয়ে ;
লড়্‌বি যদি শক্তি থাকে
আয়না দেখি, রাখ্‌বি কাকে
আমরা যাদের কর্‌ছি নাকাল
রাখ্‌তে পারিস্, আয় বেরিয়ে ;
কারুর মানা শুন্‌বনাকো
যাবই মোরা দাবিয়ে দিয়ে।"

* * * *

দেখ্‌ছ বাবা, একটুখানি
আকাশ-পানে দেখ্‌তে চেয়ে
মেঘের বুকে ঝিলিক্ হেনে
পালিয়ে গেল বিজ্‌লী-মেয়ে!
গুরু গুরু শব্দ ক'রে
দৈত্য যেন ডাক্‌ছে জোরে
দুরু দুরু বুকের তলায়,
—তবু বারেক বাইরে যেয়ে
দুষ্টু দলের দস্যি-পণা
আজ্‌কে আমি দেখ্‌ব চেয়ে।

দুরাশা

(গল্প)

শ্রীমতী কমলা দাস গুপ্তা ।

১

বিজয়াদশমীর শুভ দিনে সবাই নৌকায় উঠেছিল। ফিরে এলোও সবাই,—শুধু অমিয়ার একমাত্র সম্বল মঞ্জুমালা আর ফিরে এলো না। দৈবদুর্ব্বিপাকে কার ক্রোল থেকে সেই দুবছরের শিশু পদ্মার করাল গ্রাসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঠিক কোরে বলা কঠিন। এমনি কোরেই জমিদারি-বাড়ীর আনন্দময়ীর আগমনে সে বৎসর নিরানন্দ শোকের অন্ধকারে মগ্ন হোয়েছিল। অমিয়ার মা সে দুঃসহ শোক সইতে না পেরে দুদিন বাদেই চিরবিদায় নিলেন। জমিদারবাবু শুধু বিধবা শোকাতুরা মেয়েটিকে নিয়ে সেই বিশাল পুরী আগ্‌লে রইলেন।

* * * *

"বাবা, ও কার চিঠি ?"

"অহীন তোকে যেতে লিখেছে।"

"যাব কি বাবা ?"

"না যাওয়াই উচিত। কেননা ডাক্তার তাকে একরকম জবাব দিয়েই পুরী পাঠিয়েছে। তাকে বাঁচাতে হোলে আমার মনে হয় সব গোপন রাখাই ভাল।"

—পিতা অপরাধীর মতই রুদ্ধকণ্ঠে কন্যাকে একথা জানালেন।

২

"মামীমা, মামীমা বৌদি কি এলো ? গাড়ীর শব্দ শুনলুম না ?"

"অহীন, ঘুমওনি বাবা ? ও কি গাড়ীর শব্দ ? —ওযে সমুদ্রের গর্জ্জন। মাথায় হাত বুলিয়ে দেব ? অনেক রাত হোয়েছে যে, এ রাত্রিবেলায় ত কোন ট্রেণ নেই। কাল সকালে তারা নিশ্চয়ই আসবে।"

"তাইত, আমার ভুল হোয়েছে। আসবে, আসবে মামীমা ? বৌদি কি দাদার অপরাধ আমার রুগ্ন মুখ দেখে ভুলতে পারবে ? মঞ্জু এখন হাঁটতে শিখেছে, নয় মামীমা ?"

মামীমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন—হায় সেকি আছে ! আমি মিছে কথায় আশা দিয়ে আশা করছি যদি বংশের শেষ আলোটুকু জেলে রাখতে পারি !

"চুপ করে রইলে কেন মামীমা ? মঞ্জুর নাম নিতেই তুমি অমন হতাশের শ্বাস ফেল কেন ? ভাব বুঝি, তাকে পেয়ে তোমার আদর কিছু কমে যাবে ?"

"না বাবা, আর তুমি কথা ক'য় না। ঘুমোও, কাল সকাল হোলেই তাকে দেখতে পাবে।"

"মামীমা, ঘুম আমার আসেনা কেন ? ভাবি শুধু তার মুখখানি। মামীমা, কি সুন্দর গোলাপী রং মঞ্জুর ! কি রকম লাল ঠোঁট দুটি ! কেমন কালো চঞ্চল চোখ দুটি, সোনালী ঝাঁকড়া চুলগুলি ! কেমন গোল গোল ছোট্ট নরম হাত, কচি কচি চাঁপারকলি আঙুল ! মামীমা, মামীমা ছবি নাম দিলেই বুঝি মঞ্জুর নাম মানাত ভাল।"

"অহীন, রাত শেষ হোল যে। হয়ত জ্বর খুব কাল বেড়ে যাবে এই অনিদ্রার ফলে।"

"যাক্ যাক্, মামীমা ! একবার মঞ্জুকে দেখে আমার মরতেও সুখ।"

"অহীন, কতবার তোকে মানা করেছি একথা মুখে আনতে। সে যে অনেক দিনের কথা, তোর মা কি জানি কি ভেবে সুধীনকে আর তোকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোয়েছিল। যখন সতী সাধ্বী তার সোণার সংসার হোতে বিদায়

নিলে তখন হাত ধরে বলেছিল—'বৌ, তুমি আমার মাতৃহারা শিশুদুটির মায়ের স্থান অধিকার কোরো।' আমিও দুঃখের তুষানল অনেক কষ্টে চাপা দিয়ে তোদের মুখ চেয়েই ছিলুম। সুধীন যে,কি পাথর বুকে চাপিয়েছে তা আর কি বলব! অহীন, তুইও আর আমায় ব্যথা দিস্‌নে বাপ্।"

"মামীমা, গলা তোমার কেঁপে উঠ্‌লো কেন? কাঁদছো নাকি? দাদা বড্ড অভিমানী, তার এ দুর্জ্জয় অভিমানের ফল কি হোল বল না? বাবার সঙ্গে 'তাউইমশাইয়ের' কি হোয়েছিল তার ঠিক নেই, তাইতে সে বৌদিকে সীতার মতই বনবাস দিলে? কোলে তার ছোট্ট মেয়ে মঞ্জু, একবার তার কথা ভাবলে না! তারপর মৃত্যু সে পণ করলে, কেমন? আমার বুদ্ধি যেন তখন বড্ড কম ছিল, কিছুই বুঝতে পারিনি কিন্তু মামীমা, তুমি চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই বৌদিকে ধরে রাখতে পারতে। চেষ্টা করনি, মহাপাপ হোয়েছে তোমার। মামীমা, মামীমা, কি ছবি ভেষে ওঠে সম্মুখে আমার—বিধবা, বিধবা, কি ভীষণ শোকের মূর্ত্তি বৌদির, না, আর নয়! মামীমা, আমার মাথার কাছের জানালাটা খুলে দাওনা, সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাসে আমি ভিজে উঠি। উঃ কি গরম আগুণের মত আমার গা টা!"

৩

"অহীন, আমায় ডেকেছ বাবা? রান্না চড়িয়েছি যে।"

"নবা কোথায়, তাকে বুঝি বাজারে পাঠিয়েছ?"

"না, বৌমাকে চিঠি লিখ্‌লুম, তাই ডাকে ফেলতে গ্যাছে"।

"মামীমা, শেষ রাতটা ঘুমিয়ে পড়ে ভয়ানক একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। যতই ভাবছি ততই আমার বুক যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হোয়ে যাচ্ছে। তুমি সারাদিন কাজে ব্যস্ত, নবা চাকরটা বাজার ছাড়া আর কিছুই ভালবাসেনা, একা কি কোরে থাকি বল ত? মামীমা, শুন্‌বে কি স্বপন দেখেছি?"

"পাগল! স্বপ্নর আবার কি শুনব? আটাশ বছর পেরিয়ে যেতে চল্লি, ছেলেমানুষী কি তোর যাবেনা অহী?"

"মামীমা—ভয়ানক স্বপন, তুমি জাননা তাই হেঁসে উড়িয়ে দিলে। অকুল—অকুল জল—সীমা নেই, তারি মাঝখানে মঞ্জু আমার—না, না, আর মনে কোরবোনা! সত্যি কোরে বলতে পার মামীমা, তারা আস্‌বে কিনা? কেন আজ মনে হোচ্ছে তোমার সব কথা যেন সেই ছেলেভুলান ছড়া! বৌদির চিঠিখানা আমায় দাও না, কি লিখেছে দেখি।"

"হাত আজাড় হোক, তুই খেয়ে দেয়ে সুস্থির হ, তখন দুজনে বসে চিঠি পড়ব। বেলা অনেক হোয়েছে যে, এখন কি চিঠি পড়বার সময়? আয় ঘরে আয়, আজ বড় ঠাণ্ডা হাওয়া, মেঘলা করেছে, এ বাতাস গায়ে লাগান মোটেই ভাল নয়।"

"মামীমা, তোমার মুখ দেখেই আমি সব বুঝতে পেরেছি। মিছে কথা, মিছে কথা! আশা আমার অনন্ত সমুদ্রের মতই সীমাহীন, মামীমা ঐ ঢেউ গুলির মতই আজ আমার বুকে কিসের ঢেউ উঠেছে! আর্ত্তনাদ—শুধু আর্ত্তনাদ! আর এখানে আমার ভাল লাগে না, চল আর কোথাও চলে যাই।"

"সে কি হয়! ডাক্তার বলেছেন আরো কিছুদিন থেকে যেতে। অহীন, লেখাপড়া শিখে তোদের এত মোহ কেন? বৌ যদি নাই-ই আসে কি করবি বল? তার বাপ তাকে পাঠাবেই বা কেন? সে মস্ত বড়লোক, অগাধ বিষয় তার। বৌমা তার একটি মেয়ে। তোদের আছে কি! আহা, সুধীন আমার বিকার-ঘোরে শুধু অমিয়া, অমিয়া ছাড়া কিছুই বলেনি। সেই কথা বার বার 'তার' কোরেও তাকে আনতে পারিনি। আর কি বলব অহী ও সব ভুলে যা, তোরও অজানা কিছুই নেই। নিজে ভাল হোয়ে উঠিস তবেই ত সব, তা নইলে বংশে বাতি দিতেও যে কেউ রইবে না!

"মামীমা, এ গরীবের যা আছে দুনিয়ার হাজার হাজার ধনীরও তা নেই। তুমি ঠিক জেন' মামীমা, মঞ্জুকে না পেলে আর বেশী দিন আমার নয়। এ অন্যায়ের প্রতিকার আমি চাই।"

"অহীন, অহীন আর অত জোরে কথা বোলসনে বাপ্। শরীরে যে রক্তের লেশ নেই, এ উত্তেজনা সইবে কি কোরে বল ?"

"মামীমা, সব সইতে পারি যদি একবার মঞ্জুকে দেখতে পাই। কেড়ে নিয়ে এস, কেড়ে নিয়ে এস মামীমা সেই পিশাচপুরী থেকে ভিখারীর অমূল্য নিধি। বৌদি মা নয়, রাক্ষসী,—রাক্ষসী, -তার মায়ায় পড়ে বুঝি দাদা অমূল্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে !"

"ছি অহীন, চুপ কর, চোখের জল মুছে ফ্যাল। অমন কথা কি বলতে আছে ? বৌমা আমার ঘর আলো করা বৌ। তাকে এনে মনে হয়েছিল কি কোরে সে এ ভাঙ্গা ঘরে শোভা পাবে। সুধীনের সে ছিল নয়নমণি, পলকে যেন হারাত'। একদিন সখ্ কোরেই বৌমা রান্না কোরতে গিয়েছিল, কি লালই হোয়েছিল তার সে রাঙ্গামুখ। ব্যথিত লজ্জিত সুধীন আমার খেতে বসে বল্লে – 'মামীমা, ঠাকুরের মাইনে কতই বা বেশী, তুমি একজনকে রাখনা কেন ?' আমি সব বুঝতে পেরেই তার তাকে কখনও হেঁসেলে যেতে দিইনি। আর কদিনই বা তাদের লীলাখেলা—চার বছর বইত নয়। তাই ভাবি—রূপ যার এমন, অদৃষ্ট-লিখন তার, এত ভীষণ; কে জানে! আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি কি অপমান বেয়াই তোর বাপকে করেছিল। সুধীন আমার জ্ঞানী ছিল, নিজের সুখ সে জলের মত ভাসিয়ে দিল বাপের অপমানে। বৌমা বড়মানুষের মেয়ে কিনা, সংসারের ভাবগতিক কিছুই শেখেনি ; কোন রকম আপত্তি না জানিয়ে বাপের সঙ্গে চলে গ্যাল। আমি অবাক হোয়ে মেয়েটীর মুখের পানে চেয়ে দেখেছিলুম, কোন রকম চিন্তাই তাকে স্পর্শ করেনি মনে হোল। সময় পেলুম কই ? দেখতে না দেখতে সুধীন আর তার বাপ যেন ডাকাডাকি করেই চলে গিয়েছে! তারপর তোকে নিয়ে এই অকূল সমুদ্রে ভাসলুম।"

৪

"কাকে ডাকছো অহীন ? কই কেও ত আসেনি।"

"মামীমা, মামীমা তুমিই আগে কোলে নিলে ? আমায় দাওনা। বৌদি, বৌদি ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, সব অপরাধ আমায় দেখে ভুলে যাও।"

"বাবা অহী, কই কেউ ত আসেনি, তুমি কি বোলছো ? ঘুমোও, অনেক রাত হোয়েছে যে।"

"মামীমা, মামীমা হাতছানি দিয়ে কে আমায় ডেকে নিয়ে যেতে চায়। ছোট্ট মেয়ে! ছোট্ট মেয়ে! ছাখ, ছাখ, সমুদ্রের কালো কালো ঢেউগুলো কেটে সে কেমন কোরে পাড়ি দিয়ে চলেছে! পা দুখানি—নীল জলে যেন কমল ফুটেছে! মামীমা, মামীমা বল বল, আমায় ছেড়ে থাকতে পারবে ? মঞ্জু আমায় ডাক দিয়েছে, আমি যাব, যাব, মঞ্জু—মঞ্জু—"

"অহীন, অহীন অসম্ভব! যেখানেই যাস্ এ হতভাগিনীকে নিয়ে যাস্ বাপ। ও কি, চুপ করে রইলি কেন ? নবা, নবা ছুটে ডাক্তার নিয়ে আয়। চক্ষু স্থির হোল যে, হাত পা গুলো হিম শক্ত! না, না সব শেষ গেল বুঝি! অহীন, অহীন আমায় ফাঁকি দিলি বাপ্ ? ··বেড়িয়ে পড়ি, বেড়িয়ে পড়ি,—উঃ কি আঁধার! জলে গ্যাল, জলে গ্যাল চোখ আমার, সমুদ্রের তীব্র আলো রেখায়! অহীন—অহীন—"

এলিফ্যাণ্টা ভ্রমণ

শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের আমেদাবাদ কংগ্রেসের পর ভ্রমণ মানসে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী আমরা বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইলাম। কি কোলাহলপূর্ণ এই বোম্বাই নগরখানি! কত জাতি, কত ব্যবসায়ী যে এখানে নানা কাজে ব্যস্ত তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রথমে আমরা একজন গুজরাটী বণিকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করি, তাঁহার আতিথেয়তা আমাদিগকে বিশেষ প্রীত করিয়াছিল। তৎপরে কালভাদেবী রোড্ হইতে একজন বাঙ্গালী ব্যবসায়ী আমাদিগকে তাঁহার গৃহে থাকিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আমরা তাঁহার গৃহে থাকিতে বাধ্য হই। ভদ্রলোকের মধুর আদর আপ্যায়ন, ভদ্রলোকের স্ত্রীর সেবা যত্ন আমরা কখন ভুলিতে পারিব না। তাঁহাদের ভবনে আমাদের প্রবাসের দিন কয়টি বড়ই শান্তিতে কাটিয়াছিল। এখানে কিছুদিন থাকার পর আর এক গুজরাটী পরিবার আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহাদের গৃহেও আমরা দিনকয়েক থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাঁহারা একটি বিরাট কাপড়ের কলের মালিক। আমরা একদিন তাঁহাদের কল দেখিতে গিয়াছিলাম। এই কলে তুলা হইতে সুতা ও সুতা হইতে কাপড় তৈয়ারী হয়। কাপড় ধোলাই, গাঁটে লেবেল মারা সবই এই কলে সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয়। এই কলের কাপড় বিলাতি কাপড় অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে।

৩০শে জানুয়ারী সোমবার বেলা ১২টার সময় আমরা এখান হইতে একখানি বোট ভাড়া করিয়া এলিফ্যাণ্টা কেভস্ দর্শনে যাত্রা করিলাম। স্থানীয় কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও আমাদের সহিত গমন করিলেন।

নীলাম্বুরাশির উত্তাল তরঙ্গপুঞ্জ ভেদ করিয়া ছোট্ট বোটখানি আমাদের দুলিতে দুলিতে ভাসিয়া চলিল। আশেপাশে আরও অনেকগুলি বোট পাল তুলিয়া মরালগুলির ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছিল—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! উপরে দিগন্ত বিস্তৃত নীলাকাশ, নিম্নে বীচিমালাপূর্ণ সফেন সমুদ্রবক্ষ, মধ্যে আমরা চলেছি যেন কোন্ এক অসীমের পানে। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই শ্যাম বিটপীরাজিশোভিত দ্বীপটি আমাদের নয়নগোচর হইল। সেটি যেন যুগযুগান্তের আকুল আবেগ বক্ষে ধারণ করিয়া অভিষ্টসিদ্ধির প্রতীক্ষায় মুগ্ধ ভক্তের ন্যায় নীরবে দণ্ডায়মান! উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ দ্বীপটির চতুর্দ্দিকে প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে সোনার লেখায় দৃপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নিম্নে মুক্ত সমুদ্রের উন্মত্ত উর্ম্মিরাজি তাহার পদতল ধৌত করিয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল। বাস্তবিকই সে দৃশ্য বড়ই মনোরম।

সংসারের দারুণ জ্বালাযন্ত্রণায় প্রাণ সর্ব্বদা ব্যথিত কিন্তু এই পর্ব্বতের, এই সিন্ধুর, এই আকাশ বাতাসের চিরনবীন দৃশ্যে ক্ষণকালের জন্য প্রাণ আমার ক্ষুদ্র বালিকার মত পুলকে চঞ্চল হইয়া উঠিল। দ্বীপটির মধ্যস্থল দিয়া কতকগুলি পথ চলিয়া গিয়াছে, সেগুলি যেন ওই ধ্যাননিরত ভক্তের বুকটি চিরিয়া প্রাণের মাঝখানটি স্পর্শ করিয়া বাহির হইয়াছে। এলিফ্যাণ্টার একপাশে একটি কোলাহল পরিপূর্ণ বন্দর দেখিলাম, কিন্তু ওই ধ্যানমগ্ন যোগীর কর্ণপটাহে সে শব্দের কিছুই ঝঙ্কৃত হইতেছে না। দ্বীপের উপরিভাগ অগণিত তরুশ্রেণীতে একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে—যেমন করিয়া সেই আদিযুগের তপস্যাপরায়ণ বাল্মিকীকে বল্মীক-কীটস্তূপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

নৌকায় বাহিরে বসিয়া দূর হইতে এই দ্বীপের

অপূর্ব্ব শোভা ও প্রকৃতির মনোরম সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হৃদয় আমার উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। সংসার-কর্ম্মক্ষেত্রের মাঝে বাস করিয়া আমাদের নিভৃত অন্তরবাসীটিকে তেমন করিয়া অনুভব করিবার সুযোগ ঘটে না। তাই এই মুক্ত সাগর-বক্ষে অন্তরবাসীটি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া বসিল—আর সেই মুহূর্ত্তেই অন্তরের ক্ষুব্ধ দীনতাটুকু মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিল!

দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলাম, দ্বীপটির নিকটে তরী ভিরিল। ক্রমাগত সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। একটা ফাঁকা জায়গা দেখিয়া আমাদের সঙ্গীগণ রন্ধনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আহারান্তে আমরা পর্ব্বত-গহ্বর-খোদিত দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলি দেখিতে চলিলাম। বহু শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও এই সকল মূর্ত্তি, প্রাচীন স্থপতিবিদ্যার উৎকর্ষতা সপ্রমাণ করিতেছে। মূর্ত্তিগুলির কোন কোনটির কোন কোন অংশ ভাঙ্গা দেখিলাম, শুনিলাম পর্ত্তুগীজদের সময় এই সব গুহা তাহাদের হস্তগত হওয়ায় মূর্ত্তিগুলির এই দশা হইয়াছে।

গুহার ভিতরে একস্থানে উৎকৃষ্ট পানীয় জল রহিয়াছে দেখিলাম। উপর হইতে শৈলদ্বীপ নিরীক্ষণ করিলে বোঝা যায় না যে ইহার ভিতর এমন শীতল পানীয় জল থাকিতে পারে। একখানি সোজা দাঁড় করান পাহাড়ের বুকের কাছ বরাবর কর্ত্তন করিলে যেমন গভীর হয় এটিও ঠিক তেমনি। এই জল নষ্ট হয় না, বহুকাল অমলিন রহিয়াছে। জলের স্বাদ অতি মধুর। কি মনোরম দৃশ্য এই পর্ব্বতসুন্দরীর মরমতলটুকুর - যেন কোন উপেক্ষিতা অভাগিনীর স্নেহ-ঢলঢল হৃদয়খানি।

আনমনে বেড়াইতে বেড়াইতে ছোট বনগুলির ধার দিয়া একেবারে সমুদ্রতীরে আসিয়া পড়িলাম। এই দিকটা কিনারা হইতে কিছু দূরে। খান দুই চারি ভাঙ্গা নৌকা এখানে পড়িয়া আছে। এক স্থানে দুইখানি ভগ্ন কুটীর দেখিলাম। পিছনে সমুদ্র বিশাল বক্ষ বিস্তার করিয়া চলিয়াছে, সামনে মুক্ত প্রকৃতির মধুরিমা, নিবিড় বনকান্তারের চির নবীন নগ্ন সৌন্দর্য্যরাশি। সেই সমুদ্রপ্রান্তে উপলখণ্ড-শোভিত বনমাঝে একটা গাছের ডাল ধরিয়া উৎসুক নেত্রে মুগ্ধ চিত্তে প্রকৃতি-সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। ঈশ্বরের সৃষ্টিবৈচিত্রে মন তখন আমার ভরপুর। সেই কুটীরখানির সম্মুখেই একটি নাতিদীর্ঘ জলের কূপ। একজন বৃদ্ধ ও একটি বালিকা সেই কূপ হইতে কলসী ভরিয়া বারি উত্তোলন করিতেছিল, আমি সেই বালিকার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। বালিকাটি সজল চক্ষে হিন্দীতে বলিল "আমরা মাদ্রাজের লোক, জাতিতে পারিয়া। আমাদের জল কেহ স্পর্শ করে না, আমাদের সঙ্গে কেহ কথাও বলে না। আমাদের সুখদুঃখের কেহ সন্ধান নেয় না, এমন কি আমাদের ছায়া পর্য্যন্ত কেহ স্পর্শ করে না। ওই বৃদ্ধ আমার পিতা। উহাকে লইয়া সমুদ্রতীরে কুটীর বাঁধিয়া রহিয়াছি।"

এই অভাগিনী বালিকার কথায় আমার চোখে জল আসিল। বুঝিলাম ইহারাই সেই অন্ত্যজ অস্পৃশ্য পঞ্চমবর্ণ—যাহাদের আমরা ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া, ঘৃণা করিয়া সমাজ হইতে নির্ব্বাসন দিয়াছি; যাহাদের মনুষ্যত্বের দাবী পর্য্যন্ত আমরা কানে তুলি না; যাহাদের দুঃখে দুঃখীত হইয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত ক'রেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে
তবু কোলে দাও নাই স্থান।"

এই সেই অপমানিত, পদদলিত, সমাজ হইতে বিতাড়িত, অভাগা অন্ত্যজ জাতি! হিন্দুসমাজ, সময় থাকিতে ইহাদের তুলিয়া লও—নচেৎ বৃহৎ হিন্দুসমাজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

অনেকক্ষণ ঘুরিয়া আমি অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলাম, কণ্ঠ পিপাসায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। মুখের নিকট দুই হাতের অঞ্জলি বদ্ধ করিলাম এবং কিঞ্চিৎ জল প্রদান করিতে অনুরোধ করিলাম। প্রথমে সে যেন বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিল। তারপর আমাকে বাস্তবিক অতিশয় পিপাসার্ত্ত দেখিয়া কলসী হইতে জল লইয়া ঢালিয়া দিতে লাগিল। সেই নীরব বনমাঝে সাগর-বেলায় দুইটি অপরিচিত মনুষ্যের নিকট দাঁড়াইয়া, এই অস্পৃশ্যের হাতের জল অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়াই পান করিলাম। বোধ হয় এমন তৃপ্তি জীবনে আমি কখনও পাই নাই। জল পান করিয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া, যে গাছের ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম সেখানে পুনরায় ফিরিয়া গেলাম। হৃদয় তখন আমার এক অপূর্ব্ব ভাবে ভরপুর হইয়া গিয়াছিল। পদতল কণ্টকে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহার বেদনার অনুভূতিও কিন্তু জাগিতেছিল না। আমি বিহ্বলার ন্যায় নির্ব্বাক্ হইয়া পাষাণ-পুত্তলীর মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। সারা জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনার তরল ধারা দুই নয়ন বহিয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল বিশ্বপিতার শ্রীচরণ উদ্দেশ্যে।

এই রকম ভাবে কতক্ষণ থাকিতাম জানিনা, স্বামীর ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম, পাহাড়ের উপর হইতে তিনি ডাকিতেছেন।

বৈকাল ৪টার সময় আবার তরণীতে গিয়া উঠিলাম। নৌকা এবার গৃহাভিমুখে ভাসিয়া চলিল। বায়ু তখন অত্যন্ত প্রবলভাবে বহিতেছিল। বোট বারংবার হেলিতে লাগিল। সেই হাওয়ার স্বর কানে আমার বাজিতে লাগিল, শৈলবালার অনুরোধের মত—"আবার এসো এই বিজন বাসে।" মাঝীরা পাল তুলিয়া দিল। নৌকা বায়ুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে চলিতে লাগিল, ক্রুদ্ধ জলকণা নৌকার ওপর সবেগে ছলাৎ ছলাৎ করিয়া আছাড়িয়া পড়িতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল, লহরশিশুগুলি কলগীতি গাহিয়া উঠিল। অস্তগামী সূর্য্যের লালিমাটুকু সমুদ্রবক্ষে ও ধরণীর মুখেচোখে জ্বল জ্বল করিতে লাগিল, বিহগবিহগীরা আপনাপন নীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, নিশীথের ঘন আঁধার সাগরবুক, আকাশ, ধরণী সব ছাইয়া ফেলিল। সারাদিন ভানুর কিরণরশ্মিতে নীল জল জ্যোতির্ম্ময় ছিল, এক্ষণে কাল হইয়া উঠিল। কৃষ্ণ পক্ষ—তাই এই আঁধার দূর হইল না, ক্রমেই নিবিড় হইতে লাগিল। আমাদের নৌকা ক্রমশই কূলের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। ক্রমে কিনারায় অগণিত প্রাসাদশ্রেণীতে বিজলী-আলোক জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোর ছিন্ন রশ্মিগুলি তীরের জলের উপর পড়িয়া ঝলমল করিয়া উঠিল। আমার মন তখন ক্রমে কল্পনার জগৎ হইতে সচেতন হইতেছিল, সে যেন উদাস স্বরে বলিতেছিল—

"দিন শেষ হ'য়ে এল আঁধারিল ধরণী
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
ধনীর প্রাসাদ হ'তে অতি দূর বাতাসে
ভাসিছে পূরবী-গীতি আকাশে,
ধরণী সমুখ পানে, চলে গেছে কোন্ খানে
পরাণ কেন কে জানে উদাসে!
ভাল নাহি লাগে আর, আসা যাওয়া বারবার
বহু দূর দুরাশার প্রবাসে;
পূরবী-রাগিনী বাজে আকাশে।
কাননে প্রাসাদ-চূড়ে নেমে আসে রজনী
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
যদি হেথা খুঁজে পাই মাথা রাখিবার ঠাঁই
বেচা কেনা ফেলে যাই এখনি॥"

তরী ঘাটে লাগিল।

শোকসন্তাপ পরিপূর্ণ সংসারের মধ্যে বাস করিয়া শান্তির মুখ দেখিতে পাই নাই, তাই সংসারের দূরে সাগরবক্ষে পর্ব্বতপ্রদেশের মনোলোভা

দৃষ্টে প্রাণে যে বিমল আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিয়া জানান অসম্ভব। অন্তের পক্ষে এই সমুদ্রযাত্রা একটা তুচ্ছ ব্যাপার হইলেও আমার পক্ষে এ একটা 'তীর্থযাত্রাবিশেষ। সেইজন্য আমার জীবনের জমাখরচের পাতায় এই দিনকয়টির স্মৃতি উজ্জ্বল.রেখায় চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

প্রত্যাবৃত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(১২)

অসীম তখন নিজের ঘরে বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া একখানা নভেল পড়িতে ব্যস্ত ছিল। মনটা বেশ তাহাতে বসিয়া গিয়াছিল।

বাহিরের দৃশ্যটা তখন বড় সুন্দর। সূর্য্য একটা পাতলা মেঘের আড়ালে লুকাইয়াছে। খানিক দূর ছায়া, আবার তাহার উপর ধবধবে সূর্য্যের আলো, যতদূর চোখ যায় এইরূপ খানিক রৌদ্র, খানিক ছায়া।

হঠাৎ সিঁড়িতে মস্ মস্. শব্দ শুনিয়া তাহার মনটা বই হইতে সরিয়া পড়িল। সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল যে জুতার শব্দ তাহারই গৃহের কাছে আসিতেছে। পর মুহূর্ত্তেই দরজাটা ঠেলিয়া সরিত বলিয়া উঠিল "ঘরে আর কেউ আছে নাকি হে?"

অসীমের মুখখানা একবার বিকৃত হইয়া উঠিল, তখনই সে মুখের ভাব বদলাইয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিল "কেউ নেই, এসো।"

সরিত দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিল। একেবারে তাহার বিছানার পাশে বসিয়া তাহার হাতের বই-খানা টানিয়া লইয়া বলিল, "এখান কি বই? এসব পচা নভেল পড় কেন? নভেলেই যদি হাত দিতে হয় তবে চয়েস্ করে নেওয়া কর্ত্তব্য। আমি এই জন্যে—অর্থাৎ কারটা রেখে কার বই চয়েস্ করব ঠিক করতে পারিনে বলেই নভেলে হাত দেই নে।"

মাঝখানে যে রাগারাগির ভাবটা আসিয়াছিল সেইটাই সে দূর করিবার চেষ্টায় ছিল। অসীম একটু হাসিয়া বলিল "বইখানা মন্দ নয়, বেশ লাগ্‌ছে।"

সরিত বইখানা পাশে রাখিয়া বলিল "সে যাই হোক, আমার অত বড় পত্রের উত্তর কি দুটি চারটী লাইনেই শেষ করে দিতে হয়? আমি কত আশা করে থাকি লম্বা চওড়া পত্র পাব, এনভেলাপ খুলে দেখি শুধু সাদা কাগজ!"

অসীম বলিল "সময়ই পেয়ে উঠিনে। কাছারীর কাজ, আবার বাবা জমীদারী কিনেছেন তার সব দেখা শোনা—

অধৈর্য্য হইয়া সরিত বিছানার উপর একটা চড় মারিয়া বলিল "আহা, কথা কাটিয়ে দিয়ো না। ইচ্ছে থাকলে অনায়াসেই লিখতে পারতে। প্রোভার্বই রয়েছে Where there is will there is way যেখানে ইচ্ছা আছে সেইখানেই উপায় হয়। তুমি হাজার কাজের মধ্যেও ছুটি করে নিয়ে একখানা পত্র লিখতে পারতে। তার চেয়ে বল যে ইচ্ছে ছিল না তাই লেখনি। মিথ্যে কথা বলে ঢাকার চেয়ে সোজাসুজি স্পষ্ট কথা বলা আমি পছন্দ করি।"

অসীম একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "না হয় তাই হল। তারপর আস্‌লে কবে?"

সরিত বলিল "কাল এদিকে সুধীরকে পাঠিয়েছিলে ষ্টেশনে অথচ জিজ্ঞাসা করছ আস্‌লে কবে?"

অসীম বলিল "সুধীরের সঙ্গে সেই পরশু পথে দেখা হয়েছিল আর দেখা হয় নি, কাজেই জানতে পারি নি। কাল সকালে এসেছ, আসোনি তো আমাদের বাড়ী?"

সরিত বলিল "দরকার?"

অসীম বিস্ময়ে বলিল "তার মানে?"

সরিত দুঃখের সহিত বলিল "তুমি যদি আগেকার মত থাকতে অসীম, আমি কাল এখানে এসেই ছুটে আসতুম। কিন্তু দেখছি তুমি আমার কাছ হতে ক্রমে এতদূরে সরে গেছ যে এখন তোমার নাগাল পাওয়া আমার পক্ষে দুরূহ হয়েছে। আমি তোমার ভালর জন্যেই বরাবর চেষ্টা করে এসেছি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে তুমি সেটা মন্দ বলেই ধরে নিয়েছ। যাই হোক, আজ আমি সে সব কথা ভুলে আবার ঝগড়া বাধাতে আসি নি। আজ আমি এসেছি বিজয়ার সম্ভাষণ জানাতে, ভাই বলে বুকে টেনে নিতে, মাঝখানে যে চটাচটিটা ঘটেছিল আজকে সেটা আমি দূর ক'রে ফেলতে চাই। মনের দাগ যেন কাহারও না থাকে তাই আমি আজকে প্রার্থনা করছি।"

অসীম গম্ভীর মুখে বলিল "আমিও সত্যি তাই চাই। নীচে সকলের সঙ্গে দেখা করে এসেছো তো?"

সে যে কি ভাবে কথাটা বলিল সরিত তাহা বুঝিতে পারিল না, বলিল "না এখনও কারও সঙ্গে দেখা করিনি। একেবারে বরাবর তোমার কাছেই এসেছি। তোমার সঙ্গে কথার একটা নিষ্পত্তি হয়ে গেলে, মাকে আর বউদিকে প্রণাম করা যাবেখ'ন। তাঁরা তো আর পালাচ্ছেন না তোমার মতন।"

অসীম সে কথা শুনিয়াও শুনিল না, বলিল "আমি এবার একটা কাজ করতে যাচ্ছি জানো সরিত?"

সরিত বলিল "কি কাজ?"

অসীম তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বেশ সহজ ভাবেই বলিল, "আমার আমার বিয়ে যে।"

সরিত সবিস্ময়ে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; একটু পরে বিস্ময়ের ধাক্কাটা খানিক সামলাইয়া লইয়া বলিল "যাও, ও কি কথা?"

অসীম হাসিয়া বলিল, "মাইরি মিছে কথা নয়: বাস্তবিকই অঘ্রাণ মাসের ২রা আমার বিয়ে। সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। না হয় বাবাকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পার।"

সরিত বলিল "পাত্রীটি কে?"

অসীম বলিল "সেই যাকে নদীর ধারে দেখেছিলাম।"

সরিত বলিল "দীপালি?"

অসীম বইখানা তুলিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল "হ্যাঁ সেই বটে।"

সরিত অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। যে লোক একটি রমণীর জীবনের ভার হাতে করিয়া লইয়া, তাহাকে শেষে অকূল সাগরে ভাসাইয়া আর একটা রমণীকে জীবনের সহচারিণী করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে, তাহাকে বন্ধু বলিয়া ভাবা কর্ত্তব্য কিনা সে তাহাই ভাবিতেছিল। এই ভাবিয়া বড় দুঃখীতও হইতেছিল। অসীম শুধু নিজের

দিকটাই দেখিল, পরের দিকে চাহিল না। নিজের যাহাতে সুখ সে তাহাই করিতে উদ্যত হইল, কেহ যে তাহাতে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইল তাহা সে ভাবিয়া দেখিল না। মানুষ কতদূর স্বার্থপর হইতে পারে, কতদূর ভয়ানক হৃদয় তাহার থাকিতে পারে, তাহা সরিত আজ বুঝি এই প্রথম দেখিল; বিস্ময়ে দুঃখে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, সে নির্নিমেষ-নয়নে শুধু অসীমের গম্ভীর মুখখানার পানে তাকাইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আর তোমার সুখের পথে বাধা-স্বরূপ দাঁড়াতে চাইনে আমি। কিন্তু সত্য করে নিজের বুকে হাতখানা রেখে বল দেখি এটা কি উচিত কাজ হচ্ছে? মুখের কথা আমি শুনতে চাইনে, বুকের সত্যটাকে আমি জানতে চাই।"

অসীম বই হইতে মুখ তুলিয়া হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল "কিসে উচিত হচ্ছে না? আমি একে অনুচিত হবার মত কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে।"

সরিত স্বীকার করিয়া লইল তাহা খুব সত্য কথা। সে বলিল "আমি একটা দিক তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি। অনেক দিন আগে এই কথাটা নিয়েই তোমার সঙ্গে আমার মনান্তর হয়েছিল। আজ আবার সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা যে উত্থাপন করতে হচ্ছে, এতে আমি ভারি লজ্জিত ও দুঃখিত হচ্ছি; কিন্তু বাধ্য হয়ে আমায় সে কথা আবার বলতেই হচ্ছে, কারণ উপায় নেই। আমাদের সমাজে পুরুষ বহুবার বিয়ে করতে পারে, মেয়েরা তা পারে না। ধর্ম্ম সাক্ষী করে যার হাতে সে হাত রাখে, তাকেই একমাত্র দেবতা বলে জানে। পুরুষ তাকে দলন করবে, পেষণ করবে, সে নীরবে সব সহ্য করে যাবে, মুখ ফুটে একটা কথা বলবার অধিকার তার নেই। আমি তোমায় সেই প্রথম দিন হতে সাবধান করে আসছি, তোমার মনের মোহভাবটা কাটিয়ে তোমায় আবার ভালপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছি, কেন তা জান? তোমার স্ত্রীর জন্যে। তুমি আবার বিয়ে করতে পার, আবার সুখী হবে, কিন্তু তার কি আছে, সে কি নিয়ে থাকবে? তার কতখানি সে তোমাকে দিয়েছে সেটা তুমি দেখছ না। তার সর্ব্বস্ব নিয়ে, তাকে পথের ভিখারিণীর চেয়েও অধম করে তুমি জগতে একলা তাকে ছেড়ে দিতে চাও? তার ভাষা আছে, কিন্তু তা তোমার মত ফুটে উঠতে পারে না, তাই তুমি তাকে এত পেষণ করতে চাও? না অসীম, ফিরে এসো ভাই। এখনও যথেষ্ট সময় আছে, ফিরতে পাবে। যদি সে মেয়েটীর সঙ্গে তোমার বিয়ের সব ঠিকই হয়ে থাকে, আমার উপর ভার দাও, আমি ভেঙ্গে দিচ্ছি। তার জন্যে অন্য পাত্র ঠিক করে দিচ্ছি। সুধীরকে আমি আজই রাজি করাব। আমার কথা রাখতে সে দীপালিকে গ্রহণ করবেই। না ভাই অসীম, আমি তোমায় আর একজনের দুঃখদাতা, শান্তিহারীরূপে পরিণত হতে দেব না। তুমি যা, আমি তোমায় তাই করতে চাই, তোমায় দেবতা গড়ব, সয়তান হতে দেব না। আমার কথা শোনো ভাই, মিছে খেয়ালের বশে চলো না।"

অসীম তাহার দীর্ঘ লেকচার নীরবে শুনিয়া গেল, বাধা দিল না। যখন সরিত থামিয়া গেল, তখন সে বলিল "তোমার সব কথাই শুনলুম। আমারও ঢের কথা আছে বলবার মত। অনেক দিন হতে চেপে রেখেছি, আজ যখন সব কথা তুলছ, তখন আমায় সব প্রকাশ করতেই হবে। তুমি যে বলছ আমি তাকে দুঃখ দিচ্ছি, কিন্তু কেবল তার দিকই দেখছ তুমি; আমার দিকে কি একবার তাকিয়েছ? আমি যে দিনরাত বুকের মধ্যে কি আগুন জ্বালিয়ে তাতে দগ্ধ হচ্ছি, তা একবার ভেবে দেখছ? আমার শান্তি গেছে, সুখ গেছে, সব সেই আগুনে আমি বিসর্জ্জন দিয়েছি। মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত আমার নেই। আমি কি ছিলুম কি হয়েছি সেইটাই দেখতে পাচ্ছো, কিন্তু কেন যে হয়েছি সেটা ঠিক কি জানতে পেরেছ? কি ভুল!

তুমি ভাবছ দীপালিকে দেখেই আমি এমন হয়েছি? সত্য কথা, তাকে দেখে মন আমার চঞ্চল হয়েছিল, কিন্তু ভগবান জানেন আমি মনকে কতদূর শাস্তি দিচ্ছিলুম তার জন্যে। আমি এখনও আমার কর্তব্য-জ্ঞান, আমার মনুষ্যত্ব হারাইনি। তার পরে,—না, আর বলব না সরিত, আমায় মাপ কর, আমার বুকের আগুন খোঁচা দিয়ে বার করো না, তাতে তুমি শুদ্ধ দগ্ধ হয়ে যাবে।"

সে দুই হাতে মাথাটা টিপিয়া ধরিল। সরিত বলিল "আমি দগ্ধ হব সে ভাবনা তোমায় করতে হবে না। তুমি বল, আমি সব শুনতে চাই।"

তীব্রকণ্ঠে অসীম বলিল "আবার কি বলব? সব জেনে শুনে আবার আমার কাছে শুনতে চাও? সে কি নারী, যে স্বামীর প্রতি বিশ্বাসহন্ত্রী হয়? সে যে দানবী রাক্ষসী, অথবা তাদের মধ্যেও যা আছে তার মধ্যে যে তাও নেই, সে তার চেয়েও ভয়ঙ্করী। তার দুঃখ? কিসের দুঃখ তার? আমার বুকে সে চিতা জ্বালিয়েছে। সে সুখে থাকবে আর আমি আজীবন এই চিতা বুকে নিয়ে চেয়ে থাকব তার পানে? তা হবে না বলেই আমি আবার দীপালিকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। দেখি, সে আমায় শান্তি দিতে পারে কিনা, সে আমায় সুখী করতে পারে কিনা। সকল মেয়েই এক সমান হয় না।"

বিস্মিত হইয়া সরিত বলিল "কি পাগলের মত ব'কছ তুমি অসীম? মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করে—"

কর্কশ কণ্ঠে অসীম বলিল "ঠাণ্ডা? তোমায় যখনই আমার সামনে দেখি সরিত, আমার মাথায় নরকের আগুন জ্বলে ওঠে, আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি মিথ্যাবাদী—কপটাচারী বন্ধু—"

তাহার উত্তেজিত ভাব দেখিয়া সরিত উঠিয়া দাঁড়াইল। অসীম রক্তনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বলিল "তুমি আবার আমাকেই জিজ্ঞাসা করতে এসেছ? বুকে হাত দিয়ে সত্য কথা বল—আমার সকল সুখ, সকল শান্তি, কে নষ্ট করেছে? সে তুমি না?"

আত্মবিস্মৃত সরিত বলিয়া উঠিল "আমি?"

অসীম তেমনই ভাবে বলিল "হ্যাঁ তুমি। বন্ধুর ঘরে এসে বন্ধুর সর্ব্বনাশ করেছ তুমিই। তোমার বুকে কার ছবি আঁকা সরিত? কোন্ কথা ভেবে তুমি আমাদের বাড়ী যাতায়াত কর বল দেখি? খল—সয়তান!"

সরিতের চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীটা তখন ঘুরিতেছিল, পায়ের তলা হইতে মাটী সরিয়া যাইতেছিল। তাহার মুখখানা তখন শবের মতই মলিন।

তখনই নিজেকে সে সামলাইয়া লইল। ম্লান হাসি হাসিয়া হাত দুখানা কপালে স্পর্শ করিয়া সে বলিল "গুরু তুমি তাই প্রণাম করছি। এমন আঘাত জীবনে কখনও অনুভব করিনি। বিজয়ার সম্ভাষণ পেয়েছি, ভাই, এখন যাচ্ছি। প্রার্থনা করি, এই দেখাই আমাদের শেষ দেখা হোক, তোমার সামনে যেন আমাকে আর দাঁড়াতে না হয়।"

টলিতে টলিতে সে বাহির হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া পড়িল। সেবিকা রন্ধনগৃহে কি করিতেছিল। সরিতকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া সে ছুটিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া ডাকিল "ঠাকুর পো।"

"মাপ কর বউদি, বিজয়ার প্রণাম করছি এখান হতেই। এই শেষ দেখা করে যাচ্ছি, যদি কোনও দোষ করে থাকি কখনও, ভাই বলে মাপ কোরো।"

সেখান হইতেই প্রণাম করিয়া সে চলিয়া গেল। সেবিকা ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিল না, আশ্চর্য্য হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

(১৩)

বাড়ীতে পৌঁছাইয়া সরিত একেবারে দ্বিতলে নিজের গৃহে প্রবেশ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। জুতাটাও খুলিবার দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না।

আজ তাহার মনের মধ্যে কে কেবলি আঘাত করিয়া গর্জ্জন করিয়া ডাকিতেছিল—মিথ্যাচারি, ভণ্ড! জগৎ আজ যেন সেই সুরে সুর মিলাইয়া ভৈরবগর্জ্জনে তাহাকে সম্বোধন করিতেছিল— মিথ্যাচারি, ভণ্ড!

দুই কানে আঙুল দিয়া সরিত নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিল।

এতদিন সে বাহিরের দিক হইতে নিজেকে দেখিতেছিল, নিজেকে সংযত করিতেছিল, হৃদয়ের দিক হইতে নিজেকে তো সে দেখে নাই।

বাস্তবিকই তো, সেবিকার দুঃখ অনুভব করিয়া তাহার হৃদয় এত কাঁদিয়াছিল কেন? জগতে আরও লক্ষ লক্ষ নারী রহিয়াছে, তাহাদের কত দুঃখ সে সেদিকে চাহে নাই কেন? সেবিকা অসীমের, অসীম তাহাকে দুঃখ দিবে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে, তাহাতে সরিতের কি? সে কেন সেবিকার মুখ দেখিলে সুখী হয়, তাহার দুঃখ দেখিলে দুঃখী হয়? সেবিকার মুখে হাসি দেখিলে তাহার মুখে হাসি আসে, সেবিকার চোখে জল দেখিলে তাহার চোখে জল আসে কেন? সে যে পরস্ত্রী, সে যে মায়ের সমান। কতদূর দূরতা তাহাদের মধ্যে, তবু সে কেন নৈকট্য অনুভব করে?

কিন্তু সেদিন তো সে পরস্ত্রী ছিল না। সেদিন যে সে একাদশবর্ষীয়া ছোট মেয়েটী ছিল। তাহার উপরে সেদিন প্রকৃতিরই একমাত্র অধিকার ছিল, আর কাহারও ছিল না।

সেই বসন্তের মৃদু বায়ু যেদিন বৈকালে বহিয়াছিল, কুসুমগন্ধ বহিয়া উন্মত্তভাবে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়াছিল, সেই সময়ে ছোট মেয়েটীকে সঙ্গে লইয়া দরিদ্র পিতা সরিতের কাছে আসিয়াছিল তাহারই হাতে সেই ছোট ফুলটীকে সমর্পণ করিবার জন্য। সরিতের বন্ধুরা এই বৃদ্ধের আশা শুনিয়া হাসিল, বিদ্রূপ করিল এবং তাঁহাকে স্পষ্ট জানাইয়া দিল বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার আশা করা তাঁহার পাগলামীরই কাজ হইয়াছে। সরিতও তাহাদের সহিত যোগ দিয়া হাসিয়াছিল, বোধ হয় বিদ্রূপও করিয়াছিল। বৃদ্ধ সজলনয়নে মেয়েটীর হাত ধরিয়া যেমন নিস্তব্ধভাবে আসিয়াছিলেন তেমনি নিস্তব্ধভাবেই চলিয়া গেলেন।

সে তো সরিতেরই হইতে পারিত। সরিতের দুয়ারে সে সাধিয়া আসিয়াছিল তাহাকে বরণ করিতে, সরিত তাহাকে কঠোর উপহাস করিয়া ফিরাইয়া দিল, অসীম সেই প্রত্যাখ্যাত কুসুম তুলিয়া লইল।

সরিত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। আজ সে পরস্ত্রী, আজ তাহার পানে চাওয়া, তাহার কথা মনে করাও পাপ; কিন্তু সে যে তাহারই হইতে পারিত।

সে ভাবনা তখনি ভুলিয়া গেল, মনে হইল অসীমের তীব্র কথাগুলি। অসীম তাহাকে কি ধারণা করিয়াছে?

সরিত ছটফট করিতে লাগিল। কেমন করিয়া সে অসীমকে বুঝাইবে অসীম তাহাকে যাহা ভাবিয়াছে সে তাহা নহে? সে বুঝাইতে পারিত তখনই যখন অসীম তাহার মুখের উপর ভণ্ড কপটাচারি বলিয়াছিল। কিন্তু তখন সে এই অতর্কিত আঘাতে এমন হইয়া গিয়াছিল যে তাহার মুখে একটী কথাও ফুটিতে পারে নাই। তখনই সে সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারিল বাস্তবিকই সে সেবিকার জন্য কতখানি ব্যগ্র। নিজের ছদ্মবেশটা নিজের কাছে প্রকাশ হইয়া যাওয়াতে সে নিজেই স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

ঝোঁকের মাথায় সে যখন চলিয়া আসিতেছিল, সেই সময়েই সম্মুখে পড়িল সেবিকা। সরিতের তখন দাঁড়াইবার অবস্থা নয়, সেবিকার মুখের পানেও সে চাহিতে পারিল না। সে যে বাস্তবিকই অপরাধী! অসীম তাহার ভুল ধরাইয়া দিয়াছে, কিন্তু বড় কঠিন আঘাত দ্বারা। তাহার অপরাধের দণ্ড সেই ভোগ করুক, এ নির্দ্দোষী যুবতী কি জানে? নিজের দোষ নিজের কাছে ব্যক্ত হওয়াতে

সে বড় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। পাছে তাহার পাপ সেবিকাকে স্পর্শ করে, সেই ভয়ে সে দূর হইতে প্রণাম করিয়া ছুটিয়া পলাইল।

অসীম বোধ হয় ইহা অনেকদিন হইতেই জানিতে পারিয়াছে। সরিত যখন তাহাকে নিজের স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিয়াছে, পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত পাপের কাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, তখন ঘৃণায় হয় তো অসীমের মুখখানা কুঞ্চিত হইয়া উঠিত, তাহার ওষ্ঠে বোধ হয় ঘৃণার হাসিই ফুটিয়া উঠিত। সেই কথা ভাবিতে সরিতের কান পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। সে দুই হাতে বালিশটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ডাকিতে লাগিল—ভগবান, এমন কোনও স্থান দাও আমায় যেখানে আমি চিরকাল আমার এ মুখখানা লুকিয়ে রাখতে পারি।

সেবিকার কথা মনে পড়িল। সে তো জানে না যে সরিতের জন্যই তাহার এত লাঞ্ছনা, সরিতের জন্যই স্বামী তাহাকে দূর করিয়া আবার বিবাহ করিতেছেন। সে যখন শুনিবে সরিতের মনে তাহারই মূর্ত্তি আঁকা, তাহারই কথা ভাবিয়া সে এ বাড়ীতে যাওয়া আসা করে, তখন সরিতকে কি স্নেহের চোখে দেখিবে? তাহার দুঃখের হেতু সরিতকে কি সে অভিশাপ দিবে না? কেন সে সরিতের সহিত অসঙ্কোচে কথা কহিত ভাবিয়া কি অনুতপ্ত হইয়া উঠিবে না?

"দাদা ঘরে আছ নাকি? বাঃ, দরজা বন্ধ করে—" বলিয়া জোর করিয়া দরজা ঠেলিয়া বিনীতা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। সরিতকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্ময়ে চক্ষু দুইটী কপালে তুলিয়া সে বলিল "শুয়ে রয়েছ যে? অসুখ করেছে নাকি?"

তাহাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সরিত ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। চোখমুখের পূর্ব্ব-ভাবটা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল "তোর যেমন মন কিনা, একটু শুয়ে থাকতে দেখলেই বলবি অসুখ করেছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখ বরং অসুখ করেছে কিনা।"

বিনীতা তাহার ললাটে হাত দিয়া বিজ্ঞভাবে বলিল "না, অসুখ তো করে নি। তোমার মুখখানা কিন্তু বড় খারাপ দেখাচ্ছে। তোমার টেম্পারেচার নিতে হবে, রও।"

হাসিয়া সরিত বলিল "পাগল হয়েছিস্ নাকি? মাথাটা ধরেছে বড়, তাতে আর এমন কিছু হবে না।"

ব্যস্তভাবে বিনীতা বলিল না "কিছু আর হবে কেন? সেবারেও অমনি করেছিলে না? প্রথম বেলায় রোগ চেপে রেখে, শেষে ধাক্কা সামলানো দায় হয়ে ওঠে। তুমি কেবল এমনি করে—"

তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল, কণ্ঠস্বরও বন্ধ হইয়া গেল। তাহার এই পাগলামী দেখিয়া সরিত হাসিল—তাহার চোখেও তখন জল টলটল করিতেছে। বিনীতার হাতখানা ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল "আমি তোর নিজের ভাই, তাই এত ভাবছিস বিনীতা, আর এই যে হাজার লোক মরছে যখন একবিন্দু জল পাচ্ছে না, সেটা ভাবছিস? আমার সামান্য মাথাধরা বই তো নয়, এখনি সেরে যাবে। যাদের দেখতে কেউ নেই, তাদের কথাটা—"

বিনীতা বলিল "তাদের সেবা করার মত উপযুক্ত করে নিজেকে তো গড়ে তুলছি দাদা। তোমার আগে ভাল থাকা চাই, নইলে তোমার দিকে যদি মন থাকে, কাজ করব কি করে?"

একটু নীরব থাকিয়া সে পুনরায় বলিল "তোমার কাছে আমি একটা ভিক্ষা চাচ্ছি দাদা, দেবে?"

সরিত তাহার ভাব দেখিয়া আগেই শঙ্কিত হইয়া উঠিল, বলিল "কি ভিক্ষা চাস্ আবার তুই?"

বিনীতা বলিল "তোমাকে যার আক্রমণ হ'তে আমিই অনেক করে বাঁচিয়ে এনেছি, আজ সেই আক্রমণটাই আমি প্রার্থনা করছি। আমি তোমার বিয়ে দেবার প্রার্থনা করছি দাদা। তোমার পায়ে পড়ি বিয়ে কর।"

সরিত একটু হাসিয়া বলিল "কেন বিয়ে করব, বিনীতা?"

বিনীতা একটু জেদের সহিত বলিল "তোমার জন্যে তোমায় বিয়ে করতে বলছিনে দাদা, আমার দিকে তাকিয়ে আমি বলছি। আমি কাজে নেমে যেতে চাই কিন্তু তোমায় একলা ফেলে যেতে পারছি নে। কে তোমায় দেখবে এই আমার ভাবনা হচ্ছে। আমি বউয়ের হাতে তোমায় দিয়ে চলে যেতে চাই।"

সরিত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "ঠিক কথা বলেছিস বটে বিনীতা। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে গুরুর চেয়ে শিষ্য বড়, সেটা ঠিক দেখালি তুই। আমিই তোকে দীক্ষিত করলুম মাতৃমন্ত্রে, আমার সহায়তা তুই করবি, তাই। দেখ, আমি কত পিছিয়ে পড়ে আছি, আর তুই কতটা এগিয়ে চলে গেছিস। তোর বাসনা মুক্ত উদার, আমার বাসনা এখনও সীমাবদ্ধ। কিন্তু আর না বোন, জড়তা আমি ত্যাগ করেছি, আমি আমার জীবন পণ করেছি। আমি আর কোনও দিকে চাইব না, কেবল এগিয়ে যাব। আমার ভার তোকেও নিতে হবে না, আমার ভার আমি নিজেই নেব। তুই যদি মুক্তির জন্যে এতটা ব্যগ্র হয়ে থাকিস, যা তবে, আমি তোকে সকল বন্ধন হতে মুক্ত করে দিচ্ছি।"

বিনীতা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল "আমি সে মুক্তি চাইনে। যদি তুমি সংসারেই না বদ্ধ হতে চাও, চল তবে এগিয়ে। এস, আটকে পড়ে আছ কেন? কোনও বন্ধনই যখন তোমার নেই—"

সরিত বলিল "ছিল বোন, বাঁধন ছিল বই কি, নচেৎ খানিক দূর এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলুম কেন? ভগবান সে বাঁধন এখনই ছিঁড়ে দেছেন। আগে আমিও সে বাঁধন বুঝতে পারিনি, যখন ছিঁড়ল তখন বুঝলুম। বুঝলুম এরই টানে আমি এগিয়ে গিয়েও ফিরেছি অথচ বুঝতে পারিনি কেন ফিরলুম। যখন বাঁধন ছিঁড়ল, তখন বুকটা যেমন হাহাকার করে কেঁদে উঠল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেল। আমি আজ যথার্থ মুক্ত বিনীতা। আমায় ফেলে তবে যাস্‌নে বোন, তোর দাদাকে তোর কাছে ডেকে নে।"

সে দুই হাত ভগিনীর দিকে বাড়াইয়া দিল। বিনীতা সেই দুইখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া দিল। (ক্রমশঃ)

রাত্রি ও তারা

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ।

শশী-হীন নভতল হ'তে কয় তারকা,—
বিষাদিনী বসুন্ধরে তব নব অলকা,
মাণিক্যের দ্যুতি দিয়া রচেছি কি আ-মরি
কলঙ্কী শশাঙ্কে যাবে পুলকেতে পাশরি!
যেদিকে ফিরাবে আঁখি মোরা আছি ঘিরিয়া
জ্বল্‌ জ্বল্‌ সুবিমল-জ্যোতিজাল মেলিয়া।
ধরা কয়—হায় মূঢ়, একি তোর দুরাশা,
নয়নেতে জাগে যার দরশের পিপাসা,—
তারি জ্যোতি-ভাতি হেরি ক্ষুদ্র ও বয়ানে,
জাগি তাই চেয়ে থাকি অনিমিখ নয়ানে।

নারীরক্ষায় ইংরেজ সরকার

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

আমাদের বাঙ্গালীজাতির কথার সহিত কার্য্যের, শাস্ত্রের সহিত শাস্ত্রীয় আচারের যে কোন সামঞ্জস্য নাই, তাহা হিন্দুনারীর দুর্দ্দশার দিকে দৃক্‌পাত করিলেই বেশ উপলব্ধি হয়। মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"

অর্থাৎ নারীগণ যেখানে সম্মান পান, সেখানে দেবতাগণ প্রসন্ন, যেখানে ইঁহাদের আদর নাই, সেখানে সমুদয় ক্রিয়া বিফল।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কার্য্যক্ষেত্রে মনুর এ বচন কতটা রক্ষিত হইয়াছে ও হইতেছে? বার বছরের কচি মেয়ে হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া বৈধব্য-বেশ ধারণ করিলে তাহার চৈত্রমাসের কাটফাটা গ্রীষ্মের মধ্যেও একবিন্দু জল খাইবার অধিকার নাই। এই সেদিন ময়মনসিংহে একটি জ্বরবিকারগ্রস্তা হিন্দু-বিধবাকে একাদশীর দিন সম্পূর্ণ বিনা-ঔষধে রাখা হইয়াছিল, তাহার ফলে বিধবা সকল জ্বালা যন্ত্রনার হাত হইতে অচিরাৎ অব্যাহতি পান। জিজ্ঞাসা করি ইহাই কি ধর্ম্ম? এক্ষেত্রে সেই রমণীকে একবিন্দু ঔষধ পান করিতে দিলে এমন কি অধর্ম্ম করা হইত?

সতীদাহ-প্রথার নিষ্ঠুরতা কে না জানেন? এই প্রথায় ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক বিধবাকে হাত পা বাঁধিয়া জলন্ত চিতায় ছুঁড়িয়া ফেলা হইত। একবার একটি হিন্দু-বিধবাকে জোর করিয়া তাঁহার সম্পত্তির লোভে গ্রামবাসীরা চিতায় তুলিয়া দিয়াছিল, বিধবা আগুনের তাতে ছটফট্ করিতে করিতে দৌড়াইয়া গিয়া কলিকাতা নগরের প্রতিষ্ঠাতা জবচার্ণকের শরণ লয়। জবচার্ণক সেই হিন্দু-বিধবাকে আশ্রয় দিয়া শেষে তাহাকে বিবাহ করেন। প্রাচীনকালে প্রথা ছিল, কোন রাজার মৃত্যু হইলে সেই সঙ্গে তাঁহার দুই চারিটী রাণী ও দাসীকে দগ্ধ করা হইত। মহারাজ রণজিৎসিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার সহিত চারি পাঁচ জন স্ত্রীলোককে দগ্ধ করা হয়। তাঁহার স্তূপের পার্শ্বে রাণীদের স্তূপ আজিও রহিয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় ইংরেজ সরকার এই নিষ্ঠুর বর্ব্বর প্রথার মূলোচ্ছেদ করেন।

বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথায় নারী-জাতির দুঃখ দুর্দ্দশাকে নিতান্ত কম বাড়ায় নাই। সেকালে এক একটি পুরুষের সহিত ৪০।৫০টি স্ত্রীলোকের বিবাহ দেওয়া হইত। অনেক ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর নাম পর্য্যন্ত বলিতে পারিতেন না। অনেক কুলীন স্বামী বৎসরান্তে এক একবার গুরুদেবের ন্যায় শ্বশুরবাড়ী যাইয়া "বার্ষিক" আদায় করিয়া আনিতেন। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় আইনের দ্বারা এই বহু-বিবাহ লোপ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দেশের "বুদ্ধিমান্" ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রতিবাদে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। সুখের বিষয় কালচক্রের আবর্ত্তনে এই বহুবিবাহ-প্রথা আপনা হইতেই সমাজ হইতে তিরোহিত হইয়াছে এবং কুলীনদের কৌলীন্য-স্পর্দ্ধারও হ্রাস হইতেছে। এখন আর মূর্খ, অর্ব্বাচীন, নিরক্ষর, অক্ষম কুলীন দেখিয়া লোকে ভুলে না—কেহ আর মেয়ে জলে ফেলিয়া দিতে চাহে না।

রাজপুতনা, পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে শিশু-বালিকা হত্যার প্রথা ছিল, ইংরেজ সরকার এই বর্ব্বর প্রথা আইনের দ্বারা তুলিয়া দিয়াছেন। পঞ্জাবে সূতিকাঘরেই শিশু-বালিকাগণকে হত্যা করা হইত।

এই ত গেল হিন্দুদের ঘরের কথা। এইবার মুসলমানদের অন্তঃপুরের সন্ধান লওয়া যাউক।

আগ্রা নগরে মুসলমান সম্রাট্‌দিগের নির্ম্মিত একটা দুর্গ আছে, সেই দুর্গের নীচের তলার কোণে একটি অন্ধকার ঘর আছে, তাহার ছাদের নীচে একটি কড়িকাঠ ও তাহাতে একটি লোহার আংটা আছে এবং তন্নিম্নেই একটি নর্দ্দমা আছে। সেই ঘরটি বেগমদের ফাঁসীর ঘর ছিল। মধ্যে মধ্যে সম্রাট্‌ অতি সামান্য কারণে বেগমদের উপর চটিয়া তাহাদিগকে ফাঁসি দিতেন। লক্ষ্ণৌএর নবাবের বাটীতে ৩৬৫টি বেগম-আবাস ছিল, প্রতিদিন যেমন নূতন একটি করিয়া বেগম আনা হইত, অমনি একটিকে ফাঁসীতে লটকান হইত!

মহারাজ রণজিৎসিংহের কোন সেনাপতি কোনও যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আসিবামাত্র তিনি একটি "রাণী" সেই সেনাপতিকে উপহার দিতেন।

সিন্ধুদেশে পত্নীহত্যার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ছিল। এত বাড়াবাড়ি যে ইংরেজ সরকারকে তথায় আইন প্রচলন করিয়া পত্নীহত্যা নিবারণ করিতে হইয়াছিল। ১৮৪০—১৮৪২ সালের মধ্যে ইংরেজেরা সিন্ধুপ্রদেশ জয় করিয়াই দেখিতে পান যে সেখানে অবাধে নারীহত্যা চলিতেছে। তদ্দর্শনে ১৮৪৭ সালে সিন্ধুদেশের গবর্ণর Sir Charles Napier যে ঘোষণাবাণী প্রচার করেন তাহার সংক্ষিপ্ত সার এই—People of Sind! The Government has forbidden you to murder your wives—a crime commonly committed when the British conquered the countary. ...This the Government will not permit.... Do you imagine that Government believe that these women committed suicide? Do you believe Government can be deceived by such villainy?... You are therefore thus solemnly warned, that in whatever village a woman is found murdered heavy, fine shall be imposed on all and rigidly levied. ...If a woman is said to have committed suicide in your district, for it shall be an evil day for all in that place. অর্থাৎ হে সিন্ধুবাসিগণ! গবর্ণমেণ্ট তোমাদিগকে পত্নীহত্যা করিতে নিষেধ করিতেছেন। যদি কোথাও পত্নী-হত্যা হয় তবে অতি গুরুতর আর্থিকদণ্ড হইবে, এমন কি কোথাও কোন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে শুনা গেলে সেখানে একেবারে ধ্বস্তবিধ্বস্ত করা হইবে।

বলা বাহুল্য এই ঘোষণাবাণীর পর হইতে সিন্ধুদেশে পত্নীহত্যা নিবারিত ও একেবারে লোপ হয়।

বিহার উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় থাকিতে "দাদন" দিয়া কন্যার বিবাহ স্থির করা হয়। গর্ভবতী যদি কন্যা প্রসব করেন, তবে দাদনের টাকা আর ফেরত দেওয়া হয় না, আর পুত্রসন্তান প্রসব করিলে দাদনের টাকা ফেরত দেওয়া হয়। ২।৩ বৎসর বয়স্কা কন্যাকে সেখানে বিবাহ দেওয়া হয়। এই বিবাহের ফলে সেই মেয়েটির অকালে গর্ভসঞ্চার হয় এবং তাহার গর্ভজাত সন্তান অল্পায়ুঃ, রুগ্নাঙ্গ, অপূর্ণাবয়ব অথবা বিকলাঙ্গ হইয়া ভারতের পুরুষত্ব-বর্জ্জিত লোক-সংখ্যাকে আরও বর্দ্ধিত করিয়াই তুলে। এ প্রথা বাঙ্গালাদেশেরও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আছে। ভারতের সমাজ বহুকাল যাবৎ সুপ্ত, সমাজের প্রাণ নাই, আত্মা নাই, চেতনা নাই, জড়পিণ্ডবৎ কিম্ভূৎ-কিমাকার একটা "অচলায়তন" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজ সরকার কি এই সব ভ্রূণ-বিবাহ, শিশু-বিবাহ, কুমারী-বিবাহের অবাধ স্রোত প্রতিরোধ করিতে পারেন না? আমাদের যদি সমাজ বলিয়া কোন বস্তু থাকিত তবে আমরা কখনই সরকারকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিতাম না। কিন্তু যখন দেখিতেছি সমাজ মেয়েদের দুঃখ দুর্দ্দশায় একেবারে নির্ব্বাক নিস্পন্দ ও নিষ্কম্প

তখন ইহার প্রতীকারের জন্য সরকারের দ্বারস্থ না হইয়া আমরা পারি না। সরকার পক্ষ হইতে এইরূপ ভ্রূণ বিবাহ কিংবা শিশু-বিবাহ প্রতিরোধক বিল উপস্থাপিত করা হইলে আমার বিশ্বাস কেহই তাহাতে আপত্তি করিবে না।

তারপর অনেক মহাপুরুষ এক স্ত্রী থাকিতে আবার অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেন। পূর্ব্ব পত্নীকে বাধ্য হইয়া বাপের বাড়ীতে অতি কষ্টে দিন যাপন করিতে হয়। দুই একটা পরিবার ভিন্ন অন্য কোন পরিবার "মানমর্য্যাদার খাতিরে" স্বামীর নিকট হইতে মাসোহারা আদায় করিবার জন্য মামলা (Maintenance suit) করেন না।

এক্ষেত্রেও আমাদের সমাজ তুষ্ণীভাবে থাকেন। কিন্তু ইংরেজ কিংবা ব্রাহ্মসমাজে এরূপ এক স্ত্রী থাকিতে দারান্তর পরিগ্রহ করিবার ক্ষমতা নাই। অতি সামান্য কারণে অনেকে স্ত্রী ত্যাগ করিয়া অন্য দার পরিগ্রহ করেন। এক্ষেত্রে কি আইনের দ্বারা ইহাদিগকে শাস্তি দিতে পারা যায় না? স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয়, কুৎসিৎ ব্যাধিগ্রস্তা হয়, তবে তাহাকে রাখিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ নিতান্ত অপরাধের বিষয় নহে, কিন্তু বিনা দোষে যাঁহারা এইরূপ স্ত্রী ত্যাগ করেন, তাঁহাদের অপরাধ নিতান্ত সামান্য নহে। এরূপ স্বামী-পরিত্যক্তা হাজার হাজার নারীর হাহাকার এখনও বাঙ্গালাদেশে শোনা যাইতেছে।

আজকাল পণপ্রথার বিষময় চাপে অনেক অনূঢ়া বালিকা কেহ বা উদ্বন্ধনে, কেহ বা আগুনে পুড়িয়া মারা যাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একএকটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই পাত্রের দর এক, এক হাজার টাকা বাড়িতেছে! দেশের যুবকদিগের দৃষ্টি এদিকে অনেক প্রকারে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কোন ফললাভ হয় নাই। এক্ষেত্রে রাজবিধি প্রয়োগ করিয়া যদি পণ লওয়া একেবারে বন্ধ করা যায় তবে বোধ হয়, কতকটা ফল লাভ হইতে পারে।

একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি—সমাজের যদি চেতনা থাকিত তবে আমরা কখনও সমাজের এই সব কুপ্রথার জন্য রাজ-আইনের দ্বারস্থ হইতাম না, কিন্তু সমাজের সে প্রাণশক্তি নিবিয়া গিয়াছে বলিয়াই ত আজ একথা আমাদিগকে বলিতে হইতেছে।

একি অসম্ভব কথা! জয়পুর প্রভৃতি রাজ্যে এখনও নাকি এক এক রাজপুত্রের বিবাহে ৬।৭ শত করিয়া বাঁদী পাত্রকে যৌতুক দিতে হয়। সেই বাঁদী নাকি মহারাজদের গৌরব ও মহিমা প্রকাশক। একবার দুই দেশীয় নৃপতির পত্নীর মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা হইতেছিল। প্রথম রাণী বলিতেছিলেন, আমার স্বামীর পাঁচশত বাঁদী আছে, আর দ্বিতীয় রাণী বলিতেছিলেন, আমার স্বামীর ছয় শত বাঁদী আছে, অতএব কে বড়? বুঝুন দেখি ব্যাপার! মেয়েলোকগুলি যেন পুরুষের হাতের ক্রীড়নক হইয়া পড়িয়াছে! আর এই সমস্ত বলিতে গেলেই সমাজপতিগণ বলেন, স্ত্রীলোকদিগকে যত অষ্টবন্ধনীর মধ্যে রাখা যায় ততই ভাল। তাঁহাদের এত বন্ধন, এত দাসত্ব, এত পরাধীনতারও মধ্যেও তাঁহারা নাকি একটুও কষ্ট বোধ করেন না!

আমরা হিন্দুঘরের মহিলাকে মুক্ত আকাশ তলে বডিজ সেমিজ গায়ে দিয়া আধা মেমসাহেব করিয়া গঠনের পক্ষপাতী নহি; কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমানে তাঁহাদিগকে যে দুর্ব্বিসহ কষ্টের মধ্যে রাখা হইয়াছে, এ প্রথারও সমর্থক নহি। বিধবাবিবাহ, বিধবাবিবাহ করিয়া চারিদিকে রব উঠিয়াছে কিন্তু কয়টি বিধবাবিবাহ দেশে হইতেছে? বালিকা-বিধবাগণের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া যে আর চোখের জল না ফেলিয়া পারিনা! কেন তাহাদের আ[illegible] এই কঠোর বৈধব্য দশা? তাহাদের নিষ্ঠুর পিতামাতা যদি শিশুকালে তাহাদিগকে খেলার সঙ্গিনীদের কাছ হইতে ছিনাইয়া লইয়া একটা বৃদ্ধ, ক্ষয়কাশগ্রস্ত, মুমূর্ষুর হাতে সমর্পণ না করিতেন তবে ত তাহাদের আজ এ দশা হইত না! আসল কথা শৈশববিবাহ, বাল্যবিবাহ দিনে

বালবিধবার সংখ্যা বাড়িবেই বাড়িবে। এই ভ্রূণবিবাহ, শিশুবিবাহ আইনের দ্বারা বন্ধ হইলে বালবিধবার সংখ্যা কমিবে, আর দেশে স্ত্রী-শিক্ষারও প্রসার বাড়িবে। তাহার ফলে ঘরে বাহিরে ভারতবাসী শিক্ষিত ও শিক্ষিতা হইয়া স্বরাজসাধনায় অগ্রসর হইবে।

অনেকে বাল্যবিবাহের অনেক সুফল কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের মতে "বুড়ো শালিকে পোষ মানে না", বালিকা-বধূ ঘরে আনিলে শ্বশুর-শাশুড়ীর সে বেশ বশ হইবে। তাঁহারা কি বলিতে পারেন, যে সমস্ত বালিকাদের যৌবন-বিবাহ অর্থাৎ ১৯।২০ বৎসরে বিবাহ হইয়াছে তাহারা সব স্বামীর ঘরে গিয়া অবাধ্যতা করিয়াছে? মানুষের চোখ-মুখ ফোটাটা কি এতই দোষের?

সমাজের দ্বারস্থ হইয়া অনেক চীৎকার করিয়াছি। শিশুবিবাহ দূর করিতেও অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু দেখা গিয়াছে আইনের সাহায্য ছাড়া এ কাজ কখনই সিদ্ধ হইবে না। এই জন্যই চিরদিন ব্রাহ্মণ্য-আদর্শে লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত হইয়াও ডাক্তার গৌরের সম্মতি-বিল (Consent bill) সমর্থন করিয়াছিলাম। কেন করিয়াছিলাম?—করিয়াছিলাম ইহাই ভাবিয়া যে, এই বিল পাশ হইলে সমাজ হইতে ভ্রূণবিবাহ, শিশুবিবাহ দূরীকৃত হইবে, দেশে শিক্ষার প্রচার ও প্রসার হইবে, শত শত সরজিনী নাইডু, সরলা দেবী চৌধুরাণী, স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, বাসন্তী দেবী, জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, উর্ম্মিলা দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার, মোহিনী দেবী, স্বর্ণলতা দেবী, কুমুদিনী বসু, সন্তোষকুমারী গুপ্তার সৃষ্টি হইবে। তখন একদিকে দেশের পুরুষলোকেরা যেমন স্বরাজ সাধনায় অগ্রসর হইবে, তাহাদের পুরোভাগে তেমনি মহিলাগণও হুলুধ্বনি করিতে করিতে অগ্রসর হইবেন। ভারতের সেই একটা শুভদিনের প্রতীক্ষায় গৌরের সম্মতি-বিল সমর্থন করিয়াছিলাম। এ সমর্থন যে নিতান্ত দুঃখের সহিত করিতে হইয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। কে চায় আমার ঘরের, আমার সংসারের, আমার সমাজের বিধি-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিদেশী, অন্যধর্ম্মাবলম্বী রাজ-শক্তির সহায়তা লইতে? কিন্তু অতীতের কথা যখন ভাবিয়া দেখি তখন ভাবি এরূপ নৃশংস সামাজিক ব্যবস্থাকে রাজ-আইন দ্বারা সংযত ও সংহত করাই ঠিক। সতীদাহ প্রথা যখন লর্ড বেণ্টিক্ তুলিয়া দেন, তখন এদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই প্রথা বজায় রাখিবার জন্য বিলাতী গবর্ণমেণ্টের নিকট পর্য্যন্ত দরখাস্ত (Memorandum) পাঠাইয়াছিলেন। এই যে দেশের সমাজপতি (?) ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের রীতি, তখন ইংরেজ সরকার যতই এদেশের নারী-নির্য্যাতনে মনোযোগ দিবেন, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল হইবে বলিয়া মনে হয়।

আমার প্রস্তাব শুনিয়া অনেকে আমার উপর ক্রোধান্ধ হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমি একবার সমাজের অসাড়তা, নিশ্চেষ্টতা ও একদেশদর্শিতার বিষয় ভাবিতে বলি। এখনও কি বাঙ্গালা দেশে বাগদী, নমঃশূদ্র প্রভৃতি সমাজে টাকা দাদন দিয়া ভ্রূণ ক্রয় করা হয় না? বাঙ্গালায় এখনও কি প্রথমা দ্বিতীয়া স্ত্রীকে বিনা কারণে তাড়াইয়া দিয়া আবার তৃতীয় পক্ষে বিবাহ দেওয়া হয় না? পাশকরা ছেলের দল কন্যার পিতাদের ঘাড় মোচড়াইয়া এখনও কি হাজার হাজার টাকা আদায় করে না? যদি করে তবে সমাজ ইহার প্রতিকারের জন্য এ যাবত কি চেষ্টা করিয়াছেন? কয়টি লোককে এজন্য সমাজিক-শাসনে শাসিত করা হইয়াছে? উত্তর হইবে—হয় নাই—হইবেও না। যদি তাহাই হয় তবে ইংরেজ সরকার যেমন একশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশের নারীকুলকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এখনও তেমনি করুন—ইহাই ইংরেজ সরকারের নিকট নিবেদন।

উদয়-আলো

(বড় গল্প)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

...সবাই ঘুমিয়ে পরেছে, আহা, ক'দিন ধরে ক্রমাগত রাত জেগেছে, একটু ঘুমুবে না? ভোরের হাওয়া দিচ্ছে না? না না ও ঠাণ্ডা হাওয়া! আমি আজ একটু ভাল আছি বলে, আমার জীবনের আশা হয়েছে বলে ওদের ঘুমন্ত মুখেও কেমন একটা পরিতৃপ্তির আনন্দ ফুটে উঠেছে। কিন্তু আজ যদি সে কাছে থাকৃত, তা'হলে আমার আসন্ন পরিত্রাণের আশায় তার মুখখানি কেমন হাসিতে ভোরে উঠ্‌ত,—আমি ত তা দেখতে পেলাম্ না! আমার মলেই ভাল হত,...না না তার খুকু যে আমার কাছে! সে-ত দেখিনি খুকু কেমন হয়েছে, কত সুন্দর তার মুখখানি, তার ওপরে তার চোখ দুটি, কেমন টুকটুকে তার গায়ের রং, তাতে আবার পদ্ম-গোলাপের লালচে আভা; তার সরু সরু হাত দুখানি, তাতে কচি কচি আঙুল গুলির কোমল নাচনা; দালিমফুলি রংয়ের দুখানি ঠোঁট, তাতে আবার হাসিকান্নার সুধাবৃষ্টি। সে আসুক, এসে দেখুক, তার প্রাণের মণি বুকে করে নিক, তার ধন তাকে দিয়ে তার পরে সকল অপরাধের ক্ষমা চেয়ে তবে ত আমায় মর্ত্তে হবে;—নইলে মলেও ত সুখী হতে পার্ব্ব না! খুকু খুকু! ঘুমোও না, লক্ষী আমার, সোণা আমার একটু ঘুমিয়ে নাও; এখনি সে আসবে যে মণি। তুইত দেখিস্ নি, তোকে কেমন করে আদর করে নেবে, প্রাণ বিলিয়ে চুমু খাবে। তখন বুঝবি কত বড় বাপের মেয়ে তুই, কত সৌভাগ্য যে এমন স্নেহের সবটুকুই তোর একার অধিকার।... আজকে কি রাত পোহাবে না?—না আমারই চোখে ঘুম নেই বলে এমনি বোধ হচ্ছে!...

...একটু পরেই সে এসে পর্ব্বে। আমার জন্তে যে তার সমস্ত উন্নতির মূলে কুড়ুল মেরে ভবিষ্যতের সব আশাকে ভেঙ্গে ফেলে, আমাকে একবার দেখবে বলে ছুটে আসছে; এসে যদি আমাকে না দেখতে পায় তাহলে কি বাঁচবে? কেঁদেই মরে যাবে,—এমনি আমায় ভাল বাসে। আর এমনি হতভাগিনী আমি, কোন দিন তাকে বুঝতে চেষ্টা করিনি, আজ মরণের দ্বারে এসেছি কিনা তাই এমন টনটনে জ্ঞান! যদি এই জীবন নিয়ে বেঁচে থাকৃতে হয়, তাহলে সে-ই জিতবে, আমাকে ভালবেসে যত্নে সেবায় বুকে করে রাখবে; আর আমি তার কোন কিছুই কর্ত্তে পার্ব্ব না, অথচ কিছু করার মধ্যেই নিজের সম্পূর্ণ স্বার্থকতা বুঝেও; না,—এ আমার সহ্য হবে না, এমন করে আমি বেঁচে থাকৃতে পার্ব্ব না!...

...সে আজ অনেকদিনের কথা। আমায় কুরূপা বলে কেউ নিতে চায় না,—না চাইলেও বয়স ত আর বসে থাকবেনা; সে বেড়েই চলতে লাগল। মা জানতেন সে বিয়ে কর্ব্বে না, তবু তাকেই আমায় দেবেন এই ছিল তাঁর আন্তরিক সাধ। আমি নিজে কুরূপা বলে ছোট বয়েস থেকেই রূপের উপর বড়ই ভালবাসা ছিল, নিজের রূপকে মেজে ঘসে ভাল করে তোলবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় রূপকে খাড়া করে ভালবাসাও রোগ হয়ে উঠল; আর প্রথমেই আমার সামনে পলো সে, তার কৈশোরের আলো নিয়ে।

...তার মুখে এমন একটা কমনীয় ভাব, এমন একটা হাস্য-জ্যোতি সদাসর্ব্বদার জন্ত লেগে থাকৃত যে, তাকে না ভালবেসে কেউ থাকৃতে পারে না।

তার কথাগুলো সুধা বৃষ্টি কর্ত্তে পার্ত্ত, বিষ উদ্গীরণ কর্ত্তে কেউ তাকে কোনদিন দেখিনি,—এমনিই ছিল সে।

...আমি তাকে না ভালবেসে থাকি কি করে? আমার মনের মত সে যে সব দিকেই। তার ভেতর বার সবখানিকে আমি আদরে বরণ করে নিলাম; কিন্তু তাকে পাবার আশা রইল এত কম যে বলা যায় না, তবু আমার তাকেই চাই—এই হ'ল একটা প্রধান চিন্তার বিষয়।

প্রথমে বুঝলেন মা, কিন্তু উপায় কি? যে চায় না, তাকে দেবেন কি করে? কত অনুরোধ, কত উপরোধ করে মা তাকে হাতে ধরে পর্য্যন্ত বল্লেন,—"তুমি বাবা বিয়ে না কল্লে মেয়ে আমার আর কাউকে বিয়ে কর্ত্তে চায় না, এর একটা কিছু তোমাকে কর্ত্তেই হবে। তুমি নিজে কর ভালই, তা না হলে এমন একটি পাত্র জুটিয়ে দাও, যাকে সে বিয়ে কর্ত্তে একটুও গররাজি না হয়।" তাতেও রাজি হল না, সে বল্লে "আমার ওপর এমন একটা অভিসম্পাত আছে যে, আমার জীবনের সঙ্গে কোন জীবন জড়িত হলে, সে একটুও সুখী হবে না; আমি অনর্থক জেনে শুনে একটা জীবন হাহাকারে ভরিয়ে দিতে পারিনে। পলে পলে মরার বিষ হাতে করে কাউকে খাইয়ে দেওয়া যে বড় অন্যায়।" তার কথায় সবাই তখন খুব হেসেছিল,—একটা পাগলামী ছাড়া আর কিছু নয়; কিন্তু আজ দেখছি সে যা বলেছিল সবই সম্পূর্ণ সত্যি।...

ছোট বয়েসে তার সঙ্গে কথা কইতে কোন দিন লজ্জা বোধ হয়নি, অবাধে বেশ কেমন মিশতাম। সে গাইতে জান্ত, বায়না ধরে তার কাছে কত গানই শুনেছি, কত প্রকারে তাকে বিরক্ত করেছি কিন্তু আজ তার সাম্নে বেরুতে পা যেন কে চেপে ধরে, হাজার ইচ্ছাকে দমন করে লজ্জাই বড় হয় যে।...

সকলের অনুরোধের পর যখন সে কিছুতেই রাজি হল না, তখন অগত্যা মা আমার জন্য এক পাত্র স্থির কল্লেন, সে এক 'তেজবেরে' ঘাটের মরা। শুনলাম তার নাকি অগাধ ধনসম্পত্তি আছে, আরও সব কি কি আছে। যাই হোক তাকে ভালবাসার মত কিছু থাক আর নাই থাক, পয়সা তার খুবই আছে। এ সম্বন্ধ স্থির করে মা আমার একটুও সুখী হলেন না; কিন্তু উপায় কি?...

আমি বড্ড বড় হয়ে পড়েছিলাম, যা আজকাল হিন্দুদের ঘরে একেবারেই ভাল মানায় না। তাই মা তাড়াতাড়ি বিয়ের দিন স্থির করে ফেল্লেন। তবু তাকে শেষ অনুরোধ জানালেন,—"বাবা, যদি আমার এ দানটি নিয়ে আমায় ধন্য কর্ত্তে, তাহলে সকল হারিয়েও ওর সুখে একটু সুখী হয়ে মর্ত্তে পার্ত্তাম। তা যখন হল না, আর হবার উপায়ই নেই, তখন ওর বলিদানের দিন তুমি একবার এসো, এসে দাঁড়িয়ে থেকে দেখে যেও—ও কি প্রাণ নিয়ে নিজেকে দান ক'রে দেয়!"...

যতই দিন ঘুনিয়ে আসতে লাগল ততই আমি যেন কেমন হয়ে যেতে লাগলাম। নিজেকে নিজেই আর সাম্লাতে পারিনে, কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ লাল হ'য়ে উঠল, খেতে বসে হাতের ভাত হাতে থেকে যায়, মুখে উঠেনা,—একি বিষম জ্বালা! সকলের কাছে সদা সর্ব্বদাই নিজেকে যেন খুব অপ্রস্তুত বলে মনে হতে লাগল। আর পারিনে—প্রাণটাও যায় না! মা জান্তেন আমার আকাঙ্খা, জান্তেন আমার আশা ও ভবিষ্যৎ কল্পনা; তাই সান্ত্বনা দেবার বদলে আমাকে দেখলেই কেঁদে ফেল্তেন, আমার বুকখানাও যে কি ক'রে উঠত তা বল্তে পারিনে। আমি আর কোন আপত্তি কর্ত্তে পাল্লাম না, নিন্দে কুৎসার তাড়নায় মার মুখখানি মলিন দেখলে প্রাণটা এমন একটা বেদনায় ভ'রে উঠত, যে মাথা খুঁড়ে মর্ত্তে ইচ্ছে হ'ত। নিজের আশা আকাঙ্খাকে বিসর্জ্জন দিয়ে ভবিতব্যের উপরই নির্ভর ক'ল্লাম।

আত্মীয়েরা মাকে বল্তেন, "তোমার এই দীন অবস্থায় সকল পণ ক'রে যাকে সেধেছিলে, সে কি

একটা মানুষ? মানুষের কাছে এ নিবেদন জানালে উপেক্ষা কর্ত্তে পার্ত্ত না, পারে না; তুমি তার আবার প্রশংসা কর!" আমার ভারি রাগ হত কিন্তু, মনে হত তোমরা তাকে কতটুকু জান বাপু? আমি যেন কতকালের বস্তিবুড়ি, যেন আমি সবই খবর রাখি। না—না, তা নয়, তাকে আমার কথা তেমন করে কেউ জানাল না যেমন করে আমার ব্যাথা তার কাছে ঠিক প্রকাশ পায়; তাহলে সে কিছুতেই 'না' কর্ত্তে পার্ত্ত না। আমাকে সে কতখানি ভালবাসে তা যে আমি ভুলতে পাচ্ছিনে। হোক বিয়ে, আমি তাকেই ভালবাসব, শ্বশুরবাড়ী যাবো না, কিছু কর্ব্ব না, শুধু বসে বসে তাকেই ভালবাসব; তাকেই বুকের মাঝখানে লুকিয়ে রাখব!…

মা বলতেন "না গো, সে মানুষ নয় বটে, কিন্তু সে দেবতা, সে আমায় ডাকে—পেটের ছেলেও এমন মধুর করে ডাকতে পারে না, তার মাঝে কতখানি আত্মনিবেদন, কত ভক্তি, কত পবিত্রতা তা যদি বুঝতে তোমরা, তাহলে তার দোষ দিতে না। সে আসুক, আসবে বলেছে, আমি আর একবার তাকে বুঝিয়ে বোলব। বোলব,—"তোমার ভবিষ্যৎ সুখদুঃখকে আমার মেয়ে বরণ করে নিতে একটুও অনিচ্ছুক নয়, যদি তোমাকে বরণ করবার অধিকার তাকে দাও। তুমি তার জীবনটাকে শুধু কান্নাতেই ভ'রে দিও না, একটু হাসতে দাও,—এ তোমায় দিতেই হবে।" শুনে একটু একটু আশাও হ'ত, সে শুধু আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের মাঝে অমনি একটু অবলম্বন। আচ্ছা আসুক, আমি মুখে পারি ভালই, না হয় লিখেই জানাব। আমার কথা কোনদিন ঠেলেনি, কোন অনুরোধ 'না' করেনি! আজ বড় হয়েছি বলে কথা কইতে কেমন যা লজ্জাই আসে, তাতেই ত কথা কইতে পারিনে!—তাই বুঝি অভিমান করেছে? তাহোক, এক কলম লিখলে আর অভিমান থাকবে না!…

…আমার নিজেকে দেখে নিজেরই ভয় হ'ত। আমি আর কারুর সামনে বেরুতে পারিনে, যেন কত বড় অপরাধই করেছি! সব সময়ে কেমন জড়সড় হয়ে পড়ি, কি করি কেবল ভগবানকেই ডাকি, বলি—প্রভু! যাদের লজ্জা নিবারণের কোন শক্তিই দাওনি, তাদের তবে এত লজ্জা কেন দিলে? যদি তাই দিলে, তবে তুমিই তাকে রাখ প্রভু! তাকে কামনা করেই যে তোমার পায় ফুল দিয়েছি, আজও চোখের জলে তোমার পুজো কচ্ছি; তোমার দয়া কি হবে না প্রভু?"…

…আমি তাকে কি চোখে যে দেখেছিলাম, তা আমিই জানিনে। জগতে তার মত আর একটি খুঁজে পাইনি, এত মধুর সে। তার মুখে কথা বেরুবার আগে সমস্ত মুখখানা একটা সত্যিকারের আনন্দে ভ'রে উঠত, তারপর যখন সে কথা ব'লত, সে যে কত মিষ্টি, যে তা ভোগ করেনি, সে কিছুতেই বুঝতে পার্ব্বে না।……খুকু, আর একটু ঘুমিয়ে নাও মা, যখন সকাল হবে, ভোরের হাওয়া আর পাখীর গান এসে তোমায় ডেকে যখন ঘুম ভাঙ্গাবে, তখন দেখবে একজন তোমার কে এসেছে, সে কত মিষ্টি, কত বড় ভক্ত তোমার। সে তোমার কাছে ভিখারীর মত শত হাত পেতে দাঁড়াবে, তখন তুমি একটা চুমো দিও, একবার বুকে যেও, যেন কেঁদ না! একটু আনন্দ শিহরণ তার যে প্রথমেই দরকার। তখনি সে তোকে এমনি আপনার কোরে নেবে যে, আমাকে ভুলে,—যে মাকে তুই একতিল ছেড়ে থাকতে পারিসনে, সেই মাকে ভুলে তারই কাছে থাকতে চাইবি; আজ তুই জানিসনে কাল তোর কি দিন, কাল তোর কত বড় সুপ্রভাত!…

…বিয়ের দশ বার দিন থাকতে একদিন সে আমাদের বাড়ীতে এলো—যেন একটা বসন্তের হাওয়া, একটা গানের ঝঙ্কার, শান্ত-মধুরের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। আমাদের অমন মনমরা বাড়ীখানাও আনন্দে ভ'রে উঠল।

মা তাকে খুব বল্লেন। সেদিন তিনি আমার জন্যে কি যে বলেছিলেন তা তিনিই জানেন না। কোন একটা দৈব শক্তি তাঁর এসেছিল, কথা সেদিন কে যেন তার মুখে অনর্গল জুগিয়ে দিয়েছিল, কে যেন তাঁকে সেদিন উন্মাদিনী করেছিল! আমাকে তার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মনে মনে এত রোখ্‌রাখ্‌ ভাঁজতাম, তখন রা-টিও কর্ত্তে পাল্লাম না; পোড়া চোখে কে যেন দশমণ পাথর চাপিয়ে দিয়ে গেছে! আমি ত কাঠের মূর্ত্তির মত নিথর নিশ্চল, তার ওপর কোন জ্ঞানও নেই;—আমি যেন কোন্‌ সুদূর দেশে চলে গিয়েছি, সে একটা ভারি মনোরম রাজ্য; সেখানকার সবই যেন নতুন সৌন্দর্য্যে ভরা, যা কখনও দেখিনি, অথচ তাই আমার অন্তর চাচ্ছিল,—এমনি একটা দেশ। জ্ঞান হ'ল কখন? —যখন মা বল্‌ছেন "চেয়ে দেখ ও কি হ'য়ে গিয়েছে, মরার মত কোথায় অপলক-চোখে চেয়ে আছে দেখ। ওই পাণ্ডুরাশে মুখখানার উপরে কি মৃত্যুর রেখাগুলো ঝল্‌মল্‌ কচ্ছে না! ওর প্রতি নিশ্বাসগুলো কি বেদনার বিষ মাখা নয়!" তখন মার চোখ দিয়ে টস্‌ টস্‌ করে জল গড়িয়ে পর্চ্ছে। তিনি বল্লেন "আমি বল্‌ছিনা ওকে তুমি তোমার পায়ে একটু স্থান দাও, কিন্তু ও-তো শুকিয়ে শুকিয়ে কঙ্কালসার হয়ে মর্ব্বে—সেটা আমি চোখের সামনে কি ক'রে দেখ্‌ব? মা হয়ে কোন প্রাণে ওর সমস্ত বেদনা ভুলে চিরবিদায়ের সময় একটু সান্ত্বনা দেব, আমার তাই সব চেয়ে ভাবনার বিষয়! এর একটা কিছু উপায় বলে দিতে পার বাবা?"

...প্রভাতের আলো আর পিপাসার জল যেমন মিষ্টি, সে ছিল সত্যিই তাই। তার ওপর সে ছিল বড় কোমল, এত কোমল বুঝি মানুষের হ'তে নেই। তার চোখ দুটো কেমন ছল্‌ ছল্‌ করে উঠ্‌ল, একটা বেদনার আঘাতে মুখখানা কেমন লাল হয়ে গেল। আমার চোখে জল এল,—তার দুঃখে সহানুভূতিতে নয়, অনুকম্পায় নয়, অভিমানে। যে আমায় সেধে আদর করে নেবে, তারই কাছে ভিখারিণীর মত হাত পেতে দাঁড়াতে হল—দাও দাও ব'লে? এখনও মনে হলে আমার ভারি রাগ হয় কিন্তু।...

...কি জানি তার মনে কি হ'ল, ঘাড়ের ভূত বুঝি ছেড়ে গেল; মাকে বল্লে, "আপনি যে দান দেবেন, আমি তা খুব আনন্দের সঙ্গেই নেব রাণীকে বল্‌বেন সে যেন ভাল ক'রে খায় দায়।"...স্বর্গ ছাড়া আরও যদি কিছু কামনার থাকে, মা-ত' তাই পেলেন; আর আমি যা পেলাম, তা এখনও বুঝতে পারিনি। সঙ্গিনীরা বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুল্লে, ঠাট্টায় ঠাট্টায় জ্বালিয়ে মারলে।

প্রধান প্রধানারা বল্লেন "সে খামখেয়ালি লোক, একবার যখন মত করেছে ভালই, শীঘ্র শীঘ্র কাজ সেরে ফেল।" মা কিন্তু তাকে জানতেন, সে যা বলে সেটা কাজে করবার জন্যেই বলে। তবু পাঁচজনের কথা শুনতে হয়, তাই একটু তাড়াতাড়িই বিয়ের দিন স্থির করে ফেল্লেন। তা যাই হোক্‌গে, কি জানি কেন যত রাজ্যির হাসি এসে আমার মুখে জোর ক'রে চেপে বস্‌ল'। আমার সমস্ত দেহটাও হাসিতে ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগল, অথচ বেশী হাসতেও পারিনে, কিন্তু কারণ-অকারণে হাসিও পায় বড় বেশী। এত ম্রিয়মাণতার পর হঠাৎ হেসে লুটোপুটি কল্লে লোকেই বা কি বল্‌বে? —মহা বিপদে পড়লাম! সোনার কাঠির স্পর্শে রাজকন্যার জীবন পাওয়ার মত আমার দেহে যেন নতুন জীবন এলো। অত কুশ্রী আমি, কার অদৃশ্য-স্পর্শ এসে আমাকে সুন্দরতায় ভরিয়ে দিলে, আমাকে আমি দেখেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম! সবাই এখনও বলে "বিয়ের দুচার দিন আগে থেকে বিয়ে হওয়া পর্য্যন্ত তুই এত সুন্দর হয়েছিলি, তেমনটি আর তোকে দেখ্‌লাম না।"

দোলের আগেই বিয়ের দিন স্থির হল। এত আশা, এত আনন্দ তবু বিয়ের দিন প্রাণটা কেমন অজানা ভয়ে দুরদুর্‌ কর্ত্তে লাগ্‌ল,—এটা বুঝি

নারী-চিত্তের একটা মস্ত দুর্ব্বলতা, না, নতুন লৌকিকতা প্রতিপালন করার জন্যেই ভয়? যাই হোক সেদিন আমাদের কত বন্ধু-বান্ধব, আপনার জন আমায় আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে এসেছিলেন।...

স্ত্রী-আচারের সময় আমাকে হাসিতে পাগল করে দিলে। সবাই বল্‌ছে "ওরে তাকা, শুভদৃষ্টি কর।" সঙ্গিনীরা বল্‌ছে "যার জন্যে এত কাণ্ড করলি সে যে তোর হচ্ছে, একবার ভাল করে চেয়ে দেখ ভাই।" আমি চেয়ে দেখ্‌ব কি হেসেই অস্থির হচ্ছি, গাল ফেটে হাসি ফুট্‌ছে, চোখে ত আছেই, ঠোঁটে ত কথাই নেই, কাকে রেখে কাকে আট্‌কাই? শেষে এমন হয়ে গেল যে, জামা কাপড় ফেটেও যেন আমার গা বেয়ে হাসির ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল! অনেক কষ্টে ত একবার চাইলাম, দেখ্‌লাম তার প্রশান্ত হাসিভরা মুখখানি শুধু আমারি পানে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে। বেশীক্ষণ চাইতে পার্‌লাম না, চোখ আপ্‌না হতেই বুজে এলো। যখন হাতে হাত দিলাম, সে কি মধুর স্পর্শ, আমার সমস্ত শরীরের শিরায় শিরায় একটা পুলক-শিহরণ এসে উন্মাদনা এনে দিলে! যখন সে আমার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলে, তখন আমাকেই আমার কাছে এত মধুর বলে বোধ হয়েছিল যে তা ভেবে শেষ কর্ত্তে পারিনে।...

বাসরঘরে সবাই তাকে পেয়ে বস্‌লে—"ওগো, তোমায় গান গাইতেই হবে।" কথায় বলে 'ওরে নেদো ভাত খাবি, আরে, আমি যে হাত ধুয়েই বসে আছি।'—সে তো তাই চায়। সেদিন এমনি সে গেয়েছিল যে, আমি জীবনে ভুল্‌ব না, যেন তার প্রাণের সমস্ত নিবেদন শুধু আমাকে জানাবার জন্যেই তার এই গান গাওয়া। আমার যেন বোধ হতে লাগ্‌ল, সে যেন আমায় কোন এক সুধা-কুঞ্জে এনে ফেলেছে সেখানে যা কিছু সমস্তই যেন শুধু গানের সুরে গড়া, নাচের হাওয়ায় উৎফুল্ল। সে যে কতখানি আমায় ভালবাসে সেই কথাই বুঝি সেদিন জানাল। বাড়ীর সবাই সমস্ত দিন ত খাটাখাটনি করেছে, তবুও সারারাত জেগে তার গান শুন্‌ল'। কতদিন ত সবাই তার গান শুনেছে, কিন্তু সেদিন তার গানে কেমন একটা নতুনত্ব, কেমন একটা আবেশ ছিল, সবাই তাতে বিভোর হয়ে গেল। কেউ কথাও কয় না, হট্টগোলও করে না; বিয়ের বাসর,—কত হৈ চৈ হবে, তা না হয়ে যেন ব্রাহ্মসমাজে বসে চোখ বুজে সবাই গান শুনছে; মরণ আর কি! আমি না হয় মজেছি, তোদের সবার কিলো? আমি উস্‌খুস্ করে মরি, কেউ একবার সাড়াও দেয় না! যদিও সে ছিল আমার কতদিনের চেনা, তবুও সেদিন বিয়ের রাত, আমি কি করে তার পাশে শুয়ে পড়ি? কিন্তু এটুকু সে বুঝ্‌তে পেরেছিল, তাই তার গানের মাঝেই কেমন নির্ব্বিকার ভাবে বল্লে "তুমি আমার পাশেই শুয়ে পড়"। শুনেছি স্থলবিশেষে পুরুষই লজ্জায় নারীকে জয় করে থাকে, কিন্তু এস্থলে দেখলাম, না, আমরাই লজ্জায় প্রথম স্থান পেয়েছি। এখনও সবাই গল্প করে 'সেদিন যেমন মশার বাড়াবাড়ি হয়েছিল এমন আর দেখা যায় না'। যদিও নিজেকে ঢেকে-ঢুকেই শুয়েছিলাম, তবু কি মানে? এমন বিরক্ত ক'রে তুল্লে যে বড়ই অস্থির হয়ে পড়লাম। তারা যেন রসিকতা কর্‌বার পাত্রী আমাকেই বেছে নিয়েছে! এমনি করুণ, এমনি কোমল সে, যে, মাঝে মাঝে আমায় কত হাওয়াই না দিলে, আমি ত লজ্জায় মরি।...

ওরে খুকু! আমার সে-ই একটু পরেই আস্‌বে। তখন দেখ্‌বি তোকে কেমন ক'রে ঘুম পাড়াবে, বুঝ্‌বি কতখানি স্নেহ তার কোলে, কত শান্তি তার বুকের পরে, কত বড় আনন্দ দেবার সে ক্ষমতা রাখে!...

(ক্রমশঃ)

বাঁকুড়া জেলা সম্মিলনীর সভানেত্রীর অভিভাষণ

(১৯২৪)

শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার।

বন্দেমাতরম্।

অভ্যর্থনাকমিটীর সভাপতি মহাশয় ও সদস্যগণ,—আজ আপনারা আমাকে আপনাদের সভার নেতৃত্ব করিতে আহ্বান করিয়াছেন, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে আমি বলিতে বাধ্য যে এ নির্ব্বাচনে আপনারা নিতান্ত ভুল করিয়াছেন। নেতৃত্বে আমার অধিকার নাই, আমি গৃহস্থ কুলবধূ, হিন্দুরমণী, সেবাতেই আমার অধিকার। যিনি নিজের সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া, সুখ ও বিলাসকে তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া কেবল দেশের ও দশের চিন্তাকে অনন্যমনা হইয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, শয়নে, জাগরণে কেবল দেশের কথাই ভাবেন, স্বপনে যিনি দেশের বিষয় দেখেন, প্রলাপে যাঁর দেশের কথাই বাহির হয়, দেশই যাঁর সর্ব্বসময়ের সাধনা, ভাবনা—নেতৃত্বে তাঁহারই অধিকার। বিদ্যায় ও জ্ঞানে অধিকার লাভ করিয়া যিনি আজ ধৃতিশক্তির দ্বারা সাধনা করিয়া মনের দৃঢ়তা লাভ করিয়াছেন, দিব্যচক্ষে যিনি ভবিষ্যৎ দেখিতে পারেন, নিজ মতে যাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, নিজ ক্ষমতা পরিচালনে যিনি নির্ভীক, ফলাফল মায়ের চরণে উৎসর্গ করিয়া যিনি কেবল কর্ম্মকেই সার করিতে পারিয়াছেন, নেতৃত্বে তাঁহারই অধিকার।

ইংরেজি বা বাংলা কোন ভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ আমি পাই নাই, আমার একমাত্র শিক্ষা স্বামী সেবার ভিতর দিয়া। স্বামীর ধর্ম্মকে নিজ ধর্ম্ম, স্বামীর কর্ম্মকে নিজ কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করাই নারীর প্রকৃত শিক্ষা, মনে করিয়াছি। প্রথম জীবন হইতেই স্বাধীনতা-মন্ত্র সাধনের সর্ব্ব কর্ম্মেই স্বামী আমাকে তাঁর সঙ্গে রাখিয়া কাজ করিয়া আসিতেছেন এবং আমিও ছায়ার ন্যায় তাঁর সঙ্গিনী হইয়া যথাশক্তি তাঁর সহায়তা করিতেছি এবং তাঁর ভিতর দিয়াই আমার শিক্ষা। আজও নিজের মতকে নির্ভুল করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি নাই, দিন দিন কর্ম্মের সঙ্গে মতের পরিবর্ত্তন হইতেছে। তাই আজ নিজ মতকে প্রচার করিয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করার সাধ্য ও অধিকার আমার আছে বলিয়া মনে করি না। যতদিন তাহা না হয় ততদিন কোনও নেতার অধীনে থাকিয়া মায়ের সেবা করাই আমাদের অধিকার। তাই আমরা স্বরাজ্য দল ভুক্ত হইয়া দেশবন্ধুর নেতৃত্বাধীনে তাঁহার সামান্য কর্ম্মীরূপে মায়ের সেবা করিয়া আসিতেছি। শ্রদ্ধেয় অনিলবরণ বাবু যখন আপনাদের পক্ষ হইতে আমাকে এই গুরুভার গ্রহণে আহ্বান করিলেন, তখন আমি বিশেষ সঙ্কোচ মনে করিতেছিলাম। কিন্তু বঙ্গ দেশের পূর্ব্ব প্রান্তে ত্রিপুরায় আমার ঘর, আর পশ্চিম প্রান্ত বাঁকুড়া হইতে আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, আপনাদের এত স্নেহ ও মমতা এবং আপনাদের ভিতর দিয়া মায়ের আদেশ অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আমার হইল না। আমার নিজের ক্ষমতা যতই অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন, মা যখন যে ব্রত দেন তাহা উদ্‌যাপনে তিনিই বল দিয়া থাকেন। আপনারা যখন আমাকে ডাকিয়াছেন তখন আজ মনের কপাট খুলিয়া দিয়া খোলা ভাবে বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান যুগে আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু "স্বরাজ", বর্ত্তমান যুগের যুগধর্ম্ম "স্বরাজ"। ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু এই স্বরাজের স্বরূপ ও তাহার পন্থা লইয়া ঘোরতর মতভেদ। একদল বলিতেছেন ইংরেজের অধীনে আমরা স্বরাজ চাই, কিন্তু তাঁহাদের স্বরাজের স্বরূপ যাহাই হউক তাহা স্বাধীনতা নহে, কারণ কাহারও অধীনে স্বাধীনতা হইতে পারে না। স্বাধীনতার প্রয়োজনের বিষয় ভাবিলেই কথাটা পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। এবিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ আমার নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিতে হয়। আমি একজন সর্ব্বশক্তিমান বিরাট পুরুষ কর্ত্তৃক কতকগুলি কর্ম্ম লইয়া এ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। কর্ম্মান্তে পুনরায় তাঁহার নিকট চলিয়া যাইব। এই আসা যাওয়ার পথে কিছুকাল এখানে আমাকে থাকিয়া কার্য্য করিতে হইবে। তার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া কর্ত্তা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমার শরীর ও মনের প্রকৃত সুস্থ অবস্থা লইয়া থাকিতে হইলে আমাকে খাইয়া থাকিতে হইবে এবং এই খাওয়ার বিধান আমার জন্মগ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থা করা আছে। আমাকে মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়াই দেশমাতৃকার বক্ষে আশ্রয় লইতে হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার ৬মাস পূর্ব্ব হইতে আমার গর্ভধারিণীর স্তনে দুগ্ধরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে। জন্মিয়াই সেই দুগ্ধ পান করিয়া বাঁচিয়া থাকি ও বল সঞ্চয় করিতে থাকি। বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা বাড়িয়া যায়, খাদ্যেরও পরিমাণ বেশী প্রয়োজন হয়। তজ্জন্য পরমপিতা যে অমৃতরাশি অল্প পরিমাণে গর্ভধারিণী জননীর বুকে রাখিয়াছিলেন তাহাই অপরিমিত পরিমাণে জননী জন্মভূমির বুকে রাখিয়া দিয়াছেন। মা এই এই অমৃতরাশি শস্যের, ফলের, জলের ভিতর দিয়া নানা ভাবে, নানা রূপে পলে পলে, মিনিটে মিনিটে অযাচিত ভাবে বিতরণ করিতেছেন।

গর্ভধারিণী মায়ের বুকের দুগ্ধ মুখে চুষিয়া লওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু জননী জন্মভূমির বক্ষের অমৃত রাশি বুদ্ধি ও শক্তির সাহায্যে সংগ্রহ ও রক্ষা করিতে হয়। এবং তাঁহার বিধান ও ব্যবস্থা কল্পে রাজশক্তির সৃষ্টি। যেমন তিল তিল সৌন্দর্য্য লইয়া ভগবান তিলোত্তমা সৃজন করিয়াছিলেন, তেমনি বিন্দু বিন্দু জনশক্তি কেন্দ্রস্থ করিয়া সমাজ রক্ষার্থে রাজশক্তি বা সামাজিক কেন্দ্রশক্তি গঠিত হইয়াছে। এই রাজশক্তি যখন আমার শিক্ষা দীক্ষা, চলা ফেরা, খাওয়া দাওয়া, ধ্যান ধারণা ও ধর্ম্মে কর্ম্মে সহায়তা করিয়া দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনায় আমার উপযোগী বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন, এবং আমি যে জন্য এ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি বিনা বাধায় ও বিনা কষ্টে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে সে কার্য্য করিবার সহায়তা করেন, তখন সে রাজ আমার স্বরাজ। এবং তখনই আমি নিজেকে ও সমাজকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিতে পারি। ভগবান আমাদের দেশে সকল জিনিষই দিয়াছেন। আমার মায়ের রূপ বর্ণনা করিতে আমাদের দেশের কবি গাহিয়াছেন,—

"সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।......

অন্য কবি গাহিয়াছেন,—

"ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।...

বাস্তবিক পূর্ব্বের ন্যায় এখনও মা আমার সুজলা, সুফলা, মা আমার মলয়জ শীতলা, শস্যশ্যামলা; আমার জন্মভূমি এখনও ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আজও সে সকল দেশের সেরা। মা আজও প্রতি মুহূর্ত্তে সুজল, সুফল ও ধনধান্য বিতরণ করিতেছেন, কিন্তু আমার দেশের সন্তান তাহা ভোগ করিতে পারিতেছে না। আমার মায়ের স্তনে যে পরিমাণ দুগ্ধ থাকার কথা ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত, অর্দ্ধভুক্ত মায়ের স্তনে সে পরিমাণ দুগ্ধ নাই। শিশু প্রয়োজনমত দুগ্ধ পায় না তাই সে শৈশবে রুগ্ন, ক্লিষ্ট ও অপূর্ণ দেহ ধারণ করিয়া সংসারে অকর্ম্মণ্য হইয়া বাস করে। আমাদের প্রকৃতি প্রদত্ত জিনিষগুলি বিদেশী লুটিয়া নিয়া আজ

সে হৃষ্ট-পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু, আর আমরা আমাদের মায়ের দেওয়া খাদ্য হারাইয়া ম্যালেরিয়া, মহামারী কালাজ্বর প্রপীড়িত, দুর্ব্বল ও অর্দ্ধমৃত। যে শক্তি আমাদের রক্ষার জন্য দায়ী সে, আজ লুণ্ঠনের সহায়, আমাদের রক্ষার জন্য যে বিধি ব্যবস্থা করা তাহার কর্ত্তব্য সে আজ তাতে উদাসীন থাকিয়া নিজে দর লাভের উপযোগী বিধি ব্যবস্থা করিতেছে।

আমাদের দেশবাসী যখন অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে অতিষ্ঠ হইয়া অন্নের তালাসে পাগলের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে তাহার মায়ের ভাণ্ডার দেখিতে পাইতেছে, মায়ের ধন ঐশ্বর্য্যের প্রতি তাহার চক্ষু পড়িয়াছে সে হাত বাড়াইতে চায়, তখন ইংরেজ তাহাকে চাপিয়া মারিতে চায়, কারণ আজ ইংরেজের বড় ভীষণ অবস্থা; ভোগ ও লালসাকে যতই বাড়ান যায় ততই বাড়িয়া থাকে—ইংরেজ তাহার ভোগলালসাকে এত বাড়াইয়া ফেলিয়াছে যে তাহার মাতৃভূমি ইংলণ্ড আর তাহার প্রয়োজন পূরণ করিতে পারে না। তাই সে আজ ক্ষুধার তাড়ণায় সমস্ত পৃথিবী বিধ্বস্ত করিতে চায়। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশ আজ ভারতের ন্যায় পরাধীন নহে, তাহারা শোষণ জ্বালার একটু তাপ পাইয়াই তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া সামলাইয়া উঠিয়াছে, শোষকদিগকে তাদের সীমানা হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, তাই আজ ইংরেজ তাহার সমস্ত ক্ষুধা ও লালসা লইয়া ভারতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। ভারতও আজ বাঁচিতে চায়। আজ ইংরেজের সঙ্গে এদেশবাসীর খাদ্য খাদক সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। আমাদের বাঁচিবার জন্য যে বিধি ও বিধান প্রয়োজন, তাহা ইংরেজের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাই আমার বাঁচিবার উপযোগী বিধি বিধানের জন্য ইংরেজের নিকট আশা করিতে পারি না। সেজন্যই আজ ইংরেজের অধীন আমাদের স্বরাজ হইতে পারে না?

ন্যায়ে হউক, অন্যায়ে হউক ইংরেজ আজ আমাদের দেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহার হাত হইতে আমার নিজস্ব ও সর্ব্বস্ব উদ্ধার করিতে হইবে। এতদিন ইহার একটিমাত্র পন্থা জানা ছিল, তাহা বিরোধের পথ—উপদ্রবের ভিতর দিয়া, বলের সাহায্যে সাধন করিতে হয়। সে পন্থার অনুসরণ করিতে যাইয়াই তাহার সঙ্গে ১৯২০ সালের পূর্ব পর্য্যন্ত বিশ বৎসর ব্যাপী সংঘর্ষ। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরের কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা এক নূতন পন্থা দেখাইলেন, তিনি বলিলেন নিরুপদ্রব নীতির ভিতর দিয়া অহিংস অসহযোগ সাধনায় অতি শীঘ্র স্বরাজ পাইতে পার। অতএব তোমরা উপদ্রবের পন্থা পরিত্যাগ কর। সে নীতি অনুসরণ করিতে গেলে ইংরেজের সহিত সর্ব্ব প্রকার সহযোগ করিতে হইবে। বিদ্যালয়, বিচারালয় ও কাউন্সিল প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার অনুষ্ঠানের সংশ্রব ত্যাগ করিতে হইবে। তাহা হইলেই তোমরা শীঘ্র স্বরাজ পাইবে এবং সময় নির্দ্দিষ্ট হইল ১৯২১ ইং ৩১শে ডিসেম্বর।

বঙ্গ ভঙ্গের প্রকাশ্য আন্দোলন, তদুপলক্ষে প্রতিপক্ষের প্রকাশ্য যজ্ঞ ভঙ্গ, চালবাজী, ভেদ নীতির অনুসরণ প্রভৃতির ফলে নিজের অবস্থা বিশেষ বুঝিতে পারিয়া স্বরাজের পথে অগ্রসর হইতে জনসাধারণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। কিন্তু তখনও ভয় পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল বলিয়া বিরোধপন্থী সেবকদলের সঙ্গে প্রকাশ্য সহানুভূতি করিতে দেশবাসী সাহসী হইল না। বাধ্য হইয়া বিরোধপন্থীদের বিপ্লবের পথ অনুসরণ করিতে হইল। বিপক্ষও দমননীতির অনুসরণ করিয়া নবোত্থিত দলটাকে সমূলে ধ্বংস করিতে কৃতসংকল্প হইল। বৎসরের পর বৎসরব্যাপী সন্তানদলের উপর অমানুষিক অত্যাচার চলিল। সে অত্যাচারে দেশবাসী বিচলিত হইল। জনসাধারণের অন্তর দাবাগ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। দেশবাসী স্পষ্ট বুঝিতে পারিল ইহার একমাত্র প্রতিকার স্বরাজ স্বাধীনতা। প্রকাশ্যে যদিও ইহারা সেবকদলের সহিত যোগ দিতে পারিল না, ইহাদের মনে স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা তীব্র ভাবে জ্বলিয়া উঠিল।

মহাত্মা-নির্দ্দিষ্ট পথ শান্তির পথ দেখিয়া তাঁহাদের মনের আকাঙ্ক্ষা লইয়া তাঁহারা ঝাঁপাইয়া পড়িলেন! দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রতিপক্ষের ক্ষীণ বাধা স্রোতের প্রবল বেগের সম্মুখে ভাসিয়া গেল। ইং ১৯২১ নবেম্বর মাসে প্রতিপক্ষ ১৯০৮ সালের তৈয়ারী সন্তান-দলনী আইনের (ফৌজদারী সংশোধন আইন ১৯০৮) ব্যবহার করিতে যাইয়া দেশের ছোট বড় সমস্ত কর্ম্মীদের জেলে আবদ্ধ করিল বটে কিন্তু আন্দোলন নূতন আকার ধারণ করিল। রমণীরা অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া পতি, পুত্র ও ভ্রাতাদের শূন্য স্থান পূর্ণ করিলেন। আদ্যাশক্তি মহামায়া তাঁহার অংশ-সম্ভূত রমণীগণের পশ্চাতে তাঁহার দানবদলনী শক্তি লইয়া অলক্ষিতে দাঁড়াইয়া শক্তি সঞ্চার করিতে লাগিলেন। আর্য্যরমণীদের সাধনার ফলে রমণীগণ দৈত্যদলের সমস্ত বাধাকে অগ্রাহ্য করিয়া পদে পদে জয়ী হইতে লাগিল। কলেজ-স্কোয়ার, মির্জ্জাপুর ও ওয়েলিংটন স্কোয়ার, হরিশ পার্ক ও রসারোড় মাঠ প্রভৃতি স্থানে বিপক্ষদল কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত ও নিষ্পেষিত রমণীদল চালিত বালক ও যুবকবৃন্দের শৌর্য্য, বীর্য্য, সহিষ্ণুতা, ধৃতি ও দৃঢ়তার সে দৃশ্য ও স্মৃতি আজও আমার চক্ষের উপর ভাসিতে ভাসিতে শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে রক্তপ্রবাহ ছুটাইয়া দেয়। কর্ম্ম ও স্মৃতি আমার হৃদয়ে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে—ভারতকে স্বরাজ সাধনার পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে পৃথিবীতে এমন শক্তি নাই। বিশেষতঃ বাঙ্গালীজাতিকে কিছুতেই পশ্চাদপদ করিতে পারিবে না। যেদিন দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের মোকর্দ্দমার রায় প্রকাশ হওয়ার কথা সেদিন সভা-বন্ধের সার্কুলারের শেষ দিন অতীত হওয়ার কথা ছিল। সেদিন কোন প্রকার শোভাযাত্রা বা সভাবন্ধ করার জন্য প্রতিপক্ষ সমগ্র কলিকাতায় রক্তগঙ্গা বহাইতে প্রস্তুত, তাহা জানিয়া শুনিয়াও আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় ৪০ হাজার লোক শোভা-যাত্রা ও সভা করিতে প্রস্তুত হইয়া সময়ের অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময়ে তড়িতবার্ত্তা বার্দ্দলী হইতে ওয়ার্কিংকমিটীর সিদ্ধান্ত মহাত্মার আদেশ সহ প্রচার করিল "সর্ব্ব প্রকার অগ্রগমন বন্ধ।" বাঙ্গালীর ভাবের জোয়ারে ভাটা পড়িল, পতির সঙ্গে তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিয়া বাঙ্গালীর ভাব ও স্বভাব কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া আমার বিশ্বাস। তাই অসুস্থ শরীরেও ছুটিয়া গিয়া চট্টগ্রাম প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশনে বঙ্গ-ভঙ্গ হইতে তৎকালীন সময় পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলী স্মরণ করাইয়া দিয়া অবলার কাতর ক্রন্দন প্রতিনিধিবর্গের গোচর করিয়াছিলাম। বুঝাইয়া-ছিলাম আফিংএর নেশার মত ভাবের ঘোরে বিভোর বাঙ্গালীজাতিকে ঘুমাইতে দেওয়া সঙ্গত নহে; বলিয়াছিলাম স্থানে স্থানে আইনঅমান্য করিয়া সংঘর্ষ জাগাইয়া রাখ, বিপক্ষকে বিব্রত রাখ, নতুবা ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। প্রতিনিধিরা প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু জেলের বাহিরে নেতারা ইহা বাতুলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিলেন।

দেশবন্ধু প্রমুখ নেতারা বাহির হইয়া দেখিলেন দেশ ঘোর নিদ্রাগ্রস্ত। আইন ব্যবসায়ী যাঁহারা ব্যবসা ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই ফিরিয়া গিয়াছেন, স্কুলকলেজের শূন্য গৃহগুলি পুনরায় ছাত্রপূর্ণ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় বিদ্যালয়গুলি শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, মামলা মোকর্দ্দমা পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। স্থানে স্থানে কংগ্রেস আফিসগুলি বন্ধ হইতেছে। একনিষ্ঠ কর্ম্মীরা অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে কোন প্রকারে প্রতিষ্ঠান-গুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। মুষ্টিমেয় কর্ম্মীমাত্র কর্ম্মস্থলে রহিয়াছে। তাই তিনি কাউন্সিল হইতে আরম্ভ করিয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতি প্রতিপক্ষের সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি আক্রমণ করিয়া প্রতিপক্ষকে বিব্রত রাখিতে ও তদুপলক্ষে দেশবাসীকে জাগাইতে ইচ্ছা করিলেন এবং সে জন্যই ঐ মর্ম্মে এক প্রোগ্রাম

খাড়া করিলেন। গয়া কংগ্রেসে তিনি তাঁহার প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। মেজরটী কর্ত্তৃক তাহা অগ্রাহ্য হইল। নেতাগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। প্রতিপক্ষ সচকিতে সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেশবন্ধু যতই তাঁহার যুক্তির সারবত্তা দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন, ততই দিনের পর দিন দেশবাসী তাঁহার পতাকামূলে একত্রিত হইতে লাগিল। প্রতিপক্ষও দমননীতির সাহায্য লইতে প্রস্তুত হইতে থাকিলেন। ১৯১৫ সালের ভারত রক্ষা আইন ও ১৮১৮ সালের ৩ আইনের সাহায্যে তখনকার নিষ্পেষণের প্রধান নেতা মিঃ টেগার্টকে আমদানী করিলেন। ঋতুরাজ যেমন মলয় পবন, কোকিল, দোয়েল সঙ্গে করিয়া আসেন, মিঃ টেগার্টও তেমনি সাঙ্গপাঙ্গ সঙ্গে লইয়া ১৮১৮ সালের ৩ আইন সহ পুনরায় ভারত আকাশে উদিত হইলেন। (ক্রমশঃ)

পরিমল

শ্রীমতী আশালতা প্রামাণিক।

বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি তুমি পরিমল!
আত্মীয় জনের প্রতি নাহিক করুণা,
বিলাও ঐশ্বর্য্য তব স্নিগ্ধ সুবিমল
অন্য সবে, যারা নহে আপনার জনা।

কুসুমে জনম কিন্তু প্রীত নহ তাতে,
ত্যজি তারে চলি যাও দূর দূরান্তরে;
আনন্দিত গন্ধ-বহ সহ বিচরিতে,
সম্পাদিতে প্রফুল্লতা অন্যের অন্তরে।

নিঃস্বার্থ তোমায় প্রীতি জগৎ সংসারে,
নিজে ধ্বংস হও তুমি অপরের হিতে,
আরাম দানিতে কর আশ্রয় অন্যেরে,
ক্রমে ক্রমে উপভোগে মিলাও শূন্যেতে।

এইরূপ স্বার্থহীন পর উপকার—
জগতে দৃষ্টান্তহীন, অতীব বিরল;
বাক্য নাহি ভাষামধ্যে ব্যাখ্যা করিবার
স্বর্গীয় বিশুদ্ধগুণ ইহার সকল।

যত কেন চিন্তাযুক্ত থাকহ অন্তরে,
আহ্লাদিত হয় নরে তোমার পরশে,
ভুলে চিন্তা সব, মন বিমোহিত করে,
যবে নাসারন্ধ্র-পথে হৃদয়ে প্রবেশে।

মনোমুগ্ধকর তুমি অনিল-বিহারী,
অপার্থিব গুণযুক্ত স্নিগ্ধ সুশীতল,
তব সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি কত গুণধারী,
জানিতে অধম প্রাণ হয় যে ব্যাকুল।

সঙ্কলিকা

[বঙ্গে বিধবা—অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার সেন এম-এ]

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রবর্ত্তক মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর নাই যে, বিধবাদের দুঃখে দ্রবীভূত-হৃদয়ে বিধবাদের দুঃখ-কষ্ট মোচনে অগ্রণী হন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও আর নাই যে, "বিধবাবিবাহ নাটক" অভিনয় ক'রে জনমতকে এই কঠিন সামাজিক সমস্যার সমাধানকল্পে ব্রতী হইতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ আন্দোলন হয় প্রায় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে, আর কেশবচন্দ্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে এই নাটক প্রথম অভিনীত হয় চিৎপুর রোডে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। এই নাটকের অভিনয় দেখিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় এসেছিলেন। নাটকে বর্ণিত বিধবা দুঃখ-কষ্ট সহিতে অপারগ হইয়া পাপের পথে যায় এবং অবশেষে আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার হাত হইতে উদ্ধার পায়। এই সব দৃশ্য দেখিয়া কোমল-হৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশয় কেন, অন্য অনেক কঠিন-হৃদয় দর্শকদেরও দুই চোখ জলে ভরে এসেছিল। বাঙলাদেশের দুর্ভাগ্য যে, কেশবচন্দ্র সেই বৎসরেই রঙ্গমঞ্চের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন।

আজ মনে হয়—ঈশ্বরচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র দুই-জনই যদি তখন এই আন্দোলন চালাইতেন, একজন যুক্তিতর্কের সাহায্যে আর একজন করুণ-রসের সাহায্যে—তাহা হইলে আজ এই সামাজিক সমস্যা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিত না।

এই তো গেল ভূমিকা। এখন কতকগুলি কঠোর সত্যের সম্মুখীন হওয়া যাক।

বাঙলাদেশে হাজার করা স্ত্রীলোকের মধ্যে ১৭৯ জন বিধবা এবং হাজার করা পুরুষের মধ্যে বিপত্নীক হচ্ছে ৩৮ জন। ইংলণ্ডে বিপত্নীকের সংখ্যা বাঙলারই সমান, অর্থাৎ হাজারকরা ৩৮ জন, কিন্তু ইংলণ্ডে বিধবার সংখ্যা হচ্ছে হাজারকরা ৭১ জন।

এইখানেই কত তফাৎ দেখুন। ইংলণ্ডে বিধবাদের সংখ্যা হচ্ছে বিপত্নীকদের মাত্র দ্বিগুণ, কিন্তু বাঙলাদেশে বিধবা বিপত্নীকদের পাঁচগুণ বেশী। অর্থাৎ আমাদের দেশে পুরুষ প্রৌঢ়বয়সে বিপত্নীক হইলেও (বৃদ্ধ বয়সে বিপত্নীক হইয়াও পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন—৬।৭টি পুত্র কন্যা থাকিতেও, এমন দৃষ্টান্তও বিশেষ বিরল নয়) প্রায় বিবাহ করিয়া থাকেন; কিন্তু বালিকা বা যুবতী বিধবা হইলে তাহার পুনর্ব্বিবাহ হয় না। সমাজের এই একচোখো শাসনের ও আইনকানুনের বিরুদ্ধে কি আর কেহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন না?

নীচে বাঙলাদেশের হিন্দু-বিধবাদের একটি তালিকা উপস্থিত করিতেছি; তাহা ভাল করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে সমস্যা কি গুরুতর!

বয়স্ক	হাজারকরা হিন্দু-বিধবা
০—৫	১
৫—১০	৬
১০—১৫	৩৮
১৫—২০	৯৭
২০—২৫	১৫৪
২৫—৩০	২৩৬
৩০—৩৫	৩৪৩
৩৫—৪০	৪৫৫
৪০—৪৫	৫৭৮
৪৫—৫০	৬৭৭
৫০—৫৫	৭৮৩
৫৫—৬০	৮৩৬
৬০—৬৫	৮৯৫
৬৫—৭০	৮৯৮
৭০—০	৯১০
...	...

৫ বছর অবধি হাজার বালিকার মধ্যেও ১টি বিধবা! —অর্থাৎ পেট থেকে পড়েই তা'দের এক রকম বিবাহ হইয়াছে এবং তখন তখনই বিধবা হইয়াছে!

৫ হইতে ১০ বছর বয়স্ক বালিকাদের মধ্যে হাজারকরা ৬জন বিধবা; ১০ হইতে ১৫ বছর বয়স্ক বালকদের মধ্যে হাজারকরা ৩৮ জন বিধবা! হাজারে সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে।

নীচের তালিকাটী মূক হইলেও কি নিদারুণ কাহিনীই না বহন করিতেছে। এই তালিকাটী যুবতী-বিধবাদের তালিকা -

বয়স্ক	হাজারকরা বিধবা
১৫—২০	৯৩
২০—২৫	১৫৪
২৫—৩০	২৩৬
৩০—৩৫	৩৪১

অর্থাৎ ২০—২৫ বয়স্ক যুবতীদের প্রতি ৬৭ জনের মধ্যেই একজন বিধবা, ২৫—৩০ বয়স্ক যুবতীদের প্রতি ৪ জনের মধ্যে ১ জন, এবং ৩০—৩৫ বয়স্কদের প্রতি ৩ জনের মধ্যে ১ জন বিধবা! ইহার সম্বন্ধে কোনরূপ টীকা নিষ্প্রয়োজন।

আরও দেখুন—প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকদের অর্দ্ধেকের বেশী সংখ্যার সিঁথের সিন্দুর ও হাতে লোহা পরিবার সৌভাগ্য নাই!

সমাজ সংস্কারকদল এ সমস্যা বিষয়ে খুবই চিন্তা করুন এবং ইহার সমাধানকল্পে কোন কার্য্যপ্রণালীর অবতারণা করুন। সমস্যা যে কি গুরুতর, তাহাই সকলের সামনে উপস্থিত করুন।

(২)

বাঙলাদেশে ২৫—৩০ বৎসর বয়স্কা হিন্দু-যুবতীদের প্রতি ৪ জনের মধ্যে ১ জন বিধবা এবং ৩০—৩৫ বৎসর বয়স্কা হিন্দু-যুবতীর প্রতি ৩ জনের মধ্যে ১ জন বিধবা। কিন্তু ঐরূপ বয়স্কা মুসলমান-যুবতীদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে ১ জন এবং প্রতি ৫ জনের মধ্যে ১ জন বিধবা। অর্থাৎ

বয়স্কা	হিন্দু-বিধবা (হাজারকরা)	মুসলমান-বিধবা (হাজারকরা)
২৫—৩০	২৩৬	১০৫
৩০—৩৫	৩৪৩	১৬৬

২৫—৩০ বৎসর বয়সে হাজারকরা যত মুসলমান যুবতী বিধবা আছে, হিন্দু বিধবা তাহার দ্বিগুণেরও বেশী—কিন্তু ৩০।৩৫ বৎসর বয়সে হিন্দু-বিধবার সংখ্যা দ্বিগুণের কম। অর্থাৎ ২৫।৩০ বৎসর বয়স্কা অনেক মুসলমান যুবতী স্বামী হারাইলে পুনরায় বিবাহ করে কিন্তু ৩০।৩৫ বৎসর বয়সে বিধবা হইলে, সেই অনুপাতে পুনরায় বিবাহ করে না।

মুসলমান-বালিকা বিধবারা হিন্দু-বালিকা-বিধবার তুলনায় যে অনেকে আবার বিবাহ করে, তাহার প্রমাণ নীচের তালিকা হইতে বুঝা যায়—

বয়স্কা	হিন্দু	মুসলমান
১০—১৫	৩৮	১৮
১৫—২০	৯৪	৪১

অর্থাৎ ১০—১৫ বৎসর বয়স্কা হিন্দু-বালিকাদের মধ্যে হাজারকরা যেখানে ৩৮ জন বিধবা—সেখানে ঐ বয়স্কা মুসলমান-বালিকা-বিধবার সংখ্যা হাজারকরা ১৮,—হিন্দুর তুলনায় অর্দ্ধেকেরও কম। ১৫—২০ বৎসর সম্বন্ধেও ঐ একই কথা—অর্থাৎ অর্দ্ধেকেরও কম। ২০।২৫ বৎসর বয়সের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, হিন্দু-বিধবা প্রায় ৩ গুণ বেশী। হাজারকরা সংখ্যা হইল যথাক্রমে ১৪৫ ও ৬১।

এইবার বাঙলার হিন্দু-বিধবার অনুপাত-সংখ্যার সহিত ইংলণ্ডের বিধবার অনুপাত-সংখ্যার তুলনা করা যাক্—

[হাজারকরা হিসাব ধরা হইয়াছে]

বয়স্কা	হিন্দু বিধবা	ইংরেজ বিধবা
০—৫	১	০
৫—১০	৬	০
১০—১৫	৩৮	০
১৫—২০	৯৪	০
২০—২৫	১৫৪	১
২৫—৩০	১৩৬	৮
৩০—৩৫	৩৪২	১৯
৩৫—৪০	৪৫৫	৩৮
৪০—৪৫	৫৭৮	৬৬
৪৫—৫০	৬৭৭	১০৭
৫০—৫৫	৭৮৩	১৬৫
৫৫—৬০	৮৩৬	২৪১
৬০—৬৫	৮৯৫	৩৩৮
৬৫—৭০	৮৯৮	৪৫৬
৭০—*	৯১০	৫৮০

হিন্দু-বিধবা ও ইংরেজ-বিধবার সংখ্যার তুলনায় আকাশ পাতাল তফাৎ। ২০ বছর পর্য্যন্ত হাজার-করা একজন কি আধজন ইংরেজ-বালিকাও বিধবা নয়—তার কারণ, ইংরেজ-বালিকার বিবাহ কিছু দেরীতে হয় এবং ২০ বছরের মধ্যে বিধবা হইলেও পুনর্ব্বিবাহ করিয়া থাকে।

২০-২৫ বছর বয়স্ক হিন্দু-বিধবা ও ইংরেজ-বিধবার সংখ্যায় তফাৎটা কতদূর, তা' লক্ষ্য করুন। হাজারকরা যেখানে ১ জন মাত্র ইংরেজ-বিধবা, সেখানে ২০—২৫ বৎসর বয়স্কা হিন্দু-বিধবার সংখ্যা হাজারকরা তার ১৫০ গুণের বেশী। ভাবুন কি অবস্থা! প্রতি ৫ বছরের পাশাপাশি দুইটী হিসাব তুলনা করিলে ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ৩৫—৪০ বৎসর বয়সে হাজারকরা ইংরেজ-বিধবা যত আছে, হিন্দু-বিধবা হাজারকরা তার ১২ গুণ। ইংরেজ-বিধবার সংখ্যা এত যে কম, তার দুইটী কারণ—১। পুনর্ব্বিবাহ। ২। স্বামী দীর্ঘজীবি। আর আমাদের বঙ্গীয় হিন্দু-বিধবাদের ঐ দুইটী জিনিষেরই অভাব। উপরন্তু "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা"।

বালিকা ও যুবতী হিন্দু-বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহ দেওয়া সম্বন্ধে কোন যুক্তি তর্কের অবতারণা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। তবে দু'একটী কথা বলিলে বোধ হয় বিশেষ দোষের হইবে না। প্রথমে সমাজের তরফ থেকে দেখা যা'ক—বাঙলাদেশে হিন্দু বালিকা ও যুবতী বিধবাদের সংখ্যা এত বেশী বলিয়া হিন্দুদের সংখ্যা তেমন বাড়িতে পারিতেছে না। বাঙলায় মুসলমানেরা অনেক বাড়িয়া চলিয়াছে। আবার যুবতী-বিধবার সংখ্যাধিক্য হইতে সামাজিক দুর্নীতির সৃষ্টি হইয়া থাকে, পুনর্ব্বিবাহ হইলে এই সব দুর্নীতি বহুল পরিমাণে কাটিয়া যায়।

হিন্দু বালিকা ও যুবতী বিধবারা মানুষ—তাদেরও মন আছে, প্রাণ আছে, দেহ আছে, তাদেরও নানারূপ দৈহিক ও মানসিক আকাঙ্খা আছে, তাদেরও মনে পৃথিবীর আর পাঁচজনের মত জীবনযাপন করিবার অভিলাষ আছে;—তাদেরও হয়ত মনে হয়—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে, মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

(উপাসনা)

নূতন অতিথি

বন্দে আলি মিয়া।

গ্রহ তারা দেখে সে কোন্ পাঁজির
লক্ষ্যহারা যাত্রা করার পথে,
গৃহে আমার অতিথ্ কী তুই হাজির
প্রতীক্ষাহীন লুপ্ত মনের রথে?
বস্ত্রহারা দিগম্বরের বেশে
বক্ষে যদি দেখা দিলেই এসে
সাপ্‌টে তোমায় রাখ্‌ব ধরে আজি
বিদায় নাহি দেবো কোনোই মতে।

কোথায় তোমার দেশটি নাহি চিনি
নামটি তোমার অজান্ আমার কাছে,
শোভায় বুঝি মোদের এদেশ জিনি,
সেথায় কি বাপ্ মুক্তা ফলে গাছে?
গল্পে শোনায় সেই কি মায়াপুরী,
রাত্রি দিবস নাচ্‌চে বুঝি হুরী,
তুই কি তাদের রাঙা হাসির কণা,
অশ্রু ধারার মুক্তা সে চোখ্ হতে?

দেবীর দান

(গল্প)

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ।

"দুটি খেতে পাই মা!"—বলিয়া একজন আধা-বয়সী ভিখারিণী—তাহাকে দেখিলে নেহাৎ ছোট ঘরের মেয়ে বলিয়া মনে হয় না—চাটুয্যেদের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। সেদিন জগদ্ধাত্রী পূজা—চাটুয্যেদের বাড়ীর চার পাঁচখানা বাড়ার পরের একখানা বাড়ীতে 'দেবী' আসিয়াছেন, 'সন্ধ্যাপূজার' আর বেশী দেরী নাই, এখনি বাজনা বাজিয়া উঠিবে সুতরাং পাড়ার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পূজা দেখিবে ও বাজনা শুনিবে বলিয়া বাড়ীর অঙ্গনে জড় হইয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ একদৃষ্টে প্রতিমার পানে চাহিয়া আছে—কেহ কেহ আনন্দে করতালি দিতেছে—কেহ কেহ বা হেথা হোথা ছুটাছুটি করিতেছে। কত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিয়া 'ঘোষ' মহাশয়ের বাড়ীর বৈঠকখানায় সমবেত হইতেছেন, তাঁহাদের দস্তুরমত আদর আপ্যায়ন চলিতেছে—কত ভিখারী ভিখারিণী প্রাসাদ-দ্বারে জটলা পাকাইতেছেও পাঁড়েজী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত কভু বা বিতাড়িত হইতেছে। আদর-অভ্যর্থনাপ্রাপ্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মুখে একটা তৃপ্তি ও আনন্দের হাসি—আর বুভুক্ষা-পীড়িত ও নির্য্যাতিত ভিখারী ভিখারিণীদের মুখে একটা অশান্তি, কষ্ট ও নৈরাশের অভিব্যঞ্জনা! ঘোষ মহাশয়ের বিপুল প্রাসাদ আজ আনন্দ-কোলাহলে কলকলায়মান, আর হয়ত আজ তাঁহারি কোন প্রতিবেশীর ক্ষুদ্র কুটীর গভীর বিষাদে সমাচ্ছন্ন—নীরব নিথর! কেহ আজ ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত, কেহ বা অনাহারে মুহ্যমান! জগতে সাম্য কোথায়?

যাহাহউক চাটুয্যেদের বাড়ীর একজন বর্ষীয়সী রমণী বাহির হইয়া উত্তর করিলেন—"আজ ফিরতে হবে মা, চাল বাড়ন্ত।"

ভিখারিণী বর্ষীয়সীকে দেখিয়াই একটু হাসিয়া অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কি মা, ভাল আছেন ত?" তারপর কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া বলিল "আচ্ছা মা, আমি কখনও এ বাড়ী থেকে শুধু হাতে ফিরিনি, বরঞ্চ এ বাড়ীতে যা পেয়েচি অপর বাড়ীতে তা কখনো পাব না, কিন্তু মা আজ কমাস হতে চলল—যখনই এখানে আসি—প্রায়ই শুনি 'চাল বাড়ন্ত';—বল দেখি মা কি হয়েচে?"

বর্ষীয়সীর চক্ষে জল আসিল। তিনি বলিতে লাগিলেন "কি বলব মা, আমার যেমন পোড়া কপাল! এই সেদিন কর্ত্তা হঠাৎ মারা গেলেন—যাহোক বড় ছেলেটী কাজকর্ম্ম করে' বেশ দু'পয়সা আনছিল কিন্তু ক'মাস হলো তারও কাজ গেছে—এত চেষ্টা করচে, তবুও কাজ পাচ্ছে না। আর অন্যান্য ছেলেদের কথা ছেড়ে দাও মা, তারা আমার পেটের হলেও নেহাৎ হতভাগা, এতদিন কিছু করলেনা—ভাল লেখাপড়াও শেখেনি, এখন আর করবে কি?, তারওপর যে দিনকাল পড়েচে! এ ছাড়া বিপদের ওপর বিপদ মা! বড় ছেলের বড় মেয়েটি আজ প্রায় ১৫ দিন হলো মারা গেছে—ছেলেটা ঐ শোকে পাগল—ঐ ক'দিন বিছানাতেই পড়ে আছে, আর কেবলি কাঁদচে—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া চুপ করিলেন। তারপর অঞ্চলে আর্দ্র চক্ষু মুছিয়া আবার বলিতে লাগিলেন "কি বলব মা দুঃখের কথা—সাধে কি 'চাল বাড়ন্ত'

বলতে হয়! আজ দুদিন থেকে এই আমাদের ৬।৭টি প্রাণীর পেটে একটা দানা পর্য্যন্ত যায়নি। মা জগদ্ধাত্রী আজকের দিনে কত জনকে দয়া করছেন, কেবল আমাদের ক'টিকে উপবাসে রেখেছেন —সকলি তাঁর ইচ্ছা মা!"

এই ভদ্র পরিবারের অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কাহিনী শুনিয়া ভিখারিণীর চক্ষে জল আসিল, এবং বর্ষীয়সীর দুঃখে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ও একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে যেন গম্ভীর হইয়া কি ভাবিতে লাগিল। হয়ত নিজেরই অদৃষ্ট বিষয়ে চিন্তা করিতেছিল—কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই ভিখারিণী সাধারণ ভিখারিণী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। অবশেষে যেন কিছু ইতস্তত করিয়া একেবারে বর্ষীয়সীর হাত দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "মা, আমার একটা কথা রাখ্‌তে হবে মা, আমি মা তোমার পেটের মেয়ে—আজ এই গরীব মেয়ের সামান্য কিছু দান নিতে হবে মা"—এই না বলেই সে তার কাপড়ের ভিতর হইতে মস্ত একটা পুঁটুলি বাহির করিল এবং তাহার মধ্য হইতে চাল, আলু, পটল ও কিছু পয়সা—অর্থাৎ যা' কিছু সে ভিক্ষা করিয়া পাইয়াছিল তৎ-সমুদয়ই ভূমিতে ঢালিয়া দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল "নিতে হবে মা, নইলে আমি আত্মহত্যা করব। আর আমিও মা অজাতের মেয়ে নই—কপালের দোষে আজ আমার এই দশা।"

বর্ষীয়সী কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ও তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অবিরলধারে অশ্রু গড়াইতে লাগিল। তাঁহার নয়নে কেবলই প্রতিভাত হইতে লাগিল যেন দেবী জগদ্ধাত্রী—তাঁহাদের দুঃখে কাতরা হইয়া আজ এই ভিখারিণী মূর্ত্তিতে স্বয়ং তাঁহাদেরই দ্বারে আসিয়া অন্ন বিতরণ করিতেছেন। এই সময়ে পূজাবাড়ী হইতে সন্ধ্যাপূজার বাজনা খুব জোরে বাজিয়া উঠিল।

মা

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার।

তীর্থ ও দেবতা কোথা চিনিলাম না ত;
মনোমত শান্তি কোথা না পাইনু মাতঃ।

তুমি ত দেবতা মোর আরাধ্য ধরায়,
মহাতীর্থ সেই-স্থান রাখ মা যথায়।
সাধনা তপস্যা মাগো কি ফল প্রদানে?
সর্ব্বফলদাত্রী তুমি, পদরেণু দানে
ধন্য কর এ জীবন—হউক সফল,
কঠোর সন্ন্যাসধর্ম্মে আছে কিগো ফল?
ইহকাল পরকালে যা নামে যে সুধা,
হরে মম জীবনের পাপ তাপ ক্ষুধা।

মূর্ত্তিমতী ভগবতী গৃহেতে আমার,
উপাসনা বল মাতঃ করি আর কার?
জন্মভূমি মহাতীর্থ,—শ্রেষ্ঠ স্বর্গ হ'তে,
এ হেন পবিত্র তীর্থ আছে কি ভারতে?
পাতার কুটীর নহে ও মাতৃ-মন্দির,
মুক্তি সেথা বিরাজিতা অভাগা বন্দীর,
মন্দির-প্রাঙ্গনে আজি নামাইয়া ভার,
আত্ম-নিবেদন করি চরণে তোমার।

শিশু-মঙ্গল

শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু।

আজকাল প্রায় সকল মাসিকপত্রিকা গুলিতেই শিশুমৃত্যু-সংখ্যার হিসাব বাহির হইতেছে,—তাহা পাঠ করিয়া সত্যই মাতৃ-হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠে। ইহার প্রতীকারের উপায় অনেকেই অনেকরূপে লিখিতেছেন। কেহ বলেন--বাল্য মাতৃত্ব, কেহ বলেন—ঠাকুরমা ও দিদিমাদের অজ্ঞতা, মূর্খতা, কেহ কেহ বলেন পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, সংকীর্ণ স্থানে বসবাস ও মুক্ত বাতাসের অভাব, ইত্যাদি।

আমার মনে হয় ঐ কারণগুলি যথেষ্ট নহে, আরও কারণ আছে। পুরুষ ও নারীর শারীরিক সুস্থতায় বলিষ্ঠ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে সদ্যজাত সন্তান বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়, কিন্তু তাহাকে ঠিকমত পালন করিতে না জানায় সন্তানটী জন্মগ্রহণের মাসখানেক পরেই রুগ্ন হইয়া পড়িতে থাকে। প্রথম পিতামাতা অনেক স্থানেই তাদের কিরূপ যত্নে রাখিতে হয় জানেন না, যাঁহারা তাহাদের অভিভাবক তাঁহারা তাহাদের রীতিমত শিক্ষা দেন না,—কি করিতে হয় বা না করিতে হয় কেবল পুস্তক পাঠে তাহা জানা যায় না। যাঁহারা অনেকগুলি সন্তান পালন করিয়া প্রাচীনা হইয়াছেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে গ্রহণীয়। তাঁহারা যাহা শিক্ষা দিতে পারেন, পুস্তক হইতে তাহা পাওয়া যায় না।

প্রাচীনা মহিলাগণ যদি যত্ন করিয়া স্বাস্থ্য পত্রিকাগুলি পড়িয়া ও ডাক্তারদিগের মতামত জানিয়া নাতিনাতিনীদের, পরিচর্য্যার ভার লন, বা বধূ কন্যাদের শিক্ষা দেন, তাহা হইলে তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, ও আধুনিক স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি, এই দুইটি মিলাইয়া আরও ভালরূপে শিক্ষা দিতে পারেন।

সেই মান্ধাতার আমলে আমি যাহা দেখিয়াছি শুনিয়াছি, করিয়াছি এখনও তাহাই করিব, এরূপ বলিলে আর চলে কৈ? দিন দিন স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সকল বিষয়েই করিয়া লইতে হইবে।

সূতিকাগৃহে এখন আর আগুন জ্বালাইয়া সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া কেহ রাখে না, তাহার অপকারিতা সকলেরই জানা উচিত। যদি কেহ স্বেচ্ছায় করেন, তাহার ফল ভুগিতেই হয়। শিশু জন্মাইবার পরক্ষণেই তাহাকে স্নান করাইতে হয় ইহা সকলেই জানেন ও করেন—কিন্তু প্রতিদিন যে তাহাকে উত্তমরূপে স্নান করাইতে হয়, তাহা অনেকে জানিয়াও করান না। অন্ততঃ ৮—১০ দিন শিশুর প্রতিদিন স্নানের অত্যন্ত দরকার। (পরে না করিলেও চলে) এবং সে স্নান—বেসম গুলিয়া, বা সাবান ও তৈল দিয়া খুব ভালরূপে করাইতে হয়, তাহা না করিলে গর্ভের ময়লা তাহার গাত্রে থাকিয়া যায় এবং তাহাতে নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ হয়। "মাসী পিসী" বলিয়া একপ্রকার শিশুরোগ আছে, তাহা এই কারণেই হইয়া থাকে। যদি এ বিষয়ে প্রাচীনাদের জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা উত্তর দেন, "ওরকম সব ছেলেদেরই হয়ে থাকে, তাতে কি ক্ষতি হয়?" কিন্তু কেন হয়, এবং কি করিলে না হয়, তাহা জানিবার আবশ্যক কেহই মনে করেন না।

এইরূপে প্রত্যেক বিষয়ে যদি আমাদের দেশের শিক্ষিতা ভাবী মাতাগণ দৃষ্টি না রাখেন ও প্রাচীনাদের মতেই শিক্ষিত পাইতে থাকেন, শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িবে বই কমিবে না।

বালিকা-জননীর সংখ্যাই বেশী, সেই বালিকা-

দিগকে প্রতিদিনের, সপ্তাহের ও মাসিকের স্বাস্থ্য পত্রিকাগুলি পাঠ করিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু সেইগুলি কয়জন রমণী পাঠ করেন?—দেখিতে পাই যত নভেল ও গল্পের পুস্তক, তাহাদের বিছানার পাশে বা টেবিলে প্রায়ই থাকে, যাহা পড়িলে মানসিক কোন উন্নতি হয় না, অবনতিই হইয়া থাকে।

মাতার দায়িত্ব কত অধিক—যাঁহারা মাতা হইয়াছেন তাঁহারা বলিতে পারেন। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বলেন এবং যাঁহারা শিশুচরিত্র অধ্যয়ন করেন তাঁহারাও বলেন যে, শিশু যখন গর্ভে থাকে, তখন মাতা যে ভাবাপন্ন থাকেন শিশুর মন ঠিক সেইভাবেই গঠিত হইয়া যায়। মাতা যদি সেই সময় দেবদ্বিজে ভক্তিভাবাপন্ন হন অর্থাৎ পূজাঅর্চনাদি বেশী করিয়া করেন, নিত্যপূজা সন্ধ্যা বন্দনাদি নিয়মিতরূপে করিতে থাকেন—প্রায়ই দেখা যায় ভবিষ্যতে ঐ ছেলেটী সেই ভাব কিছু কিছু লাভ করে। যাহার মাতা বেশী সাংসারিক ভাবাপন্ন, ও উগ্রস্বভাব বা ক্রোধযুক্ত হন সেই শিশু ভবিষ্যতে প্রায় সেই স্বভাব প্রাপ্ত হয়—বদরাগী হয়। সেই জন্য প্রায়ই দেখা যায়—৮।১০টী সন্তানের মধ্যে একটী মাত্র সাধু হইয়াছে, মাতার সাধু-প্রকৃতি লাভ করিয়াছে। যেমন রুগ্ন মাতার রুগ্ন সন্তান জন্মে—তেমনি শান্ত ধীর স্বভাবযুক্ত মাতার সন্তানও সেইরূপ হয়।

মনকে সাধুভাবাপন্ন রাখিয়া, স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যাঁহারা দাম্পত্যধর্ম্ম পালন করেন—সেই গৃহেই একটী একটী সাধু বীর সন্তান জন্মলাভ করিয়া কুলকে পবিত্র করে, দেশকে ধন্য করে।

এখানে বলা দরকার, শিক্ষিত বয়স্ক পিতা ও শিক্ষিতা বয়স্কা মাতা না হইলে এই সকল বিষয়ে যে দৃষ্টি রাখিতে হয়, তাহা জানিবেন না ও করিতে পারিবেন না। গর্ভস্থ সন্তানের কিসে হিত হইবে, এবং জন্মিলে পরে তাহাকে কিরূপ শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ সবল করিতে হইবে, এ সকল বিষয় পিতা ও মাতা পরস্পর মিলিত হইয়া পরামর্শ করিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। ডাক্তারদের পরামর্শ-মত চলাও ভাল। এইরূপ করিলে শিশুগণের অকাল মৃত্যু নিবারণ হইবে বলিয়া মনে হয়।

শিশুমৃত্যু-সংখ্যার আধিক্য দেখিয়া এখনও কি বঙ্গসমাজ এদিকে দৃষ্টি দিবেন না? যদি না দেন, বঙ্গীয় সমাজের শোচনীয় পরিণাম অবশ্যম্ভাবী।

মাতৃ-মন্দিরে

শ্রীমতী বেলা গুহ।

মন্দিরে আজ গভীর ছন্দে
বোধন-শঙ্খ বাজে,
কি নব চেতনা-সুখ-তরঙ্গ
বহিছে বিশ্ব-মাঝে।
চির শোভাময় এ শুভ লগন
মুখরিত আজ প্রভাত গগন
কুসুম-গন্ধে ভুবন মগন—
ধরণী শোভন সাজে।

লক্ষ ধারায় বিশ্ব-মাঝারে
ঝরিছে শান্তি-ধারা,
আয় তোরা আয় বেদনা-ব্যথিত
পিয়ে নে' আত্ম-হারা।
মান-অভিমান আজি যাও ভুলি,
পতিতেরে বুকে লহ স্নেহে তুলি;
গোপন মরম দাও আজি খুলি'
থেকনা অন্ধ লাজে।

মাতৃ-মন্দির



উমার তপস্যা

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্র হইতে

মাতৃমন্দির

২য় বর্ষ | ফাল্গুন—১৩৩১ | ১১শ সংখ্যা

নারী

শ্রীসরোজকুমার সেন।

আমি নারী—
মরমের ব্যথা কহিতে আজিকে চক্ষে ঝরিছে বারি।
পুরুষের দ্বারে নহি' তো ভিখারী নহি' শুধু সেবা-দাসী,
লালসার লেহা যে জন করিছে তারে নাহি ভালবাসি;
কামের সুরায় ফেণায়িত সদা মদির-বাসনা যেথা—
প্রেম-দেউলের রুদ্ধ দুয়ার খুলিবেনা কভু সেথা।

আমি নারী—
মমতায় মোর প্রাণ গলে যায়,—অশ্রু রুধিতে নারি।
বিশ্ব দেবের অতুলন রূপে বিভূষিতা নারী আমি,
গগনের থালে আমারি আরতি হের গো দিবস-যামী;
সৃষ্টিরে আমি প্রাণ দিয়া রাখি—সৃষ্টি আমারি হেতু—
নিখিল জগতে দিকে দিকে উড়ে আমারি বিজয়-কেতু।
অলকা-বিলাস কুঞ্জবিতানে জাগিছে আমারি ছবি—
মানসী-প্রিয়ার অর্ঘ্য রচিয়া আমারে পূজিছে কবি।

আমি নারী—
বক্ষে আমার স্নেহ-সুধা ঢালা, কক্ষে প্রেমের ঝারি।

বাঁকুড়া জেলা সম্মিলনীর সভানেত্রীর অভিভাষণ

শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার।

(১৯২৪)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে দেশবাসী প্রস্তাব পাশ করিয়া দেশবন্ধুর কর্ম্মের পথের বাধা উঠাইয়া দিল। কর্ম্মবীর দেশবন্ধু তাঁহার ধৃতিবলে সূর্য্যোদয়ে কুয়াশার ন্যায় ভিতরের ও বাহিরের সমস্ত বাধা বিধ্বস্ত করিয়া কর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইলেন। দেশে পুনরায় কর্ম্মস্রোত বহিল। দেশবন্ধু ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন আজ তাহা বর্ণে বর্ণে ফলাইয়া ইংরেজের শাসনযন্ত্র অচল করিয়াছেন। কলিকাতার কর্পোরেশন দখল করিয়া রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র সবাইকে এক পতাকামূলে সমবেত করিয়াছেন, ভারতকে সমস্ত পৃথিবীর লক্ষ্যস্থল করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আজ ইংরেজের দেশেরও স্বাধীনতাবাদী দলের (কমিউনিষ্ট) পক্ষ হইতে ঐ দলের সম্পাদক মিঃ ইঙ্কস্পিন্ সাহেব মহোদয় দেশবন্ধুকে অভিনন্দন করিতে যাইয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন "গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিষ্ট দল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত ভারতবাসীর তুমুল সংগ্রাম সহানুভূতি সহকারে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। ইহারা স্বরাজ্যদল কর্ত্তৃক মন্ত্রীদের বেতন অগ্রাহ্য করার কার্য্যে বিশেষ ফল উপলব্ধি করিতেছে। এই দল অনুরোধ করিতেছে যে সংগঠন কার্য্য দ্বারা কর্ম্মী ও প্রজাসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করার উপর আপনাদের কৃতকার্য্যতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই কার্য্যে কমিউনিষ্ট দল আপনাদের যথেষ্ট সাহায্য করিবে।"

দেশবন্ধু কর্ত্তৃক পরিচালিত স্বরাজ্যদল তাঁহাদের ঘোষণার প্রথম অধ্যায়কে সম্পূর্ণ সফল করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে পদার্পণ করিতেছেন। তাঁহারা আজ সংগঠন কার্য্য দ্বারা দেশকে সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মে নিয়োগ করিতে প্রস্তুত। বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা দেশকে প্রস্তুত করিয়া সংগঠন কার্য্য আরম্ভ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অপর দিকে অসুস্থ অবস্থা লইয়া ও জীবনকে বিপন্ন করিয়া মহাত্মা গান্ধী অপরিবর্ত্তনপন্থীদলকে বিশেষ ভাবে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। বাংলায়ও অপরিবর্ত্তনপন্থী ভ্রাতারা চরকা-প্রদর্শনী ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা দেশকে প্রস্তুত করিতে ব্রতী হইয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত অপরিবর্ত্তনপন্থী দলের প্রোগ্রাম :—

(১) হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একতা স্থাপন।

(২) অস্পৃশ্যতা নিবারণ।

(৩) চরকা ও খদ্দর।

স্বরাজ্যদল ইহার বাহিরে আরও কিছু করিতে চান। তাঁহারা একদিকে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া তাহাদের অধিকৃত প্রতিষ্ঠানগুলি দখলপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিব্রত রাখিয়া নির্ব্বিঘ্নে মহাত্মা-নির্দ্দিষ্ট কার্য্যগুলি করিতে চান এবং বিলাতী বর্জ্জন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা দেশে উদ্যম ও উৎসাহ আনয়নপূর্ব্বক দেশকে প্রস্তুত করিয়া সংগঠন কার্য্যে ব্রতী হইতে চান। বর্ত্তমানে এই দুই দলে বিরোধ দেখা যায় না। অপরিবর্ত্তনপন্থীদের বিশেষ আপত্তি

ছিল কাউন্সিল গমনে, স্বরাজ্যদল তাহা ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। বাকী বিষয়ে উভয় দলের একই মত। কাজেই এই উভয় দলের এখন একত্র হইয়া কার্য্য করিতে দৃষ্টতঃ কোন বাধা দেখা যায় না। কিন্তু ইতিমধ্যে বিরোধপন্থী বিপ্লববাদী দলের একটু তৎপরতা দেখা যাইতেছে। তাহাতে মহাত্মা পর্য্যন্ত একটু বিচলিত হইয়াছেন। আজ এই বিষয়টার একটু বিশেষ পরিষ্কাররূপে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। ইংলিশম্যান প্রভৃতি প্রতিপক্ষের মুখপত্রগুলি বিপ্লবপন্থীদের এই কার্য্যতৎপরতার জন্য স্বরাজ্যদলকে, বিশেষতঃ দেশবন্ধুকে দায়ী করিতে চান। দেশবন্ধুর অপরাধ তিনি যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা সত্যের খাতিরে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যদি স্বরাজ্যদলের প্রোগ্রাম ফেল হয় তবে দেশে ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি হইবে।

ইহা সত্য যে বিপ্লববাদীদল যখন একবার সৃষ্টি হইয়াছে তখন তাহারা থাকিবেই। যে পন্থায় রুষ-দেশে সমতা আসিয়াছে, যে সাধনায় ওয়াসিংটন পরাধীন আমেরিকাকে যুক্তরাজ্যে পরিণত করিয়াছেন, যে পথে ম্যাটসিনি, গেরিবল্ডি ইটালিদেশে স্বাধীনতা আনয়ন করিয়াছেন, সে পন্থা থাকিবেই। তবে এই দল সৃষ্টির জন্য দায়ী কে? ভারতবর্ষের ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধনায় এই গুপ্ত পন্থার কোন স্থান ছিল না। ইংরেজ, তোমরাই ভারতবাসীর স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষাকে বাধা দিতে যাইয়া বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছ। তোমরা বরিশালে লাঠির সাহায্যে যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছ, ত্রিপুরা মৈমনসিংহের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদনীতির পরিচালনা করিয়াছ। বিজলি, লায়ন সারকুলার প্রচার করিয়া তোমরা মুক্ত সাধনার পথে বিঘ্ন ঘটাইয়াছিলে, প্রকাশ্য রাজপথে বেত্রাঘাত করিয়া স্বরাজপন্থীদের মনে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসানল জ্বালাইয়াছিলে, ১৯০৮ সালে ফৌজদারী আইন সংশোধন করিয়া ১১ক। খ প্রভৃতি ধারার সাহায্যে মাতৃসেবার প্রকাশ্য পবিত্র পথগুলি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলে। বোধ হয় মনে আছে এই আইনের পাণ্ডুলিপি যখন জাতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হয় তখন প্রাতঃস্মরণীয় রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় পরিষ্কার ভাষায় ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন যে, উন্মুক্ত পথ বন্ধ হইলেই কর্ম্মীরা গুপ্ত পন্থা অনুসরণ করিবে। তখন তোমরা তাহা শুন নাই। এই প্রকারে যখন হীনবল করিয়া দিলে তখন কর্ম্মীদের ঐ গুপ্ত পন্থার আশ্রয় লওয়া ব্যতীত আর কি উপায় ছিল? তোমাদের কার্য্যের দ্বারাই এই গুপ্তপন্থীদলের সৃষ্টি হইয়াছে। তোমরা গোয়েন্দা লাগাইয়া মিথ্যা মোকর্দ্দমার সৃষ্টি করিয়া কর্ম্মীদের জেলে দিয়াছ, নানাভাবে নানা প্রকার কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মীদের হৃদয়ে প্রতিহিংসানল জ্বালাইয়া দিয়াছ, তোমরাই আবার ভারতরক্ষা আইনের সৃষ্টি করিয়া ও ১৮১৮ ইংরাজির ৩ আইন ব্যবহার করিয়া কর্ম্মীদের বিনা বিচারে দ্বীপান্তর, দেশান্তর ও জেলে আবদ্ধ করিয়াছ। তোমরাই তাদের গ্রেপ্তার করিয়া মারপিট করিয়াছ, সবুটে বুকের উপর লাথি মারিয়াছ, হাত বাঁধিয়া লটকাইয়া রাখিয়া ২।৩ দিন যাবত বেত্রাঘাত ও বেটনাঘাত করিয়াছ, ২ হাত পেছনে বাঁধিয়া বালতিপূর্ণ বিষ্ঠা মাথায় ঢালিয়া দিয়াছ, পবিত্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকদের অঙ্গে পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছ। তোমরাই পর্দ্দানশীন গর্ভবতী মহিলা সিন্ধুবালাকে বহু মাইল হাঁটাইয়া লইয়া গিয়াছ, একবার দুইবার করিয়া ৭ বার আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া খানাতাল্লাস করিয়াছ, বেশ্যা দ্বারা সমস্ত শরীর তালাস করিয়াছ। এইরূপে বহুবর্ষব্যাপী অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালাইয়াছ,—এখন বল দেখি এই বিপ্লবপন্থীদল সৃষ্টির জন্য তোমরা দায়ী কিনা? এই ত গেল গত যুগের কথা। এবারও যখন নবযুগের ঋষি মহাত্মা গান্ধী সকলকে একত্রিত করিয়া তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন তোমরা সেই যজ্ঞভঙ্গকল্পে শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ মহাশয়ের যোগে পুরাতন কর্ম্মীদের একদল হস্তগত করিয়া গুপ্ত পন্থার অনুসরণ করিয়া-

ছিলে। আমি নিজে তাহা জানিতে পারিয়া চট্টগ্রাম প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে পরিষ্কার রূপে দেশবাসীর গোচর করিয়াছিলাম। বল দেখি ইহাদিগকে তোমরাই জাগাইয়া রাখিয়াছিলে কিনা? তারপর পুরাতন বিপ্লবপন্থীদের অগ্রগামী যাহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া মহাত্মার শান্তিপতাকা নিম্নে একত্রিত হইয়া দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কার্য্য করিয়া আসিতেছিল, একমাত্র তাহারাই এই দলকে বুঝাইয়া সংযত রাখিতে সক্ষম ছিল, তোমরা স্বরাজ্যদলকে হীনবল করিতে যাইয়া তাহাদের ১৮১৮ সালের তিন আইন মতে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখিয়াছ। বুকে হাত দিয়া বল দেখি বিপ্লবপন্থীদের এই কর্ম্মতৎপরতার জন্য দায়ী দেশবন্ধু দাশ, না তোমরা?

মহাত্মা বিপ্লবপন্থীদের বুঝাইয়াছিলেন শান্তিময় অসহযোগের পথে শীঘ্র স্বরাজ হইবে। তাহা তাহারা কতক বিশ্বাস করিয়াছিল, এবং ১৯২১ সালে যখন দেখিতে পাইয়াছিল যে দলে দলে লোক ইংরেজের সহযোগ পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মার দলে যোগদান করিতেছে তখন তাহাদের মনের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছিল। তখন তাহারা প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়া শান্তির পথে অগ্রসর হইয়াছিল।

১৯২২ সালে প্রায় সকলেই সেই পথ হইতে ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। স্বয়ং মহাত্মা এখন যে প্রোগ্রাম লইয়াছেন, তাহাতে স্বরাজ নিকটে হইবে বলিয়া বিপ্লববাদীদের অনেকের মনে বিশ্বাস হইতেছে না, তাহার কারণ নিম্নে দেওয়া গেল।

১। হিন্দু মুসলমানের একতা—

হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মের মূলে অর্থাৎ গীতা, চণ্ডী ও বেদের সহিত কোরাণের কোন বিবাদ নাই। রাজনৈতিক চালই বহুদিন হইতে, এই উভয়দলকে বিরোধের পথে চালাইয়া আসিয়াছে। ত্রিপুরার দক্ষিণাংশে আমার বাস। সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯০জনের বেশী মুসলমান। মুসলমান জমীদারের অধীন হিন্দু প্রজা ও হিন্দু জমীদারের অধীন মুসলমান প্রজা বহুদিন যাবত নির্ব্বিবাদে বসবাস করিয়া আসিয়াছে। হিন্দু জমীদার পীরোত্তরাদি দিয়া মসজিদ, মাদ্রাসা ও মোক্তবাদি নির্ম্মাণ করিয়াছে। মুসলমান জমীদার দেবালয় স্থাপন করিয়া দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তরাদি দিয়াছে। আমার শ্বশুরের প্রায় সমস্ত প্রজা মুসলমান। আমাদের সঙ্গে চাচা চাচী, মামা মামী প্রভৃতি ডাক সম্বন্ধ মুসলমান প্রজার সঙ্গে চলিয়াছে ও চলিতেছে। এখন পর্য্যন্ত সেখানে হিন্দু মুসলমানে কোন বিবাদ নাই। কিন্তু ত্রিপুরার উত্তরাংশে স্বদেশীযুগে আমলাতন্ত্রের চালে পড়িয়া ঢাকার নবাব 'লাল ইস্তাহার' জারি করিয়াছিলেন। সেখানে ১৯০৮ সালে মারামারি ও খুন পর্য্যন্ত হইয়াছে। এ সকল বিপদ পরাধীনতার ফল। শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা মৌলানা আক্রাম খাঁ সাহেব সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশনে তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে এই মতেরই সমর্থন করিয়া লিখিয়াছিলেন—"বলা বাহুল্য যে এখন আমাদের সাধনার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। যখন এই সাধনা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধিলাভ করিবে—ত্রিশকোটী ভারতসন্তান যখন স্বরাজের নির্ম্মল গগনতলে মুক্ত বাতাসে মাথা তুলিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে পারিবে—দাসত্বের কলুষগুলি তখন আর আমাদের সেই উন্নত মস্তককে, সেই স্ফীত বক্ষকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাই বলিতেছি—দোঁহাই তোমাদের স্বরাজ হইতে দাও। স্বরাজই স্বরাজের সমস্ত উপকরণ সঙ্গে করিয়া আনিবে। স্বরাজই জাতীয়জীবনের পরতে পরতে মহত্বের ও মহানুভবতার সৃষ্টি করিবে। স্বরাজই তাহার সমস্ত পাপ-তাপকে দূর করিয়া দিবে। স্বরাজই প্রতিপন্ন করিবে যে, আমাদের সমস্ত দ্বিধা অমূলক, সমস্ত আশঙ্কা ভিত্তিহীন। অন্ধকারের জীব আমরা, সেই আলোকরাজ্যের মহিমা এখন অনুভব করিতে পারিব না। গোলামীর গরল কুণ্ডে নিমজ্জিত আমরা, সেই পুণ্যরাজ্যের জীবনধারার—অমৃতধারার কল্পনাও এখন সম্যকরূপে করিতে পারিব না।"

অতএব প্রাণপণে একতাসাধনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে সত্য; কিন্তু পরাধীনতা শেষ হওয়ার পূর্ব্বে এবং স্বাধীনতার সাহায্য ব্যতীত এই বিবাদের শেষ হইবে কিনা সন্দেহ।

২। অস্পৃশ্যতা নিবারণ—

গুণ কর্ম্ম বিভাগে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি ইহা গীতার কথা। কিন্তু আজ সেই কর্ম্মভেদ জাতিভেদে পরিণত হইয়াছে। এই জাতিভেদের মূলে যাহাই থাকুক না কেন বর্ত্তমানে ইহা বিশেষ জটিল হইয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশে কিছুদিন পূর্ব্বেও এই জাতিভেদ বিষয়টা অশ্রদ্ধা বা ঘৃণাপ্রসূত বলিয়া অপর জাতিদিগের মধ্যে ধারণা ছিলনা। বড় ছোট বা হীনভাব এই জাতিভেদের সম্পর্কে কাহারও মনে আসিত না। সকল জাতিই মনে করিত ইহা সত্ত্ব রজ ও তমগুণের বিভিন্নতা হেতু প্রবৃত্তি ও প্রকৃতিমূলক কর্ম্মভেদে সাধনপথের নির্দ্দেশ জন্য ও কর্ম্ম পথে নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতিরা যেমন অন্য জাতির অন্নস্পর্শে জাতি নষ্ট হয় বলিয়া মনে করিতেন তেমনই অপর জাতিরাও ব্রাহ্মণাদি জাতিকে আহার্য্য দেওয়া বা আহারকালে স্পর্শ ইত্যাদি করা নিজের ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন। নিজেদের মনে এই কারণে কোন কষ্ট অনুভব করিতেন না। বেশীদিনের কথা নয়, লোক রাজনীতিসূত্রে ব্যবহার করিতে যাইয়া ভেদনীতির অনুশীলনকল্পে নির্য্যাতিত, উপেক্ষিত প্রভৃতি শব্দগুলি আবিষ্কার করিয়া এই জাতিভেদকে মর্ম্মান্তিক বিরোধে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে। দেশবাসীর সর্ব্ববিষয়ে অজ্ঞতাই এই ভেদনীতি পরিচালনে প্রতিপক্ষকে সুযোগ দিয়াছে। একটু অনুধাবনা করিলেই দেখা যায় একই মায়ের গর্ভ-সম্ভূত ভ্রাতারা আশৈশব এক থালে অন্ন গ্রহণ করিয়াও ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া মারামারি কাটাকাটি করিতেছে। অপর দিকে বিভিন্ন জাতিসম্ভূত হইয়া রক্তের স্পর্শ-সংস্রব না থাকিলেও সমস্বার্থে অনুপ্রাণিত হইয়া একে অন্যের জন্য জীবন দান করিয়াছে। এ প্রকারের উদাহরণ অল্প নহে। অতএব এই অস্পৃশ্যতার বিষয় বিশেষ গবেষণার সহিত চিন্তা করা প্রয়োজন। কোন কোন স্থানে এই অস্পৃশ্যতা নিবারণকল্পে খাওয়া দাওয়া সব প্রবর্ত্তন করিতে যাইয়া ভীষণ দলাদলি, আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদের সৃষ্টি হইয়া সমাজে ভীষণ দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। এই প্রকারের আন্দোলন চলিতে থাকিলে সমাজে যে বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হইবে, তাহাতে এক ভেদ নিবারণ কল্পে সহস্র ভেদ সৃষ্টি করিয়া স্বরাজকে অতল জলে ডুবাইয়া দিবে বলিয়া মনে হয়। প্রাণহীন শরীরে যেমন ঔষধ ক্রিয়া করে না, তেমন প্রাণহীন সমাজে এ সকল চেষ্টা কার্য্যকরী হইবে কি না বিবেচনার বিষয়। রাজশক্তি সমাজের প্রাণ, রাজশক্তির সাহায্য ব্যতীত সমাজে ভাঙ্গাগড়ার চেষ্টা নিরাপদ হইবে বলিয়া মনে হয় না। অতএব এপথেও সর্ব্বদাই চলিতে হইবে বটে কিন্তু স্বাধীনতা ব্যতীত এই সমস্যা পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

৩। চরকা ও খদ্দর—

জীবন ধারণ করিতে হইলে খাওয়া পড়া দুই সম্যক প্রয়োজনীয়। বিদেশী রাজশক্তির সাহায্যে বস্ত্র হরণ করিয়া জাতিকে দুর্ব্বল করিয়াছে। সেই দুর্ব্বলতার সুযোগে আজ তাহারা অন্ন-হরণে প্রস্তুত। রাজশক্তি ভারতে অন্ন ও বস্ত্র উভয় সমস্যারই প্রতিকূল। সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় কলকারখানাগুলিও চরকার ভীষণ শত্রু। রাজশক্তির উদ্ধার ব্যতীত একার্য্যে সম্পূর্ণ ফল পাওয়ার আশা করা যায় না।

অতএব কেবল এই ত্রিবিধ পন্থার অনুসরণ করিয়া কিরূপে শীঘ্র স্বরাজ হইবে তাহা বিজ্ঞপন্থীরা বুঝিয়া উঠিয়া পারিতেছেন না। তবে ইহা ঠিক স্বরাজসাধনায় সর্ব্বকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ইহাকেও চালাইতে হইবে; এবং ইহার সাধনায় স্বরাজ সাধনার পথে অনেক অগ্রসর হইয়া যাইবে।

স্বরাজ্যদল ও বিপ্লবপন্থী

স্বরাজ্যদলের প্রোগ্রাম শান্তির পথে সংগঠন ও সংঘর্ষ। শান্তির পথে বলিয়াই সংগঠনের পূর্ব্বেই সংঘর্ষ বা উভয়টিকে একই সঙ্গে চালান যায়। বিপ্লবপন্থীদেরও সংগঠন ও সংঘর্ষই প্রোগ্রাম। কিন্তু পন্থা বিভিন্ন। সংগঠন তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এবিষয়ে পন্থা সম্বন্ধেও বিরোধ নাই। কিন্তু সংঘর্ষের পথ অন্য প্রকার। বিপ্লবের দুইটি পথ, একটী গুপ্ত ও অপরটি প্রকাশ্য। গুপ্ত সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় গত কালের অভিজ্ঞতা সহকারে চিন্তা করিতে হইবে।

১। গুপ্ত পথের সহকর্ম্মীদের প্রত্যেককেই প্রত্যেককে অবিশ্বাস করিতে হয়। প্রত্যেকের মনোভাব ও কার্য্যপদ্ধতি প্রত্যেক সহকর্ম্মী হইতে গোপন রাখিতে হয়। এক সঙ্গে মরিতে হইবে কিন্তু পরস্পরকে বিশ্বাস করিবে না, ইহা কর্ম্মের পরিপন্থী।

২। গুপ্ত কার্য্য পরিচালনে প্রতিপক্ষ গোয়েন্দার দ্বারা বিঘ্ন ঘটাইবার সুযোগ পায়, গোয়েন্দারা নানা উপায় এবং প্রয়োজন হইলে পুলিসের সাহায্যে মিথ্যা মোকর্দ্দমার সৃষ্টি করে। তখন কর্ম্মীরাও আত্মরক্ষার্থে পুলিস ও গোয়েন্দা ধ্বংসে ব্যাপৃত থাকিয়া মূল লক্ষ্য হইতে সড়িয়া পড়ে।

৩। গুপ্ত পথে নিজের প্রাণ বাঁচাইয়া কর্ম্ম করার স্পৃহা জন্মায়। কাজেই এই পন্থা কর্ম্মীকে ত্যাগের শীর্ষস্থানে লইয়া যাওয়ার বিরোধী। কর্ম্মী পূর্ণ ত্যাগী না হইলে তাহার কর্ম্মে পূর্ণফল প্রদান করিবে না।

৪। গুপ্ত পন্থায় দেশবাসী পূর্ণভাবে সহায়তা করিতে পারে না। কারণ কে গোয়েন্দা কে কর্ম্মী সাধারণের বুঝা কষ্টকর হইয়া উঠে। অতএব তাহারা চকিত ও ভীত থাকে।

৫। দেশবাসীর পূর্ণ সাহায্য যখন পাওয়া যায় নাই, তাহাদের ভিতরে ভয় যখন পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল, কর্ম্মীরাও যখন সংখ্যায় অল্প ছিল তখন এই গুপ্ত পন্থার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন মহাত্মা-প্রবর্ত্তিত এই নব আন্দোলনের ফলে দেশের ধনীদরিদ্র সকলেই প্রকাশ্যে কার্য্য করিতেছে। জনসাধারণের মন হইতে ভয় তিরোহিত হইয়াছে। এখন কোন প্রকার গুপ্ত পন্থা অবলম্বন করিলে ইষ্ট হইতে অনিষ্টই বেশী হইবে বলিয়া মনে হয়।

এখন বিবেচ্য প্রকাশ্য বিরোধের পথ অবলম্বন করা প্রয়োজন হইবে কি না?

এই কথার উত্তর এই যে, ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপক্ষের কার্য্য-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে।

মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু দাশ প্রভৃতি নেতারা মনে করেন ইংরেজের যোগে এদেশে স্বরাজ হইতে পারে। শান্তির পথে যে স্বরাজ আসিবে, ইহাই প্রকৃত স্বরাজ। বিপ্লবের পথে যে স্বাধীনতা অর্জ্জন হয় তাহা বুরক্রেসির পরিবর্ত্তে বুরক্রেসি মাত্র। ইংরেজের সহযোগে স্বরাজ হইতে হইলে ইংরেজকেও অগ্রসর হওয়া দরকার। কিন্তু ইংরেজ আজ তাহার ভোগলালসার আশক্তি ভুলিয়া গিয়া আমাদের সঙ্গে মিশিতে পারিবে কিনা, ব্যাঘ্র মাংস ও রক্তের আস্বাদ ভুলিয়া মানুষের গলা ধরিয়া স্বেচ্ছায় চলিবে কিনা, এই মীমাংসার উপর তাহা নির্ভর করে। কিন্তু তাহা সহসাই প্রকাশ পাইবে। দেশবন্ধু তাহাদের কোণঠাসা করিয়াছেন। এখন তাহাদের পক্ষে দুই পথ উন্মুক্ত। এক শান্তির পথ, আর এক বিরোধের পথ। যদি ইংরেজ শান্তির পথ গ্রহণ করে তবে আমাদের অন্য পথ লওয়ার কোন প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু যদি ইংরেজ বিরোধের পথে চলে তবে দেশে অশান্তি উপদ্রব অনিবার্য্য, আর তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাহাদের।

আমাদিগকে সকল বিষয়ের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তবে আমার বিশ্বাস গুপ্ত পন্থার প্রয়োজন হইবে না। এখন দেশবাসী নরনারী প্রস্তুত, নেতার অভাব না হইলে কর্ম্ম বন্ধ হইবে না। অতএব ইংরেজ যদি বিরোধের পথ বাছিয়া লয় তবে পূর্ণোদ্যমে আইনঅমান্য চালাইতে হইবে।

ভগিনীদের নিকট নিবেদন

ভগিনীগণ, তোমরা প্রস্তুত হও। তোমরা জগৎ সৃষ্টির মূল। তোমরা মৃত, অসাড় ও নিদ্রিত থাকিলে সন্তান জাগিবে না। সন্তানের অলসতা ও ভীরুতা দূর না করিলে সন্তান মানুষ হইতে পারে না। তোমাদের সেবা ব্যতীত মায়ের পরাধীনতা দূর হইবে না। রমণীর দুই আদর্শ :—

শান্তিতে——লক্ষ্মী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা।

বিরোধে——আদ্যাশক্তি, মহামায়া, চণ্ডী, কালী করালবদনী ভীমা ভৈরবী।

শান্তিতে প্রয়োজন——সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী ইত্যাদি।

বিরোধে চাই——জনা, সুভদ্রা, প্রমীলা, লক্ষ্মীবাই, চাঁদবিবি, মহামায়া, দুর্গাবতী প্রভৃতি।

শান্তিতে তোমরা গৃহলক্ষ্মী, সন্তান যখন গর্ভে আসিবে তখন সর্ব্বদা দেশের কথা চিন্তা করিবে। তোমার চিন্তানুযায়ী সন্তানের দেহ মন গঠিত হইবে। অভিমন্যু যখন মাতৃগর্ভে ছিল, তখন অর্জ্জুন সুভদ্রার নিকট চক্রব্যূহ-ভেদ ও নিষ্ক্রমণ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাই গর্ভে থাকিয়াই অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করা শিখিয়াছিল। নিষ্ক্রমণ বর্ণনাকালে সুভদ্রা ঘুমাইয়া পড়ায় নিষ্ক্রমণের পথ সম্বন্ধে অভিমন্যু অজ্ঞ ছিল এবং তাহাই তাহার মৃত্যুর কারণ হইল। অতএব মায়ের অসাময়িক নিদ্রা পুত্রের মৃত্যুর কারণ। পুত্রকে স্তন্য দেওয়ার সময় দেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করিবে। সদাসর্ব্বদা পুত্রের হৃদয়ে স্বাধীনতার বীজ বপন করিবে। যতদিন দেশ স্বাধীন না হয়, সর্ব্বপ্রকার-বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া অল্পব্যয়ে সংসার চালাইতে অভ্যাস করিবে এবং খরচের জন্য যে পরিমাণ অর্থ দরকার তাহাই নিজের পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া সংসার ভার হইতে মুক্ত রাখিয়া স্বামী পুত্রকে সর্ব্বদা স্বাধীনতার কার্য্যে ব্রতী হওয়ার জন্য প্রস্তুত রাখিবে।

আর যখন বিরোধ উপস্থিত হইবে—শক্তিরূপিণী মায়ের সাহায্যে স্বামী পুত্রের হৃদয়ে ও বাহুতে শক্তি সঞ্চার করিবে। স্বামীর অবর্ত্তমানে তাঁহারই আরব্ধ কার্য্য স্বয়ং গ্রহণ করিয়া নারীর ব্রত পালনপূর্ব্বক রমণীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবে।

আজ যদি ইংরেজ বিরোধের পথ বাছিয়া লয়, তাহা হইলে তাহার প্রথম কার্য্য হইবে দেশের সমস্ত কর্ম্মীদের স্বাধীনতা হরণ করা। প্রিয় ভগিনীগণ, তখন তোমাদেরই তাহাদের শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে হইবে। ১৯২১ সালের সংঘর্ষে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে আর্য্যরমণীর অসাধ্য কিছুই নাই। তোমরা হয়ত অনেকে মনে করিবে আমরা অশিক্ষিতা, আমাদের দ্বারা কোন কাজ হইবে না। বাস্তবিক যে শিক্ষার কথা ভাবিতেছ সে শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা নহে। তোমার পতিভক্তি, তোমার পুত্রস্নেহ, তোমার নারীত্ব, তোমার মাতৃত্ব এবং সেবার ভিতর দিয়া তোমাকে পলে পলে পতি, পুত্র ও আত্মীয়পরিজনের জন্য যে ত্যাগ ও প্রাণপাত করিতে শিক্ষা করিতে হয়, সে শিক্ষাই তোমার যথেষ্ট শিক্ষা। ঐ শিক্ষা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, দেখিবে তোমার ভয়, সঙ্কোচ কোথায় চলিয়া যাইবে। যাঁর শক্তিতে পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, অন্ধ নয়ন মেলিয়া চায়, বোবা কথা বলে, খোঁড়া নাচিয়া বেড়ায় সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া তোমার শক্তি জোগাইবেন। একবার তুমি তোমার শক্তিতে বিশ্বাস করিয়া দাঁড়াও, মা আদ্যাশক্তি, অসুরদলনী শক্তি লইয়া তোমাকে সর্ব্বশক্তি দান করিবেন।

তোমরা চরমনাইয়ের অত্যাচার-কাহিনী, তারকেশ্বরের জীবন্ত কলঙ্ককালিমা, পরিশেষে লর্ড লিটনের ঢাকার বক্তৃতায় অঙ্কিত নারী-চরিত্র স্মরণ কর। অনেক সভাসমিতি লর্ড লিটনের উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তাঁহার কোন প্রতিবাদ সভায় বা কথায় হয় না। এই প্রতিবাদ কেবল তোমরাই করিতে সক্ষম এবং তাহা কার্য্য দ্বারা। লর্ড লিটন যখন গালি দিবে তখন উপেক্ষা করিবে, কারণ যে সেই আবহাওয়ায়

গঠিত সে অপরকেও সেই মাপকাঠীতে পরিমাপ করে। অতএব তাহার উক্তিকে উপেক্ষা করিয়া চলিও, কিন্তু যখন তাহারা সমগ্র সৈনিক লইয়া অত্যাচার করিতে অগ্রসর হইবে তখন তোমরা সেই অত্যাচারের সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়া উত্তর দিবে —তোমরা আর্য্যরমণী। অত্যাচারী অত্যাচারের সমস্ত পদ্ধতি উন্মোচন করিয়া যখন তোমার স্বামী পুত্রের স্বাধীনতা হরণ করিবে, তখন তুমি নিজে স্বরাজসাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়া প্রমাণ করিবে তোমরা আদ্যাশক্তি মহামায়াসম্ভূতা নারী। ইহাই একমাত্র লিটন-উক্তির প্রতিবাদ।

সদস্যগণ, আমি আপনাদের স্নেহ মমতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া দীর্ঘকালব্যাপী বক্তৃতা দ্বারা আপনাদের বিরক্ত করিয়াছি। ইহা লাঞ্ছিতার মনোবেদনা, বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ। আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। উপসংহারে আমার নিবেদন,—

হে বঙ্গবাসী ভ্রাতা ভগিনীগণ, তোমরা সকলে মিলিয়া পূর্ণোদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। কেবল শৃঙ্খলা ও সংগঠনে মনোনিবেশ কর, স্বরাজলক্ষ্মী অচিরেই তোমাদের অঙ্কশায়িনী হইবেন।

বন্দে মাতরম্।

ভিক্ষা

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

চিন্তার আঘাতে চূর্ণ সুকোমল সুচারু অন্তর,
তবু মুখে হাসি আছে, কণ্ঠে আছে স্নেহমাখা স্বর।
নিমেষ-নিহত আঁখি
পতি-মুখ পানে রাখি
সাবিত্রী ফিরাল' যমে প্রকাশিয়া যে শক্তি তাহার,
জগদীশ, সেই শক্তি দাও আজি হৃদয়ে আমার।

যে শক্তি ধরিয়া বক্ষে বিশ্বলক্ষ্মী জনক-দুহিতা
জগতে অপরাজিতা, মানবের সমাজে পূজিতা।
নতশিরে যুক্ত করে
পতির আদেশ ধরে,
অপবাদে অগ্নি-ভয়ে নির্ব্বাসনে নহে বিচলিত,
এ দুর্ব্বল বক্ষে দেব, সেই শক্তি কর সঞ্চারিত।

বিস্মিত পাঠান-রাজ, মেবারের রাজ-অবরোধে
অনল উঠিল জ্বলি উপেক্ষিয়া সম্রাটের ক্রোধে।
কোটি রাজপুত নারী
যে শক্তি হৃদয়ে ধরি
আদরে জহর-ব্রত উদ্‌যাপিল অনলে পশিয়া,
জগদীশ, সেই শক্তি এ হৃদয়ে দেহ সঞ্চারিয়া।

যে শক্তি থাকিলে বুকে সগৌরবে আনন্দিত স্বরে
দিতে পারি পরিচয় বঙ্গনারী বলি আপনারে।
নারীর উচিত কাজ
সাধিতে পারিব আজ
যে শক্তির দৃঢ়বলে—উপেক্ষিয়া ধরার আঘাত,
সে শক্তি তোমার কাছে যাচি আজি জগতের নাথ

অপরাধিনী

(গল্প)

শ্রীসুধীন্দ্রকুমার দেব বি-এ।

সেদিন সকালে খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে একটা খবর বেরুলো যাতে সহরে বেশ একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, সহরের শত শত অপরাধে অপরাধীর সংখ্যা আর একজন এসে বাড়ালো। একজন বাঙ্গালী নার্স একজন রোগীর চোখে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে একখানি ছোরা আমূল বিঁধিয়ে দিয়েছিল; আর মস্তক ভেদ ক'রে ছোরাটি চলে যাওয়ায় রোগীর মৃত্যু হয়। একজন আর একজনকে হত্যা করলে কথাটা শুনলেই গা শিউরে ওঠে, মনটা তিক্ততায় ভরে যায়। কিন্তু যখন কারণ জানা গেল সে সময়ে অনেকেই হত্যাকারিনীর প্রতি অন্ততঃ মনে মনেও সহানুভূতি না দেখিয়ে পারেনি।

কয়েকদিন পরে অপরাধিনীর বিচার হল, কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও কেরাণীগিরির ঠেলায় আদালতে গিয়ে উঠতে পারলুম না, খবরের কাগজে তার সম্বন্ধে যা বেরিয়েছিল তা থেকে উদ্ধৃত ক'রে দিলাম।

—"হত্যাকারিনী দেখতে চলনসইর চেয়ে ভালোই, পাতলা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, সুন্দর মুখখানি চিন্তায় মলিন, চোখ দুটি টানা টানা কিন্তু দুর্ভাবনায় চোখের কোলে কালি পড়েছে। তার নাম হচ্ছে নলিনী, কলিকাতার...হাঁসপাতালে প্রায় ছয় মাস বেশ সুখ্যাতির সঙ্গেই কাজ করেছে। কিন্তু হাঁসপাতালে কেউ একটি দিনের জন্যও তার মুখে হাসি দেখেনি।

"নলিনী বললে যে সে ব্রাহ্মণের মেয়ে, তার বয়স কুড়ির বেশী হবে না। জয়নগরের কাছে কোনো এক গ্রামে তার পিত্রালয় ছিল, কিন্তু সে পিতার নাম বলতে অনিচ্ছুক। তার বিয়ে হয়েছিল হাওড়া জেলার কোনো এক গ্রামে। তার স্বামী ছিলেন পূজারী ব্রাহ্মণ, পরের বাড়ী পূজা ক'রে আর জায়গা-জমী যেটুকু ছিল তাই নিয়ে তাদের স্বচ্ছলভাবে খুব না চললেও মনের সুখেই দিন কাটতো। তার একটি ছেলেও হয়েছিল, বেশ সুন্দর ফুটফুটে ছেলে—সে হয়তো বেঁচেও আছে; কিন্তু সে সব ছবি হচ্ছে এখন স্বপ্নরাজ্যের!

"একদিন সন্ধ্যাবেলায় সে গিয়েছিলো বাগানের পুকুরে কাপড় কাচ্‌তে, তার সঙ্গে আর কেউ ছিল না। কোথা থেকে গ্রামের অছিমুদ্দিন এসে তার মুখে কাপড় বেঁধে দিয়ে ছোরা মারবার ভয় দেখিয়ে তার সতীত্বনাশ করলে। তারপরে সে যখন চোখের জলে ভাসতে ভাসতে স্বামীর পায়ে নিজের কলঙ্কের কথা নিবেদন করলে, তিনি তাকে আর ঘরে নিলেন না। পরদিন গ্রামে প্রচার হ'য়ে গেল এই একটি অসহায় মেয়ের উপর অত্যাচারের কাহিনী! কিন্তু কেউ অপরাধীকে শাস্তি দেবার চেষ্টা করলে না, বা সাহস করলে না; শুধু শাস্তির নামে চিরন্তন সংসার অনুযায়ী চাপিয়ে দিলে অত্যাচারের ভার এই একটি অসহায়া নারীর মাথায়, অথচ অপরাধ ছিল না তার বিন্দুমাত্র। তার অপরাধের মধ্যে সে নারী আর জন্মেছিল দরিদ্র, দুর্ভাগা হিন্দুর ঘরে! ভীরু, কাপুরুষ—সমাজপতিরা বড় বড় টিকি নেড়ে, তিলকের বাহার দিয়ে জানিয়ে গেলেন যে তাকে ঘরে লওয়া অসম্ভব! রায় শুনে তার চক্ষের জলে বুক ভেসে গেল কিন্তু শেষ আশায় বুক বেঁধে একবার স্বামীর

মুখের দিকে চাইলে—চেয়ে দেখ্‌লে যে সে পাথরের মূর্ত্তির মতই নিশ্চল! হায়, যেখানে ছিল এত সোহাগ, এত ভালবাসা—সেসব নিমেষের জন্য এক ঘৃণ্য কীটের পরশে কোথায় উধাও হ'য়ে গেল! অথচ একি অবিচার! সে তো স্বেচ্ছায় আপনাকে বিকোয়নি। কিন্তু এত কথা তার কেউ শুনলে না, তার বুকের রক্তে তৈরী তার ছেলেকে পর্য্যন্ত কেউ স্পর্শ কর্‌তে দিলে না! 'পতিতা' এই ছাপ তার কপালে আগুনের অক্ষরে লিখে দিয়ে বিদায় ক'রে দিলে তাকে।

"দয়ার অবতারেরা উঠানের একপাশে তাকে থাকবার জায়গা দিলেন রাত্রির জন্য, কিন্তু রাত্রি প্রভাত হ'লে কেউ তাকে আর দেখ্‌তে পায়নি সে গ্রামে। সে চলে এসেছিল কল্‌কাতায় একলা। তার শিরায় শিরায় রক্ত যেন টগ্‌বগ্‌ করে ফুট্‌ছিল অত্যাচারীদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য। কিন্তু কি ক'রে হবে তা', হয়তো বাঁচাই তার পক্ষে শক্ত হ'য়ে উঠ্‌বে, দুর্ব্বলা নারী সে! বাপের বাড়ী কিন্তু তার যাবার ইচ্ছা ছিল না, তার ভয় হয়েছিল যারা নিতান্ত আপনার জন তারাও হয় তো প্রত্যাখ্যান কর্‌বে তাকে। জানি না পূর্ব্ব-জন্মের কোন্ সুকৃতির ফলে তার দেখা হ'ল নৃপেনবাবুর সঙ্গে। তিনি হচ্ছেন ডাক্তার আর তার বাপের বাড়ীর দেশের লোক। তার কাহিনী শুনে ভালো-মন্দ কিছুই না বলে এই কাজটি ক'রে দিয়েছিলেন তাকে, আর নিঃস্বার্থভাবেই,—এই রকমের একজন অসহায়া স্ত্রীলোকের উপকার করা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের ব'লে ঠেকলেও নৃপেনবাবু করেছিলেন।

"হাঁসপাতালে সে তার অক্লান্ত ও মমতাপূর্ণ সেবায় সকলকে মুগ্ধ করেছিল; কিন্তু তাতে কি আর নারী-হৃদয় পূর্ণ হয়—হৃদয়ের ক্ষুধা মেটে? যখনই তার আগেকার কথা মনে হয়, তার ভাঙা কুটিরের সোনার ছবির কথা মনে পড়ে সে সব ভুলে গিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে যেন মোহাচ্ছন্নের মত! হায়, সে যে স্বপ্ন ক্ষণিকের স্বপ্ন মাত্র, রোগীর আর্ত্তনাদে তার সব স্বপ্ন টুটে যায়! যখনই তার স্বপ্ন ভেঙে যেত তার মনে হ'ত দিই বিষ খাইয়ে তাহ'লে চেঁচিয়ে আর ক্ষণিকের সুখস্বপ্ন ভেঙে দিতে পার্‌বে না, সব গোল চুকে যাবে। কিন্তু তাতো হবার নয়, আবার আস্‌বে অন্য লোক তাঁর যন্ত্রণার ভার বহন করে! সকলেই এই দেহটাকে নিয়ে ব্যস্ত, রোগের যন্ত্রণায় কাতর, আবার অনেকে যন্ত্রণায় অধীর হ'য়ে আর্ত্তনাদ করে; আর সে তার শতগুণ যন্ত্রণা নিয়ে তাদের সেবা করে যায় দিনের পর দিন মুখটি বুজে। হায়, যদি সে ফিরে পেত সে সুখের দিন, তার কোনো অঙ্গ ছিন্ন ক'রে দিয়ে তাহ'লে সে হাসিমুখে সব যন্ত্রণা ভগবানের দান বলে মাথা পেতে নিত। কিন্তু তা' তো হবার নয়—অথচ কেন হ'বে না? নিস্ফল ক্রোধে সে নিজেকে আঘাত কর্‌তো, কিন্তু তার দুঃখের বোঝার তুলনায় এ আঘাত কত তুচ্ছ!

"তারপর একদিন একজন রোগী এসে ভর্ত্তি হ'ল হাঁসপাতালে, কোথা থেকে পড়ে গিয়ে তার পা ভেঙেছে। একি সেই অছিমুদ্দিন না? হাঁ, ঠিক সেই। একটা নিষ্ঠুর আনন্দে তার সারা দেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌লো। সে তখনই জোগাড় ক'রে ফেল্লে একখানা শাণিত ছোরা। কিন্তু মার্‌লে না তাকে, কারণ এখনো বোধ হয় সে মৃত্যুযন্ত্রণা ভালো ক'রে অনুভব কর্‌তে পার্‌বে না। আর একটু চৈতন্যের জন্য সে অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লো। যখন ঠিক তার মনের মত অবস্থা হ'ল অছিমুদ্দিনের, সে একদিন অছিমুদ্দিনকে বেশ সোহাগের সুরেই বল্লে, 'কি অছিমুদ্দিন চিন্‌তে পারো?' অছিমুদ্দিন তাকে দেখে চম্‌কে উঠ্‌লো প্রথমে, তারপরে তার হাবভাব দেখে খুসীই হ'ল। কিন্তু সে যখন নলিনীর স্পর্শের নেশায় বিভোর সেই সময়ে নলিনী বিঁধিয়ে দিলে তার চোখে আমূল ছুরি। তার বীভৎস চিৎকারে সমস্ত হাঁসপাতাল চম্‌কে উঠ্‌লো। নলিনী তার বক্তব্য শেষ কর্‌লে এই ব'লে, 'জানুম'

তার মৃত্যু হয়েছে, ভালো হয়েছে, জগতে একজন পাষণ্ড কমেছে। আমি দোষী, শাস্তি চাই আমি, সব্ চেয়ে যে কঠিন শাস্তি ফাঁসী তাই দাও আমায়; কিন্তু তার আগে জিজ্ঞাসা করি—'আমার ওপর যারা অত্যাচার করেছিল তাদের শাস্তি হ'ল না কেন এখনো? একজন শাস্তির ভারে ঢলে পড়েছে চিরনিদ্রার কোলে, কিন্তু সমাজপতিরা যে রয়েছে এখনো বাকী।'

"তার ফাঁসীর বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হ'ল জজের দয়ায়। কিন্তু পরদিনই হতভাগিনী গলায় ফাঁসী দিয়ে লাঘব কর্‌লে নিজের দুঃখের বোঝা কারো সাহায্য না নিয়েই।"

পল্লী-বধূ

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাঙা গোধূলির বেলা
হয়ে এল শেষ
এখনো হয়নি বাঁধা
বধূ তব কেশ!
নীরবতা নামে মাঠে
যাবে গো কখন ঘাটে?
এখনো আল্‌তা পরা
হয়নিক পায়,—
গাগরী শূন্য পড়ি;
বেলা যে পোহায়!

স্বামী ও দেবর তব
সারাদিন পরে
সারিয়া মাঠের কাজ
ফিরে এবে ঘরে।
পরশি পদ্ম-পাণি—
প্রদীপ জ্বাল'লো রাণী,
ক্লান্তি হর সবাকার
সুমধুর ভাবে,—
বাজাও শঙ্খ বধূ
বেলা ব'য়ে আসে।

চপল ছেলেরা সারা-
দিন খেলা শেষে।
বসেছে সুশীল হ'য়ে
উঠানেতে এসে।
কোথা ছিল শুক সারি—
সাত সাগরের বারি
কোথা হ'তে ল'য়ে এল
রাজার দুলাল?—
বল গো তাদের কথা
বলনি যা কাল!

বাঁশঝাড় তলা দিয়ে
নামে সাঁঝ কালো,
ঠাকুরঘরের দীপ
এবে দেবী জ্বালো।
হাতের কাঁকনগুলি—
ঝিণি ঝিণি ওঠে দুলি,
সিঁথির সিঁদুরে রাঙা
হ'ল দশখানি;—
প্রণমি তোমারে দেবী
লক্ষ্মী বধূরাণী।

শিশুমঙ্গল

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

সন্তানপালন সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে স্বভাবতঃই মনে হইবে যে, যে কার্য্যে সমুদয় জীব-জগত আবহমানকালাবধি নিয়ত নিরত রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধে বলিবার বা শুনিবার প্রয়োজন কোথায়? জীবশ্রেষ্ঠ মানব হইতে ক্ষুদ্রাদপি কীটাণু পর্য্যন্ত সকলেই তো নিজ নিজ ভাবে স্বীয় সন্তান প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে, আজ এতদিন পরে আবার তাহার জন্য এত আড়ম্বর বা আয়োজন কেন?

কিন্তু আমাদের সকল আয়োজনই যে আমাদের প্রয়োজন ব্যতীত ঘটিতে পারে না, একথাও নিশ্চিত সত্য। জীবজগতে অনাদিকালাবধিই সন্তান-পালন কার্য্য চলিতেছে, তেমন জীবরাজ্যের বহুতর ক্রিয়াই তো চিরন্তনীভাবে নিত্য ও নিয়ত সম্পাদিত হইতেছে; কিন্তু সকল কার্য্যের সম্বন্ধেই এক একটা অবনতির যুগ আইসে, এবং তৎপরে তাহার পরিবর্ত্তনের কাল দেখা দেয়, তখন আর তাহা তাহার সেই পুরাতন ধারায় পরিচালিত হইতে পারে না; তাহাকে পুনঃসংস্কৃত করিতেই হয়।

ভারতবর্ষে শিশুমঙ্গল-সমিতির প্রতিষ্ঠা কিম্বা সন্তানপালন সম্বন্ধে সাধারণকে শিক্ষাপ্রদান করিবার প্রয়োজনীয়তা নাই, এমন কথা যদি কেহ বলেন, তবে তিনি হয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, অথবা এ সম্বন্ধে অজ্ঞ আছেন বলিতেই হইবে। কারণ দেশের সবলতা তাহার অধিবাসীবৃন্দের সুস্থতার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে, ইহা অবিসম্বাদী সত্য। কিন্তু এদেশ যে কতই সুস্থ ও সবল, তাহার প্রমাণ এদেশের কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ অকালবৃদ্ধ যুবকবৃন্দ এবং ক্রমবর্দ্ধনশীল মৃত্যু সংখ্যা। তাই বলি শিশুরক্ষা-সমিতির যদি কোথাও সত্যকার প্রয়োজনীয়তা ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা এই ভারতবর্ষেই ঘটিয়াছে। মানবসমাজের সহিত যথার্থ সহানুভূতি সম্পন্ন সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই ইহার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক অন্তরের সহিতই ইহার সহিত যোগদান করিবেন এবং ইহা দ্বারা নিজের দেশকে সুস্থ, সবল, দীর্ঘজীবী, জীবনসংগ্রামে সুদৃঢ় সন্তান সকল প্রদানপূর্ব্বক ইহাকে জগতের মধ্যে বরণীয় করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইবেন, ইহাতে সংশয় নাই। যেহেতু রুগ্নদেহ স্বল্পজীবী অপরিচ্ছন্ন ব্যাধিক্লিষ্ট অৰ্দ্ধমৃত জনসমাজ স্বদেশের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার উন্নতিরই আশাহীন,—ইহাদের দ্বারা দেশে নানাবিধ কষ্টকর রোগের বৃদ্ধি, যন্ত্রণাকর দারিদ্র্যের আত্যন্তিক প্রসার, পরানুগ্রহজীবী ভিক্ষুকশ্রেণীর সৃষ্টি ব্যতীত অপর কোন সুফল লাভ হইতে পারে না। শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ যে শারীরশক্তির একান্তাভাব ঘটিলে মানসশক্তিও প্রসারতা লাভ করিতে অসমর্থ হয়। চিররুগ্ন ব্যক্তির মস্তিষ্ক অপূর্ণ, হৃদয় অনুদার এবং আশয় ক্ষুদ্র হইবেই। অথচ দেশের উন্নতি নির্ভর করিতেছে সর্ব্বপ্রকারে সুস্থতম সুদীর্ঘজীবী স্থিরবুদ্ধি উন্নতহৃদয় ও উচ্চাশয় জনগণের উপরেই, স্বাস্থ্যহীন জাতির মধ্যে তাঁহাদের আবির্ভাব ক্রমশই মন্দীভূত হইতেছে এবং হইলেও অকাল-মৃত্যুর কল্যাণে তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হইতে পারে না। ইহাই জাতীয় অধঃপতনের পূর্ণ লক্ষণ!

বাংলাদেশে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে হাজার করা ১৮২·৮ হিসাবে শিশুমৃত্যু ঘটিয়াছে। কলিকাতায় ঐ সালে শিশুমৃত্যুর হার হাজারকরা ২৯৪·৬, লণ্ডনে ১৯০৩ হইতে ১০ অবধি ১১২ প্রতি সহস্রে শিশুমৃত্যুর হার, কিন্তু ১১ বৎসরকালব্যাপী শিশুরক্ষা-সমিতির

অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এক্ষণে এই ১৯২৩ অব্দে সেখানের শিশুমৃত্যু হাজার করা ৬০এর সংখ্যায় নামিয়া পড়িয়াছে। ইহা কত বড় সুসংবাদ! কলিকাতার মধ্যস্থ এক জোড়াবাগান থানার এলাকাতেই প্রতি সহস্রে ৬৭৩ জন শিশু এক বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

যে দেশে লোকসংখ্যার এইরূপ অযথা ক্ষয় হয় সে দেশ নিঃসন্দেহ ধ্বংসোন্মুখ।

যদি এদেশের মায়েরা সন্তানপালন সম্বন্ধে একটু শিক্ষালাভ করেন, সূতিকাগারকে অপরিচ্ছন্ন আঁস্তাকুড়ে পরিণত না রাখিয়া তাহা ভবিষ্যৎ বংশধরের আবাসমন্দির ভাবে পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটী রাখেন, যদি তাহার জীবনোপায়স্বরূপ মাতৃদুগ্ধকে বিশুদ্ধ রক্ষার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করেন এবং সেই শিশু-প্রাণস্বরূপ মাতৃদুগ্ধে বৎসর মধ্যে অপর অংশীদারের আবির্ভাব না ঘটিতে দেন, যদি রুগ্ন শিশুর পথ্যা-পথ্য সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জনপূর্ব্বক সেইভাবে তাহাকে রক্ষণ ও পালন করিতে পারেন, যদি নিজ গৃহে পূতিগন্ধাদিযুক্ত রোগমূলক আবর্জ্জনা প্রভৃতি জন্মিতে না দিয়া গৃহকে স্বাস্থ্যপূর্ণ রাখিতে পারেন, যদি আলস্যবশতঃ স্বাস্থ্যহানিকর মলিনতার মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ না করেন, রাশি রাশি বোতলবদ্ধ বিলাতি ফুড না খাওয়াইয়া গৃহপালিত বিশুদ্ধ গাভী-দুগ্ধের সুব্যবস্থা ঘটাইতে পারেন, বাজারের কেনা দুষ্পাচ্য বস্তু ভোজন না করান, নিজের বিলাসিতা, নভেলপ্রিয়তা বা তাসখেলার আসক্তি বশতঃ অথবা আলস্যবশে অশিক্ষিতা মমতাহীনা দাসীর হস্তে সন্তানপালনের সমস্ত দায়ীত্ব ফেলিয়া না দেন, তবে এদেশেও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে কেনই বা না পারিবে? আমাদের দেশের সূতিকাগারগুলি নিতান্তই অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন রাখা হয়। অবশ্য এদেশ দরিদ্রের দেশ, মুষ্টিমেয় ধনীগৃহের কথা ছাড়িয়া দিলে সাধারণতঃ সকল লোকের বাস-গৃহই বিশেষতঃ সহরবাসের কল্যাণে নিতান্ত অপরিসর, বায়ু-চলাচলহীন ও অস্বাস্থ্যকর। পল্লীগ্রামে ঐ দোষ কম থাকিলেও পচা ডোবার জন্য সেখানের স্বাস্থ্যও সবিশেষ দূষিত। ঐ পচা ডোবাগুলি আমাদের দেশে যমদূতের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। অনেক স্থলেই প্রসূতিকে নিরুপায়েই ঐ দূষিত জলদ্বারা শিশুর বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিতে হয়, বহু স্থলে ঐ জল প্রসূতির পানার্থ ও স্নানার্থ ব্যবহৃত হইয়া তাহাদের দুর্ব্বল শরীরকে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস ভয়ানক ব্যাধির আক্রমণ-বিষে জর্জ্জরিত করে। এই সকল অপ্রতি-বিধেয় অভাবের সম্বন্ধে শিশুরক্ষা-সমিতির দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া সঙ্গত। কিন্তু এমন অনেক পরিবার এখনও আছে, যেখানে সূতিকাগারের এবং প্রসূতি ও প্রসূতের দুরবস্থা অভাববশতঃ নহে, পরন্তু স্বভাবতঃ। সেইগুলিই একান্ত দোষাবহ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বায়ু-চলাচল ও রৌদ্রতাপযুক্ত ঘরই সূতিকার উপযুক্ত। অনেক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরে এখনও সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট নিম্নতলস্থ কক্ষ সূতিকাগৃহের জন্য ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, ইহা সঙ্গত নহে। খাট গদী বিছানা তোয়ালিয়া যোগাইবার মত অবস্থা এদেশে খুবই কম লোকের, সে খবর হয়ত অনেক চিরভাগ্যবতী ধনী গৃহবাসিনীরা রাখেন না, তবে সে সব না পারিলেও তক্তাপোষ, দুখানা কম্বল ও ধোপার বাড়ীর ধোয়ান ছেঁড়া কাপড় একটু বেশী পরিমাণে দিবার সাধ্য অনেকের থাকে; যাহাদের তাও থাকে না, সমিতির কাছে তাহাদের আবেদন করা সঙ্গত হইবে। আমি বলি যাঁহার সামর্থ্য আছে তিনি প্রসূত ও প্রসূতির উপর কার্পণ্য করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্যহানি দ্বারা নিজের বংশের সর্ব্বনাশ করিবেন না, আর যিনি অসমর্থ তিনিও দুই চার আনার সাবান, ফেনাইল ও সম্মার্জ্জনীর ব্যবহারে যতটুকু সম্ভব পরিচ্ছন্নতা রক্ষার চেষ্টা করুন। কারণ ঐ যে নবজাত শিশুসন্তানটী আপনার ঘরে আজ দেখা দিল, অদূর ভবিষ্যতে সে যে একজন মহাপুরুষ, মহাত্মা, যুগাবতার, সে যে আর একজন

রামমোহন, ভূদেব, বিদ্যাসাগর, সে যে আর একজন তিলক, গান্ধি, গোখলে, সে যে আর একজন কর্ম্মীকৃতি দেশমান্য ধন্য পুরুষ না হইয়া দাঁড়াইতে পারে, তার তো কোনই প্রমাণ নাই! আজ তার আগমনকে তুমি অবহেলায় ব্যর্থ করিলে হয়ত নিজের উত্তর পুরুষের, হয়ত সমুদয় সমাজ ও স্বদেশের তুমি সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। তাই বলি ভবিষ্যৎ যখন আমাদের চক্ষে অজ্ঞাত, কোন্ শিশু যে উত্তরকালে কোন্ মহাশক্তিশালী পুরুষপুঙ্গবে পরিণত হইয়া দাঁড়াইবেন, তাঁহার যখন কোনই প্রমাণ আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়, তখন আপন আপন গৃহজাত, নবজাত শিশুগুলিকে 'আমাদের দিব্য পুরুষের আবির্ভাব কল্পনাতেই সাগ্রহে ও সাদরে বরণ করিয়া লইয়া সযত্নে লালন ও পালন করাই উচিত। মহাত্মা ৺ভূদেবচন্দ্র তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধেও এই কথাটী অতি সুন্দরভাবে বলিয়া গিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, আমরা নিজের ছেলেদের নকড়া ছকড়া হিসাবেই দেখি, তাই তাদের তাই-ই দেখিতে পাই, বড় চোখে দেখিয়া, বড় মনে বড় গড়িতে চাহিলে বড়ই গঠিয়া উঠে।—যাদৃশী সাধনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

আমাদের পক্ষে এ কথাটা ঠিকই খাটে। ছেলের ও ছেলের মায়ের শরীরের স্বাস্থ্য দেখিব না, মনের উন্নতির চেষ্টা করিব না, অথচ মস্ত বড় বড় জিনিসের আশা করিয়া বসিয়া থাকিব। তা হয় না। সাধনা ব্যতীত কোন কার্য্যেরই সিদ্ধি লাভ হয় না। বড় জিনিষের জন্য তপস্যাও কঠোর হওয়া আবশ্যক।

হে আমার ভগিনীগণ! আপনারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া লউন। নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ মাতৃত্ব। 'নারীর পূর্ণতা এই মাতৃ-জীবনেই—ইহা আপনারাও সকলে জানেন'। নারীর নারীত্ব তখনই ব্যর্থ হয়, যখন নারী তার মাতৃ-জীবনকে অবহেলা করিয়াছে। নিতান্ত পিশাচিনী না হইলে মা হইয়া সন্তানের ক্ষতি কেহ করিতে পারে না; এবং একথা খুবই ঠিক যে জগতে ঐ সংখ্যা নিতান্তই অল্প। কিন্তু আর একটা জিনিস আছে, যদ্দ্বারা অনিচ্ছুকভাবেও এদেশের সহস্র সহস্র জননী স্বীয় প্রাণাধিক সন্তানবর্গের প্রভূত অকল্যাণ সাধনপূর্ব্বক নিজেদের মাতৃত্বকে অভিশাপ-গ্রস্ত করিয়া ফেলিতেছেন, তাহার নাম অজ্ঞতা। ছেলের পক্ষে কিসে ভাল সেটাই না জানিলে তার ভালর নামে অধিকাংশকালে মন্দ করিয়াই ফেলিতে হয়। ধরুন রুগ্ন শিশু খাবারের জন্য আব্দার করিতেছে, মা তার আব্দারের জিনিস কুপথ্য দান করিলে তাকে হয়ত স্বহস্তে বিষ ভোজন করান'র পাপে পাপী হইবেন, অথচ মায়ের সেটুকু ধারণা করিবার শক্তি নাই।

আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি কোন ভদ্র-পরিবারস্থা শাশুড়ী ও বধূ একটী রুগ্ন শিশু লইয়া থিয়েটার দেখিতে গিয়া সেখানেই তাহাকে বিসর্জ্জন দিয়া আসেন। শিশুটীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বাবধিই তাঁহারা থিয়েটার দেখিতে ব্যস্ত ছিলেন ও মৃত্যু-লক্ষণসকল চিনিতে পারেন নাই। এইরূপ সর্ব্ব-বিষয়ে ছেলের স্বাস্থ্য ভাল রাখার ভার মায়ের হাতেই সব চেয়ে বেশী, কয়জন মা সে কথা ভাবিয়া চলেন? সন্তান গর্ভে যতক্ষণ থাকে গর্ভিনীর খাওয়া শোয়া বিশ্রাম এ সমস্তই ভবিষ্যৎ-সন্তানের জন্য খুব সাবধানতা অবলম্বনপূর্ব্বক ব্যবস্থিত ও পালিত কদাচিৎ কোন পরিবারে হয়, অথচ ঐ সময়ের কার্য্যের উপরেই গর্ভস্থ শিশুর চির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। শাক, পাতখোলা প্রভৃতি তমগুণযুক্ত অসার ও কদাহারে বর্দ্ধিত শিশুও তমগুণের প্রাধান্যে জড়ত্ব লাভ করিয়া জাত হয়। অবশ্য 'অভাবই এদেশে কদাহারের ও অল্পাহারের প্রধান কারণ বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বভাব-দোষ ইহার মধ্যে বড় কম নয়।

তারপর মায়েদের আলস্যবশতঃ শিশু রোগ, যথা চোখ উঠা, মাথায় ও গায়ে ঘা, পাঁচড়া, সর্দ্দি কাশি, পেটের অসুখ এগুলি প্রায়ই লাগিয়া থাকিয়া শিশুকে স্বল্পাবয়ব ও রোগের আকর করিয়া

তুলিতে দেখা যায়। আঁতুড়ঘর হইতে নিয়মিত চোখ ধুইয়া দেওয়া, গা-মাথা পরিষ্কার, খাওয়ার নিয়ম ঠিক রাখা, এসব গুলি পালিত হইলে এই মন্দ ফলগুলি বহুলাংশে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ছেলে কাঁদিলেই খাইতে দিতে নাই, আবার খাওয়ার সময় পার করিয়া খাওয়ানও ক্ষতিকর। কত বয়সে কত কত বিলম্বে কতটুকু খাওয়ান সঙ্গত, মধ্যে মধ্যে কালমেঘ বাটিয়া খাওয়ান দরকার, স্নান সহ্য হইলে প্রত্যহ সাবধান হইয়া করান আবশ্যক, এই সকল বিষয়ে মায়েদের যথোচিত শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন।

সন্তানের শরীর মনের সমুদয়টুকু তাহার মায়ের উপরেই যে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, ইহার মধ্যে অত্যুক্তি নাই। মা সবল হইলে সন্তান বলিষ্ঠ হইবে, মা শিক্ষিতা হইলে সন্তানের শিক্ষা পূর্ণ হইবার সুযোগ ঘটিবে, মায়ের চিত্ত উদার, স্বদেশ-প্রেমে পরিপূর্ণ, সংযত ও ধর্ম্মানুরাগে মহত্তর হইলে সন্তানকে নিশ্চয়ই সেই সকল মহত্তর গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হইতেই হইবে, ইহাতে সংশয় নাই।

উন্নতচরিত্র পিতার নীচমনা পুত্র দেখা যায়; কিন্তু মাতৃসম্বন্ধে এরূপ অবস্থা প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায় না। মায়ের মন যেখানে সমুদ্রের মত বিশাল সন্তানের চিত্ত সেখানে ডোবার মত সঙ্কীর্ণ হওয়া সম্ভবে না। তাই বলি এদেশের মাতৃবৃন্দ! ভবিষ্যৎ জননী সকল! তোমরা নিজ নিজ শরীর মনের উৎকর্ষ সাধনপূর্ব্বক এদেশের ধ্বংসোন্মুখ শিশু-রাজ্যের মঙ্গলসাধনে যত্নবতী হইয়া স্বজাতির কল্যাণসাধন করিতে বদ্ধপরিকর হও!

তারপর শিশুপালন সম্বন্ধে আমি আরও কয়েকটী বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করিব। যেমন শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাহার অভিভাবকবৃন্দের প্রথমাবধি সম্পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তেমনই তাহার মানসিক স্বাস্থ্য অর্থাৎ নৈতিক শিক্ষার প্রতিও তাঁহাদের একান্ত মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। যেমন ক্ষুদ্র বীজ হইতেই মহা-মহীরুহের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তেমনই একটী ক্ষুদ্রতম শিশুই একদিন মানব-পিতামহে পরিণত হয়। বীজটী রোপণ করিয়া তাহার অঙ্কুরোৎপাদন করিতে হইলে যথারীতি সযত্ন-সেবা দ্বারা তাহাকে বর্দ্ধিত হইতে দিলে ভাল ফলের আশা করা যায়; শিশু-পালনেও ইহার ব্যতিক্রম হয় না। শিশুকে শিশু বলিয়া অবজ্ঞা করিও না, অত্যন্ত শৈশবকালেই শিশু-চিত্তের বিকাশ আরম্ভ হইয়া যায়। দুই এক-মাস বয়স হইতেই শিশুটীকে যে বিষয়ে যেরূপভাবে অভ্যাস করাইবে সেই ভাবেই সে অভ্যস্ত হইতে থাকে, ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে। কোলে বেশী রাখিলে ঐ বয়স হইতেই আর তাহারা কোলের বাহিরে শুইতে চাহে না, অন্ধকারে অভ্যস্থ থাকিলে আলোয় ঘুমাইতে পারে না, বেশী আলোয় রাখা অভ্যাস করিলে অন্ধকারে লইয়া গেলেই কাঁদে। এই সকল উদাহরণ হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে শিশুকে শিশু বলিয়া কোন দিনই তুচ্ছ করা সঙ্গত নহে। শৈশবকালকে অধিকাংশ লোকেই নিতান্ত কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। শিশুদিগের সকল কার্য্যকেই তাঁহারা 'আহা' বলিয়া ছাড়িয়া দেন, কিন্তু সেটা আদৌ সঙ্গত নহে। অনেক লোক আছেন যাঁহারা ছেলে আব্দার ধরিলে সম্ভব হইলে আকাশের চাঁদ ধরিয়া তাদের হাতে দিবারও অপক্ষপাতী নহেন। আবার তাঁহারাই অপরকেও নিজের স্বপক্ষে টানিয়া এই কথা বলিয়া থাকেন যে, "আহা কচি ছেলে চাইছে, বড় হ'লে কি আর চাইবে? দিয়ে দাও না।" কিন্তু শৈশবের এইরূপ প্রশ্রয় দান সেই শিশুর পক্ষে চিরদিনের জন্য ঘোর শত্রুতা সাধন করা—এই কথাটা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। চাওয়া মাত্রেই সঙ্গত অসঙ্গত সকল আব্দারই পূর্ণ হইতে থাকিলে ঐ শিশু ক্রমশই অধিকতর আব্দারে ও জেদী হইয়া উঠে এবং তাহার আকাঙ্ক্ষারও আর শেষ থাকে না। কামনা পূর্ণ হইলেই আবার তাহার স্থলে নূতন নূতন কামনার

উদ্ভব হওয়া মানব-প্রকৃতির মধ্যে একান্তই স্বাভাবিক। সেইজন্যই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে—

নজাতু কাম কামানামুপভোগেন সাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণ বর্ত্মেব ভূয়ো এব্যাভিবর্দ্ধতে ॥

অগ্নি যেমন ঘৃত সহযোগে বর্দ্ধিত হয়, কামনাও কাম্য-বস্তুর উপভোগ প্রাপ্তে তদ্রূপ বর্দ্ধিত-শক্তি হইতে থাকে। তাই শিশুর অসঙ্গত আব্দারগুলি সযত্নে পরিহারপূর্ব্বক অতি শৈশবাবধি তাহাদের যুক্তিসহকারে উহার অন্যায্যতা প্রদর্শন করিয়া সংযত-স্বভাব করণের বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। আমি দেখিয়াছি, দিব না বলিয়া ধমক না দিয়া কেন দিব না, কেন লওয়া সঙ্গত নহে এইগুলি বেশ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিলে অত্যন্ত আব্দারে ছেলেও তার জিদ ছাড়িয়া দেয়। অধিকাংশ মা-বাপে সেই পরিশ্রমটুকু করেন না বলিয়া ছেলেকে অযথা প্রশ্রয় দিয়া বৃথা দুরাকাঙ্ক্ষী তৈয়ারি করেন, ইহার ফলে ভবিষ্য-জীবনে নৈরাশ্য ঘটিলে সে বড় সহজেই ভাঙ্গিয়া পড়ে, অথবা অমিতব্যয়ী খামখেয়ালি ইত্যাদি হইয়া নিজেকেও দুঃখ দেয় এবং আত্ম-জনকেও দুঃখিত করে। শেষে সে ধমক খাইয়া খাইয়া মনমরা ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, ক্রমশঃ তাহার বিশ্বাস দাঁড়ায় যে মা-বাপ তাহাকে দেখিতে পারেন না, কেবলই শাসন করেন।

ছোটবেলার অভ্যাসটি এতই দৃঢ় হইয়া উঠে যে, সারাজীবনেও কখন আর সে অভ্যাসের হাত ছড়াইতে পারা যায় না। এই সত্যটুকু বড়ই সহজে আপনাদের চোখে পড়িবে যদি আপনারা নিজের নিজের শৈশবাবস্থাগুলি স্মরণে লইয়া আইসেন। আজ আপনি যতই কেন না বৃদ্ধ হউন আর বিজ্ঞই হউন, ছোটবেলায় যদি আপনার 'ভূতের ভয়' থাকে, তবে আজও সে ভয় আপনাকে ছাড়িতে পারে নাই। নির্জ্জন বনের ধারে অন্ধকার হইয়া আসিলে মনের মধ্যে এখনও আপনার একটুখানি চমক লাগেনা কি? হয়ত স্পষ্ট করিয়া সেটাকে আর আপনি মনের মধ্যে আমোল দেন না, হয়ত মনকে একটু আঁখিও ঠারেন, কিন্তু তবু সেটা যে সেই পুরাণো বিশ্বাসেরই একটু অংশ তাহাতে সংশয় নাই। অধিকাংশ মায়েরাই ছেলের কান্না আব্দারে বিব্রত হইয়া তাহাকে জুজুর হাতে ধরাইয়া দিতে চাহেন, ছেলে থামাইবার এর চেয়ে সোজা উপায় অবশ্য আর কিছুই নাই, সে আমিও স্বীকার করি; কিন্তু এর ফলেই আমাদের দেশের খোকারা খোকার 'বাবা' হইয়াও সেই জুজুর ভয়ে সর্ব্বদা জড়সড় হইয়া সমস্ত জীবন যাপন করিতেছেন, কোন দিনই এ ভয়ের হাত তাঁহারা ছাড়াইতে পারিলেননা। ঘরে গৃহিনীর ভয়, বাহিরে মনিবের ও পথে ঘাটে সভাসমিতিতে পুলিসের ভয়, আবার যে কোন ভাল কাজে বন্ধুবান্ধবের তামাসা বিদ্রূপের ভয়, সাহেবমহলে অ-সাহেব প্রতিপন্ন হওয়ার বিষম ভয় ইত্যাদি সকল ভয়ই যে সেই শৈশব-জীবনের প্রথম শিক্ষার মাতৃদত্ত জুজুর ভয় হইতেই উৎপন্ন ইহা সহজেই বলা যায়। এক পা স্বাধীনভাবে চলিলেই 'জুজুতে ধরে, অন্ধকারে জুজু আসিয়া ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে, ভাত খাইতে দেরী হইলে জুজু থলি লইয়া ধরিতে আসে, ঘুম না আসিলেও মাথার শিওরে সেই জুজুরই আমদানী! আমি জানি অনেক ছেলে রাতদিন জুজুর ভয়ে আঁৎকাইয়া থাকিয়া ঘুমাইয়া জুজুকে দেখিয়া আতঙ্কে কাঁদিয়া উঠে। এ অবস্থায় শিশুদের কখন কখন খুব সাঙ্ঘাতিক পীড়াও হইয়া থাকে। কখনও কোন কৃত্রিম ভৌতিক নিদর্শনকে সত্য বিশ্বাসে আকস্মিক ঘোর আতঙ্কে অভিভূত হইয়া গিয়া কোন কোন বালকবালিকা মারা গিয়াছে বলিয়াও শুনা যায়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে শিশু বা বালকদিগকে সর্ব্বপ্রকার ভয় দেখান হইত মায়েরা যেন বিরত থাকেন, তাঁদের কাছে এই বিনীত নিবেদন। শান্ত সুশীল ছেলে মায়ের পক্ষে ততদিনই সুবিধা—যতদিন তাহার সম্মুখে কঠোর জীবনসংগ্রাম না দেখা দেয়। বিশেষতঃ আজিকালিকার এই ঘোর সংঘর্ষময় জীবনযাত্রার দিনে মায়ের আঁচলধরা নীলমণিদেরই

যে সর্ব্বাপেক্ষা মহাবিপদ! তারা ঘরের বাহিরে পা-টি দিতে জানে না, একলা পথে বাহির হইবার উপায় তাদের নাই, অথচ জীবনযাত্রার মহা সমরক্ষেত্রে তো ভীষ্মদেবের ভিড় হয় না যে মাটীকে শিখণ্ডীর মত সামনে ধরিয়া দাঁড়াইতে পারিলে এখানের বিঘ্ন বিনাশ হটিয়া চলিয়া যাওয়ার সোজা পথ পাওয়া যাইবে! ছেলের মনে ভরসা দিয়া তাকে আত্ম-নির্ভরশীল, সুসংযত ও সাহসী তৈয়ারী করিবার চেষ্টা অতি শৈশবাবধি মা যদি না করেন তবে শতবর্ষেও আর তাহা সাধিত হইয়া উঠিবে না। চলিত কথায় যে বলা হয় "কাঁচায় বাঁশকে না নোয়াইলে পাকলে নোয়ানো যায় না।"-- সে বড় ঠিক কথা।

তারপর শিশুর সহিত কখন মিথ্যাচরণ করিতে নাই। প্রায়ই দেখা যায় অনেক মায়ে এবং বাপেও ছেলেকে মিথ্যা স্তোক দিয়া ভুলাইয়া থাকেন। এর মত কুশিক্ষা আর কোথাও নাই! খুব ছোট ছেলেতেই তাঁদের এ মিথ্যা ভাষণ বেশ বুঝিতে পারে দেখা যায় এবং ফলে সেই শিশুকাল হইতেই মিথ্যাচরণ করিতে এবং অভিভাবকদিগকে অবিশ্বাস করিতে একসঙ্গে দুইটী অন্যায় কার্য্যই শিখিয়া ফেলে। এই মিথ্যা কথন বা মিথ্যাচরণ একবার অভ্যস্ত হইলে আর কখনই তা ছাড়ানো যায় না, জন্মের মতই অস্থিমজ্জায় উহা একেবারে বসিয়া গিয়া শিশুটীকে পশু করিয়া ফেলে। অতএব খুবই সাবধান হইয়া শিশুর সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। 'দিব' বলিয়া না দেওয়া, 'কাকে লইয়া গেল' ইত্যাদি বলিয়া নিজেই লুকাইয়া ফেলা এই-রূপ ছোটখাট কথা লইয়াই ইহার সৃষ্টি; কিন্তু এই ক্ষুদ্র বৃক্ষের ফল একেবারেই বিষ-তিক্ত। মিথ্যার মত ছোট ও নোংরা জিনিস মানুষের মধ্যে আর কিছুই নাই, কারণ যত কিছু অন্যায় ও পাপ তৎসমুদয়ই মিথ্যাশ্রয়ী। মিথ্যাকে পরিহার করিতে পারিলে পাপ করিবার উপায় থাকে না। তাই বলা হইয়াছে 'সত্যাৎ পরস্তরোনহি', 'সর্ব্বংসত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ' এবং বেদ ও উপনিষদে সত্য ও ব্রহ্মকে অভিন্ন বলা হইয়া থাকে। সত্যজ্ঞান 'মানন্দম ব্রহ্ম'। ব্রহ্মের স্বরূপই সত্য। এই ব্রহ্মরূপী সত্যে সুদৃঢ়ভাবে স্বীয় সন্ততিবর্গকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে হে আমার স্বদেশবাসিনী ভগিনিগণ, আপনারা সত্যসঙ্কল্পা হউন। তাহা হইলে আবার আমাদের স্বদেশ স্বর্গোপম হইবে। যেহেতু 'সত্যমূলা ক্রিয়া সর্ব্বা', সকল ক্রিয়ার মূলই যখন সত্য, তখন সত্যকে আশ্রয় করিলে সমস্তই লাভ হইবে এবং সত্যপ্রিয়, সত্যব্রত অপাপবিদ্ধ মনুষ্যবর্গ দেবতারই রূপান্তর পরিগ্রহ করিতে পারিবেন। আর এই এত বড় একটা মহত্তম কার্য্য আপনাদেরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। এক্ষণে আপনাদের দায়িত্ব বুঝিয়া দেখিয়া স্বকার্য্য সাধনে মনোযোগিনী হউন, ধন্যা জননী হইয়া স্বদেশকেও ধন্য করুন।

সন্তানপালন সম্বন্ধে আর একটী বিশেষ ত্রুটীর কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। অনেক মা আছেন তাঁরা অন্যের উপর রাগ করিয়া নিজের ছেলের উপর সেই রাগের ঝাল ঝাড়েন, এমন কি ছেলের বাপের অপরাধে অধিকাংশ সময় ছেলেই তাঁর ঠেঙ্গা খাইয়া তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হয়। অথচ সে বেচারা হয়ত এ সকল অহেতুক শাসন অত্যাচরের কোন কারণও খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু মায়ের অবিচারটাই বুঝিয়া লয়। মা বাপকে একটা রক্তশোষক শাসনযন্ত্র মাত্র বোধ করিয়া মনে মনে সে তাঁদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতে থাকে এবং সময় আসিলে ইহার সুদশুদ্ধ আদায় করিয়া ছাড়ে কিন্তু যে অবিবেচনা-বৃক্ষের এই কটু ফল, তাহার কথা মা-বাপ বিস্মৃত হইয়া যান, অথবা তাহা বুঝিতেও পারেন না। কিন্তু বিশ্বরাজ্যের বিচারসভায় যে ন্যায়ের তুলাদণ্ড টাঙ্গানো আছে, সেখানে তিলমাত্রও ফাঁকি চলে না, এযে একেবারেই অখণ্ডনীয় সত্য! টক আমের গাছ পুঁতিয়া কলমী আমের আশা করিলে আশাহত হইতেই হইবে!

ছোট ছেলেদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে জাগ্রত থাকা মা বাপের মুখ্য কার্য্য। তাঁদের প্রতি

এতটুকু শৈথিল্য দেওয়া চলে না, আবার অতি কাঠিন্যও সেইরূপ দোষাবহ। শৈশবাবস্থাতেই তাদের ধর্ম্মশিক্ষার প্রতি বিশেষরূপ মনোনিবেশ করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। নৈতিক শিক্ষার প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখাও বিশেষ আবশ্যক। কর্ত্তব্যজ্ঞান, আত্ম-মর্য্যাদা, স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি, স্বজনবাৎসল্য যাহাতে শিশুচিত্তেই জন্মিতে পারে ও স্ফূর্ত্ত হয় সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা আবশ্যক। ভোরে উঠিয়া এবং শয়নের পূর্ব্বে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় এবং নীতিসম্বন্ধীয় সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতে অভ্যাস করান, মধ্যে মধ্যে তাঁহার অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া, বাংলা ও ইংরাজী করিতা মুখস্থ করান উচিত, ইহাতে ধর্ম্মজ্ঞান জাত ও স্মরণ শক্তির প্রসার হইবে। গল্পচ্ছলে স্বদেশের ও বিদেশের মনোগ্রাহী ইতিহাস, পুরাণাদি শিক্ষাদান করা ভাল, ইহাতে শিয়ালের ও চিংড়ীমাছের মিথ্যাচরণ ও চাতুর্য্যময় কাহিনীর আলোচনা কম পড়ে এবং ইতিহাসাদির প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়। আর একটী জিনিস বাপমায়েরা প্রায়ই বড় ভুল করিয়া থাকেন। ছেলেয় ছেলেয় বিবাদ ঘটিলে কখন কখন সেটা তাহাদের অভিভাবকদিগের মধ্যেও শোচনীয়ভাবে বিস্তৃতিলাভ করিতে দেখা যায়। অথচ ছেলেদের ঝগড়ায় একটুখানি ধৈর্য্য ধরিয়া দোষানুসন্ধানপূর্ব্বক সুবিচার করিয়া দিলে অতি সহজেই তাহা নিবৃত্ত হইয়া তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বসখ্য পুনঃসংস্থাপিত হইতে পারে। ছোটদের কোন কান্নাকেই বড় করিয়া লইতে নাই, ইহা দ্বারা কলহ-প্রিয়তা ও দলাদলির অভ্যাস তৈয়ারি করিয়া দেওয়া হয়।

আর একটা জিনিস আমাদের সমাজের বড়ই ক্ষতিকর হইয়া আছে। আমাদের দেশে "রাঙ্গা বউ এনে দেবো পায়ে তেল দিতে।" "বেঁচে থাকুক চূড়া বাঁশী, কত শত মিলবে দাসী।" ইত্যাদি রূপ শৈশব-শিক্ষার ফল সর্ব্বদাই বিষময় হইতে দেখা যায়। একতো বউ জিনিসটার প্রতি ছোট হইতেই একটা প্রবল লোভ জাত হইয়া থাকে, দ্বিতীয়তঃ বউটী যে বরের পায়ে তেল দিবার দাসী; এবং তাহা যে চূড়া বাঁশী বজায় থাকিলেই শত শত সংখ্যায় পাওয়াও সম্ভব, এই উচ্ছৃঙ্খল স্বার্থান্ধ শিক্ষা শুধু নারী-মর্য্যাদারই নহে, পুরুষের আত্মমর্য্যাদারও অবমাননাকর! এগুলি ছেলেভুলান ছড়া হইতে উঠিয়া যাওয়াই সঙ্গত। আবার ঠাকুরমা দিদিমা শ্রেণীর লোকেরা একটী ফুটফুটে ছেলেমেয়ে দেখিলেই তাহাদের বরবধূ সম্পর্ক পাতাইয়া দিয়া বসেন, সেই অদূরদর্শিতার ফলটী সর্ব্বথা ভাল বলিয়া আমি মনে করি না। শিশুজীবনে ছেলেদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ সমস্তই উচ্চাভিমুখী করিয়া দেওয়া মা বাপের কর্ত্তব্য। ভীষ্মের ত্যাগ, কর্ণ একলব্যের আত্মোন্নতি, অর্জ্জুনের বীর্য্যবত্তা, পৃথ্বীরাজ, প্রতাপসিংহ, প্রতাপাদিত্যাদির বীরত্ব-কাহিনী, শতমন্যু বাদল প্রভৃতির দেশের জন্য আত্মত্যাগ, ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতির ভগবদ্ভক্তি এই সকলই তাহাদের সম্মুখে আদর্শরূপে ধরিতে হইবে। কারণ বারবার বলিয়াছি এবং আবারও বলিব যে, শৈশব-শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা, শৈশবের আদর্শই চির-জীবনের আদর্শ, শৈশবের আশয়ই চিরদিনের আশয়, শতবর্ষেও ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় না, কখনও তা হইতে পারে না। আর শিশুর সেই শৈশব-শিক্ষয়িত্রীই তাহাদের মা। অতএব, সুস্থ, সবল, সুদীর্ঘজীবী, সুচরিত্র, শুভ্র যশমাল্য-বিভূষিত ও সৌভাগ্যবান সন্তানের সৃষ্টি করিতে হইলে জননীগণকে তাঁহাদের শরীর ও মানস-স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা লাভ ও তাহা কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত হইতেই হইবে। এ ভিন্ন আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। ইহার উপরেই আজ সমগ্র জাতির উন্নতি অবনতি, ইহার উপরেই আজ জাতির জীবন-মরণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে।

(এডুকেশন গেজেট)

প্রত্যাবৃত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(১৪)

কোথা দিয়া কার্ত্তিক মাসটা যে ফুরাইয়া আসিল কে জানে। দিন যাইতেছে সকলেরই, কাহারও আনন্দে, কাহারও দুঃখে। হেমলতার আনন্দটা খুব বেশী, কারণ সেবিকাকে তিনি জব্দ করিতে পারিতেছেন। সে যে নিজেই স্বামীর বিবাহ-প্রস্তাব বহন করিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়াছিল তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। নূতন বধূ আসিলে তাহাকে তাঁহার গৃহিণীপনা দেখাইয়া বাধ্য করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে সেবিকাকেও যে বিলক্ষণ জ্বালা দেওয়া হইবে তাহাতে তাঁহার একটু সন্দেহ ছিল না।

অসীমের সুখও নাই দুঃখও নাই। সে এখন চাহিতেছে শান্তি। এমন একটা স্নেহমাখা বক্ষ সে চায় যাহার আড়ালে থাকিয়া সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পাতলা হইয়া যাইতে পারে। সেবিকাকে সম্মুখে দেখিলে তাহার গাত্র কণ্টকিত হইয়া উঠে। বিষধর সর্প দেখিলে মানুষ যেমন সরিয়া যায়, সেও তেমন সরিয়া যায়। তাহার কথা ভাবিলে সে জগতের সকল নারীর প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলে। একবার ভাবে আর সংসার করিব না, আবার মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দেয়—সকল নারীই তো একরূপ নয়।

আর সেবিকা? তাহার মুখে হাসি ধরিতেছে না। সে যে আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া স্বামীকে সুখী করিতে যাইতেছে ইহাই তাহার বড় শান্তি। এই গোলমালে সেদিন সরিত যে কেন ওরূপ ভাবে ছুটিয়া চলিয়া গেল তাঁহা জিজ্ঞাসা করিতেও ভুলিয়া গিয়াছিল।

আর বৃদ্ধ ললিতবাবু? তাঁহার কথা বলিয়া কাজ কি? হেমলতা প্রথম যেদিন জানাইলেন অসীমের বিবাহ দিতে হইবে সেই দিনই তিনি লাফাইয়া উঠিয়াছিলেন। হেমলতা স্বামীর হৃদয়-কথা জানিতে পারিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন—ছেলে নিজেই ইচ্ছা করিয়া বিবাহ করিতে চায়, বউয়েরও এতে কোন অমত নাই; সেই তো নিজে উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিতেছে।

কথাটা ললিতবাবু বুঝিতে পারিলেন না। চিরকাল জানেন কোনও স্ত্রীলোক সতীন সহ্য করিতে পারে না। এ অবস্থায় সেবিকা যে নিজে উদ্যোগী হইয়া সতীন আনিতেছে তিনি ইহা বিশ্বাস করেন কি করিয়া?

কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেই হইল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন সেবিকা তাঁহার নিকটে আসিয়া হাসিমুখে বলিল, "বাবা, নতুন বউয়ের গহনা কিছু গড়ালেন না, মুখ দেখবেন কি দিয়ে?"

ললিতবাবু হা করিয়া তাহার মুখপানে চাহিলেন। দেখিলেন সে মুখ দিব্য প্রশান্ত, হাসি-মাখা। তিনি উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন "শুনছি

তুমি নাকি নিজে অসীমের বিয়ে দিতে যাচ্ছ মা? ছেলেমানুষ, তুমি এখনও বুঝতে পারছ না কি সর্ব্বনাশ করতে যাচ্ছ! কেন সংসারে অনর্থক একটা চিরবিবাদের সৃষ্টি করবে? একে তো এক ঝগড়ায় পাগল করে তুলছে, আবার—"

বাধা দিয়া সেবিকা বলিল "আপনার সে ভয় কিছু করতে হবে না বাবা। যে আসবে সে যে আমারই বোন্! আমি তাকে ডেকে আনছি, আপনি ভাবছেন কেন?"

ললিতবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "নিজের জায়গা ছেড়ে তুমি কোথা সরে গেলে মা? লক্ষ্মীর আসনে কাকে বসাচ্ছ?" তাঁহার চোখে জল আসিল! তিনি চোখ মুছিতে লাগিলেন।

সেবিকার চোখের পাতা চকচক্ করিয়া উঠিল, গলাটা ভারি হইয়া আসিল; সে নাকি বড় চাপা মেয়ে, তাই তখনি সেই ভাব সামলাইয়া বলিল "আপনার সব কথাতেই ভাবনা আসে। আমি কোথায় যাব বাবা? আপনি যখন আমায় মেয়ের মত ভালবাসেন, তখন আর কোথাও যাবার যো তো আমার নেই। থাক সে সব কথা, আপনি গহনা গড়াতে দিন। আর মাঝে কয়টা দিন বাকি আছে বই তো নয়। এর মধ্যে গহনা গড়ানো শেষ হবে তো বাবা?"

ললিতবাবু রুদ্ধস্বরে বলিলেন "আমার গহনা যাকে দেওয়া উচিত ছিল তাকে দিইছি। এখন যে গৃহিণী হয়ে বিয়ে দিয়ে আনবার আনন্দে অস্থির, তাকে বলগে যাও মা গহনার কথা। আমাকে আর জ্বালিও না। আমি এ বিয়ের মধ্যে নই। বউমা বলতে আমি তোমাকেই জানব, নতুন যে আসবে তাকে চিনব না।"

সেবিকা গোপনে চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

ললিতবাবু ব্যাপারটা ঠিকই বুঝিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছেন অসীম বোটে ভ্রমণ করিতে গিয়া সেই মেয়েটীকে দেখিয়া আসিয়াছে। পুত্র ও পুত্রবধূর ঝগড়ার কথা হিসাব করিয়া দেখিলেন ঠিক সেই সময়েই আরম্ভ। সেবিকাকে তিনি চিনিতেন। সে যে কতদূর নম্র, কিরূপে আপনার দীনতার মধ্যে আপনাকে সে লুকাইয়া রাখিতে চায় তাহাও তিনি জানিতেন। অসীম যে হেমলতার সহিত যুক্তি করিয়া আবার বিবাহ করিতে যাইতেছে ইহাতে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। তিনি পুত্র ও স্ত্রীর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের সব স্নেহটুকু দিয়া তিনি নিরাশ্রয়া পুত্রবধূকে ছাইয়া ফেলিতেছিলেন, উদ্দেশ্য যদি ইহাতে তিনি তাহাকে সুখী করিতে পারেন।

গাত্রহরিদ্রার দিন তিনি বাহিরের ঘরে একাকী শুইয়া পড়িয়া অমৃতবাজারখানা দেখিতেছিলেন। চোখের উপর এত বাষ্প ঘনাইয়া উঠিয়াছিল যে তাহার মধ্য হইতে অক্ষর দেখা অত্যন্ত দুরূহ ছিল। আজ তিনি এ বিবাহ ব্যাপার হইতে একেবারে নির্লিপ্ত। কেহ তাঁহাকে ডাকেও নাই, তিনিও যান নাই।

আর সেদিন?

যেদিন অসীমের প্রথম বিবাহের গাত্রহরিদ্রা হইয়াছিল, সেদিন আনন্দে তিনিই অর্দ্ধেকের বেশী কাজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তখন কোথায় ছিল হেমলতা, কোথায় ছিল তাহার কর্ত্তৃত্ব! তাহার পর দ্বাদশবর্ষীয়া কম্পিত-কলেবরা বালিকা সেবিকা যেদিন এ বাড়ীতে পদার্পণ করিল, সেদিন আগে তিনিই তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। মৃতা কন্যার কথা মনে করিয়া তিনি সামান্য বালকের ন্যায় কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন "আজ হতে তুই আমার সুজাতা মা। তোর সেবিকা নাম আমার সংসারের মধ্যে সার্থক কর। লক্ষ্মীরূপে আমার শূন্য ঘরখানা আবার উজ্জল করে তোল।"

তিনি নিজে পছন্দ করিয়া গহনা আনিয়া নিজের হাতে তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সাজাইয়াছিলেন। আজ আবার তিনি আর একজনের জন্য গহনা গড়াইতে যাইবেন? তাঁহার হৃদয় পূর্ণ

করিয়াছে মাতৃরূপে সেবিকা, আর কাহারও সেখানে স্থান নাই।

দাসী আসিয়া বলিল "মা ডাকছেন ছোট-বাবুকে আশীর্ব্বাদ করবার জন্যে।"

চমকাইয়া উঠিয়া চোখের দুই পাশ দিয়া প্রবহমান জলের ধারা মুছিয়া ললিতবাবু অমৃত-বাজারে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া বলিলেন "বলগে আশীর্ব্বাদ আমি এখান হতেই করেছি।"

সে চলিয়া গেল।

একটু পরেই হেমলতা খোলা দরজার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। রোষোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার মনের ভাবটা কি আমি জানতে চাই। এমন ছাড়া ছাড়া কথা শিখেছ কোথা? আশীর্ব্বাদ করবেন ছেলেকে, যেন আমার মাথাই কিনে নেবেন। এই যে একটা বিয়ের কাজ, এ কি আমার মত মেয়েমানুষের ক্ষমতায় কুলায়? পুরুষমানুষ হয়ে বসে আছ চুপ করে, একটু লজ্জা করে না? বিয়ে তো তোমারই ছেলের, আমার কি? আমি সৎমা বইতো নই। আমারই যে এমন কি মাথা ব্যথা পড়েছে যে খেটে মরছি?"

ললিতবাবু পত্রিকাখানা পাশে ফেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন "আমার ছেলের বিয়ে তো একবার হয়ে গেছে।"

হেমলতা একটু থামিয়া উত্তরটা খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিলেন "তা হলে তুমি বলতে চাও অসীম এখন তোমার ছেলে নয় আমার ছেলে? অসীমের উপরে তোমার যে সর্ত্ত সেটা তুমি ত্যাগ করছ? যে বউ আসবে, তার সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই তা হলে?"

ললিতবাবু স্ত্রীর মুখের উপর অবিচলিত দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া বলিলেন "না। আমি তাকে আমার ছেলে বলতে পারতুম যদি সে তার কর্ত্তব্য ঠিক পালন করত। যে একটী মেয়ের যাবজ্জীবনের সুখ-দুঃখের ভার গ্রহণ করে তারপরে তাকে ভাসিয়ে দেয়, ত্যাগ করে, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? সে যদি আমার মতে চলত আমি তাকে ফিরাতে পারতুম; কিন্তু এমন নিমকহারাম ছেলে সে, আমি যে এখনও বর্ত্তমান আছি, আমার মত নেওয়াও যে তার দরকার, তা সে ভুলে গেছে। যাও তুমি, তোমার ছেলের বিয়ে দিয়ে পুত্রবধূ ঘরে তোল গে, আমায় আর বিরক্ত করতে এসো না।"

দুটি চক্ষে আগুণ বর্ষণ করিয়া হেমলতা দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। অসীমকে ললিতবাবুর সব কথা বলিয়া দিলেন। পিতার নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া অসীমও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। যত রাগ পড়িল নিরপরাধী সেবিকার উপর। সেই তো কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া তাহার পিতৃস্নেহ সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসিয়াছে!

দুপুরবেলা আহারাদির পর ললিতবাবু বাহিরের ঘরেই একটু ঘুমাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। আজ নিজের গৃহে যাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। সবেমাত্র চক্ষু দুইটী একটু বুজিয়া আসিতেছে, সেই সময় অসীম প্রবেশ করিল। পিতার নিদ্রিতভাব দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া ভাবিল জাগাইবে কিনা। সেই সময় ললিতবাবু চাহিলেন। অসীমকে দেখিয়া তাঁহার ভ্রূ একটু কুঞ্চিত হইল। তিনি বলিলেন "কি?"

অসীম বলিল "একটা কথা আছে।"

ললিতবাবু উঠিয়া বসিয়া বলিলেন "বল শোনা যাক।"

অসীম তাঁহার বিছানার চাদরখানা যে স্থানে কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা টানিয়া ঠিক করিয়া দিতে দিতে বলিল "আপনার পুত্রবধূর চরিত্র সম্বন্ধে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই।"

ললিতবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন "বল।"

অসীম বলিল "আপনি ভাবছেন কেন আমি তাকে ত্যাগ করে বিয়ে করতে যাচ্ছি? আমি তাকে বিশ্বাস করতে পারিনি বলেই তাকে ত্যাগ করেছি। আমি তাকে সন্দেহ করি। সরিত তাকে—"

ঘৃণার স্বরে ললিতবাবু বলিলেন "যথেষ্ট। এ কথাটা একদিন তোমার মার মুখেও শুনেছি বটে। তোমরা যে ভিতরে ভিতরে একটা গোল বাধিয়ে বসেছ তা আমি বিলক্ষণ জানছি। সতী সাধ্বী বউমা, তাঁর চরিত্রে যখন তোমরা সন্দেহ করতে পেরেছ, তখন তোমরা না পার কি? আমার গলাতেও তো ছুরিখানা বসিয়ে দিতে পার। সরিত যে কেন আসেনা এর কারণ আমি এখন জানতে পারলুম। সরিতের মত অকৃত্রিম বন্ধু তুমি পাবে কোথায়? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, যেসব মাথা এমন অসত্য কল্পনা করতে পারে—তারা জগতের বাইরে চলে যাক, জগতে তারা যেন আর মুখ না দেখায়।"

অসীম উত্তেজিতভাবে কি বলিতে গেল। ললিতবাবু হাত তুলিয়া বলিলেন "চুপ কর, আর অনর্থক কথা বলে আমাকেও অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে ডুবাতে চেষ্টা করো না। তোমার চেয়েও আমি বউমাকে ভাল করেই চিনেছি। তার মধ্যে যা আছে অন্য মেয়ের মধ্যে তা পাবে না। তুমি যে নিজে কিছু করতে না পেরে ছোটলোকের মত এখন আমার সহায়তা নিতে এসেছ, এতে আমি বাস্তবিক বড় দুঃখিত হয়েছি। তোমাকে আর কিছু আমার বলবার নেই, তুমি যাও। আমার ছেলের উপযুক্ত খুব কাজ করতে পেরেছ তুমি—এই আমার যথেষ্ট।"

তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন। অসীম চুপ করিয়া খানিক বসিয়া রহিল। তখন তাহার এত রাগ হইতেছিল যে সেবিকা যদি তাহার সম্মুখে আসিত, সে তখনি তাহাকে হত্যা করিত।

নিষ্ফল ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে সে বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

সন্ধ্যাতারা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

পশ্চিমের প্রান্তদেশে মুছে গেলে মেঘের লালিমা
শুক্ল দিনশেষে; যবে ফুটে উঠে অস্ফুট নীলিমা
সন্ধ্যার ধূসর সাজে; তুমি এস সঙ্কুচিত পায়ে
জ্বালি সন্ধ্যাদীপখানি, ধীরে নামি আকাশের গায়ে।
সন্ধ্যাবধূ তুমি;—তব লাজনত গুণ্ঠনের তলে
হিমস্নিগ্ধ রূপশিখা দীপ্ত হয়ে থেকে থেকে জ্বলে।
প্রিয় গেছে দূরে; তাই পল্লীবধূ, বিরহ-ব্যথার
সারা দীর্ঘ দিনমান যাপিয়াছে তারি প্রতীক্ষায়
নানা গৃহকাজে, তার এখন যে গৃহে আসিবার
হয়েছে সময়; তাই দীপ-দেওয়া ছলে অনিবার
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্র-বক্ষে গৃহদ্বারে আসে;
পথিক-প্রিয়কে তার ডাকে শঙ্খ মিলন-উল্লাসে;
প্রাঙ্গণে প্রান্তরে ধ্বনি মরে ঘুরে। ক্ষুদ্র পথ বাহি
দূর মাঠে কোন্ চাষা অপূর্ণ কাজের পানে চাহি
ফিরিতেছে শ্রান্তদেহে অবসন্ন দিবসের শেষে
তার শান্ত গৃহ-পানে, সন্ধ্যার সমীরে আসে ভেসে
নিতান্ত সহজ সুরে তার গান; ছন্দ লয় তান
কিছু নাই হোক্ তবু সেই তব আবাহন গান!
বিশ্বের চলার গতি পথভুলে মুহূর্ত্তে নিঃশেষে
বদ্ধ হয়ে যায়; কোন্ স্বর্ণমায়া স্বপনের দেশে
তোমার ও আলোজ্যোতিঃ লয়ে যায় মোর হাত ধরে!
সৌন্দর্য্য সম্পদে মোর ক্ষুদ্র চিত্ত উঠে যে গো ভরে!

মনোমোহনে পাষাণী

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

আমি বসিয়া বসিয়া কেবল ভাবি দেশটা হইল কি! গান্ধী-তিলকের সাধনাপূত ভারত-ভূমি কি চরিত্রবলে এখনও বলীয়ান হইবে না? এই যে চারিদিকে রঙ্গালয় নামধারী কতকগুলি গণিকালয় দেশের সুরুচির মস্তকে বজ্রাঘাত করিতেছে এ গুলি কি কখনো বন্ধ হইবে না? যতদিন থিয়েটারগুলিতে কতকগুলি অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, বারবণিতা-সেবী লোক অভিনয় করিত ততদিন থিয়েটারের নাম লেখনীর মুখে অঙ্কিত করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতাম, কিন্তু এখন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত উপাধি-ধারীরা পর্য্যন্ত রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন তখন ইহাকে নিতান্ত অবজ্ঞাভরে উড়াইয়া দিতে পারি না।

এত কথা কেন বলিতেছি তাহা বলিব কি? কিছু দিন হইতে কলিকাতার মনোমোহন রঙ্গালয়ে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "পাষাণী" নামক একখানি নাটকের অভিনয় হইতেছে। এই মনোমোহন থিয়েটারের যিনি বর্ত্তমান অধিকারী, প্রধান অভি-নেতা ও নট তিনি নিতান্ত কেষ্টকেটা নন। তাঁহার নাম শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম্.এ, কিছু দিন প্রফেসরীও করিয়াছেন। কিন্তু প্রফেসরী করিলে কি হয়? অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত গান-বাজনার সখটি তাঁহার প্রাণে বরাবরই ছিল, তাই one fine morning তিনি শিকল কাটিয়া একেবারে থিয়েটার-রূপ কুঞ্জবনে উড়িয়া গেলেন। তাঁহারই অধিনায়কত্বে এখন পুরা উদ্যমে দ্বিজেন্দ্র লালের "পাষাণী" নাটকের অভিনয় হইতেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতফেরত ছিলেন ইহা অনেকে জানেন। বিলাত হইতে কৃষিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থরাশি গলাধঃকরণ করিয়া আসিয়াই তিনি নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার কৃষিবিষয়ক কোন প্রতিভাই দেশ পায় নাই। তিনি "মেবার পতন", "রাণা প্রতাপ", "সাজাহান" প্রভৃতি কয়েকখানা নাটক লিখিয়া স্বদেশীযুগে দেশে মুসলমানবিদ্বেষের হলাহল উদ্গীরণ করিয়া যুবকমহলে বড়ই বাহবা পান। "পাষাণী" এই দ্বিজেন্দ্রলালের "নরেন্দ্র-প্রতিমূর্ত্তি !"

১৩০৭ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল পাষাণী নাটক লেখেন, তদবধি এই ২৪ বৎসর যাবত এই জঘন্য নাটককে কোন থিয়েটারই আমল দেন নাই। কিন্তু দুপয়সা আয়ের লোভেই হোক অথবা রুচিবিকৃতির জন্যই হোক মনোমোহনে এই পাষাণীর অভিনয় পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। এই পাষাণী অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই একথা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, রঙ্গালয়ের দ্বারা লোকশিক্ষা দেওয়ার সদিচ্ছা যাঁহাদের মনে বিন্দুবিসর্গ আছে—অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরীর নাম যাঁহারা ভক্তিভরে কোনদিন জীবনে একবারও উচ্চারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কোনমতে এরূপ নাটকের অভিনয় করিতে পারেন না।

পাষাণী কে?

পাষাণী গৌতম-পত্নী পুণ্যশ্লোকা অহল্যা, পাষাণী সতী-কুল-শিরোমণি অহল্যা, যাঁহার নাম প্রতিদিন উষাকালে গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে প্রত্যেক হিন্দু নরনারী উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এই পাষাণীকে নাট্যকার একটি বারাঙ্গনারও অধম করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। যে অহল্যার নাম সহস্র সহস্র হিন্দু ভক্তিভরে উচ্চারণ করে সেই

অহল্যাকে মনোমোহনে গেলে দেখা যায় পাষাণী সতী, সাধ্বী, স্নেহপরায়ণা অহল্যা নহে, তিনি ইন্দ্রিয়লালসায় উন্মাদিনী একটি গণিকা। গণিকারও লজ্জাসরম আছে, কিন্তু পাষাণীর লেখক অহল্যা-চরিত্রে একটুও লাজলজ্জার সমবেশ করেন নাই। অহল্যা আশ্রমের বহির্ভাগে দাঁড়াইয়া সতত পরপুরুষের সন্ধানে চকিত নয়নে দাঁড়াইয়া আছেন পাষাণী-চরিত্রে এইটুকু ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। আর মর্ত্ত-ধামবাসী যে স্বর্গবাসের কামনা অহঃরহঃ করে, সেই স্বর্গধাম একটা মদের ভাঁটি, সেখানকার রাজা ইন্দ্র সর্ব্বদা অগ্নি, বরুণ, অরুণ প্রভৃতি দেবতাদের সাহায্যে কোথায় কার ভাল সুন্দরী স্ত্রী আছে তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন। পাষাণী চরিত্রে ইন্দ্রের লাম্পট্য ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। বলিহারি আর্ট! ইহারই নাম না কি আর্ট?

যাঁহারা মা ভগ্নী দুহিতা কিংবা স্ত্রীকে লইয়া মনোমোহনে পাষাণী দেখিতে যান তাঁহারা "পাষাণী" অভিনয় দেখিয়া কি ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ফিরিয়া আসেন তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সব থিয়েটারগুলোকে কেন দেশের লোক প্রশ্রয় দেয় তাহা আমাদের কল্পনারও ধারণার অতীত।

আমরা পাষাণীর অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম, গিয়া দেখিলাম—প্রথম দৃশ্যেই স্বর্গরাজ্যে দেবরাজ ইন্দ্র বসিয়া আছেন, তাঁহার চারিদিকে বরুণ, পবন, হুতাশন, চন্দ্র প্রভৃতি পাত্রমিত্রগণ। ইন্দ্র মুহুর্মুহু মদপান করিতেছেন। অন্যান্য দেবতারাও ইন্দ্রের সহিত মদ্যপানে নিরত, ইন্দ্রের চারিদিকে যুবতীগণ নিতম্ব দুলাইয়া নানাপ্রকার ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছে, আর অপ্সরার রূপসুধা-পানোন্মত্ত ইন্দ্র সেই লাস্যময়ী যুবতীগণের পানে সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতেছেন! উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি ইন্দ্রের সেবাদাসীগণ নিতান্ত "পুরাতন" হইয়া গিয়াছে, এখন মুখরোচক একটা, দুইটা নূতন চাই, দেবতাগণের সহিত সেই সভায় ইন্দ্র এই পরামর্শ করিতেছেন।

ধিক্ নাট্যকার তোমাকে! ধিক্ শিশিরকুমার তোমাকে! যে স্বর্গসুখ ভোগের জন্য, যে স্বর্গের অমরতা লাভের জন্য পরলোক-বিশ্বাসী হিন্দু ইহজীবনে কত না কঠোর জপঃ, তপঃ, দান, যজ্ঞ, ব্রত, আরাধনা, পূজা, বন্দনা করে, সেই স্বর্গের দৃশ্য এইরূপ নারকীয়ভাবে অঙ্কিত করিতে "তোমাদের" কি একটুও সঙ্কোচ বোধ হইল না? তুমি শিশিরকুমার একদিন না লোকশিক্ষার মহাব্রত লইয়া শিক্ষকতা করিয়াছিলে? বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কেন এখনও তোমার "এম্ এ" উপাধি ব্যবহার করিবার অধিকার দিয়া উপাধির মর্য্যাদা নষ্ট করিতেছেন?

মূল পুস্তকে উপরোক্ত দৃশ্যটি প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্য। কিন্তু শিশিরকুমারের দল দর্শকগণকে প্রথমেই একটা আকর্ষনীয় কিছু (Attractive something) দিবার জন্য এই দৃশ্যটি অভিনয়ের প্রথমেই স্থান দিয়াছেন। তারপর দ্বিতীয় দৃশ্যের কথা বলা যাউক। মহর্ষি গৌতম আশ্রমে নাই, তাঁহার পত্নী অহল্যা প্রদোষকালে আশ্রমের পথে দাঁড়াইয়া আছেন। দূরে একজন সুন্দর, সুঠাম, সুদর্শন যুবাকে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—আজ আমার আশ্রমে থাকিয়া যাও। তাপসবেশী ইন্দ্র বলিলেন,—না। তোমার আশ্রমে যাইব না। তখন অহল্যা বলিলেন,—তা যাইতেই হইবে, তুমি আমার প্রাণেশ্বর, আমার জীবন-মন-প্রাণ যা কিছু তা তোমাকেই সমর্পণ ক'রেছি। এই বলিয়া অহল্যা একেবারে হিড়্ হিড়্ করিয়া ইন্দ্রের হাত ধরিয়া টানিয়া আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পাঠকগণ ব্যাপারটি একবার বুঝুন। একজন আগন্তুক, অপরিচিত যুবককে "প্রাণেশ্বর" বলিয়া সম্বোধন নিতান্ত বাজারের গণিকাতেও করে কিনা সন্দেহ! অভিনেতাগণ ত অনেক অভিনেত্রীর সহিত সর্ব্বদা মিশিবার সুযোগ পান, কিন্তু কোন অভিনেত্রী কি এই ভাবে কাহাকেও হিড়্

হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছে? এইভাবে হিন্দুর একজন আরাধ্যা মহিলার চরিত্র যাহারা চিত্রিত করে তাহাদের পৃষ্ঠে উপর্য্যুপরি Half the profitএর ধীবরের যোগ্য চাবুক লাগাইলেও বোধ হয় গায়ের ঝাল যায় না।

তারপর আরও মজা দেখুন। ইন্দ্র ত অহল্যাকে লইয়া সেই তপোবনে কিছুদিন থাকিয়া মনের সুখে দৈহিক সম্ভোগ করিলেন, কিন্তু অহল্যার তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। অহল্যা ইন্দ্রের সহিত একেবারে তপোবন ছাড়িয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। যেমন সঙ্কল্প অমনি তাহা কার্য্যে পরিণতি। তাঁহারা নিশাশেষে দুইজনে আশ্রম ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় অহল্যার পুত্র "শতানন্দ" "মা" "মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুখের পথের কণ্টক বলিয়া অহল্যা তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের আদেশে শতানন্দের গলা টিপিয়া মারিলেন। কিন্তু শতানন্দ দৈবক্রমে একেবারে মরিল না। পরে আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—ওগো বিশ্বকবির প্রিয় শিষ্যেরা, এই অহল্যা দেখাইবার জন্যই কি তোমরা, দেশের ভদ্র মহিলাগণকে পূর্ব্বাহ্নেই সিট্ রিজার্ভ করিতে অনুরোধ কর? এ কি গৌতম-পত্নী অহল্যা—না, কোন পিশাচিনী মায়াবিনী রাক্ষসী? তারপর 'তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য' দেখুন। অহল্যা ইন্দ্রের সহিত তপোবন ছাড়িয়া একেবারে কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া বসিয়াছেন। স্বামী-স্ত্রীর মত ইন্দ্র ও অহল্যা বসিয়াছেন, রতি ও মদন নাচিয়া নাচিয়া গান করিতেছেন। অহল্যা প্রথমে সে গান শুনিতেছিলেন আর এক এক গ্লাস মদ্য পান করিতেছিলেন। এবার আর থাকিতে পারিলেন না। নেশায় ঢুলু ঢুলু আঁখি লইয়া অহল্যা নিজেই উঠিয়া রতি ও মদনের সহিত নাচিয়া নাচিয়া গান ধরিয়া দিলেন। থিয়েটারে যখন এই দৃশ্যটি দেখিতেছিলাম তখন মনে মনে ভাবিতেছিলাম যাহারা পুণ্যশ্লোকা অহল্যাকে লইয়া এই প্রকার "ন্যাকামো" আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা হিন্দু, না অন্য কিছু! হিন্দু হইয়া হিন্দুর আরাধ্য দেবীকে লইয়া কেহ ত এইপ্রকার "জ্যাঠামো" করিতে পারে না? ইঁহারা কি কোন দিন সতী সাধ্বী নারী-রত্নের মহিমা দেখিবার অবকাশ জীবনে পায় নাই?

তারপর আরও মজা দেখুন। কৈলাস পর্ব্বতে থাকিয়া ইন্দ্রের সহিত অহল্যা ত ইন্দ্রিয়লিপ্সার চূড়ান্ত চরিতার্থ করিয়া ছাড়িলেন। ইন্দ্র অহল্যাকে ছাড়িয়া স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু অহল্যা কিছুতেই তাঁহাকে যাইতে দিবেন না। ইন্দ্র কিছুতেই অহল্যার কথা শুনিলেন না। তখন অহল্যা একখানা তীক্ষ্ণ ছুরিকা ইন্দ্রের বক্ষে বিঁধাইয়া দিলেন, ইন্দ্র মরিয়া গেলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মূল পুস্তকে কিন্তু আছে ইন্দ্রের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করিবামাত্র ইন্দ্র ভূতলে পড়িয়া গেলেন, আর অহল্যা অট্টহাস্য করিতে করিতে পাগলিনীর মত চলিয়া গেলেন। এটি হইল তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য! এই দৃশ্যে অভিনেতারা খোদার উপর খোদকারি অর্থাৎ লেখকের উপরও এককাঠি বাড়িয়াছেন! কেননা দ্বিজেন্দ্রলাল ইন্দ্রকে একেবারে প্রাণে মারেন নাই, আর সবজান্তা অভিনেতারা অমর ইন্দ্রকে মারিয়া ফেলিয়া একেবারে 'পপাত ধরণীতলে' করিয়াছেন। বাস! ইন্দ্রের উপস্থিতি এইখানেই শেষ। তারপর নাটকের বাকী অংশে কুত্রাপি ইন্দ্রের নামগন্ধও নাই। আমরা জানিতাম সুরপতি ইন্দ্র অমর, কিন্তু মনোমোহনের "আড্ডায়" পড়িয়া ইন্দ্র বেচারী প্রাণ হারাইয়াছেন। সাধে কি আর কবি বলিয়াছেন "পড়িয়া ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে রে হীরার ধার।" তোমাদের পাল্লায় পড়িয়া শেষে স্বর্গগত দ্বিজেন্দ্রলালের মুখে পর্য্যন্ত চূণ কালি পড়িয়াছে।

আমরা বাল্মীকির রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, মহর্ষি গৌতমের পত্নী অহল্যা অতি সতী, সাধ্বী, পুণ্যশীলা, পতিপরায়ণা তপস্বিনী ছিলেন। একদিন গৌতমের অনুপস্থিতিকালে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র

গৌতমের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অহল্যার সতীত্ব নাশ করেন। গৌতম ইহা জানিতে পারিয়া অহল্যাকে শাপ দেন—"যদিও তুমি অজ্ঞাতভাবে এই পাপ করিয়াছ তথাচ পরপুরুষ সংস্পর্শের জন্য তুমি পাষাণী হইয়া থাকিবে তারপর শ্রীরামচন্দ্রের পদ-স্পর্শে তোমার মুক্তি হইবে।" কার্য্যতও রামচন্দ্রের পদস্পর্শে পাষাণী অহল্যার মুক্তি হইয়াছিল, ইহা যাঁহারা রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন। রামায়ণের অহল্যা শান্তমতি, সংযতেন্দ্রিয়া, ব্রহ্মচারিণী, তপস্বিনী, মাতৃত্বের চরমবিকাশ, আর দ্বিজেন্দ্রলালের অহল্যা কাম-পীড়িতা, মদনমথিতা, কুলটা, ব্যাভিচারিণী, পিশাচিনী, রাক্ষসী! মনোমোহনের কর্তৃপক্ষ নিজেদের অভিনয় লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য অহল্যা-চরিত্রকে মূল পুস্তক অপেক্ষা আরও জঘন্য করিয়া তুলিয়াছেন। অহল্যাকে অভিশাপ দেওয়ার পর অহল্যা পাষাণ হইয়া গেল, ইহাই আমরা এতদিন জানিতাম। কিন্তু মনোমোহনের "একটা নূতন কিছু করর" দল শুধু অহল্যাকে মারেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে অমন মহর্ষি গৌতমকেও মারিয়াছেন! অর্থাৎ ইন্দ্রের নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া আসিবার পর অহল্যাকে গৌতম আলিঙ্গন করিতে গেলেন, আলিঙ্গন করিতে যাইবামাত্র অহল্যা মাটিতে পড়িয়া গেলেন, সেই পতনেই তাঁহার মৃত্যু হইল। রামচন্দ্র যে অহল্যাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, থিয়েটারের বাবুদের মতে তাহা প্রক্ষিপ্ত, তাই তাঁহারা অহল্যাকে একেবারে মারিয়াই ফেলিয়াছেন। কিন্তু বাবু হে, অহল্যাকে ত তোমরা মারিলে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গৌতম বেচারীকে লোকসমক্ষে একটা কামুক, স্ত্রৈণ করিয়া বিচিত্র করিলে কেন?

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে আছে, ইন্দ্র অহল্যাকে ধর্ষিত করিয়া চলিয়া যাইবার পর অহল্যা নিজেই গৌতমের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"অজ্ঞানাদ্ ধর্ষিতা বিপ্র তদ্রূপেণ দিবৌকসা। ন-কামকারাদ্বিপ্রর্ষে প্রসাদং কর্তুমর্হসি" অর্থাৎ হে বিপ্র গৌতম! ইন্দ্র তোমারই রূপ ধরিয়া আসিয়াছিল, তাই আমি তাহাকে চিনিতে পারি নাই, সেই অবস্থাতেই সে আমাকে ধর্ষণ করিয়া গিয়াছে, আমি কামাভিলাষিণী হইয়া এরূপ করি নাই। অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" অহল্যার এই উক্তি কি তাঁহার সতীত্বের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত নহে? অহল্যা যদি অসতী হইবেন, তবে সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অহল্যার পাদবন্দনা করিয়া ধন্য হইবেন কেন? মহর্ষি বাল্মীকি লিখিতেছেন, "রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহ-তুর্ম্মদা" অর্থাৎ শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ উভয়েই প্রীতি-পূর্ব্বক সেই সাধ্বী ঋষিপত্নী অহল্যার চরণ বন্দনা করিলেন। ভগবান রামচন্দ্র যাঁহাকে সতীজ্ঞানে বন্দনা করিলেন, আজ মনোমোহনের পাল্লায় পড়িয়া সেই অহল্যা একটা নিতান্ত কামাভিলাষিণী বারবণিতায় পরিণত হইয়াছেন! তোমরা যখন বিলিতি শিক্ষা পাইয়া, বিলিতি সভ্যতায় আচ্ছন্ন হইয়া, বিলিতি চশমা চোখে দিয়া স্বপ্নোত্থিত জীবের ন্যায় দেশের যাহা কিছু সকলই বিকৃত দেখিতেছ, তখন তোমাদের পক্ষে হিন্দুর রামায়ণ মহাভারত বর্ণিত কোন আখ্যায়িকা অবলম্বনে নাটকাদির অভিনয় করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। জাতির অধঃপতন সূচিত হয় তখনই যখন জাতি আপন সমাজের যাহা কিছু বিকৃতভাবে দেখে। যীশুখৃষ্টের জননী মেরীর কুমারী অবস্থায় যীশুর জন্ম হইয়াছিল, কই কোন বিলিতি থিয়েটার বা বায়স্কোপ ত সে চিত্র কখনও দেখায় না। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল আজ স্বর্গগত, আজ যদি তিনি বাস্তদেহে দেশে বিদ্যমান থাকিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় জাতীয় জাগরণের এই শুভক্ষণে, জাতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও নিষ্ঠা প্রদর্শনের যুগে তাঁহার এই পাষাণী নাটককে জনসমাজে উপস্থিত করিতে তিনি লজ্জিত হইতেন। লর্ড লিটন যখন ভারতের নারীসমাজকে লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ একটা আপত্তিজনক উক্তি করিয়াছিলেন তখন দেশময় একটা তীব্র আন্দোলন উঠিয়াছিল,

কিন্তু আজ কেন দেশের নেতৃবৃন্দ নীরব? কেন দেশবাসী হিন্দু জনসাধারণ তুষ্ণীম্ভাবে রহিয়াছেন? পারে কি কেহ শিখ, খ্রীষ্টান কিংবা মুসলমানের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে কোন চরিত্র লইয়া এইরূপ বিকৃতভাবে অভিনয় করিতে? নিশ্চয়ই পারে না। কেন পারে না? তাহারা যে মানুষ,—কাপুরুষ, ভেড়া তাহারা নয়। তাহাদের দেশাত্মবোধ আছে, তাহারা জানে যাহাদের নিজের ধর্ম্মশাস্ত্র, নিজের পিতৃপুরুষ, নিজের প্রাচীন আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি, বেশভূষা ও সভ্যতায় বিশ্বাস নাই তাহাদের স্বাদেশিকতা শুধু কবির কল্পনা। মনে আছে, লরেন্স ফষ্টারের চরিত্র দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট "চন্দ্রশেখরের" অভিনয় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব চরিত্রের জন্য "রাজসিংহ" অভিনয় বন্ধ হইয়াছিল, অভিনীত হইবার পূর্ব্বেই "মহম্মদ" নাটক বন্ধ হইয়াছিল, শিখদের আপত্তিতে "গুরু গোবিন্দ" অভিনয় বন্ধ হইয়াছিল, সিডিসনের বীজ অঙ্কুরিত থাকায় গিরিশচন্দ্রের "সিরাজুদ্দৌলা" বন্ধ হইয়াছিল? আর এর বেলা?

এর বেলা পাষাণীর অভিনয় বন্ধ হইবে না কেন? কেন এখনও হিন্দুসন্তান তাঁহাদের মা-ভগ্নীদের লইয়া এইরূপ গণিকার নাচানাচি দেখিতে ছুটিতেছেন? কেন দেশে এই পাষাণীর অভিনয় বন্ধ করিবার জন্য তুমুল আন্দোলন উঠিতেছে না?

"থিয়েটার লোকশিক্ষার স্থান। গিরিশচন্দ্রের "বলিদান", অমৃতলালের "বিবাহ-বিভ্রাট", দ্বিজেন্দ্রলালের "বঙ্গনারী" এক সময়ে বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। বাঙ্গালার সমাজ জীবন ও রাজনৈতিক জীবন গঠনে বাঙ্গালার থিয়েটার কম সহায়তা করে নাই। কিন্তু আজ কি হইতেছে? পেটকা-ওয়াস্তে" কতকগুলি লোক আজ সেই থিয়েটারগুলিকে এমন কদর্য্য স্থানে পরিণত করিয়াছে যে, তাহার নামোচ্চারণ করিতে ঘৃণা বোধ হয়। আর দেশের লোকেরও এমন কুপ্রবৃত্তি যে, তাহারা দলে দলে গিয়া এই সমস্ত কুপ্রবৃত্তিমূলক ব্যবসায়ের প্রশ্রয় দেয়! কি হইবে দেশে অহিংসাবাদের প্রচার করিয়া? কি হইবে দেশে শিক্ষার বিস্তার করিয়া? কি হইবে দেশে স্বদেশী মন্ত্রের প্রচার করিয়া? দেশবাসীর মন হইতে যদি কুরুচির বীজ ধ্বংস না হইল, তবে বাহ্যিক লাফালাফি ও চীৎকারে লাভ কি? থিয়েটার বায়স্কোপে মুহূর্ত্তকালের জন্যও গেলে বেশ বুঝা যায় যে আমরা মুখে যতই স্বাদেশিকতার বড়াই করি না কেন, দেশ চরিত্রবলের দিকে একটুও অগ্রসর হয় নাই।

পরিশেষে মনোমোহনের নায়ক শিশিরকুমারকে অতি বন্ধুভাবে একটা কথা বলি। তিনি "সীতার" অভিনয় করিয়া দেশবাসীর যতটা সহানুভূতি পাইয়াছিলেন, এক রাত্রি "পাষাণীর" অভিনয় করিয়া সে সহানুভূতি তিনি সমূলে হারাইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানা বড় চাপরাস তাঁহার বুকে আঁটা আছে, তিনি যেন সেই চাপরাসের মাহাত্ম্য আর নষ্ট না করেন! আর্টের দোহাই দিয়া যেন এই ভাবে দেশটাকে গোল্লায় না দেন! যদি সুরুচিসঙ্গত নাটকের অভিনয় করিতে তাঁহার মন না চায় তিনি অন্য পথ দেখিতে পারেন, কিন্তু হিন্দু-সমাজের বুকে দাঁড়াইয়া এরূপ হিন্দুর জননীগণকে বেশ্যা সাজাইলে তাঁহার অপরাধ হিন্দুসমাজ নীরবে সহ্য করিবে না।

পুলিশ কমিশনার মহাশয়কে আমরা অবিলম্বে এই নাটকের অভিনয় বন্ধ করিতে অনুরোধ করিতেছি। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টকে আমরা অবিলম্বে এই নাটকখানি বাজেয়াপ্ত করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাহাতে হিন্দুসমাজ তাঁহাদের উপর সন্তুষ্ট বই একটুও অসন্তুষ্ট হইবে না।

প্রাচীনকালেও এদেশে নাটকের অভিনয় হইয়াছে। ভবভূতি, কালিদাস, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির নাটক এক একখানি বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পদ রূপে পরিণত হইয়াছে। আর তোমাদের নাটকের বেলায় লোকে সম্মার্জ্জনী হাতে করিয়া "দূর" "দূর" করে কেন? তোমরা দেশের বিকৃত রুচিকে

আরও বিকৃত করিয়া তুলিতে চাও বলিয়া। কোথায় আজি এই পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তৃতির দিনে তোমরা দেশের যুবকযুবতীগণকে প্রাচীন আদর্শে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিবে, তাহা না করিয়া তোমরা সেই ইহকাল-সর্ব্বস্ব সভ্যতা, রুচি ও প্রবৃত্তির অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতেছ! হায় লোকমান্য তিলক, হায় মহাত্মা গান্ধী, হায় দেশবন্ধু দাশ, হায় দেশপূজ্য অশ্বিনীকুমার! আজ তোমাদের সমস্ত যজ্ঞ পণ্ড করিল কতকগুলি কালাপাহাড়ের দল!

হিন্দু নরনারীগণের প্রতি আমাদের নিবেদন, তাঁহারা এ নাটকের অভিনয়ে ঘৃণা প্রকাশ করুন, কেহ মা-ভগ্নী-পত্নী-দুহিতা লইয়া এরূপ নাটকের অভিনয় দেখিয়া অভিনেতাগণকে প্রশ্রয় দিবেন না।

উদয়-আলো

(বড় গল্প)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

(গত সংখ্যায় প্রকাশের পর)

……আচ্ছা তার একটা উপমাও আমার চোখে পরে না! আমি যাকেই তার পাশে রেখে বিচার কর্ত্তে যাই তাকেই নিচে নামিয়ে ফেলি, আমার তার মত ত কাউকে পাই না। সে বলেছে আমি তার কত কালের বন্ধু। কত জন্ম এমনি করেই মিলে মিলে আসছি, ভবিষ্যতে এই জীবনের শেষে যেখানে যাব সেখানেও এমনি করেই মিলব। তা সবই সত্যি, তা না হলে এমনি ক'রে ভালবাসবে কেন?……

বিয়ের পর সে যেদিন আমায় নিয়ে গেল, যদিও সে বাড়ী আমার বড়ই চেনা, সেখানকার সবাই আমায় খুবই জানে, তবু কেমন একটা ভয় হতে লাগল। সেখানে কি ক'রে তাদের প্রথম অভিনন্দন নেব?—সেখানে আগেই একপালা ঠাট্টা-বিদ্রূপ অজস্র হবে দেখছি!……

ফুলসজ্জার কথাটা মেয়েরা যে বেশী ক'রে মনে রাখে তা খুব ঠিক। সেদিন সে বলেছিল "তুমি যেমন চেয়েছিলে তাই পেয়েছ কি-না? আচ্ছা, আমায় এমন করে কেন চাইলে রাণী? হয়ত খাওয়া-পরার কষ্টও পাবে, সেইটে আমি কি করে সইব!" এখন মনে হয় এর চেয়ে বড় ভালবাসার কথা বুঝি আর হতে পারে না।……

……সে কি হাত গুণতে জানত, না, মুখ দেখলেই সব মনের কথা বুঝতে পার্ত্ত? তার কাছে 'রা' না কর্ত্তেই 'রামের রাজ্যনাশ' পর্য্যন্ত সব বলে দিত। আমি কত আশা করে যে তাকে ভালবেসেছিলাম সে বুঝি সব জানত; আচ্ছা ওরা অমন গোপন প্রাণের কথাগুলোও কি করে সব টের পায়? তাতেই বলত "তোমার সমস্ত আশার মূলে আমি কুড়ুল মেরেছি, তোমার চোখে জল পর্ব্বে তাও আমায় দেখতে হবে!" তখন তার সমস্ত কথার মানে কর্ত্তে পার্ত্তাম না, এখন অনেকটা পারি। হলে কি হবে,—তাকে চিনে তাকে ভোগ কর্ব্বার সময় বুঝি এ জীবনে আর হ'ল না! কত

অন্যায় তার কাছে করেছি, একদিনের জন্যে সে একটু রাগ পর্য্যন্ত করেনি; তবে একটু-আধটু অভিমান সে কর্ত্ত। তার অভিমান আমার বড় মিষ্টি বলে বোধ হত। তাকে সাধব, তার পায়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা চাইব,—এত অভিমানিনী আমি তাও আমার তা কেমন মধুর লাগ্‌ত। অনেক সময় নিজে ইচ্ছে'করেই তার অভিমান জাগিয়ে দিতাম, সে সব বুঝতে পার্ত্ত, নিজের অভিমান নিজে ভেঙেই আমায় বুকের কাছে টেনে নিত। জয় আমার হলেও কাজে জয়ী হত সে; আমার সে জয়ে একটুও আনন্দ হ'ত না।……

" তার কত বন্ধু বান্ধব—একি গুণে শেষ করা যায়? দলে দলে আসে আর আমায় অভিনন্দন দেয়। তা ফুলসজ্জার রাতে আমার সম্বর্দ্ধনাটা খুবই হয়েছিল। সব শেষে তার অভিনন্দন—সে একখানা তার ছোট ফোটো এনে আমায় দিলে, সেই তার প্রথম উপহার, দিয়ে বল্লে "এ ছাড়া তো আর আমার কিছু নেই রাণী, আমি যে বড় কাঙ্গাল! আমি আমাকেই তোমায় দিলাম, বল এই দানে তুমি সুখী হয়েছ,—একবার আমি তোমার মুখে শুনে নেই?" আমি যদিও তখন তেমন কিছুই বুঝ্‌তাম না, তবুও বুকখানা কেমন বড় হয়ে উঠ্‌ত।……

সে আমায় বল্‌ত—"আমার এই বিষম দুঃখুকে নিয়ে আমায় কেউ চাইবে—এ আমি জানতাম না। তুমি তাও করেছ, তোমার ভালবাসা কতখানি তা আমি বুঝি, তবে তুমি আমায় ক্ষমা কোরো; যদি আমি কোনদিন তেমন ভাল না বাস্‌তে পারি তাহলে আমাকে দোষী ক'রোনা রাণী।" সে আমায় রাণী বলে ডাকত— সে কত মিষ্টি, এতদিন ত ছাড়া-ছাড়ি তবু যেন দিনরাত কাণের কাছে তার সেই রাণী ডাক ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তার মুখেই শুনেছি বিরহই প্রেমকে বড় করে দেয়, এখন তা বেশ বুঝতে শিখেছি। আজ যদি সে দূরে না থাকত, তাহলে যেমন করে চিনেছি হয়ত তেমনি করে তাকে চিন্‌তে পার্ত্তাম না। তার কাছে এক জায়গায় দু-দুবছর ধরে ছিলাম, যত আদর-স্নেহ পেয়েছি তার মূল্য হয় না, উপমা নেই।…

সংসারের অনেক কাজে সে আমায় সাহায্য কর্ত্তে আস্‌ত, কিন্তু তার সাহায্য নিতে বড়ই লজ্জা বলে বোধ হ'ত, অথচ তেমনি ভালও লাগত। হায়, আজ সে কোথায়! আজ যদি সে আমার কাছে থাক্‌ত তাহ'লে আমার সকল কাজই সে নিজে হাতে নিয়ে মধুর করে দিত, অনেক আগেই আমি আরাম হয়ে যেতাম, হয়ত অসুখই হ'তনা।…বাড়ীর সবাই আমায় খুব স্নেহের চোখে দেখ্‌ত, আমি যেন কি তাদের তা যেন তারাও জানে না আমিও জানিনে, তাই বুঝি তারা এমনি ক'রে আমায় পর করে দিলে? তা দিক—তাদের আমি পর কর্ব্ব কেন? সে আসুক—তাতে আমাতে তাদের পায়ে ধ'রে ক্ষমা চেয়ে নেব, তাতে ত আর তারা একটু ভালবাসা থেকে বঞ্চিত কর্ত্তে পার্ব্বে না!…

সংসারের দিনগুলো সমান ভাবে কিছুতেই কাটে না, যদি কাটতই তাহলে আমার এ দুর্দ্দশাই বা হবে কেন? সে এত ভালবাস্‌ত তখন আমি কিছুই বুঝতে পার্ত্তাম না, বোধ হ'ত এটা বড় বাড়াবাড়ি, এত ভাল নয়। কত জায়গায় আড্ডা দিয়ে তবে সে বাড়ীতে ফির্‌ত। তখন আমরা সবাই ঘুমিয়ে প'র্ত্তাম, জানালা দিয়ে ফুল ছুঁড়ে আমার ঘুম ভাঙ্গাত। সে ফুলের চেয়েও কত মধুর আজ তা বেশ বুঝতে পাচ্ছি। তাকে কত অনুযোগ করে'ছি—"ওগো তোমার পায়ে পড়ি আমি না ঘুমিয়ে পর্ত্তে পর্ত্তে তুমি এসো।" হেসেই উড়িয়ে দিত, বলত "তুমি যেমন আমাকে চাও, তেমনি আরও দুচারজন আমাকে চায় যে, তাদের একটু সুখী না কল্লে তোমার অকল্যাণ হবে যে রাণী। তা তুমি রাগ ক'র না, আর ভাব্‌বারও বিশেষ দরকার হবে না, তারা 'দশ হাত কাপড়ে কাচা দিতে' পারে, অর্থাৎ তারা পুরুষ মানুষ।" যদি কোন দিন অভিমান

করে নিজেকে ঢেকেঢুকে এক্‌পাশে মুখ গুঁজরে শুয়ে পড়ে থাক্‌তাম, তা'হলে ঘুমিয়ে গেলে কপালের টিপ্‌ গালে দিয়ে সকাল বেলায় আমায় এমনি অপ্রস্তুত কর্ত্তো, আমি হাসব কি কাঁদব ঠিক কর্ত্তে পার্ত্তাম না। সে দুষ্টুমিতেও কম ছিল না। কোন দিন যদি সকালে ঘুম না ভাঙ্‌ত তাহ'লে চুমোয় চুমোয় আমার কাল গাল রাঙা করে জাগিয়ে দিয়ে বল্‌ত "এই তোমার শাস্তি, যাও, বেড়িয়ে যাও, যেমনি তোমায় সব দেখ্‌বে, অজস্র বিদ্রূপবাণ তেমনি তোমার মাথায় এসে পর্ব্বে।" মনে হ'ত আচ্ছা এমনি করে কি কেউ কারুর স্ত্রীকে কষ্ট দেয়, না এমনি করে সঙ্গিনীদের কাছে লজ্জায় ফেলে? এ কিন্তু ভারি অন্যায়! আর এখন সেই অন্যায় একটু পাবার জন্যে কতখানি যন্ত্রনা, সে আমিই বুঝ্‌ছি; আর যদি এমনি ভালবাসার কারুর এমনি ব্যবধান এসে থাকে তাহলে সে-ও বুঝ্‌বে। কত লোকের স্বামী তাদের স্ত্রীকে কত কি সব উপহার দেয়, কৈ আমার সে-ত' কিছু দেয় না, তবে লোকে চায় কিনা জানিনে, আমি কিন্তু চাইতে পার্ত্তাম না। দিনে সংসারের কাজের মাঝখানে তাকে বল্‌বার জন্যে কত কথাই মনে মনে জমা করে রাখ্‌তাম, কিন্তু যখন তার সঙ্গে দেখা হত, তাকে দেখেই সব ভুলে যেতাম! সে ছিল একখানি শান্তির প্রতিমূর্ত্তি, এক নিমিষে, প্রাণের সমস্ত বেদনা নিংড়ে নিয়ে শান্তিতে ভরিয়ে দিত।......

...আমার নাকি রূপের মধ্যে চোখ দুটো ছিল একটু ভাল, তাই তার এই চোখে হাসি-কান্না দেখ্‌বার জন্য বড়ই আগ্রহ। মিছামিছি রাগিয়ে যেমনি আমায় কাঁদিয়েছে, তেমনি তখনই হাসিয়েছে, এই ছিল নিত্য তার মজা দেখা; পেলে-পার্ব্বণে কোন দিন যদি ফাঁক যেত! আমায় বিদ্রূপ কর্ত্ত —"আহা কিবা নাক, যেন সে আছে কি নেই জানাই যায় না; আহা তার নিচেই আবার বড় বড় দুটো, গাল যেন দুদিকে দুটো দ' পড়েছে, এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ, 'চোখের জল পালাবারও কোন উপায় নেই; তারপর গায়ের রং সে কি সুন্দর—আল্‌কাতরা বলেন 'হাঁড়ীর তলা, ভাই তুমি বড় কাল'; কপাল—কি সুদৃশ্য চুলে ঢাকা ছোট্টটি, হাত দিয়ে মেপে ঠিক করা যায় না যে ক'হাত।" আচ্ছা এসব কথা কি স্বামীর মুখে ভাল লাগে? আমার ভারি রাগ হত কিন্তু! চোখ-মুখ লাল হয়ে যেত, তখনি চুমো দিয়ে আমার সব অভিমান জল ক'রে দিত।—এতোও সে জান্‌ত! এত ত' কারুর ভালবাসার ইতিহাসে খুঁজে পাইনে, বোধহয় যারা ভালবাসে এমনি ধারাই বাসে, তবে লেখেনা, লিখে জানান যায় না বলে। এই যে আমি এত ভাব্‌ছি, তবু তার সব কথা ত ভেবে আন্‌তে পাচ্ছিনে, আর বল্‌তে গেলে এর সিকিও পার্ত্তাম না।...

এমনি হতভাগিনী আমি, এমনি জ্ঞানহীনা আমি, তার এত ভালবাসা, তাও কখন কখন বোধ হ'ত এ একটা বিদ্রূপ, নয় একটা লোকাচার। আমি এত কুরূপা আর ও এত সুন্দর, তা আমাকে সত্যিকারের এমন ভালবাস্‌তে পারেনা! ভগবানের কাছে চোখের জলে প্রার্থনা কর্ত্তাম,—"প্রভু, এবার যখন পাঠাবে আমায় একটু রূপ দিও।" রূপের জন্যে কিছু যদি ব্রত থাকে তাহলে করি এই ইচ্ছে খুব, কিন্তু কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি আর কে-ই বা বলে? যাকেই জিজ্ঞাসা কর্ব্ব, সেই এমনি বিদ্রূপ কর্ব্বে যে আমি আর মাথা তুল্‌তে পার্ব্ব না, তাও শুধু নয়, আবার সকলের কাছে ঢাক বাজিয়ে বেড়াবে। মহা মুস্কিল, এখন না কল্লে আর কর্ব্বই বা কবে? যাক, লজ্জার মাথা খেয়ে তাকেই জিজ্ঞাসা কল্লাম "হ্যাগা, কি ব্রত কল্লে রূপ পাওয়া যায় আমায় বলে দিতে পার?" শুনে সে-ত হেসেই গড়িয়ে জল। তার হাসি দেখি, না আমার কথা জিজ্ঞাসা করি? অনেক কষ্টে একটু হাসি থামিয়ে বল্লে "আমায় পছন্দ হয় না? তা তুমি নিজে পছন্দ করেই বিয়ে করেছ, এখন ওসব আমি শুনতে চাইনে; তুমি আমারি, আমাকেই তোমার

ভালবাস্তে হবে।"—ওমা! যা গেলাম বল্‌তে, হ'ল কিনা ঠিক তার উল্টো।…

…যেমন আমি ছিলাম বড় অভিমানিনী, সেও ছিল তেমনি। এক একদিন তার অভিমান ভাঙ্গাতে কি কম বেগটা পেতে হত! বড় বেশী অভিমান হলে সে বলত "আমাকে যদি তোমার সত্যিকারের ভালবাসতে প্রাণ না চায়, তাহ'লে তুমি আমায় ভালবেসো না, যাকে চাইবে তাকেই ভাল বাস্‌বে, তাতে আমি একটুও দুঃখিত হব না, একটুও ব্যাকুল হব না, কারণ আমি তোমায় ভালবাসি, আর চিরদিন বাস্‌বোও;—ভালবাসা এমনি জিনিস যে দিলে আর ফিরিয়ে পাওয়া যায় না।" আমি বড় দর্প করে বল্‌তে পারি কার স্বামী তার স্ত্রীর কাছে এই কথা বল্‌তে পারে?—বোধ হয় কারুর না। একথা শুধু তার মুখেই সাজে। কোন্ স্বর্গের অভিশপ্ত দেবতা সে, কোন্ ইন্দ্রপুরীর রাজাধিরাজ সে, আমারি জন্যে মর্ত্তের মানুষ হয়ে নেমে এসেছে। সে যে বল্‌তো তার জীবনটা একটা অভিসম্পাত, তা কিন্তু ঠিক।…

সে ভারি সুন্দর একটা গল্প ব'লতো, সে আমি কখনও ভুল্‌তে পার্ব্ব না; সে নাকি আবার সত্যিকারের ঘটনা। তা সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক, বেশ তার ঘটনাটি;—"সে একজন যুবক, কোন্ আফিসে নাকি চাকরি ক'র্ত্ত। সে ছিল যেমনি রূপবান গুণবান, তেমনি নাকি তার স্ত্রীটি ছিল সুন্দরী ও গুণবতী; দুজনেই সমান। তাদের মধ্যে ভালবাসাও ছিল তেমনি, এ ওকে না দেখ্‌তে পেলে বাঁচে না। সংসারের মধ্যে তারা ছিল মাত্র দুজন আর তার এক বুড়ী পিসিমা। কিছু পয়সা-কড়িও ছিল, তার উপর সে নাকি উপায়ও ক'র্ত্ত বেশ। সে বড় সুখেই ছিল, হলে কি হয় সুখ যে এক জায়গায় বেশীদিন থাকতেই পারে না। অমন সংসারেও সে দুঃখে ভরিয়ে দিলে, আবার আগুনও লাগালে। সে আফিস থেকে এসে এক বন্ধুর বাড়ীতে খেলাধুলো ক'র্ত্ত। একদিন তার বন্ধু বল্লেন 'দেখ ভাই, বলব বলব মনে করি বলতেও পারিনে, তা এমনি দাঁড়িয়েছে যে, না বল্লেও আর চলে না। তা ভাই তুমি যাই বল, একটু সাবধান হও। ও অমন সংসারে হয়ে থাকে, চুপি চুপি সাবধান হলেই সব শুধরে যায়, কাকে-বকেও টের পায় না। স্ত্রীজাতটাই ঐ রকমের, পণ্ডিতে সাধে কি বলেছে "স্ত্রী আর খল সর্প দুই বড় অবিশ্বাসী!" অন্য কেউ হলে না বুঝে থাকতেই পার্ত্ত না, আর দশ হাত লাফিয়ে উঠে স্ত্রীর মুণ্ডপাতের একটা কিছু ব্যবস্থাও ঠাওরে ফেলতো, সে কিন্তু নির্ব্বিকার, তা আর হবে না, সত্যি-কারের ভালবাসা যে! সে বল্‌লে 'কি হয়েছে ভাই খুলেই বল, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনে।' তখন বন্ধুটি বল্লেন 'যদি বুঝতেই পার্ব্বে তাহ'লে কি আর এমনটি দাঁড়ায়। তোমার স্ত্রী পাপের পথে নেমেছে, চরিত্রে কলঙ্ক লেগেছে।' সে-ত হেসেই অস্থির, বল্লে, 'আমাদের মধ্যে একটা কলহ বাধিয়ে মজা দেখ্‌বে? সেটি হবার কোন উপায় নেই ভাই। আমাদের কাঁচা ভালবাসা নয়। তুমি যদি একগলা গঙ্গা জলে দাঁড়িয়ে তামাতুলসী হাতে নিয়ে একথা বল, তাও আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পারিনে; সে বল্লেও পারি নে।' তবু বন্ধুটি বল্লেন 'তা যত বিশ্বাসই তোমার থাক, তার বিশ্বাস টলেছে, তুমি সাবধান হও।' কিন্তু সে কিছুতেই বিশ্বাস কর্ত্তে পাল্লে না, মনের কোণে একটু রেখাও তার প'ল না। এমনি করে প্রায়ই বন্ধুটি তাকে ঐ কথাই বলেন। একদিন সে ভারি বিরক্ত হয়ে বল্লে 'আচ্ছা তুমি আমায় চাক্ষুষ কিছু দেখাতে পার কি, তাহলে আমি বিশ্বাস করি?' সে বল্লে 'হ্যাঁ আমি, নিশ্চয়ই দেখাতে পারি। তুমি আসছে শনিবারে থিয়েটারে যাবে বলে সন্ধ্যা বেলা খেয়ে দেয়ে আমার এখানে এসে বসে থেক, তারপর আমি তোমায় দেখাব; কিন্তু আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর তুমি দেখে কিছু একটা কাণ্ড ঘটিয়ে না ফ্যাল। এমনি একটু শাসন করে দিও, তাহলেই মিটে যাবে,

দিন কতক চোখে চোখে রেখ, শুধরে উঠবে।' শনিবার এলো, সে তাই কল্লে, বন্ধু তাকে রাত দশটা বাজলে তাদের বাড়ী নিয়ে গেল, বল্লে 'এ সুযোগ সে ছাড়তে পারে না, সে লোক তোমার বাড়ীতে নিশ্চয়ই আছে, তুমি বরাবর ওপরে উঠে যাও, এখনি প্রমাণ পাবে।' বন্ধুটি পথে দাঁড়িয়ে থাকলেন, সে বাড়ীতে চলে গেল। ওপরে গিয়ে দেখলে বন্ধু যা বলেছে সব সত্যি; স্ত্রীকে বল্লে 'দরজা—খুলে দাও।' সে কেমন থতমত খেয়ে খুলে দিলে। প্রথম পাপের পথে পা ফেলতে সুরু করেছে কিনা, তাই কোন উপায় করে সেটাকে ঢাকবার চেষ্টার বুদ্ধি তার আর জুগিয়ে উঠল না! ছেলেটি ঘরের লোকটিকে নির্ব্বিকারচিত্তে বল্লে 'আপনি ইচ্ছা করেন যেতে পারেন।' সে তখন পালাতে পাল্লে বাঁচে, আর তাকে পায় কে, একেবারে উর্দ্ধশ্বাসে দে দৌড়!—" সে এখানটা এমনি করে বলত যে আমার বড্ড হাসি পেত। —"স্ত্রীটি তখনও থরথর করে কাঁপছে।" তা আর কাঁপবে না? এমন ভালবাসার এমনি প্রতিদান! তা আবার হাতে পাতে ধরা পরেছে; কালামুখি, তখনি দেবতার পায়ে মাথা কুটে মর্ত্তে পাল্লিনে! —"সে কিন্তু কোন রাগ না দেখিয়ে বল্লে, 'ওগো আমার বড় পিপাসা পেয়েছে, জল দাও, পান দাও, দাঁড়িয়ে কেন, শুয়ে পর।' স্ত্রীটি তখন কলের পুতুল, যেন কলেই কাজ করে যাচ্ছে, তা যা যা চাইলে সব দিলে। সে তখন এমনি ভেঙ্গে পড়েছে যে আর দাঁড়াতে পাচ্ছে না, ঘরের মেজেতেই শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। ছেলেটি তখন আপন মনেই কেন সে অসময়ে সেদিন বাড়ী ফিরতে বাধ্য হ'ল তার একটা কৈফিয়ত বলতে বলতে ঘুমিয়ে পল।

—"এই ঘটনার পর থেকে ছেলেটি আরও তাকে ভালবাসা দেখাতে লাগলে, আরও বেশী করে বিশ্বাস কল্লে, ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ ভাল ভাল সব গয়না গড়িয়ে দিলে, কত রকম রকমের কাপড়-জামা এনে দিলে; কিন্তু স্ত্রীটি একেবারে মরমে মরে গেল। সে ভাবে—আমার এমন স্বামী, আমি কর্চ্ছিলাম কি! এমন কাণ্ড সে চোখে দেখেও একটু বকলে না, রাগও হল' না। অন্য কেউ হলে কেটে দুখান করে দিত। নারী জাতটার একটা স্বভাব আছে যে অন্যায় কল্লেও সে কথা কেউ উল্লেখ করে না দিলে যেচে মার্জ্জনা চাওয়া,—এ তার কুষ্ঠিতে লেখে না। তবু হতভাগিনী তার স্বামীর পায়ে ধরে কেঁদে ক্ষমা চাইলে। কিন্তু তার স্বামী যদি তাকে বকত, দু ঘা লাগিয়ে দিত, তাহলে তার ক্ষমা চাওয়াটা যেন সফল হত, এ এ যেন কি রকম জগত ছাড়া; সে ক্ষমা চেয়েও শান্তি পেল' না। তার স্বামী বল্লেন 'তুমি করেছ কি যে তোমায় ক্ষমা কর্ব্ব? ওতো আমারি দোষ, তোমায় আমি তোমার সব অধিকার করে ভালবাসতে পারিনি, তাই তোমার মন অন্যদিকে গিয়েছিল। এবার আমি তোমায় সব দিক দিয়ে ভালবাসতে চেষ্টা কর্ব্ব। তুমি দুঃখু করো না, কেবল আমায় ক্ষমা ক'রো।' ছেলেটি এমনি করেই তার স্ত্রীর সঙ্গে চলতে লাগল যেন কোন কিছুই ঘটেনি। স্ত্রীটি কিন্তু অনুশোচনায় দিন দিন শুকিয়ে পোড়া কাটখানা হয়ে গেল। অত রূপ তার, যেন কে কালি ঢেলে দিয়ে গেল।

—"কিছুদিন এমনি যায়, ছেলেটি একদিন তার স্ত্রীকে বল্লে 'চল অনেকদিন কালীঘাট যাওয়া হয় নি, তোমায় আমায় মায়ের পূজা দিয়ে আসি।' তখন সে তার স্বামীর সব কাজেই খাঁটি, পুড়ে পুড়ে তখন অনেক খাঁটি হয়ে এসেছে কি না! দুজনে কালীঘাটে গিয়ে বেশ করে মায়ের পূজো দিলে। স্ত্রীটি মায়ের কাছে বুকভাঙ্গা কান্না কেঁদে নিবেদন কল্লে—'এ জীবনে কলঙ্কের দাগ ত আর মুছবে না, শুধু তুমি এইটুকু করো মা—জন্মে জন্মে যেন ওর দাসী হবার অধিকার আমার থাকে; আমি আবার এসে তোমায় বুক চিরে রক্ত দিয়ে পূজো দেব। ওর কোলে মাথা রেখে যদি মর্ত্তে পারি তাহলে সেইদিন বলে যাব, আমার অপরাধ ক্ষমা ক'রো,

জন্মান্তরে আবার তোমার দাসীর অধিকার চাইব, সেদিন যেন বিমুখ হয়ো না।' যাক, ছেলেটি বল্লে 'এইখানে আমার এক বন্ধুর বাড়ী আছে, তারা অনেকবার বলেছে তোমায় একবার দেখ্‌বে। এবার যখন আমরা এসেছি, তা তাদের বাড়ী দিয়ে একবার দেখা করেই যাই।' সেখানে গিয়ে দেখ্‌লে বাড়ীতে কেউ নেই, কেবল একজন চাকর বাড়ী আগ্‌লাচ্ছে। বোধ হয় ছেলেটিকে সে চিন্‌ত, যাবামাত্র ঘরদুয়োর খুলে দিলে, জলখাবার-টাবার এনে খুব যত্ন কল্লে। তখন তাদের দুজনের মত হল এবেলার মত এখানে বিশ্রাম করে ওবেলাই বাড়ী যাওয়া হবে। কাজেও তাই হল। ছেলেটি তার স্ত্রীকে বন্ধুর সমস্ত ঘর-দুয়োর খুলে খুলে দেখাতে লাগল। সব ঘরই সমান, যেখানে যা দরকার সবই ঠিক আছে, সবই যেন নতুন, কোথাও কিছুর অভাব নেই। সমস্ত দেখা-শোনার পর ছেলেটি বল্লে 'এই কাগজখানা নাও, এটা দলিল, এসব তোমারই, আমি আমার যা কিছু তোমায় সব দান করে আজ পথের পথিক হতে চলেছি। তোমার মাসিক আয় তিরিশ টাকা মাসে মাসেই পাবে, এতেও যদি তোমার না চলে, আমার বন্ধুর ঠিকানা দিলাম, তাকে জানিও, সেই তোমায় দেখ্‌বে।'

—"সে-ত শুনেই অবাক, তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে প'ল। সে আগে থেকেই এই রকম একটা কিছুরই কল্পনা মনে মনে কচ্ছিল, তার ডান চোখ অনবরতই নাচ্‌ছিল, মনটা কেমন একটা অজানা বেদনায় আপনা হতেই ভ'রে আস্‌ছিল। সে তার স্বামীর পা জড়িয়ে অনেক কাঁদলে। কেঁদে আর কি হবে, যে পথে বেরিয়ে পড়েছে তাকে আর ধরে কে? যাবার সময় বলে গেল, 'তুমি ত আমায় চাওনি, মনে রেখ' আমি তোমায় চাই, তুমি আমারি। এ জীবনের সম্বন্ধ তুমি ভেঙ্গে দিয়েছ, ভবিষ্যতে আবার তোমায় আমায় মিলব। আমি যদি সত্যিকারের তোমায় ভালবাসি, তাহ'লে এ প্রেমের পুরস্কার ভগবান আমায় দেবেনই, আর তখন তোমাকেই আমার পুরস্কাররূপে চেয়ে নেব। এমন করে চেয়ে নেব, আমার বুক থেকে তোমায় আর কেউ কেড়ে নিতে পার্ব্বে না।' সে-ত চলে গেলই, হতভাগিনী মেয়েটাও দুদিন যেতে না যেতে হঠাৎ মরে গেল; এত বড় শাসন আর সহ্য কর্ত্তে পাল্লে না।"

তখন এই গল্প শুনে মনে হত এ আমাকেই ইঙ্গিত করা, আমার ভালবাসাকেই সন্দেহের চোখে দেখা ছাড়া আর কিছু নয়। এখন বুঝতে পাচ্ছি সে আমায় কতখানি দিতে পেরেছে সেই কথাই জানাত,—আর কতখানি আর দেওয়া হয় নি। ভালবাসার কথা অনেক শুনেছি অনেক পড়েছি, তখন বুঝবার মত কোন শক্তি ছিল না, বুঝতে পারিনি, এখন যেন কিছু কিছু মানে কর্ত্তে পারি। সে বল্‌ত "আমি যখন দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ব তুমি তখন শক্তি দিয়ে তুলে ধর্ব্বে, আমি যখন দানে বিরত হব তুমিই তখন আমার হাতে ধন দিয়ে এগিয়ে দেবে।" ভালবাসার রাজ্যে সে আমায় সব দিয়েই ভালবাস্‌ত, তা নাহ'লে এসব কথা বল্‌তে পারে কে?......

...চিরদিন একভাবে কাটে না, কাট্‌লে ভালও লাগ্‌ত না। জ্ঞানে-মানে, সুখে-দৈন্যে, চেহারায়-ব্যবহারে পরিবর্ত্তন হচ্ছেই, আমারও পরিবর্ত্তন হ'ল খুব। সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার তারতম্যেও বিচলিত হ'লাম। আমি, সে কিছুই হ'ল না। সংসারের আর্থিক পরিবর্ত্তনে সবাই বল্‌ত আমায় অপয়া অলুক্ষণে আরও সব কত কি! আমার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগ্‌ত। এক একদিন কেঁদে কেঁদে এমনি চোখ-মুখ ফুলিয়ে ফেল্‌তাম যে তার কাছে কিছুতেই গোপন কর্ত্তে পার্ত্তাম না। সে কত আদরে আমার মুখখানি তুলে ধরে বল্‌ত "তুমি বুঝি কেঁদেছ আজ? তোমায় যা সবাই বলে তা আমি জানি, তুমি এইটে শুধু মনে রেখ যে, আমি কখনও তোমায় সেভাবে দেখ্‌ব না, ভাব্‌ব না। এই মনে করেই ওসব কথা গুলোকে উপেক্ষা কর্ত্তে

চেষ্টা ক'রো। তোমার চোখের জল যে আমার দেখতে নেই রাণী।" আমি তার কথায় শিউরে উঠ্‌তাম।—সে ছিল একটা পুলকের ধারা, তাকে দেখ্‌লে, তার ছোঁয়া পেলে আমার যে কোন কিছু সুখদুঃখ মনেই থাকে না, কেবল কতকগুলো হাসি এসে উন্মাদ করে দেয়,—তাকে যা বল্‌ব মনে করি সব ঘুলিয়ে ফেলি ......

একটা গান শুনেছি—"তোমারি তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে—" তার পক্ষে এই কথাটাই ঠিক খাটে। সে যে আনন্দ-পাগল বসন্তের হাওয়া, চিরনবীন অফুরন্ত মধুরতায় ভরা। এমনি করে আমায় স্পর্শ দিয়ে গেল যে, যখনই তার কথা ভাবি, তখনই আমি নতুন হয়ে পড়ি, আমি যে কত-কালের একটা পুরোণো হয়ে পড়েছি—সে কথা মনেই আসে না। তাতে আমাতে এই যে ব্যবধান, এত বেদনা, সব যেন এক নিমিষে কোথায় মিশিয়ে যায়। তাকে আমায় ভাবতে যে কতখানি গর্ব্ব জাগে, তাতে যে কোন কষ্ট থাকতেই পারে না—একথা আমি কাউকে বোঝাতে পারিনে; তাকে আমার মতন করে কেউ যদি পেত, তাহলে সে কিছু বুঝতে পার্ত্ত। আমায় কিনা বলে পাগল! পাগল তারা, যারা আমার সৌভাগ্যকে একটুও বুঝতে পারে না।...

...সে একদিন ফাগুনের চাদ্‌নি রাতে, আলো হাওয়ায় কত রূপ,—আমায় বলেছিল "আমরা দুজনে সে এক স্বর্গে, এক অবর্ণনীয় অচিন্তনীয় নীল সরোবরে দুটি পদ্ম হ'য়ে ফুটেছিলাম। সেখানকার যা কিছু সব চিরনতুন, দিনের পর দিন নবীন হয়ে আনন্দ দেয়। সরোবরের পারে পারে পারিজাতের বন, তারা এমনি গন্ধ বিলোয়, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত-গুলো নতুন করে মধুরতায় ভ'রে তোলে।"......

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কামনা

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

অন্তরে আগে ফুটুক মাধুরী
তবে বাহিরের আলোকে
খুঁজিব মাধুরী নূতন করিয়া
নব-জীবনের পুলকে!
আগে ধূলাখেলা ফেলে দিয়ে আসি
মলিনতা আসি ছাড়িয়া,
ধনমান তরে জগতের রণে
স্বেচ্ছায় আসি হারিয়া।
তখন অমল অন্তরখানি
একান্ত প্রেমে ধরিব,
পূজার ফুলের মতন চরণে
বিমল মরণে মরিব।

স্বচ্ছ সুষমা, পুণ্য সুবাসে
নিত্য রহিব ভরিয়া,
গোপনে বিলায়ে আপন মাধুরী
গোপনে পড়িব ঝরিয়া।
সবার আড়ালে গা'ব আপনার
হৃদয়ের গান পুলকে,
স্নিগ্ধ মধুর শান্ত ছায়ায়
শীতল মেদুর আলোকে!
আনন্দময় হবে এ হৃদয়
আনন্দময় ধরণী,
সুন্দর ফুলে ভরিবে আমার
শান্ত জীবন-সরণী!

মাতৃজাতি

ডাঃ শ্রীআদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়, দর্শনসাগর, এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি, আই-ই-এস।

আজ এই বিশাল মহাদেশের সুপ্তচেতনার নিশাবসানে প্রত্যেক পল্লীতে এবং প্রত্যেক সমাজে যে এক বিরাট কর্ত্তব্যের সাড়া পড়িয়াছে—পূর্ব্বগগনে নূতন আশার অরুণচ্ছটার উন্মেষে অসংখ্য বিহঙ্গমীর কলকণ্ঠের মঙ্গলগীতি আমাদের বিবশ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে যে আলস্যজড়তা ত্যাগ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে—ইহা মহাশক্তিপূজার পুণ্যবোধন ব্যতীত আর কিছুই নহে। চারিদিকেই মানবের কর্ম্মস্রোত প্রবলবেগে ছুটিয়াছে; সমগ্র বিশ্বে শক্তিপূজার এক বিপুল তরঙ্গ চলিয়াছে; আর সহস্র সহস্র একনিষ্ঠ পূজক তাহাতে অবগাহন করিয়া জীবন ধন্য করিতেছেন। এই নবজাগরণের সুপ্রভাতে জ্ঞানগরিষ্ঠ কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ আর্য্যঋষির বংশধর—অমৃতের সন্তানগণও কি পূর্ণ উদ্যমে মাতৃপূজার আয়োজনে ব্যাপৃত হইবেন না?

আমাদের হইয়াছিল চরম অধঃপতন—তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিতে এতকাল এই দুর্দ্দশা। আর অধঃপতন অধিকাংশস্থলেই সত্যে অশ্রদ্ধা, শক্তির অপব্যবহার এবং শক্তির অভাবজনিত জাতির স্বকৃত পাপের ফল। জীবের কোন অঙ্গ বিকল হইয়া গেলে যেমন তাহার শক্তির সম্যক স্ফূর্ত্তি হয়না—সেইরূপ সমাজদেহেরও কোন অঙ্গ অথবা সম্প্রদায় সুপ্ত অথবা অবজ্ঞাত থাকিলে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হওয়া অসম্ভব। স্ত্রী-পুরুষ, বালবৃদ্ধ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন কাহাকেও উপেক্ষা বা পদদলিত করিয়া মুষ্টিমেয় মদগর্ব্বিত শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি দ্বারা একটা বিশাল জাতি উন্নত হইতে পারে না। আত্মঘাতী সমাজ যখন স্বার্থান্ধ হইয়া জাতির ভিত্তিস্বরূপা মাতৃজাতিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে তখনই তাহার দুর্গতির সূত্রপাত হয়। পক্ষান্তরে যখন তাঁহাদিগকে জাতীয় উন্নতির প্রধান সহায় জানিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকে তখনই তাহার সভ্যতা এবং শান্তি ফুটিয়া উঠে। প্রাচীন ভারত এবং বর্ত্তমান পাশ্চাত্যদেশ ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। নব্য ইতালীর দীক্ষাগুরু জোসেফ ম্যাট্‌সিনী সত্যই বলিয়াছেন—"যে জাতি স্ত্রীজাতির গৌরব করে না, সম্মান রাখিতে জানেনা, তাহারা কোনদিন জগতে উন্নত হইতে পারিবে না। স্ত্রীজাতিকে সম্মান করিবে এবং ভালবাসিবে, নারীকে শুধু ভোগবিলাসের সামগ্রী মনে করিও না। মনে রাখিও—যে প্রেরণা শৈশবে মা তোমার প্রাণে জাগাইয়া দিয়াছেন পৃথিবীতে তাহার তুলনা মিলেনা। তুমি নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মহৎ এমন একটা ভ্রান্ত ভাব কখনও পোষণ করিও না। নারীর লাঞ্ছনায় জাতির পতন হয়।" বস্তুতঃ মাতৃজাতির জীবনাদর্শ এবং সম্মানদৃষ্টেই বিভিন্ন জাতির সভ্যতার মাত্রা নিরূপিত হইতে পারে।

অতীত-ভারতের ইতিহাসেও এমন একটা গৌরবময় অধ্যায় আছে যখন মাতৃজাতির প্রভাব এবং প্রতিপত্তির সর্ব্বত্রই প্রবল ছিল। বৈদিকযুগের মাতৃজাতির প্রতিভা এবং মৌলিকতার বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়ে প্রাণ নাচিয়া উঠে। একমাত্র পবিত্রতা, আত্মত্যাগ ও মাতৃত্বের প্রাচীরেই তাঁহাদের যশোরশ্মি সীমাবদ্ধ ছিলনা। তাঁহাদের পরমার্থজ্ঞান, সাহিত্য এবং শিল্পকলার পারদর্শিতা এখনও আমাদের প্রাচীন সভ্যতার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। ইহাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্য এবং গভীর পাণ্ডিত্যের পদতলে জ্ঞানাবতার শ্রীমৎ

শঙ্করাচার্য্যকেও পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল! প্রাগৈতিহাসিক যুগাবধি সাধারণ গৃহকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞান ভক্তি বিদ্যা শিল্প রাষ্ট্রনীতি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই নারীর আসন উচ্চে রহিয়াছে।

স্মরণাতীত কাল হইতে আধুনিক যুগের প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মনিষিমণ্ডলী সকলেই একবাক্যে বলিয়া আসিতেছেন—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।" আমাদের শাস্ত্র আরও বলেন "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" কোন জাতির উন্নতি-কামনা করিলে সর্ব্বাগ্রে দেশ জননীগণের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা করা আবশ্যক। সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য জননীই প্রধানতঃ দায়ী এবং মাতৃজাতির মানসিক উৎকর্ষের উপর মানবের জ্ঞানের বিকাশ নির্ভর করে। সন্তানের জীবন গঠনে মাতা যে প্রকার সহায়তা করিতে পারেন শত শিক্ষকের পক্ষেও তাহা সম্ভবপর নহে। আনন্দের বিষয় আমাদের বর্ত্তমান সমাজও এ বিষয় মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছেন। কিন্তু সমস্যা জটিলতর হইয়া পড়িয়াছে, স্ত্রী-জাতির আদর্শ এবং শিক্ষাপ্রণালী লইয়া। দেশ কাল পাত্র সদসৎ বিবেচনা না করিয়া সকল বিষয়ে পরানুকরণ করাতে গুরুতর বিপদাশঙ্কা আছে। আমার স্ত্রী এবং পুরুষে যে বিশেষ পার্থক্য তাহা বিধিদত্ত—একথা অগ্রাহ্য করিলেও মহা অনর্থ ঘটিবে। সুতরাং নারীর শিক্ষার আদর্শ নিরূপিত হওয়া উচিত তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া এবং এই শিক্ষা যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সুফল লাভ করে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিদ্বারা অন্তর্নিহিত শক্তিকে সম্যক বিকশিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাহা সিদ্ধ না হইলে কুশিক্ষা অপেক্ষা বরং অশিক্ষাও অনেকাংশে শ্রেয়ঃ মনে হয়। স্নেহ, পবিত্রতা, আত্মত্যাগ, সংযম, ধর্ম্মপরায়ণতা, কর্ম্মপটুতা, কমনীয়তা ইত্যাদি মধুর গুণাবলীর আধার বলিয়াই হিন্দুনারী "দেবী" আখ্যা পাইয়াছেন। তাঁহাদের চরিত্রের এই বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শিক্ষাদ্বারা এই সমস্ত সদ্গুণের বিকাশ-সাধন করাই ভারতের স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত।

নারীর শিক্ষার কাল স্থূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম কয়বৎসর তাঁহারা প্রয়োজনীয় সকল বিষয়েরই কিছু কিছু শিক্ষা করিবেন, যদ্দারা দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ও পারিবারিক সমস্ত কাজ (যথা—গৃহকর্ম্ম, সদ্গ্রন্থপাঠ, হিসাবপত্র, সেবা-শুশ্রূষা, সদাচার সংযম ইত্যাদি) অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেও সম্পন্ন করিতে পারেন। জ্ঞান অনন্ত আর আমাদের আয়ুষ্কাল নিতান্তই অল্প, কাজেই জীবনে কখনও কাজে লাগিবেনা এমন কতকগুলি বিষয় গলাধঃকরণ করিয়া শক্তি এবং সময়ের অপব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নহে। শিক্ষার দ্বিতীয় কাল, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের উদ্দেশ্যানুযায়ী ব্যয়িত হইবে। এই সময়ে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, শিল্পকলা, কষ্টসহিষ্ণুতা, সন্তান-পালন, পূজা জপ ধ্যান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চাঙ্গের বিদ্যাদি যাঁর যাঁর প্রয়োজন মত শিক্ষা করিবেন। ঋষিযুগের শিক্ষা সময়োপযোগী করিয়া জীবনে সার্থক করিতে হইবে। কেবল অতীতের লুপ্তগরিমার চিতাভস্ম বুকে ধরিয়া কাঁদিলেই আমাদের দুর্দ্দশার অবসান হইবে না। সেকালে যাহা সত্য এবং সুন্দর ছিল একালেও তাহা আবার বাস্তবে পরিণত করিয়া আরও উন্নতির দিকে অগ্রসর হইলে, তবেই আমাদের শিক্ষা সফল এবং পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষদের মর্য্যাদা রক্ষা হইবে।

জাগাও মাতৃজাতি—গার্গী ও মৈত্রেয়ীর গভীর ব্রহ্মজ্ঞান পিপাসা লইয়া; করমেতি ও মীরাবাঈর বিগলিত প্রেমধারা আর পরিব্রাজিকা গোতমী ও সঙ্ঘমিত্রার বিশ্বহিতৈষিণা, বাগ্মিতা এবং প্রচার দক্ষতা লইয়া; কর্ম্মদেবী ও অহল্যাবাঈর অদ্ভুত শৌর্য্যবীর্য্য লইয়া—আর একবার জীবন্মৃত কর্ত্তব্যবিমূঢ় সন্তানের নির্জীব দেহে শক্তি সঞ্চার

করিয়া দাও। আর একবার মরণসিন্ধুর অতল অন্ধকার ভেদ করিয়া আশা-দীপ-হস্তে ভাসিয়া উঠুক সতী বেহুলার জীবন-মরণ-সাধনা। ভারতের ভূ-লুণ্ঠিত গৌরব পূর্ণ কৌমুদীর ফুল্ল জ্যোৎস্নায় হাসিয়া উঠুক। আবার ভারতে সীতা, শৈব্যা, সাবিত্রী, আসিবেন—অপালা, বিশ্ববরা, অরুন্ধতী আসিবেন—খনা, পটাচারা, লীলাবতী আসিবেন। আবার ভারতের সকল অরণ্যকন্দর নগর পল্লী শান্তিচ্ছন্দের তড়িৎ-ঝঙ্কারে আনন্দে নাচিয়া উঠিবে। সে শুভদিনের ত আর বিলম্ব নাই। বিশ্বাস কর সে নবযুগের প্রবর্ত্তক যে মা—তোমরাই—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃ রূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

নারী-জাগরণ

শ্রীশৈলেশনাথ বিশী এম্-এ, বি-এল।

বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র নারীজাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে নারী-জাগরণ কিরূপ হওয়া উচিত ইহা লইয়া জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। দুই একজন মহিলা ইহা লইয়া মসীযুদ্ধও করিতেছেন!

আসল কথা এই—এই জাগরণ জিনিষটা জল্পনা কল্পনার বিষয় নহে। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে বিছানায় থাকিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। ঘুম ভাঙ্গিলে কি করিয়া উঠিতে হয় তাহা অপরে হাজার চেষ্টা করিয়াও বুঝাইতে পারে না। যাহার ঘুম ভাঙ্গে সে কাহারও বুঝান'র অপেক্ষা না করিয়া আপনি উঠিয়া বসে।

আমাদের দেশের নারীদের সত্যকার জাগরণ যখন হইবে তখন তাঁহাদের জাগরণ কিভাবে হইবে তাহা অন্যকে বুঝাইতে হইবে না। তাঁহাদের পর্দ্দা থাকিবে কিনা, ঘোমটা খসিয়া পড়িবে কি থাকিবে, পণ দিয়া কন্যা বিক্রীত হইবে কিনা এসব বিষয় পুরুষের অনধিকার চর্চ্চা তাঁহারা একবারে বন্ধ করিয়া দিবেন।

আরও শোচনীয় বিষয় এই যে, নারীজাগরণের সাড়া পাইলেই একশ্রেণীর লোক সীতা সাবিত্রী প্রভৃতির দোহাই দিয়া এই জিনিষটা চাপা দিতে চেষ্টা করেন। সীতা সাবিত্রী কিরূপ ছিলেন সে সম্বন্ধে ইহাঁদের যে স্পষ্ট ধারণা আছে তাহা মনে হয়না। তবুও অতীতের দোহাই দিয়া বর্ত্তমানকে খাট করার চেষ্টা তাঁহারা করিবেনই। সীতা সাবিত্রীর আদর্শের দোষ দিই না, তবে বর্ত্তমান প্রয়োজন অনুসারে তাহার আদর্শ গড়িয়া তুলিবে ইহাই আমার বলিবার কথা। আমাদের দেশে নারীজাতি পদে পদে পুরুষের মুখাপেক্ষিনী।

নারীদের জাগরণের সর্ব্বপ্রথম লক্ষণ ইহাই হইবে, যখন দেখিব তাঁহারা জীবিকা অর্জ্জনের জন্য পুরুষের উপর নির্ভর করিবেন না।

"নস্ত্রীস্বাতন্ত্র্যমর্হতি" যে দেশের বেদবাক্য সে দেশে পুরুষ কস্মিনকালেও নারীদের স্বাধীনতা দিবেন না। এই স্বাতন্ত্র্য অর্জ্জনের পথে বাধাবিঘ্ন বহুতর, ভুলভ্রান্তিও অনেক হইবে, তাই বলিয়া নারীসমাজের বিচলিত হইলে চলিবে না।

তাঁহাদের প্রতি আমার একটি বিশেষ অনুরোধ এই যে, তাঁহাদের গায়ের চামড়া একটু পুরু করিতে হইবে। ফুলের ঘায়ে বা কথার চোটে মূর্চ্ছা গেলে চলিবে না। নির্লজ্জ পুরুষ (কাপুরুষেরই নামান্তর) যখন কিছুতেই নারীদের সহিত পারে না তখন তাঁহাদের চরিত্রে কটাক্ষ করে; মেয়েদের তাহা

উপেক্ষা করিতে হইবে। আমাদের মনে হয় এই সব বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া যখন নারীরা পুরুষের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে পারিবেন, স্বাবলম্বিনী হইতে পারিবেন তখনই সত্যকার জাগরণ আরম্ভ হইবে।

আর একটি কথা ভাবিবার আছে। আমাদের পিতামহীগণ স্বামীর সহিত সহমৃতা হইতেন অথচ তাঁহাদেরই নাতনীরা নিজেরা আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছেন না।

ইহার কারণ কি? যাঁহারা জলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেন তাঁহাদের সহনশীলতা ও ধৈর্য্যের তুলনা নাই, তবে তাঁহাদের এক ধাপ নীচের এ অবস্থা কেন?

আমাদের পিতামহীগণ পুড়িয়া মরিতেন সামাজিক প্রথায়। অনেকস্থলে ইচ্ছা করিয়াও (জোর প্রয়োগ ব্যতীত) যে সহমৃতা না হইতেন এরূপ নহে। তখনকার দিনে স্বামীর সহিত সহমৃতা না হওয়া নিন্দার বিষয় ছিল। সেই গ্লানির হাত হইতে বাঁচিবার জন্যই তাঁহাদের অমূল্য জীবন এই ভাবে হেলায় দিয়াছেন। আজ তাঁহাদের নাতনীরাও ঠিক তাহাই করিতেছেন নাকি? অনূঢ়া যুবতী কন্যা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে মুক্তি দিবার জন্য হেলায় কেরোসিন ঢালিয়া জলন্ত শিখায় আত্মহত্যা করিতেছেন। অথচ নিজেদের আত্মরক্ষার মত শৌর্য্য ও সাহস তাঁহাদের নাই।

পুড়িয়া মরা তাঁহারা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছেন – সে পাওয়ার মূলে গ্লানির হাত হইতে মুক্তি।

নারী জাগরণ সেই দিনই আরম্ভ হইবে যেদিন অনূঢ়া যুবতী কন্যা পিতাকে 'কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিবার জন্য পুড়িয়া মরিবেন না, কুমারী-জীবন যাপন করিয়া নিজকে দেশের সেবায় বিলাইয়া দিয়া, স্বাবলম্বিনী হইয়া বাঁচিয়া থাকিয়া শত শত অনূঢ়াকে বাঁচিবার পথ দেখাইবেন।

আশা করি আমার কথা মাতৃ-মন্দিরের পাঠিকারা ভাবিয়া দেখিবেন এবং এখন হইতেই তাঁহাদের বিষয়ে অন্যকে অনধিকার চর্চ্চার মুখ বন্ধ করিয়া দিতে আরম্ভ করিবেন।

সুনীতি

পণ্ডিত শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

প্রাচীনকালে আমাদের ভারতবর্ষে প্রিয়ব্রত নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার সুরুচি ও সুনীতি নাম্নী দুইজন মহিষী ছিলেন। সুনীতির প্রতি রাজা অতি প্রীতিমান্ ছিলেন না, ইহারই গর্ভে লোকপাবন ধ্রুব জন্মগ্রহণ করেন। এক সময় সুরুচি-গর্ভসম্ভূত উত্তম, রাজাসনস্থিত পিতার অঙ্কে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহা দেখিয়া ধ্রুব পিতার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে উৎসুক হন। স্ত্রৈণ রাজা সুরুচির সাক্ষাতে পুত্রকে কোনরূপ অভিনন্দন করিলেন না। ধ্রুবের এই কার্য্য দেখিয়া সুরুচি ধ্রুবকে তীরস্কার করিয়া তাঁহার মন্দভাগ্যের কথা উল্লেখ করেন। বালক ধ্রুব কুপিত হইয়া নিজ মাতার মন্দিরে গমন করেন। সুনীতি পুত্রকে কুপিত ও প্রস্ফুরিতাধর দেখিয়া, ক্রোড়ে লইয়া ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বালক, পিতার তাচ্ছিল্য, বিমাতার গর্ব্বোক্তি যথাযথরূপে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মাতার কাছে বলিলেন। ক্ষত্রিয় পুত্র পঞ্চমবর্ষীয় ধ্রুব বিমাতার অবমাননায় বিমোহিত না হইয়া তাহার প্রতিকারকল্পে মনোনিবেশ করেন। ধ্রুবের একনিষ্ঠা, অনন্য

সাধারণ উত্তম, অদ্ভুত বিশ্বাসবলে তিনি নিজের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার উগ্র তপস্যায় পৃথিবী প্রকম্পিত হইয়াছিল, দেবগণ উদ্বিগ্ন আর লোকসকল চকিত হইয়াছিল। বালক যখন শারীরিক সুখদুঃখের কথা ভুলিয়া গিয়া অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তখন তাঁহার আকাঙ্ক্ষা কখন অপরিপূর্ণ থাকে না এ বিষয় ধ্রুবের ন্যায় উদাহরণ পৃথিবীর তাপস-ইতিহাসে সুদুর্ল্লভ। দেশে বাল-তাপসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে দেশ কখন অবসাদ-সাগরে নিমগ্ন হইতে পারেনা। মাতার যে উপদেশের ফলে ধ্রুব ধ্রুবত্বকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই অমৃতময়ী সঞ্জীবনী উপদেশ আবার মাতারা পুত্রকে দিয়া দেশ পবিত্র করুন।

সুনীতির উপদেশ—

সুরুচিঃ সত্যমাহেদং স্বল্প ভাগ্যোসি পুত্রক।
নহি পুণ্যবতাং বৎস! সপত্নৈরেব মুচ্যতে॥
নোদ্বেগস্তাত! কর্ত্তব্যঃ কৃতং যদ্ভবতা পুরা।
তৎ কোঽপহর্ত্তুং শক্নোতি দাতুং কশ্চাকৃতং ত্বয়া॥
রাজাসনং তথাচ্ছত্রং বরাশ্বাবরবারণাঃ।
যস্য পুণ্যানি তস্যৈতে মত্বৈতৎ শাম্য পুত্রক!
অন্যজন্মকৃতৈঃ পুণ্যৈঃ সুরুচ্যাং সুরুচির্নৃপঃ।
ভার্য্যেতি প্রোচ্যতে চান্যা মদ্বিধা ভাগ্যবর্জ্জিতা॥
পুণ্যোপচয়সম্পন্নস্তস্যাঃ পুত্রস্তথোত্তমঃ।
মম পুত্রস্তথা জাতঃ স্বল্পপুণ্যো ধ্রুবো ভবান্॥
তথাপি দুঃখং ন ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি পুত্রক!
যস্য যাবৎ স তেনৈব স্বেন তুষ্যতি বুদ্ধিমান্॥
যদি বা দুঃখমত্যর্থং সুরুচ্যা বচসা তব।
তৎ পুণ্যোপচয়ে যত্নং কুরু সর্ব্বফলপ্রদে॥
সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ।
নিম্নং যথাপঃ প্রবণাঃ পাত্রমায়াতি সম্পদঃ॥

সন্তপ্ত পুত্রের মুখে অবমাননার কথা শ্রবণ করিয়া দীনা সুনীতি দুর্ম্মনা ও দীর্ঘনিশ্বাসে ম্লানন না হইয়া বলিতে লাগিলেন :—

হে পুত্র! সুরুচি সত্যই বলিয়াছেন যে তুমি স্বল্পভাগ্য। বৎস! পুণ্যবানদিগকে শত্রুরা এরূপ কথা কহে না। হে তাত! উদ্বেগ করা কর্ত্তব্য নহে, তুমি পূর্ব্ব জন্মে যাহা করিয়াছ তাহা কে দূর করিতে সমর্থ? আর যাহা সঞ্চয় কর নাই তাহাই বা কে প্রদান করিতে সমর্থ? রাজাসন, ছত্র, বরাশ্ব ও বরবারণ এই সকল দ্রব্য যাহার পুণ্য আছে সেই প্রাপ্ত হয়। হে পুত্র, ইহা বিবেচনা করিয়া শান্ত হও। অন্য জন্মকৃত পুণ্য হেতু সুরুচির প্রতি রাজার সুরুচি হইয়াছে। আর আমার ন্যায় ভাগ্যবর্জ্জিত স্ত্রীলোক কেবলমাত্র ভার্য্যানামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহার পুত্র উত্তম পুণ্যোপচয় সম্পন্ন, তুমি আমার স্বল্প পুণ্য পুত্র ধ্রুব জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে পুত্র! তথাপি তোমার দুঃখ করা উচিৎ নহে। যাহার যে পরিমাণ পুণ্য থাকে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাতে সন্তুষ্ট হয়। যত্তপি সুরুচির বাক্যে তোমার অত্যন্তই দুঃখ হইয়া থাকে তবে, সর্ব্বফল প্রদ পুণ্যের উপচয়ে যত্নবান হও। সুশীল, ধর্ম্মাত্মা, মৈত্র এবং প্রাণীহিতে রত হও। জল যেরূপ নিম্নপ্রবণ সম্পদসকল সেরূপ পাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে।

সুনীতি, বালক ধ্রুবের অভিমান দূর করিবার জন্য সাধারণতঃ যেরূপ উপায় অবলম্বন করা হয় সেইরূপ উপায় গ্রহণ করিয়া অদৃষ্টবাদের অবতারণা করিয়া পুত্রের শান্তি আনয়নের জন্য সচেষ্ট হন। এ শান্তি ক্রিয়াশূন্যতা, এ শান্তি অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাতেই চেষ্টা বিহীন হইয়া সন্তুষ্ট থাকা—এ শান্তি মনুষ্যের কার্য্যকরী শক্তির উন্মেষের পক্ষে বাধাজনক। বিমাতার বাক্যে ভিন্ন-হৃদয় ধ্রুবের এ শান্তি ভাল লাগিল না। বরং এ শান্তিবাদ তাঁহার হৃদয়কে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। কাপুরুষ নিজের হীন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে। যাঁহারা অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন তাঁহারা কোন অবস্থাতেই নিশ্চেষ্ট বা সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান করেন না। তাই মাতৃদেবীর "সর্ব্বফলপ্রদ পুণ্যোপচয়ে" উপদেশের দিকে তাঁহার মন ধাবিত হইল। জগতে এরূপ কোন

স্থান নাই যাহা পুণ্য দ্বারা অধিগত হওয়া না যায়। তাই ধ্রুবের পৈত্রিক রাজ্য ধন সম্পদ ভাল লাগিলনা—পিতাও যাহা প্রাপ্ত হন নাই ধ্রুব সেই অপূর্ব্ব পদার্থ প্রাপ্তির জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন।

পতিত ব্যক্তি বা জাতিকে উন্নত করিতে হইলে সুনীতির যে উপদেশ "সুশীল—ধর্ম্মাত্মা—মৈত্র এবং প্রাণীহিতে রত হও", ইহার ন্যায় সুন্দর উপদেশ আর নাই। যখন জাতি বা ব্যক্তি প্রাণীহিতে বিরত থাকে তখন সে জাতি বা ব্যক্তি হীন অবস্থাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মৈত্র বা সহানুভূতির অমোঘ শক্তি। এই শক্তি প্রভাবে অধঃপতিত ব্যক্তি উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। একতা বন্ধনের পক্ষে সহানুভূতির ন্যায় কার্য্যকর অপর কোন শক্তি উপলব্ধ হয় না। যখন জাতি বা ব্যক্তি পরস্পর সহানুভূতিশূন্য তখন সে জাতি বা ব্যক্তি পরাধীনতার দুর্ব্বিসহ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

সুনীতি, পুত্র যাহাতে প্রজাগণের হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় সে জন্য তিনি তাঁহাকে "প্রাণীহিতে রত" হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। রাজশক্তি অপেক্ষা প্রজাশক্তির অপূর্ব্ব প্রভাব। যিনি প্রজাশক্তি নিয়মন করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে রাজশক্তির নিয়ামক। সুনীতি, ধ্রুব যাহাতে রাজশক্তির নিয়ামক হইতে পারেন সেই অভিপ্রায়ে পুত্রকে "মৈত্র ও প্রাণীহিতে নিরত" হইতে উপদেশ প্রদান করেন। যিনি এইরূপে পাত্রত্ব লাভে সমর্থ হন তিনি সকল প্রকার সম্পদের আশ্রয়স্থল হইয়া থাকেন।

আমাদের বর্ত্তমান ভারতবর্ষের পক্ষে সুনীতির উপদেশের ন্যায় মঙ্গলজনক উপদেশ আর দ্বিতীয় নাই। রোগে শোকে ক্লিষ্ট, বুভুক্ষিত, দরিদ্র প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি শূন্য হওয়াতেই বর্ত্তমান কালে ভারতের এরূপ অধোগতি হইয়াছে। একের দুঃখে যখন সমস্ত জনপ্রাণী দুঃখীত বা সুখে সুখী হইয়া থাকে তখন সে জাতি কখন হীনাবস্থায় বহুদিন পতিত থাকিতে পারে না। সেইজন্য জাতির মধ্যে এই সকল সদ্‌গুণ যাহাতে বহুল পরিমাণে অনুকৃত হয় সে বিষয় সেকালের দেশবাসী বিশেষরূপে সচেষ্ট ছিলেন।

বালক ধ্রুব সুনীতির উপদেশ অনুসারে জীবমাত্রের উপর মৈত্রী দেখাইয়াছিলেন বলিয়া বন্য পশুরাও তাঁহার প্রতি সদয়ভাব দেখাইয়াছিলেন। সুনীতির ন্যায় বর্ত্তমানকালের মাতারা বালকগণ যাহাতে সুপাত্র হইতে সমর্থ হয় এরূপ উপদেশ দিয়া ভারতকে পুনরায় পবিত্র করুন।

ধ্রুবচরিত্র বিশ্লেষণে আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্য যাহা আকাঙ্ক্ষা করিবে তাহার প্রাপ্তির জন্য তদনুরূপ ঐকান্তিকতার সহিত যদি সে সচেষ্ট হয় তাহা হইলে ত্রৈলক্যে এরূপ কোন দুর্ল্লভ পদার্থ নাই যাহা তিনি হস্তগত করিতে অসমর্থ হন; সামান্য পার্থিব রাজ্য ত তুচ্ছ কথা। কোথায় পৃথিবী, কোথায় ধ্রুবলোক, মানব ধ্রুব অধ্যবসায়ের বলে ধ্রুবলোক জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কবি যথার্থই বলিয়াছেন উদ্যমশালীর পক্ষে কোন বিষয়ই অপ্রাপ্য নহে। ব্যবসায়ী ব্যক্তি সকলপ্রকার শ্রেষ্ঠ পদার্থ ভোগ করিয়া থাকেন আর অব্যবসায়ী ব্যক্তি প্রচুর দ্রব্যপুঞ্জের মধ্যেও অনশন-ক্লিষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। ধ্রুব দৈবের উপর দৃষ্টিপাত না করিয়া পুরুষার্থ আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া পূজিত হইয়াছেন।

আজ ধ্রুবের কৃপায় সুরুচি-উত্তম আদি নামের সহিত আমরা পরিচিত। ধ্রুবের কঠোর তপস্যার ফলে তাঁহার বংশ গৌরবান্বিত হইয়াছে, দেশ পবিত্র হইয়াছে, আমরাও তাঁহার দেশবাসী [illegible] অনুভব করিয়া থাকি। মাতারা যদি সুনীতি অবলম্বিত পথ অবলম্বন করিতে মনোযোগী হন তাহা হইলে পোনর কোটীর মধ্যে একজন ধ্রুব প্রস্তুত করিতে পারেন না?

মাতৃমন্দির



Bhoodeb Publishing House,
44, Manicktola Street, Calcutta.



মাতৃমন্দির



২য় বর্ষ | চৈত্র—১৩৩১ | ১২শ সংখ্যা

নারী-বোধন

অধ্যাপক শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি-এ।

আজ, মশগুল কর মন্দিরময় গুগ্‌গুল দহিয়া,
ঢাল, মহুয়ার মধুগন্ধ-মদির অন্তর মোহিয়া ;
লেপ, চন্দন ভালে, রজনীগন্ধা-মাল্য আভরণে
সিঁথে, হিন্দুদেবীর সিন্দূর দাও ইন্দিরা বরণে।
আজ, লক্তক রাগ অক্ত চরণে নক্তের শোভনে
আন, শ্রান্তি হরিয়া শান্তির ধারা ভ্রান্তির ভবনে।
আজ, 'এয়োতির নোয়া' অক্ষয় কর লৌহগৌরবে,
তার, কুঞ্চিত কেশ বঞ্চিত নহে অমিয় সৌরভে।
শুভ উৎসবে লাজ বর্ষণ কর মঙ্গল অতিশয়,
তার আস্যের মধু হাস্যের রাশি লাস্যের অভিনয়।
তার দৈন্য-দলনী উন্মুখীপ্রাণ পুণ্য অর্পণে,
কর অঞ্চল তার চির চঞ্চল অশ্রু তর্পণে ;
তা'র কঙ্কণ প'রে সাধ্বীর ছবি অঙ্কন করিয়া
দাও নির্মল হিয়া নির্মাল্যের কল্যাণে ভরিয়া।

মদালসা

পণ্ডিত শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

আমাদের ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে শত্রুজিৎ নামে একজন মহা পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার ঋতধ্বজ নামে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত এক পুত্র হইয়াছিল। একদিন শত্রুজিৎ রাজার কাছে গালব নামে একজন ঋষি একটি অপূর্ব্ব ঘোটক লইয়া উপস্থিত হন। এই ঘোটক অবিশ্রান্তে সমস্ত ভূবলয়- লংঘন করিতে সমর্থ ছিল বলিয়া ইহা "কু-বল" নামে খ্যাতি লাভ করে। "কু-বল" ঘোড়ার নামানুসারে ঋতধ্বজ অনেক সময় কুবলয়াশ্ব নামে পরিচিত হইতেন। গালব ঋষি রাজাকে ঘোড়া দিয়া বলিলেন "মহারাজ, দানবরা নানা রূপ ধারণ করিয়া আমাদের আশ্রমে আসিয়া নানা প্রকার উপদ্রব করিয়া থাকে। আমি মৌনাবলম্বন বা সমাধিযুক্ত হইয়া থাকিলেও আমার মন বিচলিত হয়। আমি তাহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইলেও বহুদিনের দুঃখোপার্জ্জিত তপস্যা ব্যয় করিতে ইচ্ছা করি না। আপনার ক্রোধাগ্নিতে তাহারা দাহ হউক।" রাজা ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া পুত্র ঋতধ্বজকে সেই অশ্বে আরোহণ করাইয়া মুনির সহিত প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি গালবও তাঁহাকে আশ্রমে লইয়া গেলেন।

এই পৃথিবীতে দুই প্রকার সভ্যতা বর্ত্তমান, এক আর্য্যসভ্যতা আর এক অনার্য্যসভ্যতা; ইহাকে নিবৃত্তিমার্গ ও প্রবৃত্তিমার্গও বলা যায় পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান কালে পর্য্যন্ত দানব- দস্যু রাক্ষস প্রভৃতিরা আমাদের এই আর্য্যসভ্যতা বা নিবৃত্তিমার্গের বিরোধী। ব্রাহ্মণেরা এই সভ্যতা প্রচারের জন্য সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেন, আর ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রেরা শরীর ও ধন দিয়া ইহাদিগকে রক্ষা করিতেন। প্রাচীনকালের দানব, রাক্ষসরা বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, বর্ত্তমানকালে সেই ভাবের জাতিরা আর্য্যসভ্যতার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহারাও যে বিনষ্ট হইবে তাহা তাহাদের কার্য্যে প্রতীত হইয়া থাকে। ঋতধ্বজ বাহুবলে দানবগণকে দমন করিয়া আশ্রমের শান্তি সম্পাদন করিলেন। একদিন এক ভয়াবহ দানব আশ্রমের অশান্তি উৎপাদনের জন্য আগমন করে। তাহার দৌরাত্মে আশ্রমবাসীরা চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। কুবলয়াশ্ব সশস্ত্র হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে গমন করেন। দানব শর-পীড়িত হইয়া পলায়নপর হইল, রাজপুত্রও তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। পশ্চাদ্গমন করিতে করিতে রাজপুত্র জনশূন্য এক পুরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় দানবের পরিবর্ত্তে তিনি একজন রমণীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। রমণী রাজপুত্রের কোন কথার উত্তর না দিয়া এক অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, রাজকুমারও তাহার মধ্যে গমন করিয়া দেখিলেন এক সুন্দরী পূর্ব্ব দৃষ্ট বামা সহ পর্য্যাঙ্কে অবস্থান করিতেছেন। প্রশ্নে অবগত হইলেন যে ইনি গন্ধর্ব্বকন্যা মদালসা, দানবেরা ইঁহাকে হরণ করিয়া আনয়ন করিয়াছে। রাজকুমার ও মদালসা প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। রাজপুত্র মদালসাকে অশ্বে উপবেশন করাইয়া দানবপুরী পরিত্যাগ করেন। রাজপুত্রের গমনকালে দানবেরা এ কথা অবগত হইয়া মিলিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। রাজপুত্র তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া মদালসা সহ স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। এই সময় হইতে ঋতধ্বজ প্রতিদিন ব্রাহ্মণ রক্ষা ও অসুর ধ্বংস করিবার জন্য ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন।

দুষ্ট দানবরা ঋতধ্বজকে জব্দ করিবার জন্ত মায়া রচনা করিল। একটা দুষ্ট দানব ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া তপস্তা করিতে আরম্ভ করিল। ঘটনাক্রমে ঋতধ্বজ যদৃচ্ছাক্রমে সেই তপোবনে উপস্থিত হইলে মুনিরূপী দানব ঋতধ্বজকে বলিল "আপনি আমার আশ্রম রক্ষা করুন, ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞ-দক্ষিণা দিবার জন্ত কিছু স্বর্ণের আবশ্যক, যদি আপনি সদয় হইয়া আপনার কণ্ঠ-ভূষণ দান করেন তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হই।" রাজপুত্রের ব্রাহ্মণকে অদেয় কিছুই ছিলনা, তিনি আনন্দিত মনে কণ্ঠ-ভূষণ প্রদান করিলেন। দুষ্ট দানব ঋতধ্বজকে আশ্রম রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, তাঁহার পিতার কাছে উপস্থিত হইয়া কহিল, "রাজন, আপনার পুত্র দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে এই কণ্ঠ-ভূষণ আপনাকে দিবার জন্ত আমাকে অনুরোধ করেন। আমরা মুনি, এই স্বর্ণ লইয়া কি করিব তাই ইহা দিতে আসিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া রাজা রাণী অত্যন্ত শোকাতুরা হন। তাঁহার স্ত্রী মদালসা পতির মৃত্যু কথা শুনিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। শোকের উপর শোকে, রাজধানী শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। গো-ব্রাহ্মণের জন্ত পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে ইহাতে রাজা ও রাণীর অনেকটা সান্ত্বনার বিষয় হইয়াছিল। এই সময় পুত্রশোকাতুরা রাণী রাজাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে সেকালের জননীর হৃদয় কিরূপ ভাবে শিক্ষিতা হইত তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

তিনি বলিয়াছিলেন—"রাজন্! মুনিকে পরিত্রাণ করিতে করিতে পুত্র নিহত হইয়াছে শুনিয়া আজ যেরূপ সুখী হইয়াছি মাতা বা ভগিনী কাহারও দ্বারা আমি এ প্রকার সুখী হইতে পারি নাই। যাহারা বান্ধবগণকে শোকার্ত্ত করিয়া অতি দুঃখে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ব্যাধিক্লিষ্ট হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করে, তাহাদের মাতা বৃথা পুত্র-জননী। যাহারা গো বা দ্বিজগণের রক্ষার জন্ত সংগ্রামে নির্ভয়চিত্তে যুধ্যমান হইয়া, শস্ত্রক্ষুণ্ণ হইয়া বিপন্ন হয়, পৃথিবী মধ্যে তাহারা মানুষ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। অর্থী, মিত্র এবং শত্রুবর্গ যাহার নিকট পরাঙ্মুখ হয় না, তদ্দ্বারাই পিতা পুত্রবান বলিয়া খ্যাত এবং মাতাও বীরপ্রসবিনী বলিয়া পরিগণিত হন। পুত্র যখন সংগ্রামে নিহত হয় বা শত্রুজয় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়, তখনই স্ত্রীলোকের গর্ভক্লেশের সফলতা হইয়া থাকে।"

দানব সকলকে শোকাকুল করিয়া আবার কুবলয়াশ্বের নিকট উপস্থিত হইল। মুনিরূপী দানব কুবলয়াশ্বের কার্য্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বিদায় প্রদান করিল। রাজপুত্র ত্বরান্বিত হইয়া রাজধানী প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। রাজকুমারকে আগমন করিতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া দৈবের প্রভাব মনে করিতে লাগিলেন। রাজকুমার পিতা মাতা প্রভৃতিকে অভিবাদন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মদালসার মৃত্যুতে যার পর নাই কাতর হইয়া পড়িলেন। অতঃপর ঋতধ্বজের শুভানুধ্যায়ী জনৈক নাগরাজের অলৌকিক প্রযত্নে মদালসা জীবন লাভ করেন ও তাঁহার সহিত রাজকুমার মিলিত হন। ইহাতে আনন্দের অবধি রহিল না।

কালক্রমে শত্রুজিৎ যথাশাস্ত্র বসুন্ধরা শাসন করিয়া কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইলেন। কুবলয়াশ্বকে পুরবাসীরা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনিও নিপুণতার সহিত রাজ্যশাসন করিয়া সকলের আনন্দভাজন হন। এই সময় মদালসার গর্ভে তাঁহার প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রাজা সেই পুত্রের নাম বিক্রান্ত রাখিলেন। বালক অস্ফুটস্বরে ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলে মদালসা সান্ত্বনা প্রদান ছলে "কহিলেন হে বৎস! তুমি শুদ্ধ, তুমি নাম-হীন, অধুনা কল্পনা মাত্র সহায়েই তোমার নামকরণ হইয়াছে। তোমার এ দেহ পঞ্চভূতাত্মক, তুমি এ দেহের নহ আর দেহও তোমার নহে। তুমি কি কারণে ক্রন্দন করিতেছ? অথবা তুমি ক্রন্দন

করিতেছ, না, ঐ শব্দ তোমাকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ংই আবির্ভূত হইতেছে? নানা প্রকার ভৌতিক গুণ ও অগুণসকল ত্বদীয় ইন্দ্রিয়সমূহে বিকল্পিত হইয়াছে। দুর্ব্বল ভূতসমূহ যেমন ভূত সহায়ে অন্ন ও বারিদানাদি দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে তোমার সে প্রকার ক্ষয় বা বৃদ্ধি নাই। তোমার এ দেহ আচ্ছাদন মাত্র, ইহা শীর্ণ হইলে তুমি মোহে অভিভূত হইও না। শুভাশুভ কর্ম্মফলে তোমার শরীরে এ আচ্ছাদন নিবদ্ধ হইয়াছে। কি পিতা, কি পুত্র, কি মাতা, কি দয়িতা, কি আত্মীয় কি কি অনাত্মীয় কেহই কিছুই নহে। তুমি এ সকলকে বহু মাননা করিও না। যে সকল ব্যক্তি বিমূঢ়-চিত্ত তাহারাই দুঃখকে দুঃখোপশমের হেতু এবং ভোগসমূহকে সুখের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি অবিদ্যান্ধ ও সেইজন্য মোহাচ্ছন্নচিত্ত, তাহারা দুঃখকে সুখ বলিয়া মনে করে। রমণী হাস্য করিলে অস্থি দেখা যায়, তাহার উজ্জ্বল নেত্রদ্বয় মূর্ত্তিমান তর্জ্জন স্বরূপ, তাহার পীনোন্নত স্তনাদিও ঘন মাংসপিণ্ড মাত্র, সুতরাং রমণী কি সাক্ষাৎ নরকস্বরূপ নহে? ভূমিতে যান, যানে দেহ আর সেই দেহে অন্য পুরুষ নিবিষ্ট রহিয়াছেন। স্ব স্ব দেহে যেরূপ "আমার" এই জ্ঞান আছে সেই পুরুষে তাদৃশ জ্ঞান নাই; অহো! ইহা কি মূর্খতা!"

রাজমহিষী মদালসা পুত্র যেরূপ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল সেইরূপ তিনি পুত্রকে আত্ম-বোধ প্রদান করিতে লাগিলেন। ইহাতে পুত্রের জ্ঞানোদয় ও মমতা দূর হইল এবং সে গার্হস্থ্যধর্ম্মে স্পৃহাশূন্য হইল। কালক্রমে মদালসার গর্ভে রাজার দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ইহাদের সুবাহু ও শত্রুমর্দ্দন নাম যথাক্রমে রাখা হয়। ইহাদিগকেও রাজমহিষী পূর্ব্ববৎ আত্মজ্ঞান প্রদান করেন, ইহাতে তাঁহারা নিষ্কাম ও জ্ঞানময় হন। অবশেষে চতুর্থ পুত্র সমুৎপন্ন হইলে নরপতি নামকরণে সমুদ্যত হইলে মদালসা ঈষৎ হাস্য করিলেন। নরপতি ইহা দেখিয়া কহিলেন, "পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পর নামকরণে আমি সমুদ্যত হইলে তুমি হাস্য করিয়া থাক; ইহার কারণ কি? যদি আমার প্রদত্ত নাম তোমার পছন্দ না হইয়া থাকে এবার তুমি স্বয়ং চতুর্থ পুত্রের নামকরণ কর।" মদালসা রাজার আজ্ঞানুসারে কনিষ্ঠ পুত্রের নাম অলর্ক রাখিলেন। রাজা এই নাম শ্রবণ করিয়া হাস্য করেন এবং ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুত্তরে মদালসা বলেন "নামকরণ লোকাচার ও কল্পনা মাত্র—নাম রাখিতে হয় বলিয়া একটি নাম রাখিলাম। আপনি যে সকল নাম রাখিয়াছেন তাহারও কোন অর্থ নাই। আত্মা সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপি ও দেহের ঈশ্বর, তাঁহার গতি অসম্ভব। এই কারণে আমার বিবেচনায় "বিক্রান্ত" নামের কোন প্রকার অর্থ নাই। সেইরূপ আত্মা রূপহীন সুতরাং তাঁহার বাহু সম্ভবেনা, আত্মা সকল শরীরেই বিরাজমান সুতরাং তাঁহার শত্রুই বা কে আর মিত্রই বা কে সম্ভবিতে পারে? যদি লোকাচার হেতু এই প্রকার অর্থহীন নামের কল্পনা করা যায় তাহা হইলে "অলর্ক" আমি যে নামকরণ করিয়াছি তাহা কি প্রকারে অর্থহীন হইতে পারে?" রাজা সত্যভাষিণী দয়িতার সাধুবাক্য শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

রাণী অন্যান্য পুত্রগণকে যেরূপ আত্মজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন অলর্ককেও সেইরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা ইহাতে বাধা দিয়া তাঁহাকে কর্ম্মমার্গের বিষয় উপদেশ দিতে আদেশ প্রদান করেন। বরনারী মদালসা, পতির আজ্ঞানুসারে শিশু অলর্ককে এইরূপ উপদেশ দিলেন যাহার ফলে তিনি ভবিষ্যত জীবনে একজন কর্ম্মবীর ও প্রসিদ্ধনামা সর্ব্বগুণালঙ্কৃত নরপতি বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। বর্ত্তমানকালে মদালসার উপদেশ বিলাসনিমগ্না দেহাত্মবাদী অলসপ্রকৃতি পুরুষের পক্ষে অমৃতস্বরূপ, ইহা সেবনে দেশবাসী দুঃখহীন, কর্ম্মঠ ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া জগতে প্রাধান্য লাভ করুক।

মদালসার উপদেশ—

"হে পুত্র! তুমি সংবর্দ্ধিত হও। মিত্রগণের উপকারার্থ, শত্রুগণের বিনাশার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আমার পতির মন আনন্দিত কর। হে পুত্র! তুমি ধন্য; যেহেতু তুমি নিঃশত্রু হইয়া বহুকাল বসুমতী পালন করিবে। তোমার পালনগুণে সকলেই সুখী হউক। তাহা হইলে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে। প্রতি পর্ব্ব দিবসে ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি বিধান করিবে, বন্ধুগণের অভিলাষ পূর্ণ করিবে, হৃদয়ে পরহিত সাধন চিন্তা করিবে, পরদারার প্রতি মন নিবর্ত্তিত করিবে।"

'বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সুরগণের, অজস্র দানে বিপ্র ও আশ্রিতজনের সন্তোষ সম্পাদন করিবে। হে বীর! নানাপ্রকার অনুপম ভোগ্য দ্বারা রমণীকুলের এবং যুদ্ধ দ্বারা অরিকুলের সন্তোষ সাধন করিবে। তুমি শৈশবে বান্ধবকুলের, কৌমারে জনকজননীর, যৌবনে সৎকুল-ভূষণা নারীগণের, বার্দ্ধক্যে বলশালী হইয়া বনবরকুলের প্রীতি সাধন করিবে। হে পুত্র! তুমি রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সুহৃদগণের আনন্দ সম্পাদন করিবে, সাধুগণের রক্ষা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান এবং গো ও দ্বিজকুলের রক্ষার জন্য সমরে দুষ্টগণের ও অরাতিবর্গের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক পরলোকে প্রস্থান করিবে।"

"নরপতির প্রথমতঃ আপনাকে, তদানন্তর অমাত্যগণকে, তারপর পৌরবর্গকে বশীভূত করিয়া অবশেষে শত্রুগণকে জয় করিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিৎ। যিনি আত্মা প্রভৃতিকে জয় না করিয়া শত্রুগণকে জয় করিতে বাসনা করেন, সেই অজিতাত্মা মহীপতি অমাত্য কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া শত্রুগণের বশীভূত হইয়া থাকেন। হে পুত্র, এই হেতু প্রথমতঃ কামাদি রিপুগণকে জয় করিতে হইবে। তাহাদিগকে জয় করিতে পারিলে সর্ব্ব বিষয়ে জয়লাভ করিতে পারা যায়।"

"কামবশতঃ পাণ্ডু বিনষ্ট; ক্রোধ জন্য অনুহ্রাদ পুত্রধনে বঞ্চিত; লোভবশতঃ ঐল, মদবশে বেণরাজ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক নিহত; অনায়ুষাপুত্র বলি অভিমান জন্য, আর পুরঞ্জয় হর্ষবশেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। মহারাজ মরুত্ত ঐ সমস্ত রিপুকে পরাজয় করিয়া সমস্ত লোক জয় করিয়াছিলেন। নরপতি এই সকল বিষয় স্মরণ করিয়া দোষ সকল পরিত্যাগ করিবেন। নরপতি শত্রুর প্রতি কীটের ন্যায় আচরণ করিবেন; অর্থাৎ বাহ্যিক প্রকাশ না করিয়া কীট যেরূপ দ্রব্য নষ্ট করিয়া জর্জ্জরিত করে সেইরূপ করিতে হইবে। পিপীলিকার ন্যায় সঞ্চয়ী, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং শাল্মলী বীজের ন্যায় ব্যাপনশীল হওয়া রাজার কর্ত্তব্য। চন্দ্র সূর্য্য যেরূপ কখন তীক্ষ্ণ, কখন মৃদু কিরণ প্রদান করিয়া প্রত্যেক গৃহের বিষয় অবগত থাকেন, সেইরূপ নরপতিও হইবেন।"

"বন্ধকী, পদ্ম, শরভ, শুর্ব্বিনী স্তন ও গোপাঙ্গনার নিকট শিক্ষা শিক্ষা করিবেন। অর্থাৎ বন্ধকীর ন্যায় অপরের চিত্ত বিনোদন করিবেন, পদ্মের ন্যায় সকলের চিত্ত পরিতোষ করিবেন, শরভের ন্যায় বিক্রমশীল হইবেন, শূলিকীর ন্যায় শত্রুধ্বংসকারী হইবেন, এবং গর্ভিনীর স্তন যেরূপ ভাবী সন্তানের জন্য দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া রাখে সেইরূপ মহীপতিও ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ী হইতে যত্নবান হইবেন আর গোপাঙ্গনারা যেরূপ একমাত্র দুগ্ধ হইতে নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করে, সেইরূপ রাজাও কল্পনা পটু হইয়া নানা কর্ম্মের অবতারণা করিবেন। পৃথিবী পালন কার্য্যে নরপতি ইন্দ্র, সূর্য্য, যম, চন্দ্র ও বায়ু এই পঞ্চ দেবতার আচরণ অনুকরণ করিবেন। অর্থাৎ ইন্দ্র যেরূপ চার মাস বর্ষণ করিয়া পৃথিবীবাসীকে আপ্যায়িত করেন রাজাও সেইরূপ দান করিয়া সকলকে পরিতুষ্ট করিবেন। সূর্য্য যেরূপ আট মাস রশ্মি সহযোগে জল শোষণ করেন সেইরূপ নরপতিও সূক্ষ্ম উপায়ে শুল্কাদি সংগ্রহ করিবেন। যম যেরূপ কাল প্রাপ্ত হইলে প্রিয় অপ্রিয় সকলকে নিগৃহীত

করিয়া থাকেন সেইরূপ রাজাও প্রিয় অপ্রিয় দুষ্ট ও অদুষ্ট সকলের প্রতি সমদর্শী হইবেন। পূর্ণচন্দ্র দর্শনে যেরূপ সকলেরই আনন্দ লাভ হয়, সেইরূপ যে নরপতির শাসনে প্রজাবর্গ প্রীতিলাভ করে তিনিই যথার্থ শশিব্রতধারী। বায়ু যেরূপ গুপ্তভাবে সর্ব্বভূতে বিচরণ করিয়া থাকে সেইরূপ রাজাও চরদ্বারা পৌর-অমাত্য ও বান্ধবগণের চরিত্রাদি অবগত হইবেন। কাম লোভ কিম্বা অর্থের জন্য অথবা অন্য কোন কারণে যাহার মন আকৃষ্ট হয় না, হে বৎস, সেই মহীপতিই স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। উৎপথগামী অর্থাৎ উৎকোচ আদি গ্রহণকারী মূঢ়গণকে এবং স্বধর্ম্মভ্রষ্ট জনগণকে যে রাজা স্বধর্ম্মে আনয়ন করেন তিনিই স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন।"

"হে বৎস! যে রাজার রাজ্য বর্ণধর্ম্ম বা আশ্রমধর্ম্ম কোনরূপে অবসাদগ্রস্ত হয় না, তিনি ইহলোক ও পরলোকে শাশ্বত সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তির পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করা আর সকলকে স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপন করাই রাজার প্রধান কার্য্য এবং ইহাই তাঁহার সিদ্ধিলাভের কারণ। প্রজাগণকে সম্যক প্রকারে পালন করিলে, নরপতি কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন আর তাহাদের ধর্ম্মের অংশও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে নরপতি চতুর্ব্বর্গের রক্ষার জন্য এইরূপ নিয়মে অবস্থিতি করেন, তিনি ইহলোকে পরম সুখে বিহার করিয়া শেষে ইন্দ্রের সালোক্য লাভ করিয়া থাকেন।"

এইরূপ আশ্রম ও বর্ণধর্ম্ম বিষয়ক নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া তিনি বলিলেন, "গুরুজনের দুষ্কৃতি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহাদের প্রসন্নতা সম্পাদন বিধেয়। অন্য কেহ তাঁহাদের পরিবাদ করিলে তাহা শ্রবণ করিবে না। কাহারও মর্ম্মপীড়া দেওয়া উচিৎ নহে। লোকের প্রতি আক্রোশ প্রদর্শন ও পশুর ন্যায় আচরণ পরিত্যাগ করিবে। দম্ভ, অভিমান ও তীক্ষ্ণ ব্যবহার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।"

"মূঢ়, উন্মত্ত, বিপন্ন, বিরূপ, মায়াবী, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ এই সকল ব্যক্তিকে পরিহাস দ্বারা দুষিত করা উচিৎ নহে। উদ্ধত, উন্মত্ত; মূঢ়, অবিনয়ী, অসচ্চরিত্র, চৌর্য্যাদিদোষে দুষিত, অপরিমিতব্যয়ী, লুব্ধ, শঠ, বঞ্চকী, হীন, নীচাশয়, নিন্দিত, সর্ব্বদাশঙ্কী ও দৈবপরায়ণ এই সকল ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করা বিচক্ষণ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। সাধুগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করা উচিৎ। প্রজ্ঞাবান, শক্তিমান এবং যাহারা কার্য্যে উদ্যোগী এরূপ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা স্থাপন করিবে।"

"হে পুত্র! যে কার্য্য দ্বারা আত্মা জুগুপ্সিত না হয়, আর যাহা মহাজনের কাছে গোপনে নহে, নিঃশঙ্ক হইয়া এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে।"

"যে সকল ব্যক্তি পিতৃগণ, সৎশাস্ত্র, যজ্ঞ, মন্ত্র প্রভৃতির নিন্দা করে, হে পুত্র, তাহাদিগের সহিত আলাপ অথবা তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে অঙ্গুরীয় দিয়া সূর্য্য দর্শন করিলে শুদ্ধ হইবে।"

"পূর্ব্বপুরুষের নিন্দা শ্রবণ করিলে নিজের শক্তির উপর সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে, তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি পূর্ব্ব পুরুষের নিন্দা শ্রবণ করে সেই অধম পুরুষ দ্বারা এরূপ কোন নীচ কার্য্য নাই যাহা অনুষ্ঠিত হইতে না পারে। কাহাকেও মানবধর্ম্ম হইতে চ্যুত করিতে হইলে তাহার শাস্ত্রের অপকর্ষতা প্রভৃতি হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে পারিলেই তারপর অনায়াসে তাহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতে পারা যায়। ধর্ম্মপ্রচারকেরা একথা ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা শাস্ত্রনিন্দক বিধর্ম্মীকে সংহার করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন। কোমল প্রকৃতির বালক বালিকাকে রক্ষার জন্য ও বিশেষরূপে দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ।" সুরক্ষণীয় বালক বালিকারা সুরক্ষিত না হওয়াতে দেশের ভিতর নানাপ্রকার কদাচার প্রবল বেগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

স্নেহময়ী জননী, পুত্রকে অবসাদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, তনয়ের কাম ভোগ নিবৃত্তি করিবার

অভিলাষে শেষ উপদেশ এইরূপ ভাবে প্রদান করিতে লাগিলেন—

"হে পুত্র! গৃহস্থগণ সর্ব্বদাই মমতাপরায়ণ, সুতরাং সহজেই দুঃখের আস্পদ স্বরূপ। এই জন্যই কহিতেছি যে গৃহধর্ম্মাবলম্বী হইয়া রাজ্য শাসন করিতে করিতে যে সময় তোমার প্রিয় বন্ধুবিয়োগ-জনিত অথবা অর্থক্ষয় জনিত দুঃসহ দুঃখ সমুপস্থিত হইবে সে সময় আমার এই প্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক হইতে পত্র বাহির করিয়া তাহার মধ্যস্থ ক্ষুদ্রাক্ষরে লিখিত শাসন পাঠ করিবে।" এই বলিয়া মদালসা সুবর্ণ অঙ্গুরী প্রদান করিয়া পুত্রের প্রতি গৃহস্থের উপযুক্ত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করেন। তারপর কুবলায়শ্ব পুত্রকে রাজ্য প্রদান করিয়া দেবী মদালসার সহিত বনমধ্যে তপস্যার জন্য প্রস্থান করেন।

মহারাজ অলর্ক ন্যায়ানুসারে বহুকাল রাজ্য পরিচালন করার পর তাঁহার ভোগ কামনা দূর হইল না। অলর্কের সুবাহু নামে এক বৈরাগ্যযুক্ত বনবাসী ভ্রাতা ছিলেন। তিনি বিষয়নিমগ্ন ভ্রাতা, তত্ত্বজ্ঞান যাহাতে প্রাপ্ত হন সে বিষয় বহু চিন্তা করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত কাশীরাজের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যলাভের জন্য দূত প্রেরণ করেন। ক্ষত্রধর্ম্মবিৎ অলর্ক কাশীরাজের দূতকে প্রত্যুত্তরে কহিয়া পাঠাইলেন "আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার কাছে আসিয়া প্রণয় সহকারে রাজ্য প্রার্থনা করুন, আক্রমণ ভয়ে অল্প পরিমাণে ভূমিও প্রদান করিব না।" মতিমান বীর্য্যধন সুবাহু ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ প্রার্থনা না করিয়া কাশীরাজ সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া ভ্রাতার দুর্গ-পালক ভৃত্যাদিকে বশীভূত করিয়া আক্রমণান্তে ভ্রাতাকে বিপন্ন করিলেন। অলর্ক দিন দিন ক্ষীণকোষ, হীনবল, বিষাদগ্রস্ত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। জননী মদালসা যে অঙ্গুরীয়ের কথা কহিয়াছিলেন তখন তাহা তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল।

অঙ্গুরী মধ্যে নিবদ্ধ শাসনপত্র বাহির করিয়া পাঠ করিবামাত্র তাঁহার শরীর পুলকে প্রপুরিত ও নেত্রদ্বয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। শাসনে লিখিত ছিল যে "সর্ব্বান্তঃকরণে সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যদি সঙ্গ ত্যাগে সমর্থ না হও, তাহা হইলে সেই সঙ্গ সাধুগণের সহিত করাই কর্ত্তব্য, কারণ সাধুসঙ্গ পরম ঔষধ। সর্ব্বান্তঃকরণে কাম পরিত্যাগ করিবে, যদি উহা পরিত্যাগ করিতে অক্ষম হও তাহা হইলে মুক্তিরই কামনা করিবে, কেননা উহাই তাহার ঔষধ।"

অলর্ক জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজ্য প্রদান করিয়া আত্মজ্ঞানের জন্য অরণ্যে গমন করিয়া অনতি-কালের মধ্যে আত্মসাক্ষাৎ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন।

সে কালের জননী স্তন্যদানের সহিত পুত্রকে ইহলৌকিক পারলৌকিক উভয় প্রকার জ্ঞানে প্রজ্ঞাবান্ করিতেন। দুঃখপ্রদ বিষয়ানন্দ ভোগের পর যাহাতে পুত্র আত্মজ্ঞানরূপ পরমানন্দ লাভে সমর্থ হয় সে বিষয়ে মাতাদের হীন দৃষ্টি ছিল না। সকল প্রকার সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল—"অন্য হইতে যাহাতে ভীতির সঞ্চার না হয়", পুত্র যাহাতে এই অত্যুৎকৃষ্ট সিদ্ধি লাভে সমর্থ হয় হিতকারিণী মাতা সে বিষয় বিশেষরূপে দৃষ্টি প্রদান করিতেন। পুত্র যাহাতে বীরের ন্যায়, অনাত্মজ্ঞান এবং আত্মজ্ঞান উভয় জ্ঞানই লাভ করিতে সমর্থ হয় তাহার জন্য বিশেষরূপে সচেষ্ট থাকিতেন।

আবার বর্ত্তমান কালের জননীরা সন্তানগণকে অভয় প্রদান করুন, ভীতিবিহীন করুন, মুক্তি করতলগত হইবে। মুক্তির আর অন্য উপায় নাই। ভয়বিমূঢ়চেতা অধম প্রকৃতির মনুষ্যেরা সমাজের বা দেশের মলস্বরূপ, জননীরা পুত্রের এ মল দূর করিতে প্রবৃত্ত না হইলে দেশ পবিত্র হইবে না।

বাঁকুড়া জেলা সম্মিলনীর সভানেত্রীর অভিভাষণ

[১৯২৪]

(পরিশিষ্ট)

শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার।

অভিভাষণ লিখার পর দুইটী গুরুতর বিষয় আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এই দুইটী বিষয়ের এখানে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করিয়া আপনাদিগকে আবার বিরক্ত করিতে বাধ্য হইলাম। একটী বাংলার নারীনির্য্যাতন, দ্বিতীয়টী কংগ্রেসে সর্ব্বমতাবলম্বী কর্ম্মিদলের মিলন-পন্থা নির্ণয়ে মহাত্মা ও ডাঃ বিবি বেশান্তের বর্ণনা।

নারী নির্য্যাতন—

মালদহবাসীদের বিশেষ অনুরোধে নারীনির্য্যাতন ব্যাপারে মালদহ যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন মনে করিতেছি। বাংলার সর্ব্বত্রই নারী-হরণ ব্যাপার চলিতেছে। বর্ত্তমানে ইহা একটু গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। এই উপলক্ষে বাংলায় হিন্দু মুসলমানের ভিতরে বিশেষ উপদ্রবের আশঙ্কাও দেখা দিতেছে। ইহা সত্য যে মুসলমানধর্ম্মে, ব্যবস্থায় বা গ্রন্থে কোথাও নারী-হরণের ব্যবস্থা নাই। নারী-হরণ ব্যাপারটা সর্ব্বত্রই হিন্দু হউক বা মুসলমান হউক, অসচ্চরিত্র লোকেদের দ্বারাই হইয়া থাকে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের নেতা ও সচ্চরিত্র লোকদের একান্ত কর্ত্তব্য ইহাকে বিশেষ ভাবে দমন করা। কিন্তু আজ দেখা যায় হিন্দুনারী-হরণকারী মুসলমানকে মুসলমানসমাজ দমনের চেষ্টা করেন না, বরঞ্চ কেহ কেহ আনন্দ প্রকাশ করেন। এমন কি কোন কোন স্থানে নারী-হরণকারী গুণ্ডাকে প্রকাশ্যে মিছিল করিয়া অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। মুসলমানসমাজ তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ বা চেষ্টা করেন নাই। ইহাতে আমি মনে করি মুসলমানগণ হিন্দুসমাজের অনিষ্ট অপেক্ষা নিজ সমাজের সর্ব্বনাশই বেশী করিতেছেন।

মুসলমানসমাজ যাহাই করুন না, আমি মনে করি হিন্দুসমাজই এই জন্য বিশেষভাবে দায়ী। সমাজে পাপ, পাপী, অসচ্চরিত্র, গুণ্ডা, চিরদিনই থাকিবে। গৃহস্থ সর্ব্বদা তাঁর নিজ ঘর নিজেই রক্ষা করিবেন। যেস্থানে নির্দ্দোষী, নিরীহ হিন্দুরমণীকে গুণ্ডাগণ বলপূর্ব্বক হরণ করে সে স্থলে হিন্দুগণকে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে। আমি যতদূর জানি এই সঙ্ঘ-গঠন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে মুসলমান সমাজেরও অনেক লোক হিন্দুদের সহিত যোগদান করিতে প্রস্তুত হইবেন।

কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা যায় এই নির্য্যাতিত নারীদের মধ্যে অধিকাংশই বিধবা এবং হিন্দু সমাজে বিধবাদের অসহায় অবস্থাও ইহার একটা বিশেষ কারণ। হিন্দু সমাজ বিধবাদের ব্রহ্মচর্য্যের ভিতর দিয়া আদর্শ নারীরূপে গঠন করিয়া দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সমাজ আজ তাঁহাদিগকে বিশেষ তুচ্ছ তাচ্ছীল্যের সহিত দেখিতেছেন এবং তাঁহাদের বাড়ীতে রাখিয়া তাঁহার পিতামাতা, ভ্রাতা, ভগিনী ও আত্মীয় পরিজন সর্ব্বদা ভোগ ও বিলাসে জীবনযাপন করেন, তাঁদের সম্মুখে বিলাসের আদর্শই দেখাইয়া থাকেন। পরে যখন এই বিলাসের মধ্যে বাস করিয়া কেহও

একটু পথভ্রষ্ট হন তখনই তাঁহাকে কোন প্রকার সংশোধনের ব্যবস্থা না করিয়া কেবল নির্য্যাতন করেন এবং ৺কাশীধাম, শ্রীবৃন্দাবনধাম ও নবদ্বীপধাম প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মের নামে নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিয়া যথেচ্ছভাবে চলিতে দেওয়া হয়। অতএব আমি মনে করি সমাজের এই উদাসীন ভাবই এই নারী-হরণের জন্ত বিশেষভাবে দায়ী এবং যতদিন সমাজ ব্রহ্মচর্য্যের ভিতর দিয়া নারীশিক্ষার ও বৈধব্যজীবন যাপনের ব্যবস্থা না করিবেন ততদিন এই পাপের উপশম হইবে না।

মহাত্মা ও বিপ্লবপন্থী—

সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মিলন চেষ্টায় মহাত্মা ও ডাঃ বিবি বেশান্ত যে বর্ণনাপত্র বাহির করিয়াছেন তাহা আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয় মনে হইতেছে। মহাত্মা পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন নিরুপদ্রবতা ব্যতীত অসহযোগও পাপ, এবং তাঁহার কার্য্যের ভাবে দেখা যায় এই উপদ্রবের আশঙ্কাই তাঁহাকে বিশেষ চিন্তিত ও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে।

মহাত্মার সহিত আলাপের পর ডাঃ বিবি বেশান্ত এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, যে দুইটী কারণে (অসহযোগ ও আইন অমান্ত) তাঁহারা কংগ্রেস ছাড়িয়াছিলেন, মহাত্মা যখন সেই দুইটি আপাততঃ স্থগিত রাখিতেছেন তখন অন্যান্ত সর্ত্ত স্বীকারে তাঁহারা কংগ্রেসে যোগ দিবেন। মহাত্মাও বলিতেছেন যত কম সর্ত্তে সকলে একত্র হইতে পারে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ অসহযোগ ও আইন অমান্ত আপাততঃ বন্ধ রাখিতে হইবে।

মহাত্মার এই ঘোষণা আজ বাঙ্গালীর গবেষণার পূর্ব্ব ও পরের অবস্থা আমার মনে করিয়া দিতেছে। আমি সমস্ত ভারতের কথা ভাবিতে পারিনা কিন্তু আজ বাংলার ভাবনা আমাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। বার্দ্দলীর সিদ্ধান্ত দেশে যে নীরবতা আনিয়াছিল তাহা আড়াই বৎসর পর স্বরাজ্যদলের কর্ম্ম ও পুনঃ পুনঃ জয়লাভ অনেকটা উপশম করিতে সক্ষম হইয়াছে; দেশে আবার উৎসাহ আনয়ন করিয়াছে। বাংলা আজ পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। এ সময় যদি পুনরায় অগ্রগমন-কার্য্য বন্ধ হয় তবে আবার নিদ্রা আসিবে। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীজাতি আবার ভাবের ঘোরে ঢলিয়া পড়িবে। অতএব অগ্রগমন কর্ম্ম বন্ধ করা কিছুতেই সঙ্গত হইবে না। পূর্ণ উদ্যমে অগ্রসর হইতে হইবে। কংগ্রেসে থাকিয়াও এই কার্য্য করা যাইবে। মহাত্মা বলিতেছেন কংগ্রেস তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পন্থা মতে চলিবে। এতদ্ব্যতীত যাঁহার যাহা করিতে হয় তাহা কংগ্রেসের বাহিরে করিতে হইবে।

আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কংগ্রেস ও দেশকে কোনদিন ভিন্ন করিয়া ভাবিতে পারি নাই, এবং এখনও বুঝি না। তথাপি আমি ইহা বেশ বুঝি আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র দেশ ও দেশবাসীর মনোমন্দির। অতএব যদি কোন নিদ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করিলে কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়াও ভিন্নভাবে দেশের কাজ করা যায় তখন আমাদের তাহাতে সম্পূর্ণভাবে যোগদান করা উচিত। এবং সেজন্য যত পরিমাণ সূতা কাটা বা আর যে যে কাজ করা দরকার তাহা করা উচিত।

মহাত্মার ভাবে দেখা যায় তাঁহার মনে ও কর্ম্ম-পদ্ধতিতে সকলের স্থান আছে। কেবল কানাইলাল, সত্যেন্দ্র, যতীন্দ্র মুখার্জ্জী, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী ও গোপীনাথ প্রভৃতির সাধনার পথাবলম্বী সেবকদলের কোন স্থান নাই; সেজন্য তিনি বর্ত্তমান অবস্থায় অসহযোগকেও পাপ মনে করিতেছেন। কিন্তু ঐ প্রাতঃস্মরণীয় ত্যাগীগণের আত্মত্যাগের অনুসরণকারী পথিকগণকে ২০ বৎসরের সাধক বাঙ্গালী ভুলিতে পারিবে কি? আজ নব বাংলা ও নবীন বাঙ্গালী জাতি কি ভাবিবে জানি না, কিন্তু আমি বঙ্গমহিলা, বাঙ্গালী কানাইলাল, সত্যেন্দ্র, যতীন্দ্র, প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামের ভগিনী স্থানে,

গোপীনাথ ও তারিণী মজুমদারের মাতৃস্থানে দাঁড়াইয়া, তাদের আত্মোৎসর্গের পথকে পাপের পথ বলিয়া ভাবিতে পারিতেছি না। অতএব বিপ্লবপন্থিগণ, তোমাদের বর্ত্তমান কর্ম্মপন্থা বিশেষ চিন্তার সহিত নির্দ্দেশ করিতে হইবে। মহাত্মার নির্দ্দিষ্ট পথ বেলগাঁও কংগ্রেস গ্রহণ করিলে অবশ্য তোমরা প্রতিজ্ঞামুক্ত হইবে, কারণ কংগ্রেসের এই কার্য্য সম্পূর্ণ প্রমাণ করিবে যে ১৯২০ সালের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি আপাততঃ পরিহার করা হইল। কাজেই তৎপর বিপ্লবপন্থীরা প্রতিজ্ঞামুক্ত, কিন্তু তথাপি আমার মনে হয় ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত কোন উপদ্রবের পথ অনুসরণ করা সঙ্গত হইবে না। কোনও দলে মিশিয়া কার্য্য করা সঙ্গত হইবে। স্বরাজ্যদলের সঙ্গেই তোমাদের কার্য্যভাব অনেকটা মিলিবে।

স্বরাজ্যদল ও বিপ্লবপন্থীদল—

স্বরাজ্যদলের সংঘর্ষ ও সংগঠন বিপ্লবপন্থীদলের সংঘর্ষ ও সংগঠনের মধ্যে প্রভেদ আছে। স্বরাজ্য-দলের লক্ষ্য—ক্রমে ক্রমে জাতিকে গড়িয়া তোলা এবং তাহা করিতে হইলে প্রতিপক্ষ শক্তি যাহাতে গঠন কার্য্যে ব্যাঘাত না জন্মাইতে পারে তজ্জন্য সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া তাহাদের বিব্রত রাখিয়া তাহার পশ্চাতে থাকিয়া সমাজ ও জাতি গড়িয়া তোলা। জাতি যত গড়িয়া উঠিয়া শক্তিশালী হইবে প্রতিদ্বন্দীশক্তি ততই হীনবল হইতে থাকিবে। ক্রমে জাতি পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিলে প্রতিদ্বন্দীশক্তির আর স্থান থাকিবে না। তখন ভারত এক নূতন ভাব সৃষ্টি করিয়া বিশ্বমানবতার সঙ্গে স্থান লইবে। এমন কি তাহার গুরুর স্থান অধিকার করার আকাঙ্খাও রাখে। তৎ উদ্দেশ্যে শান্তিময় পথ ও শান্তির আবহাওয়া বজায় রাখা তাদের বিশেষ দরকার।

বিপ্লবপন্থীদের উদ্দেশ্য—বিদেশীর হাত হইতে দেশকে উদ্ধার করা পর্য্যন্ত। অতএব তাদের সংগঠন সংঘর্ষের জন্য। সংঘর্ষের দ্বারা নিজ শক্তির বৃদ্ধি করিয়া প্রতিপক্ষকে পরাজয় করিয়া দেশকে স্বাধীন করা পর্য্যন্ত তাদের কর্ম্ম। তারপর ভবিষ্যতে কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে মিশাইয়া দেশ তাহার নিজ ভবিষ্যত গড়িয়া তুলিবে। তাহা কি আকার ধারণ করিবে বা স্থান কোথায় হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিবে ভবিষ্যত এবং কাল। অতএব বিপ্লবপন্থীদের আপাততঃ স্বরাজ্যদলের সঙ্গে মিশিয়া কার্য্য করিতে কোন বাধা নাই।

বাংলার ভবিষ্যত—

সমগ্র ভারতের সঙ্গে মিশিয়া যদিও বাংলার কার্য্যপদ্ধতি বিশেষ জটিল হইয়া উঠিতেছে, তথাপি বাঙ্গালী, আজ তোমাকে নিজের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া লইতে হইবে। এই নবযুগের অগ্রগামী জাতি তোমাদিগকে আজ নানাভাবে উৎপীড়ন ও অত্যাচারের ভিতর দিয়া, নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া "মা" অগ্রগমনে নিযুক্ত করিয়াছেন, তোমরা পশ্চাৎপদ হইওনা, নিরাশ হইও না। ধৃতি অবলম্বন করিয়া কর্ম্মপথে অগ্রসর হও। কর্ম্মই কর্ম্মের পথ পরিষ্কার করিয়া লইবে।

কর্ম্ম! কর্ম্ম!! কর্ম্ম!!! কর্ম্মই পন্থা, কর্ম্মই সাধনা, এবং কর্ম্মই সিদ্ধি।

কর্ম্মই বর্ত্তমান ভারতের যুগধর্ম্ম।

বন্দেমাতরম্।

জেলের মেয়ে

(গল্প)

শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী।

নীরব নিস্তব্ধ প্রকৃতি। যামিনী গভীরা। উপরে দিগন্তবিস্তৃত নীলাকাশে পুঞ্জীভূত মেঘ ক্রমশঃ তাহার ধূমায়মান পক্ষ বিস্তার করিয়া ধরণী-বক্ষ আবৃত করিতেছে। পৃথিবীকে যেন বিরাট আঁধার গ্রাস করিতে বসিয়াছে। সেই আঁধারের বুকে আলেয়ার মত এক একবার বিজলীবালা নিজের তীব্র রূপের ঝিলিক্ হানিতেছে। কড়্—কড়্—কড়্, ঐ গুরুগম্ভীর গর্জনে মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল; তাহার সহিত প্রবল বাতাস স্বনিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অবিরল ধারায় করকাধারী ধরার মুখে চোখে, প্রাসাদে কুটীরে, সাগর বক্ষে সশব্দে আসিয়া পড়িতে লাগিল। জল, ঝড়, ঝঞ্ঝাবাত প্রবল বেগে নর্ত্তনশীল হইয়া প্রকৃতির রাজ্যে বিষম অরাজকতা ঘটাইল। এ হেন দুর্য্যোগে সকল প্রাসাদই রুদ্ধ। আবাল বৃদ্ধ যুবা আজ সভয়ে যাহার যাঁহার আশ্রয়ের অভয় ক্রোড়ে লুকাইয়াছে। শুধু—শুধু ঐ সাগরতটে একখানি কুটীরে একটি আলোর ক্ষীণ রেখা ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বিলয় হইতেছে। মৃৎকুটীরের অভ্যন্তরে একটি চিন্তাশীলা নারী গম্ভীর বদনে একবার নত নেত্রে কভু বা উদাস চোখে কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। মাঝে মাঝে বজ্রনিনাদে সে চমকিয়া উঠিতেছে। এমন সময় গগন-পবন ভেদ করিয়া, সাগরবক্ষ কম্পিত করিয়া, সাগর-ঊর্ম্মিরাজির উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে একটু করুণ কান্নার রোল কুটীর মধ্যে আসিয়া ধ্বনিত হইল। রমণী একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিয়া দাড়াইল। কর্ত্তব্যের কঠোরতা তাহার বদনে প্রতিফলিত হইল। তারপর ত্বরিতপদে একটি আলোকাধার হস্তে লইয়া, সেই নারী রোদনধ্বনির অনুসরণ করতঃ সমুদ্রাভিমুখে চলিল। বাহিরে তখন আকাশবাতাস, বৃক্ষলতা, পর্ব্বতশৃঙ্গ প্রভৃতি স্ব স্ব অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া উন্মত্তবৎ যেন যুদ্ধ করিতেছে। আজ সমস্ত বিশ্বে বুঝিবা প্রলয় উপস্থিত!

উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঐযে ভীমরবে সাগর-তরঙ্গ গর্জ্জিয়া উঠিতেছে! ভীমা প্রকৃতি রণরঙ্গিনী সংহারিণী চামুণ্ডার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই গভীর দুর্য্যোগময়ী রজনীর মধ্যভাগে, বিশ্বপ্রকৃতির মহাবিপর্য্যয়ের মাঝখানে, মূর্ত্তিমান করাল দৈত্যের ভ্রূকুটির মত ক্রুদ্ধ সমুদ্রের গর্জ্জনশীল বক্ষে সেই ধীবর-রমণী ছোট্ট একখানি জেলেডিঙ্গি বাহিয়া, মত্ত তরঙ্গের উদ্দাম গতিকে ব্যাহত করিয়া, কান্নার প্রতিধ্বনির অতি সূক্ষ্ম রেশ্‌টুকু ধরিয়া ওই চলিয়াছে। দূর—দূর—বহুদূর তরণী চলিয়াছে, প্রবল বাতাস অট্টহাস্য করিয়া তরণী দোলাইয়া দিতেছে, বৃহৎ তরঙ্গ ভৈরবনাদে হুঙ্কার ছাড়িয়া তাহার বিশাল বক্ষ ফুলাইয়া ক্ষুদ্র জেলেডিঙ্গিখানিকে বুকের মাঝখানে লইয়া চলিয়াছে। অনাবৃত মস্তকোপরি অগ্নিউদ্গারকারী ভীষণ বজ্রনির্ঘোষ, চপলার চকিত শিহরণ! ওই তুষারশৃঙ্গ ধ্বসিয়া পড়িয়া বৃহৎ অর্ণবপোতকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে! প্রকাণ্ড বিটপীসমূহ রেণু রেণু হইয়া উড়িয়া যাইতেছে! আর, ওই তরণী বাহিয়া ওগো সুদূর পথের যাত্রী, কতদূর চলিবে? এই বিভীষিকাময়ী কালরাত্রির রাক্ষসী ক্ষুধার আকর্ষণে আকর্ষিত কত শত হতভাগ্যের মর্ম্মভেদী কান্নার করুণ নিনাদে, তোমার দুরন্ত সাগরগামী স্বামীর কণ্ঠস্বর অনুমানে, কতক্ষণ এই বিরাট সমুদ্রের বক্ষকোষ অন্বেষণ করিয়া ফিরিবে?

না, সে-ত শুধু একা ফিরিতে পারে না, তা কিছুতেই হয় না। তাহার স্বামীর অনুসন্ধান করিবেই সে। তাহার স্বামীর কান্নার স্বর তাহাকে যে এখানে টানিয়া আনিয়াছে। সে কি করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইবে? না, তাহা হইতেই পারে না। পড়ুক চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হইয়া, সারা বিশ্ব ধূলিকণা হইয়া অনন্তের সঙ্গে মিশাইয়া যাক্, শত শত বজ্রের প্রচণ্ড অগ্নিশিখায় সাগরবক্ষ ঝলসিয়া উঠুক, তথাপিও সে প্রত্যাবৃত্ত হইবে না। আজ কেন, বুঝি যুগযুগান্ত ধরিয়া ব্যাকুল হিয়ার আকুল আবেগ বক্ষে লইয়া, রাত্রির পর রাত্রি দিনের পর দিন সে অন্বেষণ করিবে! যুগের পর যুগ বারিধির বিপুল বক্ষে ছুটিয়া বেড়াইবে! ঐ—ঐ চলিয়াছে সে।

বহুদূর যাইবার পর একখানা বড় জাহাজ তাহার নয়নপথের পথিক হইল। ধীবর-রমণী তাহার তরী জাহাজের কাছে লইয়া গেল, এবং চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তাহারা কি একখানা জেলে ডিঙ্গি সম্মুখ দিকে যাইতে দেখিয়াছে? জাহাজের কাপ্তেন উচ্চৈঃস্বরে জাহাজের উপর হইতে বলিল "হ্যাগো বাছা, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ওদিকে একখানা জেলেডিঙ্গিকে যাইতে দেখিয়াছি বটে, তবে ফিরিয়াছে কিনা জানিনা। উঃ যে দুর্য্যোগ তাহাতে না ফেরাই সম্ভব।" জাহাজ অতিক্রম করিয়া ক্ষুদ্র তরণী তরঙ্গের উপর উঠানামা করিতে করিতে চলিল। কিছুদূরে আসিয়া সে দেখিল একটা ছোট ডিঙ্গি জলে ভাসিতেছে। সে সেই-খানের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার স্বামীর দেহ অন্বেষণ করিতে লাগিল। এই পাইয়াছে—না, কই কিছু না—হাঁ এইবার পাইয়াছে, সত্যই এইবার পাইয়াছে—এই একটা কঠোর হিম-শীতল মনুষ্য-শরীর তাহার হাতে ঠেকিল! রমণী বিপুল বলে দুই বাহুর দ্বারা সন্তরণক্লিষ্ট, মরণোন্মুখ মানব-শরীরকে ডিঙ্গিতে উঠাইয়া শোয়াইয়া দিল। তাহার পর জলে ডোবা ব্যক্তির যে সকল প্রক্রিয়াতে জীবনীশক্তি প্রকাশ পায় সেই সকল প্রক্রিয়া করিতে লাগিল।

এদিকে নিশা অবসান হইয়া আসিতেছিল। প্রভাতের স্নিগ্ধ সূর্য্যরশ্মি সাগরের বুকে, পৃথিবীর গায়ে ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িতেছিল। চারিদিকে রাত্রির প্রলয় ঝঞ্ঝার প্রকোপ কমিয়া গিয়াছে। জল থামিয়াছে, ঝড় তিরোহিত হইয়াছে। তরঙ্গের বিপুল গর্জ্জন, বায়ুর আস্ফালন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব গগনে ধীরে ধীরে তরুণ তপন উদিত হইতেছেন। ঊষারাণীর সহাস অঞ্চলখানি আলো ঝলমল হইয়া উঠিতেছিল। প্রভাতের প্রথম আলোক সম্পাতে ধীবর-রমণী সচকিতে দেখিল, একে! এতো তাহার স্বামী নয়! তাহার স্বামী তবে কোথায়! বেদনায় সে ম্লান হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া সে বেশ করিয়া লোকটিকে দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত হইয়া গেল। এই ব্যক্তি তাহার স্বামী নয় বটে কিন্তু এযে এক প্রতিবেশী ধীবর-রমণীর স্বামী। তাহার স্বামীকে সে রক্ষা করিতে পারিল না সত্য কিন্তু আর একজন রমণীর স্বামীকে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া তাহাকে বাঁচাইতে পারিল, ইহাতে সে নিজেকে ধন্য মনে করিতে লাগিল। অতঃপর সে উক্ত প্রতিবেশিনীর নিকট গিয়া বলিল, "ভগ্নি, দেখিবে এস তোমার স্বামীকে আমি সাগরতল হইতে উঠাইয়া, বাঁচাইয়া লইয়া আসিয়াছি, এই লও তোমার স্বামী।" রমণী সহানুভূতিসূচক কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করিল, "তোমার স্বামী কোথায়?" সে ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল "সিন্ধুবক্ষে সলিল সমাধিতে।" তারপর স্নিগ্ধ স্বরে বলিতে লাগিল, "ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহ তাই তোমার স্বামীকে আসন্ন মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম।"

পরোপকাররূপ মহৎ ধর্ম্মের গৌরবময় প্রেরণাই কি তাহার জীবনে সান্ত্বনা দিল? হাঁ কতকটা তাই বটে, তবে এটা বোধহয় "আমি"কে বিলিয়ে দিয়ে "তুমি"র সুখে সুখী হওয়া রূপ উচ্চ ভাবোন্মেষ বা মানবের ইহলোকেই দেবত্ব লাভ।

মহারাণী

অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

"মহারাণী" বলিলে বিহারে, হাতুয়ার মহারাণী মহোদয়াকেই বুঝায়। এরূপ পবিত্রচেতা, স্বধর্মনিষ্ঠা, পরোপকারিণী, দানশীলা, সাধ্বীরমণী বিহারে কেন, অন্যত্রও বিরল। তাই "মহারাণী" বলিতে ও বুঝাইতে তাঁহাকেই বুঝায়।

হাতুয়ার পরলোকগত, মহারাজা স্যার কৃষ্ণপ্রতাপ সাহী যখন ১৮৯৬ সালের ২০শে অক্টোবর তারিখে স্বর্গারোহণ করেন, তখন মহারাণীর বয়স কমই ছিল। চারিবৎসর বয়স্ক পুত্র ও একবৎসর বয়সের কন্যা লইয়া মহারাণী নিদারুণ বৈধব্যসাগরে নিমগ্ন হন। এই সুদীর্ঘ অষ্টবিংশ বৎসর তিনি কঠোর ব্রতধারিণী সন্ন্যাসিনীর ন্যায় কালাতিপাত করিতেছেন।

স্বামীশোকবিধুরা সতীর সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ছিল পুত্রকে সুশিক্ষিত করা। এ কর্ত্তব্য তিনি যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ফলে মহারাজা গুরুমহাদেবাশ্রমপ্রসাদ সাহীর ন্যায় উপযুক্ত, কৃতবিদ্য, উদার জমিদার খুবই কম দৃষ্ট হয়। এই বয়সের মধ্যেই তিনি দুই দুইবার কাউনসিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া তথাকার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। মহারাজা এই বয়সেই যে কৃতকার্য্যতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার একমাত্র কারণ মহারাণীর সুশিক্ষা ও দীক্ষা। মাতা বুদ্ধিমতী, দয়াবতী, সুশিক্ষিতা হইলে যে পুত্রও সর্ব্বগুণাধার হইয়া থাকেন, এক্ষেত্রে তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহারাণীর জমিদারীর আয় প্রায় বিশলক্ষ টাকা। কিন্তু, তিনি যেরূপ সহজ ও নিরাড়ম্বরভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহা অবগত হইলে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। তিনি দিনান্তে স্বহস্তে পাক করিয়া অতি সামান্য আহার গ্রহণ করেন। অতি সাদাসিদে ভাবে থাকেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি পূজার্চ্চনায় অতিবাহিত করেন। এবং অনেক সময় তীর্থক্ষেত্রে অতিবাহিত করেন।

অথচ, মহারাণী তাঁহার বিস্তৃত জমিদারীর প্রত্যেক বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করেন। জমীদারী সংক্রান্ত কোন বিষয়ই তাঁহাকে না জানাইয়া নির্ব্বাহ হয় না। সকল বিষয়ই তিনি নখদর্পণে রাখিয়াছেন। ইহাতেই তাঁহার কার্য্য-দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। অদ্ভুত পরিচালনাশক্তি বলে বিস্তৃত জমিদারী তিনি অতি সুশাসনে রাখিয়াছেন।

মহারাণী অপ্রকাশ্যে যে দান করেন তাহার তালিকা নাই। পীড়িত, আর্ত্ত, ব্যথিত—কেহই তাঁহার নিকটে নিরাশ হয় না। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মকার্য্যে, বিবাহাদি পুণ্যকর্ম্মে তিনি সদাই মুক্ত-হস্ত।

জনহিতকর কার্য্যে মহারাণী যে কত অর্থদান করিয়াছেন তাহার তালিকা করা আদৌ সম্ভবপর নহে। তবে নিম্নোক্ত দানগুলি অবশ্যই উল্লিখিত হইতে পারে—

দুর্ভিক্ষ নিরাকরণ কল্পে—এক লক্ষ

ভিক্টোরিয়া মেমোরিল——এক লক্ষ

লেডি ডফ্‌রীণ হাসপাতালে——পঞ্চাশ সহস্র

দেশীয় ধাত্রীদের শিক্ষার্থ——পঞ্চাশ সহস্র

রাঁচি কলেজে হিন্দুছাত্রদের বোর্ডিংয়ের জন্য—পঞ্চাশ সহস্র

আর্ত্ত সৈনিকদের পরিবারদের সাহায্য——চল্লিশ সহস্র

ছাপরায় স্ত্রীলোকদের দাতব্য চিকিৎসালয়——
ত্রিশ সহস্র

বৃত্তির জন্য——ত্রিশ সহস্র

মজফরপুরে স্ত্রীলোকদের দাতব্য চিকিৎসালয়—
পঞ্চদশ সহস্র

পাটনায় দাতব্য চিকিৎসালয়—— দশ সহস্র

এইসকল দানের জন্য ১৯০০ সালের জুন মাসে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে 'কৈসরী হিন্দ' সুবর্ণ পদক প্রদান করেন। বলা উচিত এই পুরস্কার সেই বৎসরেই প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। এই পদক দিবার সময় বঙ্গের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর হাতুয়ায় যে দরবার করেন তাহাতে নিম্নোক্ত মর্ম্মে বক্তৃতা প্রদান করেন।

"মহারাণী মহোদয়াকে এই পুরস্কার প্রদানার্থ এই দরবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মহারাণীর দানের জন্য তাঁহাকে এই সম্মানের উপযুক্ত মনে করা হইয়াছে। ১৮৯৮ সালে তিনি দুর্ভিক্ষ নিবারণ কল্পে লক্ষ টাকা প্রদান করেন। লর্ডকার্জ্জন অনুষ্ঠিত ভারতীয় স্ত্রীলোকের চিকিৎসার সাহায্যের জন্য তিনি পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু, তিনি আর্ত্তের দুঃখনিবারণের জন্য যে দান করেন, তন্মধ্যে কেবল দুইটীই উল্লেখ করা গেল। তিনি যেরূপ দয়ালু তাহাতে তাঁহার নাম সকলের নিকটেই প্রিয় এবং তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকটেই সম্মানার্হ। কোনপ্রকার অনুরোধ উপরোধে অনুপ্রাণিত না হইয়াও তিনি স্বেচ্ছায়, দুর্ভিক্ষপীড়িত আর্ত্তের প্রাণদানার্থ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার স্বামীর স্মরণার্থ এই দান করিয়া তিনি হিন্দুবিধবার অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন।"

সুবর্ণের কৈসরীহিন্দ পদকপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে তাঁহার প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে যে এক প্রীতি-অভিনন্দন প্রদান করেন, তদ্দৃষ্টে সহজেই প্রমাণিত হয় যে তিনি কিরূপ পরম দয়ালু। "Your Highness has ever been ready to relievo the poor and the needy, thousands of whom invoke blessings on your Highness and on our beloved young Maharaja for what your Highness has done to ameliorate their condition. These are but a few instances out of the thousand and one generous deeds and acts of princely munificence, which your Highness has done most unostentatiously and which have rendered your Highness' name a household word through the province. These sterling qualities of your heart have endeared your Highness not only as a master but also as a mother to us." অর্থাৎ আপনি সদা সর্ব্বদাই দুঃস্থ ও আর্ত্তের অভাব মোচনে বদ্ধপরিকর এবং তজ্জন্য তাহারা আপনার ও আমাদের প্রিয় মহারাজের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণে রত। এরূপ সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে—আপনার অনাড়ম্বর দানের জন্য প্রদেশের সর্ব্বত্রই আপনার নাম লওয়া হয় এবং এই জন্যই আপনাকে আমরা কেবল প্রভুর ন্যায় দেখি না—আপনাকে আমরা গর্ভধারিণী মাতার ন্যায় দেখি।

লোকের উপকার, দুস্থের দুর্দ্দশা নিরাকরণ, দেবসেবা, পূজার্চ্চনা করিয়া মহারাণী দিনপাত করিতেছেন। তিনি ও তাঁহার আদরের পুত্র মহারাজা বাহাদুর সুখে, স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করুন। হিন্দুস্ত্রীর আদর্শে, প্রজার মঙ্গলার্থে অনুপ্রাণিত হইয়া মহারাণী দীর্ঘকাল দেশের ও দশের উপকার করিতে থাকুন, ভগবানের নিকট আমরা কায়মনে তাহাই প্রার্থনা করি।

দশহরা উপলক্ষ্যে হাতুয়ার প্রদত্ত বক্তৃতা।

প্রত্যাবৃত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(১৫)

সন্ধ্যার ট্রেণে অসীম বধূ লইয়া নামিল। হেমলতা স্বামীর উপর রাগ করিয়াই এই বিবাহ খুব ধূমধামে দিতেছিলেন। ইহাতে যত টাকা লাগে লাগুক্, স্বামীকে দেখান চাই তাঁহার ক্ষমতা আছে কিনা।

বাড়ীটিকে গ্যাসের আলোয়, দেবদারু পাতায় ও ফুলের মালায় বড় সুন্দর সাজানো হইয়াছে।

ললিতবাবু আজ নিজের গৃহটী বরযাত্রিদের জন্য ছাড়িয়া দিয়া পাশের একটা ছোট ঘরে আশ্রয় লইয়াছেন।

সেবিকা নিজের ঘরে বসিয়া খোলা জানলা পথে বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার গৃহে একটী প্রদীপ ম্লানভাবে জ্বলিতেছিল। বাহিরের জগতের সঙ্গে, তাহার আজ সকল সম্পর্ক যেন ঘুচিয়া গিয়াছে।

অনন্তাকাশে বিন্দুর মত অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়া ঝলমল করিতেছে। উহারা তো সবই দেখিতে পায়, সবই জানিতে পারে। লোকে বলে মানুষ মরিয়া নক্ষত্র হয়। ছোটবেলায় সে এই গল্পই শুনিয়াছে, এবং হৃদয়ের সহিত বিশ্বাসও করিয়াছে। তাহার মা-ও কি ওইখানে নাই? তাহাকে আজ বড় ব্যথা বহিতে হইতেছে তাই আজ মায়ের কোলে গিয়া সে জুড়াইতে চায়। জগতের মধ্যে আর কোন্ স্থান আছে যেখানে সে ব্যথা জুড়াইতে পারে?

তখনি মনে ভাসিয়া উঠিল পিতৃসম শ্বশুরের কোলে। আজ তিনিও যে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন! সব ছাড়িয়া তাহাকেই কোলে টানিয়া লইয়াছেন যে। তাহার দুঃখ তিনি মুছাইবার জন্য স্ত্রীপুত্রের নিকট হীন হইয়াছেন।

সেবিকা বুকে বল পাইল, তাহার হৃদয় আবার পূর্ণ হইয়া উঠিল। তবে, সে একেবারে অসহায়া নয়, তারও সহায় আছে। প্রথম এ বাড়ীতে পদার্পণ করিবামাত্র যিনি তাহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তিনি আছেন; তাঁহার সেই স্নেহমাখা কোলটী তাহারই, আর কাহারও নহে।

ভগবান, হৃদয়ে বল দাও, সেবিকা যেন ভাঙ্গিয়া না পড়ে। সে নিজে উদ্যোগী হইয়া স্বামীর বিবাহ দিতেছে, এখন কেন এ দুর্ব্বলতা আসে? স্বামী যে ইহাতে সুখী হইবেন, স্বামীর মুখে ইহাতে যে হাসি ফুটিবে।

বর-বধূ বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। অসংখ্য পুরললনা-পরিবৃতা হেমলতা অসীম ও দীপালিকে আনিয়া প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান করাইয়া বরণ করিতে গেলেন।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সেবিকা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতে তাহার গহনার ছোট বাক্সটা। মুখে সামান্য অবগুণ্ঠন। হেমলতা বরণডালায় হাত দিবার পূর্ব্বেই সেবিকা বাক্সটা সেখানে রাখিয়া বরণ

ডালা তুলিয়া লইয়া দৃঢ়স্বরে বলিল "এ কাজ আমার। বরণ আমি নিজে করব।"

হেমলতার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তীব্র কটাক্ষে সেবিকার পানে চাহিলেন। চারিদিকে একবার চোখ ফিরাইয়া দেখিলেন সকলের বিস্ময়পূর্ণ চক্ষু তাঁহাদের উপরে পতিত।

অনেকগুলি কর্কশ কথা তাঁহার রসনাগ্রে আসিয়া পড়িল, কিন্তু দেশ কাল বিবেচনা করিয়া সেগুলিকে আবার যথাস্থানে পাঠাইয়া তিনি বলিলেন "পাগলামী কর না বাছা, সরে যাও।"

সেবিকা পূর্ব্ববৎ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "আপনি সরুন মা, বরণ আমি আর কাউকেই করতে দেব না। এ কাজটা আজ আমারই। আপনার করবার মত ঢের কাজ আছে, সে সব আপনি করবেন। দয়া করে এ কাজটা হতে আমায় বঞ্চিত করবেন না। আমি আমার সব ছেড়ে দিয়েই তো চলেছি মা, এটা যাবার সময়কার অনুরোধ।"

শেষ কথাগুলি বলিবার সময় তাহার কণ্ঠ বড় আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিবাসিনীদের মধ্যে একজন করুণায় আর্দ্র হইয়া বলিলেন "আহা, তা করতে দাও না বাছা।"

বিরক্ত ভাবে হেমলতা সরিয়া গেলেন। পুত্র ও পুত্রবধূ বরণ করিবেন সেই জন্য আজ তিনি বেণারসী সাড়ী ও সব অলঙ্কারগুলি গায় দিয়াছিলেন। এখন সেগুলি যেন গায় ফুটিতে লাগিল। সরিয়া গিয়া সেবিকার কাপড়খানার পানে চাহিয়া বলিলেন "বরণ করবারই মতলব যদি ছিল, কাপড়খানা বদলালেও তো হতো বাপু। লোকে একে দোষ দেবে আমারই। তুমি নিজে ইচ্ছে করে স্বামীর বিয়ে দিচ্ছ, সকলে কি আর তা জানে? লোকে ভাববে আমিই বিয়ে দেওয়াচ্ছি। ওই কাপড়খানা যে পরে এসেছ এতেও লোকে দোষ দেবে আমারই। সৎমা হলে তাকে যে অনেক কথা শুনতে হয় বাছা, তাত তুমি সব জান না।"

কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য অন্য রকম ছিল। তিনি খুব চালাক মেয়ে ছিলেন, তাই এই ভাবে সকলকে জানাইয়া দিলেন কর্ম্মকর্ত্রী সেবিকা নিজে, তিনি শুধু উপলক্ষ্য মাত্র।

সেবিকা কোনও কথায় কাণ দিল না। বরণ শেষ করিয়া সে নিজের গহনার বাক্সটা খুলিয়া নববধূর পানে চাহিয়া বলিল "দেখি বোন, এগুলো পরিয়ে দি। তোমার দিদির এগুলো স্নেহের দান বলে মনে করো, ঘৃণা করে যেন ফেলে দিও না।"

তাহার কথাগুলি শুনিয়া আর তাহার গম্ভীর করুণ মূর্ত্তিখানি দেখিয়া দীপালি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে তখনই সতীনকে ভালবাসিয়া ফেলিল। হাসির কথা নহে, ভালবাসা জন্মে এক নিমিষে, তাহাতে বিলম্ব হয় না।

সেবিকা নীরবে তাহাকে একে একে সব গহনাগুলি পরাইয়া দিল। নিজের হাতে কেবল তাহার ছগাছি শাঁখা ও লোহাটী রহিল। গহনা পরাইয়া দিয়া দীপালির অবগুণ্ঠন খুলিয়া তাহার সুগৌর ললাটে একটা স্নেহচুম্বন দিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "সুখী হও।"

বুঝি এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রুও সেই চুম্বন বর্ষণের সঙ্গে ঝরিয়া দীপালির ললাটোপরি পড়িল, সে তাই অত্যন্ত চমকিত ভাবে তাহার মুখপানে চাহিল। সে মুখ ম্লান কিন্তু বড় গম্ভীর। সে চোখে অশ্রু নাই।

বরকন্যা গৃহে চলিল, সঙ্গে সঙ্গে পুরস্ত্রীরাও চলিল। সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল শুধু সেবিকা। সে চাহিয়া দেখিতে লাগিল দুই পায়ের আলতার ছাপটী কেমন করিয়া ধরার বুকে আঁকিয়া দিয়া, স্বামীর বামপার্শ্বে থাকিয়া সে চলিতেছে। একদিন সেবিকাও এমনই করিয়া দুধ-আলতার ছাপ মাটিতে আঁকিয়া স্বামীর বামপার্শ্বে থাকিয়া ওই গৃহে উঠিয়াছিল। তাহার হৃদয় সেদিন পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, আনন্দে সে চোখে দেখিতে পায় নাই। আর আজ? আজ সে নিজের সর্ব্বস্ব পরকে দিয়া ভিখারিণী হইয়া গেল।

চোখ দুইটি সবে সজল হইয়া আসিতেছে সেই সময় পশ্চাৎ হইতে কে চাপা স্বরে বলিল "গয়না-গুলো সব দিয়ে দিলে বউ-মা? বুঝতে পারলে না কি পাগলামীর কাজ করলে। এর পরে তোমায় যখন এ বাড়ী ছেড়ে বেরুতে হবে, তখন কি করে, চলবে তোমার? গয়নাগুলো না দিলেই পারতে।"

সেবিকা ফিরিয়া দেখিল রামলাল। অসীমের ব্যবহারে সেও বড় দুঃখ পাইয়াছিল।

সেবিকা একটু হাসিয়া অশ্রুভরা চোখ দুইটী নামাইয়া বলিল "দরকার কি গয়নাতে রামলাল? নারীর জীবন-সর্ব্বস্ব স্বামীই যখন অপরকে দিতে পারলুম, তখন আবার গয়না?"

কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল। পাছে ধরা পড়িয়া যায়, এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি নিজের গৃহে চলিয়া গেল। দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া শীতল মেঝেয় সে দুইহাতে মুখ চাপিয়া ধরিয়া লুটাইয়া পড়িল।

আজ সে আর কেহ নয়, আজ সে পর। আজ তাহার কোনও দাবী নাই, সকল সর্ত্ত সে বিসর্জ্জন দিয়াছে। তাহার কর্ত্তব্য ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে বাহির হইয়া যাইতে হইবে।

দরজা ঠেলিয়া কে গৃহমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। সেবিকা একবার মাথা তুলিয়া দেখিল ললিতবাবু। সে আবার মুখ লুকাইল। আজ আর সে আপনাকে কোনও গোপনতার আড়ালে ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। আজ তাহার নারীহৃদয় সকল সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

ললিতবাবু বাহিরে আর বসিয়া থাকিতে পারেন নাই। সেবিকা কি করিতেছে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার কল্পনাই সত্য হইল।

নীরবে তিনি পুত্রবধূর পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল; বিকৃত কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন "মা।"

ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। তিনি, দাঁড়াইতে অক্ষম হইয়া তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে একটু শান্ত হইয়া বলিলেন "তুমি নিজেই তো তোমার এ সর্ব্বনাশ ডেকে আনলে মা। তুমি যদি মত না দিতে তবে এ বিয়ে তো হতে পারত না।"

সেবিকা নিজেকে সামলাইল। উঠিয়া বসিয়া মুখ চোখ আঁচলে মুছিয়া ফেলিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "ভুল, বাবা ভুল। আমার মত না পেলে যে বিয়ে হত না এমন কথাই নয়। আমি খোঁজ করে জেনেছি এ বিয়ে হতই। আমার মত না পেলেও হতো। আমার কথা শুধু একটা কারণ স্বরূপ থেকে গেল।"

উভয়েই নীরব। বাহিরে তখন নানা সুরে ব্যাণ্ড ও রোসনচৌকি বাজিতেছিল, বাড়ীখানা তখন আনন্দ-কলরবে পূর্ণ। বিষাদ কেবল এই ক্ষুদ্র গৃহটীতে আসিয়া জমা হইয়াছে।

অনেকক্ষণ পরে সেবিকা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল "বাবা।"

চমকিয়া উঠিয়া ললিতবাবু বলিলেন "কেন মা?"

সেবিকা বলিল "আপনি কেন আশীর্ব্বাদ করতে গেলেন না বাবা? আপনারি ছেলে যে। আপনার আশীর্ব্বাদ না হলে যে অকল্যাণ হবে বাবা।"

এখনও এত ভক্তি! ললিতবাবুর চোখে জল আসিয়া পড়িল। তিনি তাহা মুছিয়া বলিলেন "আশীর্ব্বাদ করেছি মা। সন্তান কখন বাপমায়ের আশীর্ব্বাদ হ'তে বঞ্চিত হয় না।"

সেবিকা একটা শান্তির নিশ্বাস ফেলিল। বলিল "আপনি এখানে কেন বাবা? বাইরে যান।"

ললিতবাবু রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "আজ সকলে তোমায় এই আঁধার ঘরে ফেলে রেখে গেছে বউ-মা, আমি তোমায় কুড়িয়ে নিতে এসেছি। সকলে তোমায় ঘৃণা করে পায়ে দলে চলে গেছে; আমি তোমায় আদর করে তুলে নিতে এসেছি। আজ হতে তুমি কেবল আমার একলা মা, আমি কেবল তোমার একলা ছেলে। মাঝখানে আর কেউ নেই মা, চার পাশে আর কেউ নেই মা। আমি আজ তোমার কোলে আমায় সঁপে দিচ্ছি, আমায় তুলে নাও। আজ হতে মনে কর তোমার কেউ নেই,

কখনও কেউ ছিল না। তুমি আমার মা হ'তে এসেছ, আমার মা-ই হ'য়েছ।"

সেবিকার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। ভাঙ্গা গলায় সে বলিল "তাই—তাই বাবা। আজ আমি সর্ব্বস্ব বিলিয়ে তোমাকেই তুলে নিলুম।"

(ক্রমশঃ)

ভক্তির যুক্তি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ।

শুভ বৈকালে দেখা হল মোর
এক কৃষকের সাথে,
পুলকে দেখিছে ক্ষেতের ফসল
হুকাটী লইয়া হাতে।
দেখিয়া আমারে নোয়াইল শির
কহিল 'ঠাকুর শোনো,
তুমি পণ্ডিত আমি ত মূর্খ
জ্ঞান নাই মোর কোনো।
পাড়ায় আজিকে ঝগড়া হয়েছে
একটা বিষয় নিয়ে
এই দুনিয়ার মালিক যে জন
পুরুষ বটে কি মেয়ে।
জগন্নাথের পূজারী মহেশ
বলিয়াছে জটা নাড়ি,
ধরার কর্ত্তা জগদীশ্বর
হইতে পারে কি নারী?
শ্যামা মা আমার প্রসব করেছে
এই যে বিপুল ধরা,
আমি ত অবাক একথা মানে না
মাথায় গোবর ভরা!
উষার কপালে কে পরালে টিপ
কাজল মেঘের চোখে,
টুনটুনি হায় কোথা পেলে বাঁশী
দেখেও দেখে না লোকে।
জগৎজননী মা না হত যদি
দোপাটী পেত কি ফোঁটা?
গোলাপ পেত কি রাঙা চেলী তার
কদলী গরদ গোটা?

শিখী কোথা পেত ময়ূরকণ্ঠী
রেশমী পোষাক টিয়া,
ঝুঁটি কোথা পেত ছোট বুলবুলি
বাঁধা লাল ফিতা দিয়া?
সুমুখেতে দেখ ছুটু বোলতা
সোণালী ঘুন্সি পরা
বকের কামিজ কিবা ইস্তিরি
যায়না ময়লা করা!
ভূতলে গগনে গিরি নদী বনে
দেখুক আসি যে কেহ—
চারি দিক দিয়া গড়ায়ে পড়িছে
মায়ের গভীর স্নেহ।
পিতা ছেলে মেয়ে খেতে দিতে পারে,
সোহাগ পারে কি দিতে,
টিপ্ কাজলেতে সাজাইতে পারে
দেখিনি ত হেন পিতে।
তুমিই ঠাকুর মীমাংসা কর'
বসিল সে হাসি মুখে,
তাহার কথার নবীন আলোক
তুফান তুলিল বুকে।
বলিলাম 'মহা ধর্ম্মক্ষেত্র
এই সে তোমার মাঠ
তুমিই দেখছি হেথায় করেছ
বুকের চণ্ডী পাঠ।
তুমি ভক্তির তসর পরেছ
তোমারে প্রণাম কোটী,
পাতা খেয়ে মোর ভোঁতা হল মুখ
এখনো বাঁধছি ওটী।

কালো মেয়ে

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বি-এল্।

হিন্দুসমাজে মেয়ের বিবাহ-ব্যাপার যে কি এক ঘোরতর সমস্যায় পরিণত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মধ্যে কন্যাসন্তান জন্মিলে অনেকে দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করেন। কন্যা হইলেই পিতামাতার প্রধান ভাবনা হয়, কি করিয়া ইহার বিবাহ দিব? বলা বাহুল্য, এই মেয়ে-বিবাহসমস্যার প্রধান কারণ পণপ্রথা। আবার পণপ্রথার মূলে দুইটি জিনিষ দেখিতে পাই—একটি অর্থগৃধ্নুতা, অপরটি 'কালো মেয়ে'। মেয়ের বর্ণের কালো ফর্সার সহিত পণের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। লোকে একে মেয়ে হওয়াটাই দুর্ভাগ্য মনে করে, তার পর সে মেয়ে যদি আবার কালো হয়, তবে তাহার পিতামাতার চক্ষুস্থির হইয়া যায়। বাস্তবিক আজকাল কালো মেয়ে পাত্রস্থ করা যে কি এক মহা সমস্যার ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ অনুভব করিতে পারিবেন না। অনেক সময় অত্যাধিক পণ দিয়াও কালো মেয়ের বিবাহ দেওয়া কঠিন হয়। মেয়ের গায়ের রং যদি ফর্সা হয়, তবে তাহার সাত খুন মাপ—তাহার অন্যান্য গুণ আছে কি না আছে, সে দিকে তত দৃষ্টি দেওয়া হয় না। আর মেয়ে যদি কালো হয়, তবে বহুগুণের আধার হইলেও সহজে কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে না। টাকার লোভে ছেলের মা-বাপ রাজি হইলেও অনেক চালাক ছেলেকেই বলিতে শোনা যায়, "কালো মেয়ে বিয়ে করতে আমার তত আপত্তি নেই, তবে কিনা আমার মেয়ে যখন কালো হবে, তখন তাকে কে উদ্ধার করবে?" কমলাকান্ত শর্ম্মার ভাষায় বলিতে গেলে ছেলে নিজেই হয়ত "ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ," কিন্তু সে কথা কে বলিতে যাইবে? সে যে ছেলে! মেয়ে কালো হইলেই ত যত বিপদ! ইহাদের কথা শুনিয়া মনে হয় সন্তানসন্ততির কালো ফর্সা হওয়া সমস্তই যেন শুধু মাতার গায়ের বর্ণের উপর নির্ভর করে, পিতার বর্ণে কিছু আসে যায় না। কিন্তু জনন-বিজ্ঞান কি অনুরূপ সাক্ষ্য দেয় না?

মানুষ সৌন্দর্য্যের উপাসক। সুন্দর জিনিষ কে না চায়? একটি সুন্দর ফুল দেখিলে কাহার না পাইতে লোভ হয়? একটি সুন্দর শিশু দেখিলে কাহার না কোলে করিয়া আদর করিতে ইচ্ছা হয়? এই জন্যই বঙ্কিমবাবু এক স্থানে বলিয়াছিলেন, "সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয়।" সুন্দর জিনিষকে সকলেই আদর করে, সকলেই পছন্দ করে। বিবাহের পূর্ব্বে পুরুষমাত্রেরই একটা ইচ্ছা হয়—আমার স্ত্রী সুন্দরী হউক, একথা বলিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হয় না, কেন না, ইহাই স্বভাবের নিয়ম। সুন্দরী রমণীর জন্য পুরুষজাতি পাগল, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন কি? পৃথিবীর অনেক বড় বড় যুদ্ধবিগ্রহ সুন্দরী রমণীর জন্য সংঘটিত হইয়াছে, ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। দেবাসুরের যুদ্ধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, ট্রয়ের যুদ্ধ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক যুদ্ধবিগ্রহই সুন্দরী রমণীকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত হইয়াছে। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে সুন্দরী মমতাজ বেগমকে লইয়া কি হুলুস্থুল কাণ্ডটাই আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বোধ হয় পাঠকপাঠিকাগণের অজ্ঞাত নাই।

পুরুষ সুন্দরী স্ত্রী চায়, পক্ষান্তরে স্ত্রীরও কি সুন্দর স্বামী পাইতে ইচ্ছা হয় না? আমাদের কোন পাঠিকা হয়ত বলিতে পারেন, "না, আমাদের সেরূপ

ইচ্ছা হয় না।” যদি এরূপ কেহ বলেন তাঁহার উত্তরে আমি বলি, তিনি নিশ্চয়ই মনের কথা বলিতেছেন না। পুরুষ যেরূপ সুন্দরী স্ত্রী চায়, রমণীও তদ্রূপ সুন্দর স্বামী চায়, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম, গায়ের জোরে ইহাকে অস্বীকার করা চলে না। অনেক রমণীই হয় ত বলিবেন, “আমরা পুরুষের মত অত স্বার্থপর নই; স্বামী আমাদের আরাধ্য দেবতা। স্বামী, স্বামী বলেই আমাদের নিকট চিরসুন্দর, তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্য থাকুক, কি নাই থাকুক, আমরা গ্রাহ্য করি না।” আমি একথা অস্বীকার করি না। তবে রমণীর এই মনোভাব হয়—বিবাহের পরে; বিবাহের পূর্ব্বে নয়। অধিকাংশ পুরুষও বিবাহের পর নিজের স্ত্রীকে সুন্দরী দেখেন। বিবাহের পর স্বামীস্ত্রীর পরস্পরের প্রতি এরূপ মনোভাব হয় বলিয়াই সংসার এরূপ পবিত্রতাময়, এরূপ শান্তিময় হইয়া থাকে। যেখানে ইহার ব্যতিক্রম হয়, সেখানেই অশান্তি ও পাপের দাবানল জ্বলিয়া উঠে।

আমরা বিবাহের পূর্ব্বেকার অবস্থার কথাই আলোচনা করিতেছি। বিবাহের পূর্ব্বে প্রত্যেক মেয়েরই ইচ্ছা হয় যে তাহার বরটি সুন্দর হউক। সংস্কৃতে এ বিষয়ে একটি সুন্দর শ্লোক আছে—

কন্যা বরয়তি রূপং, মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি, মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥

বর যেরূপ সুন্দর কনে চায়, কনেও সেইরূপ সুন্দর বর চায়, বিবাহের পূর্ব্বে এ কথাটা আমরা কয়জনে স্বীকার করি, করিলেও কয়জনে আমলে আনি? ছেলের জন্য এত মেয়ে দেখা হয়, এত মেয়ে বাছাবাছি করা হয়, কিন্তু মেয়ের বেলায় কয়টি বরের রূপ যাচাই করা হয়? অনেক স্থলে বিবাহ সম্বন্ধে ছেলের মতামত জিজ্ঞাসা করা হয়; কিন্তু মেয়েদের বেলায় বিশেষ কিছুই হয় কি? আজকাল তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মধ্যে একটু বেশী বয়সেই মেয়ের বিবাহ হয়; কিন্তু বিবাহ-সম্বন্ধে তাহাদের কোনই মতামত জিজ্ঞাসা করা হয়না। বস্তুতঃ, বিবাহ-ব্যাপারে আমাদের দেশের মেয়েদের কোনই হাত নাই। বিবাহের সময় আমাদের মেয়েদের যে কতজনের নিকট কতবার রূপগুণের পরীক্ষা দিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। মেয়ে দেখার সময় মুখ, চোখ, হাত, পা হইতে আরম্ভ করিয়া আঙ্গুলের নখ, চুলের ডগা, পায়ের তলা প্রভৃতি মেয়ের সমস্ত অঙ্গকেই অতি কঠিন পরীক্ষার বিষয়ীভূত করা হয়। বিশেষতঃ মেয়ে যদি কালো হয়, তবে তাহার পরীক্ষার আর সীমা-পরিসীমা থাকে না। এই পরীক্ষা যদি দুই এক জনের নিকট দিতে হইত তবুও তত আপত্তির কারণ ছিল না। কিন্তু কতবার, কতজনের নিকট, কত বিচিত্র প্রণালীতে যে এই পরীক্ষাসাগর সাঁতরাইতে হয়, তাহা যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারাই ভালরূপ বলিতে পারেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, কয়জন ছেলেকে এরূপভাবে পরীক্ষা করা হয়? অনেকে হয়ত বলিবেন, “আমাদের দেশের মেয়েরা পর্দ্দানশীন, সাধারণভাবে তাহাদের দেখিবার সুযোগ হয় না; যে মেয়েকে আমি বধূরূপে ঘরে আনিব তাহাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইব না কি?” কথাটা ঠিক, কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে প্রাথমিক পরীক্ষার কাজটা, অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের খুটিনাটি বিষয় দেখার ব্যাপারটা সম্ভবমত স্ত্রীলোক দিয়া করাইলে ভাল হয় না কি? মেয়ে দেখার সময় আমাদের মেয়েদের যে কঠোর পরীক্ষায় পাশ করিতে হয় সিভিলসার্ভিস পরীক্ষাও বোধ হয় তাহার অপেক্ষা সহজ। অন্যে যাহাই মনে করুন, আমাদের দেশে যে ভাবে মেয়ে দেখার প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে, আমি তাহাকে নিরীহ বালিকাদের উপর নির্ম্মম অত্যাচারের নামান্তর বলিয়া মনে করি। এ প্রথার সংস্কার হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বিবাহ হইয়া গেলেও কালো মেয়ের দুর্দ্দশার শেষ হয় না। শ্বশুর গৃহে রং কালো বলিয়া অনেক বধূকে প্রথম প্রথম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও ‘খোঁটা’ সহ্য করিতে হয়, আর শাশুড়ী ননদিনী যদি দুর্ম্মুখা হন,

তবে ত কথাই নাই। অনেক শাশুড়ী ননদিনী ছেলে বা ভাইকে আবার সুন্দর মেয়ে আনিয়া বিবাহ করাইবেন বলিয়া অনেক সময় শাসাইয়া থাকেন।

আমাদের সাহিত্যেও কালো মেয়ের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। আমাদের নাটক-নভেলের নায়কেরা সকলেই সুন্দর, নায়িকারা প্রায় সকলেই সুন্দরী, সকলেই অপরূপ রূপলাবণ্যবতী। কোন উপন্যাসের নায়িকার গায়ের রং কালো, এ কথা বড় বেশী পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যে দু-এক জায়গায় পড়িয়াছি, সেখানে গ্রন্থকার নায়িকার দুর্দ্দশার অন্ত রাখেন নাই। বঙ্কিমবাবুর 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বেচারী ভ্রমর কালো ছিল বলিয়াই না চিরটা জীবন তাহাকে এত দুর্ভোগ ভুগিতে হইল! আমরা জিজ্ঞাসা করি, কালো পুরুষ কিম্বা কালো মেয়ে কি নাটক-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হইবার একেবারেই অনুপযুক্ত? অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যের নায়ক-নায়িকাগণ প্রায় সকলেই সুশ্রী ও সুন্দর ছিলেন। তাহার কারণ এই যে, অধিকাংশ স্থানেই দেবদেবতা বা রাজা মহারাজার জীবনকাহিনী লইয়াই তখনকার সাহিত্য গঠিত ছিল। কিন্তু ইহারও যে ব্যতিক্রম না হইয়াছে তাহা নহে। মহাভারতের অন্যতম প্রধান নায়ক কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কালো ছিলেন। কৃষ্ণের এক নাম ত 'কেলেসোণা।' 'কৃষ্ণ কালো, তমাল কালো, তাইতে কালো ভালবাসি' ইত্যাদি গানে কৃষ্ণকে কালো বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। মহাভারতের অন্যতম প্রধান নায়িকা দ্রৌপদী কালো ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার অপর নাম কৃষ্ণা। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় আধুনিক বঙ্গসাহিত্য ত শুধু উচ্চস্তরের লোক লইয়াই গঠিত নয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজনই ত আধুনিক নাটক-উপন্যাসের প্রধান নায়ক নায়িকা। আর বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশই ত কালো, নাটক-নভেলের বর্ণিত 'ফিট গৌরবর্ণ' পুরুষ বা 'তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা' স্ত্রীলোক শতকরা কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়? গায়ের রং যেরূপই থাকুক, যদি আবশ্যকীয় গুণ থাকে, তবে এরূপ ব্যক্তি কেন সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইতে পারিবে না? সমাজের উপর সাহিত্যের অপরিসীম প্রভাব। সাহিত্যের এরূপ বর্ণবৈষম্যের কুফল আমাদের সমাজের উপরও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। কালো মেয়ের প্রতি আমাদের যুবকগণের যে এত অধিক বিতৃষ্ণা, আমাদের সাহিত্যের একদেশদর্শিতাও তাহার জন্য কিয়ৎপরিমাণে দায়ী। কেবল নায়ক-নায়িকার রূপলাবণ্যের উপর সমস্ত জোর না দিয়া, গুণ, শিক্ষাদীক্ষা ও স্বভাবচরিত্রের উপর যদি অধিক জোর দেওয়া হয়, তবে বোধ হয় দেশের রুচি এতটা বিকৃত হইতে পারে না। নাটক-নভেলে কেবলই অতি-রূপসী নায়িকার বৃত্তান্ত পড়িতে পড়িতে আমাদের যুবকগণের মন অ-রূপসী মেয়েদের প্রতি স্বতঃই যেন বিরক্ত হইয়া উঠে। যৌবনের রঙিন নেশায় অনেক যুবকই বিবাহের পূর্ব্বে নিজকে ওসমান, কি জগৎসিংহ কিম্বা হেমচন্দ্র মনে করিয়া ভাবী পত্নীটিকে আয়েষা, তিলোত্তমা বা কুন্দনন্দিনীর মত রূপসী বলিয়া কল্পনা করিতে ভালবাসে। কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরে কয়টি তিলোত্তমা বা কুন্দনন্দিনী দেখা যায়? ফলে বিবাহের সময় যত গণ্ডগোল বাধে। নিরপরাধ মেয়েগুলিকেই আমরা যত অনর্থের কারণ বলিয়া মনে করি, কিন্তু এই অনর্থপাতের মূলে যে স্বয়ং আমরা এবং আমাদের বিকৃত রুচি তাহা তলাইয়া দেখিনা।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুইটি বৈশিষ্ট আছে—রূপ আর গুণ। একটি দৈহিক বিশেষত্ব, অপরটি মানসিক বিশেষত্ব। একটি প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, অপরটি নিজের উপর নির্ভর করে। দৈহিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে মানুষের হাত কতটুকু? মানুষের দেহের রূপ প্রায় সর্ব্বাংশেই পিতামাতার রূপের উপর নির্ভর করে, ইচ্ছা করিলেই মানুষ রূপবান হইতে পারে না। কিন্তু গুণ প্রায় সমস্তই নিজের

উপর, ব্যক্তিগত সাধনা ও চেষ্টার উপর নির্ভর করে। প্রকৃতির এমনই বিচিত্র লীলা যে, রূপ ও গুণ একাধারে বড় বেশী দেখা যায় না, যেখানে দেখা যায়, সেখানে প্রকৃতিদেবীর বিশেষ অনুগ্রহ বলিতে হইবে। মানুষের কথা ছাড়িয়া দিয়া পশুপক্ষীদের কথা আলোচনা করিলেও দেখা যায়, যাহার অত্যধিক রূপ আছে, তাহার তাদৃশ গুণ নাই। আবার যাহার অত্যধিক গুণ আছে, তাহার সেরূপ নয়নভুলান রূপ নাই। একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। যে কোকিলের কুহুস্বরে মানুষের মনঃপ্রাণ মুগ্ধ করে, তাহার রূপ অত্যন্ত কালো। আবার যে ময়ূরের সহস্র মণিমুক্তাখচিতবৎ পুচ্ছ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, তাহার স্বর শুনিলে কর্ণ বধির হয়।

কালো হইলেই যে নিজের জীবনকে দুর্ব্বহ মনে করিতে হইবে, তাহার কি মানে আছে? রূপ কয়দিনের জন্য, বা দৈহিক সৌন্দর্য্য কতটুকু স্থায়ী, ইহার মূল্যই বা কতটুকু? মানসিক সৌন্দর্য্যই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। রূপের অপেক্ষা গুণের মূল্য অনেক বেশী! জগৎ গুণের দাস। গুণ থাকিলে দুদিন আগেই হউক, বা দুদিন পরেই হউক লোকে আদর করিবেই করিবে। কবি বলিয়াছেন, "গুণাঃ পূজাস্থানং গুণীষু নচ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।" বাস্তবিকই তাই "রূপে কিবা করে কাজ যদি গুণ থাকে।" আপাত দৃষ্টিতে সুন্দর মুখের জয় হইতে পারে কিন্তু চিরকাল প্রকৃত আদর গুণের। বড়ই আক্ষেপের বিষয় আমরা সকল সময় গুণের আদর করি না। ছেলের বেলায় তাহার রূপের দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহার গুণের দিকেই লক্ষ্য করি কিন্তু মেয়ের বেলায় তাহার গুণ যাহাই থাকুক না কেন তাহার রূপকেই যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া ধরিয়া লই। ইহার ফলে যে সমাজের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। এ কুপ্রথা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। রূপ যাহাই থাকুক গুণ থাকিলে লোকে তাহাকে আদর করিবেই করিবে। আমাদের মেয়েরা জ্ঞানেগুণে, শিক্ষাদীক্ষায় গরীয়সী হইয়া উঠুন, কালো হইলেও তাঁহারাই জগৎ আলো হইবেন।

নূতন ও পুরাতন

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ।

নূতন হাসিয়া কহে "হায় পুরাতন!
জীর্ণ অতীতের ছবি ধূলি বিমলিন,
বিস্মৃতির তটকূল-লুণ্ঠিত কেতন,
খলিত শীতের পত্র বিশুষ্ক শ্রীহীন;
কালের প্রাঙ্গণে ত্যক্ত আবর্জ্জনা স্তূপ,
বিশ্বের উৎসবাগারে কোথা তব স্থান?"
—"থাকি যেথা অনুরাগ জ্বালি স্মৃতি ধূপ
অন্তর-মন্দিরে করে নিত্য অর্ঘ্য দান,
বেদনার রক্তজবা দিয়া কর্ম করে
দাঁড়ায় প্রদীপ জ্বালি নিস্তব্ধ প্রহরে!"

নাসিক ভ্রমণ

শ্রীমতী মোহিনী দেবী।

বোম্বাই হইতে খুব ভোরে ছয়টার প্যাসেঞ্জারে আমরা নাসিক তীর্থে যাত্রা করিলাম। স্ত্রীলোকদের জন্য তৃতীয়শ্রেণীর যে গাড়ী থাকে, তাহাতে আরোহীদের যে কত কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা যাঁহারা গাড়ীতে যাতায়াত করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। সাধারণতঃ মেয়েদের জন্য একখানি মাত্র কামরা থাকে, তাহাতেই ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীর মেয়েরাই যাতায়াত করেন। ওসব দিকে গাড়ীতে যেমন ভীড় হয় তেমনি যাত্রীরা গাড়ী অপরিষ্কার করেন। গাড়ীর চারিদিকে হিন্দী, ইংরাজী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় লেখা আছে—কেহ গাড়ীর ভিতর থুথু ফেলিও না। কিন্তু সে আদেশ কে মানে? ওদিকের মেয়েযাত্রীদের, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর মুসলমান রমণীদের গাড়ীতে পানের পিচ ফেলাই একটা প্রধান কাজ দেখিলাম। অন্যান্য মেয়েরাও কম যা'ন না; পানের পিচ ফেলা, খইনি খাইয়া মুখামৃত বৃষ্টি করা-তাঁহাদের রেল যাতায়াতের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম। পশ্চিমবাসিনী কি হিন্দু, কি মুসলমান সকল শ্রেণীর রমণীগণই কচিৎ স্নান করেন। স্নান যদিও বা করেন কিন্তু পরিহিত বস্ত্রাদি আদৌ কাচেন না। ইঁহাদের গাত্র ও বস্ত্রাদির সৌরভ যে কতখানি নাসিকা-প্রীতিকর তাহা সহজেই অনুমেয়। আমাদের এই প্রকার যাত্রীদের সহিত প্রায় ৮॥০ ঘণ্টা কাটাইতে হইয়াছিল।

বেলা ৩।০ টার সময় আমরা নাসিকরোড ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশন হইতে নাসিক সহর প্রায় পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ট্রাম, মটর, টঙ্গা সবই পাওয়া যায়। আমাদের পাণ্ডা তাঁহার গাড়ী করিয়া আমাদিগকে নাসিকে লইয়া গেলেন। বোম্বাইএর ধনী ব্যক্তিদের লতাপাতা-পুষ্পশোভিত বহু বাঙ্গলা নাসিকে আছে। রাস্তার ধারে একস্থানে উইণ্ডমিলের মত চাকা ঘুরিতেছে দেখিলাম। জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে সেটি জলের কল। সেই কলে মাটির নীচের কূপ হইতে জল উঠিতেছে এবং সেই জল সহরের সর্ব্বত্র সরবরাহ করা হইতেছে। পাণ্ডাজীর বাড়ী গোদাবরী নদীর তীরে। বাড়ীতে গিয়া তিনি বলিলেন "এপারে নাসিক, ওপারে পঞ্চবটী।" পুণ্যসলিলা গোদাবরীতে পবিত্রমনে স্নানতর্পণাদি করিয়া চিরজীবনের পাপতাপ গ্লানি দূর করিবার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব বাহির হইলাম। নদীতে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে প্রাণ বিস্ময়ে ভরিয়া গেল। মনে হইল এই কি সেই গোদাবরী? এই গোদাবরী তীরে দাঁড়াইয়াই কি রঘুকুলমণি বলিয়াছিলেন—

* * * * শুন ভাইরে লক্ষণ,
গোদাবরী জীবনেতে ত্যজিব জীবন"।

সে গোদাবরী কোথা? গোদাবরীর এখন শোচনীয় অবস্থা। স্থানে স্থানে খানিকটা পাথর দিয়া বাঁধান এক একটি ঘাট, তাহারি নীচেয় পাথর দিয়া ঘিরিয়া খানিকটা জল আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। সেগুলি যেন ছোট ছোট এক একটি পুষ্করিণী। বহু মহারাষ্ট্র রমণী সেই সামান্য জলে কাপড় লইয়া আছড়াইতেছেন দেখিলাম। এসব স্থান অত্যন্ত ময়লা বলিয়া পাণ্ডা আমাদের গোদাবরী দেবীর মন্দিরের সম্মুখে দশরথ কুণ্ডতে স্নান করাইবার জন্য লইয়া গেলেন। সে কুণ্ডটি একটু বড়। এখানে ।৵৫ দিয়া সঙ্কল্প করিতে হয়। অনেকে এখানে শ্রাদ্ধাদিও করিয়া থাকেন। আমরা সঙ্কল্প করিলাম। পাণ্ডা মন্ত্র পড়াইয়া স্নান করাইলেন। স্নানান্তে আমাদের দুই হাতে মাটি মাখাইয়া দিয়া বলিলেন "বল, জীবনে যত পাপ করিয়াছি গোদাবরীতীর্থ-

স্নানে সেই সব পাপ এই মৃত্তিকা যেমন জলে ধৌত হইয়া যায় তেমনি ধুইয়া যাউক।" এই কথা বলাইয়া তিনি আমাদের তিনবার ডুব দেওয়াইলেন। গোদাবরীর জলে পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিবার ইচ্ছা পূর্ব্ব হইতেই ছিল। গোদাবরীতে গিয়া হাতে জল তুলিলাম। জল যতদূর সম্ভব অপরিস্কার, ঘোলা এবং নানাপ্রকার কীটাণুতে পরিপূর্ণ। যাইহোক, কোনমতে যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিলাম।

অতঃপর আমরা তীরে উঠিয়া গোদাবরী-দেবীর মন্দিরে প্রতিমা দর্শনার্থ গমন করিলাম। প্রতিমা বড়ই সুন্দর, দেখিলে শরীর মন জুড়াইয়া যায়। তারপর আমরা পঞ্চবটী অভিমুখে গমন করিলাম। এখন আর সেই হরিণ-হরিণীসমাকুল, ময়ূর-ময়ূরী-নৃত্যপূর্ণ, বিহঙ্গমকুলের কলগীতি মুখরিত পঞ্চবটী নাই। পঞ্চবটী এখন সহর হইয়াছে। চারিদিকে লোকজন বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রায় দুই মাইল যাইবার পর আমরা রাম লক্ষ্মণ সীতার মন্দির দেখিলাম। শুনিলাম এখানে তাঁহাদের কুটীর ছিল। স্থানটী অতিশয় নির্জ্জন ও বড় মনোরম। এখানকার পূজারী ঠাকুরের কোমল ব্যবহারে আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। রাস্তার ধারে এক জায়গায় একটি বিরাট জলাভূমি দেখিলাম। জিজ্ঞাসায় জানিলাম সীতাহরণের বাধা দেবার জন্য এটির সৃষ্টি হইয়াছিল। নিকটেই কয়েকটী কুঠুরী আছে। ছোট একটি কুঠুরীতে ছোট একটী পুতুল আছেন, তিনি নাকি রাবণ। কুঠুরীর দ্বারে যাইতেই পূজারী বলিলেন "এটি রাবণ, ভিতরে সীতাদেবী আছেন, সওয়া পাঁচ আনা ভেট দিলে সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন।" যে দেবীর পুণ্যকাহিনী বাল্যকাল হইতে আমাদের মজ্জাগত, তাঁহাকে আর পুত্তলিকা মূর্ত্তিতে কি দেখিব? তিনি ত প্রাণের ভিতরেই আছেন। বাহির হইতেই তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ভরতপুরের মহারাজা নিকটে একস্থানে মহাবীর হনুমানজীর প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ও মন্দির স্থাপন করিয়া একটি সদাব্রত খুলিয়াছেন। এ স্থানটি দর্শনে আমরা বড়ই পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম। এইস্থান হইতে এক মাইল যাইয়া খরদূষণ যুদ্ধের সময় রামচন্দ্র সীতাদেবীকে যে গুহায় লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহা দেখিলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী, দ্বারে দুইজন সুন্দরী, সুবেশা মহারাষ্ট্র রমণী। আমরা যাইতেই তাঁহারা দ্বার ছাড়িয়া দিলেন এবং সিঁড়ি বাহিয়া নীচেয় নামিয়া যাইতে বলিলেন। ভিতরে কি ভয়ানক অন্ধকার। একস্থানে একটী ক্ষুদ্র প্রদীপ জলিতেছে মাত্র। খানিক দূর যাইয়া আর আমরা নামিতে পারিলাম না, ঐস্থান হইতে ভূমি লুটাইয়া প্রণাম করিলাম। পথে আর একটি রামলক্ষ্মণের মন্দির ও মূর্ত্তি দেখিলাম। যেমন মন্দির তেমন মূর্ত্তি, দেখিলে বাস্তবিকই চক্ষু জুড়াইয়া যায়। এই মন্দিরটীর গাত্রে খোদাই করা প্রস্তর মূর্ত্তিগুলি বড়ই মনোহর। এক একটি মূর্ত্তি এমনই সুন্দর যে দেখিলে মনে হয় যেন সজীব। কোথায় সেই সব শিল্পি, যাহারা এই সব কারুকার্য্য, এইসব প্রস্তরগাত্র খোদাই করিয়াছিল? তাহারা আজ ধরা হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বংশধরগণ আজ উৎসাহ অভাবে, অন্নের অভাবে অর্দ্ধমৃত, ধ্বংসপ্রায়!

যে স্থানে সূর্পনখার নাসিকা ছেদন হয় সে স্থান নাসিক হইতে দুই মাইল দূরে। রাস্তা বিজন অরণ্যে ঢাকা। অরণ্য মধ্যে মাঝে মাঝে দুই একটি ছোট ছোট মন্দির এবং তাহার মধ্যে দুই চারিটি করিয়া বিভিন্ন প্রকারের দেবদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। তরুগুল্মাচ্ছাদিত অরণ্যানী মধ্যে নাসিকা ছেদনের স্থান। সেখানেও বনমধ্যে কয়েকটি মন্দির আছে।

নাসিকদর্শন শেষ করিয়া আমরা পুনরায় গোদাবরী পার হইয়া নাসিক সহরে ফিরিয়া আসিলাম। গোদাবরী কত পাপীতাপীর পাপতাপ দূর করিয়া শান্তি প্রদান করিয়াছেন; আমাদের পাপরাশি হরণ করিবেন কি?

উদয়-আলো

(বড় গল্প)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

(গত সংখ্যায় প্রকাশের পর)

আমার বিয়ের অনেকদিন আগে, তার এক বন্ধুর কোন বিশেষ বিপদে জামিন হয়ে কতকগুলো টাকা ধার করে দিয়েছিল। বন্ধু তা দিতে পাল্লেন না, উপরন্তু তার সঙ্গে বন্ধুত্বও রাখতে পাল্লেন না। পাওনাদার নালিশ কল্লেন, তাকেই সব দেনা পরিশোধ কর্ত্তে হ'ল; কি দিয়ে কর্ব্বে, তার নগত ত এমন কিছু ছিল না, যা কিছু সম্পত্তির অধিকারী সে ছিল, তাই বিক্রি করে শোধ কল্লে। তখন সে একেবারে নিঃসম্বল হয়ে পড়ল। এই থেকেই অশান্তির একটা সূত্রপাত আরম্ভ হ'ল। সে কি তার দোষ? না—না, সে আমারি কপালের দোষ! হতভাগিনী আমি, এত সুখ কি আমার হতে আছে! এই অবস্থার মধ্যে পড়েও তার মুখে হাসি কমেনি, খুনসুটি-ফাজলেমিও লোপ পায় নি। আমাকে শোনাবার সুযোগ হলেই কেবল সে গাইত, "আমার চায়না ত মুখ কেউ ত সংসারে; পয়সা হাতে থাকে যখন, পাবার আশে সবার যতন," আরও সব ছাই-ভস্ম কত কি। আমার ভারি রাগ হত, দেখা হলে বল্তাম, "ও, তোমার পয়সা নেই বলে আমি তোমায় যত্ন করি না, বেশ, আমাকে একটু মরবার সুযোগ দাও।" সে বলত "দূর পাগলি, তোমার খেপালে বুঝতে পার না, আমি যে তোমার অভিমানটুকু দেখ্ব বলেই ঐ গানটা করি।" নারী আমি, জানি না, শুনেছি মনোরম সৌন্দর্য্যে ভরপুর কোরে তোলে নারীকে তখনই যখন তাকে অভিমানে ফুলতে হয়।...

তার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে ও শোচনীয় পরিণামে সবাই তাকে বলত "ভারি বোকা, মুখ্যুর একশেষ," শেষে উপসংহারে বল্ত "অত ভালমানুষ হলে কি আর সংসারে থাকা চলে?" তাই শুনে আমিও তাকে বল্তাম "তুমি ভারি বোকা মানুষ, আমি তোমায় যা বলি না কেন, সে আমি সইতে পারি, কিন্তু আর পাঁচজনে তোমায় যে বোকা ব'লবে, এ আমি সইতে পারি নে। কেন তুমি বোকা হলে?" সে একগাল হেসে বলত "ওগো বোকা যে আমার আশীর্ব্বাদ, আর "ভাল মানুষ"?—তা আর হতে পাল্লাম কৈ, হলে ত ধন্য হয়ে যেতাম। যে সরল সাদাসিধে হয় তাকেই বলে বোকা, তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি এমনি বোকা থেকেই যেতে পারি।" আমার মনটা বড় কিন্তুতে ভোরে উঠ্ত, আমি ছোট—আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্ব্বো কি গো। সে বলত "আশীর্ব্বাদ মানে তোমরা যা বোঝ তা নয়; আশীর্ব্বাদ হচ্ছে ভগবানের কাছে কারুর জন্যে কিছু প্রার্থনা করা। তুমি আমার জন্যে তাঁর কাছে সকল সময়েই প্রার্থনা কর্ত্তে পার; আমি যে তোমার চিরজীবনের একজন বন্ধু।" এমনি করে সে আমায় কত কথা যেমন বুঝতাম তার অনুরূপ মার্জ্জন করে দিয়েছে, যাতে আমার প্রাণের সমস্ত অন্ধকার কমে গিয়ে একটু একটু আলো এসেছে। সে যে আমার আলো—সুর ভরা আলো, গন্ধ ভরা আলো, গান ভরা আলো। সে আছে তাই আমি বেঁচে আছি,

সে যেদিন থাক্‌বে না, না—না, সে আমি ভাবতে পারিনে! আমায় বলেছে তার কোলেই মাথা রেখে মর্ত্তে পার্ব্ব, এ সৌভাগ্য আমার আছেই। আমার শেষ নিশ্বাস বাতাসে মিশে যাবার আগেই, সে আমায় চুমো দিয়ে তার বুকের মাঝখানে লুকিয়ে রাখবে!……

……মণি! মণি! উস্‌খুস্‌ কচ্ছিস্‌ কেন মা? আর একটু ঘুমিয়ে নে, ভোর হোল বলে। তোকে সে এখনও দেখেনি, তবু আমায় বলেছিল—"তাকে এখনও আমি চোখে দেখিনি বটে, হলেও আমি দেখ্‌তে পাই। আজ যদি আমি অন্ধ হয়েও বাড়ী ফিরি, অন্ধই বা কেন, তাঁর সঙ্গে কানের মাথা খেয়েও যদি যাই, তাহলেও আমি তার কথা শুন্‌তে পাব, তাকে দেখ্‌তে পাব। সে যে আমার নিভৃত অন্তরের মানসী প্রতিমা, গোপন প্রাণের পুঞ্জীভূত আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্তিময়ী সমষ্টি। বাইরের দিক দিয়ে তার 'যা কিছুকে' ভোগ কর্ত্তে পার্চ্ছিনে বটে কিন্তু মর্ম্মে মর্ম্মে বেশ উপভোগ করে নিচ্ছি।"

……শুনেছি স্বর্গে নাকি ইন্দ্রের সভায় কিন্নরী বলে একদল গায়িকা আছেন, তাঁদের গান এমনি মধুর, মানুষ ত কোন্‌ ছার, দেবতাদেরও পাগল হতে হয়। তা হোক, আমার খুকির গান—তার সে অবোধ্য ভাষায় যখন ঐ কচি কচি হাতগুলি নেড়ে নেড়ে মুখে এক গাল হাসি নিয়ে গান গায়, তখন যে আমাদের বাড়ীখানা গানে গানে একেবারে গানময় হয়ে যায়, শত বীণার ঝঙ্কারকে লজ্জা দিয়ে সবাইকে পাগল ক'রে তোলে; একটা সুখের শিহরণের সঙ্গে একটা বেদনার ঘাত-প্রতিঘাত এসে রৌদ্র-বৃষ্টির দিনের মত কি এক অভাবনীয় ভাবের সৃষ্টি করে সেটা আমি ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারিনে, বোধ হয় মস্ত বোঝার মত যেমন ভারি, তেমনিই আবার সুকোমল সহনীয়। সে যদি আজ আমার পাশে দাঁড়িয়ে একবার খুকির দিকে হাসি-ভরা মুখে চেয়ে তার কচি গলার গানগুলো শুন্‌তো তাহলে ঐ গানই আমার প্রাণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে একটা স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি করে দিত; কিন্তু সে আর হল কৈ!"……

……জিনিষকে ভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিমাণটা জানবার আকাঙ্খা মানুষের খুব বেশী হয়। চাঁদকে যখন ভোগ করি তখনই মনে হয় জ্যোচ্ছনাটা কোন, আর একটু বেশী হলে বেশ দেখ্‌তে হত। সে কত বড়, যদি একটু কাছে আস্‌ত তাহলে তাকে খুব বড় করে দেখতে পেতাম। 'তাকে'ও মাপ্‌তে ইচ্ছে করে, তার 'তুমি'টা যে কত মিষ্টি, এমন একটা মাপকাঠি পাই না যে, মেপে তার পরিমাণটা ঠিক করি। সবাই কত আমায় তুমি বলে ত ডাকে, সেও আমায় তুমি বলে ডাকে, কিন্তু তার 'তুমি'র মাঝখানে কতখানি যে আত্মদান ছিল তা আমি ঠিক বুঝতে পারিনে। কেবলি মনে হয় সে যেমন করে আমায় দিয়েছে আমার তেমন করে কিছুই দেওয়া হয়নি। আর দেবই বা কি, ভগবান আমায় দিয়েছেনই বা কি! এবার মনে ভগবানের কাছে এমন জিনিস চেয়ে নেব, যেন ফিরে এসে তাকে কিছু দিয়ে একটু তৃপ্তি পাই। সে যে বলে "দেওয়াই বড় আনন্দ নেওয়াটা তেমন নয়," এবারকার এ যাত্রায় সে আনন্দটা ভোগ করা হল না!……

……খুকু! খুকু! আর একটু ঘুমিয়ে নে মা, আর একটু পরেই সে আস্‌বে; এসে তোকেই যে আগে বুকে করে নেবে। সে আমায় লিখেছিল মায়ের স্নেহ জীবনে সে পায়নি, তাই সেই মা-ই এই এত দুঃখের মাঝে সকল বেদন মুছিয়ে দিতে মেয়ে হয়ে ছুটে এসেছে। এত অভাব, এত কষ্টের মাঝেও তোকে পেয়ে সে যে কত সুখী তা আমি জানি,—তবু সে তোকে দেখেনি। যখন তোকে সে বুকে করে নেবে, তোর গোলাপ-রাঙা মুখে একটু সুখের স্পর্শ দেবে, তখন তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে কি একটা আনন্দের আলোই না ফুটে উঠ্‌বে। কখন আমি দেখ্‌ব, তার ধন তার বুকে তুলে দিয়ে কখন একটু পায়ের ধুলো মাথায় করে নেব? আনন্দেও কি

যাতনা আসে? কতদিন বাদে তাকে দেখ্‌ব, তার ব্যবধানে কেমন করে তকে চিনেছি সেই চোখে দেখ্‌ব, কোথায় আনন্দে ফুলে ফুলে উঠ্‌ব, তা না হয়ে একি বিষম যাতনা! একটু পরে কি চোখে যে দেখ্‌ব তা আমিই বুঝতে পাচ্ছিনে। হয়ত সে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে, নয়ত আনন্দে আপ্লুত হয়ে আমারি বুকে লুটিয়ে পড়্‌বে। যা হয় হোক, আমি আর ভাব্‌তে পারি নে।.. ...

হাজারও মনে করি ভাব্‌ব না, তবু সেই ভাবনাই বেশী করে আমায় জড়িয়ে ধরে, একি বিষম জ্বালা হল!... ...একটু একটু আলো নেমে আস্‌ছে, গ্রামের পথখানি বেশ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠ্‌ছে, গাছের কোল দিয়ে দিয়ে মাঠের বুকে এঁকে বেঁকে পথখানি গ্রাম হতে গ্রামান্তরে চলে গিয়েছে— নদীর বাঁকে; সেইখানে সে নাম্‌বে, নেমেই দৌড়ুবে। আমার হাসি আস্‌ছে কিন্তু!......

সেদিন হতভাগী ডাইনি মুনি বল্‌ছিল "তোদের বেশ ভাই ভালবাসা, যেমনি তোর অসুখ শুনেছে অমনি ছুটে আস্‌ছে। আমাদের হলে দায় পড়েছে তার, কেঁদেছে তার প্রাণটা, কালিঘাটে জোড়া পাঁটা মেনে মরণ কামনা করে বসে থাকে। মলে পরে আবার বিয়ে কর্‌বে, নতুন বৌ পাবে, টাকা-কড়ি, আরও কত কি, আমি যে অলুক্ষণে স্ত্রী"। আরও বল্লে "সংসারে যে ভালবাসা না পেয়ে বেঁচে থাকে, তার যে কি কষ্ট তা তুই বুঝতে পার্‌বিনে, বুঝলে তোর দুঃখটাকে দুঃখু বলেই বোধ হত না।" আচ্ছা আমি দুঃখী কিসে?—এক অভাব তার, সেই অভাবেই আমায় পাগল করেছে।.....

... ...একটা কথা সে একদিন বলেছিল এখনও আমি সেটা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারিনি। সে বলে "নারীর কতকগুলো দিক আছে যা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব, আর কতকগুলো সে পুরুষের কাছ থেকে নেয়, এ তার নিতেই হবে। তেমনি পুরুষেরও অনেক নিজস্ব আছে, থাকলেও নারীর কাছে তার নেবারও অনেক। এই নেওয়া-দেওয়ার মধ্যে যদি উভয়ই তাদের নিজস্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আদান-প্রদান করে, আর এই আদান প্রদানে কোন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয় তা হলে তাদের ভালবাসা অটুট্‌।" সে বলে সব কথা আমি ঠিক গুছিয়ে বল্‌তে পারিনে শুধু একটু ইঙ্গিত কর্ত্তে পারি।" আচ্ছা, সে এত ক'য়ে, তার কথা যদি আগোছালই হয় তা হলে না জানি গুছোন কথা আবার কি রকমের! আমার বিশ্বাস হয় না; এটা তার বিনয়ের একটুখানি।......

.....আজকের মুহূর্ত্তগুলো যেন এক একটা বছর। কাট্‌তে আর চাইছে না। কেবলই অতীত দিনের ঘটনা সকল ছবির মত হয়ে চোখের ওপর ভেসে ভেসে উঠ্‌ছে বুকের মাঝে একটা চিন্তাই জাগিয়ে তুল্‌ছে। তার হাসিটুকু, তার কথা বলার ভঙ্গিগুলো, আমাকে পেয়ে তার গর্ব্ব ভরা বুকখানা, মনের কোণে কেবলই উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। এমনি সে আমায় করেছে যে, জীবন থেকে আর সবারই কথা মুছে ফেলে শুধু তার কথাই জাগিয়ে রেখেছি। গানের সুরের মত হয়ে, ফুলের গন্ধের মত হয়ে, চাঁদের হাসির মত হয়ে আমায় সে ঘিরে আছে। ভগবানকে ভাব্‌তে গেলে সেই মুখখানিই বর-দাতার বেশে "নাও নাও" বলে বুকের মাঝে ফুটে ওঠে, আর তাঁকে ডাকা হয় না। সংসারের কাজে নিজেকে যদি ডুবিয়ে দিতে যাই তাহলে তার মাঝেই ডুবে মরি, কাজে হয়ে পড়ে কেবল ভুল আর লাভ হয় শুধু বকুনী। হতচ্ছাড়ীরা বলে "তোর হয়েছে কি, তুই কি পাগল হবি?" তারা ত জানে না কেমন করে পেয়ে, কেমন করে তাকে না দেখে বেঁচে আছি; জান্‌লে আর বল্‌ত না।......

... ...মা বলেন "খুকি ঠিক তার মতই হয়েছে। ছোট বয়সে সে যেমনটি ছিল, সেই রকম ওর মুখখানি, তেমনি হাসবার আগেই ফুলে ওঠা, তেমনি নাকটি, তেমনি চোখ দুটি। ভাল কথা ফোটেনি তাই আ—আ করে কত গান, বড় হলে বাপের মতন গান শিখবে।" তাকে যেমন সবাই

ভালবাসে আমার খুকিকেও যে দেখে সেই ভালবেসে ফ্যালে। সবাই বলে খুকির হাসিটুকু বড় মিষ্টি।......

......তার মুখে শুনেছি রামপুরে মামার বাড়ী সে একবার একটানা কয়েক মাস ছিল, সেখানে এক বালবিধবা নাকি তাকে খুব ভালবেসে ফেলেছিল। হতভাগী ছিল খুব সুন্দরী—হাতের সোণার চুরি তার গায়ের রংয়ে লজ্জা পেত, মাথার চুল পায়ে ধরে চুমো খেত। বিধবা সে, আল্‌তা ত তার পরতে নেই—কিন্তু চল্‌তে গেলেই আল্‌তাকে হার মানিয়ে পা দুখানি লাল হয়ে উঠত—এমনি ছিল সে। পোড়ারমুখী তাকে দেখবার জন্যে পথের ধারের জানালাটী খুলে চুপ্ করে দাঁড়িয়ে থাকত কখন সে সেই পথে যাবে। নীরব ভাষায় কত কথাই না সে চোখের কোণে জানিয়েছে। কিন্তু সে তাকে কোনদিন ভালবাস্‌তে পারেনি, সে বলে "তার অভিসম্পাত বুঝি আমার জীবনটাকে এমনি করে বেদনাময় করে দিয়েছে। তার প্রেমের নিষ্ফলতার পৈশাচিকী মূর্ত্তির রুদ্র চক্ষু এখনও আমি দেখ্‌তে পাই।" আমারও ঠিক ঐ রমকই একটা ঘটনা ঘটেছিল। হতভাগা "গোগা" ছোঁড়াটা আমায় বিয়ে কর্ত্তে চেয়েছিল। লজ্জার মাথায় ঝাড়ু মেরে আমায় বলেওছিল "আমি তোমায় খুব ভালবাসি, লক্ষ্মি আমার, সোনা আমার, মালা গাছটা আমারি গলায় দিও। আমি তোমায় কত গয়না দেব, কেমন ভাল ভাল কাপড় জামা দেব, আরও কত কি দেব, যা চাইবে তাই দেব।" তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, গয়না কাপড়ের ঝোঁকও ছিল খুব, ঠিক তবু ত' তাকে একটুও মনে ধরেনি। তাকে আমি কোনও দিন দেখ্‌তে পারিনি, যেমনি চেহারা তেমনি গুণ। তার ওপর গোড়া থেকেই কেমন একটা ঘৃণা ছিল। সেকি একটা মানুষ? না—সে পশুরও অধম! তার জীবন কেমন ধারায় চলেছে ভাবলেও শিউরে উঠ্‌তে হয়। ছি—ছি! আত্মীয়-স্বজনের পরিচয়ের অযোগ্য হয়ে সে বেঁচে আছে, দেশেরও কলঙ্ক সে।

......বর্ষার জলধারা পৃথিবীকে ধুয়ে মুছে নবীন সাজে সাজিয়ে মধুর সৌন্দর্য্য দিয়ে যেমন ভরিয়ে দেয়, তেমনি সে আমায় যা কিছু ভুল-ভ্রান্তি ভেঙ্গে দিয়ে মাধুর্য্যে মণ্ডিত করে নতুন ভাবের প্রতিষ্ঠা করেছে—নিজেকে আমায় দিয়ে; সে যে একটা উপমা। তাঁর এক একখানা চিঠি আমার কাছে এক অভিনব ঐশ্বর্য্য। প্রতিবারই নতুন কথায় নতুন ভাবে গড়া। সে যে আমায় দিনের পর দিন নতুন করে দেখে, নতুন করে ভাবে। সে একবার লিখেছিল "ওগো আমার চিরজীবনের বন্ধু! তুমি আমার মুখের হাসি, প্রাণের আলো, হাতের বাঁশী। তুমি দূরে তাই এগুলো সব নিভে গিয়েছে, তারা যখন তোমার ছোঁয়া পাবে আবার সবাই জেগে উঠ্‌বে। কবে কোন্ ভোরের আলো সেই শুভ দিনের সূচনা ক'রে ফুটবে—যে দিন আমার গায়ে তোমার ছোঁয়াচ এসে লাগ্‌বে, আমার সকল বেদন পুলক হয়ে ছুটবে, সকল কান্না গান হয়ে ফুটবে।"...আর একবার লিখেছিল "ওগো জন্মজন্মান্তরের সাথী! তুমি আমার কে জান? তুমি আমার চোখের দৃষ্টি, হৃদয়ের আশা, প্রাণের বিশ্বাস। তুমি আমার চির নবীন মূর্ত্তিময়ী সুষমা, অতীতের বর্ত্তমানের, ভবিষ্যতের খেলার সাথী। এ জীবনের খেলাটা তেমন ক'রে হলনা বলে দুঃখ ক'রো না, এর পরে এমন জীবন পাব, যেখানে তোমায় আমায় একতিল ছাড়াছাড়ি হবে না, একটু বেদনা একটু কালিমা থাক্‌বে না, শুধু একটা হাসি ও আনন্দ-উৎসবের বাঁশীর গান বুকে করে চির নবীন হয়ে ফুটে থাকবে।"...তার এই সমস্ত কথা গুলো তেমন বুঝতে না পারলেও বড্ড মিষ্টি লাগে, যেন শিরায় শিরায় একটা পুলক-স্রোত অনুপ্রাণিত হয়ে ছুটতে থাকে; যে-টুকু বা বুঝি সেটুকুও কাউকে কিন্তু বোঝাতে পারিনে।......

......মেঘ করেছে বুঝি? তাই আলো আর ফুট্‌তে পাচ্ছে না! জলের গুঁড়ো গুলো হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসছে না? না, ও ঠাণ্ডা হাওয়া পাখীদের ডাকাডাকি শুন্‌তে পাচ্ছি না ত, এখনও তবে ভোর হয় নি, তাই হবে।......তাকে দূরে পাঠিয়ে, তার প্রতিদিনের চলাটুকু, প্রতিদিনের কথাগুলো, প্রতি পলের নিশ্বাস টুকু পর্য্যন্ত আমার মনের মাঝে ভেসে বেড়াচ্ছে। তাকে ভাব্‌বনা ভাব্‌লেও আপনা আপনি তারই কথা বুকের ভেতর ছুটোছুটি করে মরে, পৃথিবীর হাসি-গান আলো-রূপ কিছুই আর ভোগ কর্ত্তে পাইনে, তার কথাগুলোই গান হয়ে আমার কানের কাছে ঘুড়ে বেড়ায়, অন্য গান আর কানে পশে না; তার হাসি-গুলোই বুকের ভেতরে কেবলই কোলাহল তোলে, অন্য সব শব্দকে ডুবিয়ে দেয়, আর কিছু শোনা হয় না। দেখ্‌তে গেলে চোখের ওপর তাকেই দেখতে পাই, সকল দেখা আব্‌ডাল্ করে সে দাঁড়িয়ে আছে। শুনেছি প্রেমের দুঃখটাও বড় মধুর, তা কিন্তু খুবই সত্যি। তাকে দূরে রেখে এই যে এত যন্ত্রণা তবু এর মাঝে একটু মাধুর্য্য একটু গর্ব্ব আছে বই কি, না হলে আমি বাঁচতেই পার্‌তাম না যে।......

......খুকু! খুকু! চোখ মেলেছ মা? ঐ শোন পাখীরা তোমায় ডাক্‌ছে, তোমার কথাও যেমন কিচির মিচির ওদেরও তেমনি। তুমি ওদের সঙ্গে কথা কয়ে কিছু বল? মণি আমার তোতাপাখী, সব বল্‌তে যায় কিছুই বল্‌তে পারে না। তোর সব কথা ফুটবে, সে আসুক একদিনে তোর কথা ফুটিয়ে দেবে, সে যে বোবার শত্রু।......

... চারিদিকে আলো ফুটে উঠ্‌ছে, গানমাখা গন্ধমাখা হাওয়াতে ঘরদুয়োর সব ভোরে যাচ্ছে! মাগো পাখীগুলো কি মাতামাতিই না আরম্ভ করেছে! আমার বুকের ভেতরেও যেন কি একটা রঙ্গিন আলো ধীরে ধীরে ভেসে আস্‌ছে। এখনি তার মুখের স্পর্শ এসে আমায় অমৃতে পূর্ণ করে দেবে।...ঐ তার গাড়ীর শব্দ আস্‌ছে, না? মা, মা, এখনও ঘুমুচ্ছো! চেয়ে দেখ, অনেকক্ষণ সকাল হয়েছে।...... আমার বুকটা এত কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে কেন? আমি যে আর সহ্য কর্ত্তে পাচ্ছিনে! মা, মা, শীগ্‌গীর আমায় চেপে ধর, আমার প্রাণটা কেমন কচ্ছে; আর বুঝি তার সঙ্গে দেখা হল' না! মা—মা।

(শেষ)

অপেক্ষায়

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

অপার তোমার করুণা দেবতা
　　বরষিছ এই দীন'পর।
তোমারে কবে যে পূজিতে শিখিব,
　　কবে করে নেবে অনুচর!
　　কবে ও তোমার রাঙ্গা শ্রীচরণ
　　এই ভাঙ্গা বুকে করিব ধারণ,
　　কবে তব দয়া দিয়া ভরি নিব
　　শূন্য আমার অন্তর।

সে দিন আমার সুমুখে ধরণী
　　কুসুমে ভরিয়া উঠিবে গো,
মৃদু সমীরণ মধুর হইয়া
　　সুখে চৌদিকে ছুটিবে গো!
　　ফলফুলে আর সবুজ লতায়
　　প্রাণ খেলে যাবে কি নবীনতায়!
　　সবার মাঝারে হেরিব বিরাজে
　　নিখিল-ভুবন-মনোহর!

শোক-গাথা

আসাম গৌরীপুরের শ্রদ্ধেয়া রাণীমাতার স্বর্গগমন উপলক্ষে

শ্রীদুর্গাপুরী দেবী বি, এ, ব্যাকরণতীর্থা।

সেই এক অজ্ঞাত সন্ধ্যায় মাঙ্গলিক শঙ্খঘণ্টা ধ্বনির সাথে দীন পরিচ্ছদে মূর্ত্তিমতী শান্তিময়ী সন্ধ্যাদেবীর মত ব্রহ্মচারিণীদের নির্জ্জন তপঃ কুটীরে কে তুমি রাজরাণী এসেছিলে! চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের আশ্রমের সন্ধ্যা সঙ্গীতের মাঝে উপস্থিত হ'য়ে বলেছিলে—"কি সুন্দর কি পবিত্র ভাব।"

আজো মনে পড়ে সেই আধ গেরুয়া রঙের চাদরখানি দিয়ে আবৃত দেহখানি—উজ্জ্বল, অথচ শান্ত মধুর দেবী মূর্ত্তি! মনে হচ্ছিল যেন কোন যোগিনী তপস্যার মূর্ত্তিমতী সতী ভোলানাথের প্রেয়সী! সন্ধ্যাদীপ আরতির পরে কত কথা, কত আলোচনা! ধর্ম্মতত্ত্ব! সমাজতত্ত্ব! পূজনীয়া মাতাজী যখন বুকে টেনে নিয়ে বল্লেন—মা আমার কৈলাসের উমা। তখনও জানি নাই, বুঝি নাই, ঐশ্বর্য্যের মাঝে পালিতা রাজার গৃহিণী! রাজমাতা! কই ঐশ্বর্য্য তো তোমার অনু পরমাণু ছুঁতে পারেনি তোমার করুণাপ্লুত হৃদয়খানি উচ্চচিন্তার খনি ছিল যে, তাই যখন সেই দুই ঘণ্টার আলাপেই প্রাণটা ভরে উঠেছিল তখন বলেছিলাম "মাতৃজাতির জন্য খাটতে হবে" তুমিও প্রাণভরা অসীম উদ্যমের সহিত হাসিমুখে বলেছিলে—"তারই জন্যই তো খুঁজে খুঁজে এসেছি দিদি!" ওগো দিদি আমার! সেই কোন মুহূর্ত্তে রাজরাণী ঐ সন্ন্যাসিনী বন্ধনহীন মুক্তি পথের যাত্রীকে স্নেহের বাঁধনে বেঁধেছিলে! যাবার সময় ঠিকানা চাওয়াতে বলেছিলে "শুধু দেশের নাম?" "শুধু দেশের নাম বল্লে যাবে কি চিঠি?" "হাঁ", এই সময় একটী তোমার পার্শ্ববর্ত্তিনী সহচারিণী বৃদ্ধা বল্লেন—"রাজবাটী কিনা।" তখন বুঝলাম তুমি রাজার অর্দ্ধাঙ্গিনী একটী নারী রত্ন! যাবার সময় বলে গেলে যে আসি তবে দিদি, মনে রাখবেন সেইখানেই যে ভগ্নিত্বের বন্ধুত্বের প্রীতিডোরে বাঁধা পড়লুম।

তার পর বিগত চতুর্দ্দশ বৎসর কত আলাপ, কত আসা যাওয়া! কত প্রীতিবন্ধন! কত ঘুরেছি, কত দেখেছি! দিদি দেবী আমার! তোমার মত ঐশ্বর্য্যের মাঝে ত্যাগের মূর্ত্তি—ভোগ লালসার বিলাস স্পর্শবিহীন আধ্যাত্মিক চিন্তায় বিভোর আদর্শ সনাতন আর্য্যভাবে প্লাবিত শিরা উপশিরা, এমনটী তো আর দেখিলাম না! কতদিন গেছি—দেখি সেই গার্হস্থ্যাশ্রমে ত্যাগের বার্ত্তা! কন্যা বৌমা এঁদের ত্যাগের বার্ত্তা বুঝাচ্ছ! শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠেছে! কত বলেছি—আমি কি শিখাব দিদি! শিখবার বহু জিনিষ তোমার কাছে আছে!

রাজর্ষির অন্তঃপুরবাসিনী তুমি, শিক্ষা দীক্ষা তোমার কোন স্বর্গীয় আভায় দীপ্ত ছিলো! কত শিক্ষিতার সহিত মিলিত হলুম এমন উচ্চধারার চিন্তা দেখি নাই—ওগো আর দেখি নাই! আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল না তোমার! শুধু করুণায় পূর্ণ ছিল অন্তরটী, দরিদ্রের বেদনায় অশ্রু নীরবে ঝরত। আর্ত্ত দুঃখী আশ্রয় পেত! উচ্চনীচ ভাব ছিল না, তোমার বুঝি সবাই স্নেহের পুতুল, প্রাণের ধন! এত স্নেহ এত ভালবাসা একত্র জমাট কোথায়! যার অন্তরের অমৃতে পথের অন্ধ ভিক্ষুকও সান্ত্বনা পেত!

সোনার সংসার! সীমন্তিনী তুমি! সধবার উজ্জ্বলশ্রী সতীত্বের গরিমায় যেন কুঙ্কুমরাগরঞ্জিত!

অগাধ শ্রদ্ধা, পতিকে দেবতাজ্ঞানে নীরব আরাধনা পুত্রদের আদর্শ জননী কুলের গৌরব! দয়া বিগলিত হৃদয় তোমার ক'ত তাপিত হৃত অনাথের আশ্রয় ছিলো! তুমি কেন আজ নিজ শিশুদের কাঁদায়ে, স্বামীদেবতার সেবা পরিত্যাগ করে, অনাথদের নিরাশ্রয় করে লুকালে!

তোমার প্রাণের ধন, খোকারা, স্নেহের পুতলী কুমারীরা, আদরের ধন বৌমা তাদের মাতৃহীন করে আজ কোথা লুকালে! তোমার দেবতাকে কে আজ সান্ত্বনা দেবে? সেই ত তোমার সেই—সেই দিনকার আশ্বাস বাণী আশার বাণী "আমি তো আপনাদেরই দিদি।" আজ রুদ্ধ অশ্রু বাঁধ না মেনে আপনিই ঝরছে, এ কার উদ্দেশে! আজ এলো মেলো হয়ে তোমার স্মৃতিগুলা যে বিঁধেছে। একবার বল দিদি, কেন অকালে এম্নি করে ফাঁকি দিয়ে পালালে? তাই অজ্ঞাত আশঙ্কায় বল্‌তে— "আর যদি না দেখা হয় দিদি?"

তোমার আশীর্ব্বাদ প্রতি হিন্দু সধবা মেয়ের শিরে ঝরুক, তোমার দীপ্ত আদর্শ যেন তারা অন্তরে অন্তরে অনুভব করতে পারে। আর তোমার ঐ উজ্জ্বল গৌরবময় স্মৃতি তোমার স্বামী দেবতার একমাত্র সান্ত্বনা হোক্, তোমার সন্তান সন্ততির একমাত্র শান্তি তুমি তাদের মা, কোন্ 'অমরা'র দেবী তাদের গর্ভধারিণী জননী!

খাপছাড়া দুই পথের পথিক আমরা দুইজনা। তবু এ মিলন, এ বাঁধন কেন হ'ল দিদি তোমার সাথে আমার! যে স্নেহের বাঁধনে আজ নয়নের জল ঝরছে! সেই অসীম গভীর স্নেহের অদম্য শক্তিতে আর একদিন দেখা হবে আমাদের, যেখান থেকে আর ছাড়াছাড়ি নেই। সেই স্থানের প্রভু বংশীধারী শ্যামসুন্দর যাঁকে আশৈশবে তুমি ডেকে এসেছ, তারি স্নিগ্ধ স্নেহচ্ছায়ে আমাদের মিলন আবার হবে; যেখানে আর বিচ্ছেদ নেই, সেই রাধাসুন্দর আজ তোমার স্বামী, কুমার ও কুমারীর প্রাণে শান্তি দিন।

তোমার বেদনাহতা দিদি।

অদ্ভুত মেয়ে

(গল্প)

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ।

শীতের দিনের বেলা, ঘর হইতে বাহির হয় কাহার সাধ্য, বাতাস বেশ হু হু করিয়া বহিতেছিল। উত্তরদিকের চটকলের স্তুপীকৃত ধোঁয়া অভাগা দক্ষিণদেশবাসীদের একটু রেহাই দিতেছিল না। বৈকালের দিকে মেঘ একটু খোলসা করিতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। বস্তির তাড়িখানাটার গাছতলার দিকে দেখি কতকগুলো লোক সারি দিয়া দাড়াইয়া জটলা পাকাইতেছে। ভাবিলাম, নিশ্চয় কিছু একটা ব্যাপার ঘটিয়াছে, ও সব স্থানে ব্যাপারের ত আর অভাব নাই; একটা না একটা কাণ্ড প্রায়ই ঘটিতেছে। সেদিন শোনা গেল চটকলের এক কুলী তাড়ি খাইয়া তাহার সঙ্গের বন্ধুটির মাথায় কসিয়া এক লাঠি বসাইয়া দিয়াছে, বন্ধুটির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন এবং তাড়ি-রসিক এখন শ্রীঘরে মজা লুটিতেছে।

আমি পাশ কাটাইয়াই যাইতেছিলাম, কিন্তু

স্থানীয় একজন হঠাৎ নবাবজাদার কঠোর কণ্ঠস্বরে কেমন আমাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। আমি ঘটনা স্থানটির কিছু দূরে দাঁড়াইয়া গেলাম।

রতন কাহাকে যেন কঠোর কণ্ঠে বলিতেছিল, "ব্যাটা পাজি নচ্ছার গতর খাটিয়ে খাবার মুরোদ নেই গাছ তলায় এসে আড্ডা গাড়া হয়েছে!"

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া রতন পরুষ তিরস্কার করিতেছিল তাহার কোন কথা শুনিতে পাইলাম না যদিও, কিন্তু রতন নামে নব্য যুবকটির জীবনের ইতিহাস আমি জানিতাম। তাহার মা, ভগ্নীর উপার্জ্জনেই যে আজ তাহার পায়ে পাম-সু, গলায় সোনার হার এবং সারা গায়ে দামী পোষাক ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে তাহা আমি জানিতাম।

সকলেই তাহার বাবুয়ানার খবর রাখিত, চক্ষু লজ্জায় ফুটিয়া কিন্তু বলিতে ইচ্ছা করিত না—এই যা মাত্র সাধারণের অপরাধ।

আমি একটু অসহিষ্ণু হইয়াই বলিলাম, "গাছ তলায় যে স্থান নিয়েছে তার সম্বন্ধে বাদানুবাদ তোমার শোভা পায় না। শোচনীয় অবস্থায় না পড়লে কেউ কি এই বৃক্ষতল আশ্রয় করে? কিছু যদি দিয়ে তাকে অনুগ্রহ করো সে ভাল, তিরস্কার করবার কোন অধিকার তোমার নেই।"

অনেকেই কথাটা অনুমোদন করিল; কিন্তু নব্য যুবক রতন কিছুতেই ইহা বরদাস্ত করিতে পারিল না। স্থানীয় ম্যাট্রিক-স্কুলে বুঝি সে সেকেণ্ড ক্লাস অবধি পড়িয়াছিল, সেইজন্য জ্ঞান তাহার কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় হইয়াছিল। তাহার উপর বিলাতী উৎকট এসেন্স মাখিয়া রাস্তায় বাহির হইত। উচ্ছিষ্টভোজী অসভ্য স্তাবকও দু' একটা পেছনে জুটিয়াছিল। তাহার নাগাল পায় কে? তাহার নিজস্ব গরম ইংরাজীতেই বলিল, "Mobs must die, when they are idle."

আমি বাঙ্গলাতেই জবাব দিলাম। বলিলাম, "স্বীকার করা গেল না হয় ওই দোষী, কিন্তু তোমার নিজের দিকে তাকিয়ে তুমিই বলো দেখি, এতখানি যে তোমার বয়স হ'লো নিজের জীবিকার জন্য কতটুকু খেটেছ? দেখ, মুখে বলা সহজ। ও আজ কর্ম্ম বিপাকে গাছ তলাতেই না হয় এসে পড়েছে, তাই বলে ওকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবার কোন অধিকার তোমার আমার কারো নেই। এই যে ওর দুর্গতি এর মধ্যে ওর একলার হাত নিশ্চয়ই ছিল না। আশে পাশের মানুষই ওকে এমন অবস্থায় এনে ফেলেছে। আমি বিশ্বাস করি সমস্ত মানবজাতিকে এর ফল ভোগ করতে হবে।"

আমার কথায় দেখিলাম, লোকটা গাছতলায় একধারে ছিল, উঠিয়া বসিল। একটা ভাঙ্গা মালসায় ভাত সিদ্ধ হইতেছিল। তাহা হইতে অল্প ধরা গন্ধও বাহির হইতেছিল, ভাত গুলোকে নামাইয়া আমার দিকে স্থির অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। দৈন্যের এমন মূর্ত্তিমান মূর্ত্তি আর কখনো দেখি নাই। পরিধানে মাত্র কৌপীন, শীতের দিনে গায়ে ঢাকা দিবার কিছু নাই, কোথায় বুঝি এক খানা ছ্যাঁড়া চট্ পাইয়াছিল তাহাই সর্ব্বাঙ্গে ঢাকা দিয়াছে, কিন্তু থলিটার বড় বড় ছিদ্র পথে শীত বাতাস একটুও রেহাই দিতেছে না। গায়ে ষোল আনা ঢাকা পড়িতেছিল না। তবু ঐ ছোট চট তাহাই ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল। মাথার, মুখের চুলগুলো একেবারে উস্কো খুস্কো কোনদিন যে যে তাহাতে একবিন্দু তৈল পড়িয়াছে তাহা শপথ করিয়াও কেহ বলিতে পারে না।

আমি তাহার কোথায় বাড়ী জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, কিন্তু সে কোন উত্তর করিতে পারিল না। স্তম্ভিতের ন্যায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

রতন অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "বুঝতে পাচ্ছেন না, ব্যাটা এখন সাধু সাজবার মতলবে আছে! আরে বাবা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজত্বে ও' কি অন্ন সহজে হয়, চাইছে দেখ মিট্ মিট্ করে —শয়তান!"

আমি পাম্প-সু ওয়ালা রতনকে বলিলাম, "এত

লোক থাকতে তোমার ওর পরে এতটা রাগ কেন বল দেখি? তোমরা এখন নব্য যুবক, সমস্ত মানুষকে ভালবাসতে শিখবে, তা নয় এখন হতে এতটা বিরূপতা নিয়ে সংসারে নামা ত ঠিক নয়।"

সে মাথা নাড়িয়া টেরি দোলাইয়া তেমনি অসহিষ্ণুর স্বরে বলিয়া উঠিল, "ওরকম লক্ষ্মীছাড়া মানুষকে চিরকাল আমরা ঘৃণার চক্ষে দেখবই, কারণ ওরা হচ্চে সৃষ্টিকর্ত্তার আবর্জ্জনা! সমাজের দুষ্ট ক্ষত!"

সত্যই তাই বটে!...

ঠিক এই সময়ে তাহারই মত অবস্থার একটি স্ত্রীলোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বয়স তাহার ত্রিশ হইতে ষাট যেটা খুসি কল্পনা করা যাইতে পারে। পরণে তাহার যতদূর ময়লা হইতে হয় একখানা কাপড়, তাহাতে একটা দুর্গন্ধও বাহির হইতেছে। কিন্তু চোখে মুখে তাহার তেজস্বিতা আছে,—'কারও তোয়াক্কা রাখি না' এমনিতর এক ভাব। চাহিলেই মনে হয় এ নারী ঠিক কালে খর্পরধারিণী ছিল, এখন পথ ভুলিয়া সংসারের হাসি-কান্নার মধ্যে সুর গলাইয়া দিয়াছে।

বাঁ হাতে একটা খেলো হুকা ছিল, ডান হাতে একগাছা সদ্যভগ্ন কলিকাফুলের ডাল লইয়া শূন্যে আস্ফালন করিতেছিল।

রতনের দিকে চাহিয়া কুকর্কশ কণ্ঠে বলিল, "ওকে এত শত কি বলছিস বল্ দেখি?"—বলিয়াই হুকাটা মূর্ত্তিমান্ দৈন্যের হাতে দিয়া দিল।

রতনও ঐ বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া একটু ভয় পাইয়া গেল, ভয় পাইবারই কথা। কিন্তু উপস্থিত এত লোকের মাঝখানে ভয় পাওয়াও তার পক্ষে লজ্জা, বিশেষ সে আজ স্থানীয় একজন কেষ্ট-বিষ্টুর মধ্যে। তাহার মায়ের অনেক টাকার কথা প্রবাদের মত রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। স্বরটা যথাসম্ভব চড়া করিয়া বলিল, "কেন হ'য়েছে কি তাতে? চোর ডাকাতকে চোর বলবো না, সাধু পুরুষ ব'লে চরণামৃত নেবো? ওরে ভজা শোন্ একবার—"

চোখা কথায় তাহার মোসাহেব ভজা ওরফে ভজন তখন ভারি খুসী হইয়া উঠিল। ভাবিল ভাগ্যবান্ রতনবাবু এইবার উচিতমত লেকচার দিয়া তবে ছাড়িবে।

খর্পরধারিণী হাতের কাঁচা ডালটা আর একবার ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল, "খবরদার বলছি রত্না, মুখ সামলে কথা কোস্। যদি কেউ ওর মহা সর্ব্বনাশ ক'রে থাকে তবে তোরই মা বোন, আর কেউ নয়। ভেবেছিস তোর চেন ঘড়িতে সব ঢাকা থাকবে, কক্ষনো নয়!"

রতনের স্তাবক ভজন তখন রতনলালকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। বার বার তাহাকে বলিতে লাগিল, "কাজ নেই রতনবাবু ছোটলোক-দের সঙ্গে কথা কহায়, কি লাভ?"

কথায় কথায় হাটে হাঁড়ি যদি ভাঙ্গিয়া যায় এই ভয়টা তাহার রতন অপেক্ষাও বেশী ছিল।

অনেকেরই কিন্তু একান্ত ইচ্ছা কাহিনীটা এই স্ত্রীলোকটার কাছ হইতে শুনিতে পারিলে ভাল হয়। একটু যদি রতনের গর্ব্বটা কমে।

হতভাগ্য মূর্ত্তিমান দৈন্য মূর্ত্তিটাই কিন্তু রণভঙ্গ করিয়া বসিল।

খর্পরধারিণীকে ইঙ্গিতে কিরিমিরি করিয়া ভোজনেচ্ছা জানাইল।

একটা চটা উঠা কলায়ের ডিস ঝোপের মধ্য কোথা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রমণী তাহাতে ভাতগুলা ঢালিয়া দিল এবং পেট কাপড় হইতে হাটের কুড়ানো দুইটা শুকনা বেগুন স্বল্প প্রায় আগুনে ঝলসাইতে দিল।

মূর্ত্তিমান দৈন্যের কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, বেগুনটা যে কেমন করিয়া পুড়িবে এই ভাবনাতে সে সাগ্রহে তাহার দিকে চাহিয়া আছে এক একবার ব্যস্ত হইয়া ফুঁ পাড়িতেছে। সে বেশ জানে বেগুন পুড়িলে তবে খাইতে পাইবে, আর অন্য তরীতরকারীর কোন বালাই নাই। কোথা হইতে একটু নুন সংগ্রহ করা হইয়াছে, কাগজে

তাহা জড়ানো আছে, ঐ নুন আর ভাত - এই হইবে সারাদিনের পর উপাদেয় আহার। চাউলেও যে কাঁকর দিয়া পরিমাণ না বাড়ানো হইয়াছে, তাই বা কে বলিতে পারে? কিন্তু নিরন্নর ভারতবাসীর জন্য বিধিনির্দ্দিষ্ট এই-ই দৈনিক বরাদ্দ!

পাম্প-সু ওয়ালা রতনের স্তাবকটা রতনকে সেখান হইতে টানিয়া লইয়া গেল।

খেয়াঘাটের এক মুসলমান মাঝি অনেকক্ষণ হইতে সেখানে বসিয়া ছিল। সারা বৈকালটা তাড়ি টানিয়া তাহার চক্ষু দুইটা হইয়াছিল কুঁচের মত। এখন নেশা একটু কাটাতে স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলি হাঁগা মাসী, তুমি এই তৈলেঙ্গীটার সঙ্গে মিশেছ কত দিন? এর খবর তো তোমার ভালই জানা আছে!"

মাসীর স্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠ আরো বিকটতর হইয়া উঠিল; বলিল—"জানি ব'লেই ত বলছি-রে, শোনাচ্ছি সব দাঁড়া—" বলিয়া ভাত নুন আর খানিকটা আধপোড়া বেগুন হতভাগাটার দিকে আগাইয়া দিয়া তারপর পুকুর হইতে এক ভাঁড় জল আনিয়া রাখিয়া নিজে হুঁকা কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে বসিয়া গেল।

ঘাট-মাঝি তখন মাসীকে আর একবার চেতাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে বলিল—"তুমি যে শেষকালটায় এমনধারা এক ঘাটের মরার সঙ্গে ভিড়ে পড়বে, তা ভাবিনি, অনেকদিন তোমায় খেয়াঘাটে দেখিনি ব'লে মনে হ'য়েছিল বুঝি আর কোন দেশে চ'লে গেছ। তা বেশ মাসী, একটা পুরুষ নিয়ে থাকাই ভাল।"

মাসী মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল, "আর তোর পুরুষের মুখে আগুন! জন্মভোর যাকে চাইলুম, তাকে পেলুম কই?"

ঘাট-মাঝি সান্ত্বনা দিয়া বলিল—"আর মাসী, চ'টে উঠ্‌লে চলবে কেন? জন্মভোর যাকে চাইছো সে কি তোমায় ধরা দেবে না মনে করেছ? নিশ্চয় দেবে, দাঁড়াও সময় হোক।"

"আর তোর সময় হোক, জীবন গেল, যৌবন গেল, এখনও সবুর করতে বলিস্?"

ঘাট-মাঝি বলিল, "কেন এ তৈলেঙ্গী মেসো ত বেশ মিশ্‌মিশে বাবা, কাণে কেমন দুটো মাকড়ী রেখেছে! মাসী, তোমার মনের মানুষ ধরা না দিক, ও ত ধরা দিয়েছে, তোমার যদি এখন মনে না ধরে তা কি করবে বলো?—"

মাসী হাসিয়া বলিল,—"নারে সত্যি ধরা দিয়েছে, এমন হাল না হ'লে বুঝি এমন ধারা কেউ ধরা দিতে পারতো না। সত্যি আর আমার কোন দুঃখ নেই, এখন তোরা বল্ শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর ওপারে চলে যাই।"

ইতিমধ্যে কলিকাটায় ভাল আগুন না হওয়ায় আর একবার সেটা পাল্টাইয়া তাহাতে মৃদুমন্দ টান দেওয়া চলিতে লাগিল।

মেজাজ সরিফ দেখিয়া ঘাট-মাঝিটা এই ফাঁকে আর একবার তাহার ভিখারী প্রেমাস্পদের অতীত ইতিহাসের কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল।

ভিখারীর কিন্তু তখন কোন দিকে কাণ দিবার অবসর ছিল না। সে পরম আগ্রহে অন্নদেবতার আরাধনে মাতিয়া গিয়াছিল।—তবু যদি বেগুন পোড়া উপচার মাত্র না হইত!

মাসী একবার সস্নেহে মূর্ত্তিমান দৈন্যের দিকে চাহিয়া তারপর আরম্ভ করিল।

আমিও কথাগুলো শুনিয়া লইব বলিয়া একটু একটু করিয়া রাস্তার এধারে ওধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম।

সামনে কিনারে গঙ্গার জল ছল্ ছল্ করিতেছিল, মেঘের ফাঁকে আকাশে দু একটা সন্ধ্যাতারাও জল্ জল্ করিয়া জলিয়া উঠিতেছিল। বাতাসটা দিনমানেরই মত কড়া, সমস্তটা মিলিয়া বেশ এক বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছিল। এ-ত' কাহিনী নয়; যেন দীর্ঘশ্বাসের এক বিরাট বরফ স্তূপ, সমস্ত পৃথিবীটাকেই হয় ত এর ধাক্কায় বিষম টাল খাইতে হইবে।

..."ও যে তোদের সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কইতে পারে না, তার কারণ ও বোবা হয়ে গেছে কি করেছি এই ভেবে।...নিজের দেশভূম ছেড়ে পাট-কলে এসেছিল বাইশমানী কাজ করতে, দু পয়সা উপায়সুপায়ও করতো, কিন্তু হতভাগাটার দুর্ব্বুদ্ধি—কুক্ষণে মদে আর তাড়িতে ভিড়ে পড়‍্লো, সেই অবধি দেশ ভূঁই পরিবার ছেলে সব গেল গোল্লায়।"

ঘাট-মাঝি নিজেই তাড়িতে মশ্‌গুল ছিল বলিয়া তাড়ির উপরে কটাক্ষপাতে একটু অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "আহা ধরো না কেন মাসী, একটু কম ক'রে তাড়ি খেলে ততটা দোষেরই বা কি? সেবার ত আবগারী সাহেব এসে লেকচার দিয়ে বলেই গেল মদ তাড়ি অতি উত্তম জিনিষ যদি পরিমাণে বেশী না খাওয়া যায়। ও ত জানা কথা মাসী।" স্বর অপেক্ষাকৃত নরম করিয়া বলিল "তুমি যে বলছিলে রতনের মা-বোন ওর সর্ব্বনাশ করেছে, —তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।"

মাসী একটা ধমক দিয়া বলিল, "সবটা শোন আগে! মুখপোড়ার কি বাই চাপল, এখানে সেখানে আসা যাওয়া করতে লাগল। আমি ত তখন ওর সঙ্গে জুটিনি, তা হলে একবার দেখে নিতাম। তারপর—তারপর একটা নীচ পাড়ায় নিলে ভেরা, তখনকার দিনে ভাল ক'রে নষ্ট হবার মত জায়গা সেই পাড়াটার মত আর কোথাও দুটি ছিল না। আমি স্বচক্ষে ওর হাড় মাস খেয়ে চামড়া নিয়ে ডুগ্‌ডুগি বাজাতে দেখেছি, তোরা ত সেদিনকার ছেলে কি করে সব জানবি বল্? যথা সর্ব্বস্ব কেড়ে কুড়ে নিয়ে রাজু বাড়ীওয়ালী যখন ওকে বাড়ী হতে খেদায়ে দিল তখন ও একবারে পাগল হ'য়ে গেছে, চাকরী বাকরী নেই, বন্ধু বান্ধবেরা পর্য্যন্ত কেউ ডেকে কথা কয় না। তার উপরে সারা দেহে পারার ঘা, সেই অবস্থায় আমি ওকে ঘরে কুড়িয়ে নিয়ে এলাম। আজ যেন রত‍্না গলায় সোনার হার ঝুলিয়েছে, কিন্তু ওর প্রত্যেকটি পয়সা শুধি উপায়ে—জানিস্ ? আমি ওকে কি ভেবে ঘরে নিয়ে এসেছিলুম, সে এক ভগবানই জানে। দুনিয়ার যাকে কেউ চাহে না, আমি মেয়ে মানুষ হ'য়ে কি ক'রে তাকে চোখের সামনে মরতে দি? সবাই আমায় ছি ছি করে করতে লাগল। তখন ওর কত প্রকার যে বেয়ারাম—দুহাতে ক'রে ওর থুথু গয়েন্ন মুক্ত করেছি; যখন একটু বাঁচল, তখন ইঙ্গিতে ঈশারায়, বল্লে যে দেশে যাবো। আমিও ঐ কলেই খাটতাম। যা দু পাঁচ টাকা সঙ্গতি ছিল তাই দিয়ে রেলের টিকিট কিনে দিলুম। ও কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী চলে গেল, আমিও কাঁদতে লাগলুম বটে, কিন্তু দেশে গিয়ে ও সুখে থাকবে এই ভেবে কান্নাটাকে বড় বেশী আমল দিলুম না। তারপর কতদিন কেটে গেল, এক বছর নয়, দুবছর নয়, দশ বৎসর, একযুগ পার, আমারও আর চাকরী বাকরী নেই, আতরওয়ালার সঙ্গে মিশে জেল পেটে এলুম। আতরওয়ালা মুখপোড়া যে গোপনে আফিং কেনাবেচা করতো কে জানিতো বলো? তার পর এই সেদিন মাসখানেক হলো ফের ওর সঙ্গে দেখা, এবারে ওর আরও ভয়ানক অবস্থা। দেশে বুঝি কোন এক লড়াএর দলে মিশেছিল, মোপলা মুসলমানেরা গিয়েছিল সরকারের সঙ্গে লড়তে, সেই লড়াইয়ে ওর মা ভাই, ছেলে পরিবার, বিষয় আসয় কোথায় যে তছ্‌নছ্ হয়ে গেছে, তার আর ঠিকানা নেই। যেখানে ওর আগে ঘরবাড়ী ছিল সরকারের কৃপায় এখন সেখানে নদী বহে যাচ্ছে, অনেকদিন অবধি কারো উদ্দেশ করতে না পেরে এই বাংলা দেশেই আবার আমার কাছে মরতে এলো, তা মরুক। ও ম'লে ওর ঠ্যাং দুখানা ধরে মা জাহ্নবীর জলে ভাসিয়ে দিতে পারবো।"—বলিয়াই কেমন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমার সে হাসিটা শুষ্ক গোরস্থানের মাঝে কোন এক মূর্ত্তিমান প্রেতের অট্টহাসির মত শোনাইল! আমি আপনাকে গুপ্ত করিয়াই দাঁড়াইয়াছিলাম। সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলাম এই মোপলা বীর—এই তাহার পরিণাম!!

আমাকে কাছে আসিতে দেখিয়া বিন্দুমাত্র তাহাদের লজ্জা ভয় কি কোন প্রকার সমীহ করিবার প্রয়োজন বোধ হইল না।

খর্পরধারিণী হুকাটাকে গাছের ধারে ঠেসাইয়া রাখিয়া তৈলঙ্গীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,— "ওরে চিন্তাপাণ্ডু, পেটের জ্বালা কমলো? চেটে চেটে এক পুরু কলাই ই ত খেয়ে ফেল্লি, ঢের পেটের জ্বালা দেখেছি বাবা, এমনতর কোথাও দেখিনি। সুর্ব্বস্ব ত খেয়েছ, নাও, এখন চটমুড়ি দিয়ে আগুনের পাশে শুয়ে পড়ো আর কি!"

ঘাট-মাঝি বলিল, আজকের দিনে এই ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাসে গাছতলাতেই থাকবে? কেন কোম্পানীর যাত্রীঘর রয়েছে, সেখানেই ত থাকতে পারো।"

তেজস্বিনী নারীটি অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল, "ও যে কোম্পানীই বলো, গরীবের পাঁজরা চুষে সব ব্যাটাই এখন কোম্পানী বাহাদুর হয়েছে। কাজ কি বাবা, দু এক ফোঁটা যদি জলই আসে, কি করা যাবে!"—বলিয়া হুকা কলিকা লইয়া পুনরায় মনোযোগ দিয়া তামাক সাজিতে লাগিল।

আমাকে দেখাইয়া ঘাট-মাঝি বলিল, "ঐ যাত্রী ঘরের মালিক দাঁড়িয়ে,বাবুকে একটু বলেই দেখনা।" তাহাদের কিছু বলিবার পূর্ব্বে ঘাট-মাঝিই সুপারিশ করিয়া বলিল, "বাবু ওদের একটু এক রাত্রির মত যাত্রীঘরে ঠাঁই না হয় দিলেন, দেখছেন ত হাল, আপনার যাত্রীঘরে কতজনই ত এসে থাকে।"

আমি বলিলাম "স্বচ্ছন্দে, যতদিন খুসী ওরা থাকতে পারে, আমার কোন আপত্তি নেই।"

ঘাট-মাঝি খুসী হইয়া নারীকে বলিল, "দেখ্‌লি, তোরা সাহস ক'রে ভদ্রলোককে কিছু বলতে পারলিনে আমরা কি করবো বল?"

দেখিলাম দয়া করিয়া খর্পরধারিণী আমার দিকে একবার কৃপাদৃষ্টিপাত করিল। পরাভূত মোপলা বীরও মিট্ মিট্ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া লইল।

আমার বড় ইচ্ছা করিতে লাগিল ওর কাছ হইতে সেই ঐতিহাসিক মোপলা বিপ্লবের কিছু কাহিনী শুনিয়া লই, কিন্তু শোনাইবে কে? খর্পরধারিণীকে জিজ্ঞাসা করায় খর্পরধারিণী বলিল, "বাবু ওর কি আর কথা কইবার ক্ষমতা আছে, তা হ'লে ভাবনা কি ছিল, ওই ইরির বিরির ফিরির — বাস্ ঐ পর্য্যন্ত! আমিই সব বুঝতে পারিনে।"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম। ভাবিতে লাগিলাম জয় পরাজয়ে মানুষের মধ্যে মানুষের কি আকাশ পাতাল ব্যবধান সৃষ্টি করে।

সকালে উঠিয়া যাত্রীঘরে তাহাদের খোঁজ লইলাম। কিন্তু কোথায় বা কে? কেহই তাহাদের গন্তব্যস্থানের কথা বলিতে পারিল না। বৈকালের দিকে ঘাট-মাঝিটার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার কাছেই তাহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ইচ্ছা ছিল সাধ্যানুসারে কিছু তাহাদের দিব, ঘাট-মাঝিটা বলিল "ওদের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন বাবু, তারা কি আর মানুষ, তারা হলো বাউরে। বে পরোয়া কোথায় চ'লে গেছে। তৈলঙ্গী ফৌজের আহার দেখলেন বাবু?"

আহারের কথায় মাঝির কাছে স্ত্রীলোকটির আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম "তৈলঙ্গীই ত দেখলাম সব খেয়ে নিলো, সে হতভাগি কি খেলো?"

ঘাট-মাঝি বলিল, "আমাদের কাছে চাট্টি মুড়ি ছিল তাই দিলাম, তাতেই তার রাত কেটে গেছে। নিজের পিয়োলো স্বামীও নয়, কিছুও নয়, তবু ওই এক খেয়াল অদ্ভুত মেয়ের, ও সব মানুষের কি আর কিছু কাণ্ডজ্ঞান আছে? কোথায় এক জাতের মেয়ে আর এক জাতের পুরুষকে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" আমি মাঝিকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম, "মাঝি, মেয়ের কপাল নয় বাঙ্গালীর কপাল।"

নারী হরণ ও বাঙ্গালা সরকার

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন এদেশের শাসনভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে গ্রহণ করেন তখন তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, এদেশের লোকের ধন প্রাণ যাহাতে নিরাপদ থাকে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। কিন্তু আজ দেড়শত বৎসর পরে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে মহারাণীর অমোঘ বাণী ঠিকমত প্রতিপালিত হইতেছে না। ভারতবাসীর পক্ষে ধন প্রাণ ত দূরের কথা স্ত্রীলোক লইয়া সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করাও দায় হইয়া উঠিয়াছে। মনে পড়ে লর্ড চেম্‌সফোর্ড যখন ভারতের বড়লাট, তখন কোহাট হইতে দুর্ব্বৃত্ত আফ্রিদিরা কুমারী এলিস নাম্নী একজন শ্বেতাঙ্গ কুমারীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, এই ব্যাপারে ভারতীয় ও ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ সমাজে এরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় যে পার্লামেণ্ট মহাসভা—প্রশ্নের উপর প্রশ্নবাণে তখন তোলপাড় হইয়াছিল, এমন কি লর্ড চেম্‌সফোর্ডের আসন পর্য্যন্ত টলিবার উপক্রম হইয়াছিল। তার পর কোহাটের একজন শ্বেতাঙ্গ ডাক্তারের স্ত্রী নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কুমারী এলিসকে উদ্ধার করেন। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব অপরাধী আফ্রিদিদিগকে কাবুল রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য মহামান্য আমীরের উপর কড়া হুকুম দেন, আমীর নত মস্তকে সে আদেশ মানিয়া লন। তৎপূর্ব্বে অমৃতসরে মিসেস্ সেরওয়ানী নাম্নী একজন খ্রীষ্টান মিশনারী মহিলা পাঞ্জাববাসীদের হস্তে সামান্য লাঞ্ছিত হইলে লর্ড চেম্‌সফোর্ড কিরূপ রক্তাক্ত চক্ষুতে মহামতি এণ্ড্রুজকে ইহার প্রতিশোধের ভয় দেখাইয়াছিলেন, তাহাও আমরা ভুলি নাই। কিন্তু এই যে আমাদের বাঙ্গালায় প্রতিদিন হিন্দু মুসলমান নারীদিগকে হরণ করা হইতেছে তাহাতে শ্বেতাঙ্গ সমাজ কিংবা পার্লামেণ্ট মহাসভায় সে চাঞ্চল্য কই? তাঁহাদের নিকট একজন শ্বেতাঙ্গ রমণীর সতীত্বের মূল্যও যা, আমাদের নিকট একটা কালা রমণীর সতীত্বের মূল্য তদপেক্ষা অধিক বলিয়া গণ্য। তোমরা রাজা, আমরা প্রজা, তোমরা শাসক, আমরা শাসিত, আমরা তোমাদের উপর আমাদের ধন-প্রাণ-মান-ইজ্জত-শিক্ষা-দীক্ষা সকলের ভার অর্পণ করিয়াছি, তোমরা সে ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছ, এখন যদি তোমরা সে দায়ীত্ব রক্ষা না কর, তবে সেজন্য তোমাদিগকে কতকটা দোষী করিব বৈকি!

একচক্ষু হরিণ নদীর ধারে তৃণশষ্পাচ্ছাদিত জমির উপর বিচরণ করিত, আর সর্ব্বদা একটি চোখ বনের দিকে রাখিত, পাছে কোন শিকারী অতর্কিতে আসিয়া তাহাকে হত্যা করে। কিন্তু হঠাৎ একদিন নদীপথে কতকগুলি শিকারী আসিয়া হরিণটিকে তীর ছুড়িয়া বধ করিল। তখন হরিণ দাপাইতে দাপাইতে বলিল, "মানুষ যেদিক হইতে ভয়ের আশঙ্কা করে না, অনেক সময় সেই দিক হইতেই ভয় আসে।" আমাদের বাঙ্গালা সরকারও তাঁহাদের একটি চক্ষু সর্ব্বদা রাজনৈতিক আন্দোলনকারী (Political agitator) দের উপর রাখিয়াছেন, মনে করিয়াছেন ইহারাই দেশে বিদ্রোহ বাধাইবে; কিন্তু তাহা নয়। মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক আন্দোলনকারী পূর্ব্বে তাহাদের যাহাই ধারণা থাকুক, এখন কিন্তু মনে প্রাণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, হিংসার পথে এদেশে স্বরাজ মিলিবে না, অহিংসামূলক আত্ম নিয়ন্ত্রণ ও স্বাবলম্বনের দ্বারা এবং তোমাদের সহিত সহযোগীতা স্থলে সহযোগীতা ও অসহযোগীতা স্থলে অসহযোগীতা (Responsive co-operation) দ্বারা এদেশে স্বায়ত্বশাসন মিলিবে। কাজেই সরকার যদি শুধু এই রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের দিকেই তাঁহাদের সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন তবে পরিণামে তাঁহাদিগকে ঠকিতেই হইবে।

কেননা—দেশে যদি কোন দিন অশান্তির আগুন জলে তবে জলিবে তাহাদের যারা যাহারা রাজনীতির কোন ধার ধারে না—যাহারা স্বরাজ, স্বায়ত্বশাসনের অর্থই জানে না। এই যে পল্লীগ্রামের শত শত অশিক্ষিত লোক (Dumb million), ইহারা যখন দেখিবে যে সরকারের চৌকিদার, দফাদার যাহাদিগকে তাহারা দেহের রক্ত জল করা পয়সা দিয়া পরিপুষ্ট করে, তাহারা শুধু দারোগা বাবুর ঘোড়ার ঘাস যোগায়, প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত্‌ বাবুর কাট্‌ ফাড়ে আর লাট সাহেবের বাড়ী পাহারা দেয়, তখন তাহারা মাথা তুলিয়া বলিবে—আর আমরা এমন চৌকিদার দফাদারকে অর্থ দিয়া পরিপুষ্ট করিব না। এই নিরক্ষর গ্রামবাসীরা যখন মাথা নাড়া দিয়া উঠিবে তখন সহস্র সহস্র গান্ধী অথবা চিত্তরঞ্জনের সাধ্য নাই যে সে অনল নির্ব্বাপিত করেন। এইজন্য অতি বন্ধুভাবে আজ বাঙ্গালা সরকারকে কয়েকটি উপদেশ দিই। এ দীনের উপদেশ অনুসারে কাজ করিলে বাঙ্গালা সরকার বর্ত্তমান দেশব্যাপী অশান্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। বাস্তবিক যখন রঙ্গপুর, গাইবাঁধা প্রভৃতি স্থানের নারীহরণের লোমহর্ষণ কাহিনী পাঠ করি, তখন ভাবি আমরা মগের মুলুকে বাস করিতেছি, না মার্কিণে দাসব্যবসায়ের উচ্ছেদকারী, নারীর স্বাধীনতা সম্মান প্রদানে সর্ব্বদা সমুৎসুক, সুসভ্য ব্রিটিশশাসনে বাস করিতেছি! বর্গীর হাঙ্গামার সময়েও বোধ হয় বাঙ্গালার নারীসমাজ এখন অপেক্ষা আরও নিশ্চিন্ত ছিল।

মনে পড়ে সিন্ধুদেশের কথা। সিন্ধুদেশে পত্নীহত্যার বাড়াবাড়ি ছিল। ইংরেজ সরকারকে সিন্ধুদেশ জয় করিয়া, তথায় পত্নীহত্যা নিবারণ করিতে হইয়াছিল। ১৮৪০—১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সিন্ধুদেশ জয় করিয়াই ইংরেজ সরকার তথায় পত্নীহত্যার লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশের গভর্ণর Sir Charles Napier তদ্দর্শনে ঘোষণা করেন—

People of Sind! The Government has forbidden you to murder your wives—a crime commonly committed when the British conquered the country.…This the Government will not permit.…Do you imagine that Government believe that these women committed suicide? Do you believe Government can be deceived by such villany?…You are therefore thus solemnly warned, that in whatever village a woman is found murdered heavy fine shall be imposed on all and rigidly levied. If a woman is said to have committed suicide in your district, it shall be an evil day for all in that place." অর্থাৎ হে সিন্ধুবাসী! এতদ্বারা তোমাদিগকে পত্নী হত্যা করিতে নিষেধ করা যাইতেছে। যদি কোথাও কোন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে তাহা হইলে সমস্ত জেলা ধ্বস্ত বিধ্বস্ত ও তোলপাড় করিয়া ছাড়িব; কারণ গভর্ণমেণ্ট ইহা কোনমতেই বিশ্বাস করেন না যে কোন স্ত্রীলোক বিনা অত্যাচারে আত্মহত্যা করে।"

স্যার জন নেপিয়ারের মত আমাদের বাঙ্গালা সরকার কি প্রত্যেক জেলায় এই আদেশ করিতে পারেন না যে, যদি কোন জেলায় কোন স্ত্রীলোককে কেহ হরণ করে, কিংবা বলপূর্ব্বক তাহার ইজ্জত নষ্ট করে, তবে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে থানার দারোগা এমন কি চৌকিদার পর্য্যন্তকে বরখাস্ত করা হইবে—সেই গ্রামের অধিবাসীদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে। আমার বিশ্বাস এরূপ কঠোর আদেশ করিলে দুই দিনেই নারী হরণের প্রতীকার হয়। দেশের জমিদারগুলি আছেন কি জন্য? গবর্ণমেণ্ট কি জমিদারদিগকে এরূপ আদেশ করিতে পারেন না যে তাঁহাদের এলেকায় কোনরূপ নারীনির্য্যাতন কিংবা নারীহরণ হইলে সেজন্য জমিদারের জমিদারী সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইবে? বাঙ্গালার জমিদারেরা বৎসরে প্রায় তিন কোটি টাকা রাজস্ব দেন; আর বাদবাকী দশকোটি টাকা বেমালুম সহরে বসিয়া বিলাস ব্যসন ও আমোদ প্রমোদে [illegible]। লর্ড কর্ণওয়ালিশ কি এই আমোদ প্রমোদ [illegible] জমিদারদের সহিত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent settlement) করিয়াছিলেন? প্রজার ধন প্রাণ রক্ষা ও প্রজার অন্তঃপুর রক্ষার দায়ীত্ব কি জমিদারের নাই? তারপর বাঙ্গলা সরকার গুণ্ডা আইন শুধু কলিকাতাতেই আবদ্ধ রাখিয়াছেন, অর্ডিন্যান্স আইন শুধু রাজনৈতিক সন্দেহভুক্তদের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছেন। কেন? গুণ্ডা আইনকে পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিলে দোষ কি? নারীহরণ-কারীদের মধ্যে যাহাদিগকে আদালতের বিচারে অভিযুক্ত করা যায় না, অথচ তাহারা অপরাধে লিপ্ত আছে বলিয়া স্পষ্ট জানা যাইতেছে, তাহাদিগকে অর্ডিন্যান্স আইনানুসারে আটক করিলে দোষ কি? পল্লীগ্রামই গুণ্ডার লীলাভূমি। প্রত্যেক পল্লীগ্রামে এমন এক এক দল গুণ্ডা আছে যাহারা কেবল পরের সর্ব্বনাশ করাটাই নিজেদের ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষ লাভের উপায় বলিয়া মনে করে, এই সমস্ত গুণ্ডাদের ভয়ে পল্লীবাসীর প্রাণ সর্ব্বদাই সশঙ্ক। আমাদের বিশ্বাস বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট গুণ্ডা আইন সমগ্র বাঙ্গালায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাইবেন।

বাঙ্গলার প্রনর আনা স্ত্রীলোক জানে না যে আততায়ীর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য যদি আততায়ীকে টুকরো টুকরো করিয়া খুন করা হয়, তবে আদালতের বিচারে সে স্ত্রীলোক নির্দ্দোষিণী প্রতিপন্ন হইবেন। গবর্ণমেণ্ট কি বড় বড় প্লাকার্ড বাঙ্গলা অক্ষরে ছাপিয়া তাহা গ্রামে গ্রামে লট্‌কাইয়া দিয়া ঘোষণা করিতে পারেন না যে, "কোন স্ত্রীলোক গুণ্ডার হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য যদি সেই গুণ্ডাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া খুন করে তবে তাহার কোন শাস্তি হইবে না।" গবর্ণমেণ্ট আইনের এই সার্থক কয়েকটি কথা বাঙ্গলার প্রত্যেক পল্লীতে প্রচার করিতে যদি পারেন তবে কেন তাঁহারা এ কার্য্যে বিলম্ব করিতেছেন?

মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট অনেক সময় সার্কেল অফিসারের অনুমোদনক্রমে যে সমস্ত ব্যক্তিকে গ্রামের সার্কেল পঞ্চায়েত বা ট্যাক্স আদায়কারী পঞ্চায়েত নিযুক্ত করেন তাহারা সরকারের মনঃপুত লোক হইলেও দেশের সেবা করা কিন্তু তাহাদের অনেকের অভিপ্রেত নহে। অনেকে সার্কেল পঞ্চায়তী গ্রহণ করে শুধু গ্রামের লোকের উপর আধিপত্য দেখাইয়া প্রতিপত্তি লাভের জন্য। ভাল ভাল শিক্ষিত, গ্রামের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী লোককে সার্কেল পঞ্চায়েত ও ট্যাক্স আদায়কারী পঞ্চায়েত নিযুক্ত করিলে গ্রামের এই সব নারীহরণ প্রভৃতি অত্যাচার অনেকটা কমিতে পারে। অনেক সময় যে সর্ষেতে ভূত ছাড়াইতে চেষ্টা করা হয়, সেই সর্ষেতেই ভূত থাকে।

সরকারের হাতে সি-আই ড আছে, Criminal investigation departmentএর স্পেশাল বিভাগও আছে, কেন এই সব সি-আই-ডি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া গুণ্ডা, বদ্‌মায়েসদের অন্বেষণ করেন না? এরূপ ঘুরিলেও দুষ্ট লোকের একটু ত্রাস হয়।

বোম্বাইয়ে দুই একজন মহিলা অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। বাঙ্গলাদেশের মহকুমায় মহকুমায়, জেলায় জেলায় অনারারি মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা নির্য্যাতিতা, অপহৃতা মহিলাদের বিচার করিলে আমার বিশ্বাস অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে। আর যদি এরূপ করা সম্ভবপর না হয়, তবে অন্ততঃ পক্ষে প্রত্যেক মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্ত্রীলোকদের বিচার কামরার (Camera) ভিতর করেন না কেন? কামরার ভিতর কত কমিশন বসে, কত স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল বসে, আর কালা রমণীদের বেলায় কামরার ব্যবস্থা করিলে দোষ কি? এই ভাবে বিচার করিলে অনেক ভদ্রঘরের অত্যাচার অবিচারের কাহিনীও প্রকাশ পাইতে পারে। অনেক ভদ্রগৃহস্থের রমণী অত্যাচারে নির্য্যাতিতা হইয়াও কেবল প্রকাশ্য আদালতে উপস্থিত হইবার ভয়ে সমস্ত ব্যাপার চাপিয়া যান; একথা বাঙ্গলা সরকার কি জানেন না? যদি জানেন তবে তাঁহারা স্ত্রীলোকদের জন্য সত্বর কামরার বিচার প্রচলন করুন।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম তাহা শুধু বঙ্গীয় সরকারকে। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের যেমন আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের কর্ত্তব্য আছে, আমাদেরও কি সেইরূপ আত্মরক্ষার কোন প্রয়োজন নাই? নিজের প্রাণ, নিজের ইজ্জত নিজে না রক্ষা করিতে পারিলে কেহ তাহা রাখিতে পারে না। আমাদের দেশের যুবকগণ কি গ্রামে গ্রামে Vigilant Cemmitee স্থাপন করিতে পারেন না? এই ত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হইয়া গেল, এখন ত বাঙ্গলার ২০ হাজার ছাত্র তিন চারি মাস শুধু তাস পাশা খেলিয়া কাটাইবেন, তাঁহারা কি গ্রামে গ্রামে Vigilant কমিটি স্থাপন করিতে পারেন না? বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেশের প্রতিনিধির দল এবিষয়ে নির্ব্বাক্ কেন? তাঁহারা কেন এই নারীহরণের দিকে ব্যবস্থাপক সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না? এক "সঞ্জীবনী" পত্র ছাড়া আর কোন সংবাদপত্রকে এই নারীহরণের ব্যাপারের সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতে দেখি না কেন? একা গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় কতটুকু কাজ হইতে পারে, যদি গবর্ণমেণ্টের সহিত ভাল কাজে সহযোগিতা আমরা না করি? গবর্ণমেণ্টের উচ্চতম রাজপুরুষদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট না করিলে তাঁহারাই বা গায়ে পড়িয়া কি করিবেন?

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা বিপিন বাবু ও শ্যাম বাবু (শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী) বলিয়াছেন যে, 'দেশের স্ত্রীলোকেরা আত্মরক্ষায় সমর্থা না হইলে কোন মতেই নারীহরণ থামিবে না।' আমি তাঁহাদের কথা সমর্থন করি। মহাভারতে দেখিতে পাই দুর্দ্দান্ত জয়দ্রথ যখন দ্রৌপদীকে একাকিনী দেখিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতে আসিয়াছিল, তখন দ্রৌপদী জয়দ্রথের সহিত রীতিমত ধস্তাধস্তি করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। আজ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এইরূপ দ্রৌপদীর সৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু বিধি আমরা অবরোধ প্রথা, অবগুণ্ঠন প্রথা, অশিক্ষার তমিস্রায় মেয়েদিগকে আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহাদিগকে এক একটা জড় পদার্থে পরিণত করিয়াছি। মহারাষ্ট্রে, রাজপুতানায়, পঞ্জাবে, মাদ্রাজে মেয়েরা কেমন গটগট করিয়া রাস্তায় বেড়াইয়া বেড়ান, যমদূতও তাঁহাদের নিকট ঘেঁসিতে ভয় পায়। আমাদের মেয়েরা "ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান।" যে ভাবে মাড়োয়ারীর মেয়েরা আপন জাতীয় বেশভূষা পরিয়া স্বচ্ছন্দে প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হন—যে ভাবে রাজপুতের মেয়েরা অশ্বারোহণে রাজপথে বাহির হন, সেইভাবে বাঙ্গলার মেয়েদিগকে যক্ষপুরী হইতে বাহির হইতে হইবে। শাঁখা শাড়ী পরিয়া সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া তাঁহারা বাহির হইবেন—যাহাতে তাঁহাদের দেখিয়া কাহারও মনে পাপ বাসনার উদ্রেক না হয়। আজ মনুর একথা ভুলিয়া যান:—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রশ্চ স্থবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥"

ভুলিয়া যান হিন্দু নারীর ব্রত, জপ, তপ ছাড়া আর কোন কর্ত্তব্য নাই। শিখ জাতির মত কৃপাণ (অনতিদীর্ঘ তরবারি) হাতে লইয়া বাঙ্গলার নারীকে সর্ব্বদা বেড়াইতে হইবে। তবেই গুণ্ডারা সায়েস্তা হইবে। তবেই এ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে—তবেই এ দেশে নারীর সম্মান রক্ষিত হইবে। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণবাবু (সঞ্জীবনীর সম্পাদক শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র) নারীরক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই সমিতিতে সকলে যোগদান করুন। বাঙ্গলার প্রত্যেক জেলায় জেলায়—মহকুমায় মহকুমায় ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হোক, আর [illegible] দেশময় আজ তুমুল আন্দোলন হোক, তবেই দেশ আবার নিরাপদ ও শান্তিময় হইবে।*

* কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে Women Protection League এর অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত [illegible]
—সভাপতি শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ।